নির্বাচিত এক্ষণ ১

প্রবন্ধ সংকলন

স ম্পা দ না

অশ্রুকুমার সিকদার

সপ্তর্ষি প্রকাশন

আগামী পাঠকদের

কৃ ত জ্ঞ তা স্বী কা র

শঙ্খ ঘোষ প্রবীর ঘোষ স্বপন মজুমদার রাহুল মিশ্র শাঁওলী মিত্র
সন্দীপ রায় স্মৃতিকণা দাশ অমল মুখোপাধ্যায় অমল পাল প্রণবেশ মাইতি
সুমন সরকার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় অমিতা চক্রবর্তী বোধিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়
অরিন্দম বসু দয়াময়ী মজুমদার প্রশান্তকুমার বাগল সৌরীন ভট্টাচার্য
আশিস পাঠক শুভঙ্কর দে সৌম্যেন পাল শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুবর্ণরেখা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সূচি

পূর্বকথা

নির্মাল্য আর আমি যখন ১৯৬১ সালে দ্বিমাসিক *এক্ষণ* পত্রিকা প্রকাশ করা মনস্থ করি তখন তার মধ্যে আমাদের দু'জনের সাহিত্যসংস্রব একটা আধার পাবে এমন কোনও গৌরবের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। কলেজে থাকতে থাকতেই আমাদের এমন একটা বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যাদের বন্ধনসূত্রটা ছিল সাহিত্যের ভালোবাসা। আমাদের মধ্যে অনেকেই লেখালেখি করত—কেউ কবিতা কেউ গল্প কেউ প্রবন্ধ। আমাদের মধ্যে কয়েকজন আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলা কি ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্রও ছিলাম। স্বভাবতই নিজেদের লেখা প্রকাশের তাগিদও আমরা মাঝে মাঝেই অনুভব করতাম। নামকরা কাগজে অখ্যাতনামাদের জায়গা পাওয়া যাবে না, তাই নিজেদের লেখা ছাপার হরফে দেখতে পেতে হলে নিজস্ব পত্রিকা চাই। এইরকম একটা ভাবনা অনেক সময়েই আমাদের মনে আসত। কিন্তু নিজেদের লেখা সম্বল ক'রে যে একটা ভালো পত্রিকা বার করা যাবে না এই বোধোদয়টা হতে বেশি দেরি হয়নি।

দু-একবার উপরোক্ত বন্ধুযূথের কয়েকজন এরকম কাগজ বার করার চেষ্টা করেও ছিল। দু'এক সংখ্যার বেশি সেসব কাগজ বার করা যায়নি। শুধু পয়সার অনটনের জন্যেই নয়, লেখা পাওয়ার অভাবের জন্যেও দু এক সংখ্যাতেই এরকম কাগজের শিশুমৃত্যু ঘটত। তাই কাগজ বার করতে গেলে শুধু নিজেদের লেখায় যে কুলোবে না এটা বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম। তখন কাগজ বার করার কথা ভাবতে শুরু করলাম কী করে *পরিচয়* পত্রিকার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ করা যায় যার বিশেষ নিজস্ব গোষ্ঠী ও বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যের সীমান্তটা যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক ছিল।

একসময় ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম, কিন্তু একটা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছেটা পিছু ছাড়ছিল না। অতএব তার চেহারা চরিত্র নিয়ে স্বপ্নেই পোলাও রাঁধাও চলছিল। সেই সময় একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সান্ধ্য আড্ডার শেষে আমি আর দীপা হাঁটতে হাঁটতে মির্জাপুর স্ট্রিটে বাড়ি ফিরছি, নির্মাল্য সঙ্গ নিল। অ্যামহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের ক্রশিংয়ে নির্মাল্য বলল, 'শোন্, আমি একটি পত্রিকা বের করব বলে স্থির করে ফেলেছি। খালি একটা শর্ত আছে, তোকে যুগ্মভাবে সম্পাদক থাকতে হবে। তুই না থাকলে পত্রিকা বের করব না।' উত্তরে আমি বললাম, 'আমি তোর সঙ্গে থাকব, তোকে সব ব্যাপারে সাহায্য করব, কিন্তু যুগ্মভাবে সম্পাদক থাকব না। তোকে বুক ঠুকে বলতে হবে তুই একাই সব দায়িত্ব নিবি।'

এই নিয়ে যুক্তি-প্রতিযুক্তি-তর্ক-বিতর্ক শুরু হল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। ঘণ্টাখানেক ধরে নির্মাল্য আর আমি পরস্পরকে নিজের মতের সপক্ষে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছি, কোনও সিদ্ধান্তে পৌছানও যাচ্ছে না। এই সময় দীপা ভেটো দিল। বলল 'তোমাদের এতদিনের ইচ্ছে একটা কাগজ বের করার, সেটা তুমি না থাকলে বেরবে না- তুমি রাজি হও।' এই ভাবে অ্যামহার্স্ট স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের সংযোগে নৈশ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে 'এক্ষণ' প্রকাশ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছিল।

এরপর শুরু হল পত্রিকা প্রকাশের বাস্তবিক পরিকল্পনা। পত্রিকার নাম কী হবে, কারা কারা লিখবে, কোন্ প্রেসে ছাপা হবে, দফতর কোথায় হবে—এসব ভাবনা শুরু হল।

প্রথম থেকেই আমাদের ইচ্ছে ছিল পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দেবেন সত্যজিৎ রায়। শুধু সেই কথাই নয়, পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে সব কথাই একদিন তাঁকে বলতে আমিই গেলাম। নির্মাল্যকে তিনি তখন চেনেন না বললেই হয়, সামান্য আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম একদিন শুটিংয়ের ফাঁকে। পত্রিকার পরিকল্পনা জানিয়ে ও প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওঁকে পত্রিকার একটা নাম দেওয়ার কথা বললাম। উনি দু'দিন পরে আসতে বললেন। দু'দিন পরে যেতে উনি একটা কাগজ দিলেন, তাতে আট দশটা নাম লেখা ছিল-পছন্দের অগ্রাধিকার অনুসারে। প্রথম নামটিই ছিল 'এক্ষণ' । আমার তো তৎক্ষণাৎ-ই পছন্দ হয়ে গেল, পরে নির্মাল্য ও অন্যান্য বন্ধুদেরও পছন্দ হল।

মানিকদা কারা কারা লিখছেন জিজ্ঞেস করতেন। আমিও জিজ্ঞেস করতাম লেখক হিসেবে কাদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত মনে করেন। এই ব্যাপারে উনি অনেকেরই নাম বলতেন। দু'একজনের নাম মনে পড়ছে, যেমন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। মনে আছে বলেছিলেন, 'তোমরা কমলকুমার মজুমদারের লেখা চাইছ না?' কমলকুমার সম্বন্ধে তখন আমি বেশি অবহিত ছিলাম না। দু-একটা গল্প পড়েছি'কয়েদখানা' 'তাহাদের কথা' কমলকুমার সম্বন্ধে জানতে চাওয়াতে বলেছিলেন— 'He knows all the arts,'এবং বাংলা গদ্যের পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মতো স্বাতন্ত্র্য কারওরই নেই তাও বলেছিলেন।

এক্ষণ-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগে থেকেই এক একটা সংখ্যা এক একটা বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারে জোর দিয়ে প্রকাশ হবে এমন একটা ভাবনা আমাদের মাথায় এসেছিল। এ ব্যাপারে কবি অরুণ মিত্র আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই ইতিহাস সংখ্যা বার করার সময় যেমন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ হল, তেমনি নদী বিষয়ক সংখ্যা করতে গিয়ে নদী বিশেষজ্ঞদের সংশ্রবে এলাম। এই বিশেষ সংখ্যা হিসেবে *এক্ষণ* দুটি সংখ্যায় চূড়ান্ত রূপ পায়—দান্তে সংখ্যা ও কার্ল মার্ক্স সংখ্যায়।

বলা ভালো যে আমাদের ভাবনার মধ্যে সৃজনমূলক সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, কবিতা ইত্যাদির একটা বিশেষ স্থান থাকলেও আমাদের লক্ষ্যটা ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গুরুতর আলোচনা, গবেষণা ও চর্চার একটা ক্ষেত্র হিসেবে *এক্ষণ*-কে গড়ে নেওয়া । পুনর্মুদ্রণের যে প্রায়-নিয়মিত বিভাগ আমরা চালু করেছিলাম তার উদ্দেশ্যও ছিল সংস্কৃতির ঐতিহ্যের দিকে মননসমৃদ্ধ দৃষ্টিপাত করা।

যুগ্ম সম্পাদনায় *এক্ষণ* প্রকাশিত হত। সেখানে দু'জন সম্পাদকের দায়িত্ব কর্তব্য কী হবে তা নিয়ে প্রথম থেকেই একটা সমঝোতা করে নিতে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে। একটা সংখ্যা কী রকমের হবে, কী কী থাকবে তাতে, তার সম্ভাব্য লেখক কারা, এসব নিয়ে দু'জনে আমরা আগে আলোচনা করে নিতাম। তারপর যেমন যেমন লেখা পাওয়া যেত তেমনই আকার পেত সংখ্যাটি।

একটা বিভাগ নিয়ে নির্মাল্য প্রায় কোনও মাথাই ঘামত না, সেটা কবিতা। ওটা ও সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। নতুন অপরিচিত অনেক লেখককেও ওই বিভাগে আবিষ্কার করেছি আমরা । যেমন মালিনী ভট্টাচার্যের 'মৃণালিনী ঘোষালের শব' সরাসরি দফতরে এসেছিল। লেখিকাকে চিনতাম না। কিন্তু আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছেপেছিলাম। কবিতা পছন্দ করা বা কবিদের লিখতে বলার ব্যাপারে আমার ওপর দায়িত্ব দিলেও এমন হত না যে, নির্মাল্যর অজ্ঞাতে কোনও কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য সেটা এমনিতেই সম্ভব ছিল না কারণ ছাপাখানার কাজ ওই দেখত।

অন্যান্য সব বিভাগের লেখাই যে ভাবেই আসুক না কেন, যার মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হয়ে থাক না কেন দুজনে পড়ে একমত হয়েই ছাপা হত। যখন থেকে দু'জনের এই একমত হওয়ার পথে অন্তরায় তৈরি হল তখন থেকেই যুগ্মভাবে সম্পাদনার থেকে আমি সরে আসার কথা ভাবতে আরম্ভ করি।

একেবারে গোড়া থেকেই ছাপা, প্রুফ দেখা, লে-আউট নিয়ে ভাবাটা নির্মাল্যই করত, এবং সেই কাজটা সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করত। সেইরকম আমি বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্যে বড় ছোট কোম্পানির অফিসে ঘুরতাম। বিজ্ঞাপনের সহায়তা ছাড়া তো এরকম কাগজ টিকিয়ে রাখা যেত না, বিজ্ঞাপনপ্রার্থী হিসেবে আমার চিত্রতারকার পরিচিতিটা কাজে লাগত। পরে কিন্তু কাগজের পরিচিতিটাই ব্যাপকতা

পেলে বিজ্ঞাপন অনেক সহজেই আসত, এবং সেখানে নির্মাল্য অনেক সময়ই সুচিন্তিত পদ্ধতিতে এই ব্যাপারটার দেখভাল করত।

এসব দায়িত্ব বিভাজন থাকলেও কী লেখা প্রেসে যাবে তা নিয়ে প্রায় কোনও মতপার্থক্যই বহুদিন অবধি ছিল না। কিন্তু একসময় সেই পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। সর্বোপরি একটা সময় এল যখন আমার অগোচরেই কোনও কোনও লেখা *এক্ষণ*-এ প্রকাশিত হতে থাকে। এবং সেসব লেখার *এক্ষণ*-এ প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমার আপত্তি সত্ত্বেও অনেকসময় তা ছাপা হয়। তখনই আমি যুগ্ম সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে সরে আসি। নির্মাল্য তারপরে এককভাবেই *এক্ষণ* সম্পাদনা করে যায় আরও কিছু কাল।

এক্ষণ প্রকাশের সব থেকে বড় সার্থকতা কোথায় ছিল এটা যখন ভাবি, তখন সমাজে এর কী উপকারিতা ছিল তার বিচার করা আমার দুঃসাধ্য মনে হয়। এবং সে দায়িত্বও আমার নয়। আমার ব্যক্তিগত চিন্তায় শুধু মনে হয়, আমরা সম্পাদক দু'জনই বোধহয়, একাজে সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছি। জ্ঞানী, গুণী, সৃজনশীল, চিন্তাশীল মানুষদের সংস্রবে আসার সুযোগ আমাদের চিন্তা চৈতন্যের দীনতা অনেক পরিমাণে ঘুচিয়ে দিয়েছে, দৃষ্টির সীমানাকে অনেক বিস্তৃতি দিয়েছে। *এক্ষণ* প্রকাশ করে আমার ক্ষেত্রে অন্তত আমি বুঝতে পারি , এই কাজটা করতে পেরে মানুষ হিসেবে আমার কিছুটা বিকাশ হয়েছে।

পুনশ্চ

এক্ষণ পত্রিকার সংখ্যাগুলিতে খুব উল্লেখযোগ্য কবিতা, গল্প-উপন্যাস, স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের অনেক চিত্রনাট্য । এইসব রচনা ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবুও বলা উচিত, *এক্ষণ* ছিল প্রধানত প্রবন্ধের পত্রিকা। একথা তাই মেনে নিয়ে বলা হয়েছে, 'দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের এই পত্রিকায় প্রবন্ধের অতুল পদযাত্রা। সাহিত্য-শিল্প-লোকসংস্কৃতি-চলচ্চিত্র-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-সংগীত-বিজ্ঞান—সারস্বত সমগ্র বিষয়কেই ছুঁতে চেয়েছে পত্রিকাটি।' এই কথা মনে রেখে 'নির্বাচিত এক্ষণ'-এর পৃথক দুই খণ্ডে প্রবন্ধই সংকলিত হবে, এইটি স্থির করা হল । তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হবে নির্বাচিত গল্প-উপন্যাস কবিতা স্মৃতিকথা নাটক চিত্রনাট্য ইত্যাদি—এমনই পরিকল্পনা।

প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে প্রথম থেকে সপ্তম বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত বাছাই প্রবন্ধ। এই খণ্ডেই সংকলিত হল বিখ্যাত দান্তে সংখ্যা ও মার্কস সংখ্যা থেকে বাছাই-করা প্রবন্ধ। আমরা সচেতন যে সম্পাদক ভেদে প্রবন্ধ নির্বাচনে হেরফের হতে পারত। যেসব প্রবন্ধকার বা তাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অনুমতির জন্য যেসব প্রবন্ধকার বা উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

নির্বাচন-পদ্ধতি বিষয়ে দু-চারটি কথা বলা জরুরি। *এক্ষণ* প্রকাশিত হয়েছিল অনেক দরকারি ও দুর্লভ পুরোনো লেখা, *এক্ষণ*-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল এইসব রচনা। কিন্তু কোনও পুনর্মুদ্রিত লেখাকে এই নির্বাচনের অন্তর্গত করা হল না। তাই যেমন বর্জিত হয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী' তেমনি বর্জিত হয়েছে মার্কস বিশেষ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত, অনূদিত ও পুনর্মুদ্রিত, পল সুইজির 'মার্কস ও সর্বহারা শ্রেণী' মরিস ডবের 'মার্কসের ক্যাপিটাল', রজনী পাম দত্তের 'মার্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী', জোসেফ নীডহ্যামের 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ'। আমরা নিতে পারিনি নিতান্ত বিদ্যায়তনিক প্রবন্ধ এবং বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা প্রবন্ধ। তাই নিইনি জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'ওড়ের রূপ ও রীতি', সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ', অবন্তীকুমার সান্যালের 'অনুকরণবাদ : গ্রীক ও ভারতীয়', পদ্মনাভ দাশগুপ্তের 'কুমার গন্ধর্ব ও খেয়াল গানের ভবিষ্যৎ', অরুণ মজুমদারের 'মূল্যমানের নিয়ম ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্কার' ইত্যাদি।

পুস্তক সমালোচনা সচরাচর গৃহীত হয়নি। দুটি ব্যতিক্রম করা হয়েছে— প্রথমটি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের বিচার' দ্বিতীয়টি প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের 'বাংলায় আন্তিগোনে'। দু-তিন পৃষ্ঠার লেখা, যেগুলি প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধের খসড়া বড় জোর, সেগুলি নেওয়া হয়নি, যেমন রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'ধ্রুপদী সাহিত্য' বা অন্নদাশংকর রায়ের 'সাহিত্যিকের সংকট'। আর নির্বাচনকালে আমরা মনে রাখতে চেয়েছি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতকে ।

এক্ষণ-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ পরবর্তীকালে কোনও-কোনও প্রবন্ধকার পরিমার্জিত করে অন্যত্র ব্যবহার করেছেন। এখানে *এক্ষণ* প্রকাশিত পাঠই বজায় থাকল । আর আমরা মুদ্রণকালে বর্তমান বানান পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

অশোক মুস্তাফি

বাংলার নব-জাগৃতি ও টম পেন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের, তথা ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা ইদানীং কৌতূহলী হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই *The Age of Reason*-এর প্রখ্যাত লেখক টম পেন সম্বন্ধে সম্যক অবগত নন। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে পেনের যে একটি নেপথ্য-ভূমিকা ছিল, এটা তাঁদের কাছে হয়তো একটা অভিনব আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়বে। অথচ এই বিদেশি এবং অধুনা বিস্মৃত চিন্তানায়ক একসময় বাংলার সমাজচিন্তাকে যে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন তার অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের ইতিহাসের পাতায় ইতস্তত ছড়ানো আছে। জীর্ণরিক্ত ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং যুক্তিবাদের স্বপক্ষে, বাংলার তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একদা যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাতে পেনের রচনাবলি তাঁদের বাস্তবিক খানিকটা প্রেরণা যুগিয়েছিল, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতটি পেনের সাংস্কৃতিক অবদানের সুষ্ঠু বিচারের জন্য সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। নবলব্ধ পশ্চিমের মানবিকতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ধার্মিক নিরপেক্ষতাবাদের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদী শিক্ষিত বঙ্গযুবকদের প্রেরণার প্রধান উৎসস্থল ছিল একথা বলা যায়। মুখ্যত হিন্দুকলেজের চিন্তাশীল এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শ্রদ্ধাবান কতিপয় তরুণ, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের অভিযানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে এঁরা ফরাসি বিপ্লব এবং ইংলন্ডের সংস্কার আন্দোলনের আদর্শগুলিকে বাংলার অবনত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভক্তিকে নয়, যুক্তিকেই প্রগতির হাতিয়ার হিসাবে সমাজজীবনে ব্যবহার করতে এঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন এই কারণে যে আমাদের পুরাতন সামাজিক রীতি ও ধর্মগত প্রতিষ্ঠানগুলি, আচারসর্বস্বতা, এবং কু-সংস্কারের মধ্যেই এ যাবৎ বিশিষ্টতা দাবি করে আসছিল। এক ধরনের কর্তৃত্ব-পরায়ণতা এবং গোঁড়ামি বাংলার সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফরাসি enlightenment এবং ইংলন্ডের সংস্কার আন্দোলনের আদর্শগুলির আলোকে এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস যে বাঙালির সুস্থ সমাজ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক এবং সমূহ বিপজ্জনক এই ধারণা প্রসারের প্রয়োজন তখনকার ইংরেজিশিক্ষিত কয়েকটি ছাত্র বিশেষ করে অনুভব করেছিলেন। এঁরা খ্রিস্টীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানসঞ্জাত সামাজিক সচেতনতার মনোভাবের দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন, বস্তুত তৎকালীন বাংলার জাতীয় ক্ষেত্রে কি বিপ্লববাদী, কি সংস্কারবাদী—সকলেই উভয়ের থেকেই ফললাভে প্রয়াসী ছিলেন, যুক্তির পথে এঁদের সত্যকে জানবার এবং লাভ করবার প্রচেষ্টার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচ্ছন্ন ছিল; আর কর্তৃত্ব-পরায়ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে নিহিত ছিল এক ধরনের মানবিকতাবাদ এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে উভয়কেই আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে বাংলার মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীরা একধরনের নূতন স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দিলেন একথা সন্দেহ না রেখে বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ইউরোপীয় যুক্তিবাদী উদারনৈতিক সমাজদর্শনের প্রভাব প্রথম পর্যায়ে সংঘর্ষ এবং সন্দেহের মধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্কারবাদী অথবা সৃষ্টিশীল সামাজিক চিন্তা এবং ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত দেখি। ভারতের প্রাচীনবিদ্যার নূতন আলোকে অধ্যয়ন এবং আমূল সমাজসংস্কারের দিকে প্রবণতা এই নবজাগরণেরই একটি অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া এবং ফল। কেউ কেউ এটাকে প্রাচ্যাভিমান বলেছেন। আসলে একটা বন্ধনমুক্তি এবং ঐতিহ্য আশ্রয়ী ধর্মভাবের রূপান্তরই এই নবজাগরণের লক্ষণ। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান নয়, একটি নূতন সামাজিক জীবনচর্যাই এই অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য। তখনকার

সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিগুলি আমাদের এই পশ্চিমি প্রত্যয়ের সাক্ষ্য নির্ভুলভাবে বহন করে। পুরাতন সামাজিক মূল্যজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীগত জেহাদে একটি নূতন অভিজাততান্ত্রিক মননশীলতা এবং গণতান্ত্রিক সচেতনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সময় আমাদের শিক্ষিত সমাজে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার আগ্রহ এবং একটি নূতন স্বজাত্যবোধ সমভাবেই প্রকাশমান দেখি। হিন্দু ধর্মের সংস্কারের প্রচেষ্টাও এক অর্থে এই নবজাগরণের প্রতিক্রিয়া। স্মরণ রাখতে হবে যে ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্ম বা আনুষ্ঠানিক খ্রিস্ট ধর্ম কোনওটিই এই নবজাগ্রত হিন্দু যুবকদের দ্বারা গৃহীত হয়নি। বরং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এই নবজাগরণে আমাদের সমাজচিন্তার একটা নিছক ধর্মগত এবং লৌকিক ভিত্তিই বিশেষভাবে আক্রান্ত হল। নূতন বুদ্ধিবাদী এই সামাজিক আন্দোলনে—প্রকাশের দিক থেকে তা যত আংশিক, অস্বাভাবিক বা অসচেতন হোক না কেন—আমাদের ঐতিহ্যগত ভাগ্যবাদই বিশেষ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল। যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের উন্মেষ হিন্দুকলেজে এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখা দিল তা জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়নি; সমাজ জীবনের মানপরিবর্তনে শিক্ষিত যুবকমহলে প্রচণ্ড রকমের একটা সামাজিক তাগিদ অনুভূত হল যার বেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে। এই চিন্তার জাগরণ অসমাপ্ত, কিন্তু অসামান্য এই অর্থে যে এর ফল সুদূরপ্রসারী। এখনকার একজন লেখক বাংলার এই নব্য মানবিকতাবাদকে বলেছেন, 'মানুষের বিশ্বরূপদর্শন'। চিন্তার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে মানবিক ঐক্যের ভিত্তিতে বহির্জগতের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হল মুখ্যত এই নবজাগৃতির কল্যাণে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলার সামাজের ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি ও আদর্শের ক্ষেত্রেই দেখা গেল। একটি নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই এই নবজাগরণের মুখ্য অবদান।

এই নব্য সামাজিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা বহুলাংশে আহূত হয়েছিল বেকন, লক, নিউটন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক রচনারাজি থেকে। তৎকালীন বাংলার অনতিবয়স্ক প্রগতিপন্থীরা হিউম, গিবন, ভলটেয়ার, কোঁত্‌ বেন্থাম, বার্ক এবং পেনের লেখায় তাঁদের মতবাদের সূত্র এবং সমর্থন পেলেন। ফলে সামাজিক আচার আচরণের ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা তাঁদের পক্ষে কিছুটা সম্ভব হল, যদিও তাঁদের চিন্তার বৈপ্লবিকতা অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় না হয়ে, উদ্দেশ্যেই রূপ নিল। তখনকার সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি মাত্রই সনাতন ঐতিহ্য, অন্ধ ভক্তির মাহাত্ম্য এবং হিন্দুত্বের গৌরবের উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণে মর্মাহত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকীয় বাংলার সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রীতিগুলির পুনর্বিচারের প্রচেষ্টাকে তাঁরা পশ্চিমের নির্লজ্জ পদাঙ্ক অনুসরণ বলেই অ্যাখা দিয়েছিলেন। অথচ অন্ধ পৌত্তলিক উপাসনা এবং যুগসঞ্চিত সংস্কার সমাজজীবনকে সংক্রামিত করলে সংস্কারকামনা যুক্তিপ্রয়োগ অথবা মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতি মূল প্রশ্ন থেকে জনগণের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হতে পারে এই আশঙ্কাই নূতন উদারপন্থীরা করেছিলেন। ফলে, সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের বিভিন্ন সখ্যতা লাভ করেছিলেন। বস্তুত তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদ এবং বিশুদ্ধ ইউরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং হিন্দুধর্মের নিতান্ত ব্যক্তিক এবং আত্মিক রূপটির বিরুদ্ধে তাঁদের কোনও অভিযোগ ছিল না। পাশ্চাত্য উদারনৈতিক শিক্ষার দাক্ষিণ্যে পুষ্ট এই যুবকবৃন্দ হিন্দু সমাজের অবনত অবস্থার জন্য সংগতভাবেই অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারকেই দায়ী করতেন, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের আত্মার স্বাধীনতার কথাই এঁরা উচ্চারণ করেছিলেন এবং মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের পরিপন্থী বলেই তাঁরা ঐতিহ্যসর্বস্ব রাজনীতিকে স্বীকার করতে পারেননি। এঁরা অনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সমাজনীতির অশুভ যোগই বরদাস্ত করতে অক্ষম ছিলেন। একধরনের সামজিক হিতবাদে এই মধ্যশিক্ষিত যুবকবৃন্দ গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যার জন্য সর্বোচ্চ নৈতিকতা বা মধ্যযুগীয় ধর্মের গোঁড়ামি তাঁদের নূতন সামাজিক চেতনাকে আহত করেছিল। অর্থহীন এবং বিষম হিন্দু আচার আচরণের অন্তঃসারশূন্যতা সর্ম্পকে যে নির্ভীকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁরা দেখিয়েছিলেন তা মূখ্যত হিউম,ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট এবং টম পেন পড়ার পরোক্ষ ফল।

নূতন সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শাহরিক এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা বস্তুতহিন্দুধর্মকে যুক্তির কাঠগড়ায়দাঁড় করালেন। খ্রিস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠ যে অংশের সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্তরের যোগ ঘটেছে তার, দিকেই তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এঁরা কিন্তু দেশীয় পৌত্তলিকতাকে সরাসরি বর্জন করে ইউরোপীয় ধর্মগত অবিশ্বাসকে বা শুধু খ্রিস্ট ধর্মকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায় আশ্রয় করেননি।

Indeed, their dislike of Christianity was second only to their dislike of Hinduism, (*Calcutta Review* 1852; Jan-June vol : xvii; History of Native Education in Bengal, p. 354)

ধার্মিক আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এই নির্বিশেষ প্রতিবাদে এঁরা পেন প্রমুখ বিদেশি লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। তাঁদের মানসজগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করায় ডিরোজিও সাহেবের *পার্থেনন* কাগজ এবং Academic Association প্রভৃত সাহায্য করেছিল। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' স্বাধীন ইচ্ছা, 'নারীদিগের অধিকার' প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার আলাপ আলোচনার এই সাংস্কৃতিকচক্রটি প্রধানত কয়েকজন বিদেশি চিন্তানায়কের ধ্যানধারণার অনুবর্তী ছিল। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হবে যে তাঁদের এই বাস্তবনিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস কোথায় ছিল:

Bacon, Hume and Tom Paine became the favourite authors of the students. (Presidency College Register,1927;p.81).

বস্তুত ইংলন্ড এবং ফ্রান্সে ধর্মগত চিন্তার ক্ষেত্রে টমাস পেনের *Age of Resson* প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। ধর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্ব এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার স্বপক্ষে, মূলত যুক্তি ও ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে পেনের এই রচনাটি রচিত হয় যে অনতিবিলম্বে এটি দেশের বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মহলে বিস্ময় এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মাকে বাদ দিয়ে অযৌক্তিক এবং মানবিক দিক থেকে অন্যায্য আচার আচরণকে প্রাধান্য দেওয়া যে প্রতি ক্রিয়াশীলতার নামান্তর একথা পেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করলেন। ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে এই পুস্তক রচনার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে পেনকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত এবং নিন্দিত হতে হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থটির প্রভাব যে নিতান্তই আঞ্চলিক ছিল না তার প্রমাণ বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এর প্রচার এবং আশাতিরিক্ত সমাদর।

বস্তুত সামাজিক ঐতিহ্যবাদীরা বাংলাদেশে পেনের এই প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে প্রীতি তো নয়ই, বরং সমধিক ভীতির চক্ষে দেখেছিলেন। শিক্ষিত যুবক মহলে *Age of Reason* -এর আশ্চর্য জনপ্রিয়তা যে তাঁদের যথেষ্ট শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল নিম্নের উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ হয়:

> Hume's works were then read with avidity, also Tom Paine's The Age of Reason for a copy of which eight rupees were offered by some of the pupils.
>
> *Calcutta Christian Observer* August1832.

নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দিয়েও ছাত্রেরা যে পুস্তকটিকে সংগ্রহ করতেন তা এর লোকপ্রিয়তাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। হিন্দু কলেজের ছাত্রমহলে পেনের বুদ্ধিগত আবেদন সম্বন্ধে তাঁর একনিষ্ঠ সমালোচক আলেকজান্ডার ডাফের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> If the subject was historical, Robertson snd Gibbon were appealed to, if political, Adam Smith & Jeremy Bentham, if scientific, Newton & Day, if religious, Hume and Paine , if metaphysical, Locks & Reied, Dugald Stuart & Brown.
>
> (*India & India Missions* 1839Appendix p.615)

পরিবর্তনশীল জগৎ সম্বন্ধে যে সচেতনতা নব্যবঙ্গ লাভ করেছিলেন, তা তাঁদের সামাজিক মনের গতি নির্ণয়ে নিঃসংশয়ে সাহায্য করেছিল। পেনের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রভাব তখনকার ছাত্রসমাজের উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলে সমালোচকের নিষ্করুণ লেখনী তাঁকে নিশ্চিত রেহাই দিত। কিন্তু কলেজপ্রাঙ্গণের বাইরেও যে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাই ড. ডাফের জীবনীকার স্মিথের

একটি উক্তিতে :

> Outside of the classes, but constantly reffered to by the teachers, the favourite book was Paine's The Age of Reason.
>
> *Life of Alexander Duff* 1879; p.144

আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু ছাত্রসমাজ দুর্নীতি এবং সংস্কারে নিমজ্জিত সামাজিক অবস্থার প্রতিকার যে পেনপ্রমুখ লেখকদের রচনায় খুঁজবেন, তা আর বিচিত্র কি?

ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় কর্তৃত্বপরায়ণতা সর্বদা পরিহার করে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে একটি ধ্বংসবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে যাঁরা নূতন সমাজব্যবস্থা আনয়নে বিশ্বাসী ছিলেন সেই সব বয়ঃকনিষ্ঠ হিন্দু ছাত্র পেনের লেখায় নিজেদের বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার যুক্তিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপই খুঁজে পেয়েছিলেন। এমনকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো স্থিরবুদ্ধি নির্দলীয় ব্যক্তি পেনের *Age of Reason* পাঠ করে তখনকার দিনের মিশনারি প্রভাব অনেকটা এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারও প্রমাণ আছে। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণ:* ড. সুশীল গুপ্ত ; পৃ ১৩১)। Enquirer কাগজে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির ধর্মীয় নির্ভীক উক্তির জন্য একজন গবেষক তাঁকে 'বাঙালি পেন' এই আখ্যা দিয়েছেন (*যুগন্ধর মধুসূদন* : ড. শীতাংশু মৈত্র; পৃ ৬১)। পেনের প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা যে তৎকালীন ছাত্রমহলে অনুকরণের বস্তু হয়েছিল তা তাঁর গভীর আবেদনেরই সাক্ষ্য দেয়।

Age of Reason সম্বন্ধে ১৮৩২-এর জুলাই মাসের *সমাচার দর্পণ*-এর একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারের যোগ্য :

> ...which falling in the hands of some young men educated in England, the anxiety to purchase the work became great...we hear that his whole stock was sold among the natives in few days.

ওই সংখ্যাতেই ছাত্রমহলে পেনের এই যুগান্তকারী গ্রন্থটি কী পরিমাণ আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। সে সম্বন্ধে একটি কাহিনি আছে। একজন ভারতীয় পুস্তক বিক্রেতা *Age of Reason*-এর একশত কপি আমদানি করেছিল এবং প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা ধার্য করে একটি পত্রিকা স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু 'such was the demand for the book that he sold them for five rupees per copy.' তখনকার দিনে কোনও বিদেশি পুস্তকের এই জাতীয় সমাদর প্রায় অভাবনীয় ছিল। তৎকালীন হিন্দু ছাত্রদের মানসিক প্রবণতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে *Calcutta Review* (1982, vol xvii Jan-June, p. 354) লিখেছেন :

> The influence of the Europeans whom they looked up to with most respect was decidedly anti-christian and it is notorious that their notions of the religion of jesus were drawn chiefly from Paine's Age of reason and the pages of Gibbon and Hume.

বস্তুত পেনের ভাষার সরলতা এবং তীক্ষ্ণতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য স্বভাবতই পাশ্চাত্য শিক্ষিত এই যুবামহলের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর যুক্তি অন্তত বাংলাদেশের সে যুগের ভক্তিপ্রবণ প্রাচীনপন্থীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে যে বাধ্য করেছিল তারও প্রমাণ আছে। পেনের পুস্তকটি বস্তুত এমন সময় প্রচারিত হয়েছিল যখন উদারনৈতিক বহুমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশকে নূতন প্রত্যয়ে নূতন সামাজিক মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নব্য যুবকদের চিন্তাজগতে ধর্মীয়বোধ একটি *নূতন সামাজিক বোধে বিলীন হয়েছিল।*

এই প্রসঙ্গে ড. ডাফের আক্ষেপ-উক্তি স্মরণীয় :

> Their great authorities...were Hume's 'Eassys' and Paine's 'Age of Reason' with copies of the letter in paraicular, they were abundantly supplied—supplied form a land which has taught more than one invaluable lesson to mankind, if mankind

were only wise to learn. It was some wretehed book-seller, in the United States of America who basely taking advantege of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars— despatched to Calcutta—a cargo of that malignant and pestiferous of all anti-Christian publications, Form one ship a thosuand copies were landed and at first sold at the cheap rate of one rupee per copy but such was the demand that the price soon rose and after a few months it was quadrupled. Besides the separate copies of the Age of Reason, there was also a cheap edition in one thick volume of all Paine's works, including the Rights of Man and other minor pieces, political and theological

India & Indian Mission : A.Duff, 1839; Appendix p. 616

এই খেদোক্তি থেকে এইটিই প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত সমাজ পেনের মানবিক অধিকারবাদী স্বাধীন চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষভাবে এবং গভীরভাবে পরিচিত হবার পূর্ণ অবকাশ পেয়েছিল এবং সেগুলি তাদের মানসিক অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট নিবৃত্তি ঘটিয়েছিল।

তবে ডাফ সাহেব পেনের যে বিধর্মী হিসেবে বা খ্রিস্টধর্মবিরোধী হিসেবে অভিহিত করেছেন তার যথেষ্ট সংগত কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংলন্ডের প্রথম পর্যায়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পেনের একটি উক্তি আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করে :

That instead of Christian examples to the Indians, she hath basely tampered with their passions, imposed on them ignorance and made them tools of treachery and murder.

A Serious Thought : *Paine's Collected Works* ed. by Conway Vol-I

অন্যত্র পেন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একটি বিরল একাত্মতা অথচ সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন :

Oh India! Thou loud procalimer of European cruelties, thou bloody monument of unnecessary deaths, be tender in the day of enquiry and show a Christian world thou canst suffer and forgive.

Life and Death of Robert Clive : Vol-1, Paine's Collected Works by Conway

অতএব বাংলা তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একজন সহৃদয় এবং ধর্মপ্রাণ বিদেশি বন্ধু হিসাবেই পেনকে গ্রহণ করতে আমরা যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হই। বস্তুত বাংলার নবজাগরণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের ধারাটি পেনের এই জাতীয় উক্তির দ্বারা কিছুটা পুষ্ট হয়েছিল তা বোধ হয় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়। বাংলা তথা ভারতের সমাজ সংস্কারের ধারাটি—যা নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাও পেনের ভাবনার দ্বারা সমৃদ্ধ এটা হয়তো অনেকেই জানেন না, সে যুগে এশিয়া ভূখণ্ডে স্ত্রীজাতির হীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে পেন তাঁর *Occasional Letters to the Female Sex* (Conway: Vol–1) নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন :

In Turkey, in Persia in India in Japan and over the vast empire of China—one-half of the human species in oppressed by the other the multitude of women there assembled have no will, no inclination but his.

তখনকার বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে এই উক্তিগুলি সমাধিক প্রযোজ্য। এমনকি বর্তমান ভারতে যে সামাজিক পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতেও পেনের এই বহু পুরোনো কথাগুলি মূল্যবান মনে হয়।

পেনের ধ্যানধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার আগ্রহ তখনকার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের যে বিলক্ষণ ছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাজির করা যায়। তাঁর Age of Reason-কে বাংলায় অনুবাদের একাধিক চেষ্টা

হয়েছিল তার স্পষ্ট নজির আছে। দুটি উদ্ধৃতি এই মহৎ প্রচেষ্টার নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে—

In 1983, a book had appeared against Christianity, chiefly a translation of Paine's Age of Reason. (Long: Descriptive Catalogue, Tract Society, Tract No. 381) এই মর্মে ডাফ সাহেবেরও একটি মন্তব্যের উক্তি অন্যত্র পাই।

Here the evil genius of Paine was again resusticated. Passages his Age of Reson were often translated verbative into Bengali and inserted in the native news papers. (S.C.Sanyal : History of the Press in India : Calcutta Review, Jan. 1911, p. 28).

তখনকার সংবাদপত্রগুলি যে যুগের দাবিকে অথবা মননশীল তরুণ বাংলাকে স্বীকৃতি জানাবার জন্য পেনের রচনার আংশিক অনুবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন তাও এর থেকে জানা যায়। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের Western Influence in Bengali Literature p. 153-তে দেখি : aspirants after literary fame translated portions of Pain's Age of Reason in the Provakar, the christian missionaries were called upon by way of challenge to reply to it . *সংবাদ প্রভাকর*-এ যে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তার একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে :

> some one soon after took the trouble to translate some part of the Age of Reason into Bengali and to publish in the Provakar...
>
> *Bengali Harkuru*, 1832: Native Paper.

১৮৩২ সালের জুলাই মাসের *সমাচার দর্পণ*-এ ওই একই সংবাদ সরবরাহ করা হয়েছে। ডাফ সাহেব নিজেই এই জাতীয় সংবাদের পরোক্ষ সমর্থন করেছেন :

> The editor of one of the dailies published a separate pamphlet attacking the Bible on the score of its alleged inconsistency. A copy of it he transmitted to me with the compliments challenging a reply.
>
> *India & India Missions*: A. Duff; 642

এই স্বতন্ত্র পুস্তিকাটি যে পেনের Age of Reason-এরই চর্বিতচর্বন বা তার সারাংশ তারও প্রমাণ ডাফ সাহেবের লেখায় পাই :

> I found it to consist chiefly of patched extract from Paine clothed in a Bengali grab *India & India Missions*: A. Duff; p. 642

এই খণ্ডবিক্ষিপ্ত সাক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত (ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনীর সম্পাদনার ভূমিকায়, পৃ ৪৬) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সম্ভবত কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর*-এ পেনের *Age of Reuson*-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুমানের সমর্থন বিশেষ কয়েকটি কারণে জানানো সম্ভব নয়। প্রথমত, ঈশ্বর গুপ্ত নিজে রক্ষণশীল ছিলেন এবং ইংরেজি ভাষায় ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মও ছিলেন না। অধিকন্তু তখনকার অন্যান্য কয়েকটি সংবাদপত্র ধর্মগত প্রশ্নের আলাপ আলোচনা চালাতো। আর যদি ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং এই অনুবাদ ছদ্মনামেও করে থাকতেন, সেটিও তাঁর ভাষার অনন্যতা থেকে পরবর্তী গবেষকরা আবিষ্কার করতে পারতেন। আর এ বিষয়ে সন তারিখের সঠিক অনুসরণ করে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শক্ত। তবে এ সমস্তই প্রমাণ করে যে পেন ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে কতটা জীবিত ছিলেন।

পেনের এই বৈপ্লবিক রচনাটির ক্রমবর্ধমান লোকপ্রিয়তা বাংলার সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তার বহু প্রমাণ আছে। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থটির প্রকাশকে তাঁরা একটি হিমবাহের অগ্রগতির সঙ্গে সমার্থবোধক মনে করেছিলেন। *Age of Reason*-এর প্রভাব তরুণ বাংলার মন থেকে দূরীভূত করবার জন্য তখনকার মিশনারিরা বাংলার স্কুলগুলিতে বাইবেলকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ধার্য করবার কথা চিন্তা করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ধর্মান্ধ কয়েকজন মিশনারি ও হিন্দু *Age of Reason*-কে নিছক একটি বৈদেশিক এবং বিজাতীয় প্রভাব বলেই অভিহিত করেছেন। এই

প্রসঙ্গে ডাফের জীবনীকার বলেছেন :

> Pain's coarse 'Age of Reason' which a respectable deist would not mention save as a warning. That book, has bitter reply to Burke, his Rights of Man and his minor pieces born of the fifth of the worst period of the French Revolution.
>
> *Smith; Life of Duff,* Vol-1 1879, p 144

অবশ্য পেনের প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে হীন প্রতিপন্ন করা এবং বাজারে তাঁর গ্রন্থাদির প্রচার বন্ধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা প্রায় সব দেশেই ঐতিহ্যপ্রাণ প্রাচীনদের তরফ থেকে করা হয়েছিল। বাংলায় এটা নূতন নয়। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে এই বিদেশি গ্রন্থটি তখনকার হিন্দু কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের এবং প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রধান মিশনারিদের তুমুল বিবাদের কারণ হয়েছিল। *হেনরি ডিরোজিও*-এর লেখক এডওয়ার্ডস্ তৎকালীন বয়স্ক হিন্দুদের এই বিরূপ মনোভাবের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বলে যে ডিরোজিও-এর ছাত্ররা আনন্দলাভ করত মূলত যার থেকে তা হচ্ছে :

> licentious plays of the Restoration and in the minor pieccs of Tom Paine
>
> Edwards: *Henry Dorozio*; p.35

Sermon on the Mount-এর উপর কয়েকটি বিকৃত রচনার উল্লেখ করতে গিয়ে তদানীন্তন বাংলার দেশি এবং বিদেশি রক্ষণশীলদের মুখপাত্র ডাফ সাহেব বলেছেন যে সেগুলি greatly exceeded anything exhibited in the paged even of Paine. –*India & India Mission*:Dr. Duff; p. 619

অন্যত্র ডাফ সাহেব ওই একই কথা বলেছেন :

> How little could it have entered the imagination of Paine himself that from the banks of the Ganges, there would hereafter spring a race whose ruined splints would one day upbraid him as the author of the curse.

পুস্তকটি ডাফ সাহেবকে কতটা আতঙ্কিত এবং চিন্তিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত ডাফের আক্ষেপ এবং শ্লেষমিশ্রিত এই উক্তিটি তৎকালীন মননশীল বাঙালির উপর পেনের গভীর প্রভাবের সাক্ষ্যই বিপরীতভাবে বহন করে। সে যুগের অত্যুৎসাহী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মিশনারিদের সহস্র অপপ্রচার সত্ত্বেও পেনের যুক্তিবাদ যুববাংলার মর্মস্থলে প্রবেশ করেছিল। এই কারণে তাঁরা পুস্তকটিকে নিষিদ্ধ ও নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অপর একটি উক্তি সমস্ত বিষয়টির ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে :

> The book spread like wild fire among the native students and scholars and Dr. Duff, finding that it was a great obstacle in the path of converting the Hindus bought all copies that are in the market piled them in the street and made a bonfire of them but Hindus reprinted the book and distributed it among themselves .
>
> *India & Her People*: Abhedananda, p.197

এই বহ্নুৎসবের ঘটনা এবং বইটির পুনঃপ্রকাশ দু'টি একই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে পৃথিবীর সকল পথপ্রদর্শনকারী রচনার এই এক পরিণতি ঘটেছে। টম পেন বাঙালি শিক্ষিত তরুণদের হৃদয় এবং মস্তিষ্কের কাছে যে নিশ্চিত আবেদন রেখেছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় আর অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে নব্য বাঙালি পেনের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দু ধর্মের অলৌকিকতাবাদ, অযথা আধিপত্য এবং আচারসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সংগতভাবেই সন্দিহান হতে থাকবেন। ব্যক্তিক এবং বুদ্ধিক রাজ্যে একটি ধর্মের উদ্‌গাতা হিসাবে পেন হার্ডার, দিদেরো, এবং দ্য অ্যালেম্বারের সমকক্ষ। তিনি নিছক নিরীশ্বরবাদী বা অগভীর তথাকথিত বাস্তববাদী হিসাবে কোনও কোনও মহলে অযথা নিন্দিত হয়েছেন। বস্তুত তিনি নব্য বাংলাকে একটি ন্যায্য ধর্মাচারণ

এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য সামাজিক জীবনচর্যাতেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আরও একটি কথা। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা বাংলায় প্রসার লাভের জন্য পেন প্রমুখ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের অবদান কম নয়। একটি উদারনৈতিক মানবিকতাবাদ যা পাশ্চাত্য প্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ, বুদ্ধিজীবী তরুণ বাঙালি অনেকটা আত্মস্থ করেছিল পেন জাতীয় পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদেরই দাক্ষিণ্যে। যুক্তির প্রয়োগ এবং মানুষের চরম বিকাশ ও সার্থকতার বিষয়ে আশাবাদ, এঁদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। বিভেদদীর্ণ ধর্মসর্বস্ব হিন্দুসমাজ কিছুটা তাঁর যুক্তিবাদের ফলেই উত্তরকালে ভক্তি এবং যুক্তির সমন্বয় সাধনে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অবশ্য ১৮৫০-এর পর, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনর্ভ্যুত্থানের পর থেকেই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাব বাংলাদেশে হ্রাস পেতে থাকে।

উপসংহারে বলা যায় যে ইয়ং বেঙ্গলের ওপর পেনের প্রভাব গঠনমূলক দিক থেকে তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না অথবা স্থায়ীও হয়নি। কেননা মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষিত হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে অত্যন্ত দ্রুত ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেকটা আধুনিকতার ঝোঁকে এবং গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্ম এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধবাদের জন্যই সেই সামাজিক আলোড়নের সময় পেনকে অধ্যয়ন করেছিলেন। কতটা সত্যকার মূল্য তাঁর রচনায় লোকে আরোপ করেছিল তা গভীর বিবেচনার বিষয়। পেনের সঙ্গে তখনকার বুদ্ধিজীবীরা বোধ হয় এক ধরনের সাময়িক মানসিক সান্নিধ্য বোধ করেছিলেন। পেনের যুক্তিবাদ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বিতণ্ডা হিন্দুধর্মের পুনর্ব্যাখ্যানেই ঐতিহ্যবাদীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। বস্তুত নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অস্তিত্ব একটি অস্বাভাবিক সামাজিক interlude হিসাবে ছাড়া পরবর্তীদের আর তেমন করে চিন্তিত অথবা প্রভাবিত করেনি। সামাজিক বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার অধিকার সাব্যস্ত করতে এবং ব্যক্তিগত বিবেচনার ক্ষেত্রটি নির্দেশ করতেই বোধ হয় পেনের প্রেরণায় তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রগোষ্ঠী চেয়েছিলেন। নূতন ভাবধারা প্রচারের একটি মাধ্যম হিসাবেই বাংলায় পেনের চিন্তাধারার মূল্য, নূতন চিন্তার উৎস হিসাবে ততটা নয়। তাঁর *Age of Reason* ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে যে খানিকটা সহায়তা করেছিল, সে ব্যাপারটি আজ তর্কাতীত।

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৮)

শান্তি বসু

পশ্চিমের ঘাটে

হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি যাই বলো না কেন, তুমি তো জানো, বাস্তবে বাছাই বলে কোনও বস্তু নেই।

ডস্টয়েভস্কি

আমরা আবিষ্কার করেছি যে আমরা আমাদের ভূমিকা জানিনে। একটা আয়না খুঁজছি আমরা। আমাদের সাজ খুলে ফেলতে চাচ্ছি, যা কিছু আমাদের মিথ্যে সরিয়ে ফেলতে চাই, হতে চাই সত্য। কিন্তু ভুলে গেছি এমন একটা টুকরো ছদ্মবেশ, কোথাও তবুও লেগে আছে। আমাদের ভুরুতে একটা আতিশয্যের চিহ্ন থেকে গেছে। দেখতে পাচ্ছিনে যে আমাদের মুখের কোণটা বেঁকে। আর তাই ইতিউতি ঘুরে বেড়াই, যেন একটা বিদ্রূপ আর শুধুই অর্ধেক : সত্তা লাভ করিনি আমরা এবং অভিনেতাও নই।

রিল্‌কে

রবীন্দ্রনাথ একবার ভেবেছিলেন পশ্চিমের দুয়ার খুলেছে আমাদের জীবনে, পুব-পশ্চিমের দ্বন্দ্ব বুঝি নিঃসংশয়ে ঘুচেছে। ঘোচা উচিত, কারণ সভ্যতায় আদান-প্রদানে বিরোধের বীজ নষ্ট হয়; আর সম্পূর্ণই যদি নষ্ট না হয় তো বিরোধের নদীতে পারাপারের সেতু জোটে। আরও একবার রবীন্দ্রনাথেরই মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি প্রতীচ্য শুধু বিরোধের বীজই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সভ্যতার সংকটে আমাদের মনে, প্রাচ্যের স্মৃতিতে থাকবে শুধুই জ্বালা, যন্ত্রণা ও তিক্ততার স্বাদ। অথচ, আমরা যারা ইউরোপের চাপে বা আলোয় নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছি, কার্যত না-হোক, বক্তব্যে, চিন্তায় নতুন জীবন গড়ার আশ্বাসে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকি। নবজাগরণের জোয়ার যদি ভাঁটায় নেমে থাকে তো পশ্চিমের জীবনযাত্রা, কল্পনা ও চর্চা আমাদের এখন মাথায়। মনে করি পশ্চিমের শৌর্য, বীর্য, চিন্তা আমাদের পাড়ানির কড়ি। কার্যতই নয় বা কেন; আমাদের উনিশ শতকের একাংশ নিমচাঁদের ইতিবৃত্ত আর বর্তমান শতকের অধিকাংশই তো ঘরে ফেরার রাস্তা খোঁজে পশ্চিমের খুঁট ধরে। সমাজবিন্যাসের ছক, রাষ্ট্রগঠনের রীতি, শিল্পসাহিত্যের কেন্দ্রিক আত্মসচেতনতা, এককথায় চৈতন্যের রূপটিই আমরা পড়ে পেতে চাই ইউরোপের নজিরে। আত্মাবিষ্কারের প্রশ্নে সহজেই মনে পড়ে বুঝি আমাদের স্বকীয় কোনও পথ নেই, যা কিছু আছে তা নিতান্তই ভাবালুতা, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর, ফাঁপা আধ্যাত্মিকতার অযৌক্তিক কার্যক্রম। ভালো বা মন্দ যাই হোক, এমনকি সত্যমিথ্যার প্রসঙ্গ না তুলেও জানি, আমাদের কোনও কবি ভারতে বা বাঙলা দেশেই ফেরেন পশ্চিমের সূত্রে, রাজনীতিজ্ঞ তাত্ত্বিকের মনে হয় ভারতীয় সাধনার ধারা য়ুরোপীয় সাধনার খাতেই। হাল আমলের রাজনীতি ঘোরে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের চাকায়; এমনকি তার খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ না-দিয়েই, কী ডাইনে কী বাঁয়ে, ইউরোপের বুলি সর্বত্রই উচ্চারিত হয় মন্ত্রের মতো, যদিও পথ ও ঐতিহ্যের কথা নামাবলির মতো জড়ানো থাকে। আমাদেরও ভাববার কথা ছিল, আমাদেরও যে দেখবার মতো নিজস্ব ভঙ্গি ছিল বা সেই ভাবনা ও দেখার নজির ছড়িয়ে আছে বিরাট দেশের হাজার বছরব্যাপী সংস্কৃতির নানা স্তরে, ঐশ্বর্যের বিচিত্র সম্ভারে, সে কথা সচরাচর মনে পড়ে না। কোনও একজন মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথে কথাটা উঠলে আমরা কখনও হকচকিয়ে যাই, কখনও বা চুপিসারে তাদের স্মৃতি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলি যেমন মুছে গেছেন মধুসূদন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ কাঁধে চেপে বসলে হুজুগে স্রোতের ফুলের মতো তাকে ভাসিয়ে দিই ঘোলাজলের বানে। যেমন রবীন্দ্রশতবর্ষের মাতামাতিতে বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষার কথা পেছনে পড়ে থাকে আর দেশীয় সংস্কৃতি

ও ঐতিহ্যের হিসেবনিকেশ, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের শত বক্তব্য সত্ত্বেও, জাতীয় মানসে দাগ কাটে না। আমরা যেমন ছিলুম এতকাল তেমনিই থাকি, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা পুথিপত্রেই চাপা পড়ে, জীবনে চর্চার বিষয় হিসেবে গণ্য হয় না, ইউরোপীয় ইতিহাসের গাড়ি আমাদের দাপটের সঙ্গে টেনে নিয়ে যায় তার বাঁধা পথে।

অথচ ইউরোপে নিজের আত্মা বিষয়ে ভাবনাচিন্তার শেষ নেই। সেই আত্মা নিছক ঈশ্বরের প্রতিরূপ কী শয়তানের কাছে বিক্রীত এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। আমরা অবশ্য কখনও কখনও এলিয়ট কী অন্য কাউকে আউড়ে বলতে ভুলি না যে ইউরোপের মন বর্তমানে অবক্ষয়ের শেষ তলানিতে, সমস্ত জীবনটাই একটা পোড়া পতিত জমি। আমরাও বুঝি ওদেরই মতো শূন্য ফাঁপা মানুষ। ওদের অপরাধ, ওদের গ্লানি আমাদেরও অপরাধ, আমাদেরও গ্লানি। আবার কখনও স্পেঙলার বা টয়েনবির উদ্ধৃতিতে বলতে চাই যে ইউরোপের শেষ আসন্ন, পতনের অনিবার্যতা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা রুখতে পারবে না। অথবা, মার্কসের সুসমাচারে, বর্তমান য়ুরোপের চিতাভস্মের ওপর উঠবে শৃঙ্খলমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়সৌধ। প্রাচীন অথর্ব বুর্জোআ সমাজের পাদপীঠ ইউরোপ ভেঙে বদলে নতুন রূপ পাবে আসল ইতিহাসের শুরুতে। প্রাক-পৌরাণিক জীবন অর্থাৎ ইউরোপের প্রাক-ঐতিহাসিক পর্যায় ঘুচবে আগামী সাম্যবাদী সমাজের স্বাধীন সুখি অস্তিত্বে। চক্রাকার ঘুরে এসে ইউরোপের নবীন উদ্‌বর্তন হবে কী হবে না, দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের পরিণতি সাম্যবাদের অনিবার্যতায় কিনা এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মতের সংঘর্ষে আমরা নিশ্চয়ই ব্যতিব্যস্ত, এমনকি শেষ বিচারের ভার আমাদের ওপরেও ন্যস্ত নয় তবু ইউরোপের মনে যে একটা বিরাট সংক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে তা বুঝি, তার আঁচ আমাদের গায়ে লাগে। আমাদের কোনও কোনও পূর্বপুরুষ ভেবেছিলেন প্রতীচ্য থেকে আমাদের নেবার প্রধান বস্তু হল যন্ত্র বা যন্ত্রশিল্প আর তার বদলে আমরা দেব আমাদের আধ্যাত্মিকতা। প্রতীচ্য আমাদের প্রাচীন জগতে এসে গেছে ওদের এলাকায় পৌঁছবার অনেক আগে। আমরা যখন তার ধাক্কায় দিশেহারা বা অনেকটাই গ্রহণ করে সেই ছাঁচে নিজেদের গড়তে ব্যস্ত তখন বহু হাত ঘুরে ভারতবর্ষ গিয়ে পৌঁছোল ওই দেশে। চিনের দাপট তার আগে থেকেই। আমাদের শাস্ত্র পাঠ করে, সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা পেয়েই ওঁরা ভারত আবিষ্কারে ব্যস্ত হলেন আর আমরা নতুন করে পাঠ নিলুম ওঁদেরই কাছে ভারতবর্ষের আত্মার। ওঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় ভাবলেন যে ইউরোপের মুক্তি ভারতবর্ষের পথে, কিন্তু ভারতবর্ষের পরিচয় কখনওই সত্য হল না ওঁদের মনে যেহেতু ভারতীয়দের জীবনেই ভারতবর্ষের রূপ মৃত। আর যে নতুন ভারতবর্ষ, বুদ্ধ ইত্যাদির বাণী আউড়ে সামনে এগোল সেই ভারতবর্ষ ইউরোপেরই একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র। ফলে ইউরোপের আধ্যাত্মিক সংকটের চেহারা আমাদের সচেতনতায় তেমন স্পষ্ট হয়ে ফোটে না বা এমন কি সত্যিসত্যিই য়ুরোপের যে মৌল সমস্যা থাকতে পারে এমন বোধ আমাদের অনেকের কাছে অস্পষ্ট। যদিও আমরা সংকট, অবক্ষয় ইত্যাদি শব্দ সদাই আউড়ে চলেছি। কারণ, সংকটের বোধ বা সমস্যার রূপ বিষয়ে সচেতন হলে আমরা নকলনবীশ না হয়ে নিজেদের চরিত্র বিষয়েই চিন্তিত হতাম বেশি। যতটুকু আঁচ গায়ে লাগছে তার জ্বালা মনের গভীরে বিশেষ পৌঁছায় না; মন কোনও আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নেই জাড্য থেকে মুক্তি পায়, কারণ মন অভিজ্ঞতাবাদীদের পরিচ্ছন্ন একটি শ্লেট মাত্র নয়। এমনকি কোন একটি সুদৃশ্য আরশিও নয়।

আমাদের পূর্বপুরুষরা মোটামুটিভাবে সঠিক বুঝেছিলেন যে ইউরোপ দেবে যন্ত্র আর যন্ত্রশিল্প। কারণ যন্ত্রের গৌরবেই ইউরোপের অগ্রগতির গৌরব। যে কোনও ইতিহাসের পুথিতেই আমরা পড়েছি যে ইউরোপের বিস্তীর্ণ মধ্যযুগ জমি ও প্রাক্তন সংস্কারের বেড়াজালে মানুষ ও মানুষের মনকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। টলেমীয় জগচ্চিত্রে মানুষ ছিল নতান্ত সুখি, ঘরকুনো। নিজেকে ছড়িয়ে, গতির অখণ্ড প্রয়াসে, বিশ্বকে জানবার সুযোগ ছিল না তার জীবনে। স্তরবিভক্ত সমাজে উঁচুনিচুর অনুশাসন চেপে বসেছিল জগদ্দল পাথরের মতো। সমাজের ক্রম ও শান্তি স্থির ছিল পরস্পরের স্বীকৃত কর্তব্যে ; যে-

যার যথাবিহিত চরিত্রানুগ কাজ করে যাবে এবং নির্দিষ্ট কর্মের সূত্রেই সামগ্রিক শান্তি আসবে জীবনে, ঐশ্বর্য বিকশিত হবে সৃষ্টিকর্তার নিয়মে, যে নিয়ম স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও ভাঙেন না। ঈশ্বরের দিব্যজগৎ ও দৈনন্দিন মানুষের জগতে, আত্মা ও দেহের মধ্যে মৌলিক তফাত নিশ্চয়ই ছিল। তবু দৈনন্দিন জগতের কার্যকারণ জেনে, নির্দিষ্ট সত্তার চাপে পরিচালিত হয়েই দিব্যজগতে উত্তরণের কথা, যেমন এই দেহকে এড়িয়ে নয় দেহের নিয়মকানুন জেনে আত্মার অনুসন্ধান। দৈনন্দিন জগৎ নিশ্চয়ই অসত্য, যেমন অসত্য এই দেহ। আত্মার লক্ষ্যে, দিব্যজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেহকে পরিচালনার কথা ছিল। আর জাগতিক বিশ্বে ঈশ্বরের প্রতিভূ ছিলেন রাজা। এই জগতে যন্ত্র ছিল, কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল সীমাবদ্ধ। যন্ত্রকে ঘিরে শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। অ্যারিস্টটলের হিসেবে গতি শুধুই চক্রাকারে পরিণতি পেত, সোজা সরল রেখায় চলত না। দিব্যজগৎ ও মানুষী জগতের সেতু রচনা করবার কথা ছিল ঈশ্বরপুত্রের আত্মদানে, তাঁর পুনর্জন্মের ইতিবৃত্ত। এই মধ্যযুগের কল্পনাতেও তাই ইউরোপের বিনাশের কথা লুকিয়ে, আত্মাবিষ্কারের বক্তব্য স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব সমাধানে মধ্যযুগের এই চিন্তায় ও লক্ষ্যে প্রথম কিছুটা অন্য কথা শোনালেন সন্ত টমাস। তিনি নিশ্চয়ই গির্জার আধিপত্য অস্বীকার করেননি কিন্তু এরিস্টটলের শরণ নিয়েছিলেন এই বলে যে তিনিই জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরাণের নজিরে সন্ত টমাস শুধুই মানতে চাননি, জানতেও চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বোধিতে কোনও বিরোধ তিনি দেখেননি বরং বুঝিয়েছিলেন তারা পরস্পর সম্পূরক। এরা একই সত্য, ঈশ্বরের সত্যকেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। যদি কখনও বিরোধ ঘটে — সন্ত টমাস জানতেন বিরোধ নিশ্চয়ই ঘটে—তবে যুক্তির পাল্লা বোধির চাইতে হালকা; অবশ্যই মানুষের চিন্তাতে বিরোধের কার্য-কারণ। প্রকৃতির জগৎ ও ঈশ্বরের করুণার ক্ষেত্রে কোনও বিরোধ নেই, যে যার ক্ষেত্রে পূর্ণ ও নিজের নিয়মে অধিষ্ঠিত। সুতরাং সন্ত টমাসের ব্যাখ্যায় পদার্থবিদ্যা বিশ্বাসের হাত থেকে ছাড়া পায়। টমাস-গুরুশ্রেষ্ঠ এলবার্ট ঘোষণা করেন যে প্রাকৃতিক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যাই মিলবে না ন্যায়ে বা ধর্মের অনুশাসনে, প্রকৃতি নিজেকে খোলে বিশেষ অভিজ্ঞতায়। টমাস দেখিয়েছেন অধিবিদ্যার আলোচ্য নিশ্চয়ই প্রাথমিক বা আদি কারণ কিন্তু আদি কারণই একমাত্র কারণ নয়। বিশ্বের সমস্তই, যা কিছু সীমাবদ্ধ, আংশিক ও ইন্দ্রিয়জ, ঈশ্বরের সৃষ্টি ; এ কারণেই তারা ঈশ্বরের পূর্ণতায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের স্বকীয় ক্রম ও সৌন্দর্য আছে। তারা অবশ্যই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য লাভ করে না যেহেতু তাদের সৌন্দর্য অংশগ্রহণের ফলে তবু নিজেদের সীমায় তাদের তাৎপর্য পূর্ণতার। দিব্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়ের জগতে যে পুরানো বিরোধ ছিল মধ্যযুগের গোড়ায় সন্ত টমাস সেই বিরোধ ঘোচালেন এবং জানালেন যে মানুষ কেবলমাত্র দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিরোধী পদার্থের মিশ্রণ নয়, মানুষ পরিপূর্ণ একটি ঐক্য। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। নিজের চেষ্টায় ন্যায় ও সত্যের জগৎ গড়ে নেবার কথা এল। আর এই সূত্রেই পরবর্তী কাল এল জ্ঞানের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। ব্রুনো, কেপলার, গ্যালিলিও হয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিউটনে এসে একটা চূড়ান্ত রূপ পেল। ঈশ্বরের দিব্যজগৎ ও প্রাকৃতিক জগতের দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে থাকে পিছে। সমাজের স্তরবিন্যাস ধাক্কা খেল যন্ত্রশিল্পের সম্ভাবনায়। উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থায় জমি থেকে ছাড়া পেয়ে মানুষ নিজেকে ছড়াতে চাইল মুক্তির সম্ভাবনায় বিরাট বিশ্বে। সমস্ত বিশ্বজগতে মানুষের কর্তৃত্বের প্রতিরূপ হল যন্ত্র। অমিত শক্তির অধিকারী মানুষ পৃথিবীকেই একটি যন্ত্র বলে ধরে নেয়। লাপলাসের গর্বিত উক্তিতে উচ্চারিত হয় মানুষের সৃষ্টিজয়ের সংকল্প। ঈশ্বরের স্থানে প্রকৃতিই প্রধান হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের দিব্যজগতেও মানুষের হাত পৌঁছতে চায়। নবজাগরণের চূড়ায় উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সংশয়ের চিহ্ন নেই কোনও, সর্বত্রই মানুষের বিজয় ঘোষণা।

অথচ এই যন্ত্র, যন্ত্রশিল্প ও মানুষের অনায়াস-অর্জিত ক্ষমতাই বর্তমান ইউরোপের সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্লেটোর জগতে যন্ত্রের ছায়া বিরাট হয়ে পড়েনি কিন্তু ক্ষমতার দাপটে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। একটি নৈতিক পরিবেশের কল্পনায় তিনি মথিত হয়েছিলেন ; তাঁর সমসাময়িক জগতে

রাষ্ট্র ও শক্তির চাপ তৈরি করেছিল তাত্ত্বিক সোফিবাদীরা। আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনায়, তাঁরা বলতেন, একমাত্র ক্ষমতাই সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে। 'ক্ষমতাই ন্যায়' এই তত্ত্ব আমদের মতো এথেনীয়দের মাতাতে দেরি করেনি। ন্যায়ের ভাবনায় চিন্তিত প্লেটোর সমস্ত চেষ্টায় ছিল এই তত্ত্বকে অস্বীকার করা, এই তত্ত্বের সম্ভাবনাকেই নির্মূল করা। প্রথম লড়াই তিনি শুরু করেন 'জর্জিয়স' গ্রন্থে সোক্রাতেস ক্যালিকলসের আলাচনায়, দ্বিতীয় পর্ব পাই বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে থ্র্যাসিমেকস ও সোক্রাটেসের বাক্যযুদ্ধে। সোক্রাতেসের মুখে প্লেটো প্রশ্ন তোলেন সমস্ত কামনা ও আবেগের লক্ষ্য কী? শুধুমাত্র চাইবার জন্যেই কেউ চায় না প্লেটো জানতেন, প্রতিটি বাসনার লক্ষ্য থাকে এবং সমস্ত প্রয়াসই সেই লক্ষ্যের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু ক্ষমতার বাসনায় কোনও ছেদ নেই। এই বাসনার চরিত্রই হল সীমাহীন দাবি; কোনও এক রাজা ক্যানিউট এসে বলবে না, আর নয়— এটুকুই শুধু। প্লেটোর ভাষায় এই বাসনার তৃপ্তি ফুটো পাত্রে জল ঢালবার মতো। জীবনে ক্ষমতার এই লোভকে প্লেটো পাপ মনে করতেন, নাম দিয়েছিলেন, 'প্লিও-নেক্সিয়া' অর্থাৎ আরও আরও-র জন্য অতৃপ্তবাসনা। প্লেটোর কল্পনায় তাই একদিকে, 'ন্যায়' ও অন্যদিকে 'ক্ষমতার লোভ'; এই দুই বিরোধী বাসনার টানাপোড়েনে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। নীতির প্রমাণ 'ন্যায়'-এর কষ্টিপাথরে আর মানুষ তখনই পূর্ণ যখন সে তার জীবনে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্লেটোর চিন্তার আলোতেই আধুনিক ইউরোপের সংকট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যে যন্ত্র মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়েছিল সেই যন্ত্রই আজ মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে। যন্ত্র হয়ে উঠেছে যন্ত্রী। বিজ্ঞানের হাতে মারণাস্ত্র জমে উঠেছে বিভীষিকার সংকেতে আর স্রষ্টা বৈজ্ঞানিকরা অবোধ বিস্ময়ে ভাগ্যের কার্য-কারণ তত্ত্বে দিশেহারা। মানুষের কল্যাণের বদলে মানুষের জ্ঞান মারণাস্ত্রের রাজনীতির ঘুঁটি। আত্মহননের প্রতিটি ধাপ তৈরি করছে মানুষ নিজে। অগ্রগতি ও আবিষ্কারের নিজস্ব যুক্তিতে যন্ত্র ও যন্ত্রের দাপট ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ছায়া বর্তমানে সারা বিশ্বে। মানুষ যন্ত্রের নজিরে নিজেরাই যন্ত্র হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগের মানবিক সম্পর্কের শৃঙ্খল ভেঙে দুটি মানুষের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক বন্ধন এনেছে যন্ত্র এবং যন্ত্রের বন্ধনে যেহেতু মানুষের প্রয়োজন নেই মানুষেরাই প্রাণহীন পুতুল হয়ে উঠছে। যন্ত্র যেমন মানুষের হয়ে কাজ করে দেয়, মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তেমনি, ইউরোপের মনীষীরা সোচ্চারে ঘোষণা করছেন, সমস্ত দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষরা অন্যনির্ভরশীল ছায়ামূর্তি হয়ে উঠেছে। যুক্তিবান, স্বাধীন বিবেকি মানুষ নয়; জনসাধারণ, নামহীন গোত্রহীন একটা পিণ্ড। একটা কবন্ধ যেন, যে কেবল অন্যের দ্বারা চালিত হয়, যার সম্মিলিত বাহুতে অমিত বীর্য কিন্তু যার কোনও মস্তিষ্ক নেই, চোখ নেই, হৃদয় নেই। যন্ত্রের চাপে, যন্ত্রের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের প্রভাবে ব্যক্তি যে নিষ্পেষিত হয়ে একটি সাধারণীকৃত সূত্র হয়ে উঠবে সমাজতত্ত্ব বা রাষ্ট্রতত্ত্বের সতরঞ্চে সে কথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের নজর এড়ায়নি। তিনি লিখেছিলে *লিবার্টি* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে :

> The combination of all these causes forms so great a mass of influences hostile to Individuality, that it is not easy to see how it can stand its ground. It will do so with increasing difficulty, unless the intelligent part of the public can be made to feel its value—to see that it is good that there should be difference, even though not for the better, even though, as it may appear to them, some should be for the worse. If the claims of individuality are even to be asserted, the time is now, while much is still wanting to complete the enforced assimilation. It is only in the earlier stages that any stand can be successfully made against the encroachment. The demand that all other people shall resemble ourselves grows by what it feeds on. If resistance waits till life is reduced werely to one uniform type, all deviations from that time will come to be considered impious, immoral, even monstrous and contrary to nature.

যন্ত্র সব এক ছাঁচে ঢালে, কারণ যন্ত্র হল নৈর্ব্যক্তিক একটি মাধ্যম যা নিজের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ছাঁচ গড়ে, নিজেকে প্রতিটি মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতায় আত্মাকে ব্যস্ত করে না। কারণ, যন্ত্রের আত্মা নেই এবং উৎপাদনের প্রয়োজনই তার প্রয়োজন। উৎপাদনে সংখ্যার হিসেব। ফলে সভ্যতায় গড়পড়তা মানুষের, সংখ্যার লক্ষ্যটাই প্রধান। তখন যন্ত্রের হিসেব মতোই সাধারণ নিয়ম বা সূত্রের চালে জীবন চালাতে সুবিধে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে যন্ত্রের গতি ব্যাহত হয়। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে দূরবর্তী যন্ত্র চালাবার কৌশলে ব্যক্তিদেরও চালানো হচ্ছে জনসাধারণ নামক বস্তুপিণ্ডের আকারে। সামনে শুধু আশার ছলনা, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নবিলাস।

যন্ত্র ও যন্ত্রকৌশলকে ঘিরে ইউরোপের সংকটের দ্বৈতরূপ। যন্ত্রের অনন্ত সম্ভাবনার পরিণতি একদিকে মারণযজ্ঞের লেলিহান আগুন ও অন্যদিকে ব্যক্তির ওপর নির্বিশেষ জনসাধারণের অন্ধ দাপট। কুরি, রাদারফোর্ড, আইনস্টাইন, বোর, হাইসেনবার্গ এই অসামান্য পদার্থতত্ত্ববিদদের জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত 'সিদ্ধি' পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় বৈজ্ঞানিকদের আত্মবিক্রয়ে। অথচ একথাও জানা যে মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক অবলম্বনই হল যন্ত্র, তার হাতিয়ার। উন্নত যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সভ্যতার প্রতিটি ধাপ। সভ্যতার আদিতে প্রথম হাতিয়ার ও'আগুন মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, নিয়ে এসেছে জটিল যন্ত্রবিন্যাসের রাজপথে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সামনে কঠিন প্রশ্নটি মাথা তোলে, এই যন্ত্রকৌশল দিয়ে সে কী করবে! কারণ মানুষের ভাগ্যে একই সঙ্গে জড়িত তার বিচিত্র সম্ভাবনা আর তার অন্ধ নিয়তি, হুব্রিস ; কারণ মানুষের হৃদয় ন্যায়ের সঙ্গেই শঠতায় পূর্ণ, সত্যেরা সঙ্গে অসত্যে। চিনের তাও কল্পনায় আদিতে যে অখণ্ড শান্তির ছবি ছিল তা ভাঙে মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজে, আবিষ্কারে, কৃষিতে। যন্ত্রকৌশল এই অন্যায়ের একটি হাতিয়ার। যন্ত্রকৌশলের তাড়নাতেই মানুষ সহজে তার স্বাভাবিকতা হারায়, অন্যায়ের পথে, লোভের পথে পা বাড়ায়। কনফুসিয়সের এক শিষ্যের সঙ্গে একটি মালির কথোপকথনে জানতে পারি এই উভবলী টানের কথা। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে জল টেনে এনে সেই মালিটি অনেক কষ্টে বাগানে জল দিচ্ছে একদিন। কনফুসিয়সপন্থী দেখতে পেয়ে তাকে নতুন এক আবিষ্কারের কাহিনি শোনায়। দ্বিধাহীন জবাব আসে মালির, 'যেখানেই অসৎ আবিষ্কার সেখানেই তার অসৎ ব্যবহার, আর যেখানে অসৎ ব্যবহার সেখানেই অসৎ হৃদয়। অসৎ হলে হৃদয়ের শুদ্ধতাই নষ্ট। আমি আবিষ্কারটি জানি কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে আমি লজ্জিত।' বোঝাই যাচ্ছে যন্ত্রকৌশলতত্ত্ব দিয়ে যন্ত্রকৌশলের সংকট ঘোচে না। সমস্যা মানুষের, মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের।

কিন্তু মানুষের হৃদয়পরিবর্তনের সমস্যাই জটিল হয়ে উঠেছে ইউরোপে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের চাপে। ব্যক্তি যে নির্বিশেষ জনসাধারণে পরিণত হচ্ছে তার প্রধান কারণও রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ। প্লেটো যদিও জেনেছিলেন যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি অনিবার্য এবং সেই সংঘর্ষের জগতে ন্যায়নীতির প্রশ্ন নেই এবং সেই জ্ঞানের সূত্রে আদর্শ রাষ্ট্রের শুধু পরিকল্পনাই করেননি কার্যত তা রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছিলেন, তবু প্লেটোর নজির ইউরোপের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করে না। সন্ত টমাসের প্রভাবে মধ্যযুগের ব্যক্তির নিজস্ব কর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল, নবজাগরণ আনল নতুন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রতত্ত্ব ও পরিকল্পনা যদিও ব্যক্তির স্বাধিকারের ওপর দাঁড়িয়ে তবু ব্যক্তির স্বার্থের এমনই তাড়না যে প্রগতির মধ্যপাদেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বার্থপরতার বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজা যদিও ক্রমশই ক্ষমতাহীন হতে থাকে, রাষ্ট্রকর্ণধারদের দাপট বাড়তে দেরি হয় না। ব্যক্তির প্রত্যক্ষ শাসনের বদলে নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রের ক্ষমতা আকাশ পরিমাণ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ আর রাষ্ট্রের কর্ণধার জনসাধারণ বা জনসাধারণের প্রতিনিধিই হোক না কেন রাষ্ট্রশক্তির কাছে প্রত্যেকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। দার্শনিক হবস রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতার কথা শোনালেন এবং ইতিপূর্বেই মাকিয়াভেলি তাঁর *প্রিন্স* গ্রন্থে আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন। ঈশ্বরকে মাকিয়াভেলি অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাগ করেন তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে এবং এ কথা জানাতে ভোলেন না যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনই ভালো যোদ্ধা

হবে না যদিও তারা ভালো সামাজিক মানুষ হতে পারে। আসলে তিনি জানাতে চাচ্ছেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে বা রাজপুরুষের সঙ্গে গির্জার কোনও যোগ নেই। শক্তিই মূল লক্ষ্য। এ কারণেই তিনি লেখেন :

> A prince ought to know how to resemble a beast as well as a man, upon occasion : and this is obscurely hinted to us by ancient writers who relate that Achilles and several other princes in former time were sent to be educated by Chiron the Centaur; that as their preceptor was half-man and half-beast, they might be taught to imitate both natures since one cannot long support itself without the other. Now, because it is so necessary for a prince to learn how to act the part of a beast sometimes, he should make the lion and the fox his patterns : for the lion has not cunning enough of himself to keep out the snares and toils ; nor the fox sufficient strength to cope with a wolf : So that he must be a fox to enable him to find out the snares, and a lion in order to terrify the wolves.

প্রজাতান্ত্রিক রুশো অবশ্য জনসাধারণের 'সাধারণ ইচ্ছা'র কথা বলেন কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার হিসেব গুলিয়ে ফেলায় তিনি জবর-দস্তিতে সংখ্যালঘুকে মানিয়ে নেবার কথা তোলেন, যে রন্ধ্রপথে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রস্তাব আনেন হেগেল। রুশোর সাধারণ সরল 'সাধারণ ইচ্ছা'কে হেগেল 'পরমভাব' ও 'চৈতন্যে'-র সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দেন যে পরমভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ রাষ্ট্রের মধ্যেই ঘটতে থাকে। যদিও তিনি নেপোলিয়নে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তবু প্রুশীয় রাষ্ট্রের হাতেই জীবন ও জগতের শেষ এবং সর্ববিধ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে দার্শনিক প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন যেহেতু —

> The State is the spirit that dwells in the world and realizes itself in the world through consciousness ... It is the course of God through the world that constitutie the State ...

ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির ধারায় যে হেগেলীয় বক্তব্য রাষ্ট্রের হাতে অমোঘ ও সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব তুলে দেয় তারই সম্প্রসারিত কাঠামো দেখতে পাই ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের রাষ্ট্রতত্ত্বে। একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্রের মতোই রাষ্ট্র অব্যয়-অক্ষয়, কিন্তু মার্কসীয় সাম্যবাদে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘোষিত। তবু কার্যত হেগেল-পন্থী এই দুই বক্তব্যে রাষ্ট্রের বাহু জীবনের সর্বস্তরেই প্রসারিত। প্রাক্-সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র শ্রেণীশত্রুনিরোধের যন্ত্র অর্থাৎ নিষ্পেষণের যন্ত্র এবং সাম্যবাদী দলের কর্তৃত্বে এই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত দলীয় স্বার্থের বাহন। শ্রেণীর বিচারে যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্ন গৌণ, মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে ব্যক্তির প্রসঙ্গ নিতান্তই অবান্তর। দল-ব্যাখ্যাত সত্য বা দলপ্রধান ব্যাখ্যাত সত্যই সত্য, রাষ্ট্র এই সত্যের বাহন মাত্র। ব্যক্তি এই রাষ্ট্রে একটি সংখ্যা বা সমাজতত্ত্বের গড়পড়তা হিসেব, তার ভাগ্য সাম্যবাদী দলের উত্থানপতনের নিয়তির সঙ্গে জড়িত সাম্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী বক্তব্যের পাশে নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক বক্তব্য আছে, যেমন কান্টে, জন স্টুঅর্ট মিলে, টমাস হিল গ্রিনে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ হিসেবে অভিজ্ঞতায় এতই গোঁজামিল যে সাম্যবাদের ধাক্কা তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। মার্কস সঠিক ভাবেই দেখিয়েছিলেন যে যন্ত্রের নিয়ামক মানুষেরা বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত, তাই যন্ত্রও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও হিংসার বাহন। মার্কস আরও দেখিয়েছিলেন যে একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মালিকানা-জাত লাভ আর অন্যদিকে সামাজিক সংগঠিত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অভাব। তাই মার্কসের চিন্তায় শোষণ নির্মূল করার ছবি ফুটেছিল সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে। ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নে মার্কস বলতে চেয়েছেন যে গণতন্ত্রের সার্থকতা কখনওই অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যে, একচেটিয়া মালিকানার নিয়মে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ।

রাষ্ট্রে সঞ্চিত শক্তি ও ব্যক্তির অধিকারের সীমা ও গুরুত্ব এখনও সবিশেষ নির্ধারিত হয়নি। এবং স্বভাবতই তাই অর্থনীতির যুক্তিতে বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তি সংগঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের চৌহদ্দিতেই নিজেকে একা, নিঃসহায় বোধ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাস গণতন্ত্রের পীঠস্থান যুক্তরাজ্য পর্যন্ত সর্বত্রই এক ইতিহাস। এ কারণেই দেশজুড়ে একটা অলক্ষ্য চাপ থাকে চিন্তায়, রুচিতে, ব্যবহারে নির্দিষ্ট ছাপ ফেলে দেবার দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন, আমরা কেন মার্কিন মনীষীরাও, ইয়াঙ্কি-অন্ধতা ও বোধহীন রুচিবিকারের কথা বলেছেন। শুধু হালের রিজম্যানরাই নয়, সাবেকি ফরাসি দ্যটকেভিলও এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের দুশ্চিন্তা তাই প্রায় নিছক সত্য হয়ে উঠেছে। আর ফ্যাসিবাদী দেশে বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রে মিল কথিত 'enforced assimilation' তো সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা। মার্কস্‌বাদীদের এ বিষয়ে লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই যেহেতু তাঁরা শ্রেণীকে মানেন, ব্যক্তিকে নয়। শ্রেণীবিলোপের আগে ব্যক্তির কথা মার্কসীয় শাস্ত্রে যেহেতু থাকতে পারে না, বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট ছাঁচ গড়ার আপত্তি কোথায়? গণতন্ত্রে কবন্ধ 'জনসাধারণ' আর সাম্যবাদী রাষ্ট্রের কবন্ধ 'শ্রেণী'। গণতন্ত্র অবশ্য মৌল স্বাধীনতার কথা বলে, সাম্যবাদের সে দায় একমাত্র সভ্যতার বর্তমান পর্ব শেষ হলে। তাই উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যেও রুশ শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ছাঁচের ছায়া রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েছিল।

কী সাম্যবাদ কী গণতন্ত্রে স্বতঃই যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে চায় তার কারণ ইউরোপের ইতিহাসের মৌল ঝোঁকে নিহিত। ভারতবর্ষের প্রতিপক্ষে, ইউরোপে সভ্যতার শুরু থেকেই দৃঢ়, কঠিন সংগঠন গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার গুরু প্রাচীন গ্রিক মানসেও এই সংগঠনের চিন্তার ছাপ আছে। মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি বিষয়ে যদিও গ্রিকেরা চিন্তিত ছিল, যদিও ইউরোপে সর্বপ্রথম ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বের কথা গ্রিসেই উচ্চারিত হয় তবু সমাজবিন্যাস শোষণের ব্যবস্থা গ্রিকসংগঠনের প্রমাণ দেয়। সংগঠন নিশ্চয়ই প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি, কিন্তু গ্রিসে এই সংগঠনের রূপ মানুষের সত্তার 'স্বাভাবিকতার' নজিরে এমন ভাবে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয় যে ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বয়ং অ্যারিস্টটল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমন জোরালো প্রতিবাদ করেন না, আর মহৎ দার্শনিক প্লেটো মানুষের মনকে ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করে ধাতুর নজিরে শ্রেণীবদ্ধ করেন গুণাগুণ ছকে। গ্রিসে অবশ্য পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় না, হয় পরবর্তী রোমে। সাম্রাজ্যবাদী রোম সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রিসকে টেক্কা দিয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো শোষণের ওপর তৈরি হয় যার ছাপ এমন কি খ্রিস্টীয় গির্জা-সংগঠনের ওপর দেগে থাকে। স্তরবিভক্ত সমাজের ছবি মধ্যযুগ পায় রোমক রাষ্ট্রবিন্যাসে ও খ্রিস্টীয় সংগঠনে। ব্যক্তি এখানে গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে বিভক্ত। খ্রিস্টীয় গির্জা-সংগঠনে ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট বীজমন্ত্র ও গির্জা অবলম্বন করেই জীবন গড়ে। এর বাইরে তার স্বাধীনতার সীমা বিস্তৃত নয়। ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনা ও পরিণতি স্পষ্টতই রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুশাসনে চালিত। ইউরোপের ইতিহাসে তাই সমাজের চাইতে রাষ্ট্রের দাপট বেশি, ধর্মের চাইতে গির্জার। ফলে স্বভাবতই ইউরোপে সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের মনোভাব ও সংগঠন গজিয়ে ওঠে, একনায়কতন্ত্র দাপটে রাষ্ট্রপরিচালনা করে। যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রপ্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে ইউরোপের সমস্যা হৃদয় পরিবর্তনের সমস্যা। আপাত সরল এই ভারতীয় বা কনফুসীয় মৌল সমাধানের ক্ষেত্রটি যে কত জটিল তার প্রমাণ মিলবে জীবনে নীতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে। মার্ক্‌সবাদীরা বলে হৃদয় পরিবর্তন নির্ভর করে সংগঠন পরিবর্তনের ওপর। সমাজবিন্যাস বদলাতে পারলেই প্রায় যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষেরা বদলে যাবে। ইউরোপে মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদীদের নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় ধরা পড়ে তারা কে কেমনভাবে নিয়তই ভাবের ঘরে চুরি করছে। নীতিশাস্ত্রের নজির এ কারণে যে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনযাত্রার মূল্যবোধে চরিত্রের ও সংস্কৃতির পরিচয়। কোনও সংস্কৃতিই তার নীতির পরীক্ষা না দিয়ে স্বীকৃত হতে পারে না। ইউরোপে যন্ত্র ও মনুষ্যত্বের যে সমস্যার পরিচয় আমি তুলেছি তার স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে

বর্তমানে চালু নীতিবিরোধী দার্শনিকতার কয়েকটি মতামত বিচার করলে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে রাসেল লেখেন, 'আগুয়ান দেশে প্রয়োগ তত্ত্বকে অনুপ্রেরিত করে, অন্যত্র তত্ত্ব প্রয়োগকে।' প্রাচ্যের তুলনায় প্রতীচ্য নিঃসন্দেহেই উন্নত, কাজেই তার তত্ত্বের চরিত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন জীবনে ন্যায়নীতির প্রশ্নে রাসেল নিজেই লেখেন :

> **If we all agreed, we might hold that we know values by intuition. We cannot prove, to a colour-blind man, that grass is green and not red. But there are various ways of proving to him that he lacks a power of discrimination which most men possess, whereas in the case of values are no such ways, and disagreements are much more frequent than in the case of colours...Hence, the conclusion is forced on us that the difference is one of tastes, not one as to any objective truth.**

এই বক্তব্যে আমরা জানছি যে মূল্যবোধের কোনও বিচার্য মান নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসংখ্য বিভেদের মতো রুচিতেও অসংখ্য পার্থক্য। মূল্যের বোধ সম্পূর্ণ রুচি-নির্ভর। বিভিন্ন রুচি বিষয়ে কারও কোনও তাত্ত্বিক বক্তব্য থাকতে পারে না। সুতরাং মূল্য বিষয়েও কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। রাসেলের এই উক্তি প্রত্যক্ষবাদীদের নীতিশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্বের একটি অংশ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রত্যক্ষবাদীদের প্রচণ্ড দাপট। তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন নীতিশাস্ত্র বলে সত্যিই কিছু হয় না, নীতিশাস্ত্রের কোনও বচনই সত্যবচন নয়। যে যে উক্তি নীতিশাস্ত্রে আমাদের আলোচ্য তা একান্তই আবেগ-প্রধান, আমাদের মনোভাব মাত্র সুতরাং ন্যায়ের বচন নয়। অধ্যাপক এয়ার যেমন লিখেছেন : 'কোনও বচনে নীতিশাস্ত্রের প্রতীক থাকলেই তার তথ্যগত তাৎপর্য বাড়ে না। তাই যদি কাউকে বলি, 'ওই টাকা চুরি করে তুমি অন্যায় করেছ' তবে আমি 'তুমি টাকা চুরি করেছ' বাক্যটির চেয়ে অন্য বাড়তি কিছু বলতাম না। 'তুমি অন্যায় করছ' এইটুকু জুড়ে দিলেই এ বিষয়ে বাড়তি মন্তব্য করা হচ্ছে না। আমি শুধুমাত্র আমার নৈতিক অসমর্থন প্রকাশ করছি। যেন 'তুমি টাকাটা চুরি করেছ' বলেছি ভয়ের এক বিশেষ কণ্ঠস্বরে, বা কয়েকটা বিশেষ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন জুড়ে ওটা লিখেছি।' এই তত্ত্বের নানাবিধ ভ্রান্তির মধ্যে প্রধান একটি হল এই মূল্যকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরা যাক আমি 'ক' বাবুর বন্ধু। আমার প্রতি ওঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। কিন্তু আমি সামান্য কৌশলে ওঁর উইলটা পালটে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নিলুম আর জলের সঙ্গে বিষ দিয়ে ওঁর জীবন শেষ করে দিলুম। 'ক' বাবু নিশ্চিন্তমনে চিরনিদ্রায় ডুবলেন। কোনও যন্ত্রণা তিনি পাননি, আমিও কৌশলে ধরা পড়বার সমস্ত সূত্র মুছে ফেললুম। এবারে আমাকে কী বলা হবে? 'ক' বাবু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারতেন কিন্তু জীবদ্দশায় ওঁর মনোভাব ছিল শ্রদ্ধার, বিশ্বাসের। সুতরাং হত্যা বিষয়ে বলবার কিছু নেই প্রত্যক্ষতার অভাবে, কার্যত হত্যাই ঘটেনি। একমাত্র আমি নিজে সাক্ষাৎ ভাবে জানি বা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আমি দূরদর্শী লোক, তাই কাউকে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা না দিয়ে আমার ভবিষ্যতের পাকা ব্যবস্থা করেছি। আর একথা এয়ার-রাসেলরা নিশ্চয়ই মানবেন যে কারও কোনও প্রতিবাদী বা আপত্তিকর মনোভাবের অনুপস্থিতিতে কোনও অর্থেই আমাকে খুনি বলা চলে না বা ঘটনাটাকে নিন্দে করা যায় না। সুতরাং এই তত্ত্বে হত্যাপরাধ কেমন চমৎকার নীতিশাস্ত্রের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও অনেক ঝামেলা, কারণ পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রসঙ্গে সত্যবিচারের কোনও মানদণ্ড নেই। ফলে এই দার্শনিক প্রস্তাবনায় জগৎজোড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে কড়ে আঙুলও তোলবার সমর্থন নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতির সত্যতা বিষয়ে প্রশ্ন নেহাৎই অবান্তর। তাই বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধে বৃদ্ধ রাসেলের অসমসাহসী সংগ্রাম তাঁর নিজের নীতিশাস্ত্রবিরোধী বক্তব্যের পাশে ইউরোপীয় মানসের শূন্যতাকেই তুলে ধরে।

প্রত্যক্ষবাদের পাশে মার্ক্সবাদের সাপেক্ষ নীতিতত্ত্ব সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। এই সাপেক্ষ

তত্ত্ব অবশ্যই ব্যক্তিনির্ভর নয়। ফ্যাসিবাদের 'ফোক'-এর স্থানে, মার্ক্সাবাদের 'শ্রেণী'। লেনিনের উক্তিতে জানি, 'আমাদের নীতিতত্ত্ব সম্পূর্ণই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থের দাবি মেনে চলে। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের তথ্য ও প্রয়োজন থেকে আমরা নীতিতত্ত্বকে আহরণ করি।' অবশ্য এঙ্গেলস ঘোষণা করতে ভোলেন না যে:

> **A really human morality which transcends class antagonisms and their legacies in thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class antagonisms, but has even forgotten them in practical life.**

এই তত্ত্বে প্রমাণ হচ্ছে সামাজিক শ্রেণীগুলোর স্বার্থ সম্পূর্ণই পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধ থেকে পৃথক পৃথক নীতিশাস্ত্র জন্মায়। যদিও মার্কসীয় শাস্ত্রে বলা হয় না পৃথক শ্রেণীর কারণে বা পৃথক স্বার্থের কারণেই কোনও পৃথক নীতিবোধ জন্মাবে তবু সহজবুদ্ধিতে এ কথা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিভিন্ন নীতির জন্ম। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যুক্তির নজির সত্ত্বেও মার্ক্সবাদীরা আকস্মিকভাবে দাবি করেন বুর্জোয়া নীতিবোধের চাইতে শ্রমিকশ্রেণীর নীতিবোধ শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে তবে ওঁরা মানবতা ও সভ্যতার দোহাই তোলেন। কারণ মার্কসের ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোয়া পর্যায়ে সমগ্র মানবতার প্রতীক। যদি এ কথা সত্য হয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই মানতে হবে আদিতে, মানবসভ্যতার সূত্রপাতেই মানবিক নীতিবোধ আছে। অথচ এ-বক্তব্যের সঙ্গে নীতির শ্রেণীতত্ত্ব কোনওক্রমেই মেলে না। মানবিক নীতিবোধ সর্বজনীন নীতিবোধ, তাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই অংশীদারিত্ব আছে এবং সেক্ষেত্রে সমাজকে সম্পূর্ণ বিরোধী স্বার্থের শিবির মনে করবার কোনও কারণ নেই। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে মার্ক্সবাদ নীতিবিচারের সঠিক মানদণ্ড উপস্থিত করে না। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে আদিতে নয়, বিশিষ্ট পর্যায়ের অন্তেই সর্বজনীন নীতিশাস্ত্র আসছে। প্রশ্ন তোলা যায় এই সর্বজনীন নীতি এল বা আসবে কোথা থেকে? ওঁরা নিশ্চয়ই জবাব দেবেন শ্রেণী না থাকলেই সর্বজনীন নীতি আসে। কিন্তু একথা বোঝা যায় না, কেমন করে, কোথা থেকে শ্রেণী মুছে গেলেই সর্বজনীন নীতিগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়বে। কারণ সাম্যবাদের সূত্রপাত পর্যন্ত শ্রেণী থাকবে, রাষ্ট্র সেই শ্রেণীস্বার্থের বাহন হবে, রাষ্ট্রে শ্রেণীর নীতিও নিশ্চয়ই থাকবে। শ্রেণীর নীতির সঙ্গে সঙ্গেই কি সর্বজনীন নীতি তৈরি হচ্ছে? যদি হয় তো কেমন করে হচ্ছে? যদি হয় তো বর্তমানের পৃথিবীতে অন্যত্র শ্রেণীর পাশাপাশিই সর্বজনীন নীতি সম্ভব নয় কেন? মার্ক্সবাদে এই সমাজতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের টানেই হিংসার বক্তব্য প্রধান হয়ে পড়ে কারণ প্রতিটি মানুষ যদি শ্রেণীস্বার্থের বাহন হয় এবং সমাজ পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর, তবে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, যুক্তি বিবেচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ বিলোপ পায় আর তখন একমাত্র হিংসারই পথ খোলা থাকে। শান্তির ললিতবাণী তখন সত্যিই ব্যর্থ পরিহাস।

প্রত্যক্ষবাদ ও মার্ক্সবাদ উভয়তই মানুষকে যুক্তি বিবেচনার পাত্র হিসেবে ভাবা হচ্ছে না, তাকে প্রাণহীন যন্ত্রের মতো অজ্ঞানের হাতে, রাষ্ট্রের হাতে, দলের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জনতার চাপে ব্যক্তির অবস্থা তখন কাফকার 'কে'র মতো, যার বিচার চলছে অথচ যে অপরাধ বিষয়ে অবহিত নয়। কাফকা লিখেছেন —

> ওদের বেছে নিতে বলা হল রাজা হবে কী হবে তার বার্তাবহ। শিশুরা যেমন করে, ওরা সব বার্তাবহ হতে চাইল। তাই রইল শুধু বার্তাবহের দল যারা বিশ্বে শুধু ছুটে বেড়ায়, চিৎকার করে পরস্পরের প্রতি সেই সংবাদগুলো—কারণ রাজা তো নেই— যা অর্থহীন হয়ে গেছে। ওরা ওদের এই দীন জীবনকে খতম করে ফেলতে চায় কিন্তু সাহস পায় না যেহেতু তারা সেবা করবার শপথ নিয়েছে।

বর্তমানের সবচেয়ে চালু শাস্ত্র সমাজতত্ত্বের মানহাইমের জবানিতে একই কথা পাচ্ছি, সেই অজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানহাইম মনে করেন সমস্ত তত্ত্বই হল 'আইডিওলজি' অর্থাৎ যা সামাজিক অবস্থার ফসল

মাত্র। নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার চাপেই সব তত্ত্বের জন্ম, এর বাইরে সত্যের কোন স্থান নেই। গর্বভরে মানহাইম লিখতে পারেন :

> The view which holds that all cultural life is an orientation towards objective values is just one more illustration of a typically modern rationalistic disregard for the basic irrational mechanisms which govern man's relation to his world ... there is, then, no norm which can lay claim to formal validity ...

এবং ভাবেন 'জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব' তৈরি করলেই বুঝি সভ্যতা ও সচেতনতার দায় ঘোচে। ওঁর মতে দুটি পথ মাত্র খোলা আছে। একটি হল যুক্তির পথ। যুক্তিই মানুষের প্রধান অবলম্বন এবং যুক্তির দাবিতেই মানুষ বিশ্বরহস্যের দুয়ার খুলছে, আপাতবিরোধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাচ্ছে। দ্বিতীয়টির মতে, সংসার কেবল নিরন্তর ঘটনাপ্রবাহ, এই ঘটনাপ্রবাহে কার্যকারণের সূত্র অনুপস্থিত যেহেতু যুক্তির নিয়মে ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রিত নয়। ঘটনা ঘটছে, অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। কোনও ঘটছে, কী তার পরিণতি বা উদ্দেশ্য জানতে বাসনা হলেও জানার চেষ্টা অর্থহীন কারণ আমরা জানি জ্ঞানে যুক্তির পরম্পরায়, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের পেছনে কোনও যুক্তির খেলা নেই। মানহাইম দ্বিতীয় মতটিই মানেন কিন্তু ভুলে যান যে জ্ঞান যদি নিছক সমাজ ও সময়-সাপেক্ষ হয় তবে এই জ্ঞানের বোধ বা বক্তব্যটিরও অর্থাৎ মানহাইমের জ্ঞানের সমাজতত্ত্বেরও সমাজতত্ত্ব থাকবে এবং এমনি করে সমাজ তত্ত্বের পিছুহটা চলবে নিরবধি কাল ধরে, মানহাইম এই বিপদমুক্তির পথ খোঁজেন এই বলে ব্যক্তি যদিও অন্ধতার রোগী তবু পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অন্ধতা ভেঙে হয়তো একটা স্বীকৃত সম্মত অবস্থা তৈরি করা যায়। কিন্তু তিনি ভুলে যান তার জন্যে শুরুতেই একটি মানদণ্ডের প্রয়োজন যা ব্যক্তির অন্ধতা ও অজ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে না।

মনস্তত্ত্বের 'অজ্ঞান'-এর কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। সুতরাং মনস্তত্ত্ব ছেড়ে আমরা দর্শনের রাজ্যে আসি। প্রত্যক্ষবাদ আদিতেই বিজ্ঞানের বাইরে সমস্ত জ্ঞানের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছে। আর নির্জ্ঞানের প্রসারে অস্তিত্ববাদ প্রত্যক্ষবাদকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। যুক্তির পথে. চিন্তার নেতৃত্বে সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা অস্তিত্ববাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। একক মানুষদের দিয়ে অস্তিত্ববাদের সূত্রপাত। প্রতিটি মানুষই একক ও নিঃসঙ্গ। তাকে গড়ে নিতে হবে নিজের জগৎ, তেমনি নিজেকে। কোনও কিছুই তার চারপাশে স্থির নেই, নির্দিষ্ট নেই। তার যেমন নেই পশ্চাৎ, তেমনি নেই নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। পূর্ববর্তী দর্শনে জ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনা ও মানুষের বিপুল ভবিষ্যতের কল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু অস্তিত্ববাদের ঘোষণায় সেই মানুষ অর্থহীনভাবে শুধুই যুক্তির হাতে ধরে চলে, মানুষ শুধুই তার চরিত্রের নির্দিষ্ট স্বাভাবিকতায় পরিণতি পায়। অথচ বিশ্বে কোনও কিছুই যুক্তির নিয়মে চলে না, পুরোনো প্রতিটি প্রত্যয় ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। সার্ত্র লিখছেন : 'মানুষ আর কিছুই নয় সে নিজেকে যা বানায় তা ছাড়া। এটাই হল অস্তিত্ববাদের প্রথম সূত্র।' লিখছেন :

> For we mean to say that man primarily exists — that man is, before all else, something which propels itself towards a future and is aware that it is doing so ... Before the projection of the self, nothing exists ; not even in the heaven of intelligence : man will only attain existence when he is what he purposes to be. Not, however, what he may wish to be. For what we usually understand by wishing or willing is a conscious dicision taken much more often than not — after we have made ourselves what we are.

সার্ত্র অবশ্য ব্যাখ্যা করেন না কোনও একমাত্র মানুষই নিজেকে সৃষ্টি করবে আর সৃষ্টি করবে কী ভাবে, কোনও লক্ষ্যে। তিনি লিখেছেন যে সত্তার আগে অস্তিত্ব স্বীকৃত হলে মানুষ নিজের জন্যে নিজেই দায়ী। কিন্তু এই দায়িত্বের সাধারণ বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠবে দায়িত্ব নিশ্চয়ই নিজেকে গড়বার কিন্তু মানুষ নিজেকে গড়বার প্রেরণা পাবে কেন? প্রেরণা ছাড়া তার দায়িত্বের অর্থই বা কি? সার্ত্র আরও

জানান যে নিজেকে গড়বার সূত্রেই ব্যক্তি 'নিজেকে বাছাই করে।' 'যদি বলি মানুষ নিজেকে বাছাই করে তবে নিশ্চয়ই বোঝাতে চাই যে আমাদের প্রত্যেককেই নিজেকে বাছাই করতে হবে। এ দ্বারা আরও বোঝাতে চাই, যে নিজের জন্যে বাছাই করে সে সবার জন্যেই বাছাই করে।' মানুষ যদি সম্পূর্ণই নিজে নিজেকে বাছাই করে তবে অন্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবার কথা নয় এবং প্রসঙ্গত সার্ত্র তা মানেনও না। অথচ তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন যে নিজেকে বাছাই করে অন্যদের জন্যেও বাছাই করা হচ্ছে। 'এটা ওটার মধ্যে বাছাই করা হল যা বাছাই করা হয়েছে তার মূল্যকেই সমর্থন করা; কারণ আমরা কখনওই খারাপ বাছাই করতে পারিনে।' কেন যে পারিনে সার্ত্র তা জানান না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল অগ্রপশ্চাৎহীন মানুষ একক বিশ্বে শুধু নিজেতেই বিশ্বাস রেখে এগোতে পারে এবং নিজেকে গড়ে নিতে পারে। অথচ তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি আসবে কোথা থেকে ও কার কাছে সার্ত্র ব্যাখ্যা করেন না। এমন একটা বিশ্বে সে এসে পড়েছে যা সে নিজে গড়েনি, এমন কোন স্বীকৃত নীতি নেই যা সে সমর্থন করে এগোতে পারে। তাই তার জীবন নিঃসন্দেহেই শুধু 'এঙ্গস্ট' ও 'সোর্জ' অর্থাৎ 'দুশ্চিন্তা' ও 'যত্ন'। তাই হাইদেগেরের কাছে 'মায়া থেকে মুক্তি একমাত্র সেই মানুষটিই পেতে পারে যে যন্ত্রণার কাছে নিজেকে মেলে ধরে দৃঢ়চিত্তে শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়ায় আত্মবিলুপ্তির অপেক্ষায়।'

লা নসি-র নায়ক হঠাৎ আকস্মিক এক মুহূর্তে পার্কে বসে তার অস্তিত্বের আস্বাদ পেয়েছিল। সেই মুহূর্তের আগে সে জানত না অস্তিত্বের কী অর্থ :

> আমি ছিলুম অন্য সবার মতো, ওই লোকগুলোর মতো যারা বসন্তের সাজে সমুদ্রের পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের মতোই আমি বলছি 'সমুদ্রটা সবুজ, ওই উঁচু জমি যেটা সমুদ্রে নেমে গেছে তার রং সাদা, ওই যে একটা সী-গাল উড়ল।' কিন্তু অনুভব করিনি যে ওদের কেউ আছে, সী-গাল সত্যিই একটা অস্তিত্ববান সী-গাল। কার্যত অস্তিত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের চারপাশে আছে, আমাদের ভেতরেও, আমরাই তা, তার কথা না-বলে দুটো কথাও আওড়াতে পারিনে তবু শেষ পর্যন্ত তা আমাদের নাগালের বাইরে। যখন কল্পনা করেছি আমি তার বিষয় ভাবছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে আমি মোটেই ভাবছিলুম না, আমার মন ছিল ফাঁকা অথবা হয়তো আমার মনে একটি মাত্র কথা ছিল, সেই কথাটি 'সত্তা'। ...নিজেকে বললাম সমুদ্র সবুজ বস্তুর মধ্যে পড়ে অথবা সবুজ সমুদ্রের একটা গুণ। যখন এর দিকে তাকিয়েছি তখনও আমি চিন্তায় একশো মাইলের মধ্যে নেই যে তারা অস্তিত্ববান; মঞ্চের দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছিল তাদের। ... আগে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত অস্তিত্ব কী, আমি বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিতুম, ওটা কিছুই নয়, বাইরের বস্তুতে চাপানো একটা শূন্য আকার মাত্র যাতে বস্তুর চরিত্র একটুও পালটায় না। আর এখন, এক মুহূর্তেই, সে উপস্থিত, দিনের মতো স্বচ্ছ; অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে আবরণমুক্ত হয়েছে।

বোঝাই যাচ্ছে অস্তিত্ব চিন্তার বিষয় নয়, জ্ঞানে তার পরিচয় মেলে না। বাহ্য বস্তুপুঞ্জের ওপর চাপানো অর্থহীন একটা আকারের মতো সে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তার স্বরূপ প্রকাশিত হয় অতর্কিতে, মনের গভীর থেকে। প্রায় যেন ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান *হঠাৎ* মনের আগল *ঠেলে* এসে পৌঁছেছে সচেতনতায়। আর তাই যুক্তিবিরোধী বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অস্তিত্ববাদের শব্দরূপে। চিন্তায় নয়, সত্তার আভাস মেলে যেহেতু আবেগে, আকস্মিক দীপ্তির জৌলুসে সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয় কর্মে, নিজেকে গড়ে নেবার চেষ্টায়। এই গড়ে নেওয়া বা নিজেকে জড়ানো প্রায় স্বপ্নে ঘুমন্ত মানুষের চলার মতো। 'এঙ্গ' ও 'সিসটেয়ার' অর্থাৎ 'কাজে নামা'।

সার্ত্রর সমগ্র রচনাবলিতে এই চিন্তাহীন 'কাজে নামা'র পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কাজের মধ্যেই সার্ত্র ঘোষণা করেন 'পুরো মানুষ'টিকে পাওয়া যাবে। এই কাজের চরিত্রটি কেমন? সার্ত্র চমৎকার ব্যাখ্যা করে দেখান যে আমাদের পূর্ববর্তী শিল্পী, যাদের কাছে আমরা পেয়েছি আমাদের সংস্কৃতি, বোধ, বিধি, নিষেধ, আমাদের প্রবাদ, আমাদের বাসস্থান, তাঁরা ছিলেন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোক। অর্থাৎ

নির্ঝঞ্ঝাট। তাঁরা 'সমগ্র মানুষ'টির খোঁজে চাননি এমন সমসাময়িক অবস্থা যা অত্যাচারে, নৃশংসতায়, চাপে পাত্রপাত্রীদের নিষ্পেষিত করবে। ঘাম ও রক্তে সর্বাঙ্গ ভাসবে মানুষদের আর সেই অসহায়তায় জ্ঞানের ও সচেতনতার সাহায্য ছাড়াই হঠাৎ জানতে পারবে নিজেদের অস্তিত্বের কথা। কিন্তু সার্ত্র জানেন এই রক্ত ও ঘামের, ইতিহাসের চাপের কাহিনিতে মানুষের দৃষ্টি ঢেকে যায়। সমসাময়িক কালের চরিত্র নজরে আসে না কারণ সময়ের কেন্দ্রে অন্ধ মানুষ নিজের বাইরে তাকাতে পারে না। আর তার চারপাশেই তো কেবল চাপের কথা যেহেতু রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ার মানুষের মনুষ্যত্ব না হোক সার্ত্র-কথিত সামগ্রিকতার বিকাশ। অবশ্য সার্ত্র জানতেও চান না কারণ তিনি বলেন সবটাই 'অবোধ্য', শুধু মারাত্মক চাপটা অনুভব করলেই চলবে। সার্ত্রর নায়করা তাই এমন ধরনের লোক যাদের জীবনে সব কিছুই ঘটে, তারা ঘটায় না। তারা নিষ্ক্রিয় সব মানুষ, উইন্ডহাম লুইসের মতে, 'গিনিপিগ জাতীয়'। শুধু কি সার্ত্রতেই? এলবেয়র কামুর নায়ক মিরশ একটি অপোগণ্ড ভ্যাবলা মাত্র—তার ভাবনা-চিন্তার প্রশ্ন নেই।

সার্ত্রর মতো আন্দ্রে মালরোরও একই সমস্যা। মালরোর বিশ্বেও মানবিকতার প্রবেশ কর্মে এবং সেই কর্ম হত্যায় সংঘটিত হয়। মালরো তাই লেখেন :

> **In imposing his personality upon the external world man finds the only outlet which remains to him, his one and only chance of escaping—imprefectly—from Nothingness (an néant).**

আসলে জগৎটা মানবিকই নয়। মানবিকতা নিশ্চয়ই প্রকাশ পায় কর্মে কিন্তু সেই কর্ম যুক্তি ও সচেতনতার হাত ধরে নিজের স্বভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টায়। সার্ত্ররা যেহেতু জগৎকে শূন্যের নামান্তর মনে করেন এবং পূর্বাপর সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করেন সুতরাং তাদের মুক্তি পলায়নের পথেই আসে এবং সেই পলায়ন কখনও হত্যার রূপে, কখনও নিরঙ্কুশ চাপের রূপে। মাল্‌রোর ভাষাতেই তাই বাঁচার তাৎপর্য হল 'to lead, to be he who decides, to coerce. That is to live.' সার্ত্র অবশ্য এই পলায়নের কর্মে ভাবেন শিল্পীর স্বাধীনতা আসে রাজনীতির ভাগাভাগিতে। রাজনীতির পরিমণ্ডল ছাড়া শিল্পীর অস্তিত্বের কোনও জগৎ নেই। আর বর্তমানের রাজনীতিতে আছে অবিসম্বাদী দুই পক্ষ: বুর্জোয়া ও সাম্যবাদী। সার্ত্র বলতে চান শিল্পীকে পক্ষ বাছাই করে নিতে হবে এদের মধ্যে যদিও তিনি নিজে বুর্জোয়াদের ছেড়েছেন তবু ভাবতে পারেন না যে সাম্যবাদী দলে যোগ দেবেন। অথচ ওঁর অভিযোগের অন্ত নেই যে সাম্যবাদীরা ওঁর পাঠক অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে কেড়ে নিয়েছে। শিল্পীদের যে পক্ষ বাছাই করে নিতেই হবে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ছাড়া শিল্পীর মুক্তি নেই, এই তত্ত্বে সার্ত্র সাম্যবাদীদের কাছে এগিয়ে আসেন (যদিও তিনি লেখেন 'For Communists a writer is suspect on principle') এবং অস্তিত্ববাদের অন্ধতায় শিল্পীর স্বাধীনতাকে তুলে দেন সর্বগ্রাসী দল ও দলসমর্থিত রাষ্ট্রের হাতে।

মালরোর, *মানুষের ভাগ্য* উপন্যাসটিতে একটি আশ্চর্য কথোপকথন আছে। এই কথোপকথনে শূন্যতার বিকট দাঁত অন্ধকারেও ঝলসে ওঠে। জানতে পারা যায় জীবনের স্তরে স্তরে ইউরোপে কেমন সন্দেহ, হতাশা ও অজ্ঞানের অন্ধকার জমেছে।

'গিসরকে সে ইতিমধ্যেই খুন করেছে কিনা' জিজ্ঞেস করে নেতিবাচক উত্তর পাবার পর চেনের হঠাৎ মনে হল যে গিসরের মধ্যে কিছু একটার অভাব আছে।

গিসর জিজ্ঞেস করল :

'প্রথম যখন কোনও মেয়ের সঙ্গে শুয়েছিলে—পরে কী ভেবেছ?'

'গর্ব।'

'মানুষ হবার জন্যে?'

'মেয়েমানুষ না হবার জন্যে', চেন জবাব দিল...

'মেয়েদের কথা তুলে ভালোই করেছ। যে লোকটিকে খুন করা হয়েছে তার জন্যে হয়তো একটা

বিরাগ থাকে। তবে অন্যদের ঘৃণার চাইতে তাকে কমই ঘৃণা করা হয়।'

'তুমি বলছ তাদের চাইতে যারা খুন করেনি?'

'যারা খুন করেনি তাদের চাইতে— কুমারদের চাইতে।'

এই হল বর্তমান ইউরোপের অবস্থা। আমরা যারা এখনও কর্মের পথে পলায়নের জন্য খুন করিনি, যারা এখনও ইতিহাসের প্রয়োজনে নিষ্পেষণের যুক্তি, রক্ত ও ঘামে দরবিগলিত হবার বাসনা প্রকাশ করিনি তারা নিছক 'কুমার' অর্থাৎ জীবনের পূর্বাপর অভিজ্ঞতাহীন নিরেট বোকা ছেলে। জীবনের কোনও তাৎপর্যই নেই আমাদের সত্তায়, অস্তিত্বের অর্থ এখনও ফোটেনি আমাদের স্বপ্নে, আমরা তাই ঘৃণার পাত্র। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে ইউরোপের প্রতিটি মানুষ এমনি করে ভাবে বা ইউরোপের সবাই সচেতনতা ও যুক্তির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে, তবু এটাই বর্তমান ইউরোপের জীবনচর্চার প্রধান দিক। যন্ত্রের ও যন্ত্রকৌশলের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনার উদ্‌বর্তন হয়নি, মস্তবড় ফারাক থেকে গেছে। এই ফাঁকটাই বর্তমানে বিরাট মুখব্যাদান করে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে আর গ্রাসিমে কাসের উত্তরসাধকরা ক্ষমতার লোভে, স্বার্থের তাড়নায় রাষ্ট্রকে তাদের হাতিয়ার করে বিশ্ব অভিযানে বেরিয়েছে। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখবার জন্যে মানুষের লোভ ও মোহ এমন একটা সংগঠন চালু রাখতে চাচ্ছে যার চাপে ব্যক্তি দলে পিষে পিণ্ডে পরিণত হবে, তার স্বাধিকারের স্বপ্ন ফুৎকারেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে। নিষ্পেষণের আগে তার বুদ্ধিবিবেচনা কেড়ে নেওয়া দরকার যেহেতু বুদ্ধি বিবেচনাহীন মানুষ অন্ধতার দুর্বল পুতুলমাত্র। তাই ইউরোপজোড়া অজ্ঞানের অভিযান। মানুষের মহত্ত্বের কথা না শুনিয়ে তাকে নিছক অস্তিত্বের অনুকূলে আটকে রাখবার চেষ্টায় দার্শনিক শিল্পীরা সর্বক্ষণ ব্যস্ত। শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে ইউরোপ এখন এমন এক নিঃসীম গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে হয় তাকে অতল আঁধারে নিমজ্জিত হতে হবে নয়তো আত্ম আবিষ্কারের বাসনায় জ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের সচেতন লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত কর্ম ও প্রেরণাকে চালিত করতে হবে। কোনও দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতে স্বাধিকারের প্রশ্ন তুলে না দিয়ে ব্যক্তির নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে সমগ্র মানবসভ্যতার ঋদ্ধির আলোয়। শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বে সজ্ঞানে বুঝে শ্রেয়কেই আশ্রয় করতে হবে। মানুষের সামনে সমস্ত সম্ভাবনার পথই খোলা, ইচ্ছায় সে হতে পারে দেব বা দানব। ইউরোপ কী হবে তার ওপর অনেক মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ১৩৬৯)

কানাই সামন্ত

প্রতিমা : নন্দলালের নূতন রূপকৃতি

কবির ভাষাতে বলতে গেলে : নির্জনে নিভৃতে 'আছি'তে, 'আছি'তে মৃদুমধুর করতালি বাজছে।...

'আমার বেলা যে যায় সাঁজ বেলাতে' এ গান যখন সবে রচিত হয়েছে, তারই সুরের রেশে অবনীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছি গুন্‌গুন্ স্বরে—

আমার বেলা যে যায় সাঁজ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটির একটি তারে
সুরের বেদন বইতে নারে
আমার তুলি সইতে নারে
নিখিল রঙের বেদন বইতে নারে—
ওগো, তোমার সাথে বারে বারে
আমি হার মেনেছি এই খেলাতে।

কত যে দরদ, কত বিচিত্র আখর তা বলা যায় না। এ গান তো আসর সাজিয়ে পাঁচজনকে শোনানো নয়, হাতের তুলি হাতে থাকতেই নিজের মনে নিজেকে শোনানো হাতওয়ালা আরামকেদারাটিতে বসে—অন্য কে শুনল না-শুনল বড়ো খেয়াল নেই—দক্ষিণের বারান্দায় সবে মাত্র চাঁপারং রোদটি এসে পড়েছে, চঞ্চল দুটি চড়ুই নাচানাচি করছে রেলিঙের উপর বা কার্নিশের ধারে, আর বাগানের গাছপালাগুলি দেখা যায় আলোছায়ায় বাতাসে ঝিলমিল করছে। কিন্তু গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিষ্য নন্দলালের সর্বাঙ্গীন তুলনা তো হয় না। তাই কবির অন্য একটি গানের ভাষায় বড়ো জোর বলতে পারি—

খেলার ছলে সাজিয়ে তোমার রূপের বাণী
দিনে দিনে ভাসাও দিনের তরীখানি।

না, তাও কি বলা যায়? শিল্পী নন্দলালের শিল্পসাধনায় চিরদিন ছিল একটি শুদ্ধসংযত আরাধনার ভাব, আর আজও আছে। অশীতিবর্ষের কাছাকাছি এসে শারীরিক শক্তি অল্প, ইচ্ছামতো হাঁটতেও পারেন না, আর মানসিক শক্তি সযত্নে সংরক্ষণ করে দিন থেকে দিনে উজিয়ে চলেছেন। অথচ আজ এক বছরের বেশি হল সদ্য-আলো- ফুটে -ওঠা সকাল বেলায় নির্জন 'কাচের ঘরে', নিজের কাজের ঘরে, বসে একমনে তুলি ধরে দিনের পর দিন যে ছবিগুলি আঁকছেন—প্রত্যহ প্রভাতে একখানি করে ছবি আঁকেন—'খেলা' না বলে এ কথা বলাই ভালো যে, যে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির পূজা, আরাধনা, প্রকৃতির অন্তর্লীন সর্বানুভূ যে চেতনাসত্তা তাঁরই পূজা। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী নন্দলালের চরিত্রগত প্রভেদ। পূজা যেমন বলা যায়, তেমনি বলা চলে 'আমি আছি এবং তুমি আছ, সব হয়েই আছ' এই নিগূঢ় গভীর অবচন বোধ থেকেই একটি সুখ বা সন্তোষ—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন দুই 'আছি'তে আছি'তে অনুচ্চ মধুর করতালির আওয়াজ—এই যেন রূপের পূজারি, রূপদর্শী নন্দলালের নতুন এই চিত্রধারার নিহিত তাৎপর্য। যে নিষ্ঠা-সহকারে, যেমন নিয়ম-পূর্বক, ভক্ত বা সাধক প্রতিদিন ইষ্টের ধ্যানধারণা আরাধনা করেন, বুঝি তারই সঙ্গে এর অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্য।

এই হল শিল্পী-প্রকৃতির বিশেষ পরিচয়। এই চিত্ররূপের বিশেষ প্রকৃতি কী সেটিও প্রণিধানের বিষয় আর বড়োই চমৎকারজনক। শ্রেষ্ঠ কাব্যে দেখা যায় নিরলংকৃত স্বভাবোক্তির ভাবলাবণ্য ও চমৎকারিত্ব।

আমরা আলংকারিক নই, সংজ্ঞার্থ মিলিয়ে নির্দোষ উদাহরণ অবশ্যই উপস্থিত করতে পারব না। তবু নানা যুগের নানা কবির রসাত্মক বাক্য অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত:—

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তখনি বন্ধু, তোমার লাগিয়া বেঁধেছিনু অঞ্জলি

এ উক্তিতে অলংকারের বাহুল্য কী আছে?—

আমি যে সইতে পারি নে,
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারিনে

অথবা—

রূপনারায়নের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়

এই সব ছত্র কি সত্যই নির্ভূষণ নয়? আছে অনায়াসে অব্যর্থ ছন্দ, অন্তর্নিহিত সুর, আর অনির্বচনীয় কত ভাবের অনুষঙ্গ। তাইতেই রসিকচিত্তের দূর-দূরান্তর পর্যন্ত শিহরন জাগে, জন্মজন্মান্তর বুঝি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। জানকীর স্পর্শ সুখে শ্রীরাম যখন বলেন—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।

সুখ বা দুঃখ বুঝি নে স্বপ্ন অথবা জাগরণ, বিষের না অমৃতের এই প্রতিক্রিয়া। নব অনুরাগে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা বলেন—

আস্তাং তদীয় নবযৌবনপূর্ণবাপী
কাপীয়মাত্র ন করোমি নিমজ্জনেচ্ছাম্।
ইচ্ছামি তং কমপি কালমলজ্জমুচ্চৈঃ
আক্রন্দিতুং সুমুখি হা প্রিয় হা প্রিয়েতি।

নবযৌবনলাবণ্যে আপূর্ণ শ্যামসায়র আমার সামনে, আমার ভাগ্য হবে না সখি নিমজ্জনস্নানে নেমে যেতে, ঝাঁপ দিতে— ওরই নির্জন কূলে বসে 'হা প্রিয়' 'হা প্রিয়' বলে অলজ্জ উচ্চকণ্ঠে একবার কাঁদতেও কি পাব না? এসব ক্ষেত্রেও বুঝি অতিশয় সাদাসিধে ভাষায় অতি গভীর আনন্দবেদনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে—আলংকারিকেরাই বলতে পারেন সর্বশেষ দৃষ্টান্তে সাঙ্গরূপকের একটা অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারানো হয়েছে কি না—আমরা জানি , অন্য কোনও কারুকৌশলে ভাব ভাষার সুনিপুণ সজাগ প্রয়োগে, ঝলোমলো ঐশ্বর্যে, যেন এর শতাংশের একাংশ সাড়া জাগানো যেত না রসিকহৃদয়ে। আমরা জানি, পরিপূর্ণ কলসের মতো অন্তঃকরণ যদি ভরা থাকে অলক্ষ্য রূপরাগে বা রসে, একটু হাত ঠেকালেই, এতটুকু হেলানো হলেই, উছলে পড়ে রস।এই অলৌকিক রস শুকনো জমিতে পড়ে শুষে যাবার নয়, নষ্ট হবার নয়—এ যে আপন আধার আপনি সৃষ্টি করে আর তখনই লক্ষগোচর হয়ে রসিককে বিস্মিত পুলকিত করে। কবি বা শিল্পীর এই হল সিদ্ধ অবস্থা। জরার অধিকারে দেহ হয়তো জীর্ণ এবং পুরাতন, কিন্তু আসক্তি-ক্ষয়ে-যাওয়া অনুরাগ-ধোওয়া দৃষ্টির ঝরোখায় বসে আছে যে জন, বাল্যে কৈশোরে বা যৌবনে যেমন ছিল আজও সে তেমনি নবীন, হয়তো নবীনতর। দৃষ্টি হয়তো অন্তরদৃষ্টিই হবে। চোখের দেখার যা কিছু অভাব বা অপূর্ণতা, মনের দেখায় যে সবই ছাপিয়ে গিয়েছে। চিনা-জাপানিরা এ তত্ত্ব বিশেষভাবেই বোঝেন। রূপকথার পারগামী হতে হলে বিধিদত্ত প্রতিভা তো চাই-ই,আরও চাই সুদীর্ঘ জীবনের একাগ্র এবং অনবচ্ছিন্ন অনুশীলন—এ তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলেই জানেন। তাই বুঝি রূপরচনার জাদুকর হকুসাই বলেন অশীতি বৎসর বয়সে: রূপের মর্মে আজ আমার প্রবেশলাভ ঘটেছে মনে হয়, আরও আশি বৎসরের পরমায়ু পেলে এমনও হতে পারে 'চিত্রপটে যে ফোঁটাটি ফেলব—যে রেখাটি টানব—সবই

কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে।' আচার্য নন্দলালের রূপকলা -ব্যাখ্যানে এই চমৎকার উক্তিটি সংকলিত হয়েছে আর তাঁরই সাম্প্রতিক রসরূপ-সাধনার আলোচনায় ও উক্তির প্রাসঙ্গিকতা অল্প নয়।

অসুস্থ দেহের বাধা একটা আছেই এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সে বাধা সত্ত্বেও আনন্দঘন সত্তার প্রকাশ নির্ভূষণ সহজ বেশে, বেশি বৈ কম নয় তার স্বভাবসৌন্দর্য। এই কথাটাই এ পর্যন্ত নানাভাবে বলতে চেষ্টা করা গেছে। শিল্পী বলেছেন, একটু বাড়িয়েই বলেছেন আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই : বহুদিন ধরে তার ছবিতে ছিল একটা লড়াইয়ের ভাব। ভারতের প্রাচীন রূপরচনার ভাব এবং আদর্শ, সাধনা এবং সিদ্ধি, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা চাই অতুল মহিমার উন্নত বেদীতে— মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর সর্বদাই ছিল। তিনি বলেন, অবনীন্দ্রনাথে এ ভাব ছিল না বললেই হয়; তাই ফুল ফোটা আর আলো ফুটে ওঠার মতোই সহজ সুন্দর তাঁর অধিকাংশ ছবি—সে যেন ছবি করা নয়, ছবির হওয়া—আপনাকে আপনি যেন রচনা করেছে ছবি। স্বতঃই মনে আসে : স্বামী বিবেকানন্দে যে যোদ্ধৃভাব ছিল সেটি ছিল না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে। কিন্তু, শিল্পী যাই বলুন, আমরা জানি নন্দনালের চিত্রকৃতিতেও উত্তরকালে এই তন্ময়তা এই স্বাভাবিকতা উপজাত এবং ক্রম-উপচিত হয়ে আজ তাঁর ছবিতেও সৃজন করেছে একটি অবিশ্লেষণীয় ভাবলাবণ্য, রূপদক্ষ শিল্পীর বশীকৃত বর্ণতুলির দান রূপলাবণ্য সেটি নয়। এই গুণ কালে কালে বিস্ময়করভাবে ফুটে উঠেছে—নটীর পূজায়, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে, প্রত্যাবর্তনে, গাছে-চড়া শবরীকন্যায়, কৃষ্ণকলিতে, আর পোয়ে নাচের ছবিতে গতিরাগের অপূর্ব গানে। বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে, ছাত্র নন্দলালের অতি পুরাতন চিত্র 'সতী'তে বা 'শিব-সতী'তে আত্মবিস্মৃত এই ভাবলাবণ্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা নেই। গভীর গম্ভীর সৌন্দর্য আছে, লোক-দেখানো কোনও নৈপুণ্য সেখানে নেই।

তবে আজই যে তাঁর ছবি বিশেষভাবে সহজ হয়েছে, একেবারে ভূষণহীন হয়েই সুন্দর হয়েছে, কেউ ভালো বলে বা মন্দ বলে সে ভাবনা চিত্তপট আর চিত্রপট থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, নিছক ইষ্ট-আরাধনায় উৎসর্গ করেছেন শিল্পী আপনার রং তুলি আর অবশিষ্ট শক্তি, প্রতিটি ছবি তার অন্তিম মূল্য পেয়েছে শিল্পীর 'স্বাক্ষর' হৃদয়ে ধারণ করে—শিল্পীর পূর্ণপরিণত ব্যক্তিসত্তার, নৈর্ব্যক্তিকতার সীমান্তে উপনীত ব্যক্তিসত্তার, নিগূঢ় পরিচয় সর্বাঙ্গে বহন করে—এজন্যই বিশিষ্ট হয়েছে, অন্যের অনুসরণের বা অনুকরণের অতীত হয়েছে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও রূপ তুলনায় আলোচনার সুযোগ নেই, বিচার বিশ্লেষণ নিষ্ফল, বার বার শুধু এই কথাই মনে ওঠে—

বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।

সেই সাধনার পরিণামেই এই সিদ্ধি। মনে হয়, যা সবচেয়ে সহজ তাই সব থেকে গভীর, গম্ভীর, তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশভুবনব্যাপী কত আয়োজনের পরিণামে ঘাসের ডগায় এক ফোঁটা শিশির দেখতে পাই! আর ফুল?—

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।

নন্দলালের আলোচ্য ছবিগুলি, কদাচিৎ একটু আধটু রং-ছোঁয়ানো হলেও, মোটের উপর সবই প্রায় কালি তুলি দিয়ে আঁকা। চিনা কালি আর ভারতীয় তুলি। অর্থাৎ চৈনিক কালো কালির ছাপ-ছোপে ও রেখায় আঁকা হলেও, সেই বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা হলেন ভারতীয় শিল্পী, ভারতেরই বিশেষ ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রবীণ, পরিণত। চিনারাই বলে থাকেন, কালিতুলির কাজে তুলিকারই প্রাধান্য, কালি তার সহকারী। রং বা কালি সম্পর্কে চিত্ররূপের অভিজ্ঞ সমঝদার মাত্রেই যা অনুভব করেন সেটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়, এখানে সংকলন করা যেতে পারে:

বর্ণ মেশায় না চোখ, বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল বা ম্লান দেখিতেছে তাহারই ওজনটুকু নীলে মেশানোই বর্ণকে ভঙ্গি দেওয়া। আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি, যদি মনের রঙটুকু সেই কালিতেই মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না, যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে।

'কালী কি কালো? [শ্রীকৃষ্ণ কি কালো?]
দূরে তাই কালো।
চিনতে পারলে আর কালো নয়।'[১]

মন যতক্ষণ কালী হইতে পৃথক আছে, কালী ততক্ষণ কালো কালী মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালী আর কালো নাই, সে ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চিত্রকারী শিল্পীর প্রকৃষ্ট উপায় ও উপকরণ -স্বরূপ বর্ণ আর সর্ববর্ণাত্মক কালি সম্পর্কে এ থেকে অধিক আর কিছু বলবার নেই। এ যেমন চিনা-জাপানি শিল্পীগণের উপলব্ধির সঙ্গে মেলে, তেমনি দেখা যায় ভারতের যোগী বা ভক্তদের অপরোক্ষ দর্শনের সঙ্গে, সত্যদর্শনের সঙ্গেও অভিন্ন। আর, শেষ বয়সে তাই শিল্পী নন্দলালও চলেছেন উত্তরোত্তর কালোর সরণীতেই আলোর অভিসারে—তারও বাইরে-বাইরে দৃষ্ট বা আবিস্কৃত কার্যকারণের অতিরিক্ত অন্য আন্তরিক হেতু ও সার্থকতা অবশ্যই আছে। হয়তো সে বহু থেকে একের দিকে মুখ ফেরাবার ইচ্ছাটিরও ইঙ্গিত করছে। এই অজস্র চিত্রের ধারায় শিল্পীর বিশেষ একটি মানসিক অবস্থা, একটি আত্মিক স্থিতি, ফুটে উঠেছে। সেটি ' বোধে বোধ' করা যেমন সুনিশ্চিত, ব্যাখ্যা করা অথবা বর্ণনা করা তেমন দুরূহ। বোধ করি শ্রেষ্ঠ সংগীতের সমে পৌঁছে যে ভাব অনুভব করা যায়, অন্তরের তেমনি শমরস বা শান্তি নির্ভূষণ রূপসৌষম্যের আধারে আমাদের অনুভবগম্য হয়েছে। সংগীতজ্ঞ আমরা নই, তবু এমন আমাদের মনে হয় যে, ওই সমের অস্থির স্থিতিকালে মৌনের অন্তরেই সম্পূর্ণ সংগীতের ছন্দ সুর ও ভাবসুষমা ধরা দিয়েছে, আলোকপ্লাবিত অতিদূর আকাশে একবার স্বর্ণডানা দুটি সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে ঈগল যেমন স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকে। গতি ও স্থিতির নিত্যদ্বন্দ্বের ক্ষণিক অবসান।

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই নিখিল সৃষ্টির প্রতি পদক্ষেপ। রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। অন্তর-বাহিরের অন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও চিত্রে আছে রূপ ও রঙের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, সংস্থিতি আর সমন্বয়। নন্দলালের বর্তমান চিত্রপর্যায়ে রঙগুলি সবই যখন সংহৃত হয়েছে কালো কালিতে, নিখিল রূপের উদ্ভব ও বিলয়ের অন্তরবর্তী যে দ্বন্দ্বটি বিশেষভাবে আমাদের নয়নগোচর সে হল গতি ও স্থিতি নিয়ে। ভাব যখনই নির্দিষ্ট কায়ার দুকূল প্রহত করে ছুটেছে, তারই ছন্দোবেগের পদে পদে, মন্দ বা দ্রুত লয়ের উত্থানপতনে, এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, অথচ এমন ভাবে আর কখনও আমাদের চোখে পড়েনি—কেননা, এমন রিক্ততার ভূমিকায় তা আর কখনও প্রকাশ পায়নি। গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই শিল্পীর ঝোঁক বেশি, পরিণামে তারই বিশেষ বাজনা। মনে হয়, নদী পৌঁছুল সাগরসংগমের মোহানাটিতে। অথবা পূর্বোক্ত উপমারই আর একবার উল্লেখ করে বলা চলে—গতি ও স্থিতির পরমাশ্চর্য একটি সাম্য-অবস্থায় পৌঁছে এই চিত্ররূপ বিরাজ করছে অতিদূর আকাশের প্রসারিতপক্ষ গরুড়ের মতো। বিভিন্ন দৃষ্টান্তযোগে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে যত্ন করা যাক —

'জলপ্রপাত' ছবিটির গতি হল প্রাণ। সমস্ত ছবিটি যেন, সর্বাঙ্গে সর্বতো ভাবে চলিষ্ণু যে বারিরাশি তারই অবিরত অশ্রুত সংগীত। মাছগুলি চলেছে স্রোতের উজানে। কলরোলে প্রসারিত শতধারার তরলস্বর কানে শোনা যাচ্ছে না সে কি শুধু এজন্যই যে ছবি স্বভাবতই নিঃশব্দ? স্বপ্নে যখন ঝড় ওঠে, মহীরূহ ভেঙে পড়ে, এমনকি ভূমিকম্পও হয়, সবই দেখা বাস্তববৎ, তবু কোনও শব্দ শোনা যায় না; প্রাণ খুলে আলাপ করা যায়, এমনকি হয়তো চিৎকার করা হয়, তবু যে যেন মনের সঙ্গে মনেরই অব্যবহিত সংযোগে, শ্রবণেন্দ্রিয় দুটির কোনও কাজ থাকে না; আর স্বপ্নে এমন ছুটে যাওয়ার বা উড়ে যাওয়ার ব্যাপারও কি স্মরণ হয় না

যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও শ্রমসাধ্য চালনার প্রয়োজন থাকে না— সবটাই যেন অনায়াস ভেসে যাওয়া, যে ভাবে শরতের শুভ্রমেঘ ভাসে নীলাকাশে। আমরা শুনেছি , শান্তিনিকেতনের উত্তর সীমানায় নতুন খালের জলে যে প্রপাত সৃষ্টি করা হয়েছে সিমেন্ট,-বাঁধানো 'ঢল' বেয়ে তাই শিল্পী একদিন দেখে এসেছিলেন। শিশুর দৃষ্টি আছে বয়স্কের চোখে, তাই ভালো লেগেছিল সন্দেহ নেই, অথচ একটা 'কিন্তু' থেকে গিয়েছিল এই যে এ তবু কৃত্রিম, লীলাময়ী প্রকৃতির অলক্ষ্য হস্তের রচনা নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসলেন তাঁর নিভৃত ঘরে নিজের আসনে, বাস্তব তাই বুঝি রূপান্তরিত হল স্বপ্নে; এ শুধু জলপ্রপাত নয়, সেই সঙ্গে স্বপ্ন প্রপাতও বটে— 'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে'। বিশেষ করেই বর্তমান পর্যায়ের ছবিতে শিল্পী দিনের পর দিন এঁকে যাচ্ছেন দূরের ছবি—দেশ কাল মানবিকতার সব দিক দিয়েই দূর, দূর অথচমধুর। অতি নিকটের বাস্তবকেও তাই আপন মনের অনুকূলে , মুডের বশে , অতি দূরের করে নিয়েছেন। পাঁচটি পুঁটি মাছের ছবিতে মাছ ক'টির চোখের কোণে কোণে বা কান্‌কোয় একটু আধটু লালিমা ছোঁওয়ানো আছে, ভস্মে-ঢাকা এক আধ রতি বহ্নিদীপ্তির মতো। প্রাচীন চীনা চিত্রকরেরা কালিতুলির ছবিতে রঙের এমন ব্যবহার করেছেন এ না হয় প্রসঙ্গত বলা গেল। ছবিটিতে দেখছি কি জলতলের শৈবাল বা উদ্ভিদ গতিশীল স্রোতে অধীরভাবে কাঁপছে অস্তিত্বের সুখে, আর সেই স্রোতে সেই একই বিশুদ্ধ 'অস্তি' র আনন্দে ছোট বড়ো মাছ ক'টি স্রোতের বিপরীত মুখে স্থির হয়ে রয়েছে। তারা চলছে না; যে তাদের জীবনের জীবন, আবাস ও আধার-স্বরূপ, অদৃশ্যপ্রায় স্বচ্ছ প্রবাহে সেই চলেছে অবিরল স্পর্শসুখে তাদের সর্বাঙ্গ প্লাবিত করে —স্থির মাছগুলির অপলক অক্ষিতারায় -তারায় চকিত ঝিকিমিকি অনুমান করলেও করা যায়।

গিরিসংকটে তিনটি হনুমান বা গিরিব্রজে সানু-সোপানে -অধিষ্ঠিত গুটি তিন বাংলো ছাঁদের বাড়ি, এ যেন আর এক প্রকারের চিত্র। পরিবেশ আর পরিপ্রেক্ষিতের বদল আর সেই সঙ্গেই শিল্পীর আত্মপরিচয়ের নতুন দিকও যেন উদ্‌ঘাটিত। প্রথমোক্ত চিত্রে রুক্ষকঠিন তৃণতরুহীন পাষাণের সংহত স্থৈর্য আর তারই ক্রোড়ে তিনটি প্রাণী—তাদের আকারে অবয়বে বা ভঙ্গিতে প্রাণচঞ্চলতা অল্পই। পাথরে আর প্রাণীতে রূপের বৈপরীত্য বা বিশিষ্টতা (character) ফোটাবার প্রয়োজনে , বর্তনাপ্রয়োগে বা রেখাবিন্যাসে যেটুকু প্রভেদ না থাকলে নয় তাই ব্যবহার করেছেন শিল্পী ; সে এতই অল্প যে মনে করা যেতে পারে এই পাথর ভেদ করেই এই প্রাণ জেগেছে। রূপে ও ছন্দে সব নিয়েই আশ্চর্য একটি ঐক্য বা অবিচ্ছিন্নতা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ছবিটির একটি স্বয়ংসিদ্ধ সম্পূর্ণতা ও অবিচল স্থিতি আছে। অন্য ছবিটিতে পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে এক দিগন্ত থেকে না-দেখা আর এক দিগন্তের অভিমুখে। সেই অজ্ঞাত সুদূর থেকেই আঁকাবাঁকা জলের ধার বয়ে আসছে। এ দিকে নিকটের পাহাড়ে ঋজু-দণ্ডায়মান দেওদার-বীথি আকাশে উন্নত মাথা তুলেছে, তাদেরই রহস্যছায়াশ্রিত বাড়িগুলি অনড় দুর্গ-সদৃশ। গতিশীল জীবনের কোনও চিহ্ন কোথাও দেখি নে, তাতে প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নির্লোভ নিরাসক্ত বৈরাগ্য; জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যে যিনি পূর্ণ, আকাশের নিঃসীম শূন্যতাতেও তাঁরই প্রকাশ, এই যেন বলতে চায় নির্জন বাড়িঘর, স্থির দেওদার আর স্থির তরঙ্গাকারে দিগ্‌দিগন্তে উত্থিত পর্বতশ্রেণী।

নূতন দৃশ্যপটের উদ্‌ঘাটনে দেখি 'শ্যামলী' মেয়েটি—- কোথা তার ঘর, কী ভাবে বসে আছে, কোনওদিন জানা যাবে না। শুধু জানি, আপনাতে আপনি যে ডুবে আছে; আপনাতে আপনি স্থিত, বিধৃত। সে আছে এইমাত্র তার পরিচয়ের সীমা নেই, শেষ নেই।

চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি, যেখানে কোনদিন কোন মানুষের পদপাত ঘটবে না; শান্ত সমাহিত যোগেশ্বর শিবের সে ধ্যানাসন। সেই ধ্যানলোকের দূরলক্ষ্যের অভিমুখী হয়ে নিঃসঙ্গ বৃক্ষরূপী কোনও শৈব-তপস্বী। নিম্নবাহিনী কোনও উৎসতল থেকে দিনান্তের ঘট ভরে নিয়ে শৈলসোপানে উঠছে ধীর মন্থর পদে দুটি পাহাড়ের মেয়ে, উপরের অধিত্যকাভূমে দেখা যায় একটি কুটীর। সমস্ত ব্যাপারটি ঘটছে অতিদূর অন্য কোনও জগতে, এখানে ঘটনাই যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাও নয়। অস্থির ক্রিয়ার পরিবর্তে সুস্থির হওয়ার

মহিমাই রূপ ধরে জেগে উঠেছে এই চিত্রে—গিরীশের হিমমৌলি চিরশুভ্র কয়েকটি শিখর।

সব শেষে আর একটি মাত্র চিত্রের উল্লেখে অবর্ণনীয়ের নিষ্ফল বর্ণনচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হব। জনশূন্য এক মগ্নশৈলের কঠিন পাষাণে মাথা কুটছে অহেতু আক্রোশে তরঙ্গগর্জিত স্ফুরণ ফেনায়িত মহাসিন্ধু, আকাশ থেকে আকাশে তখন বায়ু বৃষ্টির মাতামাতি, শ্রেণীবদ্ধ তালের বনে বনে তির্যক বারিবর্ষণ। আক্রোশ বলেছি বটে, হয়তো তা নয়—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে নেচে উঠেছে সমুদ্র তাণ্ডবমত্ত শঙ্করের পদপাতে। বিশেষ দ্রষ্টব্য দুটি কাঁকড়া, সমুদ্রের তরঙ্গদোলা থেকে উঠে পড়েছে ফেনার্দ্র শীতল পিছল পাষাণগাত্রে। জড় এবং জীব মিলে অভিন্ন একটি রূপ ও রেখার 'ছন্দ' (pattern) যেমন অন্য ছবিতেও দেখা গেছে। গাছ এবং প্রাণী এক দিকে, আর এক দিকে অন্ধ জড়জীবনের, দৃশ্য অদৃশ্য ভূতসংঘের দুর্বার আবেগ ও বিপুল উল্লাস—পাষাণরূপিনী সর্বংসহা পৃথিবী, অস্থির সমুদ্র, বৃষ্টি, এবং বায়ু যা চোখে না দেখেও মনে প্রাণে অনুভব করা যাচ্ছে। আরও রয়েছে জানি সর্বত্র প্রসারিত, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, আকাশ—সেটি তো চিত্রীর চিত্ত বা চেতনারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এত যে আবেগ এবং গতি, তার অন্তরে রয়েছে অবিচল স্থিতি ও শান্তি এ আমাদের পরিকল্পনা নয়। এই হল শিল্পী নন্দলালের আয়াসহীন কৃতিত্বের পরম পরিসীমা, তাঁর নবতন চিত্রপর্যায়ের বিশেষ গুণ।

রচনার দিক দিয়ে সমকালীন হলেও, রূপশৈলীর দিক দিয়ে পূর্বকালীন স্কেচ বা কার্ড, স্কেচের সগোত্র, 'খেজুর রসের ভিয়ান' ছবিটি আমরা ঠিকই এই চিত্রপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করি নে। অন্যান্য ছবির তুলনায় এ যেন নিকটতর পরিচয়ে পরিচিত, অপেক্ষাকৃত বস্তুভারযুক্ত বা বাস্তব। এর রস একটু আলাদা। সমতলে যে বাতাস আমরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করি আর সূক্ষ্মতর শুদ্ধতর যে বায়ুমণ্ডল চিরহিমাবৃত গিরিশিখরে, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান অনুরূপ একটি পার্থক্য দেখা যায় শিল্পী নন্দলালের সেকালের এবং একালের ছবিতে। ভাল মন্দের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, রসাস্বাদের তবু ভিন্নতা বা বিশিষ্টতা আছে। এককালের আঙিনায় আর এককালের রূপ, বিশেষত ভাবীকালের 'অপরূপ', তারই নিদর্শন হিসাবে নন্দলালের আর একখানি ছবির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক যুগ অতীত হয়েছে খ্রিস্টীয় ১৯৪৭ সনের শারদীয় অবকাশে, ওড়িশার গোপালপুরে, রংতুলি যোগে ক্ষুদ্র কার্ডে নন্দলাল এঁকেছিলেন শ্যামসমুদ্রের কয়েকটি ঢেউ। শুধুই ঢেউ। মাঝসমুদ্রে ক'টি ঢেউয়ের এই প্রকার পরিচ্ছন্ন রূপ বা ক্লোজ-আপ, এ ছাড়া অল্প পরিসরে আর কিছুই দেখানো হয়নি, দেখাবার প্রয়োজনও ছিল না। অপ্রাণ নিসর্গের যা-কিছু আত্মনিমগ্ন উদ্‌বেলতা, অকূল সমুদ্রের দিক্‌শূন্য আনন্ত্যের যা-কিছু সম্ভবপর ব্যঞ্জনা সবই অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ওই চিত্রে—শিল্পীর কোনও সচেতন প্রয়াসে নয়, রংতুলির কোনও নির্ধারিত কৌশলে নয়— কেমন করে, তা কোনও শিল্প-সমাঝদার বলতে পারবেন না আর শিল্পী নিজেও জানেন না। সাম্প্রতিক চিত্রপর্যায়ের যে গুণে আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট, মনে হয়, সে গুণেই ওই কার্ডখানিও দীপ্তিমান। কাব্যের রসধ্বনি যেমন সকল বিচার বিশ্লেষণের অতিরিক্ত, রূপের এ জাতীয় ভাবব্যঞ্জনাও তদ্রূপ।

প্রাচীন বয়সের এই একটা সুবিধা আছে যে, যথাকালের যথোচিত কৃত্যগুলি সমাধা হয়ে থাকলে মানুষকে ক্রমেই সে মুক্তি দেয় সকল দায়িত্ব থেকে, 'বিষয়' চিন্তা বা দুশ্চিন্তা থেকে। এটি স্বভাবতই বৈরাগ্যের কাল আর ব্যাপ্ত অনুরাগের কালও বটে। প্রায় নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ। তেমনি স্থির অনুরাগ থেকে, সর্বব্যাপিনী 'জীবভূতাসনাতনী' প্রকৃতি-পূজার নিষ্ঠা থেকে, নন্দলাল আজ বর্ষাধিক কাল যে ছবিগুলি আঁকছেন তার বিষয়বৈচিত্র্য আছে অনেক, প্রকরণের ভিন্নতা ঘটেছে মাঝে মাঝে, অথচ মতি বা মনোভঙ্গির অভিন্ন একটি বিশেষত্ব প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়। এ কথাও বলাই বাহুল্য যে, এই অজস্র চিত্রকৃতির ভিতর থেকে আটখানি বা ন'খানি ছবি বেছে নেওয়া চলে কেবল চোখ বুজে—চোখ চেয়ে প্রায় দিশেহারা হতে হয় দিকে দিকে চেনা-অচেনার হাতছানিতে। চেনার অন্তরেই ছিল অচেনা।

প্রাচ্য ছবি সহজেই হয় স্মৃতি থেকে, কল্পনা থেকে। নন্দলাল বলেন, সুজাতার ছবি করেছিলেন একাসনে

বসে। গুরু অবনীন্দ্রনাথ বেহারে দেখেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় খোলার ঘর থেকে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে, পিতলের বোক্‌নোয় দুগ্ধধারের শব্দ—তাঁর বলার গুণেই শিষ্যের মনে ছবি ফুটে উঠেছিল। তেমনি মুঙ্গেরে কাট্‌নির জঙ্গলে, দূরে কোথাও বাছুরের হাম্বারব আর গাইয়ের হামলানো তা থেকেই ছবি হয়েছে উৎকণ্ঠিতা পয়স্বিনী গাভীর। শিল্পী উপস্থিত যে ছবিগুলি আঁকছেন সেগুলিও স্মৃতিচিত্র বলা যায়, তবে সে স্মৃতি বহু দূরের স্মৃতি, যেন বা আর এক জগতের আর এক জন্মের। কবে কাছারির বাড়ির দুয়োরে বাঁধা ছিল ধূমল পাহাড়ের মতো বিশাল রাজহস্তী, কবে দেখেছিলেন ইলামবাজারের খোড়ো ঘরে ঘোর-ঘোর অন্ধকারে আর প্রদীপের আলোর নিরিবিলি বসে পান সাজছে একটি বউ, স্বাধীন সচ্ছন্দ ময়ূর চড়ে বেড়াচ্ছে বনে পাহাড়ে, ভাগীরথীর পরিচিত বাঁকে অতিপরিচিত এক স্টিমার-ঘাটে, জটা-পাকনো বুড়ো বটের তলায় জলসত্রে আসীন আদ্যিকালের এক বুড়ো— দেশ বিদেশের পথ ঘাট, গাছপালা, মানুষ পশু, পাহাড় বন, নদী সায়র সমুদ্র—মনের নয়নে একের পর আর এক ভেসে ওঠে—কিছুই লুপ্ত হয়নি, তবে সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত হয়েছে সে তো সত্যই আর সেই তার বিশেষ সার্থকতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, শিল্পীর মনের একটি দূরাপসরণ, মানসিকতায় ঈষৎ একটি পরিণতি বা পরিবর্তন, এজন্যই তাঁর চিত্রের অচ্ছিন্ন ধারাতেও নতুন রূপগুণ, নতুন লক্ষণ ফুটে উঠেছে—শারীরিক অস্বাস্থ্য বা দুর্বলতা এর মূল কারণ নয়। প্রকরণের দিক দিয়ে এই পরিবর্তন দেখছি যে, মৌলিক[২] রূপ, আর অনেক সময় মৌলিক রূপও নয়—মৌলিক ভাব, সেইটি ফুটিয়ে তোলার দিকেই শিল্পীর যা কিছু অভিনিবেশ। রসের দিক দিয়ে প্রায় সব ছবিতেই দেখি একটি শান্তি, স্থিতি, বিরতি, দূরত্ব এবং 'পরত্ব' অর্থাৎ এক প্রকার বস্তুতন্ত্র নৈর্বক্তিকতা। যেন আর-এক জগতের আর-এক জন্মের সব দেখা। আমরা বা তোমরা বা বিশেষ করে মানুষের বসবাসের জগৎ যেন নয়, পরন্তু 'ঈশাবাস্য'—সর্বগত ঈশ্বরের আবাস। এক ভাবে বলা যায়—যা স্থূল তাই সূক্ষ্মে, যা বিশেষ তাই নির্বিশেষে, যা আকার তাই নিরাকারে মগ্ন এবং বিধৃত। এ হয়তো দেশে দেশে আর যুগে যুগে উৎকৃষ্ট চিত্রের অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে একই কাল এমন প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় আর কখনও প্রকটিত হয়নি। নিকট কখনত্ত এমন দূরে বিলীন হয়নি। দূর শব্দেই কী মায়ামন্ত্র আছে জানিনে। সেই দূরে শোনা যায় অশ্রুত কুহুরব—

breaking the silence of the seas
among the farthest Hebrides.

ভূগোল বিবরণে যদিও কোনও ঠিকানা পাইনে। সেই দূরে নাইটিঙ্গেলের গানে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সিন্ধুহৃদয়ে চকিতে ঝরোখা খুলে যায় পরিলোকের। সেই দূর দূরান্তরের আকাশই অলক্ষ্যে শিউরে ওঠে সহসা অনাহত অশ্রুতগভীর এই মন্ত্ররবে—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!

অথচ এই 'দূর' আমাদের কবিকে যদি আকুল করে থাকে, যে কবি আশৈশব 'সুদূরের পিয়াসী', শিল্পীকে করেছে শান্ত, বিবিক্ত, স্থিতধী।

ছবি যখন কবিতার ছত্র স্বতঃই মনে এনে দিল এখানে আরও এইটুকু বলা দরকার—কবি ওয়ার্ড সওয়ার্থের মনে দূরের ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিয়েছে অতি নিকটের অতিসাধারণ একটি দৃশ্য; কীট্‌সের স্বপ্নচারী বিমুগ্ধহৃদয়ও যুগে-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে ফিরেছে একান্ত কাছের শ্যামান্ধকারে প্রচ্ছন্ন সুধাবর্ষী এক বিহগকণ্ঠস্বরে; আর কবি রবীন্দ্রনাথের দূরতম প্রয়াণের সূত্রও কিছু দূরে নয়। অর্থাৎ, দিব্য ভাবে ভাবিত কবি ও শিল্পীর নয়নে মনে নিকটই দূরের আবির্ভাবে পরমাশ্চর্যের আধার হয়ে ওঠে, পরিচিতই হয়ে ওঠে সকল পরিচয়ের অতীত। বস্তুত শিল্পী নন্দলালের এই ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতার পরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি এক শরৎসন্ধ্যায় ধান-ক্ষেতের শান্ত শিহরিত শ্যামলতার পরপারে বেণুবনে প্রচ্ছন্ন সাঁওতাল পল্লীটি, আবছা ধূমলেখা উঠছে অথবা অকালমেঘ শুভ্র ফেনায় উপ্‌চে পড়েছে দিগ্‌বলয়ের কোলে[৩]— চেয়ে দেখেছি ফাল্গুনের কোনও সোনালি বিকালবেলায় চিকন-কচি পাতায় পুলকিত অশ্বত্থ দেবদারু আর

জামরুল আম নারিকেল সুপারির জটলা—কিছুই মনে হয়নি নিঃশেষিত অথবা পুরাতন-পরিচিতি বলে। বরং মনে হয়েছে, যেখানে যা দেখছি সবই কোন অরূপ বা অপরূপ লোকের সীমান্তরক্ষী যেন, বক্ষে ও বাহুতে তক্‌মা-তাবিজে নানা অদৃশ্য অক্ষর—গাছ নয়, মানুষ নয়, পশু নয়—অরণ্য অথবা পর্বত, নদী অথবা সমুদ্র নয়—আমি বা তুমি নয়—সে-সবই বিচিত্র ছদ্মবেশ মাত্র। বুঝে না-বুঝে মন কেমন উদাস হয়ে গেছে। অনির্দেশ্য বিধুর এই ঔদাস্যের অপূর্ব রূপ দেখেছি কবির 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। যেতে নাহি দিব? তবু তো যেতে দিতেই হয়। সবই তবু চলে যায়—

কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।

শান্ত মুখশ্রী। নিষ্পলক চাহনি! একি নন্দলালেরই শিল্পীমানসের এক নিখুঁত ছবি নয় আজ—এক অপূর্ব প্রতিমা?[৪]

সূ ত্র নি র্দে শ :

১। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

২। ইংরেজিতে বলা যায় : essential as opposed to accidental and superficial.

৩। বেলা তিনটা। মাস্টারমশাইয়ের দক্ষিণের বারান্দা। শান্তিনিকেতনের সীমানার পরে দক্ষিণে প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত শান্তনিথর সবুজ ধানক্ষেত— শান্ত অথচ লক্ষ লক্ষ বর্শাফলার মতো পাতায় পাতায় আর শিষে শিষে শিউরে রয়েছে। আলোক উদ্ভাসিত। আকাশে বেকার মেঘ, তারই এক ফালি ছায়া এদিক থেকে ওদিক সমস্ত আলোকে-ক্ষেত্রটিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। ডান দিকে সাঁওতালি গ্রাম প্রচ্ছন্ন আছে দূরবর্তী বাঁশবাগানের শ্যামান্ধকারে, তার সম্মুখভূমিতে একটি মাত্র একচালা ঘর দেখা যায়—মাঠের মধ্যে দূরে দূরে বিদ্যুৎবাহী তারের দু-একটা দীর্ঘাকায় খুঁটি। প্রচুর আকাশ। অলস নিস্তব্ধ বেলা। পাখ-পাখালির ডাক মনোযোগ না দিলে শোনাই যায় না। আকাশে অলস ভ্রাম্যমান মেঘ। এই সবুজ, শ্যাম, পাণ্ডুর, ধূসর, শুভ্র*—ধানে-ভরা মাঠ, বনলেখা, একটি কুটীর, অনেকটা আকাশ— এই হল মাস্টারমশাইয়ের এখনকার significant ছবি, বিশেষ ছবি। প্রকৃতি। প্রকৃতির আশ্রিত জীবন কিভাবে আছে? গভীর জলের মধ্যে যেমন মাছ—একটি মাছ নয়, মাছের ঝাঁক—যেন তাদের গমনাগমনের চঞ্চলতামাত্র নেই, যেন একটিও ঢেউ উঠছে না। —দিনলিপি। ১৬ অক্টোবর ১৯৫৯

৪। প্রবন্ধ শেষে এই কথাটি বলবার আছে যে, আলোচ্য চিত্রাবলীর সম্যক পরিচয় পেতে হলে সেগুলি স্বচক্ষে দেখা দরকার। 'বড়ো কঠিন সাধনা যার বড়ো সহজ সুর'—কথাটি প্রতিচিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সার্থক হয়েছে। সাবলীল তুলির টান-টোন, প্রতিরূপগ্রহণের প্রকরণগত দুরূহতায়, একটির ধার হয়ে গিয়েছে ভোঁতা আর অন্যটির ক্রমবিন্যস্ত স্তরগুলি সর্বত্র যথাযথ ফুটে ওঠেনি, বা মোলায়েম হয়নি (যেখানে যেখানে তুলি আদপে কাগজ ছোঁয়নি সেখানেও একটা সূক্ষ্ম ছোপ ধরে গিয়েছে)—ফলত মূলে যে টোনের লীলাবৈচিত্র্য অভিজাত ধ্রুপদ সঙ্গিতের মতো, তার মীড় মূর্চ্ছনার বহু অপরূপতা নষ্ট হয়েছে। আরও সহজগ্রাহ্য উপমায় বলা চলে যে, টাটকা ভাজা মুড়ির মুচমুচে ভাবটা নেই, প্রতিরূপ হয়ে পড়েছে ঈষৎ মিয়ানো মুড়ির মতো। কাজেই মূলের সঙ্গে পরিচয় না হওয়া অবধি, জানতে হবে, এ ছবিগুলির পরিচয় পুরো হল না।

' ডায়রির লেখায় এটুকু যোগ করা চলে; রংগুলি প্রায় সব সময় টোনে, অর্থাৎ সাদা-কালোর বিচিত্র পর্দায়, অনূদিত হয়েছে, ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৯)

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যামলেট : এক নয়, বহু

যুগভেদে লোকচৈতন্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই লোকচিন্তায় হ্যামলেট-মূর্তির তাৎপর্যের রূপান্তরের দীর্ঘ ইতিহাস হয়তো কোনওদিন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হতে পারে। আপাতত যোগ্যতা, স্থান ও কালের প্রতিকূলতায় সে প্রয়াসে স্পর্ধা হয় না। চিন্তার ইতিহাসের পটভূমিকায় শেক্‌স্‌পীয়রের এই কালজয়ী নায়কের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ইমেজ আরেকবার তুলে ধরে এই চরিত্রের তাৎপর্যের অনন্ত গভীরতার আভাস দেবার সাধেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে-হেতু এই নায়ক দুর্বোধ্য, যেহেতু এই নায়ক সহজ সাবেকি ক্যাটেগরি-র ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে না, সেইহেতু শেক্‌স্‌পীয়রের নাটককেই বাতিল করে দিয়ে একদা যিনি নিজে মানসিক শান্তি চেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধশিক্ষিত অপরিণতবয়সিদের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ কুড়িয়েছিলেন, আজ বার্ধক্যে তিনি অনুতপ্ত, সেদিনের অপরিণত মানসিকতা স্বীকারেও কুণ্ঠিত নন (*এলিজাবেথান ড্রামাটিস্টস* গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ ১৯৬২ সালের জুনে রচিত এলিয়টের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। [মনে পড়ে, ম্যালভোলিয়ো বলেছিলেন, 'বার্ধক্যের স্থবিরতা প্রাজ্ঞকে দুর্বল করে, কিন্তু মুর্খকে সুবুদ্ধি দেয়!'] প্রত্যেক পাঠকের কাছে যদি হ্যামলেটের অর্থ স্বতন্ত্র হয়, তাতে নাট্যকারের দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না, বরং চরিত্রের জটিলতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সাহিত্যে এই জটিলতাই সদা কাম্য। একটি চরিত্রের মধ্যে এই অনেকগুলি চরিত্রই সত্য হতে পারে, যে কোনও একটি ব্যাখ্যা গ্রহণে আপত্তি নেই; কিন্তু এই তাবৎ তাৎপর্যের অস্তিত্বের চেতনাতেই বোধ হয় হ্যামলেট সবচেয়ে মূল্যবহ হয়ে উঠতে পারে। নয়তো একটি কম্পোজিট ইমেজ রচনার চেষ্টা করা যেতে পারে, এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরেও সেই চেষ্টা থাকবে।

১. সপ্তদশ শতক।

সপ্তদশ শতকের চেতনায় হ্যামলেট অভিনীত নাটকের নায়ক। কেবলমাত্র (বা প্রধানত) মঞ্চেই তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের ঘটনাবলি ও বিচ্ছিন্ন উক্তি বা চিত্রকল্পের ছায়া সমকালীন নাটকে বা লেখায় বারবার ধরা পড়ে। নাটক বা চরিত্রের জনপ্রিয়তার এই রাশি রাশি প্রমাণের মধ্যে উত্তরকালের দার্শনিক বা চিন্তাশীল হ্যামলেটকে তেমন পাওয়া যায় না। বরং এই কালের চলতি ধারণার সঙ্গেই হ্যামলেটের যোগাযোগ দেখা যায়।

সমকালীনদের কাছে হ্যামলেট প্রতিশোধাত্মক নাটকের পুরানো ঐতিহ্যের সঙ্গেই যুক্ত। ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহার বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের অনুশাসন এবং লোকচেতনায় মধ্যযুগীয় পৃথিবীর উত্তরাধিকারস্বরূপ এই স্পৃহার বাস্তব উপস্থিতি, সম্ভবত এই দুয়ের সংঘাতেই নাটকের যে ধারা শুরু হয়েছিল, *হ্যামলেট*-এর আদিভাষ্য সেই ধারারই অন্তর্গত। অথচ ১৬০২ সাল নাগাদ এই ধারার প্রতিষ্ঠিত গঠন ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ট্যুর্নিয়র, ওয়েবস্টার, চ্যাপম্যান এবং বোমন্ট ও ফ্লেচারের নাটকে সেই আদি সংঘাত আবার এসে দেখা দিচ্ছে। হায়রেনিমোর মতে এই স্পৃহাকে মেনে নিয়ে কেবলমাত্র সুযোগ সন্ধানেই কালক্ষেপ আর সম্ভব নয়। 'এথেইস্টস ট্রাজেডি'-তে (ট্যুর্নিয়র) দ্বিতীয় অঙ্কে মৃতের বিদেহী আত্মা পুত্র শার্লেমন্টকে সতর্ক করে দেয় : 'ধৈর্যে অপেক্ষা কর; দেখ ঘটনা কী মোড় ফেরে। রাজাদেরও যিনি রাজা, প্রতিশোধের ভার তাঁরই হাতে ছেড়ে দাও।' শেষ অঙ্কে শার্লেমন্ট এই উপদেশের যাথার্থ্য স্বীকার করে। দ্বিতীয় কোয়ার্টোর বছরেই শেক্‌স্‌পীয়রের সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত

মার্স্টনের *দি ম্যালকন্টেন্ট* নাটকে ম্যালেভোলি (অর্থাৎ ছদ্মবেশী আন্টোফ্রন্টো) মেন্ডোজাকে শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করে। সমকালীনদের চোখে হ্যামলেট-পিতার নির্দেশের ভারে পর্যুদস্ত হ্যামলেটের মানসিক সংকট দুর্বোধ্য মনে হয়নি। সমকালীন উল্লেখগুলি বিচার করলে, প্রতিশোধ, মৃতপিতার আবির্ভাব এবং নায়কের ভূমিকা একই পরিস্থিতির অন্তর্গত, এই বোধের প্রমাণ মেলে। হ্যামলেটের চরিত্রে জটিলতার যোগ ঘটিয়ে শেক্সপীয়র প্রতিশোধাত্মক নাটকের ঐতিহ্যের নতুন পর্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেও লোকচিন্তায় কিডের 'উর-হ্যামলেট'-এর প্রতিশোধের স্বয়ম্ভু শক্তির মায়া তখনও কাটেনি; এবং সেই একই ধারণা শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ১৬৩০ অবধি যাবতীয় উল্লেখেই এই সাবেকি ধারণার ছায়া। ১৬৮২, ১৬৯৮, ও ১৭০০ সালে যে তিনটি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে ইঁদুরের কলের সাফল্যে উৎফুল্ল হ্যামলেটের বাণীর স্মৃতিবহ — অর্থাৎ সরলতম প্রতিশোধাত্মক পরিস্থিতির পরিমণ্ডল ছেড়ে শেক্সপীয়রীয় ভাষ্যের বৈশিষ্ট্যে এবার দৃষ্টি পড়ছে [১]।

প্রতিশোধ সংকল্পবদ্ধ নায়কের চরিত্রের সঙ্গে পরম্পরাগতভাবে যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিও হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যায়। হায়েরেনিমোর মতো হ্যামলেটও পাগল সাজে, ম্যালেভোলির মতো 'ম্যালকন্টেন্ট' টাইপের গুণসম্পৃক্ত। হ্যামলেটের ব্যঙ্গাত্মক, তিক্ত, নিষ্ঠুর যেন দায়িত্বহীন, ও সময়ে সময়ে অশ্লীল উক্তি এই ম্যালকন্টেন্ট টাইপেরই বিশিষ্ট বাচনরীতির অঙ্গ। স্পষ্টভাষণের যে তিক্ততায় হ্যামলেট পোলনিয়াস্কে আঘাত করে, মার্স্টনের ম্যালেভোলি সেই একই রীতিতে পিয়েট্রোকে আক্রমণ করে [২]। রাজসভার চাটুক্তি ও অবিশ্বাসিনী নারীকুলের প্রতি বিদ্বেষ এবং 'মেমেন্টো মোরি'র গুরুভারে উভয়ের চিন্তাই কলুষিত। নবজাগৃতির কালের নতুন মানবিক চেতনা ও মধ্যযুগীয় গির্জার গোঁড়া শিক্ষার টানাপোড়েনেই বোধ হয় এই অতৃপ্ত ম্যালকন্টেন্ট টাইপের উদয়। নবজাগ্রত মানবিকবাদের স্বাধীন আত্মজিজ্ঞাসার পরিণতিস্বরূপ মানুষের জ্ঞান ও শক্তির সীমিত পরিধির চেতনা এসে পড়ে। তাই যে হ্যামলেট মৃত্যু ও সর্বব্যাপী পাপের চিন্তায় বিভোর ; সেই হ্যামলেটই প্রায় উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ হয়ে বলে : 'মানুষ, সে কী আশ্চর্য রচনা'। [৩] বিশ্বলোক দর্শনে এই দুই চিত্রের বিরোধেই ম্যালকন্টেন্টের মানসিকতায় বিহ্বলতা তথা তীব্র অসহায় ক্রোধ। ডেকারের "দি অনেস্ট হেবার", জন রেনল্ডস-এর কবিতায়, এবং

ট্যুর্নিয়রের *দি রিভেঞ্জার্স ট্র্যাজেডি* ও *দি এথেইস্ট্স ট্র্যাজেডি*-তে করোটি হাতে মৃত্যুচিন্তার নিদর্শন ম্যালকন্টেন্ট হ্যামলেটের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ স্বরূপ।

সমকালীন ধারণায়, ম্যালকন্টেট টাইপের মধ্যেই পাগলামির ক্ষীণ রেশ থাকে। পোলনিয়স ও গার্ট্রুডের প্রথম ব্যাখ্যায় (প্রেমের কারণে কিংবা পিতার মৃত্যু ও মাতার সহসা বিবাহের কারণে) হ্যামলেট বিকৃতমস্তিষ্ক; ওফেলিয়ারও সেই ধারণা।[৪] ডেনমার্কের সাধারণ মানুষদের মতোই [৫] এলিজাবেথীয় দর্শক সমাজও হ্যামলেটের মধ্যে ম্যালকন্টেন্টের স্বভাবজ পাগলামি দেখতে পান! হ্যামলেট সময়ে সময়ে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র প্রকাশ করে, তাতে এই ধারণা আহত হয় না, কারণ ম্যালকন্টেন্টের পাগলামি ঠিক ব্যাধি নয়, বরং নিউরোসিস বা তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা ও বুদ্ধিলোপের সীমান্তরেখায় অবস্থিত। ১৬০৪ সালে অ্যান্টনি স্কলোকরের 'ডাইফ্যান্টাস ইন লাভ' কবিতায় প্রেমে পাগল নায়কের চিত্রে হ্যামলেটের স্মৃতি আসে। ১৬১৮ সালে রিচার্ড বারবেজের মৃত্যুতে রচিত এক কবিতায়, ডেকারের *দি ডেড্ টার্ম* ও *ল্যানর্থন অ্যান্ড ক্যান্ডল্ লাইট*, চ্যাপম্যান, জনসন ও মারস্টনের *ইস্ট ওয়ার্ড হো* নাটকে এই একই চিত্র পাওয়া যায়! কখনও কখনও এই হ্যামলেটীয় প্রেমিক আতিশয্যহেতু হাস্যকর হয়ে ওঠে। এই পাগলামির সুচতুর চালেই হ্যামলেট প্রতিপক্ষকে পারস্ত করে, তাই দর্শকও হ্যামলেটের সফলতার অংশীদার হয়ে এই পাগলামিতে সহানুভূতির হাসি হাসে।

এই শতাব্দীর চিন্তার আরও একটি প্রদেশে হ্যামলেটের স্থান আছে। মানব চরিত্রে বিষাদের ভূমিকা সম্পর্কে এলিজাবেথীয় সমাজের ভাবনা রীতিমতো জটিল স্তরে পৌঁছেছিল। মানবদেহের মাইক্রোকস্‌মসে

চারটি হিউমরের মধ্যে বিষাদ অন্যতম (বিষাদ যেহেতু ক্ষিতির সঙ্গে যুক্ত, সেইহেতুই বোধ হয় মানুষের পার্থিব জীবনে প্রায় অনিবার্য)। বিষাদের প্রাবল্যে মানুষ বিষণ্ণ, তিক্ত অসংসৃষ্ট ও কুটিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থারই নাম স্বাভাবিক বিষাদ। অস্বাভাবিক বিষাদ বা দগ্ধ বিষাদের[৬] উৎস অন্যরূপ। যে কোনও হিউমার অত্যধিক উত্তেজনায় আপনাকে দহন করলে এই বিষাদের জন্ম হয়। স্যার টমাস এলিয়ট বলেন, 'সর্বশ্রেণীর দগ্ধ বিষাদই মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করে।'[৭] টিমথি ব্রাইটের 'ট্রিটিজ অভ মেলাংকলি' গ্রন্থে [৮] এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 'অস্বাভাবিক বিষাদ মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তি ও কর্মের ইচ্ছাকে ধ্বংস করে'; বিষণ্ণ ব্যক্তি 'প্রথমেই সন্দিহান হয়, দীর্ঘকাল চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সন্দিগ্ধচিত্ত থাকে, অধ্যয়ন ও চিন্তায় গভীরভাবে প্রবেশ করে', বিষণ্ণজনের এই হিউমর 'তাদের মধ্যে কর্মে অবহেলা, এবং অধ্যবসায়ের স্থলে দিগ্‌ভ্রষ্ট চঞ্চলতা এনে দেয় : কর্মে তাদের অনীহা বস্তুলোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনেই তাদের আনন্দ; আবেগের তীব্রতায় তারা সহজে ধরা পড়ে না, অথচ ধরা পড়লে চরমবিন্দু অবধি চলে যায়; 'বিষাদের অন্ধকারে চন্দ্রসূর্য ঢাকা পড়ে, ... তাবৎ গ্রহ নক্ষত্র ...অন্ধকারে হারিয়ে যায়, কালো কুয়াশায় রাহুগ্রস্ত হয়"; এই বিষণ্ণ হিউমরে কল্পনার মানসচক্ষে বীভৎস সব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়, সাধারণ বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি আহত হয়, নিজের বাসস্থানও বন্দীশালা মনে হয়; কিয়ৎকালের জন্য যাবতীয় গুরুত্বসহ বিষয় লঘু ও হাস্যকর বোধ হয়; দুঃখেও নাচগান আসে।[৯] হ্যামলেটকে এমনি এক বিষণ্ণ চরিত্ররূপে চিনতে এলিজাবেথীয় দর্শকের কষ্ট হত না।

২. অষ্টাদশ শতক।

অষ্টাদশ শতকের চিন্তায়, হ্যামলেটের চরিত্র অন্তত প্রথমে বেটারটন ও গ্যারিকের অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের অভিনেতারা ও নাট্যরসিকেরা হ্যামলেটের বহুরূপীসম ভাব-পরিবর্তনে মুগ্ধ হন। শিল্পমাত্রই যে যুগে মহতী সেন্টিমেন্টের ধারক, সে যুগে সেন্টিমেন্টের রাজ্যে হ্যামলেটের মুক্তপক্ষ বিচরণই যে সবচেয়ে মূল্যবহ মনে হবে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। অ্যারন হিল্‌ 'দি প্রম্পটার' পত্রিকায় নালিশ করেন — উইল্‌কসের অভিনয়ে হ্যামলেটের 'উচ্ছল' দিককে পাওয়া যায়, বুথের অভিনয়ে তার 'গম্ভীর' দিক — অর্থাৎ 'অর্ধমাত্র রাজপুত্র হ্যামলেট'। হ্যামলেটের চরিত্র ব্যাখ্যায় হিল লক্ষ করেন : 'আত্মনিমগ্ন, অথচ সৌজন্য স্নিগ্ধ মানবতা; স্বভাবত বিষাদ মগ্ন, কিন্তু ভদ্র শিক্ষার প্রসাদে তাঁর মনের অন্ধকার দীপ্ত হয়ে উঠেছে; বৃষ্টিধৌত মে মাসের সকালের মতো তাঁর বিষাদ আলোকস্নাত; দুঃখে তিনি ক্লিষ্ট নন, ছেলেখেলাতেও লঘু নন; একাকিত্বে গাম্ভীর্যে গভীর, জনসমক্ষে স্বেচ্ছায় পরিবর্তনশীল; যা চান তাই হতে পারেন ; কিন্তু যা হওয়া উচিত, তিনি কেবল তা-ই—নিহত পিতার শোকে সন্তপ্ত, মাতার লঘুতায় ক্ষুব্ধ, খুল্লতাতের হীনতায় রুষ্ট।' অভিনয়ে এই বিচিত্ররূপক্ষম চরিত্র রচনাই বেটারটন ও গ্যারিকের কৃতিত্ব।

গ্যারিকের অভিনয়ে পূর্ব শতাব্দীর হ্যামলেটের রুক্ষতা কেটে যায়। হ্যামলেটের বিষাদ এবার দার্শনিকের তন্ময় চিন্তা হয়ে উঠেছে। তার মৃত্যু চিন্তাও সমকালীন কবিতার ক্ষীণপ্রাণ স্টাইলাইজড মৃত্যুচিন্তারই অনুরূপ। 'পিতৃভক্তি' ও সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভয়, এই দুই অনুভূতিই গ্যারিকের হ্যামলেটের বিষাদের উৎস। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী টম ডেভিসের সাক্ষ্যে জানা যায়, 'গ্যারিক আশ্চর্য প্রয়াসে আবেগের স্পর্শে সেন্টিমেন্টের বিপুল ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেন।' প্রত্যেকটি অনুভূতিকে বিচ্ছিন্নভাবে মুখজ ও দেহজ অভিনয়ে পুনঃসৃষ্টি করার দুর্লভ নিষ্ঠা গ্যারিকের ছিল বলে মনে হয়। এই অনুভূতিপ্রবণ রাজপুত্রকে রচনা করে তার উপর 'ডেকোরাম'-এর ঔচিত্যবোধ চাপিয়ে দিতে গ্যারিক কুণ্ঠাবোধ করেননি। ব্যক্তিগত পত্রে গ্যারিক লেখেন,

'আমি হ্যামলেট প্রযোজনা কালে পরিবর্তনের স্পর্ধা দেখিয়েছি। জীবনে এমন অপরিণামদর্শী কাজ আর করিনি; কিন্তু আমি তার আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, পঞ্চম অঙ্কের জঞ্জাল থেকে এই মহৎ নাটককে মুক্ত না করে মঞ্চ থেকে আমার মুক্তি নেই। গ্রে ভডিগারের চতুরালি ও ফেন্‌সিং ম্যাচ বর্জন

করে আমি এই নাটক নামিয়েছি। আমার এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত জনসমর্থনও লাভ করেছে।'[১০]

মঞ্চের বাইরের চিন্তাতেও আরও পরিচ্ছন্ন, আরও সংস্কৃত এক হ্যামলেটকে রচনা করা হয়। আর্ল অফ শাফ্ট্স্বেরির বিচারে, হ্যামলেট 'গভীর চিন্তার' প্রবক্তামাত্র। নিকোলাস রো দেখান হ্যামলেট অরেস্টিসের চেয়ে মানবিক। স্বভাবতই মানবিক মহিমায় মহিমান্বিত যে হ্যামলেট-মূর্তি রচিত হয়, লিউইস টেবল্ড তাতে হ্যামলেটের অশ্লীলতা ও অসৌজন্যকে ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর পরে হান্‌মার ও ডক্টর জনসনও হ্যামলেটের 'নিষ্ঠুরতায়' আহত হন। এই যুগের হ্যামলেট-চিন্তার স্পষ্টতম চিত্র আছে স্যার টমাস হ্যানমারের রচনা বলে কথিত একটি প্রবন্ধে। হাউস অফ কমন্‌স-এর স্পিকার হ্যানমারের কাছে হ্যামলেটের 'বীরোচিত চরিত্র', 'পিতৃভক্তি' ও 'গুণান্বিত মানসিকতা'-র সঙ্গে তার পৌনঃপুনিক লঘুচিত্ততা, পাগলামি, অভদ্রতা, ওফেলিয়ার সঙ্গে কথায় অশ্লীলতা এবং প্রার্থনারত রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতা কিছুতেই খাপ খায় না।

নাটকের সাক্ষ্য প্রমাণের ঊর্ধ্বে হ্যামলেটের মহত্বকে স্থাপন করার এই ব্যাপক চেষ্টার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৭৪৭ সালে হ্যামলেটকে 'এভ্‌রিম্যান' বলে প্রমাণ করে দেন, অর্থাৎ কার্যত হ্যামলেটের 'বীরোচিত' চরিত্র সাধারণতম দিনানুদৈনিক জীবনের একটি সাধারণ মানবচরিত্র বলে প্রতিপন্ন হয়। 'হ্যামলেটে দেখি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান একটি যুবক, সংকল্প স্থির করেও সে তার সন্দেহ-দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার চরিত্রে এমন কিছুই নেই যা মানবজাতির মধ্যে অহরহ মেলে না।' গাথ্‌রির বিচারে, হ্যামলেটের সংকট যে কোনও সাধারণ শিক্ষিত যুবকের সংকট।

১৭৭৬ সালে গ্যারিক মঞ্চ থেকে বিদায় নেন, ওই সঙ্গেই শেক্‌সপীয়রীয় অভিনয়ের একটি বিরাট যুগের অবসান হয়। জর্জিয়ান থিয়েটারের অবসানের মধ্যেই শেক্‌সপীয়রের নাটক মঞ্চের সীমা পেরিয়ে সমালোচকদের এক্তিয়ারের মধ্যে এসে পড়ে। অভিনেতাদের অভিনয়ে রচিত হ্যামলেট-মূর্তির আভাস ক্রমশই ঝাপসা হতে থাকে, এবং হ্যামলেট-চিন্তা নতুন খাতে বইতে থাকে। ১৭৭০ সালে ফ্রান্‌সিস্‌ জেন্টলম্যান এবং ১৭৭২-এ ডক্টর জেম্‌স বিটি হ্যামলেটের চরিত্রের জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধী অনুভূতির টানাপোড়েন সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠেন। হ্যামলেটের চরিত্র ব্যাখ্যার এই নতুন ধারার প্রথম কীর্তি উইলিয়ম রিচার্ডসনের প্রবন্ধে (১৭৭৪) হ্যামলেটের মানসিকতার ব্যাখ্যা। রিচার্ডসন বলেন, 'একটি প্রোথিত অনুভূতিকে উচ্ছেদ করে প্রেমের স্থলে ঘৃণাকে এমনকি উদাসীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মানব-প্রকৃতি বিপর্যস্ত হয়। ... হ্যামলেটের দশাও অনুরূপ। নৈতিক সৌন্দর্য ও বিকৃতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন হ্যামলেট গুরুজনের মধ্যে বিচ্যুতি লক্ষ করেন।... ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ অপরাধীকে শাস্তি দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই বিক্ষোভ যখন নৈতিক বোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার প্রকৃতি ও ধারা ভিন্ন হ'তে বাধ্য। অনুভূতির প্রথম ধাক্কায় হয়তো তীব্র ও ত্বরিত প্রতিশোধের স্পৃহা আসে। কিন্তু ঔচিত্যানৌচিত্যবোধ এবং বিচারশক্তি এই সহিংস তীব্রতাকে খর্ব করে। সংঘর্ষলিপ্ত বলিষ্ঠ নীতিসমূহের সংঘাতে বিপর্যস্ত চিন্তাশীল মন তাই অনিশ্চিত ও দোলাচলচিত্তবোধ হয়।' রিচার্ডসন হ্যামলেটের চরিত্রে 'আত্মপ্রতারণা'র ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন। প্রার্থনারত ক্লডিয়াস প্রসঙ্গে হ্যামলেটের তথাকথিত 'নিষ্ঠুরতা' এবং সময়ে সময়ে লঘুচিত্ততা ও পার্থিব জীবন সম্পর্কে অনীহা রিচার্ডসন 'আত্মপ্রতারণা' বলে ব্যাখ্যা করেন।[১১] হার্টলির অ্যাসোসিয়েশনিজম-এর ধারায় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিচারে হ্যামলেটের এই পুনর্মূল্যায়নে তার নাটকীয় চরিত্রের পরিবর্তে সামাজিক চরিত্র আরোপিত হল। টমাস রবার্টসন ও হেনরি ম্যাকেঞ্জি রিচার্ডসনের ব্যাখ্যায় মূল ধারা অনুসরণ করেন। 'পাপপুণ্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা,' 'অপার প্রাণময় কল্পনাশক্তি' এবং 'জ্ঞানের পরিবর্তে স্বজ্ঞা,' আসন্ন রোম্যান্টিক জীবনধর্মের পূর্বাভাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে নব হ্যামলেট মূর্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ডিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্টারে' গ্যায়টের হ্যামলেট-বিচারও এই একই মৌলিক মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'বীরোচিত' হ্যামলেটকে গ্যয়টে সম্পূর্ণ বর্জন করেন — তিনি হ্যামলেটকে দেখেন 'সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, মহান, নীতিনিষ্ঠ

চরিত্র, অথচ বীর হয়ে উঠবার মতো স্নায়বিক শক্তি নেই — দুঃসহ অথচ অনিবার্য ভারের চাপে সে হারিয়ে যায়; প্রতিটি দায়িত্বই তার আছে পবিত্র দায়ভার।' 'শেক্‌সপিয়র দেখালেন অক্ষম নায়কের উপর গুরুভার দায়িত্বের ভার।... এ যেন বহুমূল্যে পাত্রে রোপন করা ওক্ গাছ; যে পাত্রে কেবল ফুলের গুচ্ছই শোভা পায়, তাতে ওক গাছের শিকড় ছড়ানো; পাত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।'[১১] অভিজ্ঞতার নিষ্ঠুর রোষ ও পুষ্পপ্রতিম রোম্যান্টিক কবির সংঘাতজাত রোম্যান্টিক বিষাদ ও হ্যামলেটের বিষাদ এবার অভিন্ন হয়ে যায়। এই হ্যামলেটের প্রতি করুণা বোধ করা যায়, ধীরোচিত মর্যাদার সুযোগ থাকে না।

৩. রোমান্টিক পর্ব।

শেক্‌সপীয়রের হ্যামলেট রোমান্টিক পর্বে খুব সহজেই রোম্যান্টিক কবির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবনের আর্তি এবং সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব জীবনের যন্ত্রণা—নাইটিঙ্গেল হবার কামনা—এর সঙ্গে হ্যাটলেটের আত্মীয়তা আছে। একটি পত্রে কীট্‌স হ্যামলেটের সঙ্গে স্রষ্টা শেক্‌সপীয়রের আত্মীয়তা লক্ষ করেন, ফ্যানি ব্রনকে লেখা শেষ পত্রে (অগস্ট ১৮২০) লেখেন : 'আমারই মতো যন্ত্রণায় হামলেট ওফেলিয়াকে বলেছিল—নানারিতে যাও, যাও, যাও! আমিও সব কিছু এই মুহূর্তেই ছেড়ে দিতে চাই—আমি মরতে চাই। যে জান্তব পৃথিবীর সঙ্গে তুমি হাসছ, আমি সেই পৃথিবীকে দেখে অসুস্থ বোধ করি। আমি পুরুষকে ঘৃণা করি, নারীকে আরো বেশি।' হ্যামলেটের ব্যর্থতার সঙ্গেই কীট্‌সের যোগ। চার্লস ল্যাম 'সলজ্জ, উদাসীন, নিঃসঙ্গ হ্যামলেটের' যে চিত্র রচনা করেন, মঞ্চের বাস্তবতায় তার প্রাণহানি হবার আশঙ্কায় 'হ্যামলেট'-এর মঞ্চায়নের বিরুদ্ধেই মত রাখেন। 'হ্যামলেটের যা কিছু কর্ম, তার দশ ভাগের নয় ভাগ নিজের সঙ্গে নীতিবোধের মত-বিনিময়, তার নিঃসঙ্গ চিন্তার বাণীরূপ.. কেবল পাঠকের জন্যেই...।' 'চারশো লোকের ভিড়ে' অভিনেতা কেমন করে এই অন্তরঙ্গ চিন্তাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবেন? শেক্‌সপীয়রীয় হ্যামলেটের 'সী-চেঞ্জ' এই পর্বেই সম্পূর্ণ হল—মঞ্চ থেকে একেবারে ঘরের কোণে।

রোম্যান্টিক হ্যামলেটের স্পষ্টতম বিশ্লেষণ কোল্‌রিজের। হ্যামলেটের মনে চিন্তা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের সুসমঞ্জস্য সম্পর্ক ভেঙে কেবল চিন্তার প্রাধান্যহেতু তার স্বভাবজ কর্মপ্রেরণা ভেঙে পড়ে। হ্যামলেটের চিন্তা ও কল্পনা তার বাস্তব অনুভূতির চেয়ে অনেক জীবন্ত। হ্যামলেটের দৃষ্টিতে স্বভাবতই বস্তুলোকের ঘটনাদি ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে; মনের দর্শনে যা কিছু প্রতিফলিত হয়, কেবল তারই যা কিছু সারবত্তা। পৃথিবী থেকে এই দূরত্ব ও নিঃসঙ্গতা, এবং তার যন্ত্রণা রোম্যান্টিক কবিদের সকলেরই কাম্য। হের্ডার হ্যামলেটের মানসিকতাকে 'মেটাফিজিকাল' বলে বর্ণনা করেন, এবং উইটেনবার্গের শিক্ষার সঙ্গে এই মানসিকতার যোগসূত্র লক্ষ করেন।

তেঈনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও এই রোম্যান্টিক হ্যামলেটকেই দেখি : 'হ্যামলেটের কল্পনাশক্তি সুচিন্তিতভাবে কারও বক্ষে ছুরি বসাবার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় থেকে তাকে বঞ্চিত করে। অতর্কিত কোনও অনুভবের ইঙ্গিত মাত্রেই সে অমন একটা কাজ করতে পারে। হ্যামলেটের প্রয়োজন মুহূর্তের প্রেরণা : তাকে ভাবতে হয়, অ্যারাসের আড়ালে রাজা লুকিয়ে আছেন, নয় তো বিষপ্রয়োগে নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনে শত্রুকে তরবারির আয়ত্তে চাই। হ্যামলেট নিজে তার কর্মের নিয়ন্তা নয়, পরিস্থিতিই তাকে কর্মে টেনে আনে; সে হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে জানে না; হত্যাই যদি করতে হয়, তবে তাও অনুদ্যোগে। অত্যন্ত জীবন্ত কল্পনাশক্তি অসংখ্য কল্পচিত্র সৃষ্টি করে শক্তিকে ব্যাহত করে, অভিনিবেশের তন্ময়তা শক্তিকে গ্রাস করে! হ্যামলেটের মধ্যে দেখবেন কবির আত্মা, যে আত্মা স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ করতে জানে না, আপনার কল্পনায় রচিত অশরীরী সৃষ্টির মায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সেই কল্পলোককে এত স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে যে বাস্তবে নিজেকে স্থাপন করতে পারে না;

অদৃষ্টের ফেরে কবি না হায় সে হয়েছে রাজকুমার, আরও কুটিল অদৃষ্টের খেলায় তাকে হতে হল অপরাধের দণ্ডদাতা; প্রকৃতি যাকে প্রতিভার আধার করতে চেয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে উন্মাদনা ও দুঃখের অভিশাপে অভিশপ্ত করল। হ্যামলেট স্বয়ং শেক্সপীয়র...।'[১৩]

রোম্যান্টিক চেতনায় সুন্দরের সঙ্গে বীভৎস ও ভয়ংকরের যে যোগ স্বীকৃতি পায়, হ্যামলেটকে সেই ভয়ংকর সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করা যেতে পারে। নোভালিস থেকে জিদ অবধি অনেকেই আনন্দ ও যন্ত্রণার যে সম্পর্ক লক্ষ করেছেন, বোদল্যার 'হিম টু বিউটি'-তে সেই একই মেডুসা সৌন্দর্যকে যখন আরাধনা কনে, তখন হ্যামলেটের চিত্র বার বার মনে আসে। বোদল্যার প্রশ্ন তোলেন: সুন্দরের জন্ম কোথায়, অনন্ত স্বর্গধামে, না অতল পাতালে? তিনি বলেন: 'আসুরিক অথচ স্বর্গীয় তোমার চাহনিতে আশীবার্দ ও পাপ একই লগ্নে জন্ম নেয় তাই তুমি যেন সুরা।' বোদল্যার আবার বলেন:

> তুমি কি পাতালের অন্ধকার থেকে উদয় হও, না নক্ষত্রলোক থেকে নেমে আসো? অভিশপ্ত অদৃষ্ট কুকুরের মতো তোমার পায়ে পায়ে ঘোরে! তুমি নির্বিচারে বীজ বুনে যাও—আনন্দের অথবা বিষাদের। তোমার শক্তিকে এখানে সবই বশ, তুমি অধিপতি, অথচ কখনও জেরার জবাব দেবে না। সুন্দর, তুমি মৃতকুলকে মাড়িয়ে যাও, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে। বীভৎসা তোমার মায়াবী রত্ন; হত্যা তোমার সাধের খেলনা, তোমার উদ্ধত বুকের পরে সে-কী লাস্যে নাচে!'[১৪]

মর্ত্যলোক সম্পর্কে হ্যামলেটের তিক্ত ঘৃণা, অথচ মর্ত্য প্রেমেই সে-ঘৃণার উৎস; অজান্তে পোলনিয়াসকে হত্যা করে সে ওফেলিয়ার মৃত্যুর কারণ হয়; প্রতিশোধের মুহূর্তে হ্যামলেট পূর্ণতায় পৌঁছায়, কারণ এই মুহূর্তের অভিমুখেই সে পদে পদে এগিয়েছে, অথচ হ্যামলেটের এই একমাত্র কীর্তিতেও আনন্দ ও বিষাদ মিশে একাকার হয়ে যায়। রোম্যান্টিক রূপকল্পে বিরোধী শক্তিবর্গের সমাহার রচনার মধ্যে জীবনের জটিলতর তাৎপর্য সন্ধানের চেষ্টা আছে, এবং বিরোধী শক্তিবর্গের সম্মিলন সৃষ্টিই কোলরিজের 'এজেমপ্লান্টিক ইম্যাজিনেশন'-এর লক্ষ্য। এই সমন্বয়ের মধ্যে[১৫] রোম্যান্টিকের আদর্শলোকের অসীমকে ধরতে চান—সসীম পৃথিবীর সংঘাতকে পেরিয়ে কোনও বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে লোকান্তরে অসীমের স্বাক্ষর আছে। র‍্যাঁবোর 'ওফেলিয়া' কবিতায় সেই আভাস আছে, 'নদীর স্রোতের টানে তোমার মৃত্যু হল। নরওয়ের গিরিরাজি থেকে বাতাস এসে তোমার কানে কানে তিক্ত স্বাধীনতার কথা বলে গেল। ... প্রমত্ত সাগরের কণ্ঠস্বর, প্রচণ্ড গর্জন, তোমার শিশু হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে গেল—যে হৃদয় কোমল, একান্তভাবেই মানুষের। এপ্রিলের সকালে সেই বিষণ্ন সুরূপ অভিজাতজন, তোমার পায়ের কাছে, সেই হতভাগ্য নীরব পাগল। স্বর্গ! প্রেম! মুক্তি! সেকী স্বপ্ন, আরে বোকা পাগল মেয়ে! আগুনের কাছে বরফ যেমন গলে, তুমিও তেমনি গলে গেলে। তোমার আশ্চর্য স্বপ্ন তোমার কণ্ঠ রোধ করল; ভয়ঙ্কর সেই অসীম তোমার নীল চোখে মায়া ধরালো।'[১৬] 'লারা', 'ম্যানফ্রেড', 'কর্সেয়ার' প্রভৃতি রচনায় এবং ব্যক্তি জীবনে বায়রন যে সেট্যানিক নায়ককে রচনা করেছিলেন র‍্যাঁবোর হ্যামলেটের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে — নিষ্ঠুরতা ও বিপুল শক্তির (যে শক্তি সমাজ বন্ধনের ঊর্ধ্বে, সেইহেতু অসামাজিকও বটে) যোগেই অসীমের মূর্তি রচিত হয়। হ্যামলেট ম্যানফ্রেডের মতো বলতে পারে, 'আমার আলিঙ্গন মৃত্যুর বার্তা। ... আমি তাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে বিনাশ করলাম।'' [১৭] হ্যামলেট যাদের ভালবাসে তাদেরই উপর তার আঘাত সবচেয়ে নিষ্ঠুর। গার্ট্রুড ও ওফেলিয়া সেই নিষ্ঠুরতার সাক্ষী।

৪. আধুনিক কাল: বিংশ শতাব্দী।

ভিক্টোরীয় যুগে এবং আমাদের শতকেও অ্যাকাডেমিক সমালোচনা হয় হ্যামলেট চরিত্র ছেড়ে নাটকের দিকেই সন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়েছেন; নয়তো শ্লেগেল ও কোলরিজের খাতেই হ্যামলেটের কালক্ষেপ ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে নাটকের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও চরিত্রবর্গ, এবং নাট্যকারের সমকালীন চিন্তালোকের সঙ্গে হ্যামলেট-চরিত্রের জটিল সম্পর্ক নির্দেশ ক'রেছে। প্রথম ধারায় স্টোল, কোল্‌বে, স্পার্জিয়ন, গ্র্যানভিল বার্কার, মিউর, ব্র্যাড ব্রুক। বেথেল প্রমুখ এবং দ্বিতীয় ধারায় ডাউডেন, ব্র্যাড্‌লি, ডোভার উইল্‌সন, হ্যারিসন প্রমুখেরা আছেন। এঁদের কীর্তি প্রথমত সুপরিচিত, এঁদের মতামত বহুপঠিত, দ্বিতীয়ত এঁরা কেউই হ্যামলেটের নতুন কোনও মূর্তি রচনা করেননি। তাই এবার এ্যাকাডেমিক সমালোচনার বাইরেই আমরা নিদর্শন খুঁজব।

হ্যামলেটের ফ্রয়েডীয় মূর্তি রচনা করেন স্বয়ং ফ্রয়েড ও আর্নেস্ট জোন্‌স [১৮]। হ্যামলেটের কালক্ষেপকে এঁরা 'হিস্টিরিকাল প্যারালিসিসের' লক্ষণ বলে বিবেচনা করেন। হ্যামলেট চিন্তায় তন্নিষ্ঠ বলেই যে-কোনও কর্মের পূর্বেই আত্মজিজ্ঞাসায় লিপ্ত হয়, এবং কর্মে অক্ষম হয়, এই যুক্তির প্রতিবাদ করে ফ্রয়েড দেখান যে, হ্যামলেট সহসা উত্তেজনায় পোলনিয়াসকে হত্যা করে, এবং পরে সুপরিকল্পিতভাবেই কুটচক্রে রোজেনক্রান্ট্‌জ ও গিল্ডেন্‌স্টার্নের মৃত্যু ঘটায়। কেবলমাত্র ক্লডিয়াসকে হত্যার প্রশ্নেই হ্যামলেটের টালবাহানা। হ্যালেটের যাবতীয় যুক্তিকেই ডক্টর জোন্‌স ভিত্তিহীন বিবেচনা করেন। ডক্টর জোন্‌স দেখান যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দায় হ্যামলেটের কাছে স্পষ্ট কিন্তু মাতার অজাচারের প্রশ্নেই হ্যামলেটের মানসিক যন্ত্রণা সবচেয়ে দুর্বিষহ। মনস্তাত্ত্বিকদ্বয়ের সিদ্ধান্ত, শৈশবে মাতার সঙ্গে হ্যামলেটের সম্পর্কে গোপন কামের ভাব ছিল। পিতৃভক্তির আড়ালে পিতা সম্পর্কে প্রেমিকোচিত হিংসা চাপা পড়েছে। মাতাপুত্রের এই সম্পর্কের অস্তিত্ব সন্দেহে গার্ট্রুডের ইন্দ্রিয় পরবশ প্রকৃতি এবং পুত্রের প্রতি ভালোবাসা [১৯] ও পুত্রের কাছে দুর্বলতার ডক্টর জোন্‌স্ সমর্থন পেয়েছেন। গার্ট্রুডকে শুনিয়ে ওফেলিয়ার কাছে অশ্লীল উক্তি উচ্চারণ হয়তো এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— এ হেন বঞ্চিত প্রেমিকের প্রতিশোধ-স্পৃহায় অন্য নারীর উপর নিজের শক্তির প্রদর্শন। হ্যামলেটের অশ্লীন উক্তিকে কোনও যৌন সঙ্কটের প্রতিফলন বলে বিচার না করলে হ্যামলেটের শিক্ষিত ও মার্জিত প্রকৃতির সঙ্গে এই শহালীনতাকে মেলানো যায় না। এই যুক্তির জের টেনে জোন্‌স বলেন, মায়ের প্রেমে পিতার স্থান দখল করার দীর্ঘকাল অবদমিত সাধ ক্লডিয়াসের কর্মে নিজেরই অপূর্ণ সাধের বাস্তাবয়ন দেখে অচেতন উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়। নিজের মনে যে অজাচারের সাধ ছিল, অন্য অজাচারে তাকেই প্রত্যক্ষ করেই হ্যামলেট এমন বিপর্যস্ত হয়। এই যৌন সংকটই অবদমনের নিষ্পেষণে তীব্র নারীদ্বেষের ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নিজের অপরাধ-বোধ ও মাতার স্বামীকে হত্যার প্রশ্নে আবার সেই পুরনো শৈশবসাধের অবদমিত জ্বালা হ্যামলেটকে বাধা দেয়। হ্যামলেটকে এইভাবে ইডিপাস কমপ্লেক্স নামধেয় বিকারের শিকার বলে প্রমাণ করা যায়।

ডি. এ্যচ, লরেনস হ্যামলেটকে ঘৃণা করেন।[২০] এই চরিত্রের ভিত্তি আত্মঘৃণা ও প্রচণ্ড ভাঙনের এক অনুভূতি। শেক্‌সপীয়রে এই আত্মগ্লানি যেন 'শরীরে অপচারের অনুভূতি ও তারই বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিক্রিয়া।' হ্যামলেট নিজেরই মধ্যে এই অপচার উপলব্ধি করে আত্মধিকারের পরিবর্তে আত্মগর্বে আত্মগ্লানিকে চাপা দেয়। তাই অশালীন নিষ্ঠুরতায় হ্যামলেট চারিদিকে কেবল অপচারের রূপকে নগ্ন করে তুলে ধরে। এতেই তার পাশবিক আনন্দ। 'সমগ্র নাটকটিই দেহপিণ্ডের বিরুদ্ধে মনের প্রতিক্রিয়া, আত্মন-এর বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিক্রিয়া, অভিজাততান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিক্রিয়া।'[২১] মধ্যযুগীয় চিন্তার উত্তরফলস্বরূপ হ্যামলেট আত্মনকে পিতা বা রাজার মূর্তির মধ্যে উপলব্ধি করে। এই আত্মন পিতৃহত্যায় আহূত হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রাজার মূর্তির মধ্যে মিশে গেছে। নারীর স্থান এই চিন্তায় সর্বদাই পুরুষের নীচে; সেই নারী অন্তত পরোক্ষেপও এই আত্মনের বিনাশে সহযোগী থেকেছে। তাই সমগ্র নারীজাতির প্রতি হ্যামলেটের ঘৃণা; অথচ ক্লডিয়াস সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া অত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। মধ্যযুগে আত্মনের প্রাধান্যে মানুষ নিজের দেহকে সম্মান দিয়েছে, কারণ এই দেহে আত্মন আশ্রয় নেয়, এই আশ্রয়ে নিজেকে বিকশিত করে, নিজেকে বহুতে রূপান্তরিত করে। রাজ্যে

রাজা, পরিবারে পিতা, এবং নিজের মধ্যে এই দেহপিণ্ডে আত্মন তার শক্তিকে উপলব্ধি করে। কিন্তু মধ্যযুগের এই বোধ নতুন খ্রিস্টীয় ধর্মের আক্রমণে আহত হল। খ্রিস্টের রাজরূপকে ছাপিয়ে ওঠে বেথলেহেমের শয্যায় শিশুরূপ এবং পরে ক্রুশবিদ্ধ অসহায় রূপ। আত্মনের মধ্যে সমগ্রকে গ্রহণ করে আত্মনকে সর্বশক্তিমান সর্বগৌরবমহীয়ান করে অসীম হয়ে ওঠার যে আদর্শ এতদিন ছিল সেই আদর্শে সন্দেহ এল। খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক এলেন, বললেন : আত্মন তথা দেহকে বিনাশ করেই অসীমের উদয় হতে পারে। হ্যামলেটের মনেও এই নতুন বোধ এসে ধাক্কা দিয়েছে। আত্মনের মহত্ত্বে সন্দেহ জেগেছে বলেই রাজা ক্লডিয়াসের রাজরূপ তাকে ভোলাতে পারে না, সে প্রতিশোধের সংকল্প নেয়; অথচ রাজা-আত্মন অভিন্ন বোধের অবশেষ তাকে ছাড়ে না। এতেই হ্যামলেটের দোটানা। ক্লডিয়াসকে হত্যার সংকল্পে ও সেই সংকল্পসিদ্ধির মধ্যে হ্যামলেট আত্মনকে হত্যা করে, সেই কারণেই এই হত্যাকে ঘিরে ন্যায় ও নীতির এত প্রশ্ন, আত্মনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর অসীমে পৌঁছবার প্রয়াস। নবজাগৃতির এই সংকটেই মাতার সঙ্গে বা ওফেলিয়ার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের চিন্তায় হ্যামলেটের মনে এমন প্রচণ্ড ঘৃণা আসে; দেহজ সম্পর্কমাত্রই যেন অবর্ণনীয় কলঙ্ক। প্রবৃত্তি ও স্বজ্ঞার শাসন ছেড়ে আত্মিক-মানসিক চেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গেই হ্যামলেটের সংকটেরযোগ। এই প্রথম মানুষ নিজের দেহকে ও বিশেষত তার যৌনসত্তাকে ভয় করতে শিখল, সর্বশক্তি দিয়ে নিজের স্বাধীন স্বজ্ঞা-প্রবৃত্তিগত চেতনাকে গলা টিপে মারতে গেল। ঈডিপাস যৌনসত্তাকে ভয় করে না, যৌনতাকে ভয় করে না, ঘৃণাও করে না; সে ভয় করে নিয়তিকে। হ্যামলেট নিয়তিকে জানে না, যৌনতার ভয়ংকরতায় সে কাতর।[২২] 'ম্যানিফেস্টো কবিতায় হ্যামলেট-এর 'টু বী অর নট টু বী' প্রশ্নের জবাবে লরেন্স বলেন : 'অস্তিত্বের এই তীব্র কামনাই চরম ক্ষুধা।' নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে 'এ যেন একরকম মৃত্যু অথচ মৃত্যু নয়'', আত্মন্‌কে অতিক্রম করে অন্যের সঙ্গে যোগরচনা।

হ্যামলেটকে ঘিরে রোম্যান্টিক সমালোচকেরা যে অলোকসামান্য মহত্ত্বের চিত্র রচনা করেছিলেন, এই শতাব্দীও তার মায়ায় আচ্ছন্ন। তাই বার্নাড শ বলেন, 'যারাই ইতর লোভ বা উচ্চাশা কিংবা হীন বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে, তারাই তাদের প্রতারকদের কাছে দুর্বল ও ভীরু বলে প্রতিপন্ন হয়। কখনও কখনও তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে ওই ভুল ধারণা করে। এটুকু যে বোঝে, তার কাছে হ্যামলেটের চরিত্রে কোনও অসঙ্গতি নেই।'[২৩] এমনকি এলিয়টও যখন 'লাভ সং অফ প্রুফ রুক'-এ প্রুফ্‌রুকের বিপরীতে প্রিন্স হ্যালেটকে দাঁড় করান, তখনও প্রুফ্ রুক প্রভুদের হাতের খেলনা, বিনয়ী, পরের কাজে লাগলেই ধন্য, কৌশলী, সাবধানী, অতিসতর্ক, আড়ম্বরপ্রিয়, কিঞ্চিৎস্থূলবুদ্ধি, কখনও কখনও প্রায় হাস্যকর—কখনও কখনও প্রায় 'ফুল'।[২৪] এলিয়ট স্পষ্টতই পোলনিয়সকে স্মরণ করেন; হ্যামলেট-পোলনিয়সের এই বৈপরীত্যে হ্যামলেটের গুণাবলি স্পষ্টতর রেখায় ফুটে ওঠে। আধুনিক জর্মন কবি হল্‌থুসেন 'ব্যালাড আফ্‌টার শেক্সপীয়র' কবিতায় হ্যামলেট প্রসঙ্গে বলেন : 'এই সব কিছু তাকে চক্রব্যূহে ঘিরে ধরে : সিংহাসন, সিঁড়ি, দর্পণ, মোড়া পর্দা। আমরা শুনি, সে ডাকে প্রেতাত্মাকে, নিদ্রাকে, মৃত্যুকে, সমাপ্তিকে।' 'শুধু ন্যায়ের জন্য' হ্যামলেট নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। 'তার চিন্তা, তার ভয়ঙ্কর বিনিদ্র পৌরুষ, রোষ, সংযম, অগ্নিস্তম্ভ, অগ্নিগর্ভ রক্ত, মঞ্চকে সে কী প্রচণ্ড তেজে বিধ্বস্ত করে।'[২৫] অগ্নিকল্প তেজে হীন নারকীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হ্যামলেটের এই চিত্রে তার অস্ত্র আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্কলঙ্ক নিষ্ঠা; তার সহচর সাথি গ্লানি, শ্রান্তি, মৃত্যুকামনা, চিন্তার দুঃসহ ভার। বিংশ শতাব্দীর সর্বব্যাপী কাপুরুষতা, নৈতিক দৌর্বল্য ও লঘুচিত্ত-পলায়নপরতার বিপরীতে প্রিন্স হ্যামলেট তার অষ্টাদশ শতকের বীর্যও ফিরে পায়। হ্যামলেট আর শুধু বিষণ্ণ অক্ষম কবি নয়।

পাস্তেরনাকের 'হ্যামলেট' কবিতায় হ্যামলেট জীবনের জটিলতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—যে জটিলতা আবার নিয়তির দুর্ভেদ্য রহস্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। নিঃসঙ্গতা ও মিথ্যার কূলপ্লাবী অন্তরও এই জটিলতারই অন্তর্গত 'আমি একা। চারিদিক মিথ্যায় ডুবে যায়। জীবন তো আর মাঠ পেরিয়ে যাবার

মতো সহজ নয়।' এই সঙ্গেই আছে মুক্তির জন্য প্রার্থনা ('অপার করুণায় বিষপাত্র টেনে নাও') এবং নত মস্তকে দায়িত্ব গ্রহণ[২৬]। এই কবিতায় হ্যামলেটকে খ্রিস্টের সঙ্গে এক করে পাস্তেরনাক হ্যামলেটের যে মূর্তি সৃষ্টি করেন অন্যত্র তিনি সেই মূর্তি আরও স্পষ্ট করে আঁকেন : 'প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হ্যামলেট তার স্রষ্টার সাধ পূর্ণ করবে বলে নিজের সাধ বিসর্জন দেয়। এ নাটক স্পৃহার দুর্বলতার নাটক নয়, কর্তব্য ও আত্মত্যাগের নাটক। আপাতদৃশ্য ও বাস্তবের মধ্যে যখন অতল গহ্বরের ব্যবধান দেখা দেয়, তখন যে পৃথিবীর মিথ্যাচারের আবরণমোচন করতে অশরীরী প্রেতাত্মা এগিয়ে আসে, প্রতিশোধ দাবি করে তার অন্য কোনও বিশেষ গুরুত্ব নেই। বরং সত্যিই যা গুরুত্বপূর্ণ, হ্যামলেট তার নিজের কালের বিচারক নির্বাচিত হয় এবং প্রাচীনতর কালের সেবক বলে স্বীকৃত হয়।'[২৭] হ্যামলেটের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার সকল আবরণ মিথ্যা হয়ে যায়; সত্যদ্রষ্টা হ্যামলেটের তিক্ত বাণীও অনাবৃত সত্যের রুক্ষ্মতা নিয়ে এসেছে, আর কিছু নয়। হ্যামলেটের নিঃসঙ্গতাও সত্যদ্রষ্টার নিঃসঙ্গতা, এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার গুরুভার দায়িত্ব তার একার স্কন্ধেই, সেই হেতুই বিবাদ ও যন্ত্রণার বেদনা।

৫. আরও একটি ব্যাখ্যা।

'No one is likely to accept another man's reading of Hamlet'– E M. W. Tillyard.

কলিন্ উইলসন যাকে 'আউটসাইডার' বলেন, হ্যামলেটের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে। উইল্সনের মাপকাঠিতে ফেলে হ্যামলেটকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা না করে বরং হ্যামলেটের চরিত্র থেকেই এই আউটসাইডারকে খুঁজতে গেলে বেশি লাভের সম্ভাবনা। হ্যামলেটের সঙ্গে আমাদের শতাব্দীর চিন্তার ধারার সম্পর্ক নির্ণয় হয়তো এই পথে সম্ভব। একথা বোধ হয় মনে রাখা বিধেয় যে, হ্যামলেটের চিন্তায় উৎসস্থল উইটেনবার্গ, এবং এই উইটেনবার্গ রেফোর্মেশনের জনক মার্টিন লুথারের নাম ও কীর্তির সঙ্গে যুক্ত। খ্রিস্টীয় গির্জার ব্যাখ্যা ও অনুশাসনের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ব্যক্তিকে লুথার যে-মুহূর্তে মুক্তি দিলেন, সেই মুহূর্তেই তার উপর সত্যকে[২৬] খুঁজে নেবার সম্পূর্ণ দায় এসে পড়ে। সেই দায় নিয়েই হ্যামলেট ডেনমার্কে ফেরে, এসে দেখে ডেনমার্ক 'বন্দীশালা'। অসত্যের আবরণ ভেঙে সত্যকে খুঁজে তবেই তার মুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে। হ্যামলেটের সম্মুখে বৃহত্তম যে অসত্য দেখা দেয়, সে-অসত্য আত্মীয়বন্ধনের সত্যকে অস্বীকার করছে। যে-বন্ধনে হ্যামলেট নিজেও যুক্ত, সেই বন্ধনেরই এক প্রান্তে পচন ধরেছে, সেই ব্যাধির সংক্রমণ থেকে হ্যামলেট কেমন করে নিজেকে বাঁচাবে? এলিজাবেথীয় ইংরেজিতে 'কাইন্ড' কথাটির অর্থ 'কিন'-এর সঙ্গে যুক্ত, 'নেচার' বা জন্মগত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত নীতিবোধের সূচক। 'কাইন্ডনেস্' দয়া বা করুণা নয়, জন্মমুহূর্তে আত্মীয়সমাজবন্ধনে স্থাপিত জীবনধর্মে; সেই জীবনধর্মও মূল্যবোধ থেকে ক্লডিয়াস ও গার্ট্রুড বিচ্যুত হয়েছে। তাই তাদের চরিত্রও সেই বৃত্ত থেকে ছিট্কে বেরিয়ে গেছে; তারা আজ যথাক্রমে 'আঙ্কল-ফাদার', 'আন্ট মাদার'। এই পরিপ্রেক্ষিতে হ্যামলেট যখন ক্লডিয়াসকে 'কাইন্ডনেস ভিলেন্' বলে বর্ণনা করে, কিংবা বলে, 'I must becruel only to be kind' কিংবা ' more than kin and less than kind' তখন আত্মীয়বন্ধনের পবিত্র সূত্রে যে শৈথিল্য এসেছে, তাতেই হ্যামলেটের চাপা ক্ষোভ ধরা পড়ে (বেটরিকের বৈচিত্র্যে এই অংশগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও লক্ষণীয়)। একই কারণে এই নাটকে রোগব্যাধির ইমেজ-এর প্রাচুর্য। এই ইমেজগুলি প্রায়ই আবিলতার সঙ্গে যুক্ত।[২৮] হ্যামলেটের মনের পরিচ্ছন্নতা যে সহসা কলুষিত হয়ে গেছে, ওফেলিয়ার কথায় তার আভাস আছে। ওই কুৎসিত রোগের সাক্ষাতে এসে, সংক্রমণের আতঙ্কে, রোগ থেকে পালাবার প্রাণান্ত চেষ্টায় রোগের বীভৎস রূপ তার চিন্তায় এমনভাবে ভর করে থাকে যে, হ্যামলেটের ভাষাও কুৎসিত হয়ে উঠতে থাকে। ডোভার উইলসন যখন হ্যামলেটের প্রথম স্বগত ভাষণে 'সলিড' বদলে 'সালিদ' করেন, তখন এই সমগ্র চিন্তার ধারা স্পষ্টতর হয়—মাতার অজাচারে হ্যামলেটের নিষ্কলঙ্ক দেহপিণ্ডে মালিন্যের কলঙ্ক লেগেছে। এতেই হ্যামলেটের অসহ যন্ত্রণা। এই সম্পর্ক থেকে সে নিজেকে সমূলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়, ওই অসুস্থ মানুষগুলির সংস্পর্শেই

তার ভয়। ক্লডিয়াস তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করা মাত্রই হ্যামলেট যেন ঘৃণায় পিছিয়ে আসে—সে যেন 'টু মাচ ইন দি সান'— ধ্বনিগুণে পুত্রত্বের সম্পর্কে ও সূর্যের খরতাপ তথা তার যাতনা অভিন্ন হয়ে যায়। আরও বলা যায় যে, যেহেতু দেহজ এক সম্পর্কের তাড়নায় ক্লডিয়াস ও গার্ট্রুড প্রকৃতির বিধিকে অমান্য করেছে, সেইহেতুই দেহ ও দেহের দাবি সম্পর্কে হ্যামলেটের এত ভয়— 'নানারি' দৃশ্যের ব্যাখ্যা এইভাবেই সম্ভব।

ম্যাক্রোকজ্‌ম -মাইক্রোকজ্‌ম-এর জটিল সম্পার্কে' আস্থাশীল এলিজাবেথীয় হ্যামলেট সমাজদেহেও আনকাইন্ডনেস রূপ ব্যাধির সংক্রমণ দেখতে পায়। হ্যামলেট-পোলনিয়াসে বৈপরীত্য কোলরিজ লক্ষ করেছিলেন, এলিয়টও তাঁর কবিতায় করেছেন। হ্যামলেটের তাবৎ গুণের বিপরীত গুণের আধার পোলনিয়াস—শঠতা, গুপ্তচরবৃত্তি (পুত্রকন্যা কেউই বাদ যায় না), স্বার্থসার দাসবৃত্তি, এবং সততার বহিরঙ্গরূপের সঙ্গে তার ক্রুরতার অসঙ্গতি[১১] তার অপ্রশ্ন জীবনযাত্রা। তাই হ্যামলেটের হাতে পোলনিয়াসের মৃত্যুতে যেন নিয়তির হাত আছে। যে ব্যাধিকে স্পর্শ করতে হ্যামলেট প্রথম থেকে ঘৃণা বোধ করেছে, সহসা সেই ব্যাধির একটি শিকারকে নিজের অজান্তে হত্যা ক'রেই তার ওই ছোঁয়াচের ভয় কেটে যায়। তারপর হত্যায় আর হ্যামলেটের হাত কাঁপে না, রোজেন্‌ক্রান্টজ, জিল্ডেনস্টার্ন ও ক্লডিয়াসের বিদায় দিতে বেশি সময় লাগে না। পোলনিয়স হত্যার পর ওই দোটানা প্রায় কেটে গেছে; পোলনিয়স্‌কে হত্যার পরই ছুরিকাসম বাণীতে মাতাকে আক্রমণ করাও সহজ হয়। হ্যামলেট এইবারই অ্যাভেঞ্জার হয়ে ওঠে। আউটসইডার অবশেষে কমিটমেন্ট-এ আসে।

সূ ত্র নি র্দে শ

১। Paul S. Conklin, A History of Hamlet Criticism, 1601–1827. Routledge. 1957.

২। "You are a fishmonger" (Hamlet II ii 174) "Duke, thou art a becco, a corunto" (The Malcontent, I, iii, 93). এই নাটকদ্বয়ে শুধুমাত্র কথার সাদৃশ্যের তালিকা সুদীর্ঘ হয়ে ওঠে।

৩। H. J. C. Grierson, Crosscurrents in English Literature of the 17th Century, Chatto and Windus, 1958 : Christianity was not dead, far from it ; and the dominant note of the 17th century was to be the conflict of the secular and the spiritual, the world, the Flesh, and the spirit, a conflict whcih troubled every sphere of life. কোরেজিয়োর 'লিয়েতো' স্বাক্ষর, মিকেলাঞ্জেলোর নবসৃষ্ট 'অ্যাডাম মূর্তি,' কিংবা লিয়োনার্দোর সেই কাহিনি—ফ্লব্যরেন্‌সের রাজপথে খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দেওয়ার গল্প — নবজাগৃতির সেই কল্পচিত্রকে ভেঙে জটিলতর অভিজ্ঞতারূপে এই কালকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা গ্রিয়ার্সন ও ডক্টর টিলিয়ার্ডের কাছে কৃতজ্ঞ।

৪। পরেগার্ট্রড বলেন, 'Mad as the sea and wind' (IV. i 7ff) কিন্তু এখানে গার্ট্রুডের মনে স্পষ্ট নয়। তিনি হয় (ক) একথা এখনও সত্যিই বিশ্বাস করেন, নয়তো (খ) পুরনো ভাষ্যের জেরস্বরূপ হ্যামলেটকে আড়াল করছেন, নয়তো (গ) নিজেকে চোখ ঠেরে হ্যামলেটের 'ছুরিকাসম' আঘাত থেকে নিজেকে আড়াল করছেন, cf "Mother, for love of grace. Lay not that flattering unction to your soul. That not your trespass bu my madness speaks.

৫। V. i. 160 ff.

৬। Melancholy adust.

৭। Castel of Health. 1547.

৮। শেক্‌সপীয়র এই বইটি পড়েছিলেন, তার প্রমাণ দাখিল করে রিচার্ড লোয়েনিং। ডাউডেন থেকে শুরু করে ডোভার উইলসন প্রায় সকলেই এই প্রমাণ মেনে নিয়েছেন।

৯। Lily B. Compbell. Shakespeare's Tragic. Heroes. Cambridge. 1930 M. I. O" Sullivan. Hamlet and Dr. Timothy Bright (PMLAA, XLII. 3.) J.D. Wilson. What Happens in Hamlet. 1950. AppendixE.

১০। ১০ জানুয়ারি, ১৭৭৬ তারিখে Sir W. Young-কে লেখা চিঠি। Quoted by W. S. Scott, The

Georgian Theatre, Westhouse, 1946. শেক্সপীয়রের অযোগ্য বলে শেক্সপীয়রের রচনাকে বাতিল করার যুক্তিহীন রীতি 'ডিসিন্টিগ্রেশন'-এর শুরু বোধ হয় এইখান থেকেই।

১১। New Variorum Hamlet. Ed. H.H. Furness. Dover reprint. 1963. Appendix (Volume II). 1774-এর মূল প্রবন্ধের ১৭৮৪ সালের নতুন ভারটি ব্যবহার করেছি।

১২। কার্লাইলের অনুবাদ থেকে।

১৩। New Varlorum Hamlet. Appendix.

১৪। ডরোথি মার্টিন ও ফ্যান্সিস স্কার্ফের দুটি স্বতন্ত্র ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে ভাবানুবাদ। বিদেশি কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে এই পন্থাই বোধ হয় আদর্শ।

১৫। ফ্লোবোর বলেন, 'La grande synthese.'

১৬। অলিভার বার্নার্ডের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে।

১৭। Manfred. Act II. (মারিয়ো প্রাজ কর্তৃক উদ্ধৃত)

১৮। Sigmund Freud. The Interpretation of Dreams. Ernest Jones. Hamlet and oedipus.

১৯। 'The Queen his mother lives almost by his locks'. IV. Vil.

২০। And Hamlet how boring. how boring to live with./Somean and self-conscious. blowing and snoring. / His wonderful speeches. full of other folks' whoring.

২১। Twilight in Italy: The Theatre.

২২। Puritanism and the Arts. (D.H. Lawrence. Selected Literary Criticism. Viking. 1956

২৩। Letter to Alfred Gruikshank. October 4. 1918> (Shaw on Shakespeare. Ed. Edwin Wilson. Dutton. 1961).

২৪। নাটকের প্রথমাংশে পোলনিরস Fool হয়ে দাঁড়ায়, তবে শেক্সপীয়রের fool নয় তাই এলিয়টও বলেন, 'Almost. at times. the Fool.'

২৫। প্যাট্রিক ব্রিজওয়াটারের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে।

২৬। লিডিয়া পাস্তেরনাক স্লেটার, হেনরি কামেন এবং ম্যাক্স হেওয়ার্ড ও মানিয়া হারারির তিনটি স্বতন্ত্র ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

২৭। Pzsternak. On Translating Shakespeare (Soviet Literature. Sept. 1946: July 1956.)

২৮। স্পার্জিয়নের অ্যানালিসিস্ থেকে আমি নিজস্ব উপসংহার টেনেছি। ইমেজের প্রকৃতির ইঙ্গিতটুকু কেবল স্পার্জিয়নের দান।

২৯। cf.'By indirections find directions out.' 'Trail of Policy' 'Leave wringing of your hands.'

২য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১)

অমিয় বাগচী

গণতন্ত্র, গোষ্ঠীস্বার্থ ও জনস্বার্থ

ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রচলিত ধারণার উৎস বলা যেতে পারে ইংরেজ ইউটিলিটিবাদীদের লেখা। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের চিন্তাতেই বেন্‌থামের প্রভাব যথেষ্ট বেশি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য পরে কোঁতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোঁত (Comte) সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের মূলে ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের positivism সম্বন্ধে উৎসাহ। Fabian-রা Utilitarian-দের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী আর জওহরলাল নেহরুর ওপর ফেবিয়ানদের প্রভাব তো অতি স্পষ্ট। গণতন্ত্রের এই ধারণার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গণসভার স্মৃতি পরে মিশে গিয়েছিল, এবং ইংরেজ মনীষীদের আমরা আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কিত চিন্তার উৎস না মনে করে পুনঃস্মারক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম।

গণতন্ত্রের এই ধারণায় গণতন্ত্রকে প্রধানত সাধারণ লোকের শাসন হিসেবে মনে করা হত। গণতন্ত্র এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্র এখানে প্রায় সমার্থক; জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *Representative Government* বই লেখার সময়েই জানতেন যে, আধুনিক আমলা কণ্টকিত শাসনব্যবস্থায় গণমানসের ইচ্ছা এবং শাসকের ইচ্ছার মধ্যে প্রচণ্ড দূরত্বের সৃষ্টি হতে পারে। গণমানসের ইচ্ছা কী তা সব সময়ে ঠিক করা যায় না। এবং এই অনিশ্চয়তার মাঝখানে শাসকগোষ্ঠীকে শাসন করতেই হবে; সুতরাং খুব সৎ, দায়িত্বপূর্ণ শাসকও সব সময় গণের ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারবেন না।

আরও জানা ছিল আধুনিক আর্থিক ও শাসনব্যবস্থার বহু বিষয়েই সাধারণ মানুষ অতীব অজ্ঞ। একথা শুধু ভারতবর্ষের মতো গরিব প্রায়-অশিক্ষিত দেশের পক্ষে খাটে না, সুশিক্ষিত, সুপুষ্ট ইংরেজ ও আমেরিকানদের পক্ষেও একথা খাটে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠী অনেক কিছুই করতে পারে যা সাধারণের মঙ্গলের পরিপন্থী।

গণতন্ত্রের আদিম ধারণার সারাংশ পাওয়া যায় লিংকনের বিখ্যাত উক্তিতে : It is government of the people, for the people, by the people। ঊনবিংশ শতকের এই শুভ্র ধারণার পটে বাস্তবের কালিমা আগেই লেপিত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও তার প্রকাশের সঙ্গে গণতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে একথা অস্বীকার করা হয়নি।

জন স্টুয়ার্ট মিল জানতেন যে সাধারণ মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় (ম্যাক্‌কার্থীর তাণ্ডবের পিছনে অধিকাংশ সাধারণ আমেরিকানেরই বোধ হয় সম্মতি ছিল)। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার সাহায্যে সাধারণ মানুষের দায়িত্ববোধ, সম্মানবোধ এবং স্বাধীনতাপ্রীতি বাড়ানো যেতে পারে। এই বিশ্বাস এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে মানুষের অভিমতের পিছনে সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ কাজ করতে পারে একথা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকেরা মানতে চাননি। শিক্ষার প্রকারভেদে তা যে নিছক প্রোপাগান্ডা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে পর্যবসিত হয় তা-ও তাঁরা মানতে চাননি।

শিক্ষা ও সামাজিক মঙ্গল বিচারকে (social value criticism) এই যে উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে সাধারণতন্ত্রবাদীদের আরেকটি আদর্শ জড়িত ছিল : এই আদর্শ হল রাষ্ট্র ও সমাজের বিচ্ছেদ। জনসমাজের কতকগুলি মঙ্গলজনক কাজ রাষ্ট্রের ধারক সরকারকে দেওয়া হবে। কিন্তু মানুষের জীবনের অনেকখানি অংশই থাকবে রাষ্ট্রের আওতার বাইরে। এই বাইরে-থাকা স্বাধীনতা সংরক্ষণের একটি প্রধান উপায়; দুষ্ট শাসকের বিরুদ্ধে অভিমত বৃহত্তর সমাজের মধ্যে গড়ে উঠবে এবং দুষ্ট শাসনের অবসান ঘটবে। মানুষের জীবনের প্রসার ঘটবে নানারকম সমাজধৃত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

উনিশ শতকেই সাধারণতন্ত্রের এই আদর্শবাদ-আরোপিত ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। আপত্তি ওঠে দুই তরফ থেকে : মার্কস প্রমুখ সমাজবাদী লেখক Ideology এবং গোষ্ঠীস্বার্থের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের উপর জোর দেন। অন্যদিকে টকেভিল প্রমুখ রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও সামগ্রিক উন্মত্ততার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অল্প কথার মধ্যে মার্কসের মতের সারাংশ দেওয়া দুষ্কর। এ-কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না, কোনও গোষ্ঠীর যুক্তিগ্রাহ্য মতের মূলে যে অনেক সময়েই থাকে গোষ্ঠীস্বার্থও এ-কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে মার্কস বলেছিলেন। গোষ্ঠী বলতে তিনি প্রধানত শ্রেণীকেই বুঝিয়েছিলেন, এবং শ্রেণীর গণ্ডী তিনি নিরূপণ করেছিলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সেই শ্রেণীর স্থান দিয়ে। পশ্চিমি গণতন্ত্র তাঁর মতে প্রধানত নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতিয়ার। মানুষের স্বাধীনতার নামে যে কোনও ব্যবসায় মধ্যে দিয়ে লাভ করার স্বাধীনতাই বুর্জোয়া শ্রেণী খুঁজছিল। সাম্য বলতে ধনতান্ত্রিক দেশে প্রধানত রাষ্ট্র ও আইনের চোখে ব্যক্তির সাম্য বোঝানো হত; কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইনকানুন স্বভাবতই এমন আকার ধারণ করত যাতে মানুষের আর্থিক সাম্য ক্ষুণ্ণ হত। এবং সম্পত্তিহীন শ্রমনির্ভর মানুষেরা আইনগত বা রাজনৈতিক সাম্য অথবা স্বাধীনতাও পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে পারত না। উপভোগের পথে প্রধান অন্তরায় সম্পত্তিবান শ্রেণীর চাপ এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীর তৈরি ideology। ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি মানুষের মনের ওপরে এই ideology নানাভাবে কাজ করে; ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে, আপাত রাজনীতিমুক্ত সামাজিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে, রাজনীতিক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এবং খবরের কাগজের বিরামহীন প্রচারের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু মার্কস বিশ্বাস করতেন এতৎসত্ত্বেও যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের মঙ্গলের কথা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই এবং প্রকৃত অবস্থার মধ্যে সমতা ঘটবে, এবং একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবি প্রতি পদে ব্যাহত হবে না। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজের জন্য প্রচার মার্কস তাঁর জীবনের কাজ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেননি যে যুক্তিগ্রাহ্য আবেদনের দ্বারা শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে। শাসকগোষ্ঠীকে সরাবে তারাই যারা ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান ধারক এবং যারা নতুন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা থেকে সবচেয়ে লাভ করবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী। মার্ক্স যুক্তির সাহায্যেই সমাজতন্ত্রের বিরোধীদের খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রচারের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে যাদের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি মেলে তারা।

গণতন্ত্রের অন্য সমালোচকরা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আনতে চাননি। যে কোনও জনতাই (mass) তাঁদের সমালোচনার লক্ষ্য। শুধুমাত্র ব্যক্তিই যুক্তির অধিকারী, শুধুমাত্র ব্যক্তির পক্ষেই ভালো কাজ করা অথবা নিজেকে সংযত করা সম্ভব। জনতা শুধু কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি নয়, জনতার অঙ্গীভূত হলেই ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য, যুক্তি, দৃঢ়তা ও সাধারণভাবে মানবত্বের অনেকখানি হারায়। যে লোক ব্যক্তিগত জীবনে অতি শান্ত, ভদ্র ও নিরীহ প্রকৃতির সে-ই কোনও 'সংগ্রামী জনতা'র অঙ্গীভূত হলে কাণ্ডজ্ঞানহীন, মারমুখী হয়ে ওঠে। জনতার বুদ্ধি সর্বদাই যে-কোনও একজন ব্যক্তির বুদ্ধির চেয়ে কম। সুতরাং জনতার হাতে শাসনের ভার দেওয়া যেতে পারে না।

প্রশ্ন হবে, তা হলে কার হাতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জনতা-শাসন বিরোধীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়েন। একদল গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বলেন যে গণতন্ত্রের উচিত কিছু বিশেষ গুণে গুণান্বিত লোককে নির্বাচন করে তাদের হাতেই শাসনের ভার ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু নির্বাচন হতেই হবে। নয়তো সাধারণ মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতার ওপরে হাত পড়বে।

জনতা-শাসন বিরোধীদের আর এক দল বিশ্বাস করেন না যে সাধারণ লোকে স্বাধীনতা বা সাম্য চায় অথবা গুণনির্বিশেষে স্বাধীনতা বা সাম্যের তারা অধিকারী। বুদ্ধি, গুণ, শক্তি সকল বিষয়েই কতকগুলি

লোক অন্যদের তুলনায় অনেক উপরে; শাসনের ভার উপরের স্তরের লোকের হাতেই থাকা উচিত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে এ সম্ভাবনা থাকে যে অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু লোক সাধারণ লোকের চাটুকারিতা করে এবং তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হবে। সেই সম্ভাবনা দূর করার জন্য দেশের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের (elite-এর) হাতে শাসনভার তুলে দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক জীবনের অমোঘ নিয়ম হল এই যে, মুষ্টিমেয় লোক বহুলোককে শাসন করবে; গণতন্ত্রেও এ-কথা সত্যি। কিন্তু গণতন্ত্রে ভয় আছে যে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোক নির্গুণ হবে। সুতরাং গণতন্ত্র বাদ দিয়ে অন্যভাবে গুণান্বিত গোষ্ঠীকে (elite-কে) ক্ষমতা দিতে হবে। কীভাবে যে 'এলিট'কে ক্ষমতা দেওয়া হবে এ সম্বন্ধে অবশ্য জনতা-শাসন-বিরোধী এই তাত্ত্বিককুল নীরব (বলা বাহুল্য এই তাত্ত্বিকগণ অনেকেই ফ্যাসিজ্‌মের সমর্থক।)।

একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। গণতন্ত্রের আলোচনা 'গণ'কে বাদ দিয়ে শুধু 'গোষ্ঠী'কে নিয়ে করা যায় কি না তা-ই আমাদের জিজ্ঞাস্য। আপাতদৃষ্টিতে বোধহয় যে রাজনীতির টানাপোড়েন যখন চলে গোষ্ঠীস্বার্থের ভাগ্য দিয়েই তখন রাজনীতি বোঝার জন্য জনস্বার্থের কথা ভাবা দরকার নেই। কিন্তু আসলে সকল গোষ্ঠীর ক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব এক নয়। কোনও গোষ্ঠীর ক্ষমতা কতখানি এবং তার গুরুত্ব কতটা তা বিচার করতে গেলেই গণতন্ত্রের গণদেবতার ইচ্ছার কথা আসে এবং জনকল্যাণের কথাও ফিস্‌ ফিস্‌ করে আর বলা যায় না। জনতার গর্জন ও জনকল্যাণের দাবি গণতান্ত্রিক রাজনীতি সভার প্রধান মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে ওপরের যুক্তিকে বলীয়ান করার চেষ্টা থাকবে।

॥ দুই ॥

প্রথম অংশে আমরা যে চিন্তাধারার সারাংশ দিয়েছি বিশ শতকের রাজনীতির লেখকরা সকলেই সেই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিবিদরা সকলেই মার্কস, টকেভিল, মিল, লী বন (Le Bon), মিশেল (Michels), মস্‌কা (Mosca) এবং বেবারের (Weber) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু আমেরিকানদের ওপর এই চিন্তাধারার দুই বিশেষ উপধারা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই দুই উপধারার বিষয়বস্তু হল রাজনীতিতে যুক্তিবিচ্ছিন্ন প্রচারের প্রভাব, এবং রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগাভাগিতে গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রচণ্ড চাপ। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই দুই উপধারাকে বিশ্লেষণ করতে চাই, কারণ সম্প্রতি কয়েকজন আমেরিকান লেখক ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে বই লিখেছেন এবং তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর এই দুই উপধারার স্নাতক। মায়রন উইনার, সেলিগ হ্যারিসন, রিচার্ড পার্ক, জীন ওভারস্ট্রাট এবং রাসেল উইভমিলারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের লেখাতেই রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠন ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। আধুনিক-ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি ছাত্রকে এঁদের লেখা পড়তেই হবে। সেইজন্য এঁদের তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন।

এঁরা সকলেই অবশ্য রাজনীতির 'বৈজ্ঞানিক' আলোচনায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁরা গোড়াতে কোনও বিশেষ তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করেন না; পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁরা তত্ত্ব খাড়া করেন। আসলে এ ধরনের প্রতি উক্তিই অংশত ভ্রমাত্মক। বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুধু যদি কতগুলো ঘটনার অসংবদ্ধ কখনও না হয়, তার পেছনে তত্ত্ব থাকবেই। এবং এই তত্ত্ব প্রধানত আধুনিক আমেরিকান রাজনীতিবিদ্‌দের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

এঁরা সকলেই pluralism বা বহুকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী; এই কেন্দ্রগুলি ব্যক্তিমানস নয় বা আঞ্চলিক গণসমষ্টির ইচ্ছা নয়, এই কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর ইচ্ছা। রাজনীতির টানাপোড়েনে সরকার

কোনও-না কোনও স্বার্থের ক্ষতি অথবা উপকার করবেই। সরকার অনেক সময় শ্রম আইনের মাধ্যমে মালিকের আর্থিক ক্ষতি করেন, অন্যদিকে বিদেশি পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়ে দেশি ব্যবসায়ীদের পকেটে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে দেন। যদিও প্রতিটি রাজনীতিবিদ জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে ভোট চান এবং নির্বাচিত হন, এই রাজনীতিবিদদের বাঁচাতে হয়; তাঁদের নিজেদের নির্বাচনকেন্দ্রের মাতব্বর লোকেদের স্বার্থ বিশেষ করে দেখতে হয়, নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দরকার হয়, ভালো প্রেস বজায় রাখার জন্য ব্যবসায়ী, মিলমালিক ইত্যাদির শরণাপন্ন হতে হয়, কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের সংবাদপত্রগুলো ব্যবসায়ীদেরই করতলগত। এই অবস্থায় রাজনীতিতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী এবং গণতন্ত্রের শাসকদের প্রতিপদে এই সব স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে।

সুতরাং গণতন্ত্রের শাসক কোনও abstract সমাজকল্যাণের ধারণার দ্বারা চালিত হতে পারে না। 'সর্ববৃহৎ জনসমষ্টির সর্বোত্তম মঙ্গল সাধন' কীসে হবে এ নিয়ে মতবিরোধ থাকবেই; যদি শাসকের এই ধরনের কোনও লক্ষ্য থাকেও তিনি সেই আদর্শ বেশিদিন অনুসরণ করতে পারবেন না, কারণ সকল লোকের মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে তিনি কোনও বিশেষ গোষ্ঠীরই মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। সরকার যদি সর্বজনের কল্যাণ সাধনেই সারাক্ষণ তৎপর না হতে পারেন, তবে রাজনীতিবিদরাই বা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? নীতি কী, ন্যায়নীতি কী, ন্যায়নীতি ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতার সময় উনিশ শতকের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। এখন সৎ রাজনীতিবিদদের কর্তব্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া—সোজা কথা রাজনীতির মারপ্যাঁচ—খুঁটিনাটিভাবে লক্ষ করা এবং গণতন্ত্রের ধারকদের বলা কখন তারা আপস ও মীমাংসার পথ ছেড়ে একনায়কতন্ত্রের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হচ্ছে।

মায়রন উইনারের বই *The Politics of Scarcity*[১] উপরিউক্ত মতের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই বইটির উপশিরোনাম (subtitle) হল 'Public Pressure and Political Response in India'। এই subtitle দিয়ে বইটির বিষয়বস্তু সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। কীরূপে এবং কারা ভারতীয় সরকারের উপরে চাপ দিচ্ছে এবং সরকার কী কী ভাবে এই চাপের ফলে কাজ করেছে এই হল উইনারের গবেষণার প্রধান বিষয়। সরকারের উপরে চাপ দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী অথবা স্বার্থসংস্থা (interest group) তৈরি হয়। উইনার বিশেষ করে পাঁচ ধরনের স্বার্থসংস্থার প্রভাব আলোচনা করেছেন; প্রথমত জাতি (caste), ভাষা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত সংস্থা (Community Associations), শ্রমিকসংঘ (Trade Unions), ব্যবসায়ী সংঘ (Origanized Business), কৃষকদের দল ও আন্দোলন (Agrarian Movements), এবং ছাত্রসংঘ। সরকার কীভাবে এই সব সংস্থার দাবির সম্মুখীন হয়েছে তার আলোচনা তিনি করেছেন; তাঁর আলোচনার প্রধান উদাহরণ হিসেবে কাজ করেছে পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে কলকাতার বিভিন্ন আন্দোলন।

উইনারের প্রধান প্রতিপাদ্য (thesis) নিম্নলিখিতরূপ : কংগ্রেসে সরকারের মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদান প্রদান বা bargaining-এর পরিপন্থী হয়েছে। তাঁরা যেন সারা দেশের অভিভাবক এইভাবে তাঁরা কাজ করেছেন। ফলে আন্দোলন অনেক সময় মন্ত্রণাগৃহ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে। এবং রাস্তায় শ্লোগান ছোড়া পরিত্যাগ করে আন্দোলনকারীরা ইটপাটকেল ছুড়েছে। উইনারের বক্তব্য এই যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এভাবে দানা বাঁধে না। গণতন্ত্র সমস্ত দেশেই (বিশেষ করে আমেরিকায়) দুই বা বহু স্বার্থসংস্থার আদান-প্রদানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতবর্ষের আর্থিক প্রগতি দরকার; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি এখানে গণতন্ত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং বাঁচতে হয় তবে আদানপ্রদান মনোভাবকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

উইনারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অধিকাংশ লোকই একমত হবেন। কিন্তু যে-পদ্ধতিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেই পদ্ধতি পরীক্ষা করলে অনেক সংশয় মাথা চাড়া দেয়।

প্রথমত, কংগ্রেস সরকার কেন এ-রকম অভিভাবকসুলভ আচরণ করবেন? তাঁদের লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর উইনারের আর একটি প্রবন্ধে (Some Hypotheses on the Politics of Modernization in India[২]) খুব পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। তাঁর মতে ভারতবর্ষের elite প্রধান দুইভাগে বিভক্ত : একভাগ ভারতবর্ষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে 'আধুনিক' করে তুলতে চায়, আর এক ভাগ পুরোনো সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইভাবে ভাগ করলে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ও স্বতন্ত্র দলের বড় অংশই একদিকে পড়ে আর অন্যদিকে শুধু জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি দলগুলো পড়ে। উইনারের সংজ্ঞার বন্ধ্যাত্ব এর থেকেই খানিকটা বোঝা যাবে।

তিনি আরও একটি বিভাগের কথা অবশ্য স্বীকার করেছেন :

> India is thus fragmented in at least two ways. There is, first of all, the fragmentation of the western-nonwestern gorups..., and secondly, the fragmentations which involve ethnic, class, religious, and linguistic pluralisms.
>
> (উল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ধরনের বিভাগকে তিনি ভারত রাজনীতি সমুদ্রের ওপরের তরঙ্গমালা মনে করেন :

> Politics in India represents more than a set of conflicts between interest groups, as we have noted throughout this paper, involve something far deeper : the conflict between the forces for modernization and those against.
>
> (উল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৩৭)।

প্রবন্ধের এই মত তিনি তাঁর বই *The Politics of Scarcity*-তে পরিবর্তন করেছেন। বইতে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের সংঘাতকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এবং তাঁর একটি প্রধান বক্তব্য হল এই যে ভারতীয় রাষ্ট্র যে পরিমাণে এই সব গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারবে, এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সেই পরিমাণেই উজ্জ্বল হবে।

শ্রীযুক্ত উইনারের বিশ্লেষণের গোড়াতেই দুটি মারাত্মক ত্রুটি থেকে গেছে। প্রথমত তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গঠন কোনওরকম ভাবেই পর্যালোচনা করেননি। কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে যে অবস্থায় ছিল, আজও প্রায় সেই অবস্থায়ই রয়ে গেছে, অর্থাৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদলের সমন্বয়। কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দুসমাজের কিছু সাদৃশ্য আছে : বেদ অভ্রান্ত এবং উপনিষদ্ ভগবদ্-আদিষ্ট মেনে নিলেই যেমন হিন্দু হওয়া যায়, একেশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী সকলেই হিন্দু নামে আখ্যাত হতে পারে। ঠিক সেই রকম গান্ধী এবং নেহরুর বাণী সমস্ত আচরণের মূলসূত্র বলে মেনে নিয়ে কার্যক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী, অসমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলেই কংগ্রেসি বলে চলে যেতে পারে। একটি জায়গাতে অবশ্য এখনও দ্বিধা থেকে যায় (ঠিক যেমন দ্বিধা ছিল চার্বাকবাদীরা হিন্দু কি না এই সমস্যা নিয়ে) : কেউ যদি নিজেকে অহিংসা ও সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন; তিনিও কি কংগ্রেসি বলে গণ্য হবেন? বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকেদের মধ্যে সংঘর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসি ঘেরাটোপের আড়ালেই চলে, সাংবাদিকের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। তাছাড়া অনেক সময়েই কেন্দ্রের হুকুম সোজাসুজি অমান্য না করে বিভিন্ন রাজ্যসরকার কার্যক্ষেত্রে শুধু নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা বানচাল করে দেন। সমবায় পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থা করতে না পারা এ কথার জ্বলন্ত

নিদর্শন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কংগ্রেসি সভাসমিতির রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে কংগ্রেসের ভেতরের দলাদলির অনেক খবরই বেরিয়ে আসে। কী নিশ্চিন্ত উপায়ে রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনি প্রেস রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত উইনারের আলোচনার আর একটি মূলগত দোষ হল তিনি নতুনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের প্রভেদের স্বরূপ নানাভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় বিভেদের কথা প্রায় উহ্য রেখেছেন : সে বিভেদ হল ধনী ও নিঃস্বের বিভেদ। এই বিভেদ পরিষ্কারভাবে আলোচনা করতে গেলেই দেখতে পেতেন স্বাধীন ভারতে নামত যে দল বা উপদলের হাতেই শাসনভার থাক না কেন, ক্ষমতা আছে ধনীদের হাতে। (কেরালার কমিউনিস্ট সরকার কয়েক মাসের শাসনকালে এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেনি; এবং তাদের অপসারণের মূলেও ছিল ধনীর হাত থেকে অপেক্ষাকৃত নির্ধনের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা এবং ধনীর তরফ থেকে তার প্রতিরোধ।) ভারবর্ষে ঠিক কয়েকটি শ্রেণী আছে তা নিয়ে মতদ্বৈত থাকতে পারে, এবং শুধু অর্থসম্পর্কধৃত শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে ভারতবর্ষের রাজনীতি বোঝা যাবে না এ বিষয়ও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ দুষ্কর এবং সব বৈজ্ঞানিক সমস্যার মুশকিল আসান নয় বলেই শ্রেণীর সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা হবে না এ কোন ধরনের যুক্তি?

শ্রেণীর কথা বলতে গেলেই শ্রীযুক্ত উইনার দেখতে পেতেন যে, আধুনিকতার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সমাজের যে-সব নেতারা কথা বলছেন তাঁরা প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত ধনী স্তর থেকে এসেছেন। তিনি এ-ও দেখতে পেতেন যে সমাজবাদী দলের অনেক নেতাও ধনীসম্প্রদায়-উদ্ভূত, আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী কিন্তু তথাপি কংগ্রেসিদের সঙ্গে গোড়াতে এক বিরাট পার্থক্য : কংগ্রেস সোজাসুজি নির্ধনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চায় না[৩], সমাজবাদী দলের লোকেরা চায়। অনুসন্ধান এর পরে দুইদিকে চলবে : একদিকে দেখতে হবে ধনীদের হাতেই যারা ক্ষমতা রাখতে চায় তাদের মধ্যে বিভেদ উঠছে কেন। আর একদিক থেকে দেখতে হবে সমাজবাদীদের সঙ্গে অন্য নতুনপন্থীদের কার্যপ্রণালীর আসল প্রভেদ কোথায়।

স্বাধীনতার পরেই ভারতবর্ষের বিত্তবানদের মধ্যে বড় এক সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল, সে সংঘর্ষ জমিতে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার নিয়ে। কংগ্রেস সরকার সে অধিকার তুলে দিয়েছে। আজ অনেক দিক থেকে ভারতের বিত্তবান শ্রেণী অনেক বেশি সুসংবদ্ধ : তারা সকলেই সরকারি ব্যয় থেকে লাভ করছে এবং করবে; কিন্তু তারা পরিকল্পনাকে এমন এক জায়গায় যেতে দিতে চায় না যেখানে সত্যি করে তাদের ক্ষমতার উপর হাত পড়বে। (জাতীয়করণের দ্বারা ক্ষমতা কমে না, বরং কয়লা শিল্পের মতো লোকসানের ব্যবসাকে জাতীয় মালিকানায় আনলে মালিকশ্রেণীর লাভ আরও বাড়ে।) এই ব্যাপারে গ্রামীণ ও শহুরে বিত্তবান একেবারে একমত। আস্তে আস্তে গ্রামে ধনতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়াস হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নগর ও গ্রামের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব কমে আসছে।

ভারতের বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে অন্য অনেক বিভেদের কারণ আছে : ভারতীয় রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় এই সব বিভেদের আলোচনা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু গত সতেরো বছর ভারতের বিত্তবান শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ঐক্য বিশ্বাসের কথা জোর দিয়ে না বললে সে আলোচনা একেবারে একপেশে হয়ে যাবে।

বিত্তবান শ্রেণীর জয়যাত্রার পাশাপাশিই আছে নির্ধন মানুষের শ্লথগতি। (উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে ধনীনির্ধন উভয়ের জয়যাত্রা সম্ভব, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ধনীর আত্মম্ভরিতা অবশ্যই হ্রাস করতে হবে)। নির্ধন মানুষ কারা? সবার নীচে আছে ভূমিহীন মজুরের দল—প্রতি পাঁচজন ভারতবাসীর একজন ভূমিহীন মজুর। আর আছে ছোটচাষি—প্রতি চারজন ভারতবাসীর একজন ছোটচাষি; প্রায় কোনও বছরই তারা বছরের ফসলে কুলোয় না; যেটুকু ফসল যে পায় তারও বড় অংশ ফসল ওঠার সময় যায় মহাজনের ঘরে, কারণ ধার করেই তাকে চাষের কাজ ও সংসার চালাতে হয়। আর আছে শহরাঞ্চলের বেকার যুবক,

মধ্যবয়সি ও বৃদ্ধের দল, আর রেলওয়ে, পোর্ট, কলকারখানায় খেটে খাওয়া casual labour যারা বছরের পর বছর একই জায়গায় কাজ করেও regular বলে গণ্য হয় না, কাজে কাজেই সমস্ত রকম শ্রম আইন ও শ্রম বীমা ব্যবস্থার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

ইতিহাসের প্রগতির পথে অবশ্যম্ভাবী জঞ্জাল (?) গোটা জাতির প্রায় অর্ধাংশকে এইভাবে নাকচ করে দিতে বুকের পাটার এবং এক ধরনের জ্যাঠামোর প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই এই নির্ধন অংশকে সারাক্ষণ কাজে লাগিয়েছে কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার এতটুকু চেষ্টা করেনি। সমাজবাদী দলগুলির কার্য পরিকল্পনায় অবশ্য এই নির্ধনদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাঁরাও বেশিরভাগ সময় নির্ধনদের মিত্রশ্রেণীর—অর্থাৎ কলকারাখানার অপেক্ষাকৃত ভালো মাইনে পাওয়া শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, নিম্নমধ্যবিত্ত ইত্যাদির সমর্থন লাভের চেষ্টায় বেশি ব্যস্ত থাকেন। হয়তো অল্পদিনের কৌশল হিসেবে এতে কাজ দেবে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য ভূমিহীন শ্রমিক ও ছোট চাষির উপর নির্ভর না করে তাঁদের কি কোনও উপায় আছে?

বিত্তবান শ্রেণীর অধিকাংশের কার্যকলাপই নগরে। সুতরাং অনেক সময়েই তারা গ্রামের সমস্যাগুলোর সম্বন্ধে অবহিত নয়। সেই জন্যই তাদের গৃহীত অনেক নীতি অবাস্তব প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু সব সময়ে দোষের কারণ গ্রাম-নগর বিভেদ নয়, দোষের মূল কারণ ধনীনির্ধনেব বিভেদ। একজন ভূমিহীন গ্রাম্য শ্রমিকের জীবধারণের সমস্যা একজন সাধারণ বিত্তবান নাগরিকের পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর। শ্রীযুক্ত উইনারের গোষ্ঠীস্বার্থের বিশ্লেষণ এই জন্যই পল্লবগ্রাহী মনে হয় যে ভারতবর্ষের বিত্তবান শ্রেণী কীভাবে আইন ও শাসন ব্যবস্থা নিজেদের কাজে লাগিয়েছে তার কোনও আলোচনা তাঁর বইতে নেই। আশা করি কোনও ভারতীয় রাজনীতির ছাত্র আমাদের জ্ঞানের এই বিশাল শূন্যতা শীঘ্রই পূর্ণ করবেন।

এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছিস ক্ল্যাসিক্যাল ও তথাকথিত আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণার তুলনা দিয়ে। আধুনিক আমেরিকানদের আলোচনায় গোষ্ঠীস্বার্থ যথেষ্ঠ প্রাধান্য পায় : রাজনীতি যেহেতু অধিকাংশ সময়েই দার্শনিক আলোচনা নয় অতএব স্বার্থের নগ্ন সংঘাত যত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায় ততই আলোচনা বেশি বৈজ্ঞানিক হবে। কিন্তু দার্শনিক আলোচনা অথবা সমাজনীতি ও মানবনীতির জন্য এই যুদ্ধ তাই বলে অবান্তর হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কল্যাণ একটি অত্যন্ত সোজা ধারণা; এই কল্যাণের বিরুদ্ধে আক্রমণের রূপও অত্যন্ত সোজা। শ্রমিকশ্রেণী অথবা ছাত্রশ্রেণীর গোষ্ঠীস্বার্থ যে সাধারণ মানুষের কল্যাণের সবচেয়ে বড় শত্রু নয় সে তো জানা কথাই। সুতরাং সমস্ত গোষ্ঠীস্বার্থকে একই ভাবে দেখার অর্থ প্রগতির বাধাগুলোকে চিরস্থায়ী বলেই মেনে নেওয়া হবে।

শুধু সমাজকল্যাণের দিক থেকে নয়, বৈজ্ঞানিক আলোচনার দিক থেকেও সমস্ত গোষ্ঠীস্বার্থকে সমান মনে করা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক হবে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামার একটি মূল কাবণ অর্থনীতিক; ভাষাগত, জাতিগত বিভেদ যাই থাকুক না কেন, আশু আর্থিক লাভের আশাই গুন্ডা, বেকার ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে প্ররোচিত করে। এই সাধারণ সত্য গোষ্ঠীস্বার্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রায়শ ঢাকা পড়ে যায়।

তাছাড়া অনেক সংঘাত পরিবর্তনশীল সমাজের গতির লক্ষণ মাত্র। এই সংঘাতগুলোর মধ্য দিয়ে যে-সব দল-উপদলের জন্ম হয় সেগুলোর জীবন দীর্ঘ নয়। তাদের যদি আর্থিক অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমপর্যায়ে দেখা যায়, তবে সিদ্ধান্তগুলো বেশ একপেশে হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও আর্থিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী করা বিরাট উদ্যমসাপেক্ষ। সামাজিক অগ্রগতির বহু শত্রু চারপাশে বর্তমান। সবচেয়ে বড় শত্রু সেই সব প্রতিষ্ঠিত ধনী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে যাঁদের ধর্মসঞ্চয় ব্যাহত হবে। প্রতিটি ভারতবাসীকেই তার যথেচ্ছাচারের ওপর হস্তক্ষেপ মেনে নিতে হবে, কারণ বহু কাজেই একের সামর্থ্য ও উদ্যম নিস্ফল হবে এবং বহুর উদ্যমের সাফল্যের জন্য সমষ্টির শৃঙ্খলার

প্রয়োজন হবে। এই রকম অবস্থায় যদি সত্যিই মেনে নিতে হয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নীতি, আদর্শ ইত্যাদির কোনও স্থান নেই তবে অসহায় ভাবে ভাগ্যচক্রের—অথবা গোষ্ঠীচক্রের—আবর্তনের অপেক্ষা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা দেখেছি, বৈজ্ঞানিক আলোচনার অর্থ সমাজনীতি-আলোচনা বাদ দেওয়া তো নয়ই, উপরন্তু সমাজনীতি-আলোচনা ছাড়া রাজনীতির বহুরূপকে বুদ্ধির আওতায় আনার কোনও উপায়ই দেখা যায় না। সুতরাং এখনকার মতো আমাদের আমেরিকান শিক্ষকদের বর্ণনা-অংশটুকুতে তাঁদের অনুসরণ করে পরিষ্কার বিবেক নিয়ে আমরা আবার রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের অসমাপ্ত কাজে ফিরে যেতে পারি; নির্ধন, অশিক্ষিত ভারতীয়কে তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

সূ ত্র নি র্দে শ

১. Asia Publishing House, Bombay, 1963.

২. Richard L. Park and Irene Tinker (ed) : Leadership and Political Institutions in India (Madras, 1960)

৩. নির্ধনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং দরিদ্রকে নারায়ণ বলে ভক্তি করা বা দরিদ্রকে দরিদ্র রেখে আর কোটিপতিকে কোটিপতি রেখে তাদের সমান সম্মান দেওয়া যা এককথা নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
(কার্তিক-অগ্রহায়ণ১৩৭১)

শিশিরকুমার দাস

রামেন্দ্রসুন্দর

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষী মূলত ইউরোপের সাহিত্য সংস্কৃতির-ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপের নবজাগরণের শক্তির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় এই সাহিত্য ধারার মধ্যে দিয়েই ঘটেছিল কিন্তু নবজাগরণের শক্তির একটা বড় দিকের সঙ্গে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপরিচয় ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের। ইউরোপে, গ্যালিলিওর সময় থেকেই বলা চলে যে সংস্কৃতির দুটি ধারাই পাশাপাশি বয়ে চলেছিল, একটি সাহিত্য দর্শন শিল্পের আর অন্যটি বিজ্ঞানের। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এই দুটি ধারারই সম্মিলনে গড়ে উঠেছে। ইতালিতে নবজাগরণের সময় থেকেই ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা বলে ঐতিহাসিকেরা অভিহিত করেছেন। এই আধুনিক যুগের স্বকীয় রূপ প্রতিষ্ঠা পেল প্রকৃতপক্ষে আরও পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন থেকে বিচিত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানুষের দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হল। নবজাগরণের সময় পর্যন্ত প্রাচীনের সঙ্গে নবীন যুগের ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠেনি। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *পশ্চিমি দর্শনের ইতিহাস*-এ লিখেছেন:

> নবজাগরণের কালে ইতালিয়ানরা এমন কোনও গ্রন্থ লেখেননি যা প্লেটো বা অ্যারিস্টটল পড়ে অর্থোদ্ধার করতে পারতেন না; লুথারের লেখায় টমাস অ্যাকুইনাস হয়তো ভীত হতেন, কিন্তু তাঁর বুঝতে কোনও অসুবিধে হত না। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল অ্যাকুইনাস এবং ওকাম কেউই নিউটনের তত্ত্বের কিছুই বুঝতে পারতেন না।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির যখন পরিচয় ঘটেছিল, তখন সেই সংস্কৃতির এই আধুনিকতম ধারাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেনি।

ইউরোপীয় ভাব-ভাবনা আমাদের জীবনে অনেকটা আলোড়ন এনেছিল, আমাদের উনিশ শতকের পূর্বপুরুষেরা সেই ভাব-ভাবনার প্রতি গভীরভাবে আকর্ষণও বোধ করেছিলেন কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক ধারাটিকে আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার থেকেই একটি নূতন জীবন দর্শন গড়ে উঠতে পারত। ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে যখন প্রবর্তিত হল তখন থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হল সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা, দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের কাছে ব্যবহারিক বিদ্যা মাত্র হয়ে রইল, তা এক নূতন জীবনদর্শনের বাহন রূপে দেখা দিল না। এই নূতন জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আর এই মানসিকতার জন্ম হতে পারে যেখানে মন মুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তা এবং জিজ্ঞাসার একটি পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রধান স্থপতি চারজন— কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটন। অন্যপক্ষে ভারতবর্ষে, বৈজ্ঞানিক চিন্তার একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা নেই বললেই হয়। এবং ধর্ম এবং দৈব যেখানে প্রবল সেখানে বৈজ্ঞানিকচিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হবার সুযোগই পায় না। এর সঙ্গে হয়তো এটুকুও বলা দরকার যে পরাধীন দেশে মনের স্বাধীনতা স্বভাবতই খর্ব হয়, মুক্ত জিজ্ঞাসার ধারা দীর্ঘজীবী হতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম সব মিলিয়ে যে বিরাট জাগরণ ঘটেছিল তার একটি দুর্বলতা এইখানে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব বিশেষ ধর্মান্দোলনের পর্ব, সমাজ সংস্কারের পর্ব। বাঙালি মনীষা মূলত ওই দুটি ক্ষেত্রেই তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল। বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী একটি মানুষের পরিচয় অবশ্য আমরা জানি—তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তাঁর আগেও অনেকে বিজ্ঞানগ্রন্থ বাংলায়

লিখেছেন, কিন্তু তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানে উৎসাহ বোধ করেছেন। বিজ্ঞানে এই উৎসাহ নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে নয়, আত্মিক প্রয়োজনেও। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ বিচার' এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ফসল। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও গড়ে তুলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানপ্রিয় বাঙালি সাহিত্যিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞানচর্চার বাঙালির উৎসাহ বেড়েছিল সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালির কৃতিত্বের কথাও আমরা শুনেছি। কিন্তু সেই সব বিজ্ঞানীরা তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির কাঠামোতে নূতন উপাদান সংযোজন করার চেষ্টা করেননি, অন্যদিকে সাহিত্য সাধকরা সেই বৈজ্ঞানিক চৈতন্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বিলম্ব করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য করেছেন। সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন। তিনি যে সময় *বিষবৃক্ষ* লিখছেন সেই সময়ই *বিজ্ঞান রহস্য*-এর প্রবন্ধগুলি লিখছেন। অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছেন তা মূল্যবান। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বৈজ্ঞানিক গদ্যের পথ রচনা করেছেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটি জটিল অংশকে আমাদের মাতৃভাষার মধ্যে প্রকাশ করার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুটি কারণে তখনও পর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশা অতৃপ্ত থেকে যায়। প্রথমত, অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই মুখ্যত বিজ্ঞানের ছাত্র নন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা দুজনেই ছাত্রদের জন্য যা ইংরেজি না-জানা বাঙালির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। আমাদের প্রত্যাশা, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির জন্যই বাংলায় বৈজ্ঞানিক গদ্য এবং তার লেখক হবেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তার ফলেই আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান অংশই হয়ে উঠবে বৈজ্ঞানিক গদ্য, পরিণত মনের আকাঙ্ক্ষিত ভোজ্য। এই প্রত্যাশা প্রথম যিনি পূরণ করলেন তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। তার মাত্র পাঁচ বৎসর আগে ডারউইনের *Origin of Species* প্রকাশিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স যখন আট তখন বেরুল বঙ্কিমচন্দ্রের *বিজ্ঞান রহস্য*। ১৮৮১-তে রামেন্দ্রসুন্দর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। এই বছরই তাঁর প্রিয় বৈজ্ঞানিক হেল্‌মহলৎস বিদ্যুৎ সম্পর্কে তাঁর নূতন প্রতিপাদ্যটি আবিষ্কার করেন। অন্য সব পদার্থের মতোই বিদ্যুৎও পরমাণুর সমষ্টি। ১৮৮৬-তে রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন বিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। এই বছরটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে অতি স্মরণীয়। মাদাম কুরী এই বছর রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। এক বছর পরে ১৮৮৭ তে পদার্থবিদ্যায় এম এ পাশ করেন রামেন্দ্রসুন্দর, এবারও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এই বছরটিও বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় বছর। এতদিন পর্যন্ত ইথার নামক ভারহীন এক কাল্পনিক বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা। মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষায় তার অস্তিত্ব কল্পনা করার আর প্রয়োজন থাকল না। রামেন্দ্রসুন্দরের 'শক্তি' এবং 'অভিব্যক্তি' নামক দুটি প্রবন্ধ বেরোয় ১৮৯৪-৯৫-এ, আর এই সময়েই রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪-এ, এই বৎসরই স্যার জগদীশচন্দ্র বোস লন্ডনে কেলভিন, জে. জে. টমসন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সামনে তাঁর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্পর্কিত পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *জিজ্ঞাসা*। তার এক বছর পরেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

এই হল রামেন্দ্রসুন্দরের সময়। এরই মধ্যে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন, চিন্তা করেছেন এবং লিখেছেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনীষীদের বিভিন্ন আবিষ্কার এবং চিন্তার সঙ্গে যেমন একদিকে তিনি পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই নবীন ভারতীয় বিজ্ঞানছাত্রদের গবেষণার ধারা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। তিনি হেল্‌মহলৎস, কেলভিন, রাদারফোর্ড বা হাক্সলির গ্রন্থাদি গভীর ভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য ও চিন্তার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির যোগাযোগ ঘটুক এ চেষ্টা তিনি করেছেন। তবু নিজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানচর্চায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। তিনি

কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেননি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকেও তিনি নিজে বিশেষ দূর প্রসারিত করতে পারেননি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যে জ্ঞান আমরা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দের কাছ থেকে পেতে পারি, তা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, এই ছিল তাঁর কামনা। এ বিষয়ে তাঁর বৃত্তি তাঁকে সাহায্য করেছিল। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞান এক নৈর্ব্যক্তিক তথ্যসমষ্টি এবং জ্ঞানের সমষ্টি, তা তখনই আমাদের জীবনকে অর্থবান এবং প্রাণবান করতে পারবে যখন সেই নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানরাশিকে আমাদের সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে নিতে পারব। সেই জন্যই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পঠিত হোক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এটি তাঁর ইচ্ছামাত্র নয়, তিনি মুখে বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বাংলাতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনাও আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সূচনা এই ভাবেই। একই সময়ে যখন জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তখন সমপ্রতিভাপ্রাণ ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করলেন। দুটি কাজ পরস্পরের পরিপূরক। নূতন যুগের বৈজ্ঞানিক গঠনের পথপ্রস্তুতি।

এই বিজ্ঞানের শিক্ষা শুধু ক্লাসের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, রামেন্দ্রসুন্দরের লেখার মধ্য দিয়ে তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিকীর্ণ হল। এই সব লেখার মধ্য দিয়ে এক বিশ্বের ছবি এঁকেছেন তিনি। এই বিশ্বচিত্রের উপাদান প্রধানত তাঁর সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা। আর অংশত তাঁর নিজস্ব জীবনচিন্তা। যে বিশ্বের সঙ্গে তিনি পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন, সে বিশ্ব সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী। সেই বিশ্ব পদার্থ দিয়ে গড়া। পদার্থ গড়া অনুপরমাণুতে। স্থিতি বিজ্ঞান এবং গতিবিজ্ঞানের নিয়মাবলির দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। সমস্ত রাজত্বটাই নিয়মের রাজত্ব।

এই বিশ্ব সুবৃহৎ। এত বৃহৎ যে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। এই বিশ্বসংসার বৃহৎ। মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এই বিশ্ব অতি প্রাচীন। মানুষ নিতান্ত নবাগত। তার ফলে মানুষের সামনে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। এই বিশ্বে তার স্থান কতটুকু। এই স্থানের বিশালতা এবং কালের ব্যাপ্তি দুই-এর মাঝখানে তার অস্তিত্বের অসহায় রূপ ফুটে ওঠে। একদা মানুষের ধারণা ছিল মানুষের গ্রহ এই পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র। তারই চারিদিকে সূর্যের আবর্তন। কোপারনিকাস এই ধারণাকে চূর্ণ করেন। বিশ্বজগতের কেন্দ্র থেকে পৃথিবী তার কাল্পনিক গৌরব ভ্রষ্ট হল। আর পৃথিবীর মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের প্রাচীনত্ব এবং মহত্বের গৌরবও চূর্ণ করলেন ডারউইন। ভূতাত্ত্বিকেরা লক্ষ লক্ষ বছরের পরিমাপে কথা বলে দেখালেন পৃথিবী কত প্রাচীন। কত লক্ষ বছর সেখানে প্রাণের আবির্ভাব হয়নি। আর মানুষ কত নবীন। জ্যোতির্বিদেরা লক্ষ আলোকবর্ষের পরিমাপে কথা বলে দেখালেন কত অজস্র গ্রহতারার মধ্যে পৃথিবী একটি। কত তারার আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌছায় না। কী বিশাল ব্যাপ্তি-স্থানের এবং কালের। স্যার জেমস জীনস লিখেছেন পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরের সমগ্র বালুকারাশির সংখ্যা যত বিশ্বজগতের নক্ষত্রসংখ্যা প্রায় তারই কাছাকাছি। আর পৃথিবী সেই নক্ষত্র সংখ্যার একটি। এই বিশ্বচিত্রে আশা নেই, আলো নেই। অসহায়তার অন্ধকার। রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন:

> মনুষ্য যখন জগতের মধ্যে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্বের সহিত বুক ফুলাইয়া নিশ্চিন্ত ছিল, এবং যখন বিজ্ঞান বিদ্যা তাহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কর্মে নিযুক্ত রহিয়া মনুষ্যের জয়ঢক্কা বাজাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিজ্ঞানই আবার মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, প্রভু, প্রভুত্ব গর্বে গর্বিত হইও না; তুমি জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি তৃণাদপি সুনীচ, তুমি বালুকণা হইতেও অধম।

কিন্তু এই আশাহীন বিশ্বজগৎ-এর যে ছবি রামেন্দ্রসুন্দর এঁকেছেন তারই পাশে পাশে আছে আশার ছবি। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের কাছ থেকেই সত্যের রূপের সন্ধান করেননি। সত্য তাঁর কাছে কবিকথিত সেই বিচিত্র বর্ণ-স্ফটিক। বিজ্ঞান তার সমস্তরূপ দেখতে পায় না—এই ছিল তাঁর ধারণা। বিজ্ঞান স্বভাবতই সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করতে এখনও সমর্থ নয়

নয় এবং একটি জিনিসেরও সামগ্রিক সত্যের রূপ বিজ্ঞান দিতে উৎসাহী নয়। সি ই এম জোডের ভাষায় বলি, '... it only provides us with partial truth about those aspects of things which it has selected for treatment because they are amenable to its methods.' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের তৈরি এই যান্ত্রিক বিশ্বের শৃঙ্খলায় বৈজ্ঞানিকরা সন্দেহ করলেন। রামেন্দ্রসুন্দর আর কিছুদিন জীবিত থাকলে দেখতে পেতেন যে পরমাণুর আচরণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান যখন আরও সম্পূর্ণতা লাভ করল তখনই ঊনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিশ্বের নিয়মের রাজত্বে অরাজকতার সন্ধান পাওয়া গেল। সাধারণত দেখা গেছে যে একটি বৈদ্যুৎ কণিকা একটি চক্র থেকে অন্য চক্রে লাফ দেয়, যখন তা তেজ আহরণ করে তখন ভেতরের চক্র থেকে বাইরের চক্রে, আরও যখন তেজ বিকিরণ করে তখন বাইরের চক্র থেকে ভেতরের চক্রে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারছেন না, এর কারণ কী, কখন এবং কেন, এবং কোনটি কোন চক্র থেকে চক্রান্তরে যাবে। একেই বলা হয়েছে পরমাণুর free-will। এই free-will পদার্থবিদ্যায় অনির্দেশ্যবাদের জন্ম দিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনজিজ্ঞাসাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বৈজ্ঞানিকের সৃষ্ট জগতের মধ্যে জীবনের অস্তিত্বের মূল্য আবিষ্কার করেছেন। প্রথমে আমরা লক্ষ করেছি তাঁর জীবনে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সাধনার একটি ধারা যেমন বয়ে চলেছিল তেমনই আর একটি ধারা বইছিল তা হল দর্শনের। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে বাংলাদেশে দার্শনিক চিন্তারও বিশেষ বিকাশ হচ্ছিল। সেই দার্শনিক চিন্তা মূলত আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গেই জড়ানো। এই সময়ে নূতন করে হিন্দুত্বের অভ্যুদয়, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা, বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার স্বাভাবতই রামেন্দ্রসুন্দরের সংবেদনশীল মনে সাড়া জাগিয়েছিল। ইউরোপে এবং আমেরিকায় দার্শনিক চিন্তার এক নূতন ধারা গড়ে উঠেছিল। উইলিয়াম জেমস-এর The Willto Believe and other Essays, ১৮৯৭, Pragmatism, ১৯০৭; ১৯০৭; জি. ই. মুর-এর Principia Ethica, ১৯০৩; ক্রোচের Philosophy of Spirit, /১৯১৩-২২; জর্জ সান্টায়নার The Life of Reason, ১৯০৫-৬; বার্গসঁর Creative Evolution ১৯১১, এবং, হোয়াইটহেড এবং রাসেল-এর Principia Mathematica, ১৯১০-১৩- এই সমস্ত গ্রন্থ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবৎকালে এবং সক্রিয় চিন্তার কালেই প্রকাশিত হয়েছে এবং এঁদের অনেকেরই লেখার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনচিন্তা মূলত গড়ে উঠেছিল পাশ্চত্য metaphysician-এর চিন্তার সঙ্গে Vedanta-র সমন্বয়ে। তাঁর কাছে চরম সত্য হল আমি-বোধের চিরজীবী ধারা বা আত্মার অবিনাশিতা। যখন বিজ্ঞানের জগতে মানুষের স্থান সংকীর্ণ, তার গৌরব লুণ্ঠিত তখন রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চান, "আমিই এই বিশ্বজগতের কল্পনা কর্তা, এবং আমিই উহার রচনা কর্তা; আমি উহার রূপ দিয়াছি এবং আমিই উহার 'নাম'।" যখন রাসেলের মতো দার্শিনিক বলবেন :

> The man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving... এবং ... no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve individual life beyond grave.

রামেন্দ্রসুন্দর তখন সেখানে বলবেন :

> সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুইটা কাল্পনিক প্রত্যয় বিশালকায় বিস্তার করিয়া আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্ব ও এমনকি, শক্তির অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু এই দেশ ও কাল যেন কী একটা বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মান করিয়া রাখে। আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমার পূর্বে ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আমাকে অবসন্ন

করিয়া কি এক বিভীষিকা দেখায়।.. বস্তুত দেশ ও কাল আমারই কল্পনা বা আমারই সৃষ্টি। আমার প্রত্যয়গুলিকে আমি দুইটা রীতিতে সাজাইয়া থাকি, তাহার মধ্যে একটা সজ্জার নাম দেশ, আর একটার নাম কাল। ...আমি জীব সাজিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ দেখি; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র নহি, সংকীর্ণ নহি। কেন না, আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব-যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞেয়—দুইই এক-একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বিজ্ঞানচিন্তা এবং দার্শনিক চিন্তার সমন্বয়ের মধ্যে কোনও অভিনবত্বের দাবি নেই। তা সভ্যতার ইতিহাসে বারবার ঘটেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের এই সমন্বয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হল এই যে বিশ্বের সম্পূর্ণ ছবিটি যদি আমরা পেতে চাই-তা হলে বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয় ধারার সাহায্যেই পেতে পারি। এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর বহু মূল্য দিয়ে, জীবনের বহু দুঃখে। তাঁর সেই অন্তর্জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার কাহিনি রামেন্দ্রসুন্দর বড় সততা দিয়ে লিখেছেন। পদার্থবিদ্যা থেকে অধ্যাত্মচিন্তায় পরিভ্রমণের এই যে ইতিহাস তা আমাদের সাহিত্যের পরম মূল্যবান বস্তু। রামেন্দ্রসুন্দর অল্পবয়সে পিতাকে হারান। কবির ভাষায় 'Life's early cup with such a draught of woe', রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র জীবনের অন্তরালে এক বেদনার অন্তঃশীল স্রোত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল । বিজ্ঞান এবং দর্শনচিন্তায় তিনি বাঙালি পাঠকের সামনে যে ছবিটি তুলে ধরেছেন তার অন্তরালে আছে তাঁর বেদনাজর্জর প্রতিমূর্তি। তিনি 'প্রকৃতি'র উৎসর্গ পত্রে হঠাৎ সেই মনকে প্রকাশ করেছেন :

> জ্ঞানের প্রবাহ সংসার প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই দুর্বল দেহে সেই প্রবাহে ভাসিয়া চলিবারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ঊষর সংসারমরুতে জ্ঞানের অপেক্ষা প্রেমের প্রবাহের প্রয়োজন অধিক... কেন আসে, কেন যায়, দিয়া কেন হরিয়া লয়, — প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর লীলাখেলার উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য দেশবিদেশের জ্ঞানিজনের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছি। জ্ঞানের নিকট সান্ত্বনা মিলে নাই; স্নেহের পিপাসা জ্ঞানে মিটায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমরনাথের উক্তি মনে পড়ে, 'প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই।' আবার 'জিজ্ঞাসা'র উৎসর্গে লিখেছেন, ''বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় সংসার ক্ষেত্র আবৃত রহিয়াছে, কোটি মানবের হাহাকার সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভীত পথিকের ত্রাস জন্মাইতেছে।' এই ছবি আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে সত্য বলে মনে হয়। মানুষের জীবন অন্ধকারে, অদৃশ্য শত্রু নিপীড়িত পথে বেদনাদায়ক যাত্রার বেশি কিছু নয় এমন কথা যখন দার্শনিক বলেন তখন তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সমকালেই রাসেল তাঁর 'A Free Man's Worship', ১৯০২ প্রবন্ধে এই ভীত জীবনের ছবিটি এঁকেছেন :

> **In action, in desire we must submit perpetually to the tyranny of outside forces; but in thought, in aspiration, we are free, free form out fellowmen, free from the petty planet on which out bodies impotently crawl, free even while we live, from the tyranny of death.**

রামেন্দ্রসুন্দর এই অন্ধকার বিশ্বজগতের ছবিটিকে স্বীকার করবেন না, তিনি বলবেন;

> জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাইরে নহে, জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে। জীবসমাকুলা বসুন্ধরা, সূর্যকেন্দ্রক সৌরজগৎ, তারকাকীর্ণ নভস্থল তোমারই অন্তরে। তুমি বিশ্বজগতের অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগৎই তোমার অন্তর্গত। বিশ্বজগতের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণই নাই; তুমি আছ বলিয়াই বিশ্বজগৎ আছে।... তোমার জগতে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে; কেননা, সেই নিয়ম, সেই ব্যবস্থা তুমি স্থাপন করিয়াছ। তুমিই জগতের স্রষ্টা, তুমিই তাহার বিধাতা।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২)

শম্ভু মিত্র

একটি অন্বেষণে

আমরা একটা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। স্বাধীনতার পর আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের একটা বিশিষ্ট পরিচয় অর্জন করবার চেষ্টা করছি। যাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা আমাদের সেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে। কিন্তু ভারতীয়ত্বের সেই বিশিষ্ট আধুনিক পরিচয় যে কী হবে তা বোধহয় এখনও আমরা সঠিক ধরতে পারিনি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু প্রকাশই আমাদের সকলের কাছে খুব গৌরবের। কিন্তু জীবনধারণের সেই প্রণালী আমাদের আজকের দিনের পক্ষে অসম্ভব। চেষ্টা করে সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। তাহলে কি আমাদের দেশের যন্ত্রশিল্প যেমন ইয়োরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনিই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-আচার-ব্যবহার সবই তাদের নকলে গড়ে উঠবে? যেমন ঐতিহ্যবিহীন যে কোনও অনুন্নত জাতি ইয়োরোপীয় পোষাক থেকে ধর্ম পর্যন্ত সবই নিজেদের সমাজে মেনে নেয়? নাকি আমরা বিচার করে গ্রহণ করব ও বর্জন করব? তা যদি করি তাহলে সেই বিচারের কেন্দ্র কী? — সন্দেহ নেই, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। এবং ইতিহাস তার রায় দেবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিল্পকর্মেরও প্রত্যেক স্তরে বহুল ও বহুধা পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। তার একটি কথা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

নাটকে আজকাল স্বগতোক্তি থাকে না। থাকলে আমাদের দর্শকদের হয়তো অবাস্তব লাগে। সেকেলে বলে মনে হয়। অনেক অভিনেতাও বলেন যে, কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা যায়, কিংবা বুড়োবুড়িদের মতো আপন মনে একটু-আধটু বকবক করাও যায়, কিন্তু গম্ভীর হয়ে নিজের মনে কথা গড়গড় করে বলে যাওয়া—ভীষণ অস্বাভাবিক লাগে। আবার একথাও শুনেছি যে, এতে নাট্যকারের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, যে কথাটা ঘটনার মধ্যে প্রকাশ করা গেল না সেটা চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়ে সহজে প্রকাশ করে দেওয়া হল।

কিন্তু হ্যামলেটের স্বগতোক্তি সম্পর্কে আমরা জানি যে সেগুলো অক্ষমতার প্রকাশ নয়, বরঞ্চ তাতেই সত্যের আর একটা গভীরতর স্তর আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের স্বগতোক্তিতেও তাই মনে হয়।

অর্থাৎ এক ধরনের নাটক হয় যার মধ্যে ঘটনাই নায়ক। সেখানে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রগুলো যে আচরণ করে তাতেই তাদের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আর এক ধরনের নাটকে — অন্তত একটা মূল চরিত্র — বাইরের ঘটনার সংঘাতে জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির চিন্তাস্রোত বাইরের ঘটনাগুলোকে ছাড়িয়ে এক নতুন নাটকীয় অর্থ বহন করে।

অর্থাৎ একটাতে যেন আমরা তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাইরে থেকে একটা অনবস্থিত দেয়ালের মধ্য দিয়ে কেবল আচরণটা দেখি। আর অপরটাতে যেন নাটকের চরিত্রের নিকটবর্তী হয়ে তার subjective জগৎটার মধ্যে চলে যাই।

বাস্তবকে দেখবার এই যে objective দৃষ্টি (প্রথমোক্ত ধরনের নাটকে যেটা প্রকাশ পায়) সেটা ইয়োরোপে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে। আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে। তাই সেখানে অভিনয়েও বাস্তবানুকরণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়। বিরাট চরিত্রের অভিনয়ের চেয়ে যৌথ অভিনয়ের প্রয়াস বাড়তে থাকে।

দৃশ্যপট ও মঞ্চসরঞ্জামের দ্বারা পরিবেশকেও নাটকের একটা চরিত্র হিসাবে প্রকাশ করা হতে থাকে।

এই নতুন যুগের কলাকার হিসেবে Antoine Stanislavski প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনায় নতুন রূপ ও নতুন আস্বাদ আনলেন। (তারপরে এই যৌথ অভিনয়ের উপর আবার একটা ঝোঁক আসে রুশ বিপ্লবের পর।) কিন্তু এই নব্যরীতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এর বাঁধন কাটাবার চেষ্টাও শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ চেষ্টা চলতে থাকে যে, ব্যক্তিগত মানুষের গভীর ও মৌল প্রশ্নগুলো কী করে প্রকাশ হতে পারে। সমাজগত মানুষ আর ব্যক্তিগত মানুষের সমন্বিত প্রকাশ কী করে নাট্যরীতিতে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আর তাই, বাস্তবানুকরণের পথে সত্যপ্রকাশের যে বাধা সৃষ্টি হয়েছে সেই বাধা ভেঙে গভীরতর সত্যপ্রকাশের একটা নাট্যরীতির অনুসন্ধান চলছে। এবং তার ফলে বলা যায় পুরোনো নাট্যরূপ যেন অনেকটাই ভেঙে গেছে। এখন Martin Esslin প্রমুখ নাট্যবিদ আশা করছেন যে Brecht ও Absurdist-দের নাট্যরূপের সমন্বয় যদি কেউ ঘটাতে পারে তাহলেই পাশ্চাত্যে নাট্যসৃষ্টির একটা সার্থক যুগ আসবে।

আমাদের দেশের পরিবর্তনের ছন্দটা কিন্তু ভিন্ন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কুটিল। আমরা বিজ্ঞানের সে অভ্যুদয় দেখিনি যাতে সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পারি নাটকে। আমাদের দৃশ্যপট বা মঞ্চসজ্জা কখনওই বাস্তবের বিভ্রম ঘটাতে পারে না। মস্কো আর্ট থিয়েটার কত যুগ আগে চেকভের নাটকের বাস্তবানুগ রূপারোপ করেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে হ্রদ দেখা যাচ্ছে, আকাশে বিকেল থেকে সন্ধ্যা হল, নিস্তব্ধ প্রান্তরে দূর থেকে ভেসে আসা একটা নিঃসঙ্গ আওয়াজ, বৃষ্টি এমনকি ট্রেন আসা, — এরকম অনেকানেক বাস্তববিভ্রম ঘটিয়ে দর্শককে পরিবেশের মুড ও কাব্য অনুভব করিয়েছে। সে অনেকদিন আগে।

কিন্তু আমাদের দেশে পার্শি থিয়েটারে, ও তারই অনুকরণে কিছু বাংলা থিয়েটারে, অশ্বপৃষ্ঠে ওসমানের প্রবেশ হত, রাস্তার দৃশ্যে মোটরগাড়ি ঢুকত (শুনেছি কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে নাকি ট্রাম-গাড়িও চালানো হত), মহাদেবের তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠত, অপ্সরীরা আকাশে উড়ে যেত, সুদর্শন চক্র ঘুরতে ঘুরতে এসে শিশুপালের শিরশ্ছেদন করত। কেদার রায় নাটকে নৌকো ক'রে সোণা-র অপহরণ, দুর্গ আক্রমণ ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি করতালিপ্রদ দৃশ্য ছিল। যতদূর মনে পড়ে শচীন সেনগুপ্ত মশায়ের একটি নাটকে ভূমিকম্পে মঞ্চের উপর বাড়ি ঘর দোর ভেঙে পড়ত, এবং শ্রীমনোজ বসুর একটি নাটকে প্লাবনের মধ্যে একা অহীন্দ্র চৌধুরী একটি টিলা আঁকড়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেন আর স্টিমারের তীব্র আলো ঘুরে ঘুরে যেত। এই শেষোক্ত নাটকটায় প্লাবনের পরবর্তী অবস্থা দেখাতে একটুকরো বায়োস্কোপও দেখানো হত বলে যেন মনে পড়ছে।

অর্থাৎ আমাদের ব্যবসায়িক থিয়েটার বাস্তবরূপের কাব্যকে ফুটিয়ে তোলার পরিবর্তে কেবলই রোমহর্ষক করতালিলুব্ধ মঞ্চকৌশল ঘটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ইওরোপীয় বাস্তবানুকৃতির মধ্যে জীবনকে নাট্যরূপের মধ্যে অনুবাদ করবার যে নিষ্ঠা ছিল, যে শ্রদ্ধা ছিল, তা আমাদের মঞ্চে সম্ভব হল না। তার চেয়ে হঠাৎ এক একটা দৃশ্যে ইন্দ্রজাল ঘটানো অনেক সহজ উপায় বলে মনে হয়েছে এঁদের কাছে। এবং যখনি এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তখনি বাংলা রঙ্গমঞ্চ কলাশিল্প হিসেবে দেউলে হয়ে গিয়েছে।

আর তাই বিদেশ থেকে কেউ মঞ্চাভিনয় দেখে এলে তাকে সবচেয়ে বেশি এই প্রশ্ন করা হয় — 'ওখানে আঙ্গিক কী রকম দেখলেন? দারুণ না?' — অর্থাৎ নাট্যাভিনয় যে একটা কলাশিল্প, তার কাছে যে আমরা কিছু গভীর কথা শুনতে চাই, এসব চিন্তা আমাদের মন থেকে কত সহজেই মুছে যায়।

অথচ আমরা সেই বাস্তবানুগ অভিনয়ের কথা শুনেছি যেখানে অভিনেতা আর অভিনেয় চরিত্রকে এক বলে প্রতীয়মান হবে।

আমরা বিরাট চরিত্র বাদ দিয়ে সামান্য সাধারণ চরিত্রসমূহের যৌথ অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত লেখা পড়েছি।

আবার একক অভিনেতার অলৌকিক অভিনয় প্রতিভার কথাও শুনেছি। একথাও শুনেছি যে অভিনেতা যদি সর্বদা তাঁর অভিনেয় চরিত্র থেকে দূরত্ব বজায় না রাখতে পারেন তাহলেই দুর্বলতা। তাঁকে যেন কখনও চরিত্রটি বলে ভুল না হয়। আমরা থিয়েট্রিক্যাল থিয়েটার সম্পর্কেও এমন কোটেশন-কন্টকিত কথা শুনেছি যে না মানবার সাহস হয়নি। আবার যা দেখে চোখে জল আসে তাকেই এত নিশ্চিত নির্ঘোষ 'মেলোড্রামাটিক' বলতে শুনেছি যে চোখের জলের জন্যে লজ্জা বোধ করেছি। তখন আবার subdued acting সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে এইটাই বোধ হয় আসল আর্ট। শেষ পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে খবর নেবার চেষ্টা করি যে পশ্চিম থেকে একেবারে শেষ ডাকে কী খবর এসেছে সেখানে কী বলছে। কারণ তাহলেই বুঝতে পারব যে কোনটা আমাদের ভালো লাগা উচিত।

আমাদের পরিচয়ভ্রষ্টতার এটাই তো একটা বড় কারণ এবং নিদর্শন। কিন্তু এই হীনমননকে পেরিয়ে গিয়েই তো আমাদের নিজস্ব পরিচয় জয় করে আনতে হবে। এবং সেই অভিযানে আমাদের ডুবে যেতেই হবে আমাদের দেশের বোধের গভীরে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পকর্ম বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্যকে রূপ দিতে চেয়েছে, এ আলোচনা আমরা শুনেছি। সেই যুগে নাটক ও নাট্যাভিনয় আমাদের থেকে ভিন্ন এক রীতিতে মানুষের এই অন্তরঙ্গ পরিচয় মঞ্চে প্রকাশ করে কলাশিল্পের মর্যাদা পেত। এবং সে শিল্প বোধ করি উপেক্ষণীয় ছিল না।

কিন্তু নিঃসন্দেহে ভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের নাট্যশিল্প গ্রিকদের নাট্যশিল্পের মতো সংঘাতভিত্তিক ছিল না। অথচ দুই দেশের সঙ্গেই দুই দেশের পরিচয় ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের আদানপ্রদানও ছিল। কিন্তু শিল্পপ্রকাশের ক্ষেত্রে এ ব্যবধান কেন? চিত্রে, ভাস্কর্যে সর্বত্রই এই পার্থক্য। আধুনিক ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে গ্রিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। আর ভারতবর্ষের নানান লোকনাট্য সংস্কৃত নাট্যের দ্বারা প্রভাবিত। অত্যাধুনিক যে Ionesco তিনিও বলেন যে সংঘাত ছাড়া থিয়েটার হয় না। অথচ গুজরাতের ভাওয়াই থেকে বাংলাদেশের কৃষ্ণযাত্রা পর্যন্ত সংঘাতভিত্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকও সংঘাতভিত্তিক নয় সেই ভাবে। অর্থাৎ এ ভিন্নতা যেন জীবনকে দেখার ভিন্নতা। দর্শনের ভিন্নতা।

এ সকল বিশ্লেষণ আমাদের বোধহয় করতেই হবে। না করে উপায় নেই বলে। তাই আশা করি আমাদের নাট্যোৎসাহী যুবকেরা এ তত্ত্ব অনুসন্ধানের কাজে লাগবেন।

গ্রিসীয় সভ্যতার মধ্যে তবু প্রাচ্যের সঙ্গে বহু মিল ছিল, কিন্তু পরবর্তী ইউরোপে খ্রিস্টিয় সভ্যতার সঙ্গে এ পার্থক্য আরও গভীর হয়েছে। সেটাও দর্শনের ভিন্নতা। এ দেশের দর্শনের মধ্যে ঈশ্বর ও শয়তানের দুটো চিরন্তন পৃথক সত্তা সৃষ্টি হয়নি। এখানে ঈশ্বরই ভয়ংকর। তাঁরই দয়াহীন তাণ্ডবের ফলে পৃথিবীতে সংহার আসে। তিনি কেবল পালনকর্তা নন, তিনি রুদ্রও। ভালোমন্দ উভয়েরই জন্মদাতা তিনি। তিনি সর্বপ্রভুঃ।—(এই দর্শনের বৈশিষ্ট্যের কথা ঐতিহাসিক টয়েনবিও উল্লেখ করেছেন)।

এই দর্শনের ভিত্তিতে তাই সংঘাত তার শেষ কথা নয়। বিরোধের সমন্বয়ে জীবন যে একটা নতুন স্তরে উত্তরিত হয় এইটেই বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে। কামকে অতিক্রম করে দুষ্মন্ত শকুন্তলার ভালোবাসা প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং সেই সূত্রে ভরতের দেশ বলে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে, এ কবি বর্ণনা এ যাবৎকাল এদেশে নন্দিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা সম্পর্কে লেখাই আমাদের দিশা দেখাবার পক্ষে অমূল্য।

কিন্তু মাঝখানে এল আমাদের অন্ধযুগ। আর তারপর হল ইংরেজের আগমন।

সেই থেকে আমাদের সমাজ অতি দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। আমাদের সমাজে যেন ভূমিকম্প লেগে গেল। প্রত্যেকটি স্তরে যেন শুরু হল প্রচণ্ড সংঘাত। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল একত্র বাস করার নৈতিক অনুশাসনগুলো। জীবনের কেন্দ্রে যেসব ধর্মাচরণ

ছিল সেসব ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় যেসব অবাধ অধিকার ছিল উচ্চবর্ণের হাতে সেসবও হারিয়ে গেল। মেয়েদের এক বিবাহের শাসন উড়ে গেল। কী না গেল! এমন কী ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল এখন তাও আমাদের চোখের সামনে কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এই প্রত্যেকটা পরিবর্তনের মধ্যে যে কঠোর সংঘাত, যে কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে, সে সমস্তেরই অনুভব আমাদের চেতনায় এসেছে। সুতরাং সেই স্বর্ণযুগের সংস্কৃত নাটকের মধ্যে আমাদের মন আর মুক্তি পাচ্ছে না। আমরা সংঘাত আর আলোড়ন দেখতে চাচ্ছি আমাদের নাটকে। অথচ এখনও মণিপুরী নাচ, বা রবীন্দ্রনাথের গান বা ওইরকম কোনও স্থির শান্ত তদ্গতভঙ্গি রসের প্রকাশ দেখলে আমরা মুগ্ধ ও আবিষ্ট না হয়ে পারি না। আমাদের যে নাড়ির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেই সুছন্দ শান্তির। আমরা যে জানি রুদ্রের দক্ষিণ হস্তেই বরাভয়। তাঁর একমুখে পালন একমুখে ধ্বংস। আমাদের ধর্ম তো ইয়োরোপীয় religion নয়। আমরা নিরীশ্বর ন্যায়শাস্ত্রের কথাও জানি। সাংখ্য জানি, বৌদ্ধ-ন্যায় জানি। নাড়ির মধ্যে এইসব অনুভব নিয়েই তো আমরা ভারতীয়। কিন্তু আমরা সেতুস্থাপন করতে পারছি না। আমাদের নিজেদেরই সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কেবল একজন নাট্যকার এই সংঘাতের মধ্যে থেকেও সেই স্বর্ণযুগের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নাটকে আমরা আধুনিক সমাজের কাহিনি পাই, কিন্তু ইয়োরোপীয় ভঙ্গিতে নয়। তাই তো বিদেশি নাট্যশাস্ত্রীদের এত অসুবিধে হয় তাঁকে বুঝতে। তাই তো John Gassner কত সহজে এক লাইনে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে পেরেছেন যে — Tagore proved to be a cross between Maeterlinck and a Hindu Sage. (Theatre in our times)

অথচ আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করে আমাদের, কী ভীষণ ভালো নাটক বলে মনে হয় সেগুলোকে — তাই তো অনেক সময় আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতি যে গভীর রূপটি আছে — যেটি যেমন সরল তেমনি sophisticated — রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমির মতো — সেটা সাহেবদের পক্ষে বোঝা যেন সহজ নয়। সাহেবদের শিষ্যদের পক্ষেও।

'রক্তকরবী' আধুনিক সমাজের যন্ত্রসভ্যতার কাহিনি। এই সভ্যতা নিজের মধ্যে যে বিরোধের জন্ম দিচ্ছে সেই সংঘাতের প্রকাশ আছে এই নাটকে। 'মুক্তধারা'তেও এক আধুনিক কাহিনি। অথচ ইয়োরোপীয় নাটকের রূপ নয় এদের। বাস্তবানুসৃত যে চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তা একেবারেই অবলম্বন করা হয়নি এই সমস্ত নাটকে। অথচ অভিনয় করলে বুঝতে পারি যে এর বহু চরিত্রের বহু জায়গাটাই ভীষণ বাস্তব। এর কৌশলটা কী?

একটা কৌশল হল ভাষা। এই ভাষাটা বাজারচলিত ভাষা নয়। যেমন, ধরা যাক একটা জায়গা — কিশোর বলে; 'একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।'

এই ভাষা বলে অভিনয় করতে আমাদের বহু অভিনেতারই বিশেষ অসুবিধে হয়। মনে হয় এটা অনুভব হয়তো কিশোর করতে পারে, কিন্তু সে কথাটা এমন করে বলতে পারে কি কেউ? অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু উচ্চারিত সংলাপ হিসেবে ঠিক নয়। এভাবে কথা বলতে গেলে যে ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। — এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকে বলেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বলতে আমাদের এত কষ্ট হয়।

কেন যে আমাদের দৈনন্দিন ভাষা এত পরুষ হয়েছে, কেন যে আমরা আমাদের অনুভবের কথা সহজভাবে, উন্মুক্তভাবে বলতে পারি না, সে আলোচনা এড়িয়েই আমরা বলতে পারি যে, কোনও উপায়ে যদি এই Uninhibited উন্মুক্তভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে কি সেটা কিশোরের অন্তরঙ্গ প্রকাশ হবে না।

'চার অধ্যায়' অভিনয়কালেও আমরা দেখেছি যে প্রেমের মুহূর্তে ওই ধরনের কথা আমরা কেউ

বলি না। 'আলো কমে গিয়েছে, এসো আরও কাছে এস। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোট তার আয়তন...' । কিংবা ...'এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনও এক অদ্বিতীয় কবির হাতে ধরা দিতে পারল না বলেই এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ।'

বলি না ঠিকই। কিন্তু আমাদের মনের গভীরে যে প্রেমের আবেগ আমরা অনুভব করি তার যদি কোনও ভাষা থাকত তাহলে সে হয়তো এই ভাষা। যে ভাষায় আমরা কথা কইতে পারি না, কিন্তু যেটা আমাদের অন্তরের আবেগের ভাষা, সেইটাই তো কবিতা। সেই ভাষা যিনি আমাদের শোনাতে পারেন তিনিই তো কবি।

তাই অভিনয়টাই এমনভাবে করা দরকার যাতে অন্তরের আবেগের কাব্য অবলীলায় প্রকাশ পায়। এবং সেটা কেবল naturalistic ভঙ্গিতেই চেষ্টা করলে আমরা পারব না। চেষ্টা করতে হবে, তারই সঙ্গে যেন অন্তরের কতাগুলোও অতি সহজে অনর্গল হয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই দুটো স্তরে সঞ্চরণ খুব যেন সহজে হয়। বাইরের জীবন আর অন্তর্জীবন দুটোই যেন গায়ে গায়ে মিশে অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্তমান থাকে। ঠিক যেমন আগেকার দিনের নাটকে হ্যামলেটের পক্ষে স্বগতোক্তিতে চলে আসাটা একেবারে নির্বাধা ছিল।

এই বোধ নিয়ে যদি আমরা রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে আধা-রিয়ালিস্টিক ছাঁচে লেখা নাটকগুলো আমরা যেভাবে অভিনয় করি সেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আমাদের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ছেলেদের যদি তিক্তভাবে রাগারাগি করার দৃশ্যে অভিনয় করতে দেওয়া হয় তাহলে তারা অতি সহজেই সে অভিনয় করে দিতে পারে। মেয়েরাও ঠিক সেই রকম। কলহের দৃশ্য হলে প্রায় কিছু দেখাতেই হয় না। (তাই বুঝি ট্রামে বাসে প্রাত্যহিক কলহের মধ্যে আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি অমন করে প্রকাশ পায়)। কিন্তু যদি গভীর অনুভবের কথা বলতে হয়, যদি প্রেমের কথা সহজভাবে বলতে হয়, তাহলে ওই কলহপটুতার তিক্ত কণ্ঠস্বরে তো সেটা হবে না। যে ভালোবাসে তার কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা লাগে, সুর লাগে, কাব্য আসে। অত্যন্ত চেনাজানা সাদাসিধে পাঁচীও যখন প্রেমে পড়ে তখন তার চোখে কটাক্ষ আসে, দেহের ভঙ্গিমায় কাব্য আসে। এইটাই তো প্রকৃতির কীর্তি। সেই জন্যেই তো প্রেমে পড়া ছেলেমেয়েরা যেন আহ্লাদে সর্বক্ষণ খুশি হয়ে থাকে। তাদের দেখলেও তখন অত ভালো লাগে।

কিন্তু সেই কাব্যের প্রকাশ করতে গেলে ঝংকার থাকা চাই কণ্ঠে। কবিতায় যেমন প্রত্যেকটি কথা কী একটা রসে টসটস করে, যাতে সে নিজেকে ছাড়িয়ে আরও অনেক কিছু যেন প্রকাশ করে, এ কণ্ঠও সেইরকম রসাভিষিক্ত হওয়া চাই নাকি?

কিন্তু কথাটা কেবল প্রেমপ্রকাশের কথা নয়। কিশোর কেবল প্রেমপ্রকাশ করছে না। কথাটা হল আদ্যোপান্ত মানুষটাকে প্রকাশ করার। কিশোরের অন্তরটাকে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করার। তাই আমাদের সেই কণ্ঠের দরকার হয়, সেই ভঙ্গির দরকার হয়, যাতে আমরা অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের মনের অনুভব প্রকাশ করতে পারি। এবং সেই চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাব যে-চরিত্রের কতখানি বলিষ্ঠতা থাকলে তবে মানুষ এত সহজে নিজেকে অনর্গলিতভাবে প্রকাশ করতে পারে। তখন বুঝতে পারব যে, এটা ন্যাকা-র কার্য নয়। এই সরলতা হল গভীর Sophistication-এর ফলস্বরূপ।

এটা খালি কিশোরের কথা নয়, প্রেমের কথাও নয়। এটা হল আমাদের নাট্যাভিনয়ে আমরা কেমন করে চরিত্রগুলোর বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন একই সঙ্গে প্রকাশ করতে পারি সেইটে বোঝবার একটা প্রয়াস। আমাদের নাট্যপ্রচেষ্টার একটা নিজস্ব পথ খুঁজে পাওয়ার কথা, আমাদের একটা নিজস্ব

পরিচয় লাভ করার কথা। এবং সে চেষ্টা যদি এখনি সাহেবগ্রাহ্য না হয় তাতেও কিছু না এসে যাওয়ার কথা।

আমাদের দেশের ভালো নাটক বলতে প্রথমেই নাম করতে হবে রবীন্দ্রনাথেব। এবং সে নাটক অ্যাকশন নির্ভর নয়। যদি আমরা একটু মনোযোগের সঙ্গে পড়ি তাহলে দেখব 'রক্তকরবী'তে মেজ সর্দারের ওই অত্যল্প ভূমিকার মধ্যেও কী স্পষ্টভাবে একটা মানুষ প্রকাশ পেয়েছে। কেন যে সে মানুষটার নাচওয়ালি আর বাজনাদারদের রওনা করে দিতে বেশি আগ্রহী, কীভাবে যে সে নিজের সম্বন্ধে বলে —'রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না। এখনও সে আশা আছে', এসব যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম একটা নতুন ধরনের চরিত্র এত স্বল্প জায়গার মধ্যে প্রকাশ করার আর কোনও উদাহরণ আমার জানা নেই। তেমনি 'মুক্তধারা'র প্রত্যেকটি ছোট ছোট চরিত্র, তেমনিই 'রাজা'র। সবাই অত্যন্ত বাস্তব।

এই প্রকাশ পদ্ধতিকে আত্মসাৎ করে যদি আমরা আমাদের যুগকে প্রকাশ করতে পারি, তবেই আমরা আমাদের বিশিষ্ট পরিচয় খুঁজে পাব। এবং তার ওপরেই আমাদের আত্মসম্মান থাকবে। সেকাজ কেবল রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়েই হবে না। কারণ তিনি তো আমাদের পথের শেষ নন, তিনি আমাদের পথের পাথেয়। আমাদের মহার্ঘ দিশারী।

এবং এর জন্যে আমাদের বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। কারণ আমরা এখনও কেউ জানি না যে আমাদের নাট্যাভিনয়ের সেই বিশিষ্ট ভারতীয় রূপটি কী হবে।

৩য় বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭২)

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দান্তের জীবনী

১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত মে মাসে ইতালির ফ্লরেন্‌স শহরে দান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন রোমান বংশোদ্ভূত এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর আদি পুরুষেরা ফ্লরেন্‌স শহরের অন্যতম পত্তনিদার। এমনও হতে পারে যে তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রথমেই কিছু সম্ভ্রান্ত হিসাবে পরিগণিত হননি, উত্তরকালে উপাধির বশে তা অর্জন করেন। *পারাদিজো*-তে দান্তে বলেছেন তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ কাচ্চাগুইদা সম্রাট তৃতীয় কনরাদ (কোর্‌রাদো) কর্তৃক 'নাইট' (মিলিৎসা) উপাধিতে সম্মানিত হন। কাচ্চাগুইদার বংশধরেরা শহরের 'পুরোনো বাজার' ছেড়ে সান মারতিনো দেল্‌ ভেস্‌কোভো পাড়ায় বসবাস করতে শুরু করেন। এখানেই দান্তে জন্মগ্রহণ করেন, জন্মগৃহটি এখনও রক্ষিত আছে। পিতার নাম আলিগিএরো, পিতামহ বেল্লিন্‌চোনে। মাতার নাম বেল্লা। তিনি সম্ভবত দুরান্তে-র কন্যা ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন 'দান্তে' নামটি 'দুরান্তে'র সংক্ষিপ্তকরণ (Durante)। দান্তের পিতা দু'বার বিবাহ করেন, দান্তে তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। ছ'বছর বয়সে মাকে হারান, পিতাকে আঠারো বছরের মুখেই, মানুষ হন বিমাতা লাপা-র কাছে। সৎভাই ফ্রান্‌চেস্‌কো, দান্তের চেয়ে কুড়ি বছর বেশি বাঁচেন। সৎভগ্নী তানা (অর্থাৎ গাইতানা), আর একটি সৎভগ্নী, লেওন্‌ পোজ্জির স্ত্রী, তাঁর নাম জানা যায় না, কিন্তু তিনিই সম্ভবত ভিতা নুওভায় উল্লিখিত— দোন্না জোভানে এ জেন্তিলে, নম্র কিশোরী ভদ্রা। তাঁরই ছেলে আনদ্রেআ বোক্কাচ্চ-র বন্ধু ছিলেন। আনদ্রেআ মামা দান্তের অবিকল প্রতিকৃতি, এ কথা বোক্কাচ্চ বলে গেছেন। দান্তের অনেক কিছু খবর ভাগ্নে আন্‌দ্রেআ বোক্কাচ্চ-কে দেন, যার ফলে দান্তের জীবনী লেখা সম্ভব হয়।

দান্তের জন্মসময়ে উত্তর ইতালি দু'টি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত ছিল। একটির নাম গুএলফো, অপরটি গিবেল্লিনো। বহুবচনে গুএলফি, গিবেল্লিনি। সে-যুগে ফ্লরেন্‌সে অপেক্ষাকৃত নিম্ন অভিজাত বংশের লোকেরা, কারুশিল্পী, ব্যবসায়ী, ইত্যাদি গুএলফো দলে ছিলেন; অপর দিকে রাজন্যবর্গ, জমিদার, ইত্যাদি গিবেল্লিনো দলে। এই দুটি দলের ঝগড়া বিবাদ, রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য আদি আভিজাত্য, আর্থিক গৌরব দান্তে পরিবার অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যান্য নিম্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতো আলিগিএরি ছিলেন গুএলফি এবং চিরকাল গিবেল্লিনি-র বিপক্ষে সংগ্রাম চালিয়েছেন। তেমন স্বচ্ছল অবস্থা না থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হননি, দান্তে একজন ভদ্রবংশীয় 'ভদ্রলোক'-এর মতোই প্রথম জীবন কাটাতে পারেন। নগর সঙ্ঘের (Commune) তরফে ১২৮৯-এ তিনি কাম্‌পাল্‌দিনো যুদ্ধক্ষেত্রে একজন প্রথম সারির অশ্বারোহী যোদ্ধা হিসাবে লড়াই করেন গিবেল্লিনির বিরুদ্ধে। কাম্‌পাল্‌দিনো যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা দান্তে একাধিক বার উল্লেখ করেছেন পুবগাতোরিও ও ইন্‌ফেরনো-তে। বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি যুদ্ধের চমৎকার বর্ণনা করেন, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি নকশাও পাঠান। শ্রেণীগত বৈষম্য থাকলেও আভিজাত্যে গর্বিত কবি গুইদো কাভালকান্তির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা জন্মে। দান্তের পিতা আলিগিএরো মৃত্যুর পূর্বে (১২৮৩?) সম্ভ্রান্ত কিন্তু পড়তি দোনাতি পরিবারের কন্যা জেম্মা-র সঙ্গে দান্তের বিবাহ ঠিক করেন। কবে বিবাহ হয় তা ঠিক জানা যায় না।

অনেকে মনে করেন দান্তে ছেলেবেলায় সান্তা ক্রোচে মঠে ফ্র্যান্‌সিসকান ব্রতী হিসাবে ছিলেন। তখনকার দিনে মঠে লেখাপড়া করবার সুযোগ ছিল, হয়তো সেজন্য তিনি কিছুকাল ব্রতী হয়েছিলেন, ভবিষ্যতে ধর্মযাজক হবেন এমন কোনও লক্ষণ তাঁর পিতামাতা দেখতে পাননি। সম্ভবত তিনি প্রথমে ফ্র্যান্‌সিসকান পাঠশালায় পাঠ নিতে যেতেন, এমনকি পরে মঠের বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র চর্চা করে থাকবেন। সে-যুগে

অবশ্য লাতিন ভাষা শেখা শুধু ধর্মযাজকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাগরিকদের মধ্যেও এর রীতিমতো চর্চা ছিল। দেশের শাসন, আইন আদালত সব ক্ষেত্রেই লাতিন ব্যবহার হত। এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও লেখা হত লাতিনে। লাতিন না জানলে কেউ শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে গণ্য হতেন না। সে-কালের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রুনেত্তো লাতিনি-র কাছে দান্তে শিক্ষা লাভ করেন, বিশেষ করে প্রাচীন লাতিন সাহিত্য। তিনিই তাঁকে শিখিয়েছিলেন দিনের পর দিন, কী করে অসীমের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। দান্তের সময়ে বোলোঞাঁ শহর অলংকার শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল, সেখানে যৌবনে তিনি গিয়েছিলেন শাস্ত্রচর্চা করতে। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, এমন কোনও বিষয় সে-যুগে ছিল না যা তিনি জানতেন না বা চর্চা করেননি। দান্তে গ্রিক জানতেন না, লাতিনে অনূদিত গ্রিক সাহিত্য, দর্শন পড়েছেন। ইন্‌ফেরনো কাব্যখণ্ডে একটি জায়গায় ভার্জিলের একটি উক্তি থেকে মনে হয় দান্তে গ্রিক ভাষা না জানার দরুন নিজে কিছুটা বিব্রত বোধ করে থাকবেন। প্রভাঁসাল জানতেন, আজও অসামান্য, এমন নিবন্ধ লিখেছেন ত্রুবাদুর কবির ওপর; আর অবশ্য ফরাসি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর গুরু, শিক্ষক, কবি ব্রুনেত্তো লাতিনি-র বিখ্যাত পুস্তক *তেজোরো* ফরাসি ভাষাতেই লেখা, যদিও ইতালিতে এই বইটির একটি ইতালিয়ান অনুবাদই চলিত ছিল। এই বইটির প্রতি অনুরাগ কতখানি তা 'ইন্‌ফেরনো'-র কয়েকটি ছত্র পড়লেই বোঝা যায়।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। শীঘ্রই শহরের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁরা পরস্পর কবিতা আদান প্রদান করতেন, কবিতায় থাকত প্রশ্ন, আসত উত্তর, যেমন সে-সময়ের রেওয়াজ ছিল। বলা বাহুল্য প্রেমই ছিল কাব্য তথা আলোচনার প্রধান বিষয়। একটা রীতিমতো সাহিত্য সঙ্ঘ নব্য আদর্শে গড়ে উঠছিল সমবায়ের ভিত্তিতে, সঙ্ঘের সভ্যরা যে প্রভাঁসাল কবিদের চেয়ে পৃথক তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তবু তাঁদের অনেকরই কাব্যর্চচা ছিল শৌখিন পর্যায়ের, রমণীয় পদ্যরচনা, অনেক সময় সূক্ষ্ম কারুকার্য, জীবন ও কাব্যের অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণে দীপ্ত নয়। দান্তের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম গোড়া থেকেই দেখা যায়, ধীরে ধীরে কাব্য তাঁর জীবনের সবখানিই জুড়ে বসল, তার দায়িত্ব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন ক'রে এসেছেন। প্রথমে সে-কালের কবিগুরু গুইদো গুইনিৎসেল্লি-র কাব্যাদর্শে আকৃষ্ট হন, গুইদো কাভালকান্তি-র কবিতা ভালোবাসেন, পরে নিজেই সরে আসেন, তৈরি করেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাব্য না হলেও কবিতায় নতুন সুর, আনেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। যে-প্রেমের আদর্শ গুইনিৎসেল্লি প্রমুখ কবিদের লেখায় অস্পষ্ট ছিল, তাই দান্তের রচনায় ক্রমশই স্পষ্ট হতে লাগল। ভার্জিল হন তাঁর গুরু, যাঁর কাব্য থেকে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পান, 'সুন্দর রচনা-রীতি'-র উৎস তিনিই। গুইদো কাভালকান্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত একটি কবিতার মারফত, তার প্রথম চরণ— আ চিআস্কুন আল্‌মা প্রেজা এ জেন্তিল কোরে— প্রত্যেক বিমুগ্ধ প্রাণ ও নম্র হৃদয়। কবিতাটি পাঠিয়ে তিনি প্রচলিত রীতিতে উত্তর ভিক্ষা করেন কবিদের কাছ থেকে, উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন কাভালকান্তি। সেই থেকে তিনি তাঁর প্রথম বন্ধু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে পরিগণিত হলেন। কাভালকান্তির সঙ্গে তৎকালীন ইতালীয় 'স্থূল কবিদের' রচনা নিয়েও আলোচনা হত। ক্রমে গড়ে উঠল একটি কবিদল, কবিতায় এল একটি বিশিষ্ট রচনা-রীতি, দান্তে নিজেই তার নাম দিয়েছেন— লা দলচে স্টিলনুওভো বা নতুন রম্য-রীতি। গুইদো গুইনিৎসেল্লি, গুইদো কাভালকান্তি ছাড়াও দান্তের এই কবি-চক্রে অনেক সুকবি ছিলেন, যেমন দান্তের আর এক কবি বন্ধু— চিনো দা পিস্‌তোইআ। নতুন রম্য-রীতির প্রেরণায় দান্তের ভিতা নুওভা রচিত হলেও, দান্তে নিজেকে সম্পূর্ণ এই রীতির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি; ভবিষ্যতে তিনি কী রীতিতে লিখবেন, কী কাব্যদৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর দেখবেন তার আভাস ভিতা নুওভা-র মধ্যে পাওয়া যায়। দান্তের কবি প্রতিভার খ্যাতি শুধু আর কবি বন্ধুদের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না।

ফ্লরেন্‌সীয় অভিজাত পরিবারের একটি কিশোরীর মাধুর্য মণ্ডিত মুখশ্রী তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। আনুমানিক ১২৭৫ খ্রি.-তে কোনও একটি সামাজিক প্রীতি সম্মেলনে অন্যান্য কিশোরীদের সঙ্গে তাকে তিনি দেখেন; কিশোরীর বয়স তখন সবে নয়ে পৌঁছেছে, আর দান্তের বয়স নয় পার হতে চলেছে।

লোকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকত 'বিচে', দান্তে ভালোবাসতেন ডাকতে তার পুরো নামেই, অর্থাৎ, বেআত্রিচে— যার দর্শন আনন্দময়। এ সব কথা দান্তে নিজেই বলে গেছেন তাঁর 'ভিতা নুওভা' নামক কাব্যগ্রন্থে। যতদূর জানা যায় বেআত্রিচে ফোলকো পোরতিনারি-র কন্যা ছিলেন, পরে বিবাহ হয় সিমোনে দেইবারদি-র সঙ্গে। অতি সুন্দরভাবে বোকাচ্চ তাঁর *ভিতা দি দান্তে* দান্তের জীবনী নামক গ্রন্থে এই প্রীতি সম্মেলনের বর্ণনা ক'রে গেছেন। দান্তের হৃদয়ে সেই প্রথম ভালোবাসার সূত্রপাত। ত্রুবাদুরদের মতো 'ভালোবাসা'কে কেন্দ্র করে কাব্যরচনা সে-যুগে রেওয়াজ ছিল, দান্তের নিজের কবিদলের মধ্যেও তার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়, গুইনিৎসেল্লি-র বিখ্যাত চরণ—'নম্র হৃদয়ে প্রেম চিরাশ্রিত', এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে, কিন্তু দান্তের ব্যক্তিত্ব, কাব্যিক বিকাশ প্রায় প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র, অন্য কবিদের তুলনায় তাঁর কবিতায় একটা 'রূপগত পার্থক্য'ধরা যায়। তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী বিরহীর অশ্রুপাত থাকলেও চোখের জলে তাঁর কবিতা, এমনকি প্রথম প্রেমের কবিতাও, ভিজে যায়নি। অপর পক্ষে তিনি বেআত্রিচেকে দেখেছেন নম্র সৌজন্যের প্রতিমা হিসাবে, যাঁর গুণাবলি অনুভব করে মানুষ ধন্য, বিশ্বস্ত প্রেমিকের হৃদয়ে যিনি মঙ্গলময়ী। খ্রিস্টীয় ভাষায় তাই দান্তে বেআত্রিচে-কে বলেছেন 'মিরাকল্', ঈশ্বর প্রেরিত, অলোক-সামান্যা।

এই অনুভবে যখন তাঁর প্রথম যৌবনে হৃদয় পরিপূর্ণ, তখনি তাঁর আশ্চর্যভাবে সন্দেহ হয়েছিল বুঝি এ মর্ত্যধামের জন্য নয়। এবং অনিশ্চিত আশঙ্কার মধ্যেই প্রথম খবর এল বেআত্রিচের পিতার মৃত্যু, পরে ৮ জুন ১২৯০ খ্রি তাঁর প্রিয়তমার। দান্তের বয়স তখন প্রায় পঁচিশ বছর। এই কিছুদিন আগে রাজনৈতিক দল ও নগর সঙ্ঘের তরফে ১২৮৯ খ্রি, তাঁকে কাম্পাল্দিনোতে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। জয়ী হয়ে ফ্লরেন্সে ফিরে এই দুঃসংবাদ। সারা দেশ তখন বিজয়ীর উল্লাসে নন্দিত, শুধু দান্তের মনে হয়েছিল এই 'জনাকীর্ণ শহর কী নিঃসঙ্গ'। গভীর বেদনায় অশ্রুসজল দৃষ্টি, বহির্জগত, যতই ঝাপসা হয়ে আসে ততই অন্তরে তিনি প্রত্যক্ষ করেন বেআত্রিচের ঐশী লাবণ্য। এইভাবে এক বছর কেটে যায়। এমন সময় বেআত্রিচের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর কিছুদিন বাদে কোনও এক অভিজাত রমণীর অনুকম্পা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু তা অতি ক্ষণস্থায়ী মাত্র; এবং শীঘ্রই তিনি, অনুতপ্ত, আরও গভীর ভাবে তাঁর প্রিয়তমার স্মৃতিতে নিমগ্ন হলেন। যাঁরা তাঁর জীবনী ও কাব্য অনুধাবন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, দান্তে অকপটভাবে তাঁর নিজের চ্যুতিবিচ্যুতির কথা স্বীকার করে গেছেন। যেটি লক্ষণীয় সেটি হল, প্রত্যেক চ্যুতিবিচ্যুতির পরই দান্তের আত্মানুসন্ধানের গভীর প্রয়াস। *ভিতা নুওভা* থেকে *কোম্মেদিআ* পর্যন্ত একাধিক দৃষ্টান্ত মিলবে। এমনকি কোম্মেদিআর অনেক জায়গায় যেখানে তিনি বিরুদ্ধ শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন, সংজ্ঞালাভের পর ঐশী অনুগ্রহে তাঁর সেই অপূর্ব অনুপ্রবিষ্ট দৃষ্টিলাভ সে যুগের তো বটেই অদ্যাবধি কাব্যে তার তুলনা মেলে না।

ক্ষণস্থায়ী বিস্মৃতির পরই একদিকে যেমন বেআত্রিচের স্মৃতি তাঁকে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করল, অপরদিকে দান্তে তার প্রিয়তমার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য এতদিনকার লেখা কবিতাগুলি সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই সংগ্রহের ফলে আনুমানিক ১২৯২-১২৯৩ খ্রি একটি ছোট কবিতার বই বার হয়। দান্তে নাম দেন ভিতা নুওভা বা নতুন জীবন, উৎসর্গ করেন কবিবন্ধু গুইদো কাভালকান্তিকে। এই নামকরণের মূলে কবির কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল : এখন প্রস্তুতির পর্ব শেষ। আরম্ভ হল নতুন জীবন।

ইতিমধ্যে বইথিউস ও কিকেরোর রচনাবলি পাঠে তাঁর চিন্তার চৌহদ্দি আরও অনেক বিস্তৃত হল, জীবনকেই তিনি মনে করলেন একটি 'দীর্ঘ পাঠ'। দান্তের জন্মের বেশ কিছু আগেই গ্রিক, লাতিন, ফরাসি প্রভাঁসাল সাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদ ইতালিতে দেখা যায়, আরিস্ততলের যুক্তি এসে মেশে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে, যেমন দান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাব সেন্ট টমাস একুইনাসের রচনাবলি। একদিকে 'ফেদে'-বিশ্বাস, অন্যদিকে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যুক্তি, বিশ্বাস ও যুক্তির নিখুঁত সমন্বয় এল ইতালিতে, যদিও ১২১৩ খ্রি

প্যারিসে আরিস্ততল পড়ানো নিষিদ্ধ হয়। কবিতায় এই নব্য ইতালীয় দৃষ্টিভঙ্গি, এক ধরনের নতুন মানবিকতার বোধ, তার প্রভাব সে সময়ে স্পষ্টতই দুটি কবির মধ্যে ধরা পড়ে। এক, গুইদো কাভালকান্তি; দুই, দান্তে আলিগিএরি। প্রাচীন পেগান সাহিত্য দর্শনের চর্চা ধর্মমন্দিরেও অব্যাহত হওয়ায় দান্তে তার পুরো সুযোগ নিয়েছিলেন। সান্তা ক্রোচের ফ্র্যানসিসকানদের মধ্যে অনেক ভালো শিক্ষক ছিলেন, দান্তে প্রসঙ্গে একজনের নাম কেউ কেউ উল্লেখ করেন, যেমন মিকেলে বার্বি, তিনি হচ্ছেন : পিএত্রো জোভান্নি ওলিভি, ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ পর্যন্ত তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। দান্তে বোধ হয় এঁর পড়ানো শুনে থাকবেন। সান্তো স্পিরিতো-র অগাস্টিনিয়ানরাও ধর্ম ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দান্তের নিজের উক্তি থেকে জানা যায় ১২৯০ পর থেকে তিনি দর্শন শাস্ত্রের চর্চা করতে লাগলেন; দর্শনের মাধুর্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অন্য সব চিন্তা মনে ঠাঁই পায়নি। অধিক পাঠের ফলে তাঁর চোখের দৃষ্টি কিছুটা ক্ষীণ হয়।

এই গভীর পাঠানুরাগের ফল তাঁর কাব্যেও মেলে। ঋজু কারুকার্য-খচিত 'কান্‌ৎসোনি' আমরা স্মরণ করবার আগেই কানে শুনব ---আমোর, কে নেল্লা মেন্‌তে মি রাজোনা; আমোর, কে মুওভি তুআ ভির্‌তু দাল্‌ চিএলো; আল্‌ পোকো জ্যরনো এদাল্‌ গ্রান্‌ চের্‌কিও দোমব্রা, ইত্যাদি। গভীর পাঠ, অধ্যবসায়ের মধ্যে দর্শন হল অন্যতম প্রেয়সী, একসময় তাকেই তিনি একমাত্র মনে করতেন; অন্যান্য কবিদের তুলনায় কাব্যরচনায় এল অনেক বেশি সংযম, চিত্রকল্পে সমন্বয়, চিন্তায় সংহতি, আধুনিক অর্থে সচেতনতা এবং সে-যুগের পক্ষে সবচেয়ে চমকপ্রদ—দায়িত্ববোধ।

যতই তিনি দর্শনশাস্ত্র চর্চা করুন, গভীর পাঠে অভিনিবিষ্ট হোন, তিনি ছাড়তে পারেননি ' লে দল্‌চি রিমেদামোর' — প্রেমের মধুর চরণ, তাঁর কথামৃত। জীবিত ভদ্রাদের কবিতা উৎসর্গ করে তিনি প্রেমের মহত্ত্বই অনুভব করেছেন। তিনি মনে করতেন, মধ্যযুগীয় ভাব ধারণার বশবর্তী হয়েই মনে করতেন যে, একজন অভিজাত ব্যক্তির কাছে পৌরুষ হবে অপরাজেয় আর 'শিষ্টাচার' অনন্য। যাঁরাই তাঁর জীবন ও কাব্য অনুধাবন করেছেন তাঁরাই এই দুটি গুণের বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ করেছেন। আর শিষ্টাচার আর কাব্য যেন অভিন্ন হৃদয়, এমনকি একথা বলা যেতে পারে, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে দান্তের কবিতা শিষ্টাচারের এক মহান প্রকাশ। শিষ্টাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ এত গভীরভাবে জীবন ও কাব্য অনুভব করতে পারে, সেকথা দান্তের পূর্বে সিসিলিয়ান বা প্রভাঁসাল কবিদের জানা ছিল না, এমনকি স্তিল্‌ নুওভো দলের মধ্যে একমাত্র গুইদো কাভালকান্তিই দান্তের সমকক্ষ ছিলেন বলা যেতে পারে। ক্রমেই দান্তে তাঁর কবি-ভাইদের থেকে অন্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন, অনুভূতির স্বীকৃতি পেল তর্কে, মীমাংসা হল প্রেমে — এমন এক প্রেম যে বিশ্বের তুচ্ছ থেকে মহান আচরণ ধারণ করে আছে।

আমরা এমন কথা মনে করব না যে, দান্তে কেবলমাত্র এ সময়ে পড়াশোনা ও কাব্যচর্চায় মন উৎসর্গ করেছিলেন। ফ্লরেন্‌সের জীবনই ছিল এক প্রবল বাস্তবতা, তার দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে দান্তের মতো মরমী কবিও গজদন্তমিনারে বাস করবার কথা ভাবতেও পারতেন না। এ প্রশ্ন অবশ্য ওঠে না, কারণ কিছু কিছু মরমীবাদ থাকলেও দান্তের কবিতা বাস্তবানুরাগী, জীবনের ফরমায়েস ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লেখেননি, প্রতিটি ঘটনাকে তিনি কাব্যমণ্ডিত করেছেন, প্রতিটি কবিতা ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে আছে। ফ্লরেন্‌স শহর তথা ইতালিতেই তখন এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব ঘটছিল। ফিউডাল সমাজ ভেঙে পড়ছিল, দেখা দিয়েছিল কারুশিল্পী ব্যবসায়ীরা, নতুন বুর্জোয়া সমাজ। ব্যবসা, টাকার লোভে বহু বিদেশিরাও ফ্লরেন্‌সে বাস করতে শুরু করে। রাজনীতির নানা হাওয়া বইতে লাগল। পুরোনো অভিজাত বংশের লোকেরা ব্যবসার ধার ধারত না, কী করে চালাতে হয় তা জানা ছিল না, অবস্থা খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম রাজনীতির আশ্রয়ে, কখনও পোপের সমর্থক হয়ে কখনও সম্রাটের সমর্থক হয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে লা জেন্‌তে নুওভা, নতুন ধনী সম্প্রদায় টাকার গরবে উদ্ধত। সমাজে প্রতিপত্তি পাবার জন্য এল দলাদলি। আজ যে রাজা কাল সে ফকির—হামেশাই এ দৃশ্য দেখত পাওয়া গেল। দান্তে নিজেই এর উল্লেখ করেছেন : রিক্কি এ মেন্‌দিচি—দনী ও ভিক্ষুক (পারাদিজো, ১৭, ৯০)। সৌভাগ্যবশত

দান্তের পিতা পৈত্রিক সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন তা অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন, সম্ভবত নতুন ব্যবসা করে কিছু বাড়িয়েওছিলেন। ছেলে বাপের পথ বেছে নেননি, এমনকি ফ্রান্‌চেসকো তাঁর সৎ-ভাইও। শোনা যায় পিতা কুসীদজীবী ছিলেন। কি কারণে ঠিক বলা যায় না, দান্তে পিতার নাম একবারও উল্লেখ করেননি, আর একজন সম্বন্ধেও তিনি নীরব, —তাঁর স্ত্রী। সৎ-ভাই ফ্রান্‌চেসকোর কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, বিবাহ মোটামুটি ভালো ঘরেই হয়েছিল, লেখাপড়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। দান্তে ও ফ্রান্‌চেসকো নিজের নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর নির্ভর করতেন মোটামুটি ভাগে গবাদি পশু পালন ক'রে কিছু বাড়তি রোজগার হত দু'ভাইয়েরই, এই পর্যন্ত। আর সকল সাধারণ ভূস্বামীর মতো আমাদের কবিও মাঝে মাঝেই অভাব অনটনে পড়তেন। দু'একটি নথিপত্র থেকে জানা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দান্তে ও ফ্রান্‌চেসকো উভয়কেই ঋণ করতে হয়। জেম্মা দি মানেত্তো দোনাতি-র সঙ্গে বিবাহ হবার পর কয়েক বছর দান্তে ঘর সংসার করতে সময় পান। বোকাচ্চ মনে করেন দান্তে বিবাহিত জীবনে অসুখী ছিলেন; কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে কথা বলা যায় না। দান্তের দুই ছেলে —ইআ কোপো, পিয়েত্রো; কন্যা —আন্‌তোনিয়া (বেআত্রিচে নামে পরিচিত, রাভেন্নার সান্‌তো স্তেফানো মঠে সন্ন্যাসিনী হন) আরও একটি ছেলের নাম পাওয়া যায় ফ্লরেন্‌সের নিকটে লুক্কা শহরের এক মামলার নথিতে —সাক্ষ্য হিসাবে আছে ২১ অক্টোবর, ১৩০৮ খ্রি (দান্তে তখন অবশ্য নির্বাসনে) —ইওহানেস্ ফিলিউস দান্তিস্ আলিগিএরি দে ফ্লোরেন্‌তিঅ, অর্থাৎ ফ্লরেন্‌স নিবাসী দান্তের পুত্র ইওহানেস বা জন বা জোভান্নি।

১২৯৪ খ্রি মার্চ মাসে ২য় শার্লের পুত্র — আঁজুর রাজপুত্র শার্ল মারতেল তোসকানা তে আসেন পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে। এই উপলক্ষে ফ্লরেন্‌স শহর তাঁকে এক বিরাট সংবর্ধনা জানায়। দান্তের বয়স তখন ঊনত্রিশ বছর, শার্ল মারতেলের চেয়ে ছ'বছরের বড়। তিনি ইতিমধ্যেই একজন গণ্যমান্য নাগরিক, কবিকুলের নেতা, উৎসাহী, আদর্শবাদী, জনোপকারী, ন্যায়নিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী — তাঁর সঙ্গে সুদর্শন, সংগীতজ্ঞ, জনপ্রিয় রাজকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় বলে অনুমিত, অন্তত পারাদিজো-র কয়েকটি ছত্র থেকে এই অনুমান অসংগত নয় (*পারাদিজো*, ৮,৫৫.৫৭)। দান্তে এই তরুণ সুদর্শন রাজকুমারের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন, ভেবেছিলেন ইনিই একদা তাঁর আদর্শ অনুরূপ সম্রাট হবেন, আনবেন ইতালিতে একতা আর তার সঙ্গে শান্তি। কিন্তু রাজকুমার ফ্লরেন্‌সে আসবার একবছর বাদেই প্লেগ রোগে মারা যান। দান্তে যেমন আঘাত পেলেন তেমনি নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন।

যতই তিনি চান মধ্যযুগীয় আদর্শ —যথা, শৌর্য, শিষ্টাচার তাঁর জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হোক, ততই তিনি দেখেন স্বার্থপর দলাদলি, মনুষ্যত্বের চরম অপমান—না ধর্মীয়, না রাজকীয়, না মানবীয় কোনও আদর্শই ফ্লরেন্‌সে তার নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। যাঁরা দান্তের সমসাময়িক ঐতিহাসিত ভিল্লানি অথবা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মাকিআভেল্লির ইসতোরিয়ে ফিওরেনতিনে, ফ্লরেন্‌সবাসীর ইতিহাস পড়েছেন তাঁরাই জানেন কী ভাবে সে সময় স্বার্থান্বেষী দলাদলির মধ্যে পড়ে, ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে, পরিবারে পরিবারে, অভিশপ্ত দাঙ্গা হাঙ্গামায় জীবন ধনসম্পত্তি রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছিল। আর দেশজোড়া দরিদ্র উলুখাগড়ার দল একবার পোপের হয়ে একবার সম্রাটের হয়ে প্রাণ দিয়েছে। বলা বাহুল্য স্বদেশপ্রেমিক দান্তের কাছে ফ্লরেন্‌সের এই অধোগতি জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠছিল; তাঁর শান্ত অথচ উদ্বেলিত বেদনা সে-সময়কার কয়েকটি কান্‌ৎসোনিতে প্রকাশ পেয়েছে, তাছাড়া কবিবন্ধু চিনো দ্য পিসতোইয়া-কে উদ্দেশ্য করে লেখা সনেটে।

Le dolci rime d'amor, ch'l' solia
Cercar ne' miei peusieri,
Convien ch'io lasci....

Il Convivio

লে দোলচি রিমে দামোর, কি' সোলিআ
চেরকার নে' মিয়েই পেন্‌সিয়েরি,
কোন্‌ভিয়েন কিয়ো লাশি ...

মধুর পদাবলী প্রেম, অভ্যাসেই
খুঁজেছি আমারই চিন্তায়;
বাধ্য কিবা, আমি তাদের ছাড়ি....

Poscia ch' Amor del tutto m'ha lasciato...
Canzone XIX
পোশ্যা কামোর দেল্‌ তুত্তো মা লাশ্যাতো ...

যেহেতু আমারে ছাড়ে প্রেম একেবারে ...

Oh, messer Cin, Come'l tempo e' rivolto
A danno nostro e delli nostri diri ...

ও মেস্‌সের চিন, কোমেল তেম্পো এ্যা রিভোল্‌তো
আ দান্নো নোস্‌ত্রো এ দেল্লি নোস্‌ত্রি দিরি ...

হায়, প্রিয় চিনো, কালের চাকা ঘোরে
আঘাতে করে দীর্ণ জীবন ও ছন্দ ...
চিনো দা পিসতোইআ-কে লেখা সনেট

কিন্তু মহানপ্রাণ দান্তে জীবন-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যাননি। সারা জীবনই তিনি আদর্শ নিয়ে লড়েছেন স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পোপের বিরুদ্ধে। ১২৯৩ খ্রি ফ্লরেন্‌সে নতুন 'অর্ডিনান্স' জারি হল : নগর সঙ্ঘ (Commune) শাসন পরিষদ, ইত্যাদির নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে কেবলমাত্র তাঁরাই দাঁড়াতে পারবেন যাঁদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। এতে অভিজাতবর্গের বিশেষ ক্ষতি হল, তাঁরা পরশ্রমজীবী, রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁদের হাতে থাকা খুবই কঠিন। দান্তে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এই বিধানের স্বপক্ষে ছিলেন। ১১৯৫ খ্রি ৬ জুলাই এই কড়া বিধান একটু আলগা করা হল, বলা হল সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা অন্তত যদি কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নাম লেখান (কাজ করুন বা না করুন) তাহলে তাঁরাও পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। দান্তে বৈদ্য ও ভেষজকারী সঙ্ঘে নাম লেখান। সে যুগে ওষুধ যাঁরা বেচতেন তাঁরা পুথিও বেচতেন। জ্ঞানী গুণী বিদ্যার্থীরা তাই এসব দোকানে বই পড়বার জন্য ভিড় করতেন; এই সব দোকানগুলি অনেকটা পাঠাগারের কাজও করত। দান্তেও এই সব দোকানে যেতেন পুথি পড়তে বা কিনতে। গল্প আছে যে, একদা তিনি সিয়েনায় গিয়েছিলেন, একটি দরকারি পুঁথি পড়বার জন্য দুপুরবেলা একটি এই ধরনের দোকানে আসেন। পুথিটি তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসবার উপায় ছিল না অথচ তাঁকে পড়তেই হবে, তিনি দোকানের সামনে একটি বেঞ্চিতে বসে পড়তে শুরু করেন। কিছুক্ষণ বাদেই দোকানের নিকটেই একটি খোলা জায়গায় একটি উৎসব —ইতালীয় উৎসব, অর্থাৎ যথেষ্ট হই চই আকাশ ফাটানো গান বাজনা নৃত্যসহ, শুরু হয়। পাঠে এতই তন্ময় হয়েছিলেন যে, একটি বারের জন্যও দান্তের চোখ পুথির বাইরে যায়নি। সন্ধ্যা হল, উৎসবও শেষ হল, আর তার সঙ্গে দান্তের পড়াও। যখন তাঁকে উৎসব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি খুব বিস্মিত হলেন, ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁকে কী জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। গল্পটি অবশ্য বলেছেন জোভান্নি বোকাচ্চ।

এই সংঘে যোগ দেবার ফলে ১লা নভেম্বর ১২৯৫ খ্রি থেকে ৩০ এপ্রিল ১২৯৬ পর্যন্ত বিশেষ জাতীয় পরিষদে পরিচালনার কাজে সুযোগ পান। ১৪ ডিসেম্বর ১২৯৬ খ্রি শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজ্ঞদের ডাকা হয় 'প্রিঅর'দের নির্বাচন করবার জন্য। এঁদের মধ্যে দান্তে ছিলেন একজন। 'শতজন পরিষদ'-এও তিনি একজন সভ্য ছিলেন ১২৯৬ মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই পরিষদই অর্থ এবং অন্যান্য দরকারি বিষয় পরিচালনা করত। সম্ভবত ১২৯৭ খ্রি আর একটি পরিষদেরও সভ্য ছিলেন।

দুঃখের বিষয় জুলাই ১২৯৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৩০১ পর্যন্ত এই সব পরিষদের কার্য পরিচালনার কোনও 'মিনিট' বই পাওয়া যায় না। কিন্তু দু'একটি নথিপত্র দেখে মনে হয় দান্তে পৌরসংস্থার পরিচালকদের মধ্যেও একজন ছিলেন। ১৩০০ মে মাসে তাকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে সান জিনিএ্যানো শহরে পাঠানো হয়, উদ্দেশ্য —আসন্ন তোসকানা গুএলফো দলের অধিবেশনে যাতে সান জিনিএ্যানো তাদের অধিকর্তাদের পাঠায়। গুএলফো দলকে আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বোঝাপড়া দরকার, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন রণাধিপতি নির্বাচন করা। ফ্লরেন্স্ বিপদের আশঙ্কা করছিল। দান্তের এই নতুন পদ এমন কিছু সম্মানজনক নয়, কিন্তু লক্ষণীয় যে, কূটনৈতিক কাজে ফ্লরেন্স্ তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারত। দান্তের নির্বাসনকালেও আমরা দেখেছি একাধিক রাষ্ট্র দান্তের কূটনৈতিক বুদ্ধির ওপর অপরিসীম আস্থা রেখেছে। সে যাই হোক ফ্লরেন্সে গুএলফো দলের প্রধান কর্তব্য হল পোপ অষ্টম বোনিফাৎসো-র বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘবদ্ধ হওয়া। সে-সময় ফ্লরেন্স্ কোনও সম্রাটের অধীন ছিল না, সিংহাসন শূন্য, অস্ট্রিয়ার অ্যালবার্ট তখন স্বীকৃত হননি বা সিংহাসনে বসেননি, পোপ বোনিফাৎসো এই সুযোগে তোসকানা নিজের করায়ত্তে আনবার মতলব করলেন। ফ্লরেন্স্ দান্তেকে নিযুক্ত করলেন এই বিপদ ঠেকাবার জন্য। ১৫ জুন থেকে ১৫ অগস্ট গোটা দু'মাস দান্তেকে ক্রমাগত পোপের বিরুদ্ধাচরণ করতে হল, তাঁর অভিসন্ধি মুখোস খুলে ধরলেন—তাঁর তত্ত্ব প্লেনিতুদো পোতেস্তাতিস্, অর্থাৎ, চার্চের এমনকি ধর্মযাজকেরাও ধর্মচিন্তা ভুলে কোনও না কোনও উপদলে যোগ দেয়। দিনো কোমপাঞি তাঁর ক্রোনিকা নামক গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। যেহেতু সামনে বিপদ, আর কেউ নয় স্বয়ং পোপের কাছ থেকেই, সম্রাট অনুপস্থিত, শাসনকার্য শহরের প্রজাতন্ত্রের হাতেই —দান্তের পক্ষে সংগ্রামের জন্যই রাজনীতি ছাড়া সম্ভব হল না। যদিও তিনি দু'টি উপদলের একটিকেও সমর্থন করতে পারতেন না, তবু তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে উপদলটির কিছুটা বিবেক বুদ্ধি আছে বলে ভেবেছিলেন সেই চেরকির দলকেই তিনি সমর্থন করলেন। ভালোআ-র শার্ল-এর সঙ্গে গোপন সহযোগিতায় পোপ বোনিফাৎসো-র আসন্ন এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড়ালেন।

আগেই বলেছি নগর পরিষদের 'মিনিট' বই ১২৯৮ থেকে ১৩০১ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ১৩০১ অগাস্ট মাসে তাঁর সভ্যপদ উত্তীর্ণ হবার কথা। তারপর অন্য কোনও পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে আমরা এটা জানতে পারি যে, ১৩০১ এপ্রিলে তিনি সান প্রোকোলো নামক একটি জায়গায় একটি পুরোনো রাস্তাকে নতুনভাবে তৈরি করার কাজে নিযুক্ত হন। কাজটি কোনও সরকারি নয়; কয়েকজন প্রতিবেশী মালিকের সুবিধে হবে বলে তাঁদেরই সহযোগিতায় রাস্তাটি তৈরি করা হয়। নানাবিদ্যায় পারদর্শী তাঁর বৈষয়িক ও জাগতিক বুদ্ধির ওপরও লোকের আস্থা ছিল। সেই বছরেই ১৫ মার্চ কয়েকজন বিজ্ঞ লোককে (সাভি) ডাকা হয় একটি গুরুতর বিষয়ে তাঁদের মত নেবার জন্য। দান্তে তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল : আজুঁর রাজা শার্লকে সিসিলি পুনরুদ্ধারের কাজে অর্থসাহায্য দেওয়া হবে কিনা। দান্তে অর্থসাহায্যের বিরুদ্ধে মত দেন। সেই বছরেই ১৪ এপ্রিল প্রিঅর-দের কী ভাবে নির্বাচন করা যায় তার জন্য দান্তেকে পুনরায় ডাকা হয়। পোপ তাঁর প্রতিনিধি মারফত ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, ফ্লরেন্সের দুটি দলেরই নিজস্ব মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়েই অধ্যক্ষ গঠিত হোক। কিন্তু শহরের মঙ্গলের জন্য দান্তে ঠিক করলেন যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় অথবা অসাধু সন্দেহভাজন কিংবা পোপের নীতি অনুসরণ করে তাদের প্রার্থী হিসাবে গণ্য করা হবে না। সারা জীবন, এমনকি দুঃখময় দীর্ঘ নির্বাসনকালেও,

তিনি তাঁর জন্মভূমির মঙ্গলকামনা করে এসেছেন এবং তার মঙ্গলের জন্য কী-করা উচিত সে-বিষয়ে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেননি। ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি আবার 'শতজন পরিষদ'-এর সভ্য হন। তিনি সেখানে সভ্য থাকাকালীন দু'বার কথা ওঠে — পোপকে একশোটি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা হবে কিনা। পোপের এই সৈন্যদলের প্রয়োজন—তোসকানার প্রান্তে আলদো ব্রান্‌দেস্‌কি নামক জায়গায় অভিযান চালাবার জন্য। দু'বারই দান্তে এ সাহায্যদানের বিরুদ্ধে মত দেন। ১৩ সেপ্টেম্বর একটি যুক্ত পরিষদ ডাকা হয়, সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকেন। এই ধরনের যুক্ত পরিষদের সভা তখনই ডাকা হত যখনি দেশে বিপদ দেখা দিত। দান্তে এই সভায় দু'টি মূল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। একটি হচ্ছে, ন্যায় বিচারের কথা মনে রেখে যে-সব 'বিধান' জারি করা হয়েছে, সে বিষয়ে; অপরটি, দেশের গণতান্ত্রিক আইন সম্পর্কে। সভার কার্য-বিবরণীর কোনও লিপিবদ্ধ নথি না পাওয়াতে দান্তের মতামত জানা যায় না। তবে আজ অনুমান করা শক্ত নয় ন্যায়নিষ্ঠ দেশপ্রেমিক দান্তে কী মতামত দিয়েছিলেন।

১৩০১ অক্টোবর মাসে ভালোআ-র শার্ল ফ্লরেন্‌স অভিমুখে যাত্রা করেন। নগর সঙ্ঘ ঠিক করে পোপ বোনিফাৎসো-র কাছে একটি দৌত্য পাঠানো হোক, যদি তাতে কৃষ্ণ দলের কুমতলব কিছুটা প্রতিহত করা যায়। তিনজনকে নিয়ে এই দৌত্য গঠিত হয়। তাঁরা হচ্ছেন, মাজো দি রুজ্জিএরিনো; কোরাৎসা দি সিএগ্গা এবং দান্তে আলিগিএরি। এর ফলে দান্তের স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয় পোপের রাজকীয় দরবার। দিনো কোমপাঞি তাঁর ক্রোনিকা নামক গ্রন্থে এই দৌত্যের বিবরণী দিয়েছেন :

যখন দূতেরা রোমে পৌঁছলেন, পোপ তাঁদের নিজের ঘরে একলা দেখা করলেন, কানে কানে বললেন,

> তোমরা কেন এত অবাধ্য? আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি সত্যই বলছি তোমাদের শান্তি ফিরিয়ে আনা ছাড়া আমার কোনও উদ্দেশ্য নেই। তোমাদের মধ্যে দু'জন ফিরে যাও, গিয়ে তাদের বল তারা যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করে তাহলে তারা আমার আশীর্বাদ-ভাজন হবে।

ধূর্ত পোপ অতি কৌশলে দু'জনকে ফিরে যেতে বললেন, দান্তেকে নিজের কাছে আটকে রাখলেন, জানতেন তাঁর সবচেয়ে ভয় দান্তের কাছ থেকেই। সেই বিপদের দিনে দান্তে ফ্লরেন্‌সে থাকলে ভীরু চেরকি-র দল অন্তত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারত না।

যথাসময়ে পূর্বকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ভালোআ-র শার্ল তোস্‌কানা-তে এলেন। ভিএরি দে' চেরকী পাছে তাঁর ধনসম্পত্তি লগ্নী খোয়া যায় সেই ভয়ে শার্লকে কোনও বাধাই দিলেন না। শার্ল বিনা বাধায় ফ্লরেন্‌সে পদার্পণ করেন। মনে হয় শার্লের সাহায্যেই কোরসো শহরে ফিরে এসে শ্বেতদলকে ধ্বংস করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দান্তের বিধান অনুযায়ী এতদিন তিনি নির্বাসিত ছিলেন, তাই প্রথমেই দান্তের বাড়ি লুঠ করা হয়; সেই লুণ্ঠিত বাড়ি দেখবার সৌভাগ্য আর দান্তের হয়নি, কারণ তিনি আর স্বদেশে ফিরে আসতে পারেননি। পোপের কাছে আটকে থাকার পর তিনি সিয়েনা শহরে গিয়েছিলেন; সেখানে দলের শোচনীয় পরাজয়ের খবর শোনেন। ১৩০২-এর ২৭ জানুয়ারি তিনি তাঁর প্রথম দণ্ডাজ্ঞা শুনলেন। দান্তে ও আরও চারজনের পাঁচ হাজার ফ্লোরিন জরিমানা, দু'বছরের জন্য নির্বাসন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ : অবৈধভাবে নিজ দলের স্বার্থে দেশের ও পৌর প্রতিষ্ঠানের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ, গচ্ছিত তহবিল তছরুফ, পোপ ও ভালোআ-র শার্লের বিরুদ্ধতা, পিসতোইআ-দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র (যার ফলে পোপের ভক্ত কৃষ্ণদলকে কোণঠাসা হতে হয়) ইত্যাদি। যেহেতু দান্তে যথাসময়ে ফিরে এসে জরিমানা দেননি বা নিজের দোষ স্খালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি, অতএব ১০ মার্চ দ্বিতীয় দণ্ডাজ্ঞা তাঁর এবং আরও চোদ্দোজনের ওপর জারি হল এই মর্মে : যদি দান্তে (এবং অবশ্য আরও চোদ্দোজনও) কখনও নগর সঙ্ঘের চৌহদ্দির মধ্যে আসে এবং ধরা পড়ে তাহলে তাকে 'জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে'—ইগ্‌নে কমবুরাতুর সিক্ কুত্তদ্ মরিআতুর। ইতালিতে এইসব নথিপত্র বর্তমান ও ভাবীকালের জন্য সযত্নে রাখা হয়েছে।

নির্বাসনের ফলে ফ্লরেন্সীয় নাগরিক বিশ্বের নাগরিক হলেন। ১৩০৩-এ আমরা তাঁকে দেখতে পাই

স্কারপেত্তা ওরদেলাফ্‌ফির কর্মসচিব হিসাবে। সেই বছরেই ভেরোনায় তিনি স্কালিজার পরিবারের তরফে দৌত্যকার্য করেন। ১৩০৪-এ শ্বেতদলের বারোজন সভ্যের একজন সভ্য হয়ে পার্টির কাজকর্ম করেন। কাজ প্রধানত পত্রাদি খসড়া করা কার্ডিনাল দা প্রাতো-র জন্য। সে সময়ে দা প্রাতোর মধ্যস্থতায় ফ্লরেন্‌স ও নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য কথাবার্তা চলছিল। এতদিনে দান্তে অন্যান্য নির্বাসিত সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজকর্ম করছিলেন (প্রধানত রাজনৈতিক কাজ তা বলাই বাহুল্য) কিন্তু শীঘ্রই তিনি 'লা কোমপাইএ্রা মালভাজা এ স্কেমপা'—এই দুষ্ট ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করলেন এবং কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই একটি দল তৈরি করলেন। দান্তের নিজের কথা থেকে এবং ওত্তিমো কোম্‌মেনতো-র গ্রন্থকার যে সব উক্তি করেছেন তাতে মনে হয় দান্তের রাজনৈতিক দল দান্তের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। আমরা এই অভিযোগ বা এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না; তবে দান্তের প্রকৃতি ও চরিত্র যতটুকু জানা যায় তাতে স্বার্থপর সুযোগবাদী বিবদমান উপদলের দলাদলিতে তিনি টলবেন এমন আশা করা যায় না। তিনি নিজে নির্ভীক মতামতে অভ্যস্ত ছিলেন; অসাধারণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব ছিল বলেই কৃষ্ণদল ও শ্বেতদল উভয় দলই হয় নিজেদের স্বার্থে তাঁকে দলে টানবার চেষ্টা করত, নয় তো তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত। তিনি দু'টি উপদলের স্বরূপ ভালোই জানতেন—ক্রনেত্তোর মারফৎ তিনি তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রথমে ভেরোনার জমিদারবর্গের আশ্রয় গ্রহণ করলেন; কিন্তু বেশিদিন সে শহরে থাকেননি। নির্বাসনের তাপে জীবন ঝলসে গেলেও তিনি অবিচলিত ছিলেন। যে স্বদেশপ্রেমিক 'আরনো-র জল পান করেছেন দাঁত ওঠবার আগেই' তিনিই নির্বাসনকালে লিখতে লিখতে একজায়গায় বলেছেন —'তাঁর কাছে এই দুনিয়াই হচ্ছে পিতৃভূমি (পাত্রিঅ) যেমন সমুদ্র মাছের কাছে'। বিলাপ করে বলেছেন —'তাকে যাত্রী, প্রায় ভিক্ষুকের মতো দেশের সর্বত্র ঘুরতে হচ্ছে যতদূর ইতালিআন ভাষা উচ্চারিত'— যেন, 'একটি ডিঙি (লেএ্রো) যার পাল নেই হাল নেই, ঠেলে নিচ্ছে বন্দরে বন্দরে, নদীর মোহানায়, তীরে তীরে শুকনো হাওয়ায় শুকনো দারিদ্র্যের নিশ্বাসে'। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠেন, 'বিচার করব বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা, হৃদয়াবেগে নয়',—দোল্লিয়া মি রেকা নেল্ল কোর আর দিরে —দুঃখ আমার হৃদয়ে সাহস আনে। এই তাঁর চরিত্র, তাঁর নীতি, তাঁর সারাজীবনের আদর্শ—যৌবনে প্রেমে, রাজনীতিতে, নির্বাসনে একদিনের জন্যও এই আদর্শের ব্যত্যয় হয়নি।

নির্বাসিত সহকর্মীদের ত্যাগ করবার পর তাঁর অবস্থা যা দাঁড়ালো তা অনেকটা অমাত্যর মতো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক শহর থেকে আর শহরে, দয়ালু ভূস্বামীদের দোরে দোরে আশ্রয়ের জন্য। সুখের বিষয় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের জন্যই সে-সময় এমন অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন যাঁরা জ্ঞানী গুণীদের সমাদর করতেন, যদিও ওই একই সঙ্গে মল্লযোদ্ধা, ভাঁড় ইত্যাদির সমাদরও কিছু কম হত না। ফলে দান্তে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই 'উদারতায়' নিজেকে অনেক সময় বিব্রত বোধ করলেও নানা পাঁচমিশেলি অমাত্যবর্গের মধ্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। 'তুমি বুঝবে অন্যের রুটিতে নুনের স্বাদ কেমন'- এ কথা দান্তে নিজেই বলেছেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ কাচ্চাগুইদার ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করে। রাজন্যবর্গ 'তারা (বংশমর্যাদার) গৌরব পালন করতেন বীরজনোচিত ভাবে নয়, স্থূল ব্যক্তিদের মতো —কুই নন্‌ হেরইকো মোরে সেদ্‌ প্লেবেও সেকুউনতুর সুপেরবিআস—এই ধরনের শ্লেষাত্মক উক্তি তাঁর মন নিপীড়িত হত বলেই উচ্চারিত। ভূস্বামীদের অমাত্য হিসাবে বাস করলেও তাঁর আচরণে সাধারণ অমাত্যর মতো বশংবদভাব কোনও সময়ই প্রকাশ পেত না। নির্ভীক মতামত, নির্ভীক আচরণ, মুখের ওপর জবাব দিতে তিনি কসুর করেননি। এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ দরদী বন্ধুপ্রতিম গুণী কানগ্রান্দেকে শ্লেষ ঠাট্টার উত্তরে কথা শোনাতে পেছ-পা হননি। নির্বাসনকালে এই সব ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁর ছোটখাটো সংঘাত নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে। দান্তে যেমন স্বভাবতই বিনয়ী ছিলেন, তেমনি ছিলেন গর্বিত।

যতই দিন যায় ততই তাঁর দেশে ফিরে যাবার বাসনা প্রবল হয়। তাঁর সেই আদর্শ—মধ্যযুগীয় শিষ্টাচার, শৌর্য, প্রেম, রাষ্ট্র ও ধর্মের ঐক্য, সবই যেন নির্মূল হল। ১৩০৩-এর একটি বিধান অনুযায়ী বয়স চোদ্দবছর

হলেই দান্তের দু'টি ছেলেরও দান্তের ভাগ্য অনুসরণ করতে বাধ্য, অর্থাৎ নির্বাসন; এই কথা মনে হলে তিনি আরও বিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি যে নিরপরাধ, কতখানি নিরপরাধ তা তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন বহু চিঠিপত্র লিখে। প্রায় নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছেন তাঁরই স্বদেশবাসীর কাছে তাঁকে যেন ফিরে যেতে দেওয়া হয় কোনও অপমানজনক শর্তে নয় —নিজ মর্যাদায়। সরকারের কাছে, ব্যক্তি বিশেষের কাছে, স্বদেশবাসীকে লক্ষ্য করে তিনি অনেক চিঠি লেখেন, তার মধ্যে একটি খুব বড় চিঠি, আরম্ভ —পপ্যুলে মেএ, কুইদ্ ফেকি তিবি? হে আমার স্বদেশবাসী আমি তোমাদের কী করেছি। চিঠি ছাড়া ফ্লরেন্সকে তিনি একটি কানৎসোনে, গীতিকবিতাও পাঠান, তার শেষ পঙ্‌ক্তি — কেল্ পের্‌দোনারে এ্য বেল্ ভিনচের দি গুএর্‌রা, ক্ষমার মধ্যেই নিহিত শ্রেষ্ঠ সুন্দর জয়। যদি তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে ক্ষমা করে থাকে তাহলে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি তারা জানত না দান্তে কী ধরনের মানুষ ছিলেন—কে নোন্ সান্ কোয়েল কে সোনো। তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি ফ্লরেন্সকে ভালোবেসেছিলেন, শান্তি চেয়েছিলেন, সেই জন্যই কি তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়? তাঁর এই আবেগ, বেদনা, অভিমান একটি কবিতায় বিশেষভাবে ব্যক্ত যার প্রথম চরণ — ত্রে দোন্নে ইন্‌তোরনো আল কোর মি সন ভেনুতে —আমার হৃদয় ঘিরে আসে ত্রিভদ্রা রমণী।

'স্বদেশবাসীরা' তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ এনেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযোগ পোপের বিরুদ্ধতা। তাছাড়া স্বয়ং পোদেস্তা অর্থাৎ মেয়র অর্থাৎ আদালত যখন তাঁকে অভিযুক্ত করে দণ্ডদান করেছেন তখন তো তিনি নিশ্চিতভাবে দোষী। তিনি গুএলফো রাজনৈতিক দলের আদর্শ কোনো দিন মেনে চলেননি এও একটি অন্যতম প্রধান অভিযোগ। বহু চিঠিপত্রে তিনি এই সব অভিযোগের বিরুদ্ধে, নিজের কর্ম, আচরণ ও মতবাদের সপক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্বদেশবাসীকে বোঝাতে ব্যর্থ হন। তখন তাঁর মনে হয় শুধু চিঠিপত্রে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না, তাঁর চিন্তাকে, তাঁর আদর্শকে তিনি রূপ দেবেন বই লিখে। তিনি লিখবেন। তিনি এখন নির্বাসিত, রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্যুত, চরম দারিদ্র লাঞ্ছিত, তিনি তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা —তা সে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা দার্শনিক হোক তাকে একটি তত্ত্বে রূপ দেবেন। তাঁর মনে পড়ে গেল ভিতা নুওভার দিনগুলি, কী করে দিনের পর দিন প্রেমের অভিজ্ঞতাকে তিনি 'যুক্তির' মধ্যে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, (যার জন্যই 'রাজোনি'-র সৃষ্টি) যে-যুক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম একটি 'বিশ্বাসে'। এখনও সেই যুক্তির আশ্রয়েই তিনি লিখবেন যাতে তাঁর 'বিশ্বাস' অবুঝ স্বদেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ১৩০৪ থেকে ১৩০৭-এর মধ্যে তিনি দু'টি প্রবন্ধের বই লেখেন, কিন্তু দুটি বই-ই অসমাপ্ত থেকে যায়। একটি, *দে ভুলগারি এলোকুএন্‌তিআ*, অর্থাৎ মাতৃভাষার লেখা সম্বন্ধে; অপরটি, *ইল্ কনভিভিও*, মুখ্যত নিজের কবিতার ব্যাখ্যা তথা দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা।

কিন্তু তিনি যেন তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। যৌবনের সেই আদর্শ স্বভাবতই নির্বাসনকালে তাঁকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করছিল —তিনি মানুষের দুঃখকে দূর করবার জন্যই রাজনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা আরও বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন পৃথিবীতে ন্যায়বিচার নেই, শান্তি নেই, আইন কানুন আছে (ইতালিতে সে সময় রোমক আইন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত) কিন্তু এমন কেউ নেই যিনি তার প্রয়োগ করেন। চারিদিকে লোভ হিংসা জুলুম। নির্বাসনকালে ইতালির যেখানেই গেছেন সেখানেই তিনি তাঁরই মতো আরও অনেক দুঃখী নির্বাসিত লোক দেখতে পেয়েছেন; কোথাও কোনও শৃঙ্খলা নেই, —দলাদলি, অত্যাচার, জবরদস্তিই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এর কারণ তাঁর কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। নির্বাসনকালে ১৩০৯ নাগাদ তাঁর রচিত প্রবন্ধে দে মনারকিআ (একচ্ছত্র শাসন সম্বন্ধে) এ বিষয়ে অনেক কথা আছে। দান্তের মত : আদি পাপের ফলে মানুষের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় দু'টি প্রতিষ্ঠানের সমান প্রয়োজন (del mondo e di Deo. পুরগাতোরিও, ১৬,১০৮) এবং এটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে, ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা থেকে নিজের নিজের কাজ করে যাবে। রাষ্ট্র মানুষকে সাহায্য করবে পৃথিবীর পথে তার যাত্রা সুগম

করতে; ধর্ম নিয়ে যাবে মানুষকে ঐশীপথে। এই জগতের জন্য প্রয়োজন ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট যিনি দায়ী থাকবেন ঈশ্বরের কাছে, পোপের কাছে নয়। আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যাবার জন্য থাকবেন পোপ যিনি সম্রাটের কাছে দায়ী থাকবেন না, ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি বিধান করবেন। রাষ্ট্র ও ধর্মের মিলিত সহযোগেই মানুষের কল্যাণ সম্ভব। দান্তের কাছে এ বিষয়ে শুধু বাইবেল নয় (দান্তের চিঠি ৫ ; সেন্ট জন, ১৯, ১০-১১) ইতিহাসেরও একটি নজির আছে। একদা কনস্তানতিনুস-এর মহানুভবতা এবং দূরদর্শিতার জন্য প্রাচ্যখণ্ডে রাষ্ট্র ও ধর্মের ঐক্য সম্ভব হয়েছিল এবং তার প্রভাব সমস্ত খ্রিস্টান জগতে সুদূরপ্রসারিত, মানুষের মনে নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছিল — সেন্ট জনের মধ্যে খ্রিস্টের বাণী সার্থক মনে করেছিল; কিন্তু প্রতীচ্যখণ্ডে এই আদর্শ টিকল না ইতিহাস পাঠক মাত্রই তা জানেন। সেখানে রাষ্ট্র ও ধর্ম তথা সম্রাট ও পোপের বিবাদ সমাজ ও মানুষকে বিষিয়ে তুলেছিল। একদিকে শৃঙ্খলার জন্য সম্রাটের সংগ্রাম, অন্য দিকে মর ও অমর জগতের একক আধিপত্যের জন্য পোপের সংগ্রাম; এমনকি মনুষ্যত্বহীন, ধর্মহীন নির্মম রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রতীচ্যখণ্ডে সম্রাট ও পোপ স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী। দান্তের সময়ে ক্ষমতালোভী পোপ বোনিফাৎসো রাষ্ট্র ও ধর্ম দুই-ই সম্পূর্ণভাবে নিজের করায়ত্তে আনতে চেষ্টা করেন। এরই মূলে ইতালির চরম দুর্দশা দান্তে তাই মনে করতেন। সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব হওয়াতে যেমন সম্রাট ও পোপ উভয়েই পাপাচার থেকে বিরত হননি, তেমনি এঁদের উভয়ের সমর্থকরা অনাবিল পাপকার্যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ রাষ্ট্র সমাজ ধর্মীয় পীঠস্থানেও উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পাপের স্রোত বয়ে চলেছিল। এই ভয়াবহ জীবনের গতিকে প্রতিহত করতে হলে দান্তে কী করবেন? সামান্য চিঠি, দে ভুলগারি এলকুএনতিআ, কনভিভিও এমনকি সবচেয়ে পরিণত প্রবন্ধ দে মনারকিআ এই জীবনকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে ফ্লরেন্‌সবাসীর চিত্তশুদ্ধি আনতে পারবে না। অতি পুরোনো তাঁর সেই *ভিতা নুওভা*-র দিনগুলি আবার মনে পড়ে গেল —জীবনের প্রথম সেই কঠিন সমস্যাকে তিনি যুক্তির কাঠামোয়, বিশ্বাসের ভিত্তিতে, একটি পরম দৃষ্টির আলোয় দেখেছিলেন, থাকে কাব্যমণ্ডিত করেছিলেন। তিনি ঠিক করলেন শিল্পের আশ্রয় নেবেন— যে-শিল্প তার অনন্য ঔষধিবলে চিত্তশুদ্ধি আনবে। যে-বিশ্বদৃষ্টির বশে দান্তের বিখ্যাত রচনা সম্ভব হয়েছিল, সেই রচনাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন কোম্‌মেদিআ, কারণ তার লেখা সরল এবং তদানীন্তন আলংকারিক অর্থে রচনাটি আরম্ভ দুঃখে, শেষ আনন্দে। পরবর্তীকালে লোকে এই Sacrato poema-র নাম দিয়েছিল *লা দিভিনা কোম্‌মেদিআ*—*La Divina Commedia.*

নির্বাসিত সঙ্গীদের ত্যাগ করার পর দান্তে কোথায় সবচেয়ে বেশিদিন কাটান তা সঠিক জানা যায় না। একটি উক্তি থেকে (পুরগাতোরিও, ৮,১২৪-১৬২) জানা যায় তিনি মালাসপিনা পরিবারের মধ্যে ছিলেন। মালাসপিনা-দের সঙ্গে লুনি-র বিশেষ বিবাদ ছিল। দান্তের মধ্যস্থতায় এ বিবাদ বিসম্বাদ থামে। বোকাচ্চ-র একটি লাতিন কবিতা থেকে একটা মত এখনও চলিত আছে যে, তিনি আলপ্‌স পার হয়ে প্যারিস গিয়েছিলেন সম্ভবত ধর্ম ও দর্শনচর্চার আকর্ষণে, এমনকি অক্সফোর্ড পর্যন্ত; কিন্তু এই কয়েকটি পঙক্তি ছাড়া আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৩১০ সপ্তম হেনরি ইতালিতে পদার্পণ করবেন এই মর্মে সারা ইতালিতে ঘোষণা করা হয়। এই খবরে দান্তে খুব আশান্বিত হন; সম্রাটের অধীর প্রতিক্ষায় থাকেন। তিনি এই সম্রাটের উপর আস্থা রাখতেন. পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বোঝাপড়া হবে, ইতালিতে, বিশেষ করে ফ্লরেন্‌সে শান্তি ফিরে আসবে এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তার ওপর যখন পোপ স্বয়ং হেনরিকে সমর্থন করেন তখন সম্রাট নিশ্চয়ই বিনা বাধায় ফ্লরেন্‌সে প্রতিষ্ঠিত হবেন এই আশা তাঁর মনে আরও দৃঢ় হল। বাস্তবিক পক্ষে হেনরির এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাতে এই আশাকরা দান্তের অন্যায় হয়নি। এমন একজন সম্রাটের অপেক্ষায় তিনি কতদিন অপেক্ষা করেছেন! তিনি আর থাকতে পারলেন না, ইতালির রাজা, রাজকুমার, রাজন্যবর্গ, নাগরিকদের উদ্দেশ করে একখানি চিঠি লেখেন।

দুঃখিনী ইতালি তুই জয়ধ্বনি কর ... (পাঁচ নম্বর চিঠি)

ধীরে ধীরেই আমরা লক্ষ করছি কী করে দান্তে একটি বিশ্ব-রাজ্যের কল্পনা করেছেন—যার অধিপতি হবেন একজন ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট যিনি সময়োপযোগী ন্যায়শাসনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি আনবেন। বলা বাহুল্য হেনরি-র মধ্যে আদর্শ সম্রাটের প্রতিমা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই উপরোক্ত বিখ্যাত পত্রটি তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল। যে-মুহূর্তে হেনরি ইতালির চৌহদ্দির মধ্যে পৌঁছলেন, দান্তে কালবিলম্ব না করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন একটি চিঠিতে (সাত নম্বর চিঠি)। উপরোক্ত চিঠির মতো এই চিঠিতেও আমরা দেখতে পাই তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা শুধু অকপটে প্রকাশ করতেন তাই নয়, তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তা সমর্থন করতেন। সম্রাট হেনরিকে তিনি একজন আদর্শ ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট যিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী শাসন করবেন, এই ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই হেনরিকে মনে করেছিলেন ঈশ্বর-প্রেরিত—তাঁর 'পদস্পর্শে ও ওষ্ঠদ্বয়ের প্রার্থনায় নিজের ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন' (এপিস্‌তোলা ৭,৪৩ পঙ্‌ক্তি)।

এদিকে ফ্লরেন্‌সের নাগরিকরা বিদেশি সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতে চাইল না। সদ্য ফিউডাল সমাজ ভেঙে গিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বাদ তারা পেয়েছে—নগরে দলাদলি থাকলেও, শান্তির অভাব ঘটলেও, ইতিহাসের অমোঘ বিধান অনুযায়ী স্বার্থান্বেষী শক্তিশালী নতুন ব্যবসায়ীরা (লা জেনতে নুওভা) টাকা ছড়িয়ে নাগরিকদের হাত করলে, সম্রাট হেনরির বিরুদ্ধে দাঁড়াল। ফ্লরেন্সের সঙ্গে দান্তের আবার এক নতুন সংঘাত উপস্থিত হল। উত্তর ইতালিতে হেনরি বিলম্ব করছিলেন — সেখানেও অনেক বাধা, বাধা দূর করতে হবে। দান্তের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল —তিনি হেনরিকে জানালেন, আসল বিপদ উত্তর ইতালিতে নয়, আরনো নদীর ধারে, অর্থাৎ ফ্লরেন্‌সে। ফ্লরেন্‌সে দান্তের এই ব্যবহারের প্রতিশোধ নিলে : ১৩১১-তে যে-সব নির্বাসিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করা হয়েছিল সেই তালিকার মধ্যে দান্তের নাম বাদ দেওয়া হল। এ কাজটির জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল 'ধূর্ত উকিল' বাল্‌দো দ্যগুল্লিওনে, সে-সময়ে সেই ছিল প্রিওর। একাধিক বার এই লোকটির উল্লেখ করেছেন দান্তে তাঁর *কোম্‌মেদিআ*-তে —বলা বাহুল্য তার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করেই।

কিন্তু হেনরি যখন দান্তের উপদেশ অনুযায়ী ফ্লরেন্‌স আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, তখন এই আক্রমণের ফলে ফ্লরেন্‌সের কী দুরবস্থা হবে, কত ক্ষয় ক্ষতি , কত প্রাণহানি হবে, সেসব ভেবে তিনি ভেঙে পড়লেন। যতই বিরোধ থাক তিনি ফ্লরেন্‌সকে ভালোবাসতেন—তিনি শেষ পর্যন্ত হেনরির সঙ্গে যোগ দিতে পারলেন না। কোনও নথিপত্র পাওয়া যা না যে, তিনি চিঠিপত্র মারফত উৎসাহ দেওয়া ছাড়া হেনরিকে আর কোনও ভাবে সাহায্য করেছেন কি না। তাঁর চিঠিতে যে ঠিকানা উল্লেখ ছিল তাতে মনে হয় সে-সময় তিনি বাত্তিফোল্লে পরিবারের আতিথেয়তা গ্রহণ করে কাজেনতিনো-তে বাস করছিলেন।সম্ভবত হেনরির আগমন কালেই, নিজেকে সক্রিয়ভাবে ফ্লরেন্‌সের বিরুদ্ধে যোগ দিতে ব্যর্থ হওয়াতে তিনি বিশ্বসাম্রাজ্য তথা খ্রিস্টিয় সাম্যবাদী বিশ্বরাজ্যের স্বপক্ষে দে মনারকিআ নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৩১২ শরৎকালে হেনরি ফ্লরেন্‌স আক্রমণ করেন, কিন্তু নগর অধিকার করতে ব্যর্থ হন। তিনি পিজায় ফিরে যান এবং প্রায় ছ'মাস দোমনা হয়ে সেখানে কাটান। পরে তিনি দক্ষিণ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন এবং ২৪ অগস্ট ১৩১৩ হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হয়ে সিএনার নিকট বুওনকনভেনতো নামক জায়গায় মারা যান।

যদিও শেষের দিকে দান্তের মনে হয়েছিল হেনরি ইতালির ঐক্য আনতে পারবেন কিনা, তবু তিনি তাঁর উপরেই অনেকখানি আশা করেছিলেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি পুনরায় খুব বিচলিত হলেন। কিন্তু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়নি এমন দুঃসময়েও; তিনি আরও দৃঢ়ভাবে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচান করতে লাগলেন। ১৩১৪ খ্রি পঞ্চম ক্লেমেন্টের মৃত্যুর পর আভিঞঁ-র নিকটে কারপাঁত্রাস্‌ নামক জায়গায় কার্ডিনালরা জড় হলে দান্তে তাঁদের উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখেন (এপিস্‌তোলা ৮)। রোম থেকে ধর্মপীঠ ইতিমধ্যেই আভিঞঁ-তে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে (১৩০৯ খ্রি) প্রধানত ফরাসি রাজাদের সহযোগিতায় ইতালির পোপ-বিরোধী দলগুলিকে জব্দ করবার জন্য। ধর্মপীঠ সরিয়ে নেওয়ার জন্য দান্তের বেদনা এই

চিঠিখানিতে সিক্ত; কারণ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জগতের কল্যাণের জন্য রোমেই হবে বিশ্ব-রাজ্যের রাজধানী তথা পীঠস্থান, যেমন খ্রিস্টীয় ধর্মেরও। বাইবেলের বিভিন্ন উক্তি তিনি স্মরণ করান আর বলেন ---ধর্মবিরোধিতা দেখতে যেমন কষ্ট হয় তেমনি কষ্ট হয় আজ রোমের দিকে তাকাতে : তার দুটি সূর্য ---সম্রাট ও পোপ, দু'টিই অস্তমিত।

সম্রাট ও পোপ নিয়ে দান্তে যে-বিশ্বরাজ্যের কল্পনা করেছেন খ্রিস্টের বাণী স্মরণ করতে করতে, তাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচকেরা অবাস্তব কাল্পনিক বলে আখ্যা দিয়েছেন; অনেকেই বলেছেন দান্তের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না, ফ্লরেন্সের ক্রমবর্ধমান অব্যর্থ ঐতিহাসিক গতি বুঝতে পারেননি। কিন্তু একজন প্রকৃত খ্রিস্টান এবং কবি হয়ে তিনি যে-দৃষ্টি লাভ করেছিলেন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে বাস্তব জীবনবোধ থেকে আরম্ভ করে *পারাদিজো*-র শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তির অন্তে সেই মহান প্রেমের মধ্যে নিজের আসন লাভ করা পর্যন্ত তাঁর এক অসামান্য পরিণতি ও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

দান্তের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের এক এক সময় মনে হয়েছে দান্তে হয়তো ফ্লরেন্সের বিধান অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করে দেশে ফিরে আসতে পারবেন। ১৩১৫-তে ফ্লরেন্স সিসিলির রাজা রবার্টের নেতৃত্বে পুনরায় নির্বাসিত ব্যক্তিদের ফিরে আসবার সুযোগ দিলে যদি তারা জরিমানা দেয় এবং দীক্ষাপীঠে (baptistry) একটি অনুশোচনা পর্ব পালন করে। দান্তের বেলায় শর্ত কিছুটা লাঘব করা হয়েছিল এবং সেইজন্যই তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা আর একবার আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিরপরাধ গর্বিত দান্তে কোনও শর্তে ফিরে যাবেন না—তিনি যদি যোগ্য পদমর্যাদা ও সম্মান পান তবেই ফিরে যেতে পারবেন, তা না হলে না। এক পাদ্রিস্থানীয় ফ্লরেন্টীয় বন্ধু তাঁকে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন, বোধহয় নতুন 'ক্ষমা-ভিক্ষা'র অনুশাসনটি দান্তে লিখে জানান। এই চিঠির উত্তরে দান্তে ফ্লরেন্সের 'পুরস্কার'টি গ্রহণ করতে অসামর্থ্য জানান (চিঠি, ৯)। ইতিমধ্যে ১৩১৪-তে ফ্লরেন্সের 'ডিক্রি' অনুযায়ী দান্তের পুত্রদ্বয়---পিএত্রো ও যাকোপো এরা দুজনেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, কারণ তাদের চোদ্দো বছর পার হয়েছে। ঘোষণা করা হল তাদের ধরে সর্বসমক্ষে মুণ্ডচ্ছেদ করতে। ছেলে দু'টি অবশ্য ধরা পড়বার আগেই কোনও রকমে পালিয়ে পিতার কাছে যেতে সমর্থ হয়।

সেই বছরেই অগস্ট মাসে বহিঃশত্রুর চাপে খানিকটা অসহায় বোধ করে আরও একবার ফ্লরেন্টীয় কৌম কম বিপদজনক এমন সব নির্বাসিত ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল---মৃত্যুদণ্ড মকুব করা হল, শুধু নগর সঙ্ঘ তাদের যে-সব এলাকায় থাকতে বলবে সেখানে থাকতে হবে। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এই শমনের জবাব দিতে হবে। দান্তের ওপরও এই শমন জারি করা হল, কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। ৬ নভেম্বর দান্তেকে মৃত্যুদণ্ডে ফের দণ্ডিত করা হল। এবারে শুধু একা দান্তে নয় তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রদ্বয়ও, কারণ তারা বিদ্রোহীর সন্তান, এখানে বালক বলে কোনও ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না---তাছাড়া, তাদের চোদ্দ বছর তো আগেই পার হয়েছে।

বাকি আট বছর দান্তে কী ভাবে কাটিয়েছেন ঠিক জানা যায় না। তিনি বাত্তিফোল্লে পরিবারের মধ্যে কাজেনতিনোতে ছিলেন, না কি উগুচ্চোনের মোনতেকাতিনি-র যুদ্ধে সাফল্যের জন্য তাঁরই দিকে ঝুঁকেছিলেন? হেনরি-র ব্যর্থতার পর তিন কি মনে করেছিলেন হয়তো তিনিই ফ্লরেন্সের দুর্দশা লাঘব করতে পারবেন? অথবা কোনও ব্যক্তিগত কারণবশত তাঁকে কান্‌গ্রান্দের আশ্রয় ছেড়ে উগুচ্চোনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল? এই সব প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন, জবাব কিছু বিশেষ মেলেনি। তবে এটা অনেকটা নিশ্চিত যে জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তিনি অপেক্ষাকৃত স্বস্তির মধ্যে ছিলেন রাভেন্না শহরে তংার গুনগ্রাহী গুইদো দা পোলেনতা-র অনুগ্রহে। গুইদো তাঁকে একটি বাড়ি দিয়েছিলেন থাকবার জন্য। নির্বাসনে থাকাকালীন এই সর্বপ্রথম তিনি তাঁরই নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বাড়ি পেলেন—এতদিন থাকবার জন্য শুধু ঘর পেয়েছেন, এমনকি কান্‌গ্রান্দে যাঁকে দান্তে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন, পারাদিজো উৎসর্গ করেন, তিনিও তাঁর থাকবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন মল্লবীর ভাঁড় আর পাঁচজনের জন্য যেমন -

—একটি ঘর। যাই হোক গুইদো দা পোলেন্‌তার দেওয়া বাড়িতে দান্তের.ছেলেরা, মেয়ে বেআত্রিচে, এমনকি মিকেলে বারবি-র মতে স্ত্রীও এসে সেখানে থাকতে পেরেছেন।

গুইদোর বাড়িতে থাকলেও দান্তের আর্থিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। তিনি যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই ছিলেন। *পারাদিজো* উৎসর্গকালে কান্‌গ্রান্দেকে দান্তে যে বিখ্যাত পত্রখানি লেখেন কোম্‌মেদিআ-র ব্যাখ্যা করে, তার মধ্যে একটি জায়গায় তিনি তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য আশা করেন তার উল্লেখ আছে! বোকাচ্চও দান্তের শেষ বয়সের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন নানারকমের কাজ তাঁকে এ সময়ে নিতে হয়েছে, যেমন ছেলে পড়ানো, অলংকার শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতই ছিল যে, কোনও 'ডিগ্রি' না থাকা সত্ত্বেও ১৩২০ খ্রি. ভেরোনা শহরে ধর্মযাজকদের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। 'জল ও পৃথিবী' বিষয়ে একটি গভীর মতভেদ হয় পুরোহিতবর্গ পণ্ডিতদের মধ্যে, তাই সালিশি মানা হয় দান্তেকে। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, বিষয়টি বৈজ্ঞানিক এবং লাতিন ভাষায় এই বক্তৃতাটির অনুলিখন রক্ষিত আছে। এই ভেরোনা ও রাভেন্না শহরেই তিনি কোম্‌মেদিআ-র শেষ অংশটুকু লিখতে শুরু করেন এ পর্যন্ত জানা যায়। এর আগে কোথায় কবে এই বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন, কবে ইন্‌ফেরনো, পুরগাতোরিও শেষ হয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয় —এ সব নিয়ে এত মতভেদ আছে যে, কোস্‌মো তার এক সঙ্গত যুক্তি দিয়ে একটি অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থতালিকা পর্যন্ত দিয়েছেন—শুধু এ বিষয়ে, অর্থাৎ কোম্‌মেদিঅ লেখার সন তারিখ বিষয়ে যে-সব লেখা ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত লেখা হয়েছে।

সবে *পারাদিজো* শেষ করেছেন এমন সময় গুইদো দা লোপেনতা-র অনুরোধে তাঁকে ভেনিসে যেতে হয় দৌত্যকার্যে—রাভেন্না ও ভেনিসের মধ্যে একটি ঝগড়া মেটাবার জন্য। কথিত আছে ভেনিস দান্তের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেনি, এমনকি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জলপথে ফিরে আসবার অনুমতি পর্যন্ত দেয় নি। কাজেই বাধ্য হয়ে দান্তে স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমির ভিতর দিয়ে ফিরে আসেন। ফেরবার পথে জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ১৩ কি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৩২১ রাভেন্নায় তিনি মারা যান।

গুইদোর আয়োজনে সান ফ্রানচেসকো গির্জায় তাঁকে রাজকীয় সম্মানে সমাধিস্থ করা হয়। জীবিতকালে যারা বার বার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, দান্তে মারা যাবার পর সেই ফ্লরেন্টীয়রা বহু শতাব্দী ধরে তাঁর পূতাস্থি ফিরে পাবার জন্য রাভেন্নার কাছে আবেদন জানায়, কিন্তু প্রত্যেক বারই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। একদা যাঁর সেই লিখন—'দুঃখ আমার হৃদয়ে সাহস আনে', তাঁর সেই অপরাজেয় পৌরুষ আজও রাভেন্নার সমাধিস্থলে অক্ষুণ্ন আছে।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
(দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩)

সুনীলচন্দ্র সরকার

দিব্যনাট্যের কবি দান্তে

বিশ্বকবির আধুনিকতা।

যাঁরা বড় কবি তাঁরা সকল যুগেই আধুনিক — এমন একটা কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীর সংস্কৃতি-চিত্ত মহান কবিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যে তাতে সংশয় জন্মাতেই পারে বুঝি তা নিল না কবিকে, দিল না উপযুক্ত স্থান। কিন্তু কবি যদি সত্যিই কিছু দিয়ে থাকেন, দেখা যায় তাকে ঠেলে রাখা, ভুলে যাওয়ার উপায় নেই। প্রাথমিক হয়তো কয়েক শতকের অবহেলা আবার শেষ হয় বৃহত্তর আবাহনে, নিন্দা-প্রশংসার-উত্থান পতন ক্রমে স্থায়ী হয় একটা জনস্বীকৃতির অধিত্যকায়। জীবন থেকে আলাদা করে পূজামন্দিরে তুলে রাখা কাব্য আবার এসে অবতীর্ণ হয় জীবনের, সাহিত্যসৃষ্টির রঙ্গভূমিতে। তাই যখন রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমদেশে জনপ্রিয়তা হ্রাস নিয়ে দুর্ভাবনার কথা শুনি, তখন এ বিষয়ে আমাদের যে একটা কর্তব্য আছে তা স্বীকার করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তেমন উদ্বেগ বোধ করতে পারি না।

এই যে তাঁর জন্মদিনের সাতশো বছর পরে আমরা দান্তেকে স্মরণ করছি একি শুধু স্মৃতিতর্পণ, সাহিত্যজগতের একটি পারলৌকিক ক্রিয়া? না, তাঁর কাব্য-আত্মার পুনর্বোধন চাইছি আমরা। তিনি 'কমেডি' লেখবার সময় পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তাঁর জন্মের তেরশ বছর আগেকার কবি ভার্জিলকে। তাঁকে গুরুবরণ করে সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন ডিভাইন কমেডিতে। আবার এই দান্তের প্রভাব পরে গ্রহণ করলেন স্পেন্সর তাঁর *Faery Queene*-এ, মিলটন তাঁর *Paradise Lost*-এ। শেলির মধ্যে দান্তে-প্রভাব স্পষ্ট। এবং একেবারে আধুনিক যুগে এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়ট প্রভৃতি কবির কাব্যসাধনায়।

বাংলার আধুনিক সাহিত্যের প্রথম থেকেই দেখি 'ডিভাইন কমেডি'র ছায়াপাত। মাইকেলের 'মেঘনাদবধকাব্য'-র অষ্টম সর্গে রামের পিতৃলোকযাত্রাপথে নরকদর্শনের মূল ছাঁচ আছে ভার্জিলের ঈনিডের ষষ্ঠ খণ্ডে। সেখানে ঈনিস পিতৃ-আত্মার সঙ্গে মিলনের পথে অতিক্রম করলেন নরক। দান্তেও নরক ভ্রমণ করলেন বিয়াত্রিচে-মিলনের পথ হিসাবে। তাঁর ভাবৈশ্বর্যের কাছে মেঘনাদবধ-এর ওই সর্গ অনেক ঋণী। এমনকি নরকের গেটে যে হৃদ্‌কম্পজনক নিষেধবাণী রয়েছে দান্তের কাব্যে 'এখানে ঢুকছ যারা বাইরে ফেলে এসো সব আশা' ইত্যাদি, তার আক্ষরিক অনুবাদ করে দিয়েছেন মধুসূদন। এই সর্গ সম্পূর্ণ বাদ দিলে মেঘনাদবধকাব্য-র কি ক্ষতি হত জানি না। আর বঙ্কিমচন্দ্রও চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীকে যে নরক দেখিয়েছেন তার মধ্যেও ইনফারনোর নানা বিভীষিকা-চিত্রের অনুসরণ দেখি; অবশ্য আমাদের ভারতীয় নরকধারণার সঙ্গেও মিল রাখার চেষ্টা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনেই দান্তের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন। সে কিন্তু ইনফারনোর উগ্র উত্তেজনা, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও নাটকীয়তার জন্য নয়, দান্তের বিয়াত্রিচে-প্রেমের স্বরূপ বোঝবার জন্য। কিন্তু দান্তে যেমন ভার্জিলের আদর্শ মেনেও ডিভাইন কমেডিতে করলেন নতুন যুগের উপযোগী নতুন সৃষ্টি কতকটা সেই ধরনের কাজ আমাদের সাহিত্যে করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণে। তাই দান্তে আমাদের অপরিচিত নন, শ্রদ্ধার্হ সুহৃদের মতোই তাঁকে আজ আমরা আবাহন করছি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে।

ভার্জিল কেন?

সংসারে পথভ্রষ্ট দান্তেকে ভার্জিলই ত্রিলোক—নরক, তপোলোক বা শুদ্ধিলোক (purgatory) ও স্বর্গলোক ভ্রমণ করালেন, প্রথম দুটিতে স্বয়ং নেতা হয়ে এবং তৃতীয় রাজ্যের নেতৃত্বভার বিয়াত্রিচেকে সমর্পণ করে। একি শুধু একটি কাহিনিবিন্যাসের ব্যাপার, না এর কোনো গূঢ় তাৎপর্য আছে?

যাঁদের দৃষ্টির পরিসীমায় সমসাময়িক জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা কুলিয়েছিল, অন্তত সেই ধরনের নিখিলজীবনচেতনার সাধনা যাঁরা করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশে তাঁদের সংখ্যা দুই : হোমার ও ভার্জিল। হোমারের কাব্যজগৎ পেগ্যান — লৌকিক বাসনা-কামনার অসংকোচ স্ফূরণের সেই দেশ। তাঁর স্বর্গ মর্ত্য নরকের মধ্যে সুখ ঐশ্বর্য সম্ভাবনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বদর্পের একটা ভেদ আছে। কিন্তু কোনো নৈতিক আধ্যাত্মিক সোপান কল্পনা নেই। ভার্জিলের প্লট নেওয়া হোমরের ইলিয়ড থেকে, কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের নায়ক একিলিস এগামেমননের মতো অলজ্জ মানবতার মুখপাত্র নয়, এক আদর্শ ব্যক্তি। উচ্চ এক দৈবনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে তাঁর জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। তারই ফলে ভার্জিলের মহাকাব্যের গতি ও মেজাজ, তার ভাবানুভূতি ও রসসাধনা হেলেছে পশ্চিমি ঐতিহ্য থেকে পুবের দিকে; ভারতীয় মহাকাব্যের দিকে। ভার্জিলও কিন্তু পেগ্যান, কারণ তাঁর জন্ম যিশু খ্রিস্টের জন্মের কিছু আগে, এবং ব্যাপ্‌টিজ্‌ম-এর সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। দান্তের কাব্যপ্রেরণা অনেকটা তাঁর খ্রিস্টধর্ম সাধনার থেকে। ল্যাতিন কবিরা লিখেছিলেন প্রার্থনার সংগীত, খ্রিস্টজীবনের গাথা, মিষ্টিক কবিতা। বৃহৎ জীবনের থেকে সে যেন আলাদা ভূমিতে প্রবাহমান ধারা। দান্তেই প্রথম বড় কবি যিনি মেলাতে চাইলেন জীবন অনুভূতির সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার রস, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়। ইয়োরোপীয় কবিরা এখন পর্যন্ত অমিশ্র শুভচেতনার কাব্য বা নাট্য সম্ভাবনায় অবিশ্বাসী, তাদের চাই 'সু' ও 'কু'র মিশ্রণ, তাই এখনও প্রধান ধারা হোমরের পেগ্যান আদর্শের হিউম্যানিজ্‌ম-এর অনুবর্তন। কিন্তু দান্তের প্রধান কাব্যকীর্তি এই যে উচ্চতম আদর্শ সাধনেরও যে একটা কাব্যরূপ সম্ভব তা তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর কাব্যে। এখনও ইয়োরোপের সমালোচকরা কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ স্বীকার না করে দেখাতে চান দান্তের সার্থকতা তাঁর অধ্যাত্মসিদ্ধিতে ততটা নয়, যতটা তাঁর সংসার অভিজ্ঞতার তীব্রতায় ও যাথার্থ্যে ও তার নিপুণ চিত্রণে — অর্থাৎ প্রধানত ইনফারনো রচনায়। তার তুলনায় পারগেটোরিও ও প্যারাডাইসোর কাব্যমূল্য অনেক কম। কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য অন্য রকম। কমেডির গুণাগুণ পরীক্ষা করে আমরা দেখাব সেটা কী।

কমেডির গঠন প্যাটার্ন।

কমেডির structure বা গঠন প্যাটার্নটি লক্ষ করলে দান্তের পরিকল্পনার কতকগুলি বিশেষত্ব আবিষ্কার করা যায়। তাঁর আসল দ্রষ্টব্য বা ধ্যেয় বস্তু কি? মানুষের জগৎ ও জীবন ও তার ভিত্তিতে এক নবমানবিকতা (neo-humanism)? মানুষের অপূর্ণতা, অশুদ্ধি ও পাপদুষ্ট জীবন ও স্বভাবের পরিশোধন ও সম্ভব হলে উর্ধ্বায়ন — অন্তত একটি বদ্ধতার প্রাচীর অতিক্রমণের ঈঙ্গিত? যাকে অ্যারিস্টটল নাম দিয়েছেন (catharsis বা purgation) এবং যা গ্রিক ট্র্যাজেডিকারদের ছিল কাব্যিক লক্ষ্য? কিংবা খ্রিশ্চান করুণাতত্ত্বের (grace) আওতায় মানুষ-আত্মার বন্ধনমুক্তি (salvation)-এর আনন্দঘোষণা? — যে কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিলটন লেখেন *প্যারাডাইস রিগেন্‌ড*, শেলি *প্রমিথিউস আনবাউন্ড*, কীট্‌স আরম্ভ করেন *হাইপিরেরিয়ন*, রবীন্দ্রনাথ লেখেন *অরূপরতন* আর শ্রীঅরবিন্দ *সাবিত্রী*?

কোনও মতাসক্তির (dogmatism) দ্বারা চালিত না হলে সকলেই স্বীকার করবেন যে তত্ত্বান্বেষী খ্রিশ্চান সাধক দান্তের নক্ষ্য ছিল মানুষের জগতের হাবভাব ব্যাপারবৈচিত্র্য ঘটনাধারাকে ঘৃণা বিদ্রুপ ও বিভীষিকাচিহ্নিত করে তার পরিবর্জনের পথ দেখানো, কারণ খ্রিশ্চান ধারণায় মূল পাপ (original sin) সর্বজনীন ও তা সমূলে বিসর্জন না দিলে আর এগোবার উপায় নেই। কাজেই সেই জগৎকে

যথাসম্ভব বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল করে তুলে ধরতে পারলেই মানুষের চৈতন্যোদয় হবে। ইনফারনোর উদ্দেশ্য সেই 'সংসার'কেই গ্রাহকচক্ষে প্রকটিত করা, অবাস্তর কোনো নরককল্পনা নয়। যারা ওই ইনফারনোয় কষ্ট পাচ্ছে তাদের দেখে গ্রাহকচিত্ত যাতে মুক্তধারার সেই পাগলা-বটুর মত মনে মনে বলে উঠতে পারে : 'ও পথে যেও না বাবা, ও পথে আছে তৃষ্ণা, তৃষ্ণারাক্ষসী।' হোমারের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে দেখলে এ তো হিউম্যানিজ্‌ম বা নিও-হিউম্যানিজ্‌ম নয় — ante-humanism। সাহিত্যে এর স্থান বরং স্যাটায়ার জাতীয় রচনায়। কিন্তু ইনফারনোকে কি আমরা সেই শ্রেণীতে ফেলতে পারি? না।

তবে একে কি গ্রিক ট্র্যাজেডির সমপংক্তিতে রাখব? মিল অনেকটা আছে — বিশেষত ইনফারনোর, কিন্তু সমস্ত কাব্যের নয়। কৌতূহলের বিষয় এই যে ইনফারনোয় কোনও নায়ক বা নায়কোপম চরিত্রের শোধন বিবর্তন চলছে না, বরং বলা যায় নায়কই হলেন কবি-বক্তা, দান্তে নিজে। তিনি নিজেই যেন নায়ক, নিজেই গ্রিক কোরাসের মতো টিকাকার, রসের ধূয়াধারক। পার্গেটোরিওতে চলল সত্যকার শোধন — কিন্তু তার রস ঘুমে-জাগরণে আনন্দ-বেদনায় মেশা। আর প্যারাডাইসোর মুক্তিলোকে আনন্দধামে মহা আনন্দ ব্যক্তিক-চেতনা বিবর্তনের প্রয়াসযন্ত্রণায় গভীর। এই সব মিলিয়ে দান্তে এবে কমেডি আখ্যাই দিয়েছেন। এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

ট্র্যাজিক উপাদান জড় করলেই ট্র্যাজেডি হয় না। ট্র্যাজেডিত্ব নির্ভর করে ওই উপাদান ব্যবহারের উপর, বিশেষরকমের অঙ্গীভাব (total impression) রূপায়ণ চেষ্টার উপর। একই থীম গ্রিক ট্র্যাজেডিতে একভাবে ব্যবহৃত, অনেক পরে ইতালিতে সেনেকার নাটকে তাই নিয়েই উত্তেজনাবিলাসের (sensationalism) আয়োজন, আবার কয়েক শতাব্দী পরে ফরাসি নাট্যকার রাসিনে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ভাবাবেগ ওঠানামার গ্রাফ অঙ্কন। দান্তে সামাজিক নক্সাই শুধু আঁকতে চাননি, শুধু উত্তেজনা বা মানসবৈচিত্র্যের অনুসরণও তাঁর কাম্য নয়। তাঁর কাম্য দুঃখ অভিজ্ঞতার বেদনাময় কিন্তু শিল্পরস অনুধাবনের মধ্য দিয়ে, তপস্যার পথ পেরিয়ে মিলনে পৌঁছানো। ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে এমন কমেডিতে যাওয়া যা সমস্ত দুঃখসুখের সমবায়েই উঠেছে সমস্ত দুঃখসুখের উপরে।

এই মহৎ সাহিত্যিক উদ্দেশ্যসাধনায় দান্তের সহায় হয়েছে চার রকমের রসের সাধনা : ১. ভ্রমণ রস ২. প্রকৃতি ও জীবন সম্ভোগরস ৩. মানবিক সহবেদন রস ৪. প্রেম ও অধ্যাত্মরস।

ভ্রমণ রস।

ভ্রমণ রস কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রেনেসাঁসের সময়ে তো বটেই, তারও আগে কাব্যে ভ্রমণকাহিনি কথনের যে একটা স্বতন্ত্র আবেদন ফুটেছে এবং অসংখ্য গ্রাহকচিত্তকে আকৃষ্ট করেছে তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে যে উদ্দেশ্যে ভ্রমণই হোক তার নিপুন কথন যে ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠা বিস্ময় আবিষ্কারের আনন্দ ইত্যাদি জাগাতে পারে তাকেই একত্রে নাম দিচ্ছি ভ্রমণ রস। হোমরের ওডিসিউসের প্রধান সামর্থ্য এই রসের প্রাচুর্যের জন্য। আর দান্তে ইউলিসসকে নরকে স্থান দিয়েও যে কতটা তার গুণমুগ্ধ ছিলেন তা ইনফার্নোর ছাব্বিশ সর্গেই দেখা যায়। ভার্জিল-এর 'ঈনিড'ও ভ্রমণবৃত্তান্তের উপর গড়া কাব্য। 'ফাউস্ট' ও তাই। 'প্যারাডাইস লস্ট'ও অনেকটা তাই। আর শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'ও তাই। দান্তে খ্রিস্টধর্মের গোঁড়া প্রচারক হিসাবে তাঁর নরকস্বর্গ ভ্রমণ বর্ণনা করেননি, নিপুণ রসিক ভ্রাম্যমাণ হিসাবেই তা করেছেন। আজকালকার travelogue বা ভ্রমণ সাহিত্যের মাপকাঠিতে দান্তেকে এ ক্ষেত্রে একজন উচ্চতম শিল্পী বলা যায়। তাঁর ক্যান্টোর পর ক্যান্টো বর্ণনা কোথাও একঘেয়ে বা বিরস হয়নি তা শুধু তাঁর সদাজাগ্রত সদা-উৎসুক সদ্যস্পর্শী মনের ছোঁয়ায়। আমরাও এই মহাপথিকের সঙ্গেই যেন জুটে যাই ও একাত্ম হয়ে যাই তাঁর সমস্ত মানস প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে। তাঁর ঋজু পাহাড়ের সামনে এসে অক্ষমতাবোধ ও হতাশা, কিম্ভূতকিমাকার বা ভীষণ জন্তু জানোয়ার দানব ইত্যাদি দেখে ভয় বিস্ময়, আলো আঁধারের মধ্যে 'ঠাওর' করতে করতে বোঝা দৃশ্যটা কী, সঙ্গী ও নেতা ভার্জিলকে বারবার

উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করে জানা : এটা কী, ওটা কী, এ রকম কেমন করে হল; আর এইসব কৌতূহল মেটাবার কাজে তাঁর সময়ের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা। দান্তে শিক্ষায়, সংস্কৃতি-সাধনায় গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। ধর্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ, চিত্রসঙ্গীত-ভাস্কর্যতত্ত্ব সবেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল প্রচুর। তাঁর ভূগোল ও জ্যোতিষ, তাঁর অ্যারিস্টটল প্ররোচিত জগৎ ও নরকবিভাগ ইত্যাদি দেখে আজ হাসি পেলেও তার পেছনে যে দীপ্তিমান বুদ্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাকে চিরকালের শ্রেষ্ঠ সম্মান একটা দিতেই হয়। এবং এই মন তার বিশ্বপরিক্রমায় এমন সরস অভিজ্ঞতা অর্জন ও বিতরণ করেছে যে তাই তুলেছে কমেডিকে উচ্চতর সাহিত্যভূমিতে। ভ্রমণ ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সমুচিত রসগ্রাহী হচ্ছে ইতালীয়রা। এক ইতালিয় কন্যা ডেসডেমোনা ভ্রমণের গল্প শুনে প্রেমে পড়েছিলেন। আর এই ইতালিয় কবির ভ্রমণ রসে মুগ্ধ হয়ে কেউ তাঁর প্রেমে পড়লে আশ্চর্য বোধ করব না।

বাইরের দৃশ্যান্তর ঘটনার সঙ্গে কত তীব্র মানসিক আবেগের যোগ ঘটতে পারে এবং তার ফলে পথযাত্রা হয়ে ওঠে চিরস্মরণীয় তার নিদর্শন দিচ্ছি। Styx নদীর বেখেয়ার মাঝি সেই বুড়ো ক্যারন (Charon) — যার ঝুলে পড়া গাল, যার দুচোখ ঘিরে ঘুরছে আগুনের চাকা, যার নৌকো থেকে লোক নামছে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে শীতঝড়ের ঝরাপাতা—সে যখন নৌকোয় তুলল দান্তেকে তখন কেমন করে যে ওই নদী পার হলেন তা তিনি জানলেন না। কারণ :

অশ্রুভেজা মাটি পাঠালো ঝড়দমক,
চোখ সমুখে জ্বালালো যেন আগুন লাল,
অসাড় ঢাকায় ঢাকল সব বোধচমক—
পড়ে গেলুম ... যেন একটা ঘুম মাতাল...

ইনফারনো, ২য় কান্টো

জেগে দেখেন একেবারে নদীর ওপার। কোলরিজের Ancient Mariner-এর বর্ণনাকৌশল অপূর্ব, কিন্তু তা দান্তের শিল্পকলা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার হতাশার অবসাদের পর নতুন উৎসাহে যাত্রারম্ভের প্রসঙ্গে :

ফুলরা রাতের শৈত্যে বুজিয়ে বুক
আবার ফোটায় নোয়ানো পাপড়ি বোঁটা
পেতে সকালের প্রথম আলোর সুখ
তেমনি আমারো নব উদ্যমে ওঠা।

প্রকৃতি ও জীবন সম্ভোগ।

কমেডির দ্বিতীয় গুণ এর মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি চমৎকার চিত্রশালা : জীবনের প্রকৃতির নানা মূর্তি পরিস্থিতি ও পশ্চাৎপটে সম্পূর্ণ এক এক জগৎ-চিত্র। এগুলি তাদের নিজস্ব শিল্পমূল্যেই মূল্যবান। বিভিন্ন চক্রে প্রেতাত্মাদের নিয়মতান্ত্রিক বিলিব্যবস্থা যত অনম্য কাঠিন্যেই উপস্থিত থাকুক এই কাব্যে, তবু দেখি দান্তের দৃশ্যসম্ভোগ ও বর্ণনা মানবিক আবেদনপূর্ণ, তাঁর শিল্পদৃষ্টি মুক্ত।

এক একটি চক্র বা লোকপরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে তিনি বেছে নেন এক এক ধরনের জীবনপ্রবেগ বা বাসনাতাড়ন যেমন প্রেমের আতিশয্য, লোভ, অসংযম, কৃপণতা, অপব্যয়িতা, ক্রোধহিংসাদ্বেষ, নাস্তিকতা, ভণ্ডামি, দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি। স্বর্গেও প্রধান খ্রিশ্চান গুণগুলি যথা বিশ্বাস (Faith), আশা (Hope), ও ভালোবাসা (Love)-র লোকবিভাগ রয়েছে। তারপর নির্দিষ্ট জীবনরীতির সঙ্গে মিলিয়ে একটি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ — যার উপাদান আমাদের চেনা পৃথিবীর জলবায়ু থেকেই নেওয়া - গড়ে তোলা এবং তা একেবারে প্রত্যক্ষ্যগম্য করে তোলা। সমস্ত ইন্দ্রিয় শরীর মন

অনুভূতি দিয়ে কেমন করে জগৎকে নিতে হয় তা দান্তে জানতেন এবং তারই পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর কাব্যে। আধুনিক কাব্যের ইমেজিজ্‌ম, নানা রকমের ইমেজ বা প্রতিচিত্রের প্রতি অনুরাগের আদি প্রেরণা দান্তে। কিন্তু দান্তের ইমেজ শুধু চোখের (visual) নয়। চোখের, কানের, ঘ্রাণের, স্পর্শের, গতিবোধ-ইন্দ্রিয়ের (motor) বোধির — সব রকমের এলাকাভুক্ত ইমেজ।

যেমন ধরা যাক নরকের গেটের মাথায় লেখা সেই 'এখানে ঢুকছ যারা ফেলে এস সব আশা', আর তারপর আপোষহীন অন্ধকারের (truceless gloom) রাজ্য, আর তার মধ্যে উঠছে

অচেনা অসংখ্য ভাষা, তর্ক ভয়ানক
ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আর দুঃখ ইতিহাস
হাতে হাতে ঠোকা আর ভগ্ন তীক্ষ্ণ স্বর...

ঘূর্ণিঝড় বইছে ; ক্রমে অন্ধকার সয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল ছত্রভঙ্গ ছায়ামূর্তির দল। একদল এক নিশান তুলে চলছে শোভাযাত্রা করে কেমন যেন অস্থির হয়ে। একদল দৌড়চ্ছে নগ্নদেহে মৌমাছি ভীমরুলের হুল খেতে খেতে, তাদের রক্ত পড়ছে মাটিতে, কৃমিকীটরা পুষ্ট হচ্ছে সেই রক্তে ইত্যাদি ...। এইখানে থাকে সেই সংশয়াত্মারা যারা ভালো বা মন্দ কিছুই একটা বেছে নিতে পারেনি।

অতিকামনার দেশের অভিভাবক মিনস। সে তার ল্যাজের যত পাক দিয়ে ধরে কাউকে, বোঝা যায় তার স্থান নরকের তত নম্বর চক্রে। এখানে সব সময়ে বইছে ঝড়। শীতকালের ঝড়ে অসহায় পাখির মতো আত্মারা এখানে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে। 'বকের সারি যেমন আকাশে দাগ কাটে আর রব তোলে করুণ, তেমনি সেই ঝড়ের মত্ততায় আর্তনাদ করতে করতে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখলুম ছায়ামূর্তির দল।'

তৃতীয় চক্র অমিতাচারীদের ; এখানে অভিভাবক সেই বিখ্যাত নারকীয় ড্র্যাগন বা কুকুর সের্‌বেরাস (Cerverus) যার চিৎকারে কান ফাটে। ঠান্ডা বর্ষা ও করকাপাত ; আর নোংরা কাদা পাঁকের সমুদ্র। সেই পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রেতরা, এপাশ ওপাশ ফিরে বৃষ্টির চাবুক থেকে শরীরের একবার এ পাশ একবার ওপাশ বাঁচাচ্ছে। ভার্জিল কাদা ছুড়ে গিলিয়ে ওই রাক্ষুসে কুকুরের মুখ খানিকক্ষণের জন্য থামালেন। একটা প্রেতকে কাদার মধ্যে মাড়িয়ে ফেলে দান্তে দেখেন শুধুই শূন্যগর্ভ ছায়া, বস্তু কিছু নেই।

সপ্তম চক্র উগ্রপন্থীদের স্থান। জায়গাটা একটা বিস্তীর্ণ উদ্ভিদহীন বালুপ্রান্তর। এখানে উগ্র নাস্তিকরা পড়ে আছে চিৎ হয়ে, শিল্পের চোরা ব্যবসায়ীরা বসে আছে টাকার থলি আঁকড়ে, অস্বাভাবিক কামবিলাসীরা ঘুরছে পাগলের মতো, আর আগুনের হল্‌কা বৃষ্টি হচ্ছে আল্পসের চূড়ায় তুলোর মতো ফাঁপানো তুষারপাতের মতো।

পাপে সহযোগী দুই বন্ধুর মধ্যে একজন আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে অপরকে ও তার সন্তানদের কারাগারে অনাহারে মেরেছিল। দু'জনেই এখন বরফের দেশে এই বরফজমা গুহায় আটকে রয়েছে, পালাবার উপায় নেই। যে অন্যায়ভাবে মরেছিল সে বিশ্বাসঘাতকের মাথা কামড়ে খাবার চেষ্টা করছে। কারণ তার সে অধিকার আছে। তার মুখে তার গল্প শুনলে মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাত্যায়নের কথা — 'আমার সাত সাত ছেলেকে অনাহারে মরতে দেখেছি' ও মনে হয় ইনফারনোর তেত্রিশ ক্যান্টোয় ইউগোলিনের এই গল্প তিনি পড়েছিলেন।

শুধু ভয়ংকর চিত্রই নয়। সুন্দর চিত্রও আছে অনেক, তার একটি মাত্র দিচ্ছি। চাঁদের দেশের বাসিন্দাদের মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা আয়নার ভিতরকার ছায়া। এই বিশ্বজগতে ফুটে উঠছে সুন্দরী মেয়েদের অস্পষ্ট ঝিলিক। গৌরবর্ণা মেয়ের কপালে যেমন মুক্তোর টায়রা মিলিয়ে থাকে দেখা যায় না, শুধু তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতেই একটু চিকিয়ে ওঠে, তেমনি ফুটে উঠছে ওই সুন্দরীদের রূপ।

তত্ত্বের নিগড়ে বন্দী থেকেও দান্তে যেন 'সহস্রবন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'। তাঁর শিল্পকৃতিত্বের প্রভাব এজরা পাউন্ড, ইমেজিস্ট কবিরা, টি. এস. এলিয়ট ছাড়াও স্যুররিয়্যালিষ্ট কবিদের মধ্যেও দেখা যায়।

মানবিক সহবেদন

প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমবেদনা তো যে কোনো সার্থক কবির পক্ষেই অপরিহার্য, বিশেষভাবে সে কথা দান্তে প্রসঙ্গে তোলা কেন? তার মানে এই যে তাঁর ক্ষেত্রে এই 'সহবেদন' সমস্ত মতবাদবদ্ধতার বাধা অতিক্রম করে এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যার একটা বৈশিষ্ট্য, একটা বিশেষ রস আছে। এ শুধু মন বা কল্পনার সহনশীলতা বা ঔদার্য নয়। এ হৃদয়নিঃসৃত এক ধারা যা নৈসর্গিক ঝরণার মতো স্বতঃউৎসারিত। বুদ্ধিবিচারের ব্যাপার এ নয়, মূলত এ একটা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিও নয়। এ একটা মানবিক স্তরের হৃদয়সিদ্ধি — মানবিক নবজন্মের (humanistic renaissance) এক প্রধান প্রেরণা, এবং এর প্রধান উৎস দান্তে। সেই হিসাবে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রধান পুরুষ যদি দান্তেকে বলি, (যেমন ইংলন্ডের শেক্‌সপিয়র) তবে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করি।

ইনফারনোর প্রথম চক্র লিম্বোতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অশেষ গুণান্বিত পেগ্যানদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, তাদের একমাত্র দোষ জীবৎকালে তাদের খ্রিশ্চান হবার সৌভাগ্য হয়নি। কষ্ট যন্ত্রণা কিছু নেই, কিন্তু এদের ভবিষ্যৎ 'আশা' বলেও কিছু নেই। কারণ তা হচ্ছে খ্রিশ্চানদেরই একচেটে অধিকারের বস্তু। ভার্জিল হোমর ইত্যাদি সকলেই এখানে। যখন ভার্জিলের কাছে দান্তে শুনলেন এখানকার কথা তখন 'দারুণ-দুঃখের মোচড় খেল আমার হৃদয় তাই শুনে।'

আবার অষ্টম চক্রে আছেন ইউলিসিস, কারণ তিনি এক ধূর্ত পরামর্শদাতা, খ্রিশ্চান বিশ্বস্ততাগুণ তিনি লঙ্ঘন করেছেন — তা সে অন্যরকমের গুণে মহত্বে যতই তিনি মহীয়ান হোন। এই চক্রে অবশ্য নোংরা বীভৎস তেমন কিছু নেই। এখানকার বর্ণনা দিচ্ছে দান্তে :

সূর্যের মুখ যখন আমাদের দৃষ্টিসহ হয় (সন্ধ্যায়) যখন মাছিরা মশাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেয়, তখন পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত চাষি নীচে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখে অসংখ্য জোনাকি, তারা ঢেকে ফেলেছে সেইসব জমি জায়গা যেখানে হয়তো সে নিজেই চাষ করে বা আঙুর ফল তোলে : ঠিক সেইরকম অসংখ্য শিখায় এই অষ্টম চক্রের সব দিক পরিপূর্ণ।

এই হল হোমেরিক সিমিলিরীতির দান্তে সংস্করণের নমুনা। আধুনিক কাব্যিক ইমেজের এই উৎস (ইমেজটা অবশ্য দান্তের নিজস্ব)। এই চক্রে একটি দ্বিচূড় শিখার মধ্যে একত্রে আবিষ্কার করা গেল ইউলিসিস্ ও ডায়োমেডকে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে আগুনের জিভের মতো লকলকিয়ে উঠে উত্তর দিল ইউলিসিস শিখা। বলল তার মহৎ আদর্শের কথা। জানালো তার অদম্য ভ্রমণ পিপাসা, জগৎ-এর অন্যমেরু আবিষ্কার-অভিযানের কাহিনি, সেই অভিযানে নাবিকদের উদ্রিক্ত করবার সেই আহ্বানবাণী : 'পশুর মতো বাঁচা আমাদের নয়, আমাদের জন্ম মানুষের লভ্য সমস্ত জ্ঞান শ্রেষ্ঠসিদ্ধির অনুধাবনের জন্য।' নরকবাসী ইউলিসিসের এই উজ্জ্বলচিত্রণের উদারতা লক্ষণীয়।

তারপর পার্গেটোরি-ওর শেষ দিকে বিয়াত্রিচে আসার মুহূর্তে ভার্জিলের অন্তর্ধান, কারণ ওই লেথে নদী (Lethe) পার হবার অধিকার তাঁর নেই। তখন দান্তে বলছেন : 'আমাকে শোকে ভাসিয়ে চলে গেলেন ভার্জিল, যিনি আমার অতিপ্রিয় পিতার মতো, যাঁর জন্যই আমার মুক্ত হল পাপের বন্ধন। আমার গাল শিশিরে ধুয়ে হয়েছিল পবিত্র, এখন আবার তাতে পড়ল অবিশ্রাম অশ্রুর কলঙ্ক।

আর সেই বিখ্যাত দুই প্রেমিক ফ্রাঞ্চেস্কা আর পাওলো। ঠিক ওদেরই মতো প্রেমের মোহে পড়ে দান্তে বিয়াত্রিচেকে ভুলতে বসেছিলেন। নরকের তৃতীয় চক্রে (আগেই বর্ণনা করেছি) ঝড় ঝাপটায় দুর্যোগ-অশান্ত দেশে রয়েছে ওই প্রেমিকযুগল। ওদের ইতিহাস মেয়েটির মুখে শুনে দান্তের মনোভাব

একেবারেই নীতিবাগীশের নয়, গোঁড়া খ্রিশ্চানেরও নয় — পরম সহানুভূতির।

ফ্রাঞ্চেস্কা বলল :

একদিন একত্রে পড়ছি পড়ারই আনন্দে
লন্‌সলট কাহিনি, মজল কেমনে প্রেমে সে...
শুধু দুজনেই আছি, পড়ছি নির্দ্বন্দ্বে ;
এক জায়গায় এসে চোখে চোখ মেশে,
দু'জনেরই গালে চোরা রং ফুটে ওঠে...
...হবার যা হল এই জায়গাটিতে এসে —
'বহু আকাঙ্ক্ষিত হাসি যেই প্রিয়াঠোঁটে
ফোটা — তা প্রেমিকবর চাপল চুমা দিয়ে'—
—পড়ামাত্র দুই হয়ে থাকবে না যে মোটে
আমা থেকে, সারাদেহ শিউরিয়ে শিউরিয়ে
সেও একটি চুমো এঁকে দিল এই মুখে...

দান্তের প্রতিক্রিয়া —

একজন বলছিল, আর অপরটি কেঁদে
ভাসাচ্ছিল ... প্রাণ আমার সব
সত্যিই বেরোল যেন ও দু'টির খেদে—
শরীর লুটিয়ে ভুঁয়ে পড়ল যেন শব!

আপনজনকে ফেলে রেখে কোনও ভালো জায়গায় যেতে পেলেও যেমন মন কেমন করতে থাকে তেমনি সেন্টিমেন্ট দান্তে বারবার সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। মহাপ্রস্থানের সময় এক এক আত্মীয়ের পতনে যুধিষ্ঠিরের মতো স্থির অনাসক্ত অন্তর্মুখ তিনি নন। একটি কোমল সংবেদনশীল মানুষের মনের সুন্দরগভীর প্রতিক্রিয়াই তাঁর। এমনকি পিকার্ডো মেয়েটি স্বর্গধামের একটা নীচের স্তরে থেকে যাচ্ছে এও তাঁর ভালো লাগছিল না। সে আরো উপরে যাবার চেষ্টা করবে না কেন? শেষে পিকার্ডোই এর যা জবাবদিহি দিলে তাতে দান্তে পেলেন সৃষ্টি বিন্যাসের একটি মূল সূত্র ; সেই 'যাথাতথ্যতোর্যান্ ব্যদধাৎ' এর মতো একটি যেন মন্ত্রোচ্চারণ 'E'n la sua volontate e nostra pace'—'and in His Will is our peace...' আর সেই তাঁর ইচ্ছাতেই সুখ — আমাদের শান্তি। মানের দিক দিয়ে যত না হোক ধ্বনির দিক দিয়ে এই বাক্যটি এনে দেয় এমন একটি উপলব্ধি যাকে বলা যায় উচ্চতম কাব্যসিদ্ধি। এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি 'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি', 'তোমার, ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী' ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটির এক এক স্তরের, এক এক তীব্রতার (intensity) কাব্যমূল্য আছে। দান্তের লাইনটি চরম ঔপনিষদিক উচ্চারণের সুরে বাঁধা।

প্রেম ও অধ্যাত্মরস

দান্তের কাব্যের প্রধান সম্পদ, প্রধান রসের উৎস তিনি নিজে। তাঁর অপূর্ব অতুলনীয় প্রেম চরিত্র ও মন। এর মধ্যে আবার মূল শক্তি ওই প্রেমে, তাই থেকেই জন্মেছে, পরিণত হয়ে উঠেছে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রেমের কতকগুলি সার্বিক টাইপ আমরা জানি, মানি বা কল্পনা করে নিতে পারি : যেমন, হরপার্বতীর প্রেম, রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানুষ জগতে নেমে এসে রামসীতার প্রেম, সাবিত্রী সত্যবানের প্রেম, আবার কাব্যজগতের যেসব প্রেম উর্ধ্বতম শিখর স্পর্শ করেছে তাদের মধ্যে দেখা যায় কত বৈচিত্র্য স্বতন্ত্র টাইপ-গত কত বৈশিষ্ট্য। মা, বোন, বন্ধু, ক্রীড়াসঙ্গিনী ইত্যাদির সম্বন্ধের নানাধরনের মিলনে, ভক্তি প্রীতি আকাঙ্ক্ষার কত রকমের মিশ্রণে, সুন্দরের আকর্ষণ, সত্যের আহ্বান, কল্যাণের

ইঙ্গিত কত রকমের প্রেরণার যোগে তৈরি হয় এক একটি চিরন্তন টাইপ, যদিও প্রতিটি টাইপে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রূপ। প্লেটোর আদর্শ প্রেম, শেলির এপিসাইকিডিয়ন, কীট্সের এনডাইমিয়ন, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি মনে মনে সাজিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা বিচার করা যায়। কিন্তু এখানে তার দরকার নেই। শুধু বলতে পারি যে এই সব প্রেমটাইপের মধ্যে দান্তের প্রেম একটি বিশেষ মর্যাদার দাবি করে। তাঁর প্রেম অপরজগতের নয়, যদিও অপরজগৎ-চুম্বী, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্কাইলার্কের মতো মাটি ও স্বর্গের মর্মকেন্দ্রচারী। তাঁর প্রেম সম্পূর্ণ নিজস্ব (private) অথচ সার্বিক (universal)। এই প্রেমে আত্মরক্ষণ বা বলা যাক আত্মচারিত্ররক্ষণ থাকলেও স্বার্থপরতা নেই, আত্মসমর্পণ থাকলেও নৈরাপ্যে বিলয় নেই। কাজেই এ প্রেম সংসারেও নদীর জলের মতো ব্যবহার্য, কাব্যেও।

আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি, কল্পনায় নিজের সামনে নতুনসৃষ্টি করে নিতে পারি নয় বছরের বালক দান্তের বিয়াত্রিচে বালিকাদর্শন এবং তৎক্ষণাৎ অনুভব : 'এ কোন গগনের তারা, কোন কাননের ফুল!' তারপর সেই প্রতিমা মনে মনে লালন, সামান্যতম দৃষ্টিবিনিময়, নমস্কার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মনে মনে অচ্ছেদ্য আত্মিক সংযোগ রচনা, অনাদিকালের যুগলপ্রেমের স্রোতটিকে খুঁজে নিয়ে তাতে আরোহন করা। 'তুমি আছ, আমি আছি' শুধু এইটুকু প্রত্যয় ও আশ্বাসের উপরই জীবনের সব কিছুকে গড়ে তোলবার সাধনা করা। ভিটা নুওভায় যে প্রেমের বর্ণনা তা তো হৃদয়ের তন্ত্রীছেঁড়া বেদনার সাক্ষ্যে জীবন্ত। তা যে গুরুতর ব্যক্তিগত ঘটনা সে কথা মুহূর্তের জন্য সন্দেহ করার কথাও ওঠে না। ভিটা নুওভায় যে চারিত্রিক বিস্ফোরণ ও বিস্ফোরণের আরম্ভ, সমস্ত ডিভাইন কমেডি কাব্যে তারই বিবর্তন ও সমাপ্তি। আত্মজীবন-রচনা আর আত্মজীবনের মহত্তম ঘটা বিয়াত্রিচেপ্রেমের উদ্‌ঘাটন দান্তের কাব্যজীবনের সাধনা ও সিদ্ধি।

নিষ্পাপ, কিশোরসরল, স্বতঃস্ফূর্তস্বভাব, অথচ উচ্চতম গভীরতম চিন্তায় তত্ত্বে কৌতূহলী — এই হল দান্তের মন। মানবজীবন পাঠশালার তিনি আদর্শ ছাত্র। সংসারে তিনি কিছুটা অখ্যাতি কুড়িয়ে থাকতে পারেন অহঙ্কারের জন্য, কিন্তু অন্তর্মানসে তাঁকে যেন তুলনা করতে পারি সেই ছেলেটির সঙ্গে যে কিছুকাল কাটিয়েছিল হিমালয়ে শান্তিনিকেতনে তার ঋষিপিতার সঙ্গে। বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের ভাব ওই রকম শ্রদ্ধার, যেন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, মা ছেলে সম্বন্ধ। ভয়, পাছে কিছু ভুল করে ফেলি বলে ফেলি, পাছে মূঢ় মাটির ঢেলার মতো বোবা হয়ে থাকি, বীণার তারের মতো বেজে উঠতে না পারি।

পার্গেটোরিওর শেষে লেথে নদীর কূলে হঠাৎ বিয়াত্রিচের আবির্ভাব এবং ভৎর্সনা, সেই ভৎর্সনার সামনে অপরাধীর মতো সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ — 'দাঁড়ায়ে ছিলাম মাথাটি করিয়া নীচু'—আর অনুশোচনা। তারপর এই শোধনের পর ভালোবাসার দূতীদের সাহায্যে লেথে নদীতে অবগাহন এবং তার ফলে পুরনো গ্লানির স্মৃতিমুক্ত হয়ে শুদ্ধ প্রেমের অধিকার লাভ — এই সব কিছুর মধ্যেও দান্তে বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে কোথাও কৃত্রিমতার বা পরুষতার কলঙ্ক লাগেনি। এইসব শাসনভর্ৎসনা শুধু আপনজনের কল্যাণ কামনায়, এতে মান অপমান উঁচু-নীচু নেই, এর বেদনা দু'জনেরই সমান কারণ ওরা বাইরের দৃশ্যে দু'জন কিন্তু গভীর আত্মিক মিলনে অভিন্ন — কমেডির পাঠকের কাছে এই সত্য অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না। এই মিলন এমন যে বাইরের কথাবার্তার প্রয়োজনও কমে গেছে। সামান্য ভাবভঙ্গি, পাশফেরা, চোখে কথাভরা আভা, মুখ তোলা নামানো, ঠোঁটের উপক্রম থেকেই ওরা পরস্পরের মনের অবস্থা বুঝে নেয়। দান্তে তাই বিয়াত্রিচের দিকে চেয়েই আছেন, বিয়াত্রিচে বারবার তাঁকে বলছে অন্য সব কিছু দেখতে। দান্তে বিয়াত্রিচেজ্যোতি চোখ দিয়ে পান করে তার সঙ্গে নিজের সুর মিলিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর ঘোলা চোখের দৃষ্টি এই করে ক্রমেই স্বচ্ছতর হতে লাগল, হৃদ্‌পদ্ম ক্রমেই পাপড়ি খুলতে লাগল। মিলটনের Holy Light-এরই মতো যে জ্যোতিরূপিনীকে পুরোবর্তিনী করে দান্তের যাত্রা তাঁকে তিনি দেখলেন দিব্যজ্ঞান — Divine Wisdom—এর দূতী হিসাবে।

বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
যে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য বাজে, জানি তারে জানি...

বিয়াত্রিচের কথায় ঝড়ের মুখে গাছপালার মতো দোলে দান্তের প্রাণ। তার রূপ তার দৃষ্টিসুধায় তাঁর চোখ করে স্নান, অন্তরাত্মা পায় পুষ্টি। সমস্ত প্যারাডাইসো এইসব অনুভব আর অভিজ্ঞতার এমন মহৎ কাব্যিক ঝংকার তুলেছেন যে তার মূল্য না দিয়ে Divine Comedy -র মধ্যে শুধু Inferno-ই সাহিত্যিক মূল্যে শ্রেষ্ঠ এমন কথা শুনে অবাক লাগে।

এক জ্যোতি উদ্ভাসিত স্বর্গলোকের সত্য উপলব্ধি হয়েছিল দান্তের এবং তাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতেও পেরেছেন তিনি প্যারাডাইসোতে আলোর বহুধারাসঙ্গম। নানা ঋতুর নানা রঙের ফুলের মতো উছলে উঠছে তার ঢেউ-এর উল্লাস, তাই থেকে তৈরি হচ্ছে বিচিত্র জগৎ। সেই আলোর গভীরে ঢুকতে ঢুকতে ক্রমশ এমন অবগাহন যে সব যেন ডুবে গেল নিঃসীম অন্ধকারে, সবচেয়ে সচেতন জাগরণ হয়ে গেল সুষুপ্তি, আর যখন তার থেকে বেরিয়ে এলেন তখন সেই পরম অভিজ্ঞতার মুহূর্তকে যেন এসে ঘিরল বহু সহস্র বছরের বিস্মরণ। মার স্তন্য নিবিষ্ট শিশু যদি আত্মকথা শোনাতে যায় সে যেমন হবে, দান্তে যে জীবন্ত আলোর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তার বর্ণনা করতে গেলেও হবে সেই দশা। এই আলোর স্বরূপ বিয়াত্রিচেই বুঝিয়ে দিলেন দান্তেকে : 'ও হল প্রজ্ঞার জ্যোতি ভালোবাসায় ভরা। আবার কল্যাণময় এই ভালবাসা ভরা আছে আনন্দে। এই আনন্দ পরমজগৎ-এর সব সুখবোধের উপরে।'

যা পাবার সবই দান্তে পেলেন বিয়াত্রিচের মধ্য দিয়ে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন সেই কথা : 'সেই প্রথম যেদিন মুখ দেখলুম ওর এই মর্ত্যলোকে, সেইক্ষণ থেকে এই আজ পর্যন্ত আমার গান ওরই চলার পথ অনুসরণ করে চলেছে, একবারও বিরত হয়নি' (Paradiso, Canto XXX—)।

তার সাহায্যেই দান্তে দেখলেন দিব্য গোলাপ, Delestial Rose। হার মানলেন, স্বীকার করলেন পৃথিবীর যে কোনো কবির পক্ষেই তার উপযুক্ত কাব্যায়ন অসম্ভব।

তখন যা দেখলুম তা ছাপালো মহত্ত্বে
আলোচনার কূল। সব দৃশ্য গেল ভেসে,
আলোর আলিঙ্গনে স্মৃতি ডুবলো নিঃশর্তে।

যখন কেউ স্বপ্ন দেখে, আর সেই স্বপ্নশেষে
দৃশ্যপট হারিয়ে যায়, তার আবেগকম্পনই
বাজতে থাকে, আর কিছুই রয় না স্মৃতিদেশে

আমার তো ঠিক তাই।... সেই সমস্ত দর্শনই
মুছে গেছে ; কিন্তু আজো মধুফোঁটা তার
একটু একটু করে যেন চিনছে ধমনী।

এমনি করে রোদ ছোঁয়ায় মিশায় তুষার,
হারিয়ে যায় সিবিল মেয়ের বাণীলেখা পাতা
দমক লেগে হঠাৎ জাগা দখিনা হাওয়ার।

রসনায় শক্তি দাও হে বিশ্ব বিধাতা,
তার কিছু স্মৃতি প্রতিধ্বনি ফুটুক এ শ্লোকে
তাতে হয়তো সার্থক হবে এই দিব্য গাথা।

অপার অনন্ত দয়া!— আমি যার দিব্য ঝোঁকে
মত্ত হয়ে চেয়েছিলুম পরম আলোর দিকে,
সেই হোমে হব্য হয়ে দৃষ্টি গেল চোখে

শুধু দেখেছিলুম সে আলোয় অনেক লেখা লিখে
কেউ উড়িয়ে দিয়েছে যেন বিশ্বের সবখানে।
আর প্রেম তা কুড়িয়ে এনে বাঁধছে পুঁথিটিকে।

প্যারাডাইসো, শেষ ক্যান্টো

সাহিত্যভূমিতে বহুতীর্থের জলই বাঞ্ছনীয়। দান্তের এই অলৌকিক অথচ গভীরভাবে মানবিক প্রেমসরস্বতীর ধারা এসে নামুক বাংলা সাহিত্যে এই কামনা করি।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
(দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩)

শঙ্খ ঘোষ

চণ্ডীদাস বা দান্তে

যে সনেটটিকে মধুসূদন দান্তের সমাধিতে ফুল হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে দান্তের আত্মার কোনও গাঢ় স্পর্শ আছে বলে মনে হয় না। ওর ব্যবহৃত দুটি লাইন 'দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে' কিংবা 'তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে'র মধ্যে শব্দব্যবহারের কোনও অব্যর্থতা দেখি না বা অন্যভাবে বলা যায় যে, এই 'সাহস' বা 'পুলক' শব্দদুটি ডিভাইন কমেডির প্রেতলৌকিক সংকেতকে মুহূর্তমধ্যে নিষ্প্রভ করে দেয়। অনুমান করা যায়, সাহস শব্দটি সরাসরি এসেছিল ইনফের্নোর দ্বিতীয় সর্গ থেকে (২/১৩০-৩২)। কিন্তু ওই একটি মাত্র শব্দের ব্যবহারে এবং ওর ঠিক পাশেই পুলক-এর প্রতিষ্ঠায় মধুসূদন আমাদের ধরতে দেন না দান্তের নির্জন আত্মার কোনও কম্পমান ছায়া। ঈনিস আর সেন্ট পলের প্রতিতুলনায় আপন শীর্ণতা জেনে কেমন করে তাঁর হৃদয় নিশীথ তুহিনে কুসুমিকার মতো ভেঙে পড়ছিল (২/১২৭-২৯), সেই দ্বন্দ্ব ক্ষতের কোনও চাপ লাগে না মধুসূদনের উচ্চারণে। এর পাশাপাশি বায়রনের 'dark eyes of a Seer' বা মিকেলাঞ্জেলোর 'souls most perfect bear the greatest woe' দান্তের প্রেত-শুদ্ধি-স্বর্গলোকের ত্রিপর্বিক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে বরং বেশি সাহায্য করে। অবশ্য মিকেলাঞ্জেলোর তুলনা এখানে হয়তো অনুচিত, এমন আর ক'জন শিল্পী ছিলেন দান্তের মর্মের এত সমীপে? কিন্তু কথাটা তুলতে হল এই জন্য যেন মধুসূদনে অথবা উনিশ শতকের বাংলায় দান্তেকে ব্যবহার করার মধ্যে একটা অর্ধস্বস্তির চিহ্ন যেন ফুটে ওঠে। ইউরোপের পক্ষে যা সত্যি ছিল না। অন্তত ইতালি জার্মানি বা ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের দান্তের পুনর্জীবন তাঁকে অনেকটা অন্তর্মূল থেকে দেখতে সাহায্য করেছিল বলে মনে করা যায়।

কেবল সনেটটিতে নয়। মেঘনাদবধকাব্যের যে অংশ দান্তে-প্রভাবে প্রকট সেই অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনাও শেষ পর্যন্ত নৈতিক বা আত্মিক কোনও সমস্যার আঘাত আনে না বাঙালি পাঠকের জন্য। ঠিক, পাপের কথা এখানে উঠে আসে বটে ; কিন্তু প্রথম সর্গে রাবণের প্রথম বিলাপ ('কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে') থেকে শুরু করে অষ্টম সর্গে দশরথের শেষ আর্তি ('স্বপাপে মরিনু আমি মোর বিচ্ছেদে') পর্যন্ত তাঁর প্রায় সমগ্র রচনাতে ওই শব্দ সাংসারিক পীড়াজনিত অস্পষ্ট আক্ষেপের মতো শোনা যায়, ঊর্ধ্বতন কোনও আত্মিক মুক্তির সাধনস্তর হিসেবে আসে না। তাই ক্ষীণ পরিসরেও নারকী বীভৎসতার আয়োজনে মধুসূদন একটু বেশি তৎপর ; এবং এই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির জন্যই হয়তো তাঁকে লিখতে হয় 'আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি'—যদিও দান্তের নরক তোরণের অক্ষরগুলি অগ্নিময় ছিল না, ছিল ধূসরিমা মাখা; ব্লেকের আঁকা ইনফেরনোর ছবিতে অস্পষ্ট উৎকীর্ণ শব্দাবলির কুহেলিতে যা অনেকটা ধরা আছে।

এইজন্য মনে হয়, দান্তের রচনায় একই সঙ্গে যে চতুঃস্তর উপলব্ধির প্রয়োজন ছিল, ইনফেরনোকে ব্যবহার করবার সময়ে মধুসূদন তাকে অনেকটা উপেক্ষা করেছেন। আর, কেবলমাত্র ইনফেরনোকেই স্বতন্ত্রভাবে ধরতে গেলে এ উপেক্ষা অনিবার্যও হয়ে পড়ে। কিন্তু যে কবি মনে করতেন যে কেবল *ডিভাইন কমেডি*-র পক্ষেই নয়, যে কোনও গণনীয় কবিতা বিচারের জন্যই চাই চতুঃস্তর অর্থের ধারণা, তাঁকে কেবল আক্ষরিক বোধে গ্রহণ করা কতদূর সংগত? কখনও কখনও মনে হয় বটে যে এলিয়টের পরামর্শ না শুনে আমরা *ভিতা নুওভা*-ই আগে পড়ব (কার্যত তা হয়ে ওঠে না যদিও) *ডিভাইন কমেডি*-র পথ দিয়ে ভিতা নুওভায় না পৌঁছে ভিতা নুওভার আলোতেই কমেডিকে দেখব ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা

কতটা ভালো? এ দৃষ্টিতে দান্তে পাঠে কেবল একটা অস্থায়ী লাবণ্যের বেশি শেষ পর্যন্ত আর কিছু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

লিটারাল, অ্যালিগোরিক্যাল, মর‍্যাল এবং অ্যানাগগিক — কনভিভিওতে বর্ণিত এই চার ধরনের অর্থের কেবল আক্ষরিক তাৎপর্যের দিকটাই মধুসূদন লক্ষ করতে চেয়েছিলেন দান্তের মধ্যে, এইরকম মনে হতে থাকে। এইজন্যই হোমার বা মিলটনের সঙ্গে তাঁর যে ধরনের মানসিক যোগাযোগ হতে পেরেছিল, দান্তে বিষয়ে কখনওই তেমন নয়, দান্তে তাঁর অলংকরণ মাত্র। আর কেবল মধুসূদনই নয়, গত শতাব্দীর বাংলা কবিতায় দান্তে যতটুকু আসেন তার প্রায় সর্বত্রই এমনি বহিরাভরণ হিসেবে তাঁর ব্যবহার।

অল্পই আসেন অবশ্য, আর আভরণও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নেওয়া। যেমন *স্বপ্নপ্রয়াণ*-এর কবি দেখেছিলেন রূপকের উল্লাস। স্বপ্নপ্রয়াণের রূপক আয়োজনের মধ্যে দান্তের স্মৃতি একেবারে অস্পষ্ট ছিল মনে হয় না। (রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনও প্রেরণা কি নেই?— কবিহৃদয়ের বিচিত্র জগৎ পরিভ্রমণ ছাড়াও 'অজগর মহিষ সর্প ছাগ বাঘ কুক্কুরে'র রূপক মনে করিয়ে দেয় কমেডির বাঘিনী বা নেকড়ের মতো পশুরূপক। এর চেয়ে সক্রিয়ভাবে কমেডির রূপককে নিয়েছেন নিশ্চয় হেমচন্দ্র। এমনকি কখনও যেন মনে হয় তিনি পারলৌকিক থেকে একটা নৈতিক চিন্তাও অস্পষ্টভাবে স্পর্শ করতে চাচ্ছেন। ছায়াময়ী অনুবাদ নয়, তবে কমেডির দ্বারা তা অনুভাবিত ; কিন্তু এতোটা দুয়ারসমীপে থেকেও হেমচন্দ্র সমগ্র দান্তেকে জানলেন না কেন? এখানেও কেবল ইনফেরনোর ব্যবহার কেন? যদিও বলেন খুব ভালো : 'ঘনতর কুয়াশায় আবৃত সে বনকায়' 'ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি — গাঢ়তর ঘন' এবং যদিও শেষ মুহূর্তে 'বিগত-কলুষ-তাপ বিগত-সকল-পাপ আত্মাময় নন্দিনীর' দেখা পাওয়া যায়, তবু মধ্যবর্তী অভিজ্ঞতার কোনও যথাযথ বাস্তবতা থাকে না সেখানে, বোঝা যায় না হঠাৎ কেন চলে আসে এন্টনি আর কাইসরের 'মৃত তনু'। হেমচন্দ্রে পুরগাতোরিও অনুপস্থিত, এবং প্রোচ্চারিত তত্ত্বকথাকে কীভাবে অভিজ্ঞতার মতো ব্যবহার করতে হয় তারও কোনও নিরিখ নেই এখানে।

এসব ব্যাপারকে অপপ্রতিভার ফলাফল বলে ব্যাখ্যা করা অবশ্য কঠিন নয়। কিন্তু তা হলেও মনে ভাবনা পুঞ্জিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ কী করেছিলেন? দান্তে বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি অল্প বয়সের খেলা, কিন্তু অভ্রান্ত রবীন্দ্রচারিত্র যে তার মধ্যে থেকে গেছে তাও সত্যি। 'বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা' তাঁর এই ব্যাখ্যা অল্প বয়সের খণ্ডদর্শন নয়, বিশেষ চরিত্রেরই দৃক্‌ভঙ্গি। বেয়াত্রীচেকে তিনি প্রায় কল্পলক্ষ্মী হিসেবে দেখেছেন দান্তের রচনায়, কিন্তু তার আবির্ভাব যেন রবীন্দ্রনাথের ধারণায় রোমান্টিকদের 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী'র মতো বড়ো জোর। সেইজন্য যখন বিশদ করে তিনি এতটা বলেন 'তিনি বিয়াত্রীচের মৃত্যু ও জন্ম তিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষগণনার অনুসারে স্থির করিলেন — বিয়াত্রীচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খ্রিস্টীয় ত্রিমূর্তির (Holy Trinity) কোনও না কোনও যোগ আছে' তখনও এর ত্রিমূর্তিগত তাৎপর্যের দিকে বেশি এগুতে প্রস্তুত হন না, তিনি একে মনে করেন আলস্যের স্বপ্ন, রোমান্টিক বিহ্বলতা : 'এই কল্পনা করিয়াই তাঁহার কত সুখ হইল!' তাই পরিণত বয়সে যখন তিনি ভাষাবোধের অভাব বশত আক্ষেপ করছিলেন যে দান্তে তাঁর কাছে রুদ্ধ বই — 'closed book'—তখন নরকবাসের নরকবর্ণনা সত্ত্বেও সে হতাশোক্তি গভীরতর অর্থে সত্য বলে ভাবতে হয়। গ্যেটের মতো ছটফট করে এমন তিনি বলেননি বটে যে 'প্রেতলোক বিরক্তিকর, শুদ্ধিলোক দ্ব্যর্থক আর স্বর্লোক ক্লান্তিজনক'' কিন্তু এই ত্রিলোককে এক সামগ্রিক বোধের মধ্যে ধারণ করবার আয়োজনও রবীন্দ্রনাথ আর করেছিলেন বলে জানা যায় না।+

কেন এমন হল? মধ্যযুগীয় নন্দন বোধের সমস্তটাই প্রতিফলিত ছিল দান্তের মধ্যে, ক্রোচের এই সিদ্ধান্ত মনে করুন। সুন্দরের জন্য যে তিনটি বিষয়ের অপরিহার্যতা বুঝেছিলেন টমাস অ্যাকুইনাস, সেই সামগ্রিকতা সমানুপাত এবং প্রোজ্জ্বল স্পষ্টতার পূর্ণ সমন্বয়ের নাম *ডিভাইন কমেডি*। কিন্তু বস্তুত

বহিরাবয়বে এই ঝকঝকে স্পষ্টতাই কি অনেক সময়ে অনুরাগীকে 'কলস ভাসায়ে জলে' বসে থাকতে অনুপ্রাণিত করে না? 'যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও' এই আহ্বান যেন গোপন হয়ে যায় অনেক সময়ে এই স্পষ্টতারই ফলে। তবে এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, অতলের এই আহ্বান যে এসে পৌঁছচ্ছে না কবিতায়, এ কি ব্যক্তিগত কবিরুচির ব্যাপার অথবা দেশীয় কোনও চরিত্রলক্ষণও প্রচ্ছন্ন আছে এর ভিতরে?

।। দুই।।

এলিয়ট যখন শেলি-ব্রাউনিংয়ের নাম করছিলেন দান্তে প্রসঙ্গে, তখন অনুচ্চারিত রেখেছিলেন কোলরিজের কথা। কিন্তু কোলরিজেই বরং ছোট আধারের মধ্যে ত্রিপর্বিক অভিজ্ঞতার এক প্রবল চেহারা দেখতে পাই।[১] হয়তো তা সম্পূর্ণ দান্তের দিক থেকেই পরিকল্পিত ছিল না, হয়তো তা পাওয়া কেবল ঐতিহ্যসূত্রে। কিন্তু কোলরিজ মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দান্তে এক 'living link between religion and philosophy'। এদিক থেকে ভেবে দেখলে মনে হয় খ্রিস্টীয় সত্তার উপলব্ধি দান্তেমানসের অনেকটা কাছে নিয়ে যায় কবিকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এ নয় ; এলিয়টের একথা অনেক শ্রদ্ধেয় যে 'poetic assent'-এর দিক থেকেই দান্তের বিশ্বাস বা অভিজ্ঞতাকে লক্ষ করতে হবে, নিজস্ব বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দুইই সরিয়ে রাখতে হবে সাময়িকভাবে। একথা সত্যি যে দান্তের বিশ্বাসে আমরাও বিশ্বাস রাখব কিনা, ডিভাইন কমেডির পাঠকের পক্ষে এ চিন্তা সেই মুহূর্তে তেমন জরুরি নয়। কিন্তু দান্তের সেই বিশ্বাসকে আমরাও আমরাও জানব কিনা, এ প্রশ্নের সমীচীনতাকে হয়তো তেমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং প্রশ্নটা যখন এইখানে এসে দাঁড়ায় যে বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতাতে তাঁর সমযোগ্য কোনও আয়োজনের প্রস্তুতি থাকে না। কেন, তখন ইউরোপীয় মনের সঙ্গে ভারতীয় মনের তুলনার পুরোনো কথাটাই চলে আসে।

Evil -এর সমস্যাকে দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কেন্দ্র রেখেছিলেন এইখানে : 'the potentiality of perfection outweighs actual contradictions (The Problem of Evil : *Sadhana*)। বস্তুত এ হল ভারতীয় বোধেরই পরিণাম, 'outweigh' কথাটির জোরে আমরা সব সময়েই জীবনের একটা বড়ো অন্ধকারকে ঢেকে রাখতে পারি, তার আভাসমাত্র দেখে নিয়েই তার থেকে উত্তীর্ণ হবার কথা ভাবতে পারি। *গীতা* — এলিয়টের ধারণায় যা *ডিভাইন কমেডি*-র পরেই দ্বিতীয় মহত্তম দার্শনিক কবিতা — সেই *গীতা*-ও যখন বিশ্বরূপে এসে পৌঁছোন, বর্জন করে যান অস্তিত্বের জটিল রূপ। *গীতা* শেষ পর্যন্ত হয়তো কাব্য নয়, দর্শনই—কিন্তু এ বর্জন যে কেবল সেই জন্যেই তা মনে হয় না। ভারতীয় সাহিত্যে এইখানে একবার উঠে এসেছিল প্রবল নেতির সমস্যা, কিন্তু 'অনেকাদ্ভুতদর্শনম্' সূত্রটুকু দিয়েই যেন তাকে মিটিয়ে দেয়া হল, বড় জোর দেখানো হল ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হিসেবে মুখগহ্বরে জ্বলন্ত পতঙ্গের মতো ধাবমান শরীরগুলিকে। এবং অর্জুন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্তবাতুর হয়ে ওঠেন, তাঁর এক পর্ব থেকে অপর পর্বে উত্তরণে কোনও রূপময় জীবনাভিজ্ঞতা কাজ করে না। তেমনি আবার বৈষ্ণব পদগুলির অভিসারিকা রাধামূর্তির মধ্যেও একধরনের তিতিক্ষার আকার আছে বটে, আছে যাত্রিকমূর্তি, কিন্তু তা কেবল ভক্তিপ্রাণতারই প্রাকৃতিক প্রকরণ, তার সহিষ্ণুতাকে মনে হয় অনেকটা শৌখিনতাময়, সৌন্দর্যের ছল। দান্তের রচনায় বিবেকানন্দ যেমন 'বহির্প্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা' দেখেন এখানে কোথায় তা পাব? 'যখনই মিলটন বা দান্তে অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন' তখন শেষ পর্যন্ত স্বামীজী তাঁদের ব্যর্থতাই দেখেন, কিন্তু তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ 'এই সমস্যা সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের নিকট নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে।'[২] এইভাবে ধর্মীয় চেতনার মধ্যে একদিকে এক ইন্দ্রিয়হীন মহাশূন্যতা আমাদের আলগা সুতোয় ঝুলিয়ে রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি লোকালোকের মধ্যবর্তী ঝাঁপটা কখনওই স্পষ্ট করে দেখানো হয় না বলে

জটিলতার আস্বাদেও আমরা বঞ্চিত থাকি। আমাদের মনে ও আমাদের শিল্পে তাই খ্রিস্টীয় পাপ ও পরিত্রাণের ছবি কোনও স্পষ্ট আলোড়ন আনতে পারে না।

'পাপ কী, কী করলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া আমার পাপ বোধ হয় নাই। পাপদর্শনে পাপ বোধ হইল; পলকের মধ্যে সহজেই পাপ বোধ করিলাম'— দেশীয় চেতনার মধ্যে থেকে যিনি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন খ্রিস্টধর্মের দিকে, সেই কেশবচন্দ্রও তাঁর জীবনবেদে এই স্বীকারোক্তি রেখে যান। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কথা তিনি বারংবার বলেন বটে কিন্তু 'সহজেই' এবং 'পলকের মধ্যে'ই জন্মায় তাঁর এই পাপবোধ। উপরন্তু নবীনচন্দ্রদের মতো নব্য মানবতন্ত্রীও যেমন অল্প পরেই বৈষ্ণবীয় ফল্গুপ্রবাহের মধ্যে মিলিয়ে যান অবলীলায়, কেশবচন্দ্রের নূতন ধর্মেও তেমনি কীর্তনবন্দনার এক বৈষ্ণবসুলভ ভক্তিমত্ততার ঢেউ লাগে শেষ পর্যন্ত। এ হল দেশীয় প্রকৃতির প্রতিশোধ।

তাহলেও কেশবচন্দ্রের ধর্মোপলব্ধির মধ্যে এক সংকটবোধ ছিল এবং কেবল কেশবচন্দ্র কেন, গত শতাব্দী বিষয়ে এ হল সাধারণ সত্য। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে থেকে মধুসূদনকেও এই দ্বন্দ্ব কি ভিতর থেকে আন্দোলিত করে? আবহের নানা প্রভাব এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকে তাঁর চিত্তচেতনায়, কিন্তু মনে হয় না যে, এমন কোনও ধর্মীয় সমস্যার টান তাঁর কাছে স্পষ্ট হতে পেরেছিল। খ্রিস্টবন্দনার একটি কবিতা লিখেছিলেন তিনি কর্তব্যবোধে, কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার মূল উত্তেজনা ছিল বরং এই দীর্ঘশ্বাসে : I sight for Albion's distant shore! ফলে যখন তিনি জয়দেবকে স্তুতি করে জানান: 'কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে' তখন এই 'ভক্ত' শব্দের প্রচলিত বাঙালিয়ানা সরিয়ে দেবার কোনও চেষ্টাই তিনি করেন না এবং ' যে বিষম দ্বার দিয়া' দান্তে তাঁর 'আঁধার নরকে' প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন তার সঙ্গে এই আবহমান চেতনাকে কোনও প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে সাজাবার কথাও তিনি ভাবেন না।

দ্বন্দ্বের অপেক্ষা ছিল আরও একটি ক্ষেত্রে, প্রেম ও প্রজ্ঞার মিলনক্ষেত্রে। এমনকি এ-ও হয়তো বলা যায় যে এ দুয়ের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ওপরেই নির্ভর করে ছিল মধ্যবর্তী স্তরটির অস্তিত্ব, যে স্তর প্রায়ই অতিক্রম করে যাই আমরা। দান্তেকে প্রথমেই মীমাংসা করে নিতে হয়েছিল এই সমস্যার। Francis অথবা Dominic, প্রেমের তাপ না কী প্রজ্ঞার প্রভা — শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য কার? মধ্যযুগের এই প্রশ্নের যে উত্তর আছে দান্তের মধ্যে, তা এ দুয়ের সমবায়ে জাত। তাই তাঁর নিবিড়তম প্রতীক হয় সূর্য, যার মধ্যে পরিপূরক ভাবে রয়ে গেছে তার উত্তাপ সমানভাবে প্রকীর্ণ হয়ে যায়, সবার ওপর। কেবল সূর্যপ্রতীকেই নয়, স্বর্গোলোকের দ্বাদশ সর্গে পরস্পর এমন তিনি আরও অনেক প্রতীক আনেন প্রজ্ঞাপ্রেমের পরস্পরসাপেক্ষতা প্রমাণের জন্য। 'sacred millstone' (১-৩), 'two bows parallel and like in colour' (১০-১২) অথবা 'wheels of the chariot' (১০৬-১০৮) এই ভাবেই চলে আসে একের পর এক।

কিন্তু ভারতীয় সাধনার মধ্যে, বিশেষত বাঙালি সাধনায়, এ দুই বিপরীতের তেমন কোনও মিলনবিন্দু শেষ পর্যন্ত ধরা যায়নি। আমরা জ্ঞানের সাধনা দেখি, দেখি প্রেমের সাধনা, কিন্তু দুই সাধনাকে মিলিয়ে এনে ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগের কোনও সম্ভাবনা আমরা ঐতিহ্যের মধ্যে থেকে আত্মসাৎ করিনি। চৈতন্যদেব যে মুহূর্তে গঙ্গায় তাঁর নৈয়ায়িক প্রচেষ্টাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গেই যেন বাঙালির ভাবী জীবনের একটা নির্দিষ্ট পথ চিহ্নিত হয়ে যায়, যেন ঘটনাটি প্রতীক তাৎপর্যে আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতা অনেক সময়ে আমাদের ধারণায় বাধা হিসেবেই দাঁড়ায় যেন, 'নামৈব কেবলম্' কিংবা 'মামেকং শরণং ব্রজ' কথার ওপর নির্ভর করতে পেরে আমরা বিশ্বাসেই বস্তু মিলাই, তর্কে আমাদের কাছে সব কিছুই সরে সরে যায়। অথচ আমাদের ভাবনাতেই এটা ঘটতে পারা সম্ভবপর ছিল : 'প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পরসম্বন্ধ — ইহারা একে তিন' (কর্মযোগ) বিবেকানন্দের এই দৃষ্টি তো ভারতচিন্তা থেকে সহজেই তুলে আনা স্বাভাবিক ছিল, কর্মাত্মিকা ও জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির সাধনা তো ছিল গীতারই কেন্দ্রীয় দীক্ষা। কিন্তু জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগের

বেলায় পরস্পরসম্বদ্ধ ওই সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপকে অথবা জ্ঞানময় ভক্তির ব্রতকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে ধরতে পারিনি, আনতে পারিনি ব্যবহারে। তাই দান্তের সূর্য আমাদের কাছে উত্তাপ আনলেও আলোক আনে না, — প্রেমের তাপ, কিন্তু প্রজ্ঞার প্রভা নয়।

৩

কোনও সমালোচক আক্ষেপ করেন এই বলে যে দুর্ভাগ্যবশত 'Abandon all hope ye who enter here' লাইনটিই অনেকের কাছে *ডিভাইন কমেডি*-র পরিচয় বা প্রবেশপত্র। কিন্তু এ হয়তো সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্যের বিষয়ও নয়। ত্রিপার্বিক অভিজ্ঞতার ভূমি অতিক্রম করবার পরেও ঐ লাইন আমাদের কাছে গুঞ্জরিত হতে পারে হয়তো বা কিছু পৃথক অর্থে, তার অভিঘাত নিতান্ত অর্থহীন থাকে না। মধুসূদন কেন এর অনুবাদ করেছিলেন 'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে' এই প্রশ্ন হঠাৎ ভাবা যায়, কেন অনুপ্রাসের প্রলোভন পর্যন্ত জয় করে নিয়ে 'আশা' শব্দটির পরিবর্ত চাইলেন তিনি 'স্পৃহা'য়? 'ছায়াময়ী' পাঠকের এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে

অমরী কহিলা ধীরে চাহিয়া মানবে—
'যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্তে, রবে ক্লেশ
জীবনের পাপাস্বাদ যত কাল অবসাদ
না হইবে চিত্তমূলে, এইভাবে রবে'।

এখানে অবশ্য প্রসঙ্গ ঈষৎ রূপান্তরিত — কিন্তু অভিপ্রায়ে যেন সাদৃশ্যের আভাস আসে এবং গীতার উপস্থিতি এই উচ্চারণের পটে কাজ করে বলে মনে হয়। মধুসূদন স্পষ্টত কতদূর ভেবেছিলেন বোঝা যায় না, কিন্তু সামর্থ্যময় ওই 'স্পৃহা' শব্দের অর্থ ও ধ্বনিগত লাফ কথাটিকে সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে নিয়ে যায় — এবং *ডিভাইন কমেডি*-র অভিজ্ঞতার কাছে এই নিস্পৃহ প্রবেশকে নিতান্ত অনিবার্য মনে হয়। আর আজ, কমেডির আক্ষরিক রূপক নৈতিক এবং আত্মিক। এই সমস্ত তত্ত্বার্থের পরেও স্পৃহাহীন এই নৈর্ব্যক্তিকতার অনুভবই আমাদের সামনে নিঃশব্দ সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত হতে থাকে — এ দেশে ক্রমেই যার উন্মোচন হবে বলে আশা রাখা যায়। *ডিভাইন কমেডি*-র সমস্ত বৈচিত্র্যের পরেও তার কেন্দ্রীয় বিষয় কবির আত্মা, কিন্তু এমনই তার ব্যবহার যে এ কাব্যের চেয়ে বিশ্বজনীন অথচ এর চেয়ে ব্যষ্টিজনীন আর ব্যক্তিগত কিছুই আর হতে পারত না।[৫] ব্যক্তি আর বিশ্বকে একই আধারে ধরবার এই চিরন্তন আধুনিকতার খোঁজে যত বেশি উন্মুখ হবে বাংলা কবিতা, ততই বেশি আমরা দান্তের সমীপবর্তী হতে থাকব বলে মনে হয়। তাই গত শতাব্দীর শেষার্ধ তাকে যেভাবে পেয়েছিল, এ শতকের শেষে তার চেয়ে ভিন্ন কোনও দাবিতে তাঁকে সার্থকতর রূপে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

উপরন্তু আছে পূর্বকথিত প্রেম ও প্রজ্ঞার সেই মিলনভূমির প্রশ্ন। কখনও কখনও বঙ্গসংস্কৃতির মৌলিক হৃদয়বত্তা থেকে সরে যাবার চেষ্টা করেছে বাংলা কবিতা, ধরতে চেয়েছে প্রজ্ঞাভূমির দৃঢ়তা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দুয়ের সংগত মিলন যেন ঘটে উঠতে পারল না, মধ্যপথে বাধা ছিল কোথাও। জীবনানন্দের অন্তিম পরিণাম ভারতীয় আনন্দধারণার মধ্যে, ব্যাপকতম প্রেমবোধে। হয়তো জীবনানন্দেই ছিল এর আভাস, মিলিয়ে দেবার একটা অতর্কিত আকস্মিক চেহারা — 'এই সব দিনরাত্রি', 'এইখানে সূর্যের', '১৯৪৬-৪৭' বা 'অনন্দা'র মতো কবিতাবলিতে 'অদ্ভুত আঁধারে'র নারকী অভিজ্ঞতার কিছু তাপ এসে লাগে এবং কখনও মনে হয় 'his feet are always firmly planted in the things of sense, but his will soars on wings of love'[৬] দান্তে প্রসঙ্গে ব্যবহৃত এই উক্তি হয়তো জীবনানন্দ বিষয়েও অল্প ভাবা যায় — কিন্তু কেমন করে প্রেমের এই ব্যাকুল পাখা সঞ্চালিত করে দেন তিনি, তা আমরা বুঝতে পারি না যেন। অর্থাৎ ঐতিহ্যের সূত্র বহন করে জীবনানন্দও জানেন না কোনও

শুদ্ধিলোক, প্রথম থেকে তৃতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হবার মধ্যে তিনিও রাখেন না কোনও মধ্যবর্তী সিঁড়ি। অথচ যে প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন তিনি, তার দ্বারা কি এই সিঁড়ি তৈরি হতে পারত না? যখন তিনি বলেন 'দান্তের উপলব্ধির শাশ্বত জিনিসে মরচে পড়েছে অনেক দিন হল' তখন বুঝতে পারি যে ডিভাইন কমেডির 'চরিত্রকূটের অতিবিষম ঠাসাঠাসি' ভেদ করে জীবনানন্দও পৌঁছতে পারলেন না এর উপলব্ধিস্বরূপে,[৫] — অথচ স্বভাবে তার সঙ্গে আত্মীয়তার কত কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন তিনি। জ্ঞান ও প্রেমের যুগলকে যিনি বাঁধতে চেয়েছিলেন এইভাবে :

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে। ... ...
... ... জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। (১৯৪৬-৪৭)

অনুপম ত্রিবেদীর মতো তাঁর বিষয়েও অবশেষে মনে হল 'জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম।' তাই ' রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায় / সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই' বলে তিনি সরে গেলেন দূরে। 'মানব প্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে / সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে' যে মানুষ নিজেরই শব বহন করছে — তার জন্য জীবনানন্দেরও অমোঘ শেষ উচ্চারণ থাকল 'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো / এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'। আর এই সূর্য — অন্তর্জীবনে যে প্রতীক বারংবার ব্যবহার করেন কবি — প্রায় সব সময়েই প্রেমের আলো জ্বালিয়ে রাখে। এ আলো দান্তের অর্থে আসে না, বরং দান্তে যাকে বলবেন তাপ, এ হল তাই :

> Then I thus began Love & Intelligence, soon as the prime equality appeared to you, became of equal poise to each of you,
> because the sun which lightened you and warmed with heat and brightness hath such equality that illustrations all fall short of it.

স্বর্লোক ১৫/৭৩-৭৮

বৈদিক ঋষিরাও জ্ঞানের দেবতার নাম দিয়েছিলেন সূর্য, কিন্তু জীবনানন্দের মতো বিষ্ণু দে-ও যখন আনেন এই প্রতীক, সেও ভালোবাসার টানে : 'সূর্য যেন আকাঙ্ক্ষায় লাল ভালোবাসা' অথবা 'সূর্য যেন ভালোবাসা প্রতি ঘরে ঘরে'। তাই তিনিও (যিনি কবিতায় আনেন 'ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তিসমাজের নিহিত ভাষা বিনিময়ের আততি'[৬] এবং যাঁর মধ্যে আমাদের অভীষ্ট মিলনের সন্ধান ছিল অনেক দূর পর্যন্ত) অবশেষে তিনিও এই আলো-উত্তাপকে একত্র না বেঁধেই এক সমীকরণ আনেন চণ্ডীদাস আর দান্তের মধ্যে : 'চিরঅস্থির উদাত্ত এক শান্তি / যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে'।[++]

এখনও পর্যন্ত তাহলে আমাদের কাছে মরমি প্রেমের এই বোধের মধ্যেই গচ্ছিত আছে দান্তের পরিচয়। মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রনাথ-হেমচন্দ্রের বিলাসী নরকভাবনা সরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু হয়েছিল প্রেমিক দান্তের গান। তাই নরকে নয় আর, আলোড়িত হৃদয়ের জটিল ছবি আনতে গিয়ে এই শতাব্দী বারংবার ফিরে তাকিয়েছে পাওলো-ফ্রাঞ্চেস্কার প্রেমকাহিনিতে।[৭]

৪

এমনকি ইউরোপীয় আধুনিকদেরও দান্তের তুলনায় 'slight and shadowy' ভেবেছিলেন ইয়েট্‌স,[৮] পাপ আর দুঃখের তেমন বড় কোনও দিব্যদর্শন ছিল না বলে। এদেশের পক্ষে সে বেদনা স্বভাবতই আরও বেশি সত্য। কিন্তু ইতিমধ্যে সূর্যকরোজ্জ্বল ভূমিতে আমরা যে নিবিড় বিষণ্ণতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হতাশ্বাসের পঙ্কপল্বল যেভাবে আমাদের পা দুটি প্রোথিত করে রেখেছে তাকে শুধু একদিনের জ্বর ভাবলে ভুল হবে। এরকম মানুষের জন্য কুরটিউস অবশ্য হাসপাতালের ব্যবস্থা করেন,[৯] কিন্তু

তাহলে তো সব পৃথিবীটাই হাসপাতালে দাঁড়িয়ে যায়! ইনফেরনোর সপ্তম সর্গে পাপী মানবকদের মতো এখন আমাদেরও মধ্যে বাজছে এই সব কথা :

Sullen were we in the sweet air!—
that there are people underneath the water, who sob, and make it bubble at the surface as thy eye may tell thee whichever way it turns.
Fixed in the slime, they say, 'Sullen were we in the sweet air that is gladdened by the sun, carrying lazy smoke within our hearts ;
now lie we sullen here in the black mire. This hymn they gurgle in their throats, for they cannot speak it in full words.

(প্রেতলোক ৭/১১৮-১২৭)

ভরাট শব্দে কথা বলবার অভ্যাস আবার কবে হবে কে জানে, কিন্তু সে রকম শব্দের পিছনে এখন আমরা অনেক অতিক্রম চাই, প্রজ্ঞাপ্রেমের মিলন চাই, কোনও সহজ সমাধানে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্ন আর চাই না এখন। তাই এখন মানবধর্মানুভূতির একটা বিশ্বব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের নূতন সময়ে দান্তে হয়তো আমাদের কাছে অন্যভাবে আসবেন, এই রকম মনে হতে থাকে।

সূ ত্র নি র্দে শ

* অবশ্য মনে রাখতে হবে গ্যেটেও এ-রকম বলেছিলেন সাময়িক উত্তেজনাবশে এবং পরে তাঁর ধারণার পরিণতি-পরিবর্তনও ঘটেছিল।

+ রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর বয়সে লেখা *পুষ্পাঞ্জলি*-র কল্পনাপটে কি *ভিতা নুওভা*-র প্রচ্ছায়া ছিল কিছু? এ প্রশ্নটা এখানে মনে ওঠে। দান্তে বিষয়ক রচনাটিতে তিনি 'ভিতা নুওভা'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন এর মাত্র সাত বছর আগে। পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে গদ্যাংশের সঙ্গে একটি গানও দেখা যায় (কেহ কারও মন বুঝে না) এবং ' যে গেছে সে সমস্ত জগৎ হইতে তাহার লাব্যণ্যচ্ছায়া তুলিয়া লইয়া গেছে' ধরনের উচ্চারণ অনিবার্যভাবে মনে ধরিয়ে দেয় দান্তেকে : 'After this gentlest of women had left this world, our city remained as though widowed and despoiled of all dignity.' (গ. ৩১) অথবা আরও দু-একটি অংশ : 'সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে — যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে — যাবার সময় সে আমাকে তার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে' এর সঙ্গে যদি তুলনা করি :

'Since she fled to heaven so suddenly
Leaving Love here to lament with me' (কা. ৪)

বা, 'তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই — তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে' — এর সঙ্গে :

'So now I call Death here
As my sweet and soothing rest.
Crying 'Come'! with so impassioned a sigh
I am jealous of all men who die.' (কা. ৫)

কিন্তু এসব আপাতদৃশ্যতা লক্ষ করবার মুহূর্তেও স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রকাশ করেন তাঁর মৃত্যু-অভিজ্ঞতার লিরিক-আবেগ, ভিতা নুওভা ঠিক তা নয়।

++সমীকৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও, যখন বলেছিলেন তিনি : 'বিয়াত্রীচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে

তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে — তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী তুমি সে নয়নের তারা — সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই'।

যাত্রী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। ক্রিস্টাবেল, এনশেন্ট মেরিনার আর কুবলা খান যে পর্যায়ক্রমে প্রেতশুদ্ধি স্বর্গলোকের প্রতিরূপ নাইট এক প্রবন্ধে তা সুন্দর করে দেখিয়েছেন (Coleridge's Divine Comedy : G. W. Knight, English Romantic Poets : ed. M. H. Abrams p. 158-69)। অথবা অতই বা কেন এনশেন্ট মেরিনারই কি পুরো এই পরিক্রমার কুঞ্চিকা নয়?

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১২৫, ২২৬।

৩। Nothing could be more universal and nothing could be more individual, nothing even more personal–*A History of AEsthetic* : B. Bosanquet, p. 153

৪। *AEsthetic Experience in Religion* : G. MacGregor, p. 171

৫। কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ, পৃ ৫৫।

৬। একালের কবিতা : সম্পা. বিষ্ণু দে, পৃ ৯।

৭। লক্ষণীয় সত্যেন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও অলোকরঞ্জনের অনুবাদ।

৮। In Excited Reverie, ed. A. N. Jeffares & K. G. W. Cross, p. 104

৯। European Literature & the Latin Middle Ages : E. R. Curtius, p. 596

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
(দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মস্কৌ স্টেট ম্যুজিয়ামে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হয়েছিল সেই উপলক্ষে একটি ছবির প্রসঙ্গে কোনও সমালোচক ও কবির কথোপকথনের একটি অংশ—

সমালোচক : আপনার চিত্রাবলির কি কোনোই নাম নেই?

কবি : কোনও নামই নেই। কোনও নামের কথা আমি আদৌ ভাবতে পারি না। কী ক'রে আমার ছবি বর্ণনা করা যায় সেটা আমার জানা নেই।

সমালোচক : এই পোর্ট্রেট কি দান্তের?

কবি : না, এটা দান্তের পোর্ট্রেট নয়। গত বছরে জাপান থেকে ফিরবার মুখে স্টিমারে এঁকেছি। আমার খেয়াল আমার লেখনীকে অনুসরণ করে চলেছিল বলেই এই ছবিটি এখন আপনাদের সামনে রয়েছে।

কবি-চিত্রী স্বয়ং একথা বললেও ১৯৩২-এ ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-শিল্প প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ১৩২ সংখ্যক ছবিটির নাম 'দান্তে'। মস্কৌতে যে ওই নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল উদ্যোক্তারা নিশ্চয় সে খবর জানতেন। এবং ছবির নাম প্রসঙ্গে ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য নিশ্চয় সেই নির্ধারণ অপ্রমাণ করে না :

ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনও বিষয় ভেবে আঁকিনে— দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব...রূপসৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নাম সৃষ্টি অপরের!

এ অঙ্গীকার অনৃতকথন না হলেও দ্ব্যর্থদ্যোতক। কবিতার নামকরণ সম্পর্কে মালার্মের সেই কুণ্ঠা রবীন্দ্রনাথের সপ্রতিভ এই সৌজন্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ। নাম শুধু কবিতাকেই নয়, ছবিকেও পরিসরের মধ্যে সংকুচিত করে, তাকে বাড়তে দেয় না। তাছাড়া শিল্পীর রহস্যময় উদ্দেশ্যকেও সে বিকৃত করে। দান্তের যে কোনো আলেখ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে সন্দেহ করবার সুযোগ নেই রবীন্দ্রচিত্রিত ওই প্রতিকৃতি দান্তের মুখাবয়বের বিশ্বস্ত সাক্ষ্য। সেক্ষেত্রে ছবিটিতে দান্তের নাম উৎকীর্ণ করে দিলে হয়তো সত্য কথা হত, কিন্তু সাংকেতিকতার মর্যাদা থাকত না। শিল্পে-সাহিত্যে সত্যভাষণের প্রাতিভাসিক উপায়টি উদ্দেশ্যের শুধু সমার্থকই নয়, কখনও কখনও অতিশায়ী। রবীন্দ্রনাথ যতই ভূমা আনন্দ ইত্যাদির অকপট ভাষ্যকার হিসাবে কীর্তিপতাকা বহন করুন না কেন, ছবি ও গানের প্রকৃতিগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য তাঁর অবমানসের মহা-অজানাকেই নন্দিত করে। রবীন্দ্রনাথের রচিত দান্তে চিত্র তাঁর মনের অনাবিষ্কৃত প্রবণতা ও অভিমুখিতার একটি স্মৃতিধার্য নিদর্শন।

অন্তত সতেরো বছর বয়স থেকেই এই গোপন গঙ্গোত্রীর সূত্রপাত। সেই সময়ে 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (*ভারতী*, ভাদ্র ১২৮৫) প্রবন্ধটি যে নিছক আকস্মিক বিষয় থেকে রচিত হয়নি, উদ্ধৃতির সাহায্যে সেটি প্রমাণ করা যেতে পারে—

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবনকাহিনি শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার

> জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে—তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়ে দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা; ইহার কিয়দ্দুর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল—তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রিচেকে দূর স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না।

অতিকল্পনার আশ্রয় না নিয়েও এই সিদ্ধান্তে নীত হওয়া সম্ভব, এই পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যমীমাংসার অস্থির সূচনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত, জীবন ও কবিতাকে একটি অবিভাজ্য রচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করার যে আগ্রহ পরবর্তী কালে তাঁর নন্দনতত্ত্বে অন্যতম উচ্চারণ হয়ে উঠেছে, এখানে তার পূর্বলেখ দেখতে পাওয়া যায়। দুই, প্রদত্ত বিশ্লেষণের শেষ অংশের ঘনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব যে এখানে জাতক-কবিগুরুর অতৃপ্ত, আত্মবিব্রত, সংগ্রামলাঞ্ছিত মনের উত্তরণের কান্না সংহত হয়ে আছে। অতঃপর এই উত্তেজনার শান্তায়ন (sublimation) ঘটেছে এবং দান্তের কাব্যে কবির রূপকসন্ধান ও 'ভিটা নুওভা' থেকে তাঁর তর্জমা পর পর পাঠ করলে বোঝা যায় তিনি নিজেও এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন—

১. রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন-একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।
২. তিনি (বিয়াত্রিচে) রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।

পবিত্রতা বিষয়ে আমাদের কবি যে, কোনও পূর্ব সংস্কারের দ্বারা অভিভূত হননি, সে কথা এর চেয়ে আরও উৎকীর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। অপেক্ষাকৃত উত্তরকালে অবশ্যই সৌন্দর্যবোধ ও কল্যাণের এই সম্পর্ক ভিন্নতর আকার নিয়েছে। সৌন্দর্য তার নিজের গরজেই মঙ্গলকে আমন্ত্রণ করে, তখনও এরকম একটি অভীপ্সা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু এর পরে— সমীক্ষাধর্মী কথাশিল্পের কিছু এবং শেষ পর্যায়ের পদাবলি বাদ দিয়ে অনায়াসেই বলা যায়— সৌন্দর্য আপেক্ষিক একটি পারমিতা। এবং তাঁর কবিতার আনুষ্ঠানিক আরম্ভের আগে 'সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ' যখন নিবিড় সমগ্রতায় রবীন্দ্রনাথের মনন অধিকার করেছিল তার প্রেরণা অব্যবহিত শিল্পসর্বস্ব আন্দোলন থেকে আসেনি, এসেছিল পিছুটানের সংস্পর্শে অবিশ্রাম অতীত পর্যটনের মধ্য দিয়ে এসে অবশেষে রোমান্টিকতার পুনরুত্থান যুগের মন্ত্রণায়। দান্তে, যিনি 'তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত ইউরোপমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন' এবং বয়োক্রমে অত্যন্ত কনিষ্ঠ গ্যেটে, যিনি 'নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ে সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন'— তাঁরা সেই ভ্রাম্যমাণ কবির কাছে অতীত ও আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম দুই যোজক। প্রসঙ্গত আরও একজন তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিলেন: পেত্রার্কা। তিনজনেই সম্ভবত এক এক অর্থে আধুনিক কালে আপেক্ষিক বোধের প্রবর্তক। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য তথ্য, এই তিনজনের মধ্যে দান্তে তুলনায়িত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কখনও তিনি লক্ষ করেছেন পেত্রার্কার সঙ্গে দান্তের 'অনেক বিষয়ে...সৌসাদৃশ্য ছিল' (*ভারতী* আশ্বিন ১২৮৫), কখনও আরও গভীর সাদৃশ্যের সন্ধানে বলেছেন :

> গ্যেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পেত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎ কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন—যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গ্যেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে

ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না। (*ভারতী* কার্তিক ১২৮৫)

নাটক ও কবিতার প্রাকরণিক এই পার্থক্যনির্দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে দোলাচলে বিচলিত কবিসত্তার অভিক্ষেপ। কবিকিশোরের অপরিণত মনের দ্বারা দান্তে ও গ্যেটের দ্বৈতত্বের এই নির্ধারণ নিঃসন্দেহে সেই মনেরই নির্মীয়মাণ কার্যক্রম আভাসিত করছে। বাস্তব ঘটনাকে আদর্শ জগতে উন্নীত করবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রহৃদয়ে আরব্ধ দায়িত্ব যার পরিপ্রেক্ষিতে এই তুলনা অর্থময়।

বাংলা ভাষায় দান্তের কবিতা অনুবাদ করিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাণিত বোধ করেছিলেন। ইংরেজির মধ্যস্থতায় এই অসম্পূর্ণ ভাষান্তর সাধিত হয়েছিল বলে এক সময়ে তিনি পরিতাপ করেছেন:

When I was young I tired to approach Dante, unfortunately through an English translation, I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.

কিন্তু এই শোচনা শিল্পনিপুণ ছদ্ম-ভাষণ। যদিও তাঁর সামগ্রিক কৃতিত্বের পাশে দান্তে তর্জমার দৃষ্টান্ত এমন কিছু অবিস্মরণীয় নয়, এবং সেই কাজ বিশেষত বাল্যকালেই সম্পন্ন, তবু এর এমন একটি তির্যক সার্থকতা আছে যা উপেক্ষণীয় নয়। আক্ষর অনুবাদের একটি অংশ—

জীবনের মধ্য পথে দেখিনু সহসা
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কি ভীষণ অতি দারুণ গহন
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক।

অতঃপর যখন লিখলেন—

আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
... ...
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে
দেখিতে না পাই—
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায় ফুল ফোটে
পথ জানি নাই।

নিশীথজগৎ ছবি ও গান

তখন বোঝা গেল দিভিনা কম্মেদিয়া থেকে নিছক পুনরনুবাদ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। আত্মপ্রতিকৃতির প্রয়োজনেই দান্তের আঁকা নরকনিসর্গ তিনি আবার আরেক রঙে আঁকতে চেয়েছেন, যেখানে নিজেই তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

২

উনিশ-শতকে বাংলা সাহিত্যের আবহে দান্তের আবির্ভাব প্রকাশ্যে প্রবলরূপে অভিনন্দিত হয়নি। শেক্‌সপিয়রের প্রেরণায় প্রথা ভেঙেছিলেন গ্যেটে এবং আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের দ্রোহদর্পণে Sturm und Drung-এর ঝোড়ো হাওয়ার শ্বাসবাষ্প নিশ্চয় লেগেছিল। এরই মধ্যে দান্তের জন্য একটি প্রত্যাশাভূমি

গঠিত হচ্ছিল। 'চির অস্থির উদাত্ত এক শান্তি যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে' (বিষ্ণু দে)—গত শতকের ক্রান্তিক্ষণে ঝড়তুফানের মধ্যেও কেউ-কেউ আত্মস্থতার আর্তিতে দান্তের দিকে তাকিয়ে বিবেকের তানপুরা বেঁধে নিচ্ছিলেন। মধুসূদন 'কবিগুরু দান্তে'কে নিয়ে যে-স্তব লিখেছিলেন তার মৌলতা একই বিষয়ে টেনিসনের প্রণীত কষ্টকল্পিত স্তুতির বৈষম্যে অনুভব করা যায়। ভিক্টোরীয় রাজকবির সাত লাইনের পদ্যপ্রস্তাবটি —কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী —'Written at the request of Florentines' এবং তাতে শেষ দু' ছত্রে অভিনীত বিনয়ের প্রদর্শন থাকলেও অন্তরঙ্গ দৃষ্টির অভাব ছিল। কিন্তু মধুসূদন দান্তেকে স্বরচিত কবিতার পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক বলে উপলব্ধি করেছিলেন —

নব কবি-কূল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে,
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।

জানি না, শ্যেলিং দান্তে সম্বন্ধে যে-সমীক্ষণ করেছিলেন, এই চতুর্দশপদী লিখবার মুহূর্তে মধুসূদন সে সম্পর্কে জাগর ছিলেন কি না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ইনফের্নোর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত চিত্রকল্প তিনি সনেটে সংহত করবার আগেই মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে তাঁর অভ্রান্ত তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন —

আগ্নেয় অক্ষরে লেখা, দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে—'এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখভোগে—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।

রবীন্দ্রনাথ—যিনি বারংবার মধুসূদনের অন্যমেরুর কবি বলে কীর্তিত— যে অনুবাদ করেছেন, মধুসূদনের প্রভাবে নিমজ্জিত —

দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে —

• মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে;—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে।
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের।
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্তকাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।

এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের মাইকেল মনস্কতার উচ্চারিত ও আভ্যন্তর অভিজ্ঞান। ইতিপূর্বে *ছবি ও গান* থেকে উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে মধুসূদনের 'নাহি ডাকে পাখি / নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে / না ফোটে

কুসুমাবলী বনসুশোভিনী'র আন্তর আত্মীয়তা স্পষ্ট। সন্দেহ নেই, মধুসূদনের দ্রঢ়িষ্ঠ নৈরাশ্য উদীয়মান উত্তরসূরীর হাতে অবারিত বিষাদ ও প্রার্থিত আশাবাদের মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। সদ্যপ্রদত্ত দু'টি উদ্ধৃতি দুই কবির এই সম্পর্ক বিশদ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ দান্তে-অনুবাদ-কালে মধুসূদনের একটা গোটা লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছেন বলেই নয়, একথা মনে করবার সংগত কারণ আছে, পূর্বসূরীর কবিতার প্রচ্ছন্ন অনুষঙ্গ মেলে ধরে সেই অনিবার্য প্রভাবকে ব্যবহার করছেন। অতঃপর সচেতন হয়ে তিনি তাঁর উপরে মাইকেলের ওই প্রভাব অস্বীকার করতে চেয়েছেন, কিন্তু ততক্ষণে স্বকীয় কবিতার মর্মে সেটি অনুস্যূত হয়ে গিয়েছে। আরও দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করা যায় —

১.

অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে!

(অষ্টম সর্গ)

২. কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া একস্থানে লইয়া গেলেন—

সেখানে—

দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ —
তারকা অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি—কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চারিদিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত!

(রবীন্দ্রকৃত তর্জমা)

কড়ি ও কোমলে সমন্বিত মধুসূদনের প্রতিভা যেখানে মুহূর্তের পরিসরে প্রলয়শঙ্খ বাজিয়ে দিতে পেরেছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাবর্ণনাধর্মী যন্ত্রণায় সেই মহিমা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু, শুদ্ধ অনুভবের সরলীকরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নন্দন-জিজ্ঞাসার বৈপ্লবিক যে পরিচয় এখানে লুকিয়ে আছে সেটি হল অন্তর্বিক্ষোভকে চূর্ণ-চূর্ণ করে অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে তাকে জানা এবং পরিশেষে তার ভিতর থেকে দর্শকের ভঙ্গিতে বিবিক্ত হওয়া। যাঁরা মিলটনের সঙ্গে মাইকেলের সগোত্রতার তদন্তে তৎপর তাঁদের কাছে প্যারাডাইস লস্ট বিষয়ে জনসনের বক্তব্য আপত্তিকর হলেও পুর্নবার বিবেচ্য বলে মনে হয়। মিলটনের মানব মানবীরা সকলেই স্বীয় সন্তাপের মধ্যে অবরুদ্ধ—একজনের পক্ষে আরেকজনের যন্ত্রণাময় অবস্থান পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়; পাঠকের পক্ষেও পারাপারের সহানুভব-সেতুটি খুঁজে পাওয়ার কোনও উপায় নেই—জনসনের এই নিরীক্ষণ অন্তত অংশত সত্য। মধুসূদনের সঙ্গে মিলিয়ে *দেখলে* তো অপেক্ষাকৃত অনেক-বেশি সত্য। মধুসূদন তাঁর নির্মিত নরনারীর সুখদুঃখের সঙ্গে একান্ত জড়িত, তাদের জন্য সমবেদনায় আর্ত। এখানেই মিলটনের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার ব্যবধান যোজনব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্বভিত্তিক উপন্যাসের জনক, সহানুভূতির (sympathy) চেয়েও সমানুভূতি (empathy) আশ্রয় করেছিলেন। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই অজস্র বস্তু-বিভাব (objective correlative) ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্রসৃষ্টি করেই সেই বিভাবগুলিতে প্রাণময়তা এনেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ক্রমশ যতই অনাত্ম-অহং বা anti-self কার্যকরী হয়েছে, মধুসূদন ততই আত্মস্বরূপের কাছে বিষণ্ণভাবে ধরা দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও তাঁর বেদনাকে সুন্দর আধারে সুরক্ষিত করতে পেরেছিলেন বলে যিনি ব্যক্তিগত বেদনাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথের অবচেতন প্রলোভন এবং দুর্দমনীয় সংস্কার মধুসূদন। দান্তের কাছে মধুসূদন গোপনে পাঠ নিয়েছিলেন। দান্তের কবিতার ভাবাসঙ্গ ও চরিত্রায়ণ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই কেরন আর অ্যাকেরন হয়ে উঠেছে কৃতান্তচর ও বৈতরণী নদী। দান্তে অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার আগে দেখেছিলেন উতরোল গঙ্গায় মধ্যদিনের সূর্য। কিন্তু দান্তের কবিতার ওই ভারতীয়তা মধুসূদনকে ততটা আলোড়িত করেনি যতটা দিভিনা কম্মেদিয়ার পাপ ও প্রতিবিধানের ধারণা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন শৈবলিনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'শৈবলিনী দেখিল সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই--দু'কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে' তখন ইনফের্নোতে বর্ণিত ফ্লেগেথনের ছবি তাঁর মনে ছিল। এবং বঙ্কিমের বর্ণনার প্রেরণা মধুসূদন, যিনি পাপপুণ্যের অনেক চিত্রকল্প দান্তের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় কবি দান্তে এবং আধুনিক যুগের খ্রিস্টীয় কবি মধুসূদনের পাপ-বোধের প্রকৃতি এক ছিল না। কিন্তু দু'জনেই পাপের সঙ্গে সৌন্দর্যের রহস্যময় যোগাযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। দান্তের নরক যত সুন্দর স্বর্গ তার কাছে নিষ্প্রভ এবং মধুসূদনের চিত্রিত নরকেও 'দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন বসন্ত'।

পাপের মধ্য থেকে যে-সুন্দরের জন্ম পরিশীলনের মধ্য দিয়ে মহাসুন্দরে তার স্খালন হতে পারে। লৌকিক কবিতা এবং ত্রুবাদুর বাউলদের সঙ্গে পরিচিত দান্তে সে কথা জানতেন। তাই তাঁর অন্তিম সুন্দর জ্যোতির্ময় স্বর্গীয় গোলাপের প্রতীক ও সংজ্ঞায় উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের আদিপর্বের কবিতায় অকল্যাণের অসিত আবহ উদ্ঘাটিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। 'মানসী'তে এই প্রবণতা শেষবারের মতো প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথের দান্তে দ্বন্দ্বজটিল উত্তরণের শিক্ষক। এই দ্বন্দ্ব মধুসূদনের চেয়েও জটিল, কেননা, মধুসূদন স্বচ্ছতার প্রয়োজনে বিসংবাদী বৃত্তিগুলিকে ঐহিক পরিসীমার ভিতরে সংকুচিত করে তুলেছিলেন, বিচিত্রের সমবায়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরমার্থিক ঐক্যের অনুশীলন করেননি।

এই সমস্যার সাহায্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর শোচনীয় অখ্যাতির অন্ধকার থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়। তাঁকে আমরা সাধারণভাবে জানি বিদ্রুপক্ষম এবং বিদ্রুপার্হ একজন পদ্যকর্তার ভূমিকায় যিনি মধুসূদনের আলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছায়াময়ী উনিশ-শতককে তার বহিরাশ্রয়িতা থেকে অন্তর্জগতের অনিকেত পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করেছিল। গত শতকের প্রথম তিন দশকে ইংল্যান্ড দান্তের যে-পুনঃপ্রবর্তনা ঘটেছিল, ছায়াময়ীতে সমালোচক হরেন্দ্রমোহন তারই ছায়া লক্ষ করেছেন। ভারতীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আত্মিক গবেষণাগুলির ফলশ্রুতিসত্ত্বেও ছায়াময়ী ভূতুড়ে গল্পের মতো এবং কবিতার চাহিদা মেটাতে অক্ষম; বরং এরই দু'বছর আগে দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা *স্বপ্নপ্রয়াণ*-এ দান্তেসংস্পর্শ আরও সার্থক—সমালোচকের এই সমস্ত নিরূপণ মেনে নিয়েও এই কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রতিহত মানসের অসংখ্য সঞ্চারী সম্ভাবনা চোখে পড়ে। *দিভিনা কম্মেদিয়া* হেমচন্দ্রের কাছে 'অদ্বিতীয় কাব্য'। দান্তের 'ভাবের রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ' করেছেন তিনি। পাওলো-ফ্রাঞ্চেস্কার কুটিল সমর্পণের রক্তিম রূপকথা অথবা মাতেল্দার নিবেদিত সারল্যের টানাপোড়েনে দান্তের ভাবের যে-রচনাপ্রণালী গড়ে উঠেছিল হেমচন্দ্রের লেখায় তার আভাসমাত্র নেই। সাতটি পল্লবে সম্পূর্ণ এই কাব্যের অনেকগুলি পল্লবই জীর্ণ হয়ে এসেছে। শুধু রচনাদোষে নয়, দান্তের কবিতায় সর্গ থেকে সর্গে অনুভূতির বিন্যাসে বিজ্ঞানসম্মত যে-বিবর্তন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে সেই ভাবক্রম ধরতে পারেননি বলে হেমচন্দ্রের পরাভব ঘটেছে। কিন্তু নরকচিত্রণে উৎসাহী হেমচন্দ্র আত্মার পরিবেশ রচনায় সামর্থ্য দেখিয়েছেন —

১. প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণি রব, একত্র মিলিছে সব
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।
নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে।

পত্র ঝর-ঝর স্বরে, সর্বদিক পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুটনাদ, ঘন স্বর সবিষাদ।
বহে স্রোত নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

২. না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত শীর্ণ কায়া, সেই সব জীব-ছায়া
নিশ্চল—নির্বাক— যেন ভূজঙ্গ তুষারে!

এবং স্বর্গপথে বেয়াত্রিচের প্রতিরূপ —

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী
কিরণের রেখা-মত শোভা করি নীল পথ
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি
...
গগনের সেই দেশে যেখানে নক্ষত্রবেশে
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

এই সব বিচ্ছুরিত সমারোহের মধ্যে থেকে-থেকেআছে ভাবগত ছন্দপতন এবং সবশেষে ওড টু দি নাইটিঙ্গেল -এর স্বপ্নজাগর, হতচকিত চিত্তাবস্থার প্রতিধ্বনি। মনে রাখা আবশ্যক, কিট্‌সে এই অবরোহণ রোমান্টিক কবিতার প্রতি অন্যান্যের মতো হেমচন্দ্রেরও আসক্তি প্রমাণ করে। রোমান্টিক মনস্তাপের মধ্যেই হেমচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তারই মধ্যে হঠাৎ কখন সত্তার উত্থান-পতনের বৃত্তান্তটি একাকার হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। প্রাচীন বিশ্বপরিক্রমার শেষে উনিশ-শতকের রোমান্টিকদের কাছেই থেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে সেই রোমান্টিকতা পুনর্জাত হয়েছিল। রোমান্টিক কবিতাকে হেমচন্দ্র ভালোবেসেও এই কারণে বিশ্বাস করতে পারেননি যে তার সহায়তায় ভাবীভাষণ চললেও যুগ, সভ্যতা বা সমাজের চেহারা পাল্‌টে দেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ স্থির করে নিয়েছিলেন শুধুমাত্র আত্মসংস্কৃতিই তাঁর উদ্দিষ্ট। তাই হেমচন্দ্রের মতো ব্যবহারিক উচ্চাশার কবলে কবিতাকে অসাড় পঙ্গু না করে তিনি তাঁর রোমান্টিকতাকে ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাসের দিকে সঞ্চালিত করেছিলেন। রোমান্টিক কাব্যাদর্শ তাঁকে শিখিয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের মতো হতে এবং তারপরে তিনি নিজেকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সেখানে, অর্থাৎ আত্মবিদারী অস্তিত্বের বিশাল মানচিত্র খুলে ধরার বেগবন্ত প্রক্রিয়ায় দান্তের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য তুচ্ছ করবার মতো নয়। দুজনের জীবনই প্রতীকনাট্যের প্রধান চরিত্র। ওই নাটক শেষ হয়েছে দু'জনেই যেখানে চরিত্র থেকে সূত্রধারের ভূমিকায় সরে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন।

একি রহস্য একি আনন্দ নূতন ভুবন জুড়ে
মহান্ বৃত্ত —দিব্য প্রতিমা তাঁরি পরে সমাসীন,
ডানা মেলে নয়, উত্তরণের সৌরশিখরচূড়ে
এসেছি সহসা রৌদ্রাভিসারে, দেখেছি অন্তহীন
আবর্তরত আলোকচক্র নিহিত বহতা ধারা
অন্তরে সুধা সঞ্চিত ক'রে দিগন্তে বিস্তৃত
প্রেমের মন্ত্রে চলে চরাচর সূর্য চন্দ্র তারা।

গীতাঞ্জলি-কে এজরা পাউন্ড *পারাদিসো*-র সঙ্গে তুলনা কেন করেছিলেন, তার যুক্তি এখানেই।

৩

মহাভারতের তুলনায় দান্তের পটভূমি ছোট; কম্মেদিয়ার ভাবনা বেদনা শ্লেষ ধিক্কার আগুন ও গভীরতা সত্ত্বেও আমার মনে হয় একটা প্রায় অনিঃশেষ ক্রন্দসীকে আলিঙ্গন করে মহাভারত বেশি গভীর। কিন্তু দান্তে সময়ের দিক দিয়ে আমাদের ঢের নিকটে। ঠিক আধুনিক পৃথিবীতে বাস না করলেও আধুনিক ভাবপৃথিবীর (সব দিকের নয়, খুব কম দিকের নয় তবুও) পিতা হবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল।

—জীবনানন্দ দাশ, 'কি হিসেবে শাশ্বত', *কবিতার কথা*

এই পর্যন্ত ব'লেও 'কালপ্রবাহী' দান্তের অমরতা জীবনানন্দ অনুযোগ উত্থাপন করেছেন, তাঁর কাব্যে তখনকার ইতালীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ঘনঘটা বড় বেশি। 'উপলব্ধি প্রকাশের অদ্বিতীয় পদ্ধতি—যা আদি আধার ও আধারের মিলনীদেশের অনির্বচনীয় সত্যেরই সামিল প্রায়— সে রকম দান হিসেবে তাঁর কাব্য বেঁচে রয়েছে',জীবনানন্দের এই উচ্চারণ গূঢ়ার্থজ্ঞাপক। দান্তে কোনও বিরাট তত্ত্ব দিয়ে গেছেন ব'লেই তিনি মহাকবি তা নয়। তা যদি হত তাহলে তাঁর চিন্তাবস্তুর জন্য টমাস অ্যাকুয়েনাস প্রমুখ মনস্বীকেই কৃতজ্ঞতা জানালে চলত। কিন্তু পাপ-অপাপ, প্রেম-অপ্রেম, আলো-অন্ধকার, উপায়-উদ্দেশ্যকে দান্তে সতেজ নতুনত্ব নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেছিলেন এবং কবিতার প্রকরণকে তার বিষয়বস্তুর উৎস ও মোহনার সঙ্গে সমীকৃত করে দিতে পেরেছিলেন। বিষয়ের অত্যন্ত কাছে কণ্ঠস্বরকে সন্নিবেশিত করার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। আমরা জীবনানন্দে এই ক্ষমতা দেখেছি, যদিও তাঁর কবিতায় দান্তের চেয়েও শেক্সপীয়রের অভিঘাত প্রচুরতর। 'সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর / নিস্পেষিত মনুষ্যতার আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ / ভাবা যাক, ভাবা যাক /ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি / ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত / শত জলঝর্ণার ধ্বনি' -একটানা এই সংলাপে 'পুর্গতোরিও'র (২৮।৮৫-৯৩; ১২১-৩০) নিলীন ভাবনা খনন ক'রে উপরে হয়তো দান্তের প্রগাঢ় প্রভাব আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু আত্মপ্রশ্ন ও দৃপ্ত প্রতীতির সমীকরণে জীবনানন্দ আঙ্গিক ও প্রসঙ্গকে যেরকম কাছাকাছি এনেছেন সেখানে দান্তের প্রবর্তনা অনুসন্ধান করলেই পরিশ্রম সফল হবে বলে মনে হয়।

'অন্ধকারে সবচেয়ে সে শরণ ভালো / যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো'। দান্তে দেখিয়েছেন প্রজ্ঞান ও প্রেম জাগলে আলো ভাস্বরতায় অজস্র গুণ বেড়ে যায়। প্রজ্ঞান-প্রেম-আলোর পারস্পরিক এই সম্পর্ক দান্তের কবিতার প্রধান আকর্ষণ। দান্তে যখন বেয়াত্রিচেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরব্ধ প্রতিজ্ঞাগুলি যদি চরিতার্থ না হয়, মহৎ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই অপরাধের ক্ষতিপূরণ সম্ভব কেনা। বেয়াত্রিচে উত্তর দেবার আগে অমল সৌন্দর্যে দিগ্বিদিক আলো ক'রে তাঁকে নিরস্ত করলেন। কবিজীবনের প্রান্তিক উৎসর্গে জীবনানন্দও সেই নিরুত্তর আলোকবর্তিকার কাছে আনত হয়েছেন –

মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
(দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩)

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে দান্তে

দান্তে যখন *ডিভাইন কমেডি* রচনা করেন (১৩১৫-১৩২১খ্রি) বাংলা কাব্যের বয়স তখন প্রায় এক শতাব্দী। বৌদ্ধ অধ্যাত্মবাদের 'ইরোটিক' উপাদান ওই কাব্যে তাঁদের কাছে অস্পষ্ট লাগবে না যাঁরা *পারাদিজো*-তে বেয়াত্রিচে কর্তৃক ক্যাথলিক কবিকে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার পথে পরিচালনা করতে লক্ষ করেছেন। পরম মোক্ষের সহায়িকারূপে বৌদ্ধ সহজিয়া কবির যোগিনী বা সহজ-সুন্দরীকে সেই পাঠকের কাছে বিস্ময়কর না মনে হতে পারে যিনি দান্তের স্বর্গসুখদ কল্পনায় গঠিত মহিয়সী মহিলার ভূমিকাটি অনুধাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু যে ভাবরাশি মিলে ডিভাইন কমেডি গড়ে উঠেছে তার থেকে তান্ত্রিক মিস্টসিজমের সমগ্র দার্শনিক প্রেক্ষাপট একেবারে আলাদা। বেয়াত্রিচের আবির্ভাব হয়েছে ত্রুবাদুরদের বিনম্র প্রেমকে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম প্রয়োজনে নিষ্কাম করে নিয়ে। যোগিনীর পটভূমিতে রয়েছে তান্ত্রিক সাধনার মূলাপ্রকৃতি তন্ত্রের ধারণা যা এক 'ইরোটিক মিথ'-এ রূপকপ্রাপ্ত। দান্তের মহিয়সী রমণী এমন এক ব্যক্তি যে একটি ভাবের মধ্যে সূক্ষ্ম রূপ লাভ করেছে ; বাঙালি বৌদ্ধ কবির যোগিনী একটি ভাব যা ব্যক্তিরূপ পরিগ্রহ করেছে। নিজ সাধনার সহায়তার জন্য সহজিয়া কবির অবশ্য প্রয়োজনীয় এই যে এক নারী সঙ্গিনীর সঙ্গে নিবিড় যোগ তা এক দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মতন্ত্র এবং দান্তের স্বর্গীয় রমণীর ধারণা দিয়ে তা বোঝা যায় না। যদি সহজিয়া কবিরা *ভিতা নুওভা*-য় বেয়াত্রিচে-র উপর রচিত কবিতাগুলির সঙ্গে ও *পারাদিজো*-র সেই সর্গসমূহের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন যেখানে বেয়াত্রিচে স্বর্গাভিমুখে দান্তের পথপ্রদর্শিকারূপে আবির্ভূতা হচ্ছেন, তার মধ্যে তাঁরা সহজ-সুন্দরীর কোনও খ্রিস্টীয় প্রতিরূপ দেখতে পেতেন না। কিন্তু যদি তাঁদের বলা হত যে 'কনভিভিও'-র রমণী কোনও পার্থিব নারীর স্বর্গীয় রূপ নয়, দর্শনের রূপকমূর্তি মাত্র, তাহলে তাঁরা একটা বিস্তীর্ণ অধ্যাত্মতন্ত্রের অংশরূপে তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারতেন। তাই এ কথা একেবারেই অসম্ভব মনে হয় যে প্রাচীন বাঙালি সহজিয়া কবি দান্তে-রচিত বেয়াত্রিচের বিগ্রহে সৃষ্টিশীলভাবে সাড়া দিতে পারতেন, এমন কী যদি ইতিহাসের কোনও ভিন্ন গতিতে তিনি তার সঙ্গে পরিচিতও থাকতেন।

দান্তের স্বর্গীয় রমণীর সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবির রাধারও কোনও সাদৃশ্য নেই। কারণ বৈষ্ণব দর্শনে রাধা হচ্ছেন মানুষের দৈবীভক্তির রূপক, আর সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে তিনি ও কৃষ্ণ ঐশ্বরিক প্রেমনাট্যের পরমাত্মার দ্বৈত বিভাগের প্রতিনিধি। যখন বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর অন্যতম জীব গোস্বামী ষোড়শ শতকে রচিত তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ 'প্রীতিসন্দর্ভ'তে প্রীতি বা প্রেম ভক্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন তিনি মহাসুখ বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের হেতুরূপে হ্লাদিনীশক্তি বা সক্রিয় সুখের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। অধুনা এমন ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম নয় যাঁরা একে দান্তের বেয়াত্রিচে-অর্চনার অন্তস্থ 'ইরোটিক' তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করবেন। অবশ্য তুলনাটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য। যাঁরা প্রাচীন খ্রিস্টীয় 'ফাদার'দের বিশেষত অরিগেন-এর অনুসরণে হিব্রু *সং অব সংস*-এ সলোমন ও শুলামাইট কুমারীর কাহিনিতে খ্রিস্ট ও গির্জার রূপক দেখবেন তাঁরা এই ধরনের ব্যাখ্যায় মধ্যযুগের খ্রিষ্টিয় কবিতার মধ্যস্থ স্বর্গীয় রমণীর রূপক দর্শনে উৎসাহিত বোধ করবেন। কিন্তু *ভিতা নুওভা* ও *ডিভাইন কমেডি*-র বেয়াত্রিচে কোনও রূপক নয় : তিনি এক কুমারী, যেমন *সং অব সংস*-এর নায়িকাও এক কুমারী। দান্তের রমণী যে আলোক ও প্রেমরূপে মহিমান্বিতা তা হল শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-কল্পনার লীলা এবং তার কিছুই *সং অব সংস*-এর রচয়িতার মধ্যে ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিক ও কবির রাধা বা প্রধানা

গোপিনী পরমাত্মার এক আবশ্যিক গুণের সুস্পষ্ট রূপক। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের রাধা হচ্ছেন বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও বিষ্ণু-পুরাণের শ্রী। জীব গোস্বামীর 'প্রীতি-সন্দর্ভ'-র হ্লাদিনী শক্তি দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব দর্শনের মুলাপ্রকৃতি তন্ত্রের এই রূপকের সঙ্গে অভিন্ন। জঘন্য চর্চায় স্থূল আসক্তির অনুমোদনরূপে এই মতবাদ যখন নিন্দিত হয় তখন কোনক্রমেই স্বর্গীয় রমণীর আদর্শ সেখানে স্থান পায় না।

বাংলা সাহিত্যে দান্তের প্রভাব কেন খুব গভীর বা ব্যাপক হতে পারেনি তার কারণ বুঝতে চেষ্টা করলে এ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সেই প্রভাবের পটভূমিকে বোঝার চেষ্টাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় কবিতায় এমন সব একালীন মানবিক উপাদান আছে যা ভারতীয় কাব্যকে কেবল তার আধুনিক পর্বেই প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের মধ্যযুগের ভাবধারা ইতালির মধ্যযুগের ভাবধারা থেকেও আরও বেশি মধ্যযুগীয়। স্বর্গীয় রমণীর এই বোধগম্য মানবিক ভিত্তি ছাড়াও দান্তের কবিতায় দুটি জিনিস আছে যা আমরা আমাদের মধ্যযুগের কাব্যে দেখি না : তা হচ্ছে কবির তীব্র সামাজিক সংশ্রব, যা প্রকাশ পায় একটি ব্যাপক মানবস্থিত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পাপের সম্পর্কে সমান তীব্র সচেতনতা। আমাদের মধ্যযুগের 'ভক্তি'-কাব্য সম্পূর্ণতই ধর্মাশ্রিত কাব্য, ভক্তি ও মুক্তির কাব্য : তা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভীষ্টের সমগ্রতার কোনও ছক দেখায় না। ফলত আমাদের মধ্যযুগের ভক্ত-কবি একমাত্র যে পাপের কথা জানেন তা হচ্ছে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাপ। তাঁর সুখের বিশ্বে কোনও দুরাচারী ও উদ্ধারযোগ্য যাতনা ভোগের কোনই স্থান নেই। নরকের বিষাদের কোনও ধারণাই বৈষ্ণব কবির নেই : তিনি জানেন কেবল ভাসমান মেঘের কোমল ছায়া যা উজ্জ্বলতর দিনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সুতরাং দান্তে তাঁর মানবতাবাদ, নৈতিক আবেগ ও বিষাদের গভীর বোধের কিছুটা দিতে পেরেছিলেন আমাদের আধুনিক কবিদের একজনকে। সে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। উনবিংশ শতাব্দীর এক বাঙালি কবির উপর ইতালীয় প্রভাব বেশ অসম্ভব প্রভাব বলেই মনে হয়, এমন কি সাহিত্যিক ঋণের বিচক্ষণ আবিষ্কর্তার কাছেও। কারণ এই সমগ্র শতাব্দী ধরেই ভারতীয় কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রধানত ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো শেকসপীয়রের পরিবর্তে রাসিন-ই বাঙালি কবির প্রেরণাদাতা হতেন, যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লাইভের পরিবর্তে দুপ্লে জয়লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ভারতীয় কাব্যক্ষেত্রে দান্তে ও তাসো-র কোনও অবদানের সুযোগ ছিল সুদূরপরাহত। কেননা ইতালীয় কোনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতায় ইংরাজি অনুবাদেও ইতালীয় কবিতা সম্পর্কে লোকের সামান্যই ধারণা ছিল, অবশ্য রে. এইচ এফ কেরি-র *ডিভাইন কমেডি* ১৮১৪-তে প্রকাশিত হয়, এবং টমাস ক্যাম্পবেলের *লাইফ অব পেত্রার্ক* চতুর্থ দশকে ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গত শতকের ষষ্ঠ দশকে যখন বাঙালি কবি ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে ফিরল তখন স্বভাবতই তার দৃষ্টি পড়ল ইংল্যান্ডের কাব্যের উপর। নব্য ধারায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮ খ্রি)-এর ভূমিকায় ইংরাজি পদ্যের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন ও সহযোগী কবিদের কাছে চমৎকার এক আদর্শরূপে একে তুলেও ধরেছেন। এর চার বছর আগে প্যারাডাইস লস্ট-এর কয়েক সর্গ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৫৪ খ্রি); অবশ্য ইংরাজি রচনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর হচ্ছে ১৮৪০-এর আগে কোনও সময়ে প্রকাশিত তারাশঙ্কর তর্করত্নের *রাসেলাস*।

তাই এটা লক্ষ করলে অবাক লাগে যে প্রথম ইউরোপীয় কবির প্রশস্তিমূলক কবিতা রচিত হয়েছিল দান্তের ওপর। এবং দ্বিতীয় এ জাতীয় কবিতা পেত্রার্ক-এর ওপর রচিত। দু'টিই ভার্সাই'তে রচিত মাইকেল মধুসূদনের সনেট এবং কলকাতায় ১৮৬৬-তে প্রকাশিত তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলির

মধ্যে সংকলিত। আমাদের সাহিত্যে ইংরাজি উপাদানের উপর সংগত গুরুত্ব প্রদানের ফলে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির মধ্যে এই ইতালীয় উপাদান বেশ কিছুটা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। শতাব্দীর অষ্টম দশকে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি দেশপ্রেমিককে 'ইতালীয় ঐক্যের দূত' মাৎসিনির আদর্শ অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করছিলেন সে সময়ে আদিতম বাংলা স্বদেশি গানগুলির অন্যতমটির বয়স দশ বছরের বেশি। তা হচ্ছে ভার্সাইতে রচিত ও Vincenzo Filicaia-র বিখ্যাত সনেট Italia-র দ্বারা প্রভাবিত একটি সনেট — চতুর্দশপদীপদাবলিতে 'ভারতভূমি' নামে তা পরিচিত। কবিতার শীর্ষে মাইকেল ইতালীয় সনেটটির প্রথম দুটি চরণ motto হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন ও তার নীচে নিজকৃত বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন। স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি ইতালীয় ভাষায় কবিতাটি পড়েছেন এবং চাইল্ড হ্যারলডস পিলগ্রিমেজ-এর চতুর্থ সর্গে এর বায়রন-কৃত অনুবাদের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়নি। তিনি যে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি— মেকলের এই অতিরঞ্জিত প্রশস্তির দ্বারা মাইকেল Filicaia (১৬৪২-১৭০৭)-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। এই বাঙালি কবি নিজের কল্পনার দাবিতে কেমন করে ইতালীয় আদর্শের বিভিন্ন রূপকল্পকে মানিয়ে নিয়েছেন তা স্মরণীয়। Filicaia -র সনেটে একটি চরণ আছে : Che in fronte scritti per gran doglia porti। বায়রন এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছিলেন : On thy sweet brow is sorrow ploughed by shame। মাইকেল লিখেছেন : 'রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে, / সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি।' বলা হয়েছে Filicaia-র এই সনেটটির স্থান 'ইতালীয় সাহিত্যে প্রায় সেই রকম, Vaudois-র হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত মিলটনের সনেটটির স্থান ইংরাজি সাহিত্যের যেমন।' মাইকেলের এই সনেট যদিও স্বাদেশিক সংগীতরূপে তত জনপ্রিয় নয়, তথাপি এর গুরুত্ব হচ্ছে এই ধরনের আদি কবিতাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম এবং কবির উপর ইতালীয় প্রভাবের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখের উপযুক্ত।

১৮৬৫-র মে মাসে যখন ইতালিতে দান্তের জন্মের ষষ্ঠ শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন সেই উপলক্ষে কবিগুরু দান্তের ওপর মাইকেলের সনেটটি রচিত। তিনি নিজের সুন্দর হস্তাক্ষরে এই বাংলা সনেটটি ও তার সঙ্গে নিজকৃত ফরাসি অনুবাদ ইতালির রাজার কাছে প্রেরণ করেছিলেন, সেই সঙ্গে ফরাসি ভাষায় ইতালি-রাজকে একটি পত্রও দিয়েছিলেন। সেই সংক্ষিপ্ত পত্রটি ১৮৬৫-র ৫মে তারিখে লেখা :

মহাশয়

জনৈক সামান্য পদ্যকার, যে নিজেকে কবি আখ্যা দিতে সাহস করে না, গঙ্গার তীরে যাহার জন্ম এবং ইতালীয় কাব্যের জনকের একজন পরম অনুরাগী, — হে মহামহিম, এই পত্রের সহিত সে একটি বাংলা সনেট আপনাকে উপহার দিবার অধিকার গ্রহণ করিতেছে। আপনার আনুকূল্যে সমগ্র ইতালি যে মাল্যের দ্বারা যশস্বী দান্তের সমাধিটি অলংকৃত করিবে, ক্ষুদ্র এই প্রাচ্যদেশীয় ফুলটিও যেন তাহার সহিত যুক্ত হয় — এই তাহার ইচ্ছা।

যখন তিনি নিজেকে ইতালি-রাজের কাছে সামান্য পদ্যকার রূপে পরিচিত করেন তার পূর্বেই তিনি আপন মাতৃভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের প্রবর্তক রূপে, তাঁর কালের বাংলা কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিরূপে এবং ইউরোপীয় আদর্শে নাটকের লেখকরূপে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। ওই পত্রে যে বিনয় প্রকাশ পেয়েছে তা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের দ্যোতক। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় একই উপলক্ষে দান্তের উপর টেনিসন-এর কবিতায় প্রকাশিত বিনয়ের, যার মধ্যে টেনিসন নিজেকে কল্পনা করেছেন 'wearing but the garland of a day'।

মাইকেলের সনেটটি অবশ্য প্রচলিত কাব্যপ্রশস্তি অপেক্ষা গভীরতর কিছু নয় : 'নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি / (তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে / খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি / প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে / অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে। / নব কবি-কুল-পিতা তুমি,

মহামতি, / ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে / পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী। / দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে, / সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে / যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে / পাপ, প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে, / যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে / এ নক্ষত্র? কোন কীট কাটে এ কোরকে ?'

এই প্রশস্তিতে দু'টি বিষয় লক্ষ করার যোগ্য। এটি এমন একজন কবির প্রশস্তি যিনি মূলত নবজাগরণের প্রভাত নক্ষত্ররূপে, কাব্যে নতুন যুগের উদ্বোধকরূপে উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, এটি কবির প্রশস্তি যাঁকে কাব্যলক্ষ্মী নরকে বিচরণের অনুমতি দিয়েছেন। প্রাচ্যদেশে পরবর্তী নবজাগৃতির কবিরূপে মাইকেল স্বয়ং তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য *মেঘনাদবধ* কাব্য-এ 'নিম্নে আঁধার অবতরণে' অগ্রসর হয়েছেন এবং এ বিষয়ে দান্তের কাছেই তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ইতালির রাজা দান্তের প্রতি এই ভারতীয় প্রশস্তিতে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আপন সচিবের সহায়তায় তাঁর এই উত্তর পাঠিয়েছিলেন :

> মহামহিম সম্রাট গভীর পরিতোষের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন যে ইতালীয় প্রতিভার গভীর ও মহান সংগীত গঙ্গার তীরেও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে এবং প্রাচ্যদেশীয় যে ফুলটি আপনি অ্যালিগিএরি-র সমাধিতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাকে তিনি স্বাগত জানাইতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের মিলনের যোগসূত্ররূপে ইতালি তাহার শুভজনক ভাগ্যকে চরিতার্থ দেখিতে পাইবে, সেই সময়ের অধিক বিলম্ব নাই।

মাইকেলের সনেটের সবগুলি অবশ্য সমান সফল নয়, কিন্তু তারা কখনওই ছন্দোবন্ধে বা প্রকাশগত পরিমিতিতে দরিদ্র নয়। দান্তে অপেক্ষা পেত্রার্ক-ই ছিলেন তাঁর আদর্শ। দান্তে ও পেত্রার্ক-এর সনেট থেকে মাইকেলের সনেটের মৌল পার্থক্য যত না রূপাঙ্গিকগত তার চেয়ে বেশি মেজাজগত। একথা সত্য যে পেত্রার্ক-এর সনেট আঙ্গিকগত শুদ্ধিতে এ জাতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পেত্রার্ক ও দান্তে উভয়েরই প্রকাশের গভীর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাঁদের রূপদক্ষতা ইউরোপীয় কাব্যে যে কারণে অনন্য তা হচ্ছে তাঁরা সনেটের হ্রস্ব পরিসরে এত অধিক প্রকাশে সক্ষম। বিশেষ করে পেত্রার্ক-এর ছিল বিচলিত ও নিরুপায়ভাবে বিক্ষিপ্ত অন্তরাত্মা এবং দেহ ও আত্মার পরস্পরবিরোধী দাবির চাপ থেকে এসেছে তাঁর গীতিস্বভাবের তীব্রতা। তাঁর সনেটের বিষাদাচ্ছন্ন সুর এই নৈতিক পীড়নের কাব্যরূপী অভিব্যক্তি এবং অভিজ্ঞতার যে গভীরতা এগুলির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল তা ইউরোপের কল্পনাকে বেশ নাড়া দিতে পেরেছিল। ইউরোপে মাইকেলকে বেশ কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছে, কিন্তু ইতালীয় কবিদের আত্মিক ও নৈতিক পীড়ন তাঁর ছিল না। অধিকন্তু বাস্তব বা কল্পনার কোনও বেয়াত্রিচে অথবা লরা-ও তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর ফরাসি স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতেন, তাঁকে আন্তরিক ভালোবাসতেন, কিন্তু তাঁকে সম্বোধন করে কোনও সনেট রচনা করেননি। প্রেমমূলক দুটি মাত্র সনেট তিনি রচনা করেছেন কিন্তু তারা কোনও গভীর ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করেছে মনে হয় না। চতুর্দশপদী কবিতাবলির এক শ' দু'টি সনেট বিবিধ বিষয় নিয়ে লিখিত হয়েছে — দান্তে, পেত্রার্ক, টেনিসন, ভিক্টর হুগো ইত্যাদি বিশিষ্ট ইউরোপীয় লেখকদের ওপর কিছু, বাল্মীকি, কালিদাস ও জয়দেব প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের নিয়ে কিছু এবং কয়েকজন বাঙালি কবি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি বন্ধুদের নিয়ে লেখা। অন্যান্য বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক বা সাহিত্যিক, কিন্তু কোনওটাই তাঁকে গীতিকাব্যিক আত্মকথনে প্রবৃত্ত করেনি। আত্মিক দিক থেকে তিনি সম্ভবত পেত্রার্কীয় হতে অক্ষম, আবার দান্তের গভীর বিষাদে প্রবেশেও অসমর্থ। তবু মাইকেল নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাব প্রকাশের উপায় হিসাবে সনেট রীতিকে একটি নিখুঁত মাধ্যম করে তুলতে অবশ্যই সফল হয়েছেন। নিজ কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় রূপাঙ্গিক অবলম্বন করার সহজ দক্ষতা তাঁর ছিল এবং তা তিনি সরাসরি তাঁর

ইতালীয় গুরুদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ইংরাজ অনুকারীদের কাছ থেকে নয় — বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। পেত্রার্ক-কে নিয়ে রচিত সনেটটিতে মাইকেল বলেছেন ইতালীয় কবি কাব্যের খনিতে এই ক্ষুদ্র মণি পেয়েছিলেন ও একে স্বর্ণমন্দিরে বাণীর চরণে প্রদান করেছিলেন। মাইকেল আপন কাব্য-ঐতিহ্যে একে পাননি, কিন্তু যে দক্ষতার সঙ্গে একে মৃত্তিকান্তরিত করেছিলেন তাতে বোঝা যায় ভারতীয় কবি ইতালীয় কাব্যের দ্বারা কতখানি সৃষ্টিশীলভাবে উদ্দীপ্ত হতে পেরেছিলেন।

মাইকেল যখন তাঁর প্রথম নাটক রচনা করেন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে 'এতে বিদেশি ভঙ্গি কিছুটা আছে'। কিন্তু সাহিত্যে বিদেশি প্রভাব বিষয়ে একটি থিয়োরি তাঁর ছিল যাতে একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ এবং অন্যদিকে অভিপ্রায় ও অবয়বের সৃজনমূলক সমন্বয়, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রচিত হয়েছে। বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রশ্ন করেন : 'প্রাচ্যের ভাবধারায় পূর্ণ বলে কি তুমি মূর-এর কবিতা অপছন্দ করো অথবা এশীয় ভঙ্গির জন্য বায়রনের কবিতা, বা তার জর্মানত্বের জন্য কার্লাইলের গদ্য?' একই পত্রে তিনি লেখেন : 'মনে রেখ আমি আমার দেশবাসীর সেই অংশের জন্য লিখছি যারা আমারই মতো চিন্তা করে, যাদের মন কম বেশি পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে ও চিন্তাধারায় পরিপ্লুত ; সংস্কৃত মাত্রেরই দাস সুলভ প্রশস্তি করতে করতে যে শিকল তৈরি হয়েছে তাকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে, এই হচ্ছে আমার মতলব।' উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের সর্বাগ্রবর্তী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বরূপে তাঁর নবীন ভাবরাজি ও আবেগকে ধারণ করতে সক্ষম এমন রূপাঙ্গিকগত নবীনতার প্রবর্তন করা প্রয়োজন হয়েছিল এবং তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি নূতন আদর্শের সন্ধান করেন কেবল ইংরাজি সাহিত্যে নয়, সমগ্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যে ও বিশেষভাবে ইতালীয় কাব্যে। এভাবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সাহিত্যে যে আমাদানি করা বস্তু তা তিনি মনে করতেন না। তাঁর একটি পত্রে তিনি বলেছেন : 'সাহিত্য, সংক্রান্ত বিষয়ে আমার এতই আত্মগরিমাবোধ যে বিশ্বের সম্মুখে আমি ধার করা বসনে দাঁড়াতে অক্ষম।' যখন তিনি তাঁর মহাকাব্যখানি রচনা করছিলেন তখন আর এক পত্রে তিনি লেখেন : 'আমি বাল্মীকি, ব্যাস, ভার্জিল, দান্তে, তাসো ও মিলটনের ছাড়া কারও কাব্য পাঠ করিনি। এই সব কবিগুরু যে কাউকে প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করতে পারেন যদি প্রকৃতি তার উপর প্রসন্না হন।' এই চিঠির তারিখ ১ জুলাই ১৮৬০ এবং নিজের স্বীকৃতি অনুসারে তিনি তখন পর্যন্ত ইতালীয় ভাষায় কোনও বুৎপত্তি লাভ করেননি। অবশ্য তার এক বছরের মধ্যেই তিনি তা শিখে ফেলেন। ১৮৬০-এর অগস্টে লিখিত এক পত্রে তিনি লেখেন : 'আমি ইতালীয় অত্তেভো রাইমা-র মতো একটি স্তবক গঠন করতে ও তা দিয়ে একটি রোমান্টিক কাহিনি লিখতে চাই।' তিনি তখন ঐ ভাষা পাঠ করার মতো জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। প্রায় এক বছর পরে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন : 'আমি সদ্য মূল তাসো পড়ছি, জনৈক ইতালীয় ভদ্রলোক আমাকে এক কপি উপহার দিয়েছেন। ওঃ কী মধুর কাব্য! ঈশ্বর যদি আমাকে আরও কয়েক বছর নিষ্কৃতি দেন, আমি একটি কাব্য লিখব, অত্তেভো রাইমা বা আট চরণের এই রকম স্তবকে একটি রোমান্টিক আখ্যান। হয়তো ওই ছন্দে তোমার 'সিংহল বিজয়' লিখব।' অবশ্য সে কাব্য কখনওই লেখা হয়নি এবং মনেও হয় না এ জাতীয় ছন্দে তাঁর কোনও স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্বচ্ছন্দ অমিত্রাক্ষর নিশ্চয়ই ক্রমশ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে অন্য যে কোনও ছন্দের পরীক্ষা বিপজ্জনক হতে পারে।

যাই হোক, মাইকেলের কাব্যে দান্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব হচ্ছে তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর অষ্টম সর্গে। এখানে তিনি রামায়ণ থেকে এক গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, এবং এ উদ্ভাবনের মূলে আছে ভার্জিল ও দান্তের প্রভাব। ইতালি-রাজের কাছে প্রেরিত তাঁর দান্তে বিষয়ক কবিতাটির লিপিতে মাইকেল দান্তে প্রসঙ্গে বায়রনের কথা উদ্ধৃত করেছেন : 'ইতালির মহান কবি পিতা' ('the great poet-sire of Italy') এবং তারপর ইনফেরনো থেকে দু-চরণ তুলে দিয়েছেন যা *মেঘনাদবধকাব্য*-র

অষ্টম সর্গের ভেতরে আক্ষরিকভাবে অনূদিত হয়েছে। চরণ দুটি নরকের দ্বারে খোদাই করা লিপি থেকে নেওয়া :

Through me among the people lost for aye.
All hope abandon, ye who enter here.
(এই পথ দিয়া যায় পাপী দুঃখ-দেশে চির দুঃখ ভোগে; —
হে প্রবেশি, ত্যাজি' স্পৃহা প্রবেশ এ দেশে!)

এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বাংলা মহাকাব্যখানির অষ্টম সর্গ নরকের ও তার অধিবাসী ভ্রষ্টাচারীদের বিবরণে পূর্ণ এবং বাংলা কাব্যে দান্তের প্রভাবের এটিই আদিতম উদাহরণ। সংস্কৃত রামায়ণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লক্ষ্মণের ত্রাণের জন্য একটি পর্বত থেকে হনুমান কর্তৃক বিশল্যকরণী আনীত হয়েছিল। মাইকেল ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছিলেন রামচন্দ্রকে নরকে অবতরণ করিয়ে মৃত পিতার কাছ থেকে সঞ্জীবনী ভেষজ লাভের পরিকল্পনা করে। সংস্কৃত রামায়ণে এক শ্লোক আছে যা বাঙালি কবিকে নিজ কাব্যে এই নতুন আখ্যান সংযোগের সূত্র প্রদান করে থাকতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণ মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পর রামচন্দ্র ভাইকে মৃত মনে করে বলেছেন :

যথৈব মাম্ বনম্ যান্ত মনুযতি মহাদ্যুতিম্ অহমপ্যানুযস্যামি তথৈব ইনম্ যমক্ষয়ম্।
(আমি আমার ভাইকে মৃত্যুদেশে অনুসরণ করব যেমন সে আমাকে বনে অনুসরণ করেছে)

কিন্তু মূল রামায়ণে রামচন্দ্র নরকে অবতরণ করেননি। মাইকেল দান্তের ইনফেরনো-র সাদৃশ্যে আখ্যান উদ্ভাবন করেছেন যা তাঁকে পাপ ও শাস্তির বিবরণের একটা আদর্শ প্রদান করেছে। মাইকেল ভার্জিলের ঈনিদ-এর ষষ্ঠ সর্গের দ্বারাও নিশ্চয় প্রভাবিত হয়ে থাকবেন যেখানে ঈনীস কুমেন্‌সিবিল-এর সহযোগে নরকে অবতরণ করে। চরম যন্ত্রণাদায়ক নারকীয় নিগ্রহের চিত্র হিসাবে বাংলা মহাকাব্যখানির অষ্টম সর্গ ভার্জিল অপেক্ষা দান্তের কাছেই অধিক ঋণী। এবং এর কারণ দান্তের রচনার সঙ্গে পরিচয় হেতু কবির অন্তর্জগৎ নৈতিক আবেগের তীব্রতা লাভ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মানস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক দৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করেছিল — তার অনুভূতিশক্তি এসেছিল যুগের আবেগগত অনুপ্রাণনা থেকে এবং তার সংঘাত ও জটিলতা, কাব্যের মধ্যে তাকে মূর্ত করে তোলার ভাবনা এসেছিল *ডিভাইন কমেডি* থেকে।

দান্তের উপর মাইকেলের সনেট রচনার প্রায় তেরো বছর পর বাংলা সাহিত্যপত্র ভারতী-তে 'বিয়াত্রীচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য' নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধ ও তৎসহ *ডিভাইন কমেডি* ও *ভিতা নুওভা* থেকে অনূদিত কিছু কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মোটের উপর দান্তের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সফলভাবে আলোড়িত হতে পারেননি। এ সম্পর্কে ১৯২৪ সালে চিনদেশে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি স্বীকার করেছেন—

> তরুণ বয়সে আমি দান্তের কাব্য পাঠে সচেষ্ট হই, দুর্ভাগ্যবশত একটি ইংরাজি অনুবাদের মাধ্যমে। আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই এবং এ ব্যাপারে নিবৃত্ত হওয়াই পবিত্র কর্তব্য বলে বোধ করি। সেই থেকে দান্তে আমার কাছে বন্ধই রয়ে গেলেন।

এটা সহজেই বোঝা যায়, কারণ রবীন্দ্রনাথের নৈতিক দৃষ্টিতে নরকের কোনও স্থান ছিল না — তাঁর কাছে কল্যাণের অর্থ ঐশ্বরিক করুণাপ্রভাবে স্বর্গলোকে উত্তরণ নয়, বরং তা হচ্ছে পূর্ব নির্দিষ্ট সৃষ্টিশৃঙ্খলার অবদান; যন্ত্রণাদায়ক কঠোর নিগ্রহের সুখপ্রসূ উপসংহার নয়, বরং স্বর্গীয় বিধানে নির্ধারিত মানবাত্মার এক উন্নয়ন যেখানে পাপের কোনও স্থান নেই। এই ব্যাপারটির প্রতি উব্লিউ বি. ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯১২-তে লন্ডনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ভারতীয় কবির জগৎ থেকে পাপবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত টমাস এ কেম্পিস-এর জগৎ একেবারে পৃথক। এর প্রায় বিশ বছর পরে নরওয়ের লেখক জোহান বয়ার বলেছিলে যে, রবীন্দ্রনাথ

যেন, সেই ভারতবর্ষ যে ইউরোপের কাছে নতুন এক স্বর্গীয় প্রতীক নিয়ে এল— ক্রুশ নয়, কমল।' তথাপি অংশত ব্রহ্মনীতিবাদে পাপ চেতনার জন্য এবং অংশত উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবনধারার আত্মিক জটিলতার জন্য মাঝেমধ্যে ও সীমাবদ্ধ পরিমাণে রবীন্দ্র-চিত্তেও পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উপলব্ধি ছিল। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ১৮৯৭-এ রচিত ও কাহিনি-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯০০-তে প্রকাশিত নাট্যকাব্য 'নরকবাস'। এ এক রাজার কাহিনি যিনি তার পুরোহিতের নিষ্ঠুর আদেশে নিজ শিশুপুত্রকে অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দিয়ে আপন রাজধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পরে অনুতপ্ত পিতা উপলব্ধি করতে পারেন এই পুত্রাহুতি কেবল তাঁর রাজকীয় আত্মাভিমান ছাড়া কিছুই নয় এবং নিজ গৌরববৃদ্ধির জন্য তিনি পিতৃস্নেহের পবিত্র নীতিই লঙ্ঘন করেছেন। যখন তিনি স্বর্গাভিমুখে চলেছেন তখন পথে নরকে তাঁর পুরোহিতকে দেখতে পেলেন এবং নিজেকেও সমতুল্য পাপী বিবেচনা করে নরকবাসের সিদ্ধান্ত করলেন। এখানে নরকের বর্ণনায় ইনফেরনো-র ভয়ংকরতার কিছুটা ফুটেছে। এডওয়ার্ড টমসন এটা লক্ষ করেছেন ও বলেছেন : Nothing could be better than the atmosphere of vagueness a misty region of voices of Dante's Hell, with which 'A Sojourn of Hell' opens.

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী' (১৮৮০-তে প্রকাশিত-র ভূমিকায় কবি বলেছেন দান্তের কাছে তাঁর ঋণের পরিমাণ আখ্যাপত্রে মুদ্রিত motto থেকে স্পষ্ট হবে। সে motto স্পেন্সার-এর কবিতা থেকে উদ্ধৃত :

I follow here the footing of thy feet
That with thy meaning so I may thee rather meete.

ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকা কাব্যখানির কথা উল্লেখ করেছিলেন এই মন্তব্যসহ :

'কাব্যখানির প্রকৃতি এর নাম থেকেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। এর মধ্যে নরকের বিভীষিকার চিত্র রয়েছে।' কাহিনি হচ্ছে এই —

এক পিতা তাঁর প্রিয় দুহিতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে শ্মশানভূমিতে বীভৎস প্রেত ও পিশাচদলের সাক্ষাৎ লাভ করেন—মৃত্যুর পরে মানবাত্মার পরিণাম কী, এই পীড়াদায়ক জিজ্ঞাসায় তাঁর অন্তর বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। এমন সময় এক দেবীর আবির্ভাব ঘটে, তিনি শোকাতুর পিতাকে কন্যার সৎকার করতে অনুরোধ করেন। সৎকারের পর এই দেবী লোকটিকে মৃত্যুলোকে নিয়ে গেলেন — সেখানে নীরো, এ্যান্টনি, ক্লিওপেট্রা প্রমুখ অনেক নিগৃহীত পাপাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। অতঃপর এই স্বর্গীয় পথপ্রদর্শিকার সহায়তায় তিনি মর্তলোকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সহসা দেখতে পেলেন সেই দেবী তাঁরই কন্যা। এই আখ্যান বাস্তবিকই হিন্দু মানসে *ডিভাইন কমেডি*-র প্রভাবের এক চমৎপ্রদ উদাহরণ।

সম্ভবত দান্তে আমাদের কবিতায় ও কথাসাহিত্যে গভীরতর ও ব্যাপকতর প্রভাব হয়ে উঠবে যখন ভারতীয় ধর্মীয় কল্পনা মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে নৈতিক বিশ্বের সংজ্ঞা প্রদানের নতুন চেষ্টা করবে। সে উদ্যমে কবিতা ও দর্শনে এক সন্ধি স্থাপিত হবে এবং তা প্রায় অনিবার্যভাবে আমাদের চিত্তকে দান্তের সৃষ্টির দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে।

700th Anniversary of the Birth of Dante : A souvenir (Department of Modern European Languages, University of Delhi), 1965 থেকে ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের অনুমতিক্রমে তাঁর 'Dante in Bengali Literature' প্রবন্ধের অনুবাদ।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
(দান্তে বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৩)

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টি

আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোর যে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় সেই বাড়িতেই উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। নিরবধি কালের পটে মাত্র আশি বছরের সীমারেখাতে তিনি দেহধারণ করে গেলেন। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের পক্ষে এই সময়কাল যেন এক পা তুলে আর এক পা ফেলা। কিন্তু এক পা ফেলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস যে কতগুলি যুগ এগিয়ে গেল তা একদিন ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ বিচার করবে। ভবিষ্যতের মানববংশের কানে কবির সেই অলৌকিক বাণীপুঞ্জ যখন তাঁর আপন কালের বিশেষ কথাটি জানাবে তখন একই সঙ্গে তার মধ্যে গুঞ্জিত হতে থাকবে কবির অতীতকাল, স্মৃতিতে আক্রান্ত, বিধুর ও জ্বলন্ত। সেই যে তিনি অতীতের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও। ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।' — সেই ভাষাই তিনি জুগিয়েছেন অতীতের মুখে। তাই আজ আমাদের দেশে সংস্কৃতি-সম্পন্ন এমন ব্যক্তি পাওয়া কঠিন 'পিতামহদের কাহিনী' সম্বন্ধে যাঁর কল্পনা কোনও-না কোনওভাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আলোকিত নয়।

রবীন্দ্রনাথের জৈব-অস্তিত্ব একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁর অলোকসামান্য চেতনা স্বচ্ছন্দে বিহার করেছে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে। এই ইতিহাস যতদিনের, তাঁর চেতনার বয়সও বুঝি বা ততদিন। এবং ব্যাপক অর্থে সে-বয়স আরও বেশি— তার মানে যেসব স্থানে তিনি বলেছেন, 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' অথবা 'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে'—সেসব স্থানে তাঁর চেতনার বয়সের হিসেব কে-ই বা রাখে! কিন্তু অঙ্কের পরিমাপে যেখানে সে-হিসেব করা সম্ভব সেখানেও তাঁর চেতনার গাছপাথর বের করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের শিরা-ধমনীতে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হত তা-ই যেন শয়নে স্বপনে দৈনন্দিনকার হাজারো কাজকর্মের মধ্যেও সেই অতীতকে বয়ে বেড়াত। সেই স্রোতের টানে অতীতের কত ঘটনা নতুন তাৎপর্য পেয়েছে, যেমন কচ বা কর্ণ মূল কাহিনির বাঁধন আলগা করে নতুন রূপ ধরে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে — এমনকি 'গান্ধারীর আবেদন'-এ দুর্যোধনও আপন লক্ষ্য নির্ণয়ে অকপট তথা সৎ, আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতায় পৌরুষে ভরপুর এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমনীষায় যে আধুনিকতা বিকশিত হয় সেই মূল্যবোধে অনন্য। অবশ্য এ-কথা একশোবার সত্য যে, কাব্যরচনায় যে স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ ইতিহাসের বিচার করবার বেলায় তা একেবারে অচল। পক্ষান্তরে একথাও কি সত্য নয় যে ঐতিহাসিকমাত্রেই আপন বিবেচনার দ্বারাই কতকগুলি ঘটনাকে স্বপক্ষে ও কতগুলিকে বিপক্ষে দাঁড় করান এবং ঘটনা নির্বাচনের ব্যাপারটা বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্বের উপরেই নির্ভরশীল?

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ঐতিহাসিকদেরই একজন হলে আপন ব্যক্তিত্ব অনুসারে ঘটনার শুধু বিন্যাস করেই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু তিনি একজন দ্রষ্টাও বটে। সেই বিশেষ অর্থেও তিনি একজন দ্রষ্টা যে-অর্থে অল্প ক'জন ক্ষণজন্মা ঐতিহাসিককেও আমরা দ্রষ্টা বলে থাকি। উপরন্তু তিনি অমর্ত্য প্রতিভাসম্পন্ন আশুচেতন কবি, তাঁর বুকের নিভৃত কেন্দ্রে জ্বলছে এক মহান দেশের সুদীর্ঘ সাধনা। এই দেশের কোনও ঘটনাই তাঁর সত্তার থেকে সম্পর্কশূন্য নয়, কোনওটাই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত নয়, কোনওটাই তাঁর চোখে পুথির পাতার অনড় নীরক্ত সুদূর তথ্য নয়, বরং সব কিছুকেই প্রশ্বাসের মতো টেনে নিয়েছেন নিজের ভিতরে, তারপর তার থেকে তত্ত্বটুকু নির্যাসের মতো গ্রহণ করে,

স্বীকার করে, বাকিটুকু ত্যাগ করেছেন নিঃশ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।' বাইরের উপকরণ সকলের মনের মধ্যে নতুন রূপ পায় এটা ভাবা ভুল, কিন্তু স্রষ্টার চিত্তে নিশ্চয়ই পায়। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাবলি 'আর-একটা জগৎ' হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা সিদ্ধ জগৎ নয়, তাকে সাধ্য বলাই সমীচীন। বাস্তবের নয়, তা একান্তরূপে সাধনার জগৎ। সেজন্যে মানতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চা তত্ত্বপ্রধান। কিন্তু স্বীকৃতিটুকুকে অভিযোগ হিসেবে খাড়া করতে গেলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্যকে মাত্র একটি পথে বেঁধে রাখতে হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু এসে যাক বা না-যাক অন্তত ইতিহাস-চর্চার পক্ষে সমূহ সর্বনাশ।

অতএব মোদ্দা কথাটা দাঁড়ালো এই, যে প্রক্রিয়ার বশে রবীন্দ্রনাথ শিল্প সৃষ্টি করেছেন সেই একই প্রক্রিয়ার বশে তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন। তবে তিনি তো পেশাদার ঐতিহাসিক নন, তাঁর ইতিহাস রচনার অর্থ ইতিহাস সম্পর্কে ইতস্তত কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা। সে ধরনের রচনায় সত্য যতখানি স্থান পেয়েছে তার চাইতে আরও বেশি স্থান পেয়েছে সেই জিনিস যাকে তিনি নিজেই 'গল্পসল্প'-এ চিহ্নিত করেছেন 'আরও সত্য' বলে। অবশ্য একথা বললে ইতিহাসের ছাত্রদের তরফ থেকে গুরুতর আপত্তি ওঠা খুবই সম্ভব। কেননা 'সত্য' বলতে নির্মল শীতল ঘটনাবলিকেই তাঁরা বোঝেন। পক্ষান্তরে 'আরও সত্য' বললে ব্যাপারটাকে এক সুসমঞ্জস কল্পনামাত্র মনে হয়। যদি আপাতচোখে দেখা যায় তবে প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথ যে ইতিহাস রচনা করেছেন সেটা এক সুসমঞ্জস কল্পনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা বিপরীত সুরের মধ্যে তিনি যে ঐকতান শুনতে পেয়েছেন, বাস্তব পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তা বোধহয় শোনা যাবে না। আজও অনেক ডাকসাইটে ঐতিহাসিকের মতে ভারতের মুসলমান যুগগুলি প্রক্ষিপ্ত, মুসলমান শাসনের থেকেই হিন্দুস্থান তার স্বাধীনতা হারিয়েছে। আধুনিক উৎপাদন প্রথাকে পশ্চিম হতে আগত ভৌতিক উৎপাত বলে ঠেকাবার চেষ্টা মহাত্মাজি জানপ্রাণ দিয়ে করেছিলেন; একালে ইংরেজির মতো আন্তর্জাতিক ভাষাকে দেশ হতে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে তার স্থলে বিশুদ্ধ হিন্দিকে বসাবার সরকারি উদ্যোগের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু তাই বলে কি রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিতে ভারতীয় ইতিহাসের যে-ঐক্যতান ধরা পড়েছিল তা একেবারে অবাস্তব কল্পনামাত্র? যখন কেউ বাইসাইকেলে চড়া শিখতে চায় তখন বারেবারে তাকে আছাড় খেতে হয়। তা দেখে যদি আর একজন বলে যে ওই আছাড়-খাওয়াটাই সত্যি আর মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জন্যে যে ভারসাম্য রাখছে সেইটে মিথ্যে তবে ধাঁধায় পড়তে হয় বৈকি। কারণ আমরা সবাই জানি যে ভারসাম্য রাখার মুহূর্তগুলোর মধ্যে যেসব ফাঁক পড়ছে সেসব ভরাট করে দিলেই সাইকলে চড়া হয়।

ভারতের ইতিহাস পতনে ও বিরোধে কতদূর বন্ধুর ও রোমাঞ্চকর সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল মুক্ত ও সজাগ, কোনও মোহ তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি নিজেই বলেছেন,

> প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য।... আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি সম্প্রদায়ের সহিত অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের।

রাজা-প্রজার অসামঞ্জস্য ইংলন্ডের ইতিহাসকে একদা চঞ্চল করে তুলেছিল, সুতরাং এক্ষেত্রে ইংলন্ডের ইতিহাস থেকে ভারতের ইতিহাসের পার্থক্য সুস্পষ্ট, কিন্তু ইংলন্ডের ইতিহাসের ছকে ফেলে আজও আমরা এদেশের ইতিহাসকে যাচাই করতে চাই। কিন্তু উপরের উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতকে পরিণত ও বিশদ করে তুললে এটাই প্রকাশ পাবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতি-সম্প্রদায়ের বিরোধ একটি অনস্বীকার্য নিদারুণ ও পুরাতন সত্য এবং সেজন্যেই বিভেদের মধ্যে ঐক্য একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার নয়, বরং তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঐকান্তিক সাধনাই ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। ঐক্যের অভাব আছে বলেই তো তা আমাদের অন্বিষ্ট। 'কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া ওঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে

ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।' পেশাদার ঐতিহাসিকগণের পক্ষে 'আজও তাহার সমাধান হয় নাই' বলা সম্ভব হত না। অথচ এই প্রয়াস ও সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া'। এই প্রক্রিয়াটিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, সমাধানটিকে সরিয়ে রেখেছেন লক্ষ্য রূপে। কালক্রমে আরও নানা সমস্যা এসে প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে তুলেছে, সে বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। 'যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে এই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব।' সেজন্য তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন: 'সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া।'

আমরা কি এখানে একজন ভবিষ্যৎ-দর্শী ঐতিহাসিকের পরিচয় পাচ্ছি না? অবশ্য ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁকে খাটো করে দেখবার একটা ঝোঁক কোনও কোনও পণ্ডিতের মধ্যে দেখা যায়। তার কারণ তাঁর প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক নিবন্ধগুলিতে নাকি অনেক তথ্যের ভুল আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই তথ্যকে বলেছেন ঘটনামূলক এবং সত্যকে বলছেন ভাবমূলক। ভারতবর্ষের মহাকাব্য পুরাণ ইত্যাদিতে পাওয়া যায় সত্যের নিদর্শন। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে যেমন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা সাংকেতিক কাহিনি, গাথা ও অনুষ্ঠানের মর্মভেদ করে জনসাধারণের পূর্ণতর ইতিহাস বের করা হয় তেমনই রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ দোহা ও কাহিনি, লোকসমাজের কিংবদন্তী , মহাপুরুষদের হেঁয়ালিপূর্ণ বচন ও দোহা প্রভৃতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং তার মধ্যে থেকেই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনন্য অভিব্যক্তিকে অন্বেষণ করেছেন। তাঁর চর্চার বিষয় ভারতের বিভিন্ন রাজপুরুষ বা শাসকদের কাহিনি তথা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়। কেননা তাঁর বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় সমস্যা এদেশের জনজীবনকে স্পর্শ করেনি—অন্তত ইংরেজদের আগমনের পূর্বে করেনি । তাহলে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচর্চার বিষয়টা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে সেটা হল ভারতবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির যথার্থ পরিচয়। এই দুটি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জনজীবনে যে-বিরোধ তাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রায় তিন-চার হাজার বছর ধরে আবর্তিত হয়েছে। সেই বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল ইংরেজদের অধীনতায়। কিন্তু সামান্য শত্রুর বিরোধিতায় যেমন ভারতবর্ষের সকল জাতি-সম্প্রদায় এক হয়েছিল, তেমনই আজ ইংরেজ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন সমস্যা পুনরায় ভিন্নতর রূপ নিয়ে ভারত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে কি মাথা তোলেনি?

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটির আচার্য যদুনাথ সরকার-কৃত ইংরেজি অনুবাদ 'My Interpretation of Indian History' *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় ১৯১৩-র অগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বের হয়েছিল এবং সমজাতীয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন 'A Vision of India's History'– দুটি প্রবন্ধের নাম দেখলেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যথাস্থিত রূপ বর্ণনা করার কোনও উদ্দেশ্যই রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কেউ যদি শিব গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে শিব গড়েন তাহলে তিনি কেন রুদ্র গড়লেন না এমন নালিশ শুনলে খুবই অদ্ভুত লাগে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে সাইকেল চড়তে শেখার সময় আছাড় খাওয়ার চাইতে ভারসাম্য রাখার চেষ্টাটাই বড় সত্য। দ্বন্দ্ব তো আছেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে, পুনঃপুন পতনও আছে এবং নিঃসন্দেহে পরিমাণের দিক দিয়ে সেগুলোই বেশি। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবাসী সমস্ত সংঘর্ষ ও স্খলনের উর্ধে ওঠার জন্যে যে প্রয়াস পাচ্ছে, যে সাধনা করছে রবীন্দ্রনাথের কাছে সেটাই প্রধান, সেটাই লক্ষণীয়, সেটাই শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর বিবেচনায় সেই প্রয়াস ও সাধনাকেই সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিছক অতীতচর্চার কোনও মূল্য নেই। যতক্ষণ না বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের ঘটনাবলি তার তাৎপর্য ও শিক্ষার আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না তা বর্তমানকে বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচায়, বর্তমানকে প্রেরণাহত করে, যতক্ষণ-না তা ভবিষ্যতের নিশানা দেয়, অন্ধকার পথ চলবার সময় আলো দেখায় ততক্ষণ ইতিহাস

পর্যালোচনার সার্থকতা কোথায়, ইতিহাস সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি শুধু এই মূল্যদণ্ডেই বিচার্য। 'স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া' দেখানো যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের তেমনই তাঁর ইতিহাসেরও আদর্শ। তাঁর সে ইতিহাস আমাদের সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেয় যে এদেশের উৎকৃষ্ট চিত্তগুলি যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে যাত্রা করেছিলেন সেখানে আজও পৌছানো যায়নি, সে-যাত্রাকে যেন অব্যাহত রাখা হয়, যেন পথ ভুল না হয়ে যায়, যেন আমরা লক্ষ্যভেদ করতে পারি। তিনি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন অতীত থেকে তা তো করতেই হবে—কিন্তু তাকে চালনা করেছেন ভবিষ্যতের অভিমুখে, কেননা একমাত্র সেখানেই রয়েছে তার স্বাশ্রয়ী সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বরাবরই সমন্বয়ের কল্পনাতে অভিভূত, সকল বাহ্যিক বিরোধের অন্তরালে একটি ঐক্যের শক্তি নিত্য সক্রিয় এ উপলব্ধিতে মহিমান্বিত। সেই একই কবিসত্তা যে ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথকেও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিসত্তাকে ঐতিহাসিকে রূপান্তরিত করেছে সে সময়ের ঘটনাবলি। প্রকৃতপক্ষে যা ছিল একটি কাব্যিক প্রক্ষোভ তাকে সুষ্ঠু ও তীব্র স্বদেশজিজ্ঞাসা করে তোলে তৎকালীন স্বদেশি আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নেমে পড়েন দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে। সবার হাতে রাখি বেঁধে প্রেমের পরিচয় দেওয়ার অপূর্ব কল্পনা করা তাঁর মতো কবির পক্ষেই সম্ভব। রাখি হল মিলনের প্রতীক। গান বাঁধা হল : 'এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।' কিন্তু দেশ যখন বিচ্ছেদের বিষাদে মুহ্যমান তখনও নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও ভেদাভেদ। নেতাদের সংকীর্ণতায় উত্যক্ত হয়ে সে-আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, দেশ যেখানে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, নানা আত্মঘাতী শক্তিতে বিদীর্ণ সেখানে স্বাধীনতার দাবি অনর্থক।

> একথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠেনাই, সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা—কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয়, তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না। এবং পশ্চিমে জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে পূর্ব প্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের মনে এ-বিষয়ে কোনও সংশয়ই ছিল না, যে বিভেদের উপরে নেতারা দেশের মঙ্গলের পরিকল্পনা করছিলেন তা একদিন চোরাবালির মতো সমস্ত আশা ও প্রযত্নকে গ্রাস করে নেবে।

এই তো সেদিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতার পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে মিছিল চালনা করেছেন, আবার তার থেকে মাত্র ছ'মাস পরেই তিনি বোলপুরের নির্জনতায় আশ্রয় নিয়েছেন, গান লিখেছেন, 'বিদায় দেহ ক্ষম আমায়, ভাই। কাজের পথে আমি তো আর নাই।' কী বেদনা! কী হতাশা! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। সেটা তাঁর ধাতেরই বিরুদ্ধে। এক দিকে যখন তাঁর প্রকাশ বাধা পেয়েছে তখন অন্যদিকে তা পথ খুঁজেছে। কোনও অবসাদই তাঁর উদ্যমকে ক্ষয় করতে পারেনি। তেরোশো বঙ্গাব্দের ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতন থেকে তিনি এক পত্রে বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে লেখেন :

> উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।

সেই প্রদীপটি হল দেশের ভাঙাচোরার মধ্যে সর্বমানবের মিলনের কল্পনা। বিভেদ, বিরোধ ও বিদ্বেষ যখন প্রবল আকার ধারণ করেছে তখনই মিলনের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে সবচাইতে উচ্চ ও তীব্র হয়ে

উঠেছে। ঘোর তামসিকতার মধ্যে প্রদীপের প্রয়োজনই সবচাইতে বেশি। নেতাদের হীন স্বার্থপরতা ও রেষারেষির প্রতিবাদেই রবীন্দ্রনাথ চারদিকে সাধ্যমতো প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে শুরু করলেন।

অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নামক রাজনৈতিক বিচ্ছেদের চাইতেও সাংস্কৃতিক বিভেদ আরও মর্মান্তিক একথা অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিক হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। এই বিষবৃক্ষকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলবার জন্যে তাঁর তেরোশো তেরো বঙ্গাব্দে বরিশালে এক প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন এক সাহিত্য সম্মেলনের। মনের মতো এক যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার জন্যে সানন্দে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন। ইংরেজ শাসক এই যজ্ঞ পণ্ড করেই ক্ষান্ত হল না, কৌশলে বপন করল বিষবৃক্ষের উর্বর বীজ। এবং পরিণামে স্থাপিত হল মুসলিম লিগ, যার মুখ্য কাজ বিদ্বেষের বিষবৃক্ষে জলসেচন করা। এই সংকটের মুখে কেমন করে রবীন্দ্রনাথ নির্বিকার থাকবেন? তিনি যখন 'গোরা' লেখা শুরু করেন তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে বিষবৃক্ষের বিভীষিকা। হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার ব্যর্থতা ততদিনে তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ধরা পড়েছে। জাতীয়তা ও মানবিকতার বিরোধ যে কোনখানে তাও আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে তাঁর চোখে। তেরোশো ষোলো বঙ্গাব্দে উপন্যাসটির উপসংহারে এসে পরেশবাবুকে গোরা বলেছে : 'আজ সেই দেবতার মন্ত্র যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনও জাতির কাছে, কোনও ব্যক্তির কাছে কোনওদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্ব-ইতিহাসে এমন কতগুলি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে যেগুলি রবীন্দ্রনাথকে শঙ্কিত করে তুলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে জার্মানিতে প্রকাশিত হয় বর্নর্ড হৌস্টন খেম্বারলেন রচিত 'উনবিংশ শতাব্দীর বনিয়াদ' এবং ক' বছর পরে তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। সে বই উনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি হিসেবে যা-ই প্রমাণ করে থাকুক না কেন তা নরডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ও শক্তির দম্ভকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান জাতি-ই কিনা শিল্পপণ্যের বাজারে ইংরেজ ফরাসি প্রভৃতি জাতির থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এর প্রতিকার হল বিসমার্ক কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা, অর্থাৎ মারকে লেঙ্গা উপনিবেশ। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও জাতিবৈরিতায় ইউরোপ তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে এক সাংঘাতিক বিস্ফোরণের মুখে।

আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় 'হিন্দু', 'দেশ', 'জাতি' ইত্যাদি শব্দের অর্থও দ্রুত পালটে যেতে থাকে। 'গোরা' শেষ করবার তিনবছর পরে হিন্দু কথাটির অর্থ তাঁর কাছে কোনও ধর্ম বা কোনও ধর্মালম্বী ব্যক্তিবিশেষ রূপে থাকল না। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন : 'হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জাতিগত পরিণাম।' ইউরোপে জাতিতত্ত্ব যখন একটা পরাক্রান্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত তখন রবীন্দ্রনাথের কাছে 'হিন্দু' শব্দটির অর্থ একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে। মুসলমান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও এই হিন্দু জাতির অন্তর্গত যদি তারা ভারতবাসী হয়ে থাকে। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মসম্মত আচার ও সাধনা পালন করা সম্ভব, যেমন শৈশব বা বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম ধর্ম পালন করা একজন হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই হিন্দু জাতির বিশেষ সাধনা ও লক্ষ্য কী? প্রশ্নটির উত্তর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে দিয়েছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ও 'A Vision of Indian History' নাম প্রবন্ধ দুটিতে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সূত্র ধরে বিভেদ জর্জরিত সমস্ত ভারতবাসীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার অন্বিষ্ট ও আদর্শ, আবার জাতির সূত্র ধরে বিরোধে উন্মত্ত বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন সমগ্র মানববংশের বেধ্য ও লক্ষ্য। এই দিগ্‌নির্দেশেই ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের যথার্থতা।

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র হেমন্তের জগতে স্বভাবতই ফুলের প্রসঙ্গ প্রায় অনুচ্চারিত। ইয়েট্স যে অর্থে ডরোথি ওয়েলেসলিকে বলেছিলেন, Why can't you English poets keep flowers out of your peotry? — কবি জীবনানন্দের এই ফুল-বিমুখতার সঙ্গে সে অর্থের কোনও সংযোগ নেই। এই অনুচ্চারণ একটা অস্তিবাচক সত্য। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলের রৌদ্ররাগ এবং পুষ্পরাগের পরিমণ্ডল পেরিয়ে সেই ধূসর ম্লানতায় প্রথম প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যে সন্ধ্যায় মনে হয়, সূর্যাস্তের ওপারের সূর্যের কথা, এ সন্ধ্যা সে সন্ধ্যা নয়। এ হেমন্তের সন্ধ্যায় যেন কোনও দুর্মর অন্ধকারের বার্তা পাওয়া গেল। তাই *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে কবিসত্তার স্বনিয়মী স্বাভাবিকতায় ফুলের ব্যবহার ঘটেনি বললেই হয়। ক্বচিৎ এক আধটি শসাফুল, বিনষ্ট শসার পাশে অথবা বাসি বা ছেঁড়া করবীর এক আধটি পাপড়ি ফুলের বিস্মৃতিকে রোধ করার জন্য প্রয়াসী। নতুবা *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে ফুল নেই। ফুল নেই সে সন্ধ্যায়—সে অভবিষ্য অস্পষ্ট অনালোকে মৃত প্রেমিকাদের মুখের মতো বিমর্ষ নক্ষত্রেরা ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনে অতঃপর নক্ষত্র স্থায়ী কাব্যপ্রসঙ্গ। ধূসর পাণ্ডুলিপিতে এবং কমবেশি তারপরেও জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবি নন—হেমন্তের সন্ধ্যার কবি। কেবলমাত্র হেমন্তের অনুষঙ্গ, অন্তত বাংলাদেশে কিছুতেই বিষণ্ণতাবাচক নয়। হেমন্তের অনুষঙ্গে ফসল তোলার আশা আনন্দই বাঙালি কৃষকের মনে জড়িত। কিন্তু হেমন্তর সন্ধ্যার নিরুদ্যমতাকে জীবনানন্দ অন্যতর অর্থে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। বিশ্বব্যাপী যে স্লাম্প বাঙালি যুবকেরও উদ্বেগ ও উৎসাহকে জুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দের হেমন্ত-সন্ধ্যা কতকাংশে সেই নিরুদ্যমতার প্রতীক। আর গভীরতর অর্থে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে ক্রমশই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জীবনানন্দ মানুষের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের কবি। আক্ষরিকভাবে বাস্তববাদিতাকে যদি বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় তাহলে আবারও বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবনের মন্দস্রোতের কথা ওঠে। কিন্তু এ সৌন্দর্যবোধের বিপন্নতারও ইতিহাস আছে। হয়তো তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতার ভাবসংকটের জের, জড়িয়ে আছে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ব্যক্তির আত্মচ্যুতির অভিজ্ঞতা; জড়িয়ে আছে ক্রমবর্ধমান আত্মসম্বিতের ফলে সঞ্জাত ব্যক্তির নৈঃসঙ্গের চেতনা। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুরই ফলে কবিচেতনার তরঙ্গ এক উপলব্ধির তটে প্রহত হয়েছে —মৎস্যকন্যাদের গান আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়। কবি জীবনানন্দের মধ্যে মানুষের সেই বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের চেতনা নক্ষত্রের প্রতীকে রূপস্থ হয়ে উঠেছে। 'বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল', আর নারকেল নাড়ু বিতরণকারিণী বাসমতী চাল ধোয়া হাতে বিনুনি বাঁধা মেয়ে সেই চেতনারই ইঙ্গিত নিয়ে পরে দেখা দিয়েছে।

বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকার প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের এবং সভ্যতার তৎকালীন নিরাশ্বাস উদ্যমহীনতার ছায়া সে অন্ধকার, সচেতন ব্যক্তির আত্মসম্বিতের যে সুযোগই দিক, তার বিষণ্ণতায় কোনও সন্দেহ নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোকে যে অনাহত সৌন্দর্যচেতনা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনানন্দীয় জগতে সে প্রত্যয় নেই — থাকার কথাও নয়। অন্ধকার সেখানে সমাসন্ন, কুয়াশায় কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে ভরসা। তখন আমরা কেউ কেউ ভেবেছি যে সূর্যের আলোকে সেখানে জীবনের প্রসন্ন পাঠ সম্ভব নয়, নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকেই সেই অন্ধকারকে যথাসম্ভব এড়াতে হবে। এই নক্ষত্র প্রেমের প্রতীক, এই

নক্ষত্র শাশ্বত জীবনের প্রতীক, এই নক্ষত্র ব্যর্থ মানুষের সন্ধ্যায় নিজের কাছে (নীড়ে) ফিরে আসার প্রতীক। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র এই কম্পমান নক্ষত্রকে দেখলে একথা মনে না হয়ে পারে না যে জীবনানন্দ যতটা নতুন চেতনার উন্মেষের কবি, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি পুরোনো চেতনার বিদায়ের কবি। সৌন্দর্যের মতোই মানুষের সম্ভোগের বিপন্নতাকে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়-বাসনায় জীবনের স্বাদুতার স্মৃতি দুর্মর কিন্তু মুমূর্ষু।

(১) বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ ... বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

(২) ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

নীলাভ নোনার বুকে রস ঘন হয়ে আসা, অথবা 'মেয়েমানুষ' শব্দটির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সেই গুণ প্রকাশমান, বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন শারীরিকতা। কিন্তু এই শারীরিকতাকে কোনও অর্থেই পঞ্চেন্দ্রিয়পরায়ণতা বলা যাবে না। বরঞ্চ একে বলা যাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্মৃতিচেতনতা। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে পঞ্চেন্দ্রিয় পরায়ণতার লক্ষণ যতটা পরিস্ফুট, তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে পঞ্চেন্দ্রিয় আকুলতা। যৌবনের অস্তায়মান রক্তরাগকে দেখে ক্লান্ত প্রৌঢ়ের যে করুণ স্মৃতি এক অশরীরী আকুলতার জন্ম দেয় এই আকুলতা সেই জাতীয়। এখানেও সন্ধ্যার স্মৃতি অনিবার্য কাব্য-প্রসঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সন্ধ্যার আকর্ষণেই ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের নক্ষত্রেরা।

(ক) তুমি আর আমি
ঠান্ডা ফেনা ঝিনুকের মতো চুপে থামি
সেইখানে রব পড়ে
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো ঝরে।

(খ) মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ; — নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে —
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন সে এক অধীরতা
তাই লয়ে সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মতো রব নক্ষত্রের সাথে।

(গ) জীবন পুড়িয়া যায় — আমরাও ঝরে পুড়ে যাই
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মতো শক্তি — তবু শক্তি চাই।

(ঘ) তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি,
আমার এ নক্ষত্রের তলে!
— জানি তবু — নদীর জলের মত পা তোমার চলে,—

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে যে অন্ধকার এবং নক্ষত্রের ছবি ও প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে জীবনানন্দের নক্ষত্র প্রসঙ্গের অমিলটুকুও লক্ষণীয়।

(ক) যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।

(খ) প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে

আঁধার মাঝে অমনি ফোটে তারা।

(গ) আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতো বাজে।

(ঘ) আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।

রবীন্দ্রনাথের গানে 'তারা' এক নিসন্দিগ্ধ আশ্বাসের বার্তাবহ। অন্ধকারের পরাভবের ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর নক্ষত্ররাজিতে, তাঁর নিশীথ আকাশের তারার মেলায়। জীবনানন্দের নক্ষত্রের ভিতরে এই আশ্বাসের প্রেরণার চেয়ে আশ্বাসের জন্য কবির আকুলতাই ফুটে উঠেছে বেশি। সেখান নক্ষত্রের দীপ্তি অপেক্ষা তার স্তব্ধ প্রশান্তিই প্রধান কথা। তাই বুদ্ধদেবের অসামান্য কবি-পরিচিতির প্রথম চরণ যতটা সত্য, (সে পথ নির্জন যে পথে তোমর যাত্রা,) ওই কবিতাটির শেষাংশ — (একটি জ্বলন্ত তারা আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন এঁকে যায় সেই পথ...) — ততটা জীবনানন্দের কবিত্বের পরিচয়বাহী হয়নি। আকাশের জ্বলন্ত তারা জীবনানন্দের নয়। সে আকাশ অধিকাংশ সময়ে কুয়াশায় আত্মলীন এবং ম্লানতায় স্বপ্নগাঢ়। নক্ষত্রে সেখানে শুশ্রূষার সংকেত।

নক্ষত্রের সংকেতের সাহায্যে যে সন্ধ্যাকে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় গাঢ় করে তোলেন সেই সন্ধ্যারই আকর্ষণে জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আর এক গূঢ়ার্থসঞ্চারী কাব্য-প্রসঙ্গ। এ কাব্য প্রসঙ্গটি হল নীড়। এখানেও দেখা যাবে যে-নীড় রবীন্দ্রনাথের সে-নীড় জীবনানন্দের নয়। রবীন্দ্রনাথ নীড়ের প্রতি মমতাসম্পন্ন নন। রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসার যে অর্থ-গৌরব তারই বিপরীত ব্যঞ্জনা 'নীড়' শব্দটিতে ধ্বনিত। প্রেমপাত্রীকে চিরবিদায় দেবার মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক নীড়ে-ফেরা পাখির বিক্ষোভে নিজের বিবর্ণ মনের ছবি খুঁজে পায়। 'নীড়ে ফেরা পাখী যবে / অস্ফুট কাকলি রবে / দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে' — প্রভৃতি অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জীবনানন্দ যে নীড় প্রসঙ্গ সৃষ্টি করেন সে নীড় বহুলাংশে আশ্রিত-বৎসল। জীবনানন্দেরই সৃষ্ট সন্ধ্যার অনুষঙ্গবাহী সেই নীড়। আকাশ-পরিক্রমায় যেখানে নিরর্থকতাজনিত ক্লান্তি, নীড়ের জন্য বিধুরতা সেখানে অনিবার্য। এখানে আবার স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসা রেনেশাঁসের জাগ্রত ব্যক্তির ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ। স্বভাবতই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উনিশের শতকের বাঙালি যুবকের সেই ব্যাপ্তির বাসনা নানা নিরুত্তাপে হিম হয়ে গেছে। জীবনানন্দ এই সময়ের পটে দাঁড়িয়েই সন্ধ্যার ম্লান কুয়াশায় নীড়ের কল্পনা করেছেন। নীড় নক্ষত্রের মতোই কবির আবেগের, স্মৃতির, কল্পনার আশ্রয়। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে 'নীড়' ব্যবহৃত হয়নি সেখানেও প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ বা আশ্রয়ের প্রসঙ্গ নীড়ের কাল্পনিকতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। যেমন :

(ক) আমাদের অবসর বেশি নয় — ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন
হাত।

(খ) পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

(গ) সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে।

(ঘ) সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে।

(ঙ) ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই; কোন এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখীর মায়ের মতো আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে—অন্ধকারে—অন্য কারো আকাশের থেকে।

এইবার এর সঙ্গে *রূপসী বাংলা*-র নীড় মমতায় মাখা কবিতাগুলির কথা এবং *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের নীড় প্রসঙ্গকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় যে জীবনানন্দের কল্পনার প্রবল আশ্রয় সন্ধ্যার নীড়। অথচ জীবনানন্দ জানেন এ নীড় নিয়তির মতো উদাসীন এক বিরুদ্ধ শক্তির হাতে কত সহজে ভেঙে যায়।

(ক) —চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে — পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা ঠান্ডা কড়কড় —

(খ) ধানকাটা হয়ে গেছে কবে যেন ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম — সাপের খোলস নীড় শীত

তাই এ অনুমান নিবর্থক নয় যে নীড়ের আকর্ষণে পাখি এবং পাখির জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার অনুষঙ্গে ব্যাধ, আবার ব্যাধের অনুষঙ্গে হরিণের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে এক চমৎকার কল্পনা-বলয়ের সৃষ্টি করেছে :

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র ‘ক্যাম্পে’ এবং *বনলতা সেন*-এর শিকার কবিতা দুটি এই সূত্রে পৃথকভাবে স্মরণীয়। দুটি কবিতাতেই মৃত্যুর একটি বিমর্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিবাদের যে প্রভাবটুকু অনুভব করা যায় তার সূত্রপাত এখানে। তবু এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে জীবনানন্দের কবি-কল্পনায় মৃত্যুচেতনা শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। মৃত্যুকে জীবনানন্দ যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা অস্তিত্ববাদীর দৃষ্টি নয় বলেই এমনটা ঘটেছে। জীবনানন্দ মানুষকে বিশ্ব-জীবনের মাঝখানে অকারণে নিক্ষিপ্ত এক সত্তা বলে মনে করেছেন বটে, কিন্তু তাকেই চূড়ান্ত বলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছেন এ ধারণার যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় না। এ কথার প্রমাণস্বরূপেই

উল্লেখ করা চলে *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' কবিতাটি :

মাটি পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হ'ত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পদে যে উপলব্ধি তা কিছুতেই মানুষের নিরর্থকতার অঙ্গীকার নয়। মানুষের চেতনার অগ্রাধিকার অবশ্য ওখানে স্বীকৃত। কিন্তু তার পরম প্রেম সেই চেতনারই সারাৎসার। তাই সেই প্রেমের প্রতীক যে নারী সে সুচেতনা। *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের 'আমি' *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'আমি' অপেক্ষা সত্তার গভীরতার ধ্বনি আরও বেশি ঝংকৃত করেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে ছিল দ্রষ্টামাত্র —*বনলতা সেন*-এ সে নিজের পথিক অস্তিত্বের আবহমানতা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে 'আমি পথ হাঁটিতেছি' এ কথার চেয়ে আরও সত্য 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর'। তাই *বনলতা সেন*-এ পথিক এবং নাবিকের শ্রান্ত রক্তের মন্থরতায় সংবিতের অনাসক্ত মূল্যায়ন কবির অভীপ্সা। বারে বারে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্তী নিবে যাওয়া-সভ্যতাগুলির কথা মনে পড়েছে। সমুদ্রগামী সেই সব নাবিকদের দূরাগত ক্লান্ত গুঞ্জনে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের অন্তহীন প্রয়াসের কথা। এই সব প্রয়াসের অন্তহীনতা এবং হয়তো নিরর্থকতা, শেষ পর্যন্ত আর এক সাধ্য খুঁজে পাবে প্রেমে। এই সাধ্যসাধনা-মীমাংসা *বনলতা সেন*-এর কবিকল্পনার উপজীব্য :

মানুষ কাউকে চায় — তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনও সাধনার ফল।

সেই সাধনারই লক্ষ্য সুচেতনা — যার অপর নাম : 'মানুষের তরে এক-মানুষীর গভীর হৃদয়'। নিজ কবিজীবনের এই অংশে জীবনানন্দের মুক্তি ঘটেছে প্রারম্ভিক শারীরিকতার হাত থেকে। এই মুক্তিই পরিণতি পেয়েছে বনলতা সেন পেরিয়ে *বেলা অবেলা কালবেলা*-য়। তখন *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র সেই ইন্দ্রিয় সচেতনতা আর নেই। 'মেয়েমানুষ' শব্দটি এখন অনুচ্চার্য। *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় প্রধান কল্পনাসঞ্চারী শব্দ 'মহিলা'। এই মহিলা যিনি মননলোককে স্পর্শ করেন — যিনি অপূর্ববস্তু রচনা করেন প্রত্যেক মানবহৃদয়ে, তাঁর শক্তিকেই প্রতিভা বলা হয়েছে। এই চেতনা আকাশীসত্তার মতো দ্যুতিময় বলে *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় মহিলারই সংস্পর্শে নক্ষত্র শব্দটিরও ব্যঞ্জনাগত পরিবর্তন ঘটেছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে *বনলতা সেন* পর্যন্ত সৃষ্টি পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় এক বিশেষ স্বরের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 'হাওয়ার রাত' বা তার মতো দু-একটি কবিতা বাদ দিলে এই সময়ের জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতার পাঠ-জনিত প্রতিক্রিয়ায় এক বিষণ্ণ পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষ দৃশ্যের আবহাওয়া, ও অনুভূতি তুলিত হতে চায়। যেন শুধু কোনও শত শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসের অন্তহীনতাকে জানা গেল, যেন অপরিহার্য নিরর্থকতাকে মেনে নিতে হল — নায়কের কণ্ঠে তারই বিষণ্ণ স্বগতোক্তি। আসন্ন যবনিকাকে উপেক্ষা করে কথাগুলি নীরব প্রেক্ষকের উদ্দেশ্যে বিনা সম্বোধনে অন্ধকারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটি কবিতা আছে যাকে মনে হয় কোনও আন্তরিক কাহিনির শেষাংশ। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'পঁচিশ বছর পরে', *বনলতা সেন*-এর 'কুড়ি বছর পরে', 'ধান কাটা হয়ে গেছে', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' এবং 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এ জাতীয় কবিতা। এই দুই ধরনের কবিতার আত্মায় জড়িয়ে রয়েছে এক সমাপ্তি বোধ। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র নক্ষত্র প্রসঙ্গের সেই জনক। সমাপ্তি বোধ স্থায়ী। সঞ্চারী হিসেবে দেখা দিয়েছে কখনও নির্বেদ, কখনও ক্লান্তি, কখনও বা শান্তির নির্লিপ্তি। এই সমাপ্তি বোধের পিছনে রয়েছে কবির প্রচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর দর্শন-স্থবির অহমের অন্তর্গত

করে নিয়েছেন। এর ফলে জানার সমাপ্তি ঘটেছে। যে সমাপ্তি বোধ জীবনানন্দের কবিতায় *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থে কখনও কখনও ক্লান্তির সুরও বাজিয়েছে তারও মূলকথা ওই জ্ঞানের সমাপ্তি। নায়ক বলছেন — আমার জানা শেষ হয়েছে এই কারণে, যে অবিরাম জেনে চলার সাধ আর আমার নেই।

সুতরাং কবি ঠিকই জেনেছিলেন যে এই সমাপ্তির অনুভূতিকে সঞ্চারিত করার এক কালগত সুদূরতার অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা দরকার। এই শৈল্পিক উপলব্ধির সূত্রেই জীবনানন্দের কবিতার আয়বিক রহস্যও উন্মোচিত হতে পারে। স্থানগত এবং কালগত সুদূরতাকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বর ধ্বনির প্রতি জীবনানন্দের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায়ক।

(ক) প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর
এই সব ত্যক্ত পাখী কয়েক মুহূর্তে শুধু : — আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে, — পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের
পারে ;

(খ) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

(গ) কাল তারা অতি দূরে আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘবর্শা
হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

(ঘ) মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;

(ঙ) মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী-শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী —

ভাবছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের সাযুজ্য জীবনানন্দের স্বভাবতই অন্যতম অন্বেষা। যে সব মুহূর্তে তাঁর কাব্যছন্দ কথ্যছন্দকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি সে সমস্ত মুহূর্তে তাঁর কাব্যছন্দ কথ্যছন্দকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি সে সমস্ত মুহূর্তে তাঁর ভাবছন্দের চারিত্রই অধিকতর আধিপত্যপরায়ণ। পূর্বে কথিত সমাপ্তিবোধকে সার্থক করে তোলার জন্য নাবিক-ক্লান্তি এবং পথিক ক্লান্তির যে পটভূমিকা দরকার 'আ'-ধ্বনির কালদৈর্ঘকে ফুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে মূর্ত করছে। এই প্রয়োজন মেনে নিয়েই জীবনানন্দ লৈখিক ক্রিয়াপদকে একেবারে বিদায় দিতে পারেননি। বনলতা সেন কবিতাটির প্রথম এবং শেষ চরণের লৈখিক ক্রিয়াপদ দুটি এখানে স্মরণীয়। 'হাঁটিতেছি'-র বিলম্বিত স্বরধ্বনি ছাড়া হাজার বছরের ক্লান্তিকে ধ্বনিত করা যেত না। আবার শেষ চরণের 'বসিবার' ক্রিয়াপদটিই সমস্ত পাঠকহৃদয়কে এক অন্তহীনতার মাঝে নিক্ষেপ করে গেল। এবং এই প্রকরণের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই জীবনানন্দ বলেন :

> ...তাই বলে কবিতার মানে পাঠকসমাজে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব এরকম, বা যে কোনও রকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার সংস্রব নেই বলে নয় ; সংস্পর্শ রয়েছে; সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায় ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনও

ভাষায় ; কিন্তু কোনও বিশেষ বাগরীতিতে বা অর্থে লেখা উচিত এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়।

— কবিতার কথা; 'মাত্রাচেতনা' : জীবনানন্দ দাশ।

নিজ কবিজীবনে জীবনানন্দ যে কারণে তাঁর কবিস্বরের বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার ব্যাখ্যা এখানে তিনি দেননি। তিনিও একটি সংকল্পই নির্মাণ করেছেন মাত্র। এবং এই সংকল্প তাঁকে সব সময়ে শৈল্পিক সার্থকতার পথ দেখায়নি। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তেই এই বাকছন্দ সংক্রান্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপের নিদর্শন তুলনাগতভাবে বেশি।

(ক) হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ মরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর
বিছানার পর

(খ) কারণ,—অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি, জীবনের এই আলো জ্বেলে

(গ) সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাত্রির মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার।

এই রকম আরও কিছু জায়গায় লৈখিক ক্রিয়া ও মৌখিক ক্রিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা শৈল্পিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপন্থী হয়েছে। 'বিয়োবার দেরি নেই আর' — এখানে 'বিয়োবার' শব্দে আপত্তি নেই। যে নারীর রূপ ঝরে যাবে তার সম্বন্ধে আচম্বিত অসম্ভ্রম তাৎপর্যবিহীন নয়। কিন্তু 'বিয়ায়ে গেছে' এই উদ্ধৃত অংশে লৈখিক ক্রিয়াভঙ্গির সঙ্গে একান্তই প্রাকৃত ক্রিয়াটির মিলন সাধন সম্ভব হয়নি। 'রাখিতে আছি' এবং 'উঠিতে আছে' একদিকে লৈখিক ক্রিয়াপদ আবার অন্যদিকে জেলা বিশেষের বাগ্‌রীতির বিশেষত্বের স্মারক। এই অবৈধমিলনও কার্যকর হয়নি।

কিন্তু তাই বলে আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে জীবনানন্দের কানে কথাছন্দের গুরুত্ব ধরা পড়েনি। শাব্দিক বিন্যাসে জীবনানন্দের পারঙ্গমতা বহুশ্রুত। তাঁর কোনও কোনও কবিতার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে আলোচ্য হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছন্দের প্রতিমুখেই যেন কথ্যছন্দকে ধরে দিয়েছে জীবনানন্দ। যেমন :

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি হে সূর্য, হে মাঘ নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর ;

উদ্ধৃত অংশটির প্রথম পংক্তিটির দীর্ঘ স্বরধ্বনি জীবনানন্দের ঈপ্সিত ক্লান্তিকে ধারণ করে রয়েছে। আত্মহত্যার বাসনা অস্তিত্বের নিরর্থকতা থেকে উদ্ভূত। সে অস্তিত্ব সকল সংগ্রামে বীতরাগ। তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। তার ক্লান্তিও দীর্ঘ। দ্বিতীয় পংক্তির সটান কথ্যভঙ্গি শেষ নিদ্রাতুরের বিরক্ত প্রতিবাদ। প্রথম চরণে নিদ্রাচ্ছন্ন স্খলিত গতি — দ্বিতীয় চরণে রূঢ় চমক। এ প্রতিবাদ তাদের প্রতি যারা অস্তিত্বের সার্থকতার কথা কাব্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির দীর্ঘস্বরগুলির সঙ্গে যোগ দিল মহাপ্রাণ বর্ণের সুমিত প্রয়োগ—দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা এল। অতঃপর পঞ্চম পংক্তিতে আবার দ্বিতীয় চরণটিই ফিরে এল— শুধু 'কেন' শব্দটি স্থানবদল করে একটি আর্ত মিনতিকে ধ্বনিত করেছে। এর পরেই অরব অন্ধকারে অপরিচিত-বিলুপ্তির বাসনা—'অরব' বিশেষণটি নীরবের পরিবর্ত শব্দ মাত্রা নয়। 'অরব' শব্দে নীরবের মিষ্টতা নেই। বিশেষণটিই ইতিপূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি বলেই অপরিচিত। তার কাজ হল অন্ধকারের কঠিন অব্যাখ্যাত শূন্যতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই শূন্যতার

অনুভূতিকে বারে বারে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নানাভাবে মূর্ত করতে চেয়েছেন।

'অরব অন্ধকার', 'উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে', 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ', 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ', 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো', প্রভৃতি বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় শব্দচিত্রের মধ্যে তাঁর কবিভাষার গূঢ় রহস্য স্পন্দিত। এগুলি তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র স্বরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই স্বর-স্বাতন্ত্র্য, সকল কবির ক্ষেত্রেই যেমন তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁর জীবনদৃষ্টির দান। 'অরব অন্ধকার' এবং 'উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে'—এই দুই ক্ষেত্রেই অন্ধকার বা নিস্তব্ধতা লক্ষ্য নয়, কবি-লক্ষ্য ছিল এক অনির্দেশ্য শূন্যতার পাত্রবস্তু-নিরপেক্ষ অনাত্মীয়তাকে মূর্ত করা। 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' এই উপমায় স্বভাবতই 'চোখ' কবির উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট কবির নিজেরই আশ্রয়াকুল মন। আবার, যে ক্লান্ত মেয়েটির চোখ ম্লান, তার ম্লানতার অন্তর্গত স্বরূপ আমরা জানি না বলেই বেতের ফলের উপমার সার্থকতা। 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো' আকারে উপমা, প্রকারে প্রতীক। করুণ শব্দটিই সেই প্রতীককে ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্লান্তি, নিরর্থকতা, উদ্বেগ প্রভৃতি নানা কারণে মাতৃকল্পনা এবং মৃত্যুকল্পনা জীবনানন্দের কবিমানসকে কখনও কখনও প্রভাবিত করেছে। মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন ও মরণাশ্রয়বাসনা একার্থক। মাঝে মাঝে জীবনানন্দ অতি আগ্রহে ব্যাখ্যা করে বলতে চান। তখন তাকে বাহুল্য বলে মনে হয় : 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি'। এখানে 'অনন্ত মৃত্যুর মতো' এই উক্তির আর প্রয়োজন ছিল না। করুণ শঙ্খের মতো স্তন নিঃসন্দেহে জীবনানন্দের মাতৃকল্পনের প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র প্রেমিকা-কল্পনা এবং *বনলতা সেন*-এর প্রেমিকা-কল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হয় তাও এই সূত্রেই বিচার্য। বনলতা সেনের প্রেমিকা-কল্পনায় জীবনানন্দের মাতৃকল্পনার প্রভাব নাতিপ্রচ্ছন্নভাবে কার্যকর থেকেছে। প্রেমিকা সেখানে আশ্রয়দাত্রী। অন্যদিক থেকে আবার মৃত্যুর ভিতরেও সেই আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা। তাই নারীর মাথার চুলের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের মৃত্যু-চেতনার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে তাঁর আশ্রয়াতুর মনোভাবকে স্পষ্টতা দিয়েছে। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-তে প্রেমিকা-কল্পনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও জীবনানন্দের যে সমাপ্তি চেতনার কথা আমরা পূর্বে বলেছি তা কিছুতেই পূর্ণতার চেতনা নয়। পূর্ণতার চেতনার জন্য যে দার্শনিক স্থিরীভবন প্রয়োজন তার অভাব জীবনানন্দে ছিল না। কিন্তু এই স্থিরীভূত দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি কোনও সংকটের সংঘাতে অর্জন করেননি। করেননি বলেই এটা তাঁর কাছে সহজ আশ্রয়ের ব্যাপার ছিল। দান্তে বা রবীন্দ্রনাথ যেমন করে তাঁদের আবেগগত বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের সাযুজ্য ঘটাতে পারেন, জীবনানন্দ তেমন পারেন নি। মানুষের প্রক্ষিপ্ততা, নিঃসঙ্গতা, তার গ্লানি ও উদ্বেগের কথা তিনি ঠিকই বলেন। তা থেকেই উত্তরণের আশাও একজন মানবতামুখী ভবিষ্যৎবিশ্বাসী আবহমানতা সচেতন ব্যক্তির মতোই তিনি প্রকাশ করেন কিন্তু এই দুই প্রান্তকে মেলাতে পারেন না। *বনলতা সেন* এবং অনুরূপ কয়েকটি কবিতার অসামান্য সার্থকতা সত্ত্বেও একথা সাধারণভাবে সত্য যে জীবনানন্দের প্রায় কবিতাতেই ভাবের কোনও অগ্রসরণ নেই। প্রথম স্তবকে বা কয়েক চরণেই কবিতাটির মূল কাজ শেষ হয়ে যায়। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়ই এ লক্ষণ ছিল। কিন্তু কবিতার ফুলটির চারপাশে রবীন্দ্রনাথ যে পুঞ্জিত পল্লবের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতেন তার সজীবতাও অভিনন্দনীয়। সে ক্ষেত্রে জীবনানন্দের ভরসা ছিল তাঁর মননলব্ধ বিশ্বাস। এর যে সীমাবদ্ধতা তার দায় তাঁকে ভোগ করতেই হয়েছে। হ্রস্ব কবিতায় এবং দীর্ঘ কবিতায় সমান ভাবেই এই শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটেছে। আমরা অবশ্যই রিচার্ড-কথিত আবেগগত বিশ্বাস এবং বৌদ্ধিক বিশ্বাসের পার্থক্যের সারবত্তা এবং এলিয়টের মতান্তর এখানে আলোচনা করতে চাই না। বরঞ্চ এলিয়টকে আমরা এখানে রিচার্ডের বক্তব্যের বিরোধী হিসাবে দেখি না। বিশ্বাসের গাঢ়তম মুহূর্তে বিশ্বাস সমগ্র চৈতন্যেরই বিষয়। আবেগের ভূমিকা সেখানে স্বতঃই গণনীয়। রিচার্ড থেকেই সে সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। বিশ্বাসের একমাত্র নিরিখ তা কবিকল্পনাকে সক্রিয় রাখতে পেরেছে কি না। *বেলা*

অবেলা কালবেলা-য় বিশ্বাসের সেই ভূমিকা ম্লান। অথচ *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় জীবনানন্দের দার্শনিক অভিপ্রায় আরও স্পষ্টতা লাভ করেছে, সেই অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য কবির প্রয়াসও শুরু হয়েছে।

বস্তুত 'আট বছর আগের একদিন'-এর সেই শূন্যতা-সঞ্চারী ক্লান্তিবোধ, সেই নৈঃসঙ্গ চেতনা থেকে *বনলতা সেন*-এ 'সুচেতনা' কবিতার বক্তব্যে পৌঁছে জীবনানন্দ আপন কবিসত্তার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় সেই অবিচল নিষ্ঠাই বক্তব্যের দিক থেকে তাঁকে আরও অগ্রসর করে দিয়েছে। কিন্তু কবিতা তো শুধু নিষ্ঠা নয়, শুধু বক্তব্য নয়। *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ কয়েকটি শিল্পিত কাব্যোক্তি অসংহত স্তবকগুলি পৃথুল কলেবরের পাশে পাশে রুদ্ধশ্বাস। সে পৃথুলতা আপন বিবৃতিতেই ক্লান্ত। 'আটবছর আগের একদিনে' ও শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটেছে, কিন্তু সে বিচ্যুতি অন্য জাতীয়। এই কবিতাটির প্রধান অসঙ্গতি দৃষ্টিকোণ-সংক্রান্ত অসঙ্গতি। যে সব দীর্ঘ কবিতায় দ্বিতীয় স্বরের সফলতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেখানে উত্তম পুরুষের উক্তি, 'তার' এই সর্বনামের প্রসঙ্গ এবং নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যগুলি পারস্পরিকতায় সমগ্র কবিতাটিকে পূর্ণতা প্রদান করে। প্রসঙ্গত আমরা এলিয়টের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা The Love Song of J. Alfred Prufrock -এর কথা স্মরণ করতে পারি। 'আটবছর আগের একদিন'-এ প্রারম্ভে, মধ্যে কোথাও উত্তম পুরুষের নিজের কাহিনি বা কথা নেই। 'শোনো' বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার ভূমিকাও স্বভাবতই গৌণ। সমস্ত কবিতাটিই 'তার' কথা। এই কবিতায় যাকে 'তুমি' বলা হয়েছে এবং যাকে 'তার' এই সর্বনামে উল্লেখ করা হয়েছে এরা এক ব্যক্তি। ' শোনো' যাকে বলা হয়েছে সেই টেবিলের ওপারের বন্ধু শ্রোতা। কবিতাটির শেষে 'আমি' এসেছে। একেবারে শেষে এসেছে 'আমরা'। 'জানি' বলে যে কথা বলেছে তার দার্শনিক উক্তি এবং পরিশেষে 'আমরা' যে উক্তি করেছে সেই 'আমরা'-র অন্তর্বর্তী আমি এক নয়। 'তবু' শব্দটিই তার প্রমাণ। 'আমরা' শব্দে যে অস্মিতা-বিচ্যুতি তার প্রস্তুতি কবিতাটিতে নেই। আবার যে দ্বি ব্যক্তিত্বের কল্পনা শেষে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তার অনিবার্যতা জীবনদর্শন সংক্রান্ত পূর্বোক্তির জন্য রচিত হতে পারেনি। এইভাবে কবিতাটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তথাপি যে কবিতাটি দাঁড়াতে পেরেছে সে 'তার' জন্য।

কিন্তু *বেলা অবেলা কালবেলা*-য় যে শৈল্পিক খঞ্জতা তার ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা কবির হাতে ছিল না। 'মাঘ-সংক্রান্তির রাতে' কবিতাটি *বেলা অবেলা কালবেলা*-র কবি-অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। আমরাও সচেতন হয়ে উঠছি এই ভেবে যে হৈমন্তিক বিষণ্ণতার অন্তে কোন বাসন্তী আশ্বাসের তোরণে কবি পৌঁছলেন দেখা যাক :

> মহাবিশ্ব তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
> মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
> লক্ষ রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি আর সুবর্ণের মতো
> দেহ হবে মন হবে — তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।

নিঃসন্দেহে এই অমেয় আশার বাণীতে কাব্যগ্রন্থটি ধন্য। কিন্তু এই আশার বাণীকে কবিতার ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে যে প্রকরণ প্রয়োজন সেখানে কবির শৈথিল্য ঘটেছে। কেননা, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যধারণার সঙ্গে জীবনানন্দের ইতিপূর্বের মূল্যানুগত্য গ্রথিত ছিল তার সবটুকু না হলেও অধিকাংশই ছিল অতীত-নির্ভর। তিনি সন্ধ্যার বিষণ্ণতার কবি, শেষরৌদ্ররাগ মুছে যাবার বেদনায় নীড়ের জন্য বিধুর কবি। আমরা আগেই বলছি যে হেমন্তের যে মাঠের ধান কাটা হয়ে গেছে, যার সম্মুখে সর্বৈব শূন্যতা, তা করি জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ। এইখান থেকে মাঘ সংক্রান্তির রাতে উত্তরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উত্তরণের প্রস্তুতির দিকে জীবনানন্দের তেমন দৃষ্টি ছিল না। দ্বিরুক্তির আশংকা মেনে নিয়েও একথা আর একবার বলা দরকার 'সুচেতনা' জীবনানন্দের কবিজীবনের সন্ধিলগ্নে লিখিত কবিতা। এইখানে আর সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কথা নেই যা আমাদের ক্লান্ত করে। অন্য এক বিস্ময়ের কথা আছে,

যা আমাদের মূক করে রাখে। তবু সে বিস্ময়কে উপেক্ষা করেই চারিদিকে রক্ত-ক্লান্ত কাজের আহ্বান। কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতার কথা জীবনানন্দ এর আগেই বলেছেন। কিন্তু 'সুচেতনা' কবিতায় দেখা গেল ওই বিবর্ণতাই সব কথা নয়। এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—এই দূর শতাব্দীমুখী এক অসংহত ভবিষ্য-বিশ্বাসও এই কবিতায় প্রথম দেখা গেল। 'সূর্যোদয়' কথাটিকে এর আগে এমন করে জীবনানন্দ আর কখনও উচ্চারণ করেননি, যেমন করলেন সুচেতনায়। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে'—এ অনুভূতি এবার বিদায় নিল।

তথাপি এই কবিতাতেই আমরা উপলব্ধি করি যে জীবনানন্দ তাঁর আবেগময় বিশ্বাসের সব ফাঁকটুকু মননের সাহায্যেও ভরাট করতে পারছেন না। যেই তিনি কর্মনিষ্ঠ মানবতার সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্ররূপা নারীপ্রেমের মিলিত আশ্বাসকে খুঁজতে যান, তখনই তাঁকে বর্তমানের প্রসঙ্গকে অপরিহার্য বলে মেনে নিতে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সেই সুদূর অতীতের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ভাষার ভূমিকা পঙ্গু হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর ভাষার শৈল্পিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমরা ব্যথিত হই। জীবনানন্দের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে ত্রুটি ক্ষীণভাবে বরাবর বিদ্যমান তা অসতর্কতায় প্রশ্রয় পেয়ে এবারে প্রকট হয়ে উঠল। দীর্ঘায়িত বাক্য কথ্যছন্দ, ভাবছন্দের সীমা ছাড়ালো। 'প্রয়াণ পটভূমি' কবিতার নবম পংক্তি থেকে সপ্তদশ পংক্তি এর একটি সাধারণ প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা চলে। জীবনের যে বিস্তৃতির দিকটি কবি কোনওদিন দেখেননি — মানুষের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বিস্তৃত জীবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে তাঁর দরকার ছিল নতুন করে টেকনিকের রহস্য মোচন। দুর্ঘটনা তাঁকে সেই সময় দেয়নি।

জীবনানন্দ তাঁর সাফল্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন: ভালোবাসা। আর তাঁর ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে শিল্পীকে শিখিয়েছেন: থীম অথবা আঙ্গিক এককভাবে এর কোনওটাই যেন শিল্পীর কাছে চরম বা absolute না হয়।

৪র্থ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৩)

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বস্তুপ্রেমিক ফরাসি 'নব' উপন্যাস

সর্বপ্রথমেই শিরোনামার ওই 'নব' কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। হয়তো নব না বলে অভিনবই বলা আরও যুক্তিযুক্ত হত। কিন্তু তা বলা হয়নি কারণ ফরাসিরা—বিশেষত সেই সব ফরাসি ঔপন্যাসিকরা, যাঁদের কীর্তি একমাত্র প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার — তাঁরা নিজেরাই জিনিসটাকে অভিনব বলতে চাননি (কেন জানি না), বলেছেন নব বা তাঁদের ভাষায় nouveau, যদিও তাঁদের সমস্ত কথাটি হ'ল nouveau roman, যার আক্ষরিক অনুবাদ 'নব উপন্যাস'-এ গিয়েই দাঁড়ায়। তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়—নব কেন? কেন এই সস্তা, খেলো, অতি পরিচিত ও সর্বগূঢ়ার্থশূন্য বিশেষণ, বিশেষত বিশেষণটি যে-বস্তুর সেটি যখন সাংঘাতিকভাবে গূঢ়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমজাতীয় অন্যান্য রচনা থেকে এত প্রকটভাবে পৃথক? কারণ কোন বইটা নব এ-জগতে? যেটা আজ বেরিয়েছে, বা যার প্রকাশ আসন্ন বলে আজ ঘোষণা করা হচ্ছে, পরিচিত অর্থে সেটাই তো নব, এবং সেটা কালই গতকালের জিনিস হয়ে যাবে, আর ততটা নব (ওই পরিচিত সর্বজনগ্রাহ্য অর্থেই) থাকবে না। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ-র (Francoise Sagan) যে-বইটা আজ সদ্য বেরোল, সেটাকেই বা নব উপন্যাস বলা যাবে না কেন তবে?

না, পরিচিত অর্থে বলা গেলেও আমাদের বর্তমান ও বিশিষ্ট অর্থে সেটিকে নব বলা যাবে না — শুধু সাগাঁর আজকের সদ্য প্রকাশিত বইটিকেই নয়, তাঁর আগের অন্যান্য বইগুলিকেও, এবং পরেও তিনি যত বই লিখবেন, যদি লেখেন, তারও সব ক'টিকেই (অবশ্য এক যদি তিনি রাতারাতি লিখন-ভঙ্গির ভোল সম্পূর্ণ না পাল্টে বসেন, তাঁর বক্তব্যটিরও এক প্রচণ্ড রূপান্তর সাধন না করেন)। সাগাঁকে এর মধ্যে টানা শুধু উদাহরণ-প্রসঙ্গেই, তাঁর সপক্ষে বা বিরুদ্ধে জোর করে কিছু বলা বর্তমান উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বহির্গত। যে-কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা হল, তা সমানই প্রযোজ্য তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বহু জীবিত ও সক্রিয় ফরাসি ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে, এবং যাঁরা সংখ্যাধিক্যে আলোচ্য মুষ্টিমেয় 'নব' ঔপন্যাসিকদের অনায়াসেই আচ্ছন্ন করতে পারেন। নব বলতে তাহলে এখানে বুঝতে হবে একটি অতি বিশিষ্ট জিনিস, এক ভিন্ন মানসিক সত্তা, যেটাকে ফরাসিরা বলবেন etatd' esprit। আবার তাঁদের বক্তব্যের সেই সত্তাটিই শুধু নয়, তাঁদের বলার ভঙ্গিটিও সমানই 'নব' ও বিশিষ্ট। এবং এই 'নব' যেহেতু মুখ্য একটি মানসিক অবস্থার বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত, প্রচলিত অর্থের আজ-এর সীমিত সংজ্ঞায় সে নিজেকে উজাড় করে না। অর্থাৎ, কথাটাকে আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায় এই ভাবে যে এমন বেশ কয়েকটি ফরাসি উপন্যাস আছে যা যদিও প্রকাশিত হয়েছে দশ বা বিশ বছর আগে বা তারও আগে, তাদের আজও আমরা বর্তমানের অতি বিশিষ্ট অর্থে 'নব' বলতে সংকুচিত হব না।

এখানে বোধ হয় এটুকুও যোগ করা সমীচীন হবে যে এই জাতীয় উপন্যাসকে কোনও কোনও সমালোচক নব না বলে আঁতি-রোমাঁ (anti-roman) বা 'প্রতি উপন্যাস' বলে এক সময় চালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কেউ কেউ তা আজও করে থাকেন। তাঁদের প্রতিপাদ্য হ'ল, উপন্যাস বলতে আমরা এতকাল যা বুঝে এসেছি, এক ঘটনা ও চরিত্র-সম্বলিত আখ্যান, এ-ধরনের উপন্যাস তার সম্পূর্ণ উল্টেপথে যায়। কথাটার মধ্যে যে যুক্তি নেই তা নয়, তবে নব উপন্যাসের ধ্বজাধারীদের আপত্তি ওই 'আঁতি' শব্দটা নিয়ে — তাঁরা বললেন তাঁদের উপন্যাসও উপন্যাস, যেমন বালজাক-এর (Balzac) *পেয়ার গোরিও*- ও (Pere Goriot) উপন্যাস, যদিও ঠিক এক অর্থে নয়। যে যুগের যা, এবং তাঁদের এই নব উপন্যাস এ যুগের জীবনের এক বিশ্বস্ত ও অর্থপূর্ণ প্রতিচ্ছবি বলেই এটাও কম উপন্যাস নয় বা উপন্যাসের বিরোধী কিছু

সৃষ্টিছাড়া জিনিস নয়—তবে এটা নতুন ধরনের উপন্যাস। তাছাড়া, উপন্যাস বলে একমেবাদ্বিতীয় কিছু নেই, যার শুধু একটিমাত্র শেষ সংজ্ঞা বা ব্যঞ্জনা সম্ভব হতে পারে—তাকে যুগে যুগে নতুন করে তোলার দায়িত্ব ঔপন্যাসিকেরই। বালজাক-এর রচনা যেমন উপন্যাস বলে লোকে একদিন স্বীকার করে নিয়েছিল, এই নব উপন্যাসও তেমনি করে উপন্যাসের স্বীকৃতি একদিন পাবে পাঠকের কাছ থেকে। এবং সেদিনের সম্ভাবনা যে এখনও সুদূরপরাহত, তাও নয়—বলা যায়, সেদিন ইতিমধ্যেই এসে গেছে, ইতিমধ্যেই লোকে এটাকে উপন্যাস বলে স্বীকার করে নিচ্ছে, এই নিয়ে ফ্রান্সে (ও অন্যত্র) হইচই আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ১৯৬৩-তেই লিখতে দেখি আল্যাঁ রব-গ্রীইয়েকে (Alain Robbe-Grillet, ফরাসি 'নব ঔপন্যাসিকদের' এক প্রকাণ্ড মুখপাত্র) : 'লোককে বুঝিয়ে ছাড়ার বাসনা যখন এত প্রচণ্ড, তখন দেখতে ভালো লাগে লোকে বুঝতে শিখছে।'

তবে এখানে আরও ছোট ছোট দুটি কথা আছে, তাও বলে নেওয়া দরকার। প্রথম কথাটি হল নব উপন্যাসের প্রসঙ্গে এক মানসিক সত্তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে সেই সত্তাটি একটি একক, অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার, যার দ্বারা নির্বিশেষে চিহ্নিত সমস্ত নব উপন্যাসই বা ঔপন্যাসিকই। অর্থাৎ, নব উপন্যাসকে সাধারণ অর্থে একটি আন্দোলনের আখ্যা যদিও দেওয়া সম্ভব হয়, সেই আন্দোলনের প্রকৃতি কিন্তু বিভিন্ন লেখকে বিভিন্ন রূপ নেয়, এবং এই লেখকেরা নিজেদের একটি গোষ্ঠী বলে পরিচিত করতে ইচ্ছুক নন — সকলেই যে যার নিজের স্বাতন্ত্র্যে স্ব-আকাশবিহারী। বর্তমান প্রচেষ্টায় লক্ষ্য হল, তাঁদের বা তাঁদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ, মুখ্য ও বিশিষ্ট গুণের আবিষ্কার, ও সেগুলির আলোচনা। এবং তাঁদের রচনা হতে দুয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করতে চাওয়া।

দ্বিতীয় কথাটির গুরুত্ব আরেকটু বেশি। এ আন্দোলন — যদি আন্দোলনই বলা চলে — এ একটা নিছক হুজুগ নয়, বীটনিক কবিসুলভ বাঁদরামি নয়, তথাকথিত 'রাগী' কবি সাহিত্যিকের ছ্যাবলামি বা প্রলাপ নয়, অ্যাবসার্ডের পূজারি নয়। এ এক প্রচণ্ড কসরত, এক ভয়ংকর বুদ্ধিজীবী ব্যাপার, ভাবে ও আঙ্গিকে এ যেমন বলিষ্ঠ, এর সম্যক অনুধাবন তেমনি শ্রমসাধ্য। এ-আন্দোলনে কোমর বেঁধে যোগদান করেছেন যে সব সাহিত্যিক, তাঁরা সকলেই সভ্য, শিক্ষিত (শিক্ষিত বলতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদেরই বলছি না, যদিও সে-ডিগ্রিরও কোনও অভাব নেই এঁদের কারও কারও), আচার-ব্যবহারে বেশ-ভূষায় সুস্থ সবল মানুষ এবং যাকে বলে ইন্টেলেকচুয়াল, তার শেষ। শুদ্ধ বুদ্ধির রসে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্প্রতিক ইতিহাসের সকল দুরূহ বক্তব্য এঁরা গুলে খেয়েছেন। এবং তাই তাঁদের নিজেদের বক্তব্যটাও কম নয়, এবং সে বক্তব্যটাকে ঠিক কোন মাধ্যমে কেমন করে বলতে হবে, তার সম্বন্ধেও তাঁরা সমান সচেতন। এঁদের প্রায় সকলেই খোলাখুলি আসরে নেমেছেন বহুবার, প্রবন্ধ ইত্যাদির আকারে (অর্থাৎ শুধু উপন্যাসের মাধ্যমেই নয়) পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁদের উপন্যাসটা 'নব' কেন, জিনিসটা কী, তাঁরা কী বলতে চান, ইত্যাদি।

এঁদের মধ্যে প্রধান যাঁরা, তাঁরা হলেন একে একে : নাতালি সারোৎ (Nathalie Sarraute), ক্লোদ সিম (Claude Simon), অ্যাল্যা রব-গ্রীইয়ে (Alain Robbe-Grillet), মিশের ব্যুতর (Michel Butor) ও *রবের পাঁজে* (Robert Pinget)। মার্গারিৎ দ্যুরাস-এরও (Marguerite Duras) কোনও কোনও রচনা নব উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে, তাই তাঁকেও এঁদের দলে কেউ কেউ টেনে থাকেন। উচ্চস্তরের সিনেমা-প্রেমিক বহু বাঙালির কাছে দ্যুরাসের নাম পরিচিত হয়তো ইতিমধ্যেই, কারণ ইনিই প্রখ্যাত ফরাসি ফিলম *Hiroshima Mon Amour*-এর চিত্রনাট্য লেখেন এবং এঁর একটি উপন্যাস, *মদেরাতো কান্তাবিলে* (*Moderato Cantabile*) বা 'মৃদু মন্দ গান', সম্প্রতি ফিল্ম হয়ে সারা ইউরোপে রীতিমত সাড়া তুলেছে। কে এই নব উপন্যাসের প্রথম প্রণেতা বা ঠিক কোন প্রথম বইটিতে এই ধরনের উপন্যাসের সুস্পষ্ট সূত্রপাত, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে—তবে পথিকৃৎ হিসেবে অনেকেই মেনে নেন সারোৎকে, এবং সে-প্রসঙ্গে তাঁর যে গ্রন্থটির উল্লেখ সচরাচর শোনা যায়, সেটি হল *ত্রোপিজম* (*Tropismes*), এবং যা

প্রথম প্রকাশিত হয় এখন থেকে বোধ হয় বাইশ কি তেইশ বছর আগে। আমার কাছে বইটির যে সংস্করণ আছে, সেটি একটি পুনর্মুদ্রণ ও যা Editions de Minuit (এঁরাই যাবতীয় নব উপন্যাসের মুখ্য প্রকাশক) প্রকাশ করেন ১৯৫৭-তে।

ত্রোপিজম (বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়, তবে ১৯৬০-এ এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সারোৎ স্বয়ং লিখছেন : 'আমার গবেষণার বিষয় হল কতকগুলি বিশেষ গতিভঙ্গি যার মধ্যে নিহিত আমাদের বাক্য ও কর্মের প্রস্তুতি এবং যাকেই আমি "ত্রোপিজম" আখ্যা দিয়েছি')। উপন্যাস নয়, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনার সমষ্টি, অনেকটা গদ্য-কবিতার মতো। তবু তাকে নব উপন্যাসের সূচক বলে যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁরা তার কাহিনি-হীনতাটাকে উপেক্ষা করে বইটির অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য ভাববস্তুটির উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। বহু ফরাসিকে বলতে শুনেছি, সারোৎ যেহেতু প্রথমত নারী, দ্বিতীয়ত মূলত রুশ ও বর্তমানে ফরাসি ও তৃতীয়ত ইহুদি, তাঁর মানসিক সত্তাটা তাই স্বভাবতই একটা জটিলতার অরণ্য, এবং সেই হেতুই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি নব উপন্যাসের মতো একটা সাংঘাতিক জটিল ব্যাপার তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এমন একটা কথা মেনে নিলে এ-দলের (এঁরা অবশ্য ঠিক কেউই তেমন দল নয়, কোনও দলেই পড়তে চান না, আগেই বলেছি — তবে যে সাধারণ মিলটি এঁদের একত্র করে, তা সকলেরই নব ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার বাসনা ও সাধনা) অন্যদের সম্বন্ধে কী বলব, যাঁদের অধিকাংশই না নারী, না মূলত রুশ, না ইহুদি? না, নব উপন্যাসের উৎসের কারণ খুঁজতে হবে যুগের অন্যান্য অনিবার্য অবিসংবাদিত লক্ষণের মধ্যে। এবং এটুকুও বলা দরকার এখানে যে সূত্রাপাত যেমন করেই হোক না, নব উপন্যাস কথাটা চালু করার পিছনে রব-গ্রীইয়ের দান নিঃসন্দেহে অন্য সকলের থেকে বেশি — ১৯৬৩-তে তিনি একটা প্রবন্ধ গ্রন্থই প্রকাশ করে বসলেন, 'নব উপন্যাসের সপক্ষে' (Pour Un Nouveau Roman)। এই আঙ্গিকের অসামান্য সক্রিয় শিল্পী হিসেবে মিশেল ব্যুতরও কম যান না — সম্প্রতি দেখলাম, এক ফরাসি সমালোচক রব-গ্রীইয়ে ও ব্যুতরকে যথাক্রমে নব উপন্যাস আন্দোলনের রবেসপিয়ের (Robespierre) ও স্যাঁ-জুস্ত (Saint Just) বলে বর্ণনা করেছেন। সকলেই জানেন, রবেসপিয়ের ও স্যাঁ জুস্ত ফরাসি বিপ্লবের দুটি বহুখ্যাত ব্যক্তিত্ব, দুই দিকপাল।

তবে এই নব উপন্যাস নিয়ে তর্কাতর্কি যদিও ইতিমধ্যেই খুবই হয়েছে এবং ক্রমশই আরও বেশি করে হচ্ছে, এ-উপন্যাসের পাঠক আজও সীমিত। রব-গ্রীইয়ের একটি সাম্প্রতিক বই প্রথম মুদ্রণে ২৮,০০০ কপি ছাপা হয়েছে — এত বড় জনপ্রিয়তার ভাগ্য তাঁর আগের কোনও বই অর্জন করেনি। কিন্তু ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁর (এবং তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য জনপ্রিয় ফরাসি ঔপন্যাসিকের) যে কোনও বই প্রথম মুদ্রণে অনায়াসেই ১,০০,০০০ কপি ছাপা হয়। তবে নব ঔপন্যাসিকেরাও যে সাধারণ ফরাসি পাঠকের চোখে ধীরে ধীরে জাতে উঠছেন, তার একটি নিশ্চিত প্রমাণ পাই এই ঘটনাটিতে : শুধু এই নতুন সাহিত্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুরন্ত প্রেমিক Editions de Minuit-ই নন, Gallimard-এর মতোন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিশ্রুত প্রকাশক এঁদের কোনও কোনও বই সানন্দে গ্রহণ করছেন। অবশ্য সহজে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এঁরা কেউই লালায়িত নন, উল্টে পাঠকের মনকেই ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তার অনুকূল করে তুলতে চান। এঁদের সাহিত্য কতটা মূল্যবান বা একেবারেই মূল্যবান কি না তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও এঁদের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যে শ্রদ্ধেয়, তা তর্কাতীত।

যে-ক'জন মুখ্য নব ঔপন্যাসিকের নাম আলোচনা করেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই বেশ কয়েকটি করে উপন্যাস ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন, এখনও লিখে চলেছেন ক্রমশই আরও জোর ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, একটি বছরের ভিতরেই কেউ কেউ দুই বা ততোধিক উপন্যাস লিখছেন — এবং এসব আমাদের দেশের পূজা সংখ্যার উপন্যাস নয়, যা যেমন-তেমন করে লিখে দেওয়া চলে এবং যা না লিখলেও কোনও সাহিত্যের কোনও ক্ষতি ছিল না। নব উপন্যাস একটার পর একটা লিখে যাওয়া চারটিখানি কথা নয়, কারণ প্রত্যেকটি উপন্যাসের পিছনে বিদগ্ধ অনুশীলন ও চিন্তার বহু খড়কুটো পোড়াতে হয়, একই পরিচ্ছেদ

বা অংশ কখনও বারবার নতুন করে লিখতে হয়। এ প্রসঙ্গে ক্লোদ সিমঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

> ব্যক্তিগতভাবে আমার যা ভালো লাগে তা সেই ভাষাকে নিরন্তর শব্দে অনূদিত করে চলা, যাকে স্যামুয়েল বেকেট (Samuel Beckett) নাম দিচ্ছেন 'সেটা কেমন করে' বলে। বরং 'কেমন করে সেটা এখন', সেটা কেমন করে আজকের আমার শাশ্বত স্মৃতিতে। এই বর্তমানের মুহূর্তটিতে — সেই মুহূর্তটিকেই যদি একক করে ধরতে চাই — আমি তো কিছুই দেখতে পাই না।

১৯৫৯-এ বলতে দেখি মিশেল ব্যুতরকেও:

> উপন্যাস তাই এক আশ্চর্য মাধ্যমে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার পক্ষে, বুদ্ধিমানের মতো বাঁচার পক্ষে, বেঁচে চলার পক্ষে এমন একটি পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা ক্রোধে প্রায় উন্মাদ ও যা আমাদের সর্বদাই আক্রমণ করতে উদ্যত দশ দিক হতে।

এই ধরনের নানান উক্তি এঁরা প্রত্যেকেই করেন, যেসব উক্তির মধ্যে নিহিত এঁদের একটি ক্ষুরস্য-ধারা সাধনার ইঙ্গিত।

যেহেতু স্ব -স্ব মহিমায় এঁদের প্রত্যেকেই মহীয়ান — এঁদের দুয়েকজনের উপর একাধিক গ্রন্থ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে — একটি ছোট নিবন্ধের আলোচনায় এঁদের সকলকে একত্র করা খুবই কষ্টসাধ্য। এঁদের সকলের সব কথার সম্যক অনুধাবন আমাদের পক্ষে সহজ নয়। তার উপর আছে বই না পাওয়ার হাঙ্গামা। তবে সৌভাগ্যবশত, এখনও নিয়মিতভাবে দুটি একটি মুখ্য ফরাসি পত্র-পত্রিকা দেখা যায়—যাদের মধ্যে আছে বিশেষত 'Critique', শুদ্ধ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক আলোচনার এক অনবদ্য মুখপত্র — তাই কী হচ্ছে না হচ্ছে, কে কী লিখছেন না লিখছেন, চোখে পড়ে। যা নিজে পড়িনি এবং যার সম্বন্ধে শুধু অন্যের আলোচনাই চোখে পড়েছে, সেরকম বই সম্বন্ধে কিছু বলা বা বলতে চাওয়া ধৃষ্টতা হবে।

আপাতত বড় আলোচনার সুযোগ নেই, তাই ধরেই নিচ্ছি, পাশ্চাত্যের আধুনিক কথাসাহিত্যে ভাব, মানস ও শৈলীর যে-যুগান্তকারী বিবর্তন সম্প্রতি সাধিত হয়েছে, বর্তমান নিবন্ধের পাঠকেরা অন্তত মোটামুটিভাবে সে-সম্বন্ধে অবগত আছেন। নব উপন্যাসের প্রসঙ্গে যে সমস্ত পূর্বসূরীর নাম অবশ্য উল্লেখ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন, মুখ্যত, মার্সেল প্রুস্ত (Marcel Proust), কাফকা (Kafka), সার্ত্র (Sartre) ও কাম্যু (Camus)। বলা বাহুল্য, কীভাবে কী আঙ্গিকে, এঁদের সকলের বক্তব্যের মধ্যে কোনও বিবর্তনের একটি স্পষ্ট, ঋজু রেখার আবিষ্কার সম্ভব নয়, — অর্থাৎ একজনের একটি জিনিস থেকেই আরেকজনের অন্য জিনিসটা উদ্ভূত হয়নি; এখানে সব বক্তব্যগুলোরই স্থান আছে, সকলেই একসঙ্গে বাস করছে এক ভয়ংকরভাবে জটিল সমাজ ও জগতে। কেবল এইভাবে এক সঙ্গে বাস করার দরুনই যেন এই এই লেখকেরা, বা তাঁদের এই-এই লেখাগুলি, নিজেদের মধ্যেই এক ভিন্নতর সমাজের সৃষ্টি করেছে, যেখানে কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে এদের প্রভাব অন্যের উপর পড়ছে ক্রমাগতই। এই বস্তুজগত, এই সমাজ ও তাতে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রশ্নের সম্মুখীন হবার চেষ্টা করছে সব উপন্যাস, সে সবের ধারণা যদিও এক অর্থে নব ঔপন্যাসিকরা পেয়েছেন আগের সাহিত্যকীর্তি থেকে, সেই আগের সাহিত্যকীর্তিরই যে এক সোজাসুজি ও অনিবার্য পরিণাম এই নব উপন্যাস, সেরকম বলতে চাওয়া ঠিক হবে না। কিছুরই প্রত্যক্ষ পরিণাম কিছু নয়, না এই জগতে, না তার সাহিত্যে।

তাঁদের আঙ্গিকের একে প্রচণ্ড নূতনত্ব তো আছেই — যাতে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, একই অংশ বার বার পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে হয় কী ঘটছে বা লেখক কী বলতে চান — যে ভাষা নব ঔপন্যাসিকদের সকলেই ব্যবহার করেন, তারও বৈশিষ্ট্য কিছু কম নয়। এত বিদগ্ধ, অনধ্যাত ভাষা অন্য ধরনের উপন্যাসে দেখা যায় না। এখানে সব কিছুই একটা আগে থেকে ছক-কাটা ব্যাপার — ভাষার সঙ্গে ভাব, আঙ্গিক ও বক্তব্য অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। ভাবের দিক থেকে দুটি প্রধান উক্তির মধ্যে নব উপন্যাসের প্রেরণার উৎস খোঁজা চলে — একটি দিয়োজেন দো-এনো-আন্দার (Diogene d' Oenoanda) : 'অধিকাংশ লোকই অসুস্থ, যেন মহামারীতে আক্রান্ত, এবং সে অসুখটা তাদের কী? জগত সম্বন্ধে তাদের যত মিথ্যা

ভুল ধারণা ও বিশ্বাস।' দ্বিতীয় উক্তিটি ভের্নের হাইজেনবের্গের (Werner Heisenberg) : 'দেখা যাচ্ছে, আধিভৌতিক অণুপরমাণুর বাস্তব, নিরপেক্ষ সত্য সম্বন্ধে যে-ধারণা, তা কেবলি আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হচ্ছে, ধূমাচ্ছন্ন বা ভুল বোঝা সত্যের কোনও নতুন ধারণায় কুয়াশার মধ্যে নয়, তা অদৃশ্য হচ্ছে সেই গাণিতিক স্বচ্ছ তরল প্রাঞ্জলতায় যা আধিভৌতিক কণার অস্তিত্বের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আগ্রহহীন, কিন্তু সেই কণার অস্তিত্বের যে জ্ঞানে আমরা সমৃদ্ধ, উক্ত প্রাঞ্জলতাটির বাসস্থান সেখানেই।'

সোজা করে, অল্প কথায় বলতে গেলে নব উপন্যাসের সাধারণ মানসিক গুণগুলি চারটি। প্রথমটি, তার নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রেরা নামহীন, আসলে তাদের চরিত্রগত অস্তিত্বই নেই --- যেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাদের ফুটে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনাকে সজাগ লেখক দৃঢ়হস্তে কেবলি রবার দিয়ে মুছে চলেছেন। তারা তাদের আশপাশের বস্তুরই সামিল। বলা হয়তো হচ্ছে কারও নাম দ্যুপঁ (Dupont), কারওর নাম ভালাস (Wallas), কিন্তু যে দ্যুপঁ, সে অনায়াসেই ভালাস হতে পারত, এবং ভালাসও হ'তে পারত দ্যুপঁ।' এবং নামের উল্লেখ বইয়ে থাকলেও (এখানে কাফকার 'দুর্গে'র K-র কথা সহজেই মনে আসা উচিত পাঠকদের) তা কয়েকটি বারের জন্য মাত্র — বইয়ের প্রায় সর্বত্রই সর্বনামের মিছিল, যেমন 'আমি' বললাম, তারপরে 'সে' এই বলল, তাপরে 'তারা' ওই করল। আবার নামহীন ব'লেই চরিত্রেরা (ও তাদের চিন্তা-কর্ম বাক্য) সর্ববিশেষহীন। বিশেষণ যদিও বা থাকে, তা যেন কিছুতেই কোনও কিছুর উপরই লেখক বা চরিত্রের মতামত আরোপ না করে। যেমন আকাশ যদি মেঘলা হয় তো তার আগে ওই মেঘলা বিশেষণটা না হয় যোগ করাই গেল, কিন্তু তাকে কোনওক্রমেই সুন্দর বা নিষ্ঠুর বা ভালো বা মন্দ বলা চলবে না। কারণ তা করলেই স্বেচ্ছাচারী মন তাঁর নিজের রঙে রঞ্জিত করছে সেই বাইরের বস্তুকে যা তার বেপরোয়া অস্তিত্বের সত্যে স্বাধীনভাবে বিরাজ করছে মনের অতীতে। মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল একদিন কথাসাহিত্যে, তার সদর্প প্রতিবাদ এই নব উপন্যাস। তবে এটাও সত্য, এই আবেগশূন্য ও বিশেষণহীন রচনা বড় নির্মম, পড়তে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

নব উপন্যাসিকদের দ্বিতীয় সাধারণ গুণ হল, তাঁদের চরিত্রদের এক অবিচ্ছিন্ন গতিভঙ্গি, কখনও স্বতঃপ্রণোদিত কখনও আত্মবিস্মৃত হয়ে তারা কেবলি ঘুরে মরছে, বার বার একই রাস্তায়, একই বৃত্তের মধ্যে, ফিরে ফিরে আসছে একই পার্কে বা স্কোয়ারে — যেন একটা নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার (এবং বাইরের বস্তুজগতের মধ্যে আত্মোপলব্ধির) পরিক্রমণে। লেখকদের বক্তব্য, ওই গতিটাই বা ভঙ্গিটাই বা হাত নাড়া পা নাড়াটাই সব, তা-ই মানুষকে পৃথক করছে বস্তু থেকে, তার বাইরে মন বলে আর কিছু নেই।

তৃতীয় গুণ : রহস্যোপন্যাস বা ডিটেকটিভ কাহিনির সঙ্গে এই ধরনের রচনায় মিল। একটা খুন বা একটা তদন্ত বা একটা বলাৎকার, এই নিয়েই অধিকাংশ ঘটনা। এঁরা বলেন, রহস্য এঁদের কাছে একটা সহজ ও সরল মাধ্যম আত্মজিজ্ঞাসার ও বস্তুজগতে আত্মোপলব্ধির। একবার এইরকম তদন্তের মধ্যে পড়ে গেলে নিজেকে নিয়ে গবেষণার কাজটা বেশ ভালো করে শুরু হয়। তবে সচরাচর ডিটেকটিভ উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, নব উপন্যাস তা একেবারেই নয়।

চতুর্থ ও অন্যতম প্রধান গুণ : লেখককে কেবলি একটা আয়নার সম্মুখীন করা — লেখকের মনটা হওয়া উচিত ঠিক একটি স্বচ্ছ আয়নার মতো, এই বক্তব্য। এঁদের অনেকেই, বিশেষত নাতালি সারোৎ, পল ক্লী-র (Paul Klee) এই বিখ্যাত উক্তিটির প্রসঙ্গ পেড়েছেন বার বার : 'আর্টের উদ্দেশ্য দৃষ্টকে সংস্কার করা নয়, দেখানো' (L' art ne restitue pas le visible, il rend visible)। আয়নার কাজ, তাতে প্রতিফলিত জিনিসের হুবহু প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা --- কিন্তু সে প্রতিচ্ছবি ঠিক সেই একই জিনিস নয় যার প্রতিফলন সেটা। যেমন, আয়নার মধ্য দিয়ে আমার ঘরের যে বইটিকে দেখছি, সেটি আমারই বই, আবার আমার বইটিও নয়, তাকে আমি ছুঁতে পারব না, সরাতে পারব না, তা আমার ইচ্ছার বা মনের সর্ব সংক্রমণের অতীত একটি বিশুদ্ধ স্বাধীন অস্তিত্বে বিরাজমান। আয়নার মধ্যে যখন নিজেকে দেখি, তখনও একই কথা—আমি হাত নাড়ালে আমার বেচারা নিরুপায় প্রতিচ্ছবিরও হাত যদিও নড়বে, সে প্রতিচ্ছবি

বস্তুজগতের অঙ্গ, ওই প্রতিফলিত বই ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত — মনের অতীত। নিছক জড় বস্তুর সঙ্গে তার যেমন সম্পর্ক, তার সঙ্গেও বস্তুর সম্পর্ক তেমনি। আমি ও বাইরের জগত, এই দুয়ের অনিবার্য সংস্পর্শে যে অবিরাম সংঘাত, তাইতেই রূপ নেয় জীবন। মানুষ ও বস্তুর একমাত্র পার্থক্য হল, মানুষ ভঙ্গির দ্বারা চিহ্নিত করে নিজের অস্তিত্ব, বস্তুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নড়ায়। অন্যদিকে, বস্তুকে যেমন সে প্রভাবান্বিত করছে, বস্তুর প্রভাবও তার উপর পড়ছে ক্রমাগতই। বস্তুর সংস্পর্শলব্ধ যে-জ্ঞান, তা-ই মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র সত্য।

উপরে যা বলা হ'ল, তার উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক রব-গ্রীইয়ের একটি প্রখ্যাত উপন্যাস *লে গম* (Les Gommes) বা *রবার*। প্রথম যখন বইটি পড়তে বসি, মনে হয়, এই তাহ'লে নব উপন্যাস, এই নিয়েই এত হইচই? এতো একেবারে ডিটেকটিভ উপন্যাস। অবশ্য উপন্যাসটি শেষ করে (এবং বিশেষত, তারও বহু পরে বইটি সম্বন্ধে লেখকের নিজের বক্তব্য পড়ে) মত বদলাই। মার্কিন সমালোচক ব্রুস মরিসেট (Bruce Morissette) বইটিকে এক কথায় বর্ণনা করেছেন এই ব'লে বদ্ধ বৃত্তাবদ্ধ ইডিপাসের কাহিনি। অসহ্য জিনিসটি না গ্রিক নাটক, না ডিটেকটিভ উপন্যাস, কিন্তু উভয়েরই ধ্বনিমুখর ব্যঞ্জনা এতে। কাহিনি এক ভালাসকে নিয়ে, যাকে পাঠানো হয়েছে কোনও এক দ্যুপঁর খুনের তদন্তে। ধীরে ধীরে জানা গেল, দ্যুপঁ কিন্তু আসলে মরেনি, ও এক অনিবার্য ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত খুন করতে বাধ্য হবে ওই ভালাসই। বইয়ের প্রারম্ভে দেখি, তদন্তর করতে এসে গোয়েন্দা ভালাস অচেনা শহরে ঘুরে মরছে, একই রাস্তায় বার বার, একই লোককে ফিরে ফিরে নানা প্রশ্ন করে। এই শহর, ফিরে ফিরে ওই একই অচেনা লোকের মুখ বা একই রাস্তা, কখনও কোনও আয়নার মধ্য দিয়ে দেখা ওই শহরের একাংশ, ইত্যাদিতে তার সমস্ত যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একটার পর একটা ছলনার ফাঁদে পা দিচ্ছে। নিজেকে প্রশ্ন করছে, কে আমি, কে তুমি, কোথায় এলাম, অর্থ কী? কিন্তু লেখকের বক্তব্য, অর্থ কোথাও নেই, অমন প্রাণপণ অন্বেষণেই ভালাস নিজের বিড়ম্বনা নিজে ডেকে আনল। কারণ যেটা যেভাবে রয়েছে, সেটা ঠিক সেইটাই, তার অতীত কোনও অর্থে উৎসাহী নয়, বস্তুজগতের এই সত্যটা যদি ভালাস মনে মনে মেনে নিতে পারত তো সে নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরে আসত, দ্যুপঁর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারও হত না, দ্যুপঁকে তার খুনও করতে হত না। র খুনের রহস্য সমাধান করতে সে এল, শেষ পর্যন্ত তাকেই খুন করে সে হল খুনি। ওর দরকার ছিল, ওর ওই আমি-বস্তুটাকে মুছে ফেলা রবার দিয়ে, তাকে নিশ্চিহ্ন করা। তা নয়, বৃথাই একটার পর একটা রবার সে কিনে গেল ওই অচেনা শহরে নানা দোকান হতে — প্রশ্ন করতে সে বার বার ফিরে আসছে একই দোকানে, তাই পাছে লোকের সন্দেহ জাগে, যখনই আসে, প্রতিবারই একটা করে রবার কেনে।

রব-গ্রীইয়ের অব্যবহিত পরের (*রবার*-এর পরেই) যে-বইটি, *ল্য ভোয়াইঅর* (*Le Voyeur*) বা *দর্শক*, তাতে দৃষ্ট বস্তুজগতের সর্বস্বতা যেমন একদিকে আরও প্রকটভাবে প্রতিফলিত, অন্যদিকে তেমনি আমি ও বাইরের বস্তু জগতের সঙ্গে সে- আমার সম্বন্ধ নিয়ে যে-প্রশ্ন, তাও উত্থিত আরও জোরের সঙ্গে। কেটি সাত-আট বছরের বালিকার উপর ধর্ষণ ও অবশেষে তাকে হত্যা করা এই নিয়ে ঘটনা। এখানে কর্মকর্তা (বা নিশ্চল বস্তুজগতে 'গতিভঙ্গির' কর্তা) হল এক মাতিয়াস (Mathias), ব্যবসায়ী পর্যটক, যে একটি দিনের জন্য এক ঝকঝকে রৌদ্রস্নাত দ্বীপে এসে হাজির হয়েছে। দ্বীপটিতে অধিবাসীর সংখ্যা কম, এবং রৌদ্রালোকে ঝলকিত তার বস্তুজগত আপন স্বাতন্ত্র্যের সর্বসন্দেহাতীত অস্তিত্বে মাতিয়াসের দৃষ্টিতে বিধৃত। বইটি দু'ভাগে বিভক্ত — প্রথম ভাগ ধর্ষণের আগের অবস্থা নিয়ে, যখন মাতিয়াস ভাবছে, অন্য ভাগ ধর্ষণের পরের অবস্থা, যখন সে ব্যাপারটাকে গোপন করার চেষ্টা করেছে; মাঝখানে একটি পাতা ফাঁক, একেবারে সাদা, যেখানে নিশ্চয় ধর্ষণটি ঘটেছে, এবং যার কোনও বিবরণ লেখক দিলেন না। প্রথম ভাগে দেখি মাতিয়াসের লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি শক্ত মোটা দড়ির উপর, যা ফরাসি বা রোমান 8 বা বাংলা চার-এর আকারে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া হল, ছেলেবেলা থেকেই মাতিয়াসের এক বিষম আসক্তি মোটা দড়ি বা শক্ত সুন্দর ফিতা ইত্যাদি সযত্নে সঞ্চয়ের উপর,

কৈশোর পর্যন্ত এক বহু পুরোনো খালি জুতোর বাক্সে এই ধরনের কত দড়ি ইত্যাদি সে নাকি জমিয়ে এসেছে। অতএব, যখন ওই ৪-আকারের দড়িটিকে সে লুব্ধ আনন্দিত মনে রাস্তা থেকে তুলে নিল, এবং দড়িটাকে নীচু হয়ে তুলতে গিয়েই হঠাৎ তার নজরে পড়ল মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে আছে অদূরেই, এবং তার দিকে কৌতূহলপূর্ণ এক স্নিগ্ধ, অল্প, শান্ত হাসিতে চেয়ে আছে। এবং তারই সামান্য কিছু আগে মাতিয়াসের চোখে পড়ে একটি চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন — চলচ্চিত্রটির কাহিনি ধর্ষণ-সংক্রান্ত। সমস্ত ইঙ্গিতগুলিই (দড়ি, ৪-এর আকার, মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া, ও ধর্ষণ-সংক্রান্ত চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন) এত স্পষ্ট যে পরে কী ঘটবে বা ঘটতে পারে, তা ইতিমধ্যেই পড়া পাতার মতো — ওই রৌদ্র ঝলসিত দ্বীপের বস্তুজগতের মতোই প্রকটভাবে পরিষ্কার। দ্বিতীয়ভাগে আরম্ভ হচ্ছে দ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় মাতিয়াসের স্বেচ্ছাকৃত পরিক্রমণ, *রবার*-এর ভালাসের মতো কোনও ব্যর্থ আত্মজিজ্ঞাসার বা আত্মোপলব্ধির অন্বেষণের তাগিদে নয়, কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটাকে নিয়ে কোনওরকম বাড়াবাড়ি না করার প্রচেষ্টাতে, সেটাকে ধামা-চাপা দিতে। একই পথে ওই বার বার পরিক্রমণের (যে পরিক্রমণও, লেখক জানাচ্ছেন, এক স্বেচ্ছাকৃত ৪-এর আকার নেয়) মধ্য দিয়ে নিজের আগের পদচিহ্ন সে লুপ্ত করে দিয়ে যাচ্ছে। ভালাসের মতো মাতিয়াসকেও দেখি একটার পর একটা ফাঁদে পা দিতে, জোর করে বস্তুজগতের শান্তি বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু যেহেতু অন্বেষণের বিছায় তাকে কামড়ায়নি, শেষ পর্যন্ত ভালাসের মতো তাকে ধরা পড়তে হল না, নিজেরই কৃতকর্মের কারাগারে বন্দী হতে হল না, সে পালিয়ে গেল, মুক্তি পেল। এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করেন — কিন্তু পালানোর পরেও আত্মগ্লানি থেকে কি সে মুক্তি পাবে? — তো তখন তাঁদের উত্তর দেওয়া চলতে পারে, নব ঔপন্যাসিকরা তো মন মানেন না; তাঁদের চোখে শুধু বস্তুই আছে, এবং সেই বস্তুজগতে মানুষের ভঙ্গিটুকুই আছে।

ওই যে পল ক্লী-র উক্তিটি—আর্ট দৃষ্ট বস্তুর ব্যাখ্যা বা সংস্কার করবে না, শুধু তাকে দেখাবে—যে উক্তিটি নব ঔপন্যাসিকদের সকলের পক্ষে এক অন্যতম প্রধান সত্য, তা শুনে মনে হয় হয়তো চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই ধরনের উপন্যাসের একটা স্বাভাবিক যোগ থাকতে পারে; এবং যোগ আছেও। মদেরাতো কান্তাবিলে-র চিত্র রূপায়ণ সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি — রব-গ্রীইয়েকেও দেখি সরাসরি দুটি চিত্র-উপন্যাস (cine-roman) লিখতে, *অমর* (*L'immortelle*) ও *গত বছর মারিয়ানবাদে* (*L'annee derniere a Marienbad*)। অন্তত দ্বিতীয়টি (প্রথমটির কথা জানি না) তো চলচ্চিত্রে ইতিমধ্যেই রূপায়িত হয়েছে এবং সারা ফিল্ম-জগতে সাড়া তুলেছে। তবু এঁরা উপন্যাস ও চলচ্চিত্রকে দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা বলেই গ্রহণ করতে চান, বলেন, উপন্যাসের কাঠামো মূলত তৈরি হয় শব্দে (যা উচ্চারিত নয়, লিখিত), চলচ্চিত্রের কাঠামো দৃষ্টিতে।

উদাহরণ শুধু রব-গ্রীইয়ে হতেই দিলাম, কারণ প্রথমত নব উপন্যাস আন্দোলনের ইনি একজন 'কর্তাব্যক্তি'; দ্বিতীয়ত বই দুটি সবেমাত্র পড়ে শেষ করেছি, তাদের বক্তব্যের আওয়াজটা এখনও মাথায় হাতুড়ি পেটাচ্ছে'। তবে অন্যদের রচনা থেকেও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত। এঁদের বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি প্রধানত দুটি। প্রথমত, অর্থ খোঁজার সকল প্রচেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাওয়া সত্ত্বেও আমার তো মনে হয় না যে অর্থের (বা অর্থের অন্বেষণের প্রচেষ্টায়) অস্তিত্বকে এঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে অস্বীকার করতে পেরেছেন। নয়তো এত ভেবে-চিন্তে, কাটাকুটি করে, ছক কেটে লেখেন কেন? একটা কিছুকে চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করার জন্যেই নিশ্চয় এত কোমর বাঁধা, পাঁয়তাড়া কষা, কসরত করা — এবং না হয় মেনেই নিলাম, সেই একটা কিছু হল সব কিছুর চরম অর্থহীনতা; কিন্তু সেই অর্থহীনতাটাকেও কি 'অর্থপূর্ণ' ভাবে ফুটিয়ে তোলার পরিশ্রম করছেন না এঁরা? দ্বিতীয় আপত্তি হল লেখা সম্বন্ধে না হয় আয়নার প্রসঙ্গটাকেও মেনে নিতে বাধ্য হলাম। তবু প্রশ্ন থেকে যায় : প্রতিচ্ছবি? ব্যক্তি-মানুষের বা সামাজিক মানুষের বা লেখক-মানুষের কাছে কোনটা তবে বড়? ওই আসল বস্তুটা না তার প্রতিচ্ছবিটা? আয়নার ভিতরে যদি দেখি আমার হাতটা নড়ছে, তা হলে আমি-নামক

আসল বস্তুটা (এবং ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানসিক সত্তাটাও) নিশ্চয়ই সে-হাতটা কী ভেবে (এবং ভাবনার প্রশ্ন একবার এসে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রশ্নও এসে যাবে) নাড়াচ্ছি, নয় কি?

বলা যায় না, হয়তো নব উপন্যাস ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করে এখনও বুঝে উঠতে পারিনি বলেই এমন আপত্তি তুলছি। তবু দেখে ভালো লাগে, এ-ধরনের প্রশ্ন আমার মতো অর্বাচীনই নয়, কৃতবিদ্য আরও অনেক করছেন।

৪র্থ বষ ৫-৬ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৩)

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সবাক চলচ্চিত্রের শিল্পসূত্র

চলচিত্রের শিল্পপ্রকৃতি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই নির্বাক চলচিত্রের ভিত্তিতে চিন্তিত। দৃশ্যবস্তুর গঠন ও তার পরম্পরা-চলচ্চিত্রের এই দুই মৌলিক উপাদানে তার শিল্পভাবনার উৎপত্তি তো বটেই,পরিণতিও বলা যেতে পারে। বেলা বালাজ, আইজেনস্টাইন, পুডভকিন, রুডলফ আর্নহাইম— সকলেরই চিন্তার আরম্ভ নির্বাক দৃশ্যবস্তু থেকে। আইজেনস্টাইন সবাক চলচ্চিত্রের সম্পর্কে উৎসাহী হলেও তাঁর কান্তিতত্ত্ব চর্চায় তার তেমন কোনও বিশিষ্ট প্রকাশ হয়নি। এমনকি তাঁর সবাক চলচ্চিত্রও মূলত নির্বাকযুগীয় রীতিরই সম্প্রসারণ। চ্যাপলিনের ছবিতেও তাই। এ বিষয় পরে আলোচ্য। আপাতত প্রধান কথা এই যে সবাক চলচিত্রের কোনও নন্দনতাত্ত্বিক নিরীক্ষা এখনও নির্বাক যুগের রচনার মতো দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ১৯৩৩ থেকে ৩৮ সাল পর্যন্ত লেখা প্রবন্ধের বই ফিল্ম *অ্যাজ আর্ট* বই-এর ভূমিকায় ১৯৫৮ সালে আর্নহাইম লিখেছেন:

> To go back to my writings about film means more than retracing my steps. It means re-opening a closed chapter...film is, to me, a unique experiment in the visual arts which took place in the first three decades of this century.

আর্নহাইমের মতে সবাক চলচিত্র আদৌ শিল্প হতে পারে না কারণ তাতে চক্ষুগ্রাহ্য ও কর্ণগ্রাহ্য এই দুই সমান্তরাল ধাপকে মেলাবার বৃথা প্রয়াস; সে প্রয়াস সম্ভব কেবল মঞ্চনাট্যে যেখানে দৃশ্যবস্তু কথার ক্রীতদাস হয়ে থাকে, চলচ্চিত্রের মতো প্রাধান্য অর্জন করে না। তাঁর *Film As Arts* বই-এর শেষ পরিচ্ছেদের শিরোনামা হল: 'The dialogue paralyses visual action.'

একপক্ষে আর্নহাইমের কথাটা ঠিকই। কেননা বাস্তবকে অসম্পূর্ণ রেখে কেবল দৃশ্যমাত্রিক ছন্দের শিল্প হয়ে চলচ্চিত্র অন্যান্য চক্ষুগ্রাহ্য শিল্পের মতো দৃশ্যবস্তুর বিকৃতি (distortion)-র মধ্য দিয়ে যে তীব্রতা সঞ্চার করতে পারে সেটা সবাক চলচ্চিত্রের গোটা বাস্তবের মধ্যে সম্ভব নয় একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের মেজাজ, গঠনরীতি ও তার কেবল প্রকাশরীতি নয় প্রকাশ্য বস্তুর আলোচনায় দেখা যায় যে সেখানে জীবনের অতি সাধারণ বাস্তবের চেহারা নেই। আইজেনস্টাইনের তিন সিংহমূর্তি যখন আসীন অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায় তখন তাতে এক সাহিত্যগত প্রতিমাকে চিত্রে পরিণত করে— 'যেন নাবিকদের গোলার আঘাতে ক্রুদ্ধ রাজকীয় শক্তি সিংহের মতো উঠে দাঁড়াল।' একে যদি সবাক চলচ্চিত্রে আমদানি করি তাহলে সিংহের গর্জন যোগ করা যেতে পারে। তখন তার সাহিত্যিক মর্ম এই দাঁড়ায়— 'যেন নাবিকদের গোলার আঘাতে ক্রুদ্ধ রাজকীয় শক্তি সিংহের মতন গর্জিয়ে উঠে দাঁড়াল।' সিংহের উত্থান এবং গর্জন একত্র হলেই এখানে ছন্দপতন অবশ্যম্ভাবী; হাস্যকর হয়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা, কেননা যতক্ষণ ওই মর্মর সিংহ নীরব ছিল, ততক্ষণ তা প্রতিমা— যেই গর্জিয়ে ওঠে তখনি তা প্রতিমা থেকে বাস্তবে পরিণত হতে চায়, অথচ হতে পারে না, ফলে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

ড্রায়ারের অবিস্মরণীয় ছবিতে যখন জোন তার কাতর মুখ দুই পাশে আন্দোলিত করে, তখন তার সঙ্গে যদি কাতরোক্তি জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে তার রসভঙ্গ হতে বাধ্য। যদিও ড্রায়ার এ ছবিতে শব্দ সংযোগ করতেই চেয়েছিলেন—ফল কী হত আমরা জানি না— কিন্তু পারেননি, কারণ আমেরিকায় চালু হলেও ফ্রান্সে শব্দসংযোগের ব্যবস্থা তখনও সম্পূর্ণ নয়। 'প্যাশন অভ জোন অভ আর্ক'কে বলা যেতে পারে নির্বাক ছবির প্রকাশশীলতার প্রত্যন্তসীমা। চ্যাপলিনের কমেডি তো বিশেষভাবে নির্বাক; 'মডার্ন

'টাইমমস'-এ বাক্যের পরিহাস, 'ভের্দু'তে নির্বাক কমেডি ও সবাক বক্তৃতা দুই ভাগে বিভক্ত (কিন্তু ওই বক্তৃতাকে এমনভাবে চ্যাপলিন নির্বাক উত্তেজনার চূড়ায় চূড়ায় বসিয়েছেন যে তার ফল অতি সূক্ষ্ম এক ফাঁকের মধ্য দিয়ে উৎরিয়ে গেল); 'লাইম লাইট'-এর সবাক অংশ হৃদয়াবেগে ভারাক্রান্ত হতে শুরু করে—নির্বাক কমেডির অংশ না থাকলে ছবি তার ভার বইতে পারত কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ চ্যাপলিন কোনওকালেই সবাক্ চলচ্চিত্রকে নির্বাক ছবির মতো বাগে আনতে পারেননি। সকলেই যে নির্বাক-সবাকের মধ্যবর্তী নদী পেরোতে পারেননি, এইটেই আমার বক্তব্য নয়, বক্তব্য এই যে নির্বাক ছবি বাস্তবকে কমেডির বা বীরোচিত ভঙ্গিমার বা ঐতিহাসিক দূরত্ব ইত্যাদির মধ্যে রেখে রীতিবদ্ধ (stylise) করে গোটা বাস্তবের সোজাসুজি চেহারাকে প্রকাশ করে না।

এখানে ভালোমন্দের কোনও প্রশ্নই নেই, কেননা নির্বাক যুগের নিখাদ শিল্পপ্রতিভা চলচ্চিত্র রসিকের অজানা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে সবাক্ চলচিত্রের শিল্প বৈশিষ্ট্য কী? তার প্রকাশভঙ্গিমার পার্থক্যই বা কোথায়? শিল্পসীমানা (artistic limitations) গোটা বাস্তবের মধ্যে চারিয়ে যাবার পরেও তার শিল্পপ্রকৃতি কীভাবে নবরূপ পেল যার জন্য তার মধ্যে অতি প্রামাণ্যধর্মী (documentery-style) ছবিও বাস্তবের শিল্পায়নে সমর্থ হয়েছে?

গোটা বাস্তব যাকে বলছি তার মধ্যেও সীমানা আছে বলা বাহুল্য, যেমন এখনও ছবিতে গন্ধযোগ চালু হয়নি, বা চলচ্চিত্রের নগ্নদেবীদের এখনও হাতে ছোঁয়া যায় না। এতৎসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে চলচ্চিত্রের পূর্বতন শিল্পসীমানা সবাকযুগের মধ্যে এসে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে, এবং বাস্তবের বহিরঙ্গের এত নিকট আর কোনও শিল্প নয়। শব্দে রঙে মিলে চলমান ছবির জগৎকে এমন একটা প্রত্যক্ষতা এনে দিয়েছে যার ফলে কেউ কেউ বলেন যে চলচ্চিত্র আগে যদি বা ছিল, এখন আর আদৌ শিল্প নয়, ওতে কেবল বাহ্য ঘটনাচঞ্চলতাই সম্ভব, মনের অন্তর্নিহিত সত্য এর মধ্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। কার্যত এই প্রত্যক্ষতা তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র বাস্তব থেকে দূরে সরে আসার বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের ভাবপ্রকাশের রীতিকেও অনেকখানি আয়ত্ত করেছে। সেইখানেই তার শিল্পমর্যাদা, এবং শিল্পপ্রকৃতির সূত্র।

চলচ্চিত্রের ভাষা চিত্রভিত্তিক, তাতে কথা বা ধ্বনি সাহায্য জোগায় মাত্র—এই সনাতনী ধারার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া চলে না, কেননা তাদের কাজ সমগ্রভাবে সবাক যুগের শিল্প পরিচায়ক নয়, যদিও তাতে কিছু বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। ঠাট্টাছলে বলা যেতে পারে যে রেনের 'হিরোশিমা মনামুর'-এ শিল্পরীতি অনেকটা আমাদের সরকারি প্রামাণ্যচিত্রের মতো; যেন পূর্বলিখিত ভাষ্যের অনুরূপ চিত্র (illustration)। হিরোশিমার অনেক অংশে এমন ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্যবস্তুর সমাবেশ যে কথিত ভাষ্যের সাহায্য ছাড়া তার অর্থভেদ অসম্ভব। 'মারিয়েনবাদ'-এও চিত্র ও কাব্য আর্নহাইম-এর মুখে চুনকালি দিয়ে সমান্তরাল পথে চলেছে, সার্থকভাবে। বার্গমানের 'সেভেন্থ সীল'-এ নাইট, জোফ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বসে বলে: 'এই দিনটি আমি কখনও ভুলব না—এই নীরবতা, এই গোধূলি, এই দুধ, ফল, সন্ধ্যার আলোতে তোমাদের মুখ' ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্তরের অনুভূতি বোঝাতে সোজা সাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া। তবু বার্গমানকে আমরা চলচিত্রের বিচারে নস্যাৎ করতে পারি না, কারণ তিনি যে শিল্পের আশ্রয়ই নিন, চলচিত্র শিল্প তাঁর নখদর্পণে, এবং প্রকাশশীলতার শিখরে তিনি ঠিক পৌঁছিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত 'সেভেন্থ সীল' সাহিত্যময়তা সত্ত্বেও দৃশ্যবস্তুর সংগঠনের জোরেই চলচ্চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো সাবেকি চলচ্চিত্রধর্মিতার চূড়ান্ত নিদর্শন এ ছবি নয়। কিন্তু যদি রসাস্বাদই বজায় থাকে তবে ওই চুলচেরা বিচারে কাজ কী?

তবু কোনও শিল্পের নির্যাসিত শিল্পকে বা তার প্রকাশভঙ্গির পরম বৈশিষ্ট্যকে খুঁজতে গেলে সূক্ষ্মবিচার চাই। এই বিচারের গোড়ায় মাইকেল রোমার-এর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিই। তিনি বলেছেন:

All of us bring to every situation, whether it be a business meeting or a love affair, a social and psychological awareness which helps us to understand complex motivations and relationships. This kind of perception, much of it non-verbal and based on apparently insignificant clues,is not limited to the educated or the gifted. We all depend on it for our understanding of other people and have become extremely proficient in the interpretation of subtle signs–a shading in the voice, an averted glance. This nuanced awareness however is not easily called upon by the arts, for it is predicated upon a far more immediate and total experience than can be provided by literature and the theatre with their dependence on the word, or by the visual arts–with their dependence on the image. Only film renders experience with enough immediacy and totality to call into play the perpetual processes we employ in life itself.

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক 'ব্রিফ এনকাউন্টার' ছবির শেষ দৃশ্য। নায়ক চলে যাচ্ছে, রেল স্টেশনের চায়ের দোকানে বসে বিদায় নিচ্ছে নায়িকার কাছ থেকে। এর মধ্যে নলবনে হস্তীর মতো এক পরিচিতা বিশালবপু, প্রগলভা মহিলার প্রবেশ। নায়ক-নায়িকার মূল্যবান মুহূর্তগুলি একটি একটি করে নিঃশেষ হতে চলেছে। প্রতিবেশিনীর অনুরোধে নায়ক তাকে এক পেয়ালা চা এনে দেয়—তাঁর বাক্যস্রোত এদিকে অব্যাহত। নায়কের ট্রেনের ডাক পড়ে মাইক্রোফোনে। বিদায় মুহূর্তের শেষ সংলাপ:

প্রতিবেশিনী মহিলা (নায়ককে): Where is the suger dear?

নায়ক (স্থির দৃষ্টিতে): It's in the spoon.

বলেই নায়ক মুহূর্তের জন্য নায়িকার কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে যায়।

চিনির খোঁজখবরের এই দুটি লাইন থিয়েটারে অর্থহীন, এমনকি সাহিত্যেও। কেননা রোমার চলচ্চিত্রের যে immediacy ও totality -র কথা বলেছেন তাছাড়া এর সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা হয় না। চতুস্পার্শ্বিক দৃশ্য ও শ্রাব্যজগতের সম্পূর্ণতার মধ্যে অর্থগ্রহণের যে জটিল প্রক্রিয়ায় আমরা বাস্তবজীবনে অভ্যস্ত, যার মধ্যে বহু সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যবর্তী উপাদানের সংযোগে কোনও পরিস্থিতির একটি বিশেষ অর্থ আমাদের মনে অলৌকিকভাবে পৌঁছায়, এখানে গোটা ঘটনা এবং পরিবেশের একটি অটুট ঐক্য ও সত্যতার মধ্য থেকে সেই অর্থ আমাদের মনে প্রবেশ করছে। বহু ট্রেন ও যাত্রী পারাপারের মধ্যে অচল, ময়লা, ইঙ্গিতময়ী বারমেইড ও হাস্যমুখর গার্ডের প্রেমালাপ—সমস্ত মিলিয়ে ওই গোটা বাস্তবের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষভাব ব্যতিরেকে আমাদের কাছে চরম রোমান্টিক বেদনার মুহূর্তে 'চিনিটা কোথায়'—এ প্রশ্ন অসংলগ্ন, অর্থহীন। এখানে পরিচালক যে কাজটি করেন সেটি বাস্তব জীবনে করে আমাদের মন। দৃশ্য ও শ্রাব্য সমস্ত বস্তু থেকে অর্থ আহরণ করে মন। সেই মনের স্থান যখন পরিচালক নেন তখন আমরা তাঁর দৃষ্টিতে বাস্তবের একটি বিশিষ্ট অর্থ দেখতে পাই—বাস্তববিন্যাসের রীতির ফলে।

নির্বাকযুগীয় অভিনয়ে অভিনেতার মুখ নড়ে কিন্তু কথা শোনা যায় না, এঅবস্থায় খানিকটা অঙ্গভঙ্গির আতিশয্য অর্থাৎ বাস্তব থেকে দূরত্বই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যখন অঙ্গভঙ্গি এবং কথা দুই একত্রে পাওয়া গেল তখন অভিনয়কে রীতিবদ্ধতা (stylisation) থেকে সরে বাস্তবের অনেক কাছাকাছি এসে পড়তে হল। আজকের সবাক চলচিত্রে দর্শকের বাস্তববোধ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে অভিনেতার বা চিত্রনাট্যের বিন্দুমাত্র পদস্খলন—সামান্য আত্মসচেতন দৃষ্টি, অন্যমনস্কতা বা সংলাপের একটি অযথার্থ কথা —তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে, বাস্তবতার বিশ্বাস চলে যায়। কেননা সর্বক্ষণই দর্শকের চক্ষু কর্ণ সজাগ। বাস্তব জীবনে যেমন আমরা কারও মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারি সে সত্যি কথা বলছে কি না, সন্দেহে আন্দোলিত হই বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এটা অনেকটা সে রকম। সবাক মুখের ক্লোজ-আপ দৃশ্যে আর ফাঁকির কোনও স্থান নেই এইভাবে আজকের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সবাক ছবির মধ্যেই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার অবিচ্ছিন্ন একটি বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়—দৃশ্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিচালক সচেষ্ট থাকেন যেন কোথাও দর্শক হোঁচট

খেয়ে এই মায়াবাস্তব থেকে জেগে না ওঠে—কারণ জেগে উঠলেই রূপধ্বনি থেকে অবিচ্ছিন্ন অর্থ আহরণের এই বাস্তব জীবনগত ধারা বাধা পাবে। বাস্তব জীবনে আমরা সচেতন, অর্ধসচেতনভাবে দেখি শুনি, অবচেতনভাবে ও আমাদের অচেতনে দৃশ্যশ্রাব্য জগৎ আমাদের যেভাবে প্রভাবিত করে, আজকের চলচ্চিত্রের প্রধান ধারা তারই অনুসারী। এই ধারার মধ্যে ক্রুফোর 'জুল ও জিম', রেনের 'হিরোশিমা' ও 'মারিয়েনবাদ', গদার-এর কিছু ছবি, এবং আংশিকভাবে ইংগমার বার্গম্যান বাদে প্রায় সারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ পরিচালককেই ফেলা যেতে পারে। আজকের শ্রেষ্ঠ সবাক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে ক্যামেরার সঙ্গে শব্দগ্রহণ যন্ত্র যোগ দিয়ে বাস্তবকে আরও মূর্ত, আরো হুবহু প্রতিফলনে পরিণত করেছে। কিন্তু এই বহিরঙ্গকে অতিক্রম করে তারই সাহায্যে মনের ঘটনাকে প্রকাশ করছে আজকের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কেননা শব্দের যেমন সহস্র সম্ভাব্য ব্যঞ্জনা সাহিত্যে, তেমনি চলচিত্রে। সাহিত্যের ভাষায় 'প্রভাত' বা 'সন্ধ্যা', 'মানুষ', 'ঘোড়া' ইত্যাদি সমস্ত শব্দের সম্ভাবনা বহুল অর্থময়। জীবনেও তাই। যেহেতু ক্যামেরায় মানুষের ছবি একটি বিশিষ্ট মানুষের সেহেতু তার কোনও ambihuity নেই, সে কেবল একটি স্থূল প্রতিকৃতি মাত্র, নিকোলা চিরায়োমন্তে এবং অন্যান্য কারও কারও এ জাতীয় মন্তব্য অর্থহীন। বাস্তব জীবনে যেমন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন মনের কাছে ওই মানুষের দৃশ্য থেকে নানা বিমিশ্র ভাবের উৎপত্তি হতে পারে (যার মধ্যে চেতন-অবচেতন সবেরই অংশ থাকে) চলচ্চিত্রের দৃশ্যের বেলায়ও তাই। 'জলসাঘর' প্রথমে বা 'লাভেস্তুরা'র শেষ দৃশ্যে আমরা একটি পরিবেশে একটি দুটি মানুষকে শুধু কথা নয়, প্রায় অঙ্গভঙ্গি বর্জিত অবস্থায় দেখি, যেন আঁকা ছবির মতো—অথচ তা সম্পূর্ণ বাস্তব। আমাদের বাস্তব জ্ঞান সেই পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর মনের কথা আমাদের সামনে পৌঁছে দেয় যেমন দিত বাস্তব জীবনে, যদি পরিচালকের দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতাম ওই ঘটনাকে। একটি মেয়ে জানলার ধারে বসে আছে, এই ঘটনার তো কত অর্থ, ব্যঞ্জনা, নিরর্থকতা কত লোকের কাছে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। শুধু দৃশ্যবস্তুতে নয়, সেই সঙ্গে ধ্বনি-শব্দের ক্ষেত্রেও এই সম্পূর্ণ বাস্তবতার জীবনগত অর্থ আমরা খুঁজি। চলচ্চিত্রে সংগীত এই অর্থ আহরণে নেপথ্য থেকে সাহায্য করে বটে কিন্তু যেই সে সামনে এসে দাঁড়াতে চায়, স্বপ্নভঙ্গ ঘটে আমাদের। এইজন্য পাশ্চাত্য ছবিতে সংগীত ব্যবহার ক্ষীয়মাণ, এবং সবচেয়ে অন্তর্মুখী শিল্পী আন্তোনিয়োনির ছবিতে প্রায় বিরল—কেবল বাস্তব সঙ্গীত— যেমন রেস্তোরাঁয় ইত্যাদি ছাড়া (অবশ্য এই জাতীয় সংগীত ব্যবহারে আন্তোনিওনি অতুলনীয়)। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'-য় অন্তর্মুখী দৃষ্টির বলে সংগীত ব্যবহার খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অতি সাবধানী।

অতএব সবাক যুগের ছবিতে শিল্পসীমানা বিস্তৃত হয়ে চলচিত্র শিল্পের নতুন অভিব্যক্তির পথ সৃষ্টি হয়েছে, যে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তবের বাহ্যরূপই তার অন্তর্নিহিত মনোজগতের সন্ধান দিতে পারে। এবং সেই কারণেই আজকের চলচ্চিত্রে নির্বাক ছবির সঙ্গে কথা ও ধ্বনি যোগ করে না,—ছবি, কথা, ধ্বনি এ সমস্তের একটি নতুন সম্পর্ক বিন্যাসে নব শিল্পরীতির সূচনা করে। একটি সবাকছবির নির্বাক পরিচ্ছেদেও আর সেই নির্বাক যুগীয় অভিনয়ে আতিশয্য নেই। যেখানে কথা নেই, সেখানে কথা না থাকাটাই বাস্তব।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা আজকের চলচ্চিত্রের প্রধান অর্থাৎ বর্ণনাত্মক (narrative) ধারার সম্পর্কে প্রযোজ্য। এর পরবর্তী যে অধ্যায় রেনে, ত্রুফো এবং বিশেষত গদার-এর মধ্যে সূচিত হচ্ছে তাতে বাস্তবের মায়াকে ভেঙে দিয়ে বাস্তবের ধারাবাহিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, তার মধ্যে সাহিত্যগত, সাহিত্যবহির্ভূত, সাংগীতিক, বুদ্ধিগত, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ নানা পৃথক স্তরকে একই ছবিতে নানা ভাবে মেলানোর জন্য ছবি শব্দ ও সংগীতের গুরুত্ব ও স্থান পরিবর্তন নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষা থেকে হয়তো এক নতুন ভাষা জন্ম নেবে, কিন্তু তার ব্যাকরণ নির্ধারণের সময়ই এখনও আসেনি।

৪র্থ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৩)

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'-এর বিচার

The Trial Begins... : Abram Tertz ; tr. by Max Hayward
New York, Pantheon Books.
On Socialist Realism : Abram Tertz ; tr. by George Dennis
New York, Pantheon Books.

ছয় বৎসর পূর্বে কোনও একটি বিদেশি সাহিত্যপত্রে এব্রাম টার্টৎস ছদ্মনামে রচিত এক রুশ গল্প লেখকের *বিচারের উদ্যোগ...* বা *The Trial Begins*...উপাখ্যানটি যখন প্রথম পড়ি, তখন কল্পনা করতে পারিনি যে কাহিনিটির উপসংহারে বিদ্রুপিত তদন্তপদ্ধতি, বিচারানুষ্ঠান ও শাস্তিবিধান হুবহু স্বয়ং লেখকের ভাগ্যেই কিছুকাল পরে জুটবে। জানি না, এটাকে লেখকের পূর্বাশঙ্কা বলব না গল্পটিকে বাস্তব রূপদানের জন্য সোবিয়েত বিচারকদের এক উদ্ভট খেয়াল বলব। সম্প্রতি সোবিয়েত ইউনিয়নে আন্দ্রে সিনিয়াভস্কি ও য়ুরি দানিয়েল নামক দুজন সাহিত্যিক 'মাতৃভূমি বিরোধী কুৎসারটনার' অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসরের জন্য 'সংশোধনকারী শ্রমশিবিরে' নির্বাসিত হয়েছেন। বিচারে প্রকাশিত হয়েছে যে The Trial Begins...এর রচয়িতা প্রথমোক্ত অপরাধী।

শাসকগোষ্ঠীর কাছে অবাঞ্ছিত সাহিত্য-রচনার অপরাধে লেখককে কারাগারে নিক্ষেপ, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন বা হত্যার নজির ইতিহাসে নতুন নয়। বেশ কিছুকাল পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ-মার্কিনি কার্যকলাপ তদন্ত সংস্থার সম্মুখে সে দেশের কয়েকজন সম্মানিত নাট্যকার ও অভিনেতাদের কমিউনিস্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর প্রকাশিত হয়েছে কীভাবে Boris Pilnyak, Isaak Babel ও Meyerhold-এর মতো কবি-সাহিত্যিক ও নাট্য প্রযোজকেরা স্তালিনের আমলে একে একে 'অদৃশ্য' হয়ে গেছেন। সম্প্রতি চিন থেকে যে সব খবর চুঁইয়ে আসছে, তা থেকে সন্দেহ হচ্ছে অনুরূপ ব্যবহার জুটেছে সে দেশের বিসংবাদী বুদ্ধিবিদদের ভাগ্যে। শুনেছি চৈনিক সৈন্যবাহিনীর মুখপত্র *Liberation Army Daily*-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই সব লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে হাঙ্গেরিতে ১৯৫৬ সালে ভিন্নমতাবলম্বী কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত 'পেতোফি সার্কল্'-এর প্রচারিত মতের প্রভাব পড়েছে। পেতোফি ছিলেন জনপ্রিয় হাঙ্গেরীয় কবি ; ১৮৪৯ সালের বিদ্রোহে শহিদ হন। তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা স্বদেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক অধিকাবের দাবি জানিয়েছিলেন।

সুতরাং 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্র'ই হোক, 'দক্ষিণপন্থী' বা 'বামপন্থী' সমাজতন্ত্র-ই হোক, প্রতিষ্ঠিত মতবহির্ভূত সাহিত্য রচিত হলেই, তার বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর ভ্রূকুটি প্রতিহিংসাপরায়ণি হয়ে ওঠে। হতভাগ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ত্রুটি স্বীকার করে আমলাতান্ত্রিক বিচারকমণ্ডলীর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। মুক্তিপ্রাপ্তির এই সহজ পথ পরিহার করে সিনিয়াভস্কি ও দানিয়েল বিচারকক্ষে স্বমতে স্থিরসংকল্প থেকে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা স্বদেশের প্রতি অনুগত এবং কোনও অন্যায় করেছেন বলে বিশ্বাস করেন না। সাহিত্যের প্রকৃত বিচারক পাঠকসমাজ, ফৌজদারি আদালত নয় বলেই, সিনিয়াভস্কির রচনাকে সোবিয়েত ইউনিয়নের সরকারি সমালোচনার আলোকে না দেখে, নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য রস বিচারের মাপকাঠিতে বিবেচনা করা উচিত।

বিচারের উদ্যোগ

একদা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাহিত্য-সমালোচক সিনিয়াভস্কি রচিত কাহিনিটি কিছুটা উদ্ভট, রসাত্মক বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রস্তাবনায় বর্ণিত হচ্ছে গভীর রাত্রে কোনও এক লেখকের (যিনি উত্তম পুরুষে এ কাহিনি বিবৃত করেছেন) গ্রেপ্তারের ইতিহাস। সাদা পোশাক পরিহিত সেপাইদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লেখক দেখতে পেলেন তাঁর ঘরের দেওয়াল স্বচ্ছ কাচ হয়ে যাচ্ছে, আর শহরের উপরে আকাশে একটা বিরাট রক্তাপ্লুত মুঠো। তার বিশাল ছায়া যেন রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘরগুলোকে ফালি ফালি করে কেটে দিল—তাদের অভ্যন্তরে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু একজন মানুষই এই নিদ্রিত শহরে জেগে আছে; নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে শহরটার দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। আকাশ থেকে প্রভুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল — এই লোকটিই তোমার গল্পের নায়ক—ভ্লাদিমির —আমার প্রিয় বশংবদ দাস। ওকে অনুসরণ করো, রক্ষা করো জীবন দিয়ে, মহিমান্বিত করে তোলো।

তারপর গল্পের শুরু। ভ্লাদিমির গ্লোবোভ সরকারি অভিশংসক। র‍্যাবিনোভিচ নামে এক স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে ভ্রূণ হত্যার অভিযোগ প্রস্তুতকরণে যখন গ্লোবোভ ব্যস্ত, ঠিক তখনই গ্লোবোভের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, মারিনা গোপনে গর্ভপাত ঘটায়। মারিনা রঙিন পুতুল বিশেষ ; দেহ-সৌষ্ঠব বজায় রাখবার জন্য মা হতে অনিচ্ছুক। নিজের সংসারে এই অদৃষ্টের পরিহাসে নিষ্ঠাবান ও আত্মতৃপ্ত গ্লোবোভ প্রায় হতবুদ্ধি। আবার অন্যদিকে তার প্রথম পক্ষের পুত্র সেরিওঝার কৈশোরের স্বভাবসম্মত বৈপ্লবিক কথাবার্তা ক্রমশই গ্লোবোভের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠছে। ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে সেরিওঝা তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপ্রতিভ করে তোলে। তার টাটকা কিশোর দৃষ্টিতে সোবিয়েত সমাজব্যবস্থাতেও ধনবৈষম্য ও অন্যায় অপরাধের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সহপাঠিনীর সঙ্গে বসে সে রঙিন কল্পনার জালে বোনে ভবিষ্যতের আসল সাম্যবাদী সমাজ, যে সমাজে বন্দীশালা থাকবে না ; রাস্তায় শ্লোগান থাকবে মায়াকভস্কির কবিতা থেকে। একটা গোপন ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া নিজের চতুর্দিকে তৈরি করে সেরিওঝা চিন্তা করে বিশ্ববিপ্লব কীভাবে সংগঠিত করা যায় এবং এই ভাবে দুরন্ত স্বপ্ন দিয়ে তার কিশোরকল্পনার ক্ষুধা মেটায়। শেষে এই কিশোরের একটি রচনা গিয়ে পড়ে মারিনার প্রেমিক কারিনস্কির হাতে। অকৃতকার্য বুদ্ধিবিদ কারিনস্কির ছিদ্রান্বেষী মানসিকতা সেরিওঝার রচনায় 'ট্রটস্কিবাদের' প্রভাব আবিষ্কার করে। সেরিওঝা ধরা পড়ে ও তার বিচার হয়। আইননিষ্ঠ দেশপ্রেমিক গ্লোবোভ তার 'দেশদ্রোহী, প্রতিবিপ্লবী' পুত্রকে ত্যাগ করেন।

উপসংহারে রয়েছে এক শ্রমশিবিরের বর্ণনা। তিনটি বন্দী কার্যরত — স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ র‍্যাবিনোভিচ, সেরিওঝা ও লেখক স্বয়ং। লেখকের বন্দী শিবিরে আগমনের হেতু বিচিত্র। যে প্রভুর আদেশে তিনি ভ্লাদিমির গ্লোবোভের গল্প লিখেছিলেন, তাঁর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী তাঁর জীবনের পুর্নমূল্যায়ন চলছে। লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ — কুৎসা-রটনা, অশ্লীলতা এবং রাষ্ট্রের গোপনীয়তা ফাঁস করা।

যাই হোক, র‍্যাবিনোভিচ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরাতন মরচে পড়া ছোরা আবিষ্কার করে ফেলে। তার হাতলটা ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির আকারে খোদাই করা। ছোরাটা তুলে ধরে র‍্যাবিনোভিচ বলে —'ওরা ভগবানের বসার জন্য কেমন একটা জায়গা বেছেছে, দেখেছ? মারাত্মক অস্ত্রের হাতলে। ...এক সময় ভগবান-ই ছিল লক্ষ্য, এখন কিন্তু ওরা তাকে উপলক্ষ বানিয়েছে ; সে একটা হাতল মাত্র। ছোরাটা ছিল উপলক্ষ, এখন সেটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'জনে জায়গা পালটেছে।'

তার অসংলগ্ন কথাগুলো শুনতে শুনতে লেখক অস্বস্তি অনুভব করেন; বলেন — 'তোমার ওই সব ধর্মকথা ঢের শুনেছি। কে না জানে, ভগবান বলে কিছুই নেই? আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি না। আমরা দ্বান্দ্বিকতায় আস্থাবান।'

র‍্যাবিনোভিচ পাগলের মতো ছোরাটা আকাশের দিকে তুলে বলে, 'আরে আমি কি তোমার সঙ্গে

তর্ক করছি নাকি? মোটেই না। আগে ছিল ভগবানের নামে! তারপর ভগবানের সাহায্যে! তারপর শুনলাম ভগবানের পরিবর্তে! ভগবানের বিরুদ্ধে! এখন শুনছি ভগবান-ও নেই, আছে শুধু দ্বান্দ্বিকতা। বেশ! তবে নতুন ছোরা ঢালাই করো এই নতুন উদ্দেশ্যে।' এ কথাগুলো লেখকের কাছে এবার সত্যই উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে হল।

এই সংক্ষিপ্তসার থেকে প্রতীয়মান হওয়া উচিত যে *The Trial Begins*... একটি বিস্ফোরক গল্প নয়। এ গল্প সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হলে সে দেশে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিলে বলতে হয় যে সোবিয়েত সমাজব্যবস্থার ভিত্তিটা নেহাতই ঠুনকো। তাছাড়া বিচারে, সিনিয়াভস্কি বলেছিলেন যে, গল্পটা রচিত ১৯৫৬ সালে এবং বর্ণিত ঘটনার সময়কাল ১৯৫২ সালের শেষাংশ থেকে ১৯৫৩ সালের শুরু পর্যন্ত — অর্থাৎ 'স্তালিন যুগের' অন্তিম কয়েক মাস। এর ইঙ্গিত গল্পের মধ্যেও রয়েছে, যেমন 'চিকিৎসকদের ষড়যন্ত্রের' উল্লেখ এবং স্তালিনের শবানুগমন মিছিলের বর্ণনা। এই যুগের সোবিয়েত সমাজব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনাকে যদি 'মার্তৃভূমি বিরোধী কুৎসরটনা' বলে অভিহিত করা হয় তাহলে ক্রুশ্চভের বক্তৃতা ও রচনাগুলিকেও সোবিয়েত ইউনিয়নে বে-আইনি বলে ঘোষিত করা উচিত।

যাই হোক, ইংরেজি অনুবাদে *The Trial Begins*... পড়ে গল্পটিকে খুব উচ্চস্তরের মর্মস্পর্শী শিল্পকর্ম বলেও আমার মনে হয়নি। একে কেন্দ্র করে বিচারের প্রহসন, অস্বাভাবিক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডাদেশ এবং গল্পে বর্ণিত লেখকের ভাগ্য-বিড়ম্বনার সঙ্গে স্বয়ং লেখক সিনিয়াভস্কির দুর্দশাভোগের এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য না ঘটলে গল্পটির এই পুনর্বীক্ষণের হয়তো কোনও প্রয়োজনই হত না।

যতদূর মনে পড়ে, Solzhenytsin-এর *One Day in the life of Ivan Denisovitch*-এর প্রকাশের পর, বিদেশি ভাষায় তার অনুবাদ ও প্রচারের দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়েছিলেন সোবিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্যিকদের সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সিনিয়াভস্কিকে গোপনে ছদ্মনামে তাঁর রচনা বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল এবং বিদেশি পত্র-পত্রিকাতেই তার প্রথম প্রকাশ। তাঁর বিরুদ্ধে এটাও একটা অভিযোগ। দু'জনের লেখাই স্তালিন-বিরোধী মনোভাবে আচ্ছন্ন ; অথচ দুজনের প্রতি দুধরনের ব্যবহার দেখছি। তার কারণ নিহিত রয়েছে Solzheytsin-এর উপন্যাসের থেকে সিনিয়াভ্স্কির গল্পের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের মধ্যে। এবং এইখানেই The Trial Begins...-এর বৈশিষ্ট্য।

সিনিয়াভস্কির গল্পে বিদ্রুপবাণ কেবলমাত্র স্তালিন-যুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বর্ষিত হয়নি, সাধারণ নাগরিক জীবনে ব্যাপ্ত স্থূলরুচি, আত্মসন্তুষ্টি, সন্দেহপ্রবণতা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও সরব। সমস্ত উপাখ্যান জুড়ে রয়েছে একটা আস্থাশূন্য উপহাসের ভাব। এ উপহাসের লক্ষ্য গল্পে বর্ণিত লেখক-ও। সিনিয়াভ্স্কির ভাষায়—(বিচারে জেরার উত্তরে প্রকাশিত) এই লেখকটি আসলে 'ভীরু ও মাহাত্ম্য-কীর্তনবিলাসী।' তাই উপসংহারে, গ্লোবোভের পদোন্নতির সংবাদ পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। গ্লোবোভের নিয়মানুগত্য এবং নিজের সংসারে তার স্ত্রীর কাছে পরাজয় এবং শেষে তার সুবিধাবাদী মনোভাবের প্রকট প্রকাশ — এ সমস্তই স্তুতিচ্ছলে নিন্দিত হয়েছে। একই সুরে বর্ণিত হয়েছে গ্লোবোভের স্ত্রী মারিনার প্রতি কার্লিনস্কির প্রণয়াসক্তি। বহুদিনের সাধ্য সাধনার পর সে যখন একদিন রাত্রে মারিনাকে অবশেষে স্বগৃহে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, চরম মুহূর্তে উপলব্ধি করে যে সে শক্তিহীন। মারিনার শীতল দেহ ও হৃদয়হীন ঠাট্টার সম্মুখে কার্লিনস্কির নিজেকে উত্তেজিত করার চেষ্টা, পাঠকের কাছে হাস্যকর মনে হয়। সারা উপাখ্যান জুড়ে সে তার কাপট্য ও পুথিগত পাণ্ডিত্য দ্বারা পাঠক-সমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই তার অন্তিম পরাজয়ে সে কারুরই সমবেদনা পায় না।

কখনও শ্রদ্ধা প্রকাশ বা কখনও দয়া প্রদর্শনের ছদ্মবেশে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সিনিয়াভস্কির এই জাতীয় পরিহাস নিঃসন্দেহে জনসাধারণবিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু *The Trial Begins*... পড়তে পড়তে যে সত্যটা বারবার অস্বস্তিকরভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা হল — স্থূলবুদ্ধি জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের স্বার্থপরতা, আত্মসন্তুষ্টি ও গুরুভক্তিই স্তালিনবাদের আমলাতন্ত্রকে সম্ভব করে

তুলেছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে সাধারণ নাগরিকের স্বাধীন বিচারক্ষমতার উন্মেষে উৎসাহদান না করে, ঊর্ধ্বতন নেতার অব্যর্থতায় ভক্তি উৎপাদনে তাকে নিয়োজিত করার ফলে জনসাধারণের জীবনে যে বিকৃতি এসেছিল তার উল্লেখ সোবিয়েতে সরকারি স্তালিনবিরোধী বক্তৃতা বা Solzhenytsin-এর উপন্যাসেও দেখতে পাইনি।

সিনিয়াভস্কির গল্পে একমাত্র সুস্থ চরিত্র সেরিওঝা, হয়তো অপাপবিদ্ধ কৈশোরের প্রতিনিধি বলে। বয়স্কদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির সঙ্গে তার তাজা দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্ন দেখার সাহস, বারংবার ধাক্কা খায়। তার একটা সামান্য শিশুসুলভ পরিকল্পনা, যেটা কল্পনার স্তরেই হয়তো থেকে যেত, যেভাবে স্বভাবত উদাসীন বয়স্ক সমাজকে হঠাৎ উত্তেজিত করে তোলে, তার বর্ণনায় সিনিয়াভস্কির সেই উপহাসের সুরের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভটত্ববোধের পরিচয়ও মেলে। এর ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে এই কিশোরের প্রতি লেখকের মমত্ববোধ — যার প্রকাশ গল্পটিতে প্রাণের উত্তাপ এনেছে। সুতরাং *The Trial Begins...* এ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী উপন্যাসের রচনার নিয়মানুযায়ী সাধারণ সোবিয়েত নাগরিকের প্রতি যেরকম অনিয়ন্ত্রিত প্রশংসার উচ্ছ্বাস নেই, তেমনি আবার অপ্রশমিত উপহাসের তিক্ততাও নেই।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

সিনিয়াভস্কির বিচার শুধু *The Trial Begins...* এর পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেয়নি, লেখকের আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধের অস্তিত্বের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুত, সিনিয়াভস্কির *On Socialist Realism* (এ প্রবন্ধটির রচনাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয়েছে) এই গল্পটির সম্পূরক। তাঁর চিন্তাশীলতার ছাপ গল্প থেকেও এই প্রবন্ধে অনেক বেশি পরিস্ফুট এবং সমালোচকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রমাণিত করে। *The Trial Begins...* এর মতো গল্পের কেন প্রয়োজন, তার উত্তর মিলবে *On Socialist Realism*-এ।

উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচিত হয়েছে সোবিয়েত সমাজের পরম উদ্দেশ্যমূলক (teleological) চরিত্র। সাম্যবাদই একমাত্র পরম-উদ্দেশ্য যাতে সোবিয়েত নাগরিক বিশ্বাসী। এর ফলে, লেখকের মতে, অতীতের প্রতি সহনশীলতা বা ঐতিহাসিক ঘটনার পক্ষপাতশূন্য বিচারের চেষ্টা ব্যাহত হয়। সমগ্র অতীতকে, সাম্যবাদের জয়যাত্রার বিভিন্ন স্তর বলে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দেয়; সব কিছুকেই সাম্যবাদের সীমাবদ্ধ পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়; অন্য ব্যাখ্যার সম্ভাবনা বা কোনও ঘটনার ভিন্ন কারণ প্রদর্শনের চেষ্টা অবহেলিত হয়।

এই জাতীয় চরম উদ্দেশ্যে অটল ও উদ্ধত বিশ্বাসের ফলে মহৎ আদর্শের নামে অতি নিকৃষ্ট নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের ভাষায় :

> চিরকালের জন্য যাতে কারাগার অবলুপ্ত হয়, তাই আমরা নতুন কারাগার তৈরি করলাম। সমস্ত সীমান্ত যাতে বিলীন হয়ে যায়, তার জন্য নিজেদের চতুর্দিকে একটা চৈনিক প্রাচীর নির্মাণ করলাম। পরিশ্রম যাতে আনন্দদায়ক হয়, তাই বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন করলাম। ভবিষ্যতে যাতে একবিন্দুও রক্তপাত আর না হয়, তার জন্য আমরা আরও হত্যা এবং আরও হত্যা করলাম।...অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে মূল লক্ষ্যের কখনওই মিল থাকে না। লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যেসব উপায় অবলম্বিত হয় তা রূপ পালটে অচেনা হয়ে যায়।

এ কথাগুলো ইদানীং অনেকেই অনেকভাবে বলেছেন। এ বক্তব্যের অনেক কিছু সম্বন্ধে আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু সিনিয়াভস্কির বিশেষত্ব যে তিনি এ থেকে তাঁর দেশের সাহিত্য এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে একটা নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন। সাম্যবাদের পরম আদর্শে অচলা ভক্তির ফলে সাহিত্যে প্রবর্তিত হল এক জাতীয় সদর্থক বা positive নায়ক, যার হৃদয়ে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা নেই, যে কখনও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না, যার চরিত্রাঙ্কনে মাত্র একটি রঙেরই ব্যবহার।

এই জাতীয় নায়ক সৃষ্টির কঠিন নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেও সোবিয়েত সাহিত্য, সিনিয়াভস্কির মতে, হয়তো শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারত। প্রাচীন যুগে ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা নির্দেশিত হয়েও মহৎ শিল্পকর্ম রচনার নজির আছে। 'সাহিত্য একনায়কতন্ত্রের নিদারুণ নিয়মতান্ত্রিকতা সহ্য করতে পারে, কিন্তু ভিন্ন রচনাশৈলীর সারমিশ্রণ বা eclecticism সাহিত্যে অচল।'

সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই eclecticism-এর পরিচায়ক। সিনিয়াভস্কির ভাষায় :

> সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নিয়মানুসারে সদর্থক নায়ক সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি psychological চরিত্র রূপে-ও সদর্থক নায়ক ও তার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুর-চড়ানো রচনাশৈলী ও অলংকারপূর্ণ ভাষার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জীবনের বাস্তববাদী বর্ণনা — এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সঙ্গতি স্থাপন করতে গিয়ে একটা বিরক্তিকর সাহিত্যিক খিচুড়ি বেরিয়ে আসে। ... মনে হয়, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' — এই কথাটার মধ্যেই একটা অসঙ্গতি আছে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পকর্ম — অর্থাৎ একটা উদ্দেশ্যমূলক শিল্প — কখনোই উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদের বিশেষ রীতিতে সৃষ্টি হতে পারে না। বাস্তব জীবনের প্রকৃত সত্যানুসারী বর্ণনা কখনোই পরম উদ্দেশ্যমূলক ভাষায় করা যেতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ যদি বাস্তবিকই পৃথিবীর মহত্তর শিল্পরীতির পর্যায়ে উন্নীত হতে চায় এবং তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে চায়, তবে তার একমাত্র উপায় 'বাস্তববাদ'কে বর্জন করতে হবে। একটা সমাজতান্ত্রিক *অ্যানা ক্যারেনিনা* বা একটা সমাজতান্ত্রিক *চেরি অর্চার্ড* লিখবার বেদনাদায়ক ও ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করতে হবে।

স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত অধিকাংশ সোবিয়েত উপন্যাস যদি কেউ পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন সিনিয়াভস্কির উপরোক্ত বক্তব্য কতখানি যুক্তিসংগত। স্তালিনোত্তর যুগে বা বিস্তালিয়ান সময়কালে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী সাহিত্যে সুর-চড়ানো বা অলংকারাধিক্য অনেকটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে। সিনিয়াভস্কির মতে :

> স্তালিনের মৃত্যুর পর, আমাদের শিল্প, আদর্শ ও জীবনের জয়গান আর উঁচু সুরে গাইতে পারে না, যা হওয়া উচিত, তাই বাস্তবে হয়েছে বলে দাবি করতে পারে না। যেসব সাহিত্য জীবনকে রঙিন করে দেখাতে চেষ্টা করে, তার মধ্যে কাপট্যের সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবচেয়ে সার্থক সাহিত্যিক তাঁরাই, যাঁরা আমাদের সাফল্যগুলোকে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদের অক্ষমতাগুলোকে যতদূর সম্ভব কৌশলে কোমল, উপাদেয় করে তোলেন। যে সাহিত্যকর্ম অতিমাত্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, অর্থাৎ বাস্তববাদের শরণাপন্ন হয়, তার বিপদ। যেমন ঘটেছিল দুদিনৎসেভের *নট বাই ব্রেড অ্যালোন*-এর ভাগ্যে।

সেই কারণে, সিনিয়াভস্কির মতে, বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নে যে সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত তার চরিত্র হবে উদ্ভটরসাত্মক। এ শিল্পকর্মে থাকবে 'মহৎ উদ্দেশ্যে প্রচারের পরিবর্তে প্রকল্প বা অনুমানাত্মক ঘটনার বিবরণ, সাধারণ জীবনযাত্রার বাস্তববাদী বর্ণনার পরিবর্তে অদ্ভুত অবাস্তবের প্রবর্তন। এই শিল্পই যুগমানসের সবচেয়ে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি হতে পারে। হফম্যান ও ডস্টয়েভস্কির, গোইয়া, শগাল ও মায়াকভস্কির এবং আরও অন্যান্য বাস্তববাদী ও অবাস্তববাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্ভট রূপকল্প আমাদের দীক্ষিত করুক, অদ্ভুত ও অসম্ভবের সাহায্যে সত্যনিষ্ঠ হবার কর্তব্যে। এই সিদ্ধান্তে On Socialist Realism -এর উপসংহার।

উদ্ভট সাহিত্য

কিম্ভূতকিমাকার এই হাস্যকর জগৎ রচনার প্রয়োজন কেন? এ সমস্যার গভীরে সিনিয়াভস্কি প্রবেশ করেননি। অথচ শিল্পসাহিত্যে absurdity অথবা অদ্ভুত রসের ঐতিহ্য দীর্ঘকালব্যাপী এবং সারা পৃথিবী জুড়ে। আধুনিক কালে ইউরোপীয় নাট্যজগতে এটা একটা বিশেষ প্রবণতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মনে হয় এর সূত্র রয়েছে একালের যুগধর্মে।

আসলে এ যুগটা একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতার যুগ, অন্যদিকে ব্যক্তির অবলুপ্তির যুগও বটে। আত্মবিরোধী শোনালেও এ উক্তি সত্যবিরোধী নয়। কারণ, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের অর্থই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীব্রতাবৃদ্ধি, বুদ্ধির চর্চার দ্বারা প্রতিটি মানুষের নিজস্ব স্বতন্ত্র ধ্যানধারণার সম্প্রসারণ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তার প্রতিবেশী থেকে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতা। অন্যদিকে ব্যক্তি-মানুষের বীরত্বপ্রদর্শন বা একক কর্মের দ্বারা সমাজকে প্রভাবান্বিত করার সুযোগ বর্তমানে ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গোষ্ঠীসৃষ্ট ব্যাপক শাসনব্যবস্থায় সে একটা সামান্য বলটু বিশেষ। একদা যে যুদ্ধ, ব্যক্তিবীরের সাহসপ্রদর্শনের মল্লভূমি ছিল, আজ তা কন্ট্রোলরুমে বসে মাত্র কয়েকটি বোতাম টেপায় পরিণত হয়েছে। সমাজের সর্বগ্রাসী শক্তির কাছে সাধারণ মানুষের অক্ষমতা ও অসার্থকতা ক্রমশই প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতার ফলে, আধুনিক বুদ্ধিবিদ প্রয়োজনীয় দূরত্ব থেকে তার নিজের প্রতিবেশীদের অবস্থাটা অত্যন্ত মোহমুক্ত হয়ে নির্মমভাবে বিচার করতে সক্ষম। প্রাচীন গ্রিক নাটকে অতি সাহসী বীরও সর্বশক্তিমান ভাগ্যবিধাতার হাতে ক্রীড়নকতুল্য ছিল ; তার সংগ্রাম ও পরাজয়ের পরিণতির মধ্যে নাট্যকারেরা মহাকাব্যীয় বেদনা আবিষ্কার করতে পারতেন। আধুনিক নাট্যকার অনুরূপ অনুপস্থিত কোনও অতিপ্রাকৃতে আস্থাহীন। গোষ্ঠী-মানবের নিজেদেরই সৃষ্ট সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সর্বগ্রাসী শক্তির কাছে ব্যক্তি-মানুষের অক্ষমতা ও অসার্থকতাবোধ আধুনিক আস্থাহীনতার জন্মদাতা। সদা পলায়মান এক উদ্দেশ্যের পিছনে অর্থহীন ছুটোছুটিকে দূর থেকে দেখলে হাসি পাবে। আধুনিক সাহিত্যিকের চোখে তাই এ যুগের মানুষের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ঠাট্টার উপাদান। এই সর্বব্যাপী উপহাসের আলিঙ্গন থেকে — নির্যাতক ও নির্যাতিত—কেউই বাদ যায় না। এবং যেহেতু মানুষের এই অকিঞ্চনত্ব দেশ ও কালের সীমা নিরপেক্ষ, উদ্ভটত্বের সাহিত্যিকেরা তাঁদের চরিত্রদের নিয়ে যান এক অবাস্তব আবহাওয়ায়, যেখানে বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন আইন-কানুন অচল। আসলে এটা এক ধরনের বিমূর্ততা। অবাস্তব জগতের পরিকল্পনায় বর্তমান সমাজের অমানবিক আবহাওয়াটাকে অতিরঞ্জিত করা যায় এবং সাধারণ মানুষের অক্ষমতাটাকে তার অন্য সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায়। কাফ্‌কার *The Trial*-এর কথা মনে পড়ে যায়।

অথবা, ধরা যাক, মানুষের চিরকালীন ধর্ম—'প্রতীক্ষার কথা'। সারা জীবনব্যাপী এ প্রতীক্ষা হয়তো ভগবানের জন্য, বা কোনও আদর্শের সাফল্যের জন্য বা কোনও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের আশায় কিংবা সব যন্ত্রণার শেষ—মৃত্যুর জন্য হতে পারে। দেশ ও কাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এই প্রতীক্ষার যন্ত্রণা, বৈচিত্র্যহীনতার বিরক্তি, ও হাস্যকর অর্থহীন পরিণতিকে যদি বিমূর্ত করে দেখাতে হয়, তাহলে হয়তো বেকেটের *ওয়েটিং ফর গোডো*-র মতো নাটকের জন্ম হয়।

কিংবা আধুনিক সমাজের বিভিন্ন প্রবণতাকে পরিহাসের জন্য উদ্ভট জগৎ সৃষ্টির নেপথ্যে হয়তো লেখকদের ছদ্মবেশ ধারণের অভিপ্রায় থাকতে পারে। সুকুমার রায়ের 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে' বা 'রাম গরুড়ের ছানা'র মতো আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ছড়ার অন্তরালে যে ব্যঙ্গের অব্যর্থ লক্ষ্য রয়েছে, অনুরূপ বিদ্রুপ অবিষ্কার করা যায় উদ্ভটের বিমূর্ত ছদ্মবেশে যে জগৎ তৈরি হচ্ছে আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায়। Ionesco-র *রাইনোসেরাস*-এ আবহাওয়াটা অবাস্তব হলেও এত স্বচ্ছ যে তার আড়ালে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় স্থূলচর্মী প্রবৃত্তির ক্রমবর্ধমানতা এবং ব্যক্তি-মানুষের মানসিক সংকটের প্রতিচ্ছবি খুঁজে নিতে সংবেদনশীল পাঠকের অসুবিধা হয় না।

যাই হোক, উদ্ভট সাহিত্য বিষয়ে এতগুলো কথা বলার দরকার হল এই জন্যই যেহেতু সিনিয়াভস্কির প্রবন্ধে এই সাহিত্যরীতির প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়েছে, এবং তার প্রকাশের চেষ্টা তাঁর গল্প *The Trial Begins*...। এ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে বলা চলে না ; কারণ যে eclecticism-এর বিরুদ্ধে সিনিয়াভ্স্কি প্রতিবাদমুখর সে দোষে তাঁর নিজের এই গল্পও কিছু পরিমাণে দুষ্ট। অর্থাৎ

উদ্ভটত্বের সুর *The Trial Begins*.. এ ধারাবাহিক নয়। যে অবাস্তব আবহাওয়ায় প্রস্তাবনার শুরু হয়েছিল, তা মাঝপথে এসে হারিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী ঘটনাগুলির যে বর্ণনা রয়েছে তা অতিমাত্রায় বাস্তবানুগ। তারপর অবশ্য, সেরিওঝার ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে শাসকমহলের উত্তেজনার আতিশয্যে কিছুটা অদ্ভুতের আভাস মেলে এবং উদ্ভটের সাড়া পাওয়া যায় দুটি পুলিশ কর্তার গোপন খবর জোগাড়ের আজগুবি পরিকল্পনার বর্ণনায় এবং শেষে উপসংহারে। কাফকা বা Ionesco-র তুলনায় সিনিয়াভস্কির জগৎ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তব জগতের প্রভাবে অপমিশ্রিত ; সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত হতে পারেনি।

সিনিয়াভস্কির উপাখ্যানের দুর্বলতা এবং রচনাশৈলীর অনির্দেশ হয়তো কিছুটা তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের ও দ্বিধার সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারে। তাঁর প্রবন্ধটি, *The Trial Begins*... এবং অপর একটি গল্প সোবিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রথম প্রকাশিত হয় বিদেশি বন্ধুদের সাহায্যে। স্বদেশে, স্বনামে এগুলি প্রকাশ না করে কেন ছদ্মনামে দেশের বাইরে পাঠালেন, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সিনিয়াভস্কি বিচারকক্ষে বলেন :

> আমাদের সাহিত্যজগতে প্রচলিত রুচি ও শিল্পকর্ম বিচারের মানদণ্ড কী, সে বিষয়ে নিজে সাহিত্যসমালোচক হবার ফলে, আমার একটা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মনোভাব প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এ দেশে যা গ্রহণীয়, আমার শিল্পকর্ম তা থেকে সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের। রাজনৈতিক অর্থে নয়, সাহিত্যিক অর্থেই এ স্বাতন্ত্র্য। ... আমি এ দেশের প্রকাশনা ব্যবসাটাকে ভালোভাবেই জানি বলে আমার লেখা আমি সেখানে দিই নি। সাহিত্য সমালোচক আন্দ্রে সিনিয়াভস্কি, যার লেখা এ দেশে ছাপা হত এবং গল্প লেখক এব্রাম টার্টৎস, যার রচনা বিদেশে প্রকাশিত হচ্ছিল — এ দুজনের পার্থক্যটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমি সচেতন ছিলাম। কিন্তু পার্থক্যটা খুব মৌলিক বা আমার মানসিকতাটা দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে আমার মনে হয়নি। এই কারণেই আমি নিজেকে প্রতারক ও ভণ্ড বলে মনে করি না।

এ যুক্তিটা কতখানি গ্রহণীয় সে তর্কের স্থান এ প্রবন্ধ নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে সিনিয়াভস্কি তাঁর রচনায়, সোবিয়েত সাহিত্যসমাজের এতদিনের অলঙ্ঘনীয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের রীতি থেকে স্বতন্ত্র রচনারীতির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভিন্ন সমাজব্যবস্থা হলেও, সোবিয়েত ইউনিয়ন এ পৃথিবীরই অংশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের মতো সোবিয়েত নাগরিকের মধ্যেও ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, অবসাদ ও আশাবাদ, নিঃসঙ্গতা ও গোষ্ঠীপ্রিয়তা — এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী প্রবণতার অস্তিত্ব স্বাভাবিক। যে আদর্শ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, অর্ধশতাব্দীব্যাপী আত্মত্যাগের পর সে দেশের মানুষ যদি দেখে যে, বিকৃতির রাহুগ্রাসে সে আদর্শ প্রায় লুপ্ত, মানুষকে মহৎ করে তুলবার একটা শুভ পরীক্ষায় অপমিশ্রণ ঘটেছে, তাহলে সোবিয়েত বুদ্ধিবিদদের মনে এ সন্দেহ উঁকি মারতে পারে যে, হয়তো মানুষ এখনও দেবতা হবারি উপযুক্ত হয়নি, বামনের চাঁদে হাত দেবার চেষ্টার মতো তার সমস্ত পরিকল্পনাই হাস্যকর। তাই বিবেকবর্জিত রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী অলংকারপূর্ণ প্রতিশ্রুতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের সচেতন চিন্তাশীলদের মতো কোনও সোবিয়েত সাহিত্যিকও আস্থাহীন হতে পারেন, ভাবতে পারেন যে, সমস্ত পরিকল্পনা থেকেও অনেক জটিল, যার জন্য এ পরিকল্পনা — অর্থাৎ মানুষ, তার মনটা এবং অতি বড় দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণীকেও সে ফাঁকি দেয়। এই কারণেই বোধহয় আজ সোবিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরীতির একনায়কত্বের অবসান সম্ভব। এবং যেহেতু সোবিয়েত ইউনিয়নে, অন্যান্য দেশের মতনই, আজও আমলাতন্ত্র ও রক্ষণশীলতা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি, প্রতিষ্ঠিত রীতিবহির্ভূত সাহিত্য ছদ্মবেশী, অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি এবং ছদ্ম-গাম্ভীর্যের আড়ালে বিদ্রুপাত্মক হতে বাধ্য।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
(কার্তিক-মাঘ ১৩৭৩)

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বাঙলায় 'আন্তিগোনে'

আমি গ্রিক জানি না। অতএব আমার পক্ষে *আন্তিগোনে*-র বাঙলা অনুবাদের আলোচনা অনধিকারচর্চা এবং সমালোচনা হিসেবে তার মূল্য নগণ্য। যে-লোক ইংরেজি তর্জমায় 'আন্তিগোনে' পড়েছে তার প্রতিক্রিয়া যদি কারও (বিশেষত অনুবাদকের) কিছুমাত্র কাজে লাগে সেটাই এ-লেখার একমাত্র দাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা চিঠিতে (১৯ পৌষ ১৩০০) 'আন্তিগোনে'র উল্লেখ আছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, বিষবৃক্ষের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে কোনও সমালোচক বলেন যে, 'Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রীচরিত্র কোনও সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম।' এ-চিঠি পড়ে বহুবার ভেবেছি, ঠিক কী জন্যে ওই তুলনায় বঙ্কিম গৌরব বোধ করেন? *আন্তিগোনে*কে অনেক সময় ইওরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্র বলা হয়; সাহিত্যকৃতি হিসেবে সূর্যমুখী বা কুন্দনন্দিনী তার সমপর্যায়ভুক্ত—এই প্রশংসাই কি তার কারণ? অথবা, মহত্তর অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার, মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায়—এবং বিশ্ববিধানের শক্তি হিসেবে—আন্তিগোনের যে-তাৎপর্য, তার সঙ্গে কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখীর ভূমিকা তুলনীয়—এই স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহের কারণ? এ-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য বাঙালির বিশ্বসাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে একটি মূল্যবান বিবৃতি হিসেবে গণনীয় তো বটেই, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ, তাঁর সাহিত্য- সাধনার পটভূমি ছিল, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে জাতীয় আত্মস্বরূপের সন্ধান।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য চমকপ্রদ লাগে আরও এইজন্যে যে তারপর দীর্ঘ ৭০ বছরের মধ্যে 'আন্তিগোনে'র কোনও বাঙলা অনুবাদ হয়নি। আমাদের অনুবাদকের আগ্রহ আবর্তিত হয়েছে প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যের একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। (অন্য সাহিত্য থেকে ইদানীং যে-টুকু তর্জমা হয়েছে তারও চোদ্দো আনা ইংরেজি মারফত) উনিশ শতকের রেনেসাঁস এবং তৎসঞ্জাত সংস্কৃতির এটা একটা দুর্লক্ষণ। ইউনেস্কোর আনুকূল্যে সাহিত্য অকাদেমি *আন্তিগোনে*-র অনুবাদ প্রকাশ করে সেই পরিধি প্রসারিত করে দিলেন। অনুবাদ্য গ্রিক নাটকের তালিকায় অকাদেমি প্রথমেই বেছে নিয়েছেন *আন্তিগোনে*কে। তাঁদের এই নির্বাচন সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। 'আন্তিগোনে'তে এক জায়গায় ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্বর্ণসম্পদের উল্লেখ আছে। পুরানো বিদেশি নাটকের স্বদেশ-প্রসঙ্গ স্বভাবতই ভালো লাগে; আর সোনার ভারতের প্রতিমা তো আমাদের জাতীয় স্মৃতি ও আবেগের অবিভাজ্য অঙ্গ। এমনিতে বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত নাটক হিসেবেই 'আন্তিগোনে'র অনুবাদ-যোগ্যতা অসামান্য। তাছাড়া গ্রিক মননের ধর্মই ছিল, যা বিশেষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে নিঃসক্ত, তন্নতন্ন বিশেষণ করে নির্বিশেষে ও সাধারণ নীতিতে পৌঁছনো। সর্বকাল ও সর্বজনকে স্পর্শ করার গুণ তাই অন্যান্য গ্রিক নাটকের মতো *আন্তিগোনে*র প্রকৃতিগত। তবে 'আন্তিগোনে' যেন অন্য নাটকের তুলনায় আরও তীব্রভাবে আমাদের সমকালকে ছুঁতে পারে। ব্রেখ্‌ট হয়তো এইজন্যেই 'আন্তিগোনে'র 'টপিক্যালিটি'র কথা বলেছিলেন। বলা যায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় থেকে *আন্তিগোনে* নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। এই নাটক তখন ইওরোপে বারংবার অভিনীত হয়েছে, মনুষ্যত্বের হন্তারক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের অপরাভূত সংগ্রামের আলেখ্য হিসেবে। তারপর, হিটলার-মুসোলিনী প্রভৃতি একনায়কের পতন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস, স্ট্যালিনের পুনর্মূল্যায়ন ও সমাধি-উৎখনন, গণতন্ত্রের সংকট, সাম্প্রতিক ইতিহাসের নানান বাঁক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জোয়ার-ভাঁটা—

এই সবের পটভূমিতে *আন্তিগোনে* যেন নতুনতর অর্থ গভীরতা পায়। কতকগুলো জিনিস আছে—যেমন মনুষ্যত্ব, মানুষের জীবন বা তার অন্তিম সৎকার—যার মূল্য পরম, চূড়ান্ত ও অলঙ্ঘনীয় : 'আন্তিগোনে' নাটকের এই প্রজ্ঞা সমকালকে বহু স্তরে স্পর্শ না করে পারে না।

অর্থাৎ মূল্যবোধের প্রশ্ন *আন্তিগোনে*-র কেন্দ্রগত বিষয়। সেই জন্যে 'প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থপ্রকাশ তাহারই অন্তর্গত',- সাহিত্য অকাদেমির এই বিজ্ঞপ্তি তাৎপর্যময়। অনুবাদের সাফল্য-বিচারের সময় ওই লক্ষ্য স্বভাবতই খুব সামনে এসে পড়ে। পশ্চিমের মূল্যমান পাঠকের বোধে সঞ্চারিত হতে পারে একটাই শর্তে। তা হচ্ছে : নাটকের আধেয়বস্তু অনুবাদক কতটা সাফল্যের সঙ্গে পাঠকের কাছে হাজির করতে পারছেন। এবং সেটা আবার শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অনুবাদকের ইন্টারপ্রিটেশন বা অর্থনিরূপণের ওপর। *আন্তিগোনে* নাটকের এই তাৎপর্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে অনেক জায়গায় অলোকরঞ্জনের সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। এ-রকম মতান্তরের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

তর্জমার ৫৪ পৃষ্ঠায় মঞ্চনির্দেশ দেখছি 'ক্রেয়োনের প্রবেশ।' তক্ষুনি প্রশ্ন ওঠে : ক্রেয়োনের প্রস্থান ঘটল কখন? তার কোনও নির্দেশ বা ইঙ্গিত অনুবাদক দেননি।

চতুর্থ ওড শুরু হবার আগে কোনও কোনও ইংরেজ অনুবাদক Exit Creon এ-রকম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভবত অলোকরঞ্জনেরও তাই অভিপ্রায় ছিল; কোনও কারণে তা ছাপা হয়নি।

কক্‌তোর 'আন্তিগোনে'তে এই জায়গায় ক্রেয়োন প্রস্থান করে না। কিটোর তর্জমায় তো স্পষ্ট নির্দেশই রয়েছে : Creon remains on the stage। কুশীলবের প্রস্থান-প্রবেশ বিষয়ে সোফোক্লেস নিজেই যথেষ্ট স্পষ্ট সংকেত দিয়ে থাকেন। এখানে ক্রেয়োনের নিষ্ক্রমণ হোক, এ-রকম ইঙ্গিত তাঁর লেখায় নেই।

ব্যাপারটা শুধু মঞ্চনির্দেশের কূটকচালি ঘটিত নয়। চতুর্থ ওড অভিনীত হবার সময় ক্রেয়োন মঞ্চে উপস্থিত থাকবে, নাটকের তাৎপর্যের দিক দিয়েই এটা দরকারি। তার কারণ বলি।

পলুনিকেসের মৃতদেহ সংস্কার করা হবে না—তার দেহ শকুনি-শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে— ক্রেয়োনের এই আদেশ সহোদরের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসার টানে আন্তিগোনে আগ্রাহ্য করল। তাই ক্রেয়োন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ক্রেয়োনের আচরণ অমানুষিক। এবং তা অমানুষিক বলেই প্রাকৃতিক ও ঐশ বিধানের প্রতিকূল।

আন্তিগোনে আর ক্রেয়োনের পুত্র আইমোন পরস্পরের প্রতি বাগদত্ত ছিল। আইমোন ক্রেয়োনকে বোঝাতে চাইল, তার দণ্ডাদেশে ন্যায়ধর্মের অনুমোদন এবং প্রজাপুঞ্জের সমর্থন নেই।

পলুনিকেসের অন্ত্যেষ্টি নিষিদ্ধ ক'রে ক্রেয়োন বিশ্ববিধানকে লাঞ্ছিত এবং (ফলে) স্বর্গ ও পাতালের দেবতাদের রুষ্ট করেছিল। এখন আইমোনের আবেদন অগ্রাহ্য এবং আন্তিগোনেকে তার সামনেই হত্যার সংকল্প ঘোষণা করে সে ভালোবাসার দেবতাকে অপমানিত করল।

কিন্তু ভালোবাসার দেবতা অপরাজেয় : আর এই কথাটিই চতুর্থ ওডের বিষয়বস্তু।

কোরাসের মধ্যে গিয়ে সোফোক্লেস এই ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস দিতে চাইছেন, লাঞ্ছিত প্রেমের দেবতার প্রতিশোধ অমোঘ সর্বনাশের রূপ নিয়ে ক্রেয়োনের মাথার ওপর প্রহৃত হবে। গড়ন থেকে বোঝা যায়, এই নাটক দৃশ্যত *আন্তিগোনের*, কিন্তু গভীরতর অর্থে ক্রেয়োনের ট্র্যাজেডি (মঞ্চ থেকে আন্তিগোনের চূড়ান্ত প্রস্থানের পরেও নাটক আরও টেনে নিয়ে যাবার জন্য যাঁরা সোফোক্লেসের নিন্দে করেন, তাঁরা এই দিকটি ধরতে পারেন না)। ক্রেয়োনের ট্র্যাজেডি দর্শকের কাছে উন্মীলিত করার জন্য চতুর্থ ওডে তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা আছে। ওই ওড শুনতে শুনতে দর্শক যদি চোখের সামনে ক্রেয়োনকে দেখতে পায় তা হলে ওডের মানে—এবং সমগ্র নাটকের অভিপ্রায়—তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া, ওই নিহিত তাৎপর্যের জন্য—এবং সেই তাৎপর্য সব চরিত্রের কাছেই এখনও প্রচ্ছন্ন বলে—এখানে ক্রেয়োনের উপস্থিতি নাট্যমুহূর্তে টান ও তীব্রতা এনে দেয়। আমি গ্রিক কোরাসের নাচের ছন্দ সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানি না। তবে এটুকু

সহজেই বুঝতে পারি, নাচের তালে তালে কোরাস প্রচণ্ড নাটকীয়তা তৈরি করতে পারে এখানে। আর তখন স্টেজে ক্রেয়োন নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে এ জায়গায় নাটকের আবেগ আরও উঁচু গ্রামে চড়তে পারে।

অবশ্য ওই নাটকীয়তার দিক দিয়ে একটা বিরুদ্ধ যুক্তিও তোলা যায়। নাচ-গান-আবৃত্তির সহযোগে চতুর্থ ওডের অভিনয় যতক্ষণ চলতে থাকবে, ততক্ষণ ক্রেয়োন মঞ্চে কী করবে? তার সংলাপ তো বেশ কিছুক্ষণ পরে। এই আপত্তি দুটো কারণে অগ্রাহ্য! ১. অন্য ওডের (যেমন তৃতীয় ওডের) জায়গায় অলোকরঞ্জন নিজেও ক্রেয়োনকে মঞ্চে রেখেছেন। ২. অভিনয় ও সংলাপ অভিন্ন মনে করা কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। মনে হয়, এই নাটকে সোফোক্লেস নির্বাক অভিনয় নিয়ে একাধিকবার সার্থক ও সাহসিক পরীক্ষা করেছেন। উদাহরণত ৬৫ পৃষ্ঠায় এউরুদিকের নীরব প্রস্থান উল্লেখ করা যায়।

তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় আন্তিগোনে বলছে, 'এই কি তোমার পিতা? আইমোন দয়িত আমার।' (গিলবার্ট মারের তর্জমায় Haemon beloved! Thy father wrongs thee sore । জেবের অনুবাদে :Haemon beloved! How thy father worngs thee। কিটো : O my dear Haemon! How your father worngs you!) ইংরেজির সঙ্গে বাঙলা তর্জমার কিছুটা তফাতআছে, কিন্তু আপাতত সেটা আমার বক্তব্য নয়। আমার আপত্তি ওই উক্তি আন্তিগোনের ওপর আরোপ করায়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'আন্তিগোনে' নাটকের সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই এটা ইসমেনের সংলাপ হিসেবেই স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ সম্পাদক (ও অনুবাদক) অবশ্য আন্তিগোনের মুখে এই উক্তি বসিয়েছেন। লেটার্স ঠিকই বলেছেন, সম্পাদকদের 'রোম্যান্টিক ঝোঁক' এই পরিবর্তনের কারণ। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ক্ল্যাসিকল গ্রিক রুচি, নীতি এবং আন্তিগোনের চরিত্রের সঙ্গে তার মুখে এই সংলাপের সংগতি নেই। গ্রিক নাটকের নায়িকারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা-প্রমুখ রোম্যান্টিক নায়িকার মতো পুরুষের সামনে অকুণ্ঠিত প্রেম-ঘোষণায় অভ্যস্ত নয়। তাই আন্তিগোনের জবানিতে এ-কথা বসালে সমস্ত ব্যাপারটা সোফোক্লেসের জগৎ থেকে অনেকটা দূরে সরে আসে। (এ প্রসঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষণীয়: ১. সুইন্‌বার্নপন্থী রোম্যান্টিক ফেনিলতার জন্য গিল্‌বার্ট মারের তর্জমা নিয়ে এলিয়ট একদা বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। সেই নিন্দিত গিল্‌বার্ট মারে কিন্তু এই উক্তি বসিয়েছিলেন ইসমেনের মুখেই। ২. ওয়াট্‌লিঙে এটা যদিও আন্তিগোনের সংলাপ, তবে তা থেকে beloved বা তার প্রতিশব্দ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।)

আর একটা কথা। গ্রিক নাটকের stychomathia বা 'কথা-কাটাকাটি'র রীতি অনুযায়ী এ-উক্তি আন্তিগোনের হতে পারে না। 'কথা-কাটাকাটি'র মধ্যে এ-রকম ক্রমভঙ্গের নজির, যতদূর জানি, আর কোনও গ্রিক নাটকে নেই।

নাটকের পঞ্চম ওড রীতিমতো জটিল। ওই কোরাসে পর পর দানাএ, লুকাউর্গোস এবং ক্লেওপেত্রা-ফিনেউসের দুই শিশুসন্তানের উল্লেখ আছে। ব্যাপারটা এমনিতে অসংবদ্ধ লাগতে পারে। ক্লেওপেত্রার্ সন্তানরা ও দানাএ নির্দোষ; আর লুকাউর্গোস ছিল দোষী। তাছাড়া এদের জীবন-কাহিনিতে মিল নেই। আন্তিগোনের সঙ্গেই বা ওদের যোগ কোথায় তাও অস্পষ্ট। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সমস্ত অনুপুঙ্খের মধ্যে সোফোক্লেস এই ঘটনার ওপর জোর দিয়েছেন : লুকাউর্গোসকে পাথরের আর দানাএ-কে ধাতব কারাগৃহে অবরুদ্ধ করা হয় : আর ক্লেওপেত্রার নিষ্পাপ সন্তানদের দু' চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শুদ্ধ যুক্তিক্রমের স্তরে দেখলে দানাএ, লুকাউর্গোস ও ক্লেওপেত্রা-সন্তানদের পুরাণ প্রসঙ্গ দুর্বোধ্য ও অসংগলগ্ন মনে হবে। কবিতার গভীরতর স্তরে যা এই সব বিষম ও বিচ্ছিন্ন বিষয়কে ঐক্যবদ্ধ—এবং সমস্ত ওড্‌কে একটি অভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিতকরেছে, তা হচ্ছে, বারংবার প্রত্যাবৃত্ত 'অন্ধকার' বা তার সমার্থক শব্দ। সোফোক্লেসের নাটকে অন্ধকার সব সময়ই তাৎপর্যময় এবং নিয়তি বা অতিযৌক্তিকের (ইর্‌র্যাশ্‌নেল) সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নাটকের গড়নের দিক দিয়ে একটা জিনিস এখানে লক্ষ করার মতো। পঞ্চম ওড্ স্থান পেয়েছে

'আন্তিগোনে'র শেষ দৃশ্য এবং তাইরেসিয়াস দৃশ্যের ঠিক মাঝখানে। অর্থাৎ অন্ধকারের পুনরাবৃত্ত অভিঘাত এক দিকে আন্তিগোনের নির্মম পরিণামের উপযুক্ত আবহ এবং অন্যদিকে অন্ধ ভাবী-কথক তাইরেসিয়াসের (যে আকাশপ্রদীপের মতো মহা-অন্ধকারকে ছুঁয়ে জ্বলতে থাকে) আবির্ভাবের যোগ্য ভূমিকা তৈরি করে।

নাটকের ঠিক মোড় ঘোরার সময় আবেগঘন একটি অসাধারণ মুহূর্তে সমগ্র জাতির স্মৃতি মন্থন করে আনা কয়েকটি পুরাণ-ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে 'অন্ধকার' শব্দের ক্রমাগত উচ্চারণের আক্ষেপ একটা অসম্ভব অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিয়ে দেয়।

অলোকরঞ্জনের তর্জমায় অন্ধকারের এই গুরুত্ব থাকেনি। উনচল্লিশ পঙ্‌ক্তি জুড়ে তিনি পঞ্চম ওডের তর্জমা করেছেন, তার মধ্যে 'আঁধার' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিতুলনার জন্য গিল্‌বার্ট মারের তর্জমার প্রথম স্রোফের প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> So Danae from *sun-light was forbidden*
> In that brass-walled prison-house immured;
> *Tomb-dark* was her marriage chamber hidden.

তিন লাইনের মধ্যেই অন্ধকারের কথা দু'বার এল : *form sunlight was forbidden* এবং *Tomb-dark*। কিটোর তর্জমাতেও প্রথম স্রোফের কেবল প্রথম তিন লাইনের মধ্যে অন্ধকারের প্রসঙ্গ এসেছে দুইবার। অলোকরঞ্জন কিন্তু সমগ্র স্রোফের অনুবাদে একবারও অন্ধকারের উল্লেখ আনেননি।

নাটকের প্রথম পঙ্‌ক্তির অনুবাদই অর্থগ্রহণের দিক দিয়ে অসুবিধে সৃষ্টি করে : 'ইসমেনে শুনেছিস, ইসমেনে বোনরে আমার।' ইসমেনে আন্তিগোনের দিদি। আন্তিগোনে তার দিদিকে বোন বলে ডাকলে সম্পর্কটা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এমনিতে তুচ্ছ মনে হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস, আন্তিগোনেই যে বয়সে ছোট, এই তথ্য বাদ দিলে বিশেষ করে প্রারম্ভিক দৃশ্যের নাট্যমূল্য অনেকটা হারিয়ে যায়। আর সে সবচেয়ে ছোট বলেই (বা কথাটাকে একটু অন্যভাবে বললে, সে আমাদের বাড়ির ছোট বোনটির মতো বলেই) ট্র্যাজেডির সমস্ত মহনীয়তার মধ্যে অকথ্য কোমল কারুণ্যের মায়া এসে পড়ে।

তাছাড়া আন্তিগোনের অনমিত চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবলে ব্যাপারটা নাটকের দিক দিয়ে অতটা গৌণ লাগবে না। নখদংস্ট্রাল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে তার লেশমাত্র ভয় নেই। দিদি ইসমেনেও যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত ভীত, আন্তিগোনে সেখানে নির্দ্বন্দ্ব নিঃশঙ্ক। আন্তিগোনের অনুজত্ব তার আত্মবোধে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ দৃঢ়তা ও নিষ্পাপ চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতাকে আরও দীপ্ত করে তোলে। এই শুদ্ধ চারিত্রের শক্তিতেই সে এত সহজে জেনেছে; যা প্রাকৃতিক, তা-ই বিশ্ববিধানসংগত।

আসলে তর্জমায় কতকগুলো বিচ্ছিন্ন অংশের প্রশ্ন নয় : যে-নীতি ও পদ্ধতিতে অলোকরঞ্জন অনুবাদ করেছেন তা আমার গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এ-রকম মন্তব্য করলেই অনুবাদকের বিকল্প নীতি—অর্থাৎ আমার সমালোচনার প্রতিমান—বিবৃত করার দায় আসে। সে দায় এড়াব না। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার।

অনেক সময় লেখকরা ক্ল্যাসিক অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেন। এ ধরনের লেখাকে মোটা হিসেবে অনুবাদ-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা হলেও এগুলো ঠিক তর্জমা নয়। এ ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক আসলে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য রূপায়ণের বা রূপকল্পগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাহন। অনুবাদের সাধারণ বিধি-বিধান এই ধরনের লেখায় প্রযোজ্য নয়। কক্‌তোর *আন্তিগোনে* এই শ্রেণীর সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য কক্‌তো মূল নাটকের অংশত রূপান্তরিত (এবং সংক্ষিপ্ত) করেছিলেন। ১৯২৭ সালের মঞ্চ-বিবরণ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে:

Five monumental plaster, heads of youngmen framed the Chorus...The costumes were worn over black bathing suits, and arms and legs were covered. The general effect was suggestive of a sordid carnival of kings, a family of insects.

আন্তিগোনে অবলম্বনে এই ধরনের নাটক লেখার অধিকার, আর সকলের মতো, অলোকরঞ্জনের আছে। এবং সে ক্ষেত্রে অনুবাদের নীতিগত প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

কিন্তু অকাদেমির মতো সাহিত্যমান সংরক্ষক সংস্থা যখন কোনও নাটকের অনুবাদ (রূপান্তর নয়) ছেপে বার করেন এবং যদি তার ঘোষিত উদ্দেশ্যই হয়—পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্য প্রাচ্যদেশীয়দের উপলব্ধিগত করানো, তখন ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেক্ষেত্রে তর্জমার নীতি-বিষয়ক প্রশ্ন তোলা সংগত ও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

ই ভি রিউ-এর সাধারণ সম্পাদনায় প্রকাশিত পেঙ্গুইন ক্ল্যাসিক্স গ্রন্থমালা বর্তমান শতাব্দীতে অনুবাদ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্দোলন হিসেবে গণ্য হতে পারে। সম্প্রতি (১৯৬০) একটি প্রবন্ধে রিউ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা এবং যে সুচিন্তিত নীতি তাঁর সম্পাদন-কর্মের নিয়ামক ছিল তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ওঁদের অভিজ্ঞতার থেকে শেখবার জিনিস অনেক আছে। তবে নিশ্চয়ই মাছি-মারা-কেরানির মতো করে নয়। যা গ্রাহ্য তা হচ্ছে মূলনীতি। এবং বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট সমস্যা বা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য প্রয়োগের সময় ওই মূলনীতির কিছু হের-ফেরও করে নিতে হবে। রিউ পেঙ্গুইন ক্লাসিক্সএর অনুবাদ-নীতির নাম দিয়েছেন 'প্রিন্সিপ্‌ল অফ ইকুইভ্যালেন্ট এফেক্ট'। ওই 'সমমানিক প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব'কে বিশ্লেষণ করলে দুটো সরল সূত্র পাওয়া যায় : ১.মূলের ভাব ও স্টাইল (স্টাইল ও ইডিয়মের অভেদ রিউ মানেন না) অবিকৃত রাখতে হবে। ২. তর্জমার ভাষাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমকালীন বাগ্‌রীতির ওপর। এই দুটো সূত্রকেই আমি আলোচনার প্রতিমান হিসেবে কাজে লাগিয়েছি।

প্রথম সূত্রটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতোন লাগে। কিন্তু দাবিটা যত সহজ, কাজটা তত কঠিন। কবিযশঃপ্রার্থী ভিক্টোরিয়ান তর্জমাকারদের কাব্যিয়ানায় উত্ত্যক্ত হয়ে কার্লাইল যখন বলেছিলেন, 'Tell us what they thought; none of your silly poetry', তাঁর ধারণা ছিল গ্রিক সাহিত্যের অনুবাদ পদ্যে করলে ভাববিকার ঘটতে বাধ্য। পদ্য-তর্জমা দুরূহতর সন্দেহ নেই, তবে গদ্যের জুড়ি হাঁকালেই ভাবান্তরের ফাঁড়া কেটে যাবে তাঁর এ-ধারণা ভুল। কারণ সাহিত্যের প্রাথমিক উপকরণ হচ্ছে শব্দ বা শব্দবন্ধ; আর শব্দবন্ধের মতো প্রায়-অননুবাদ্য বস্তু খুব কম আছে। শুধু অভিধা ছাড়া প্রত্যেক শব্দে নিহিত থাকে : ভাব ভাবনা আবেগ ও মূল্যবোধ। আর শব্দার্থের এ-সব উপাদান ভ্যাকুয়ামে ঝোলানো নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ পদার্থ নয়; ওগুলোর মূল গ্রথিত থাকে ইতিহাস-নির্ধারিত দেশ-কাল-সমাজের মাটিতে এবং লোকস্মৃতির অনুষঙ্গে। অনুবাদ-নীতির প্রশ্ন তাই এত জরুরি। অলোকরঞ্জনের পদ্ধতি ভাবের অবিকৃত অনুবাদ উপযোগী নয়। কারণ, তাঁর তর্জমা-রীতির মূল লক্ষ্যই হল, ভারতবর্ষ ও গ্রিসের ভাবলোকের দূরত্ব সরিয়ে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানে স্থানে ঋক্-মন্ত্র বসিয়েছেন, গ্রিক পারিভাষিক শব্দকে ভারতীয় রূপ দিয়েছেন এবং হিন্দু ও গ্রিক দেব-দেবীকে প্রতিন্যস্ত করেছেন। তাঁর ভূমিকা থেকেই উদ্ধৃত করি : একাধিক স্থলে জিউস বা আরেস বা দিয়নুসাসকে তাই আঞ্চলিক দুর্গমতা থেকে সরিয়ে এনে অনুষঙ্গে সদৃশ কোনো-কোনো ভারতীয় দেবতার পাশাপাশি বসিয়েছি। এভাবে পাশাপাশি বসালে দুটি নামের সান্নিধ্যে সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইষ্টার্থ সাধিত হয় এবং গ্রীস ও ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের অভিন্ন আকাশের নিচে মিলিত হতে পারে।'

এভাবে 'সেই নাটকীয় মুহূর্তের ইষ্টার্থ' কী করে সাধিত হয়, তা বোঝা কঠিন। তার চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হল : ভারতবর্ষ ও গ্রিসকে এইভাবে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব ও সংগত কি না? ভারত ও গ্রিসের ভাবলোকে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; দুটো জগৎ একাকার করা সত্যও নয়, অনুবাদে তার প্রয়োজনও নেই।

ইওরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরনের সাদৃশ্য-সন্ধানের চেষ্টা আসলে পণ্ডশ্রম; এবং তা ইতিহাস-বোধের বিরোধী। ইওরোপ ও ভারতবর্ষের পৃথকত্ব-জনিত ডায়ালেক্‌টিক্স উভয়ের সংযোগের মুহূর্ত থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বহুলাংশে নিরূপিত করেছে। যেমন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ইতিহাসে,

তেমন মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এই ডায়ালেক্‌টিক্‌স ক্রিয়াশীল। ইওরোপের অভিজ্ঞতাকে অধিগত করেই আমাদের জাতিগত আত্মপরিচয়ে পৌঁছতে হবে ও এগিয়ে চলতে হবে, এ আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। গত শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে যে-কাজ হয়েছে, তা মূলত এই প্রচেষ্টারই সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিহাস। ভুল হয়েছে, যখন আমরা পেণ্ডুলামের মতো দুটো উল্টো বিন্দুর দিকে ঝুঁকেছি; একদিকে ইওরোপের মডেলে ভারতবর্ষকে হুবহু মিলিয়ে দেখার বিকার; অন্যদিকে ইওরোপের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অস্বীকার করার অন্ধতা। অন্য প্রত্যয়, অন্য জগৎ দেখার একটা বড়ো ফল হচ্ছে তাতে নিজের কাছে নিজের স্বরূপটা স্পষ্ট হয়। সরল সমীকরণের দ্বারা ভেদরেখা লুপ্ত করে নয়, ইওরোপ বা তার আদি জননী গ্রিসের ভাবজগৎ অবিকৃতভাবে স্থাপিত করেই আমাদের অনুবাদকেরা এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে পারেন।

> যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন—ভাব সর্বত্রই সমান। কথাটা শুনিতে বেশ উদার, প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছুই নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়।...দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্যস্বভাবের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান-প্রদান, বাণিজ্য-ব্যবসায় চলে।
>
> রবীন্দ্রনাথ

যা স্ব-ভাবে গ্রিক তাকে ভারতীয় রূপ দিলে অর্থ ও ভাব-গত বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, অলোকরঞ্জন আন্তিস্ত্রোফের নাম দিয়েছেন 'অন্তরা' এবং স্ত্রোফের 'স্থায়ী'। আন্তিস্ত্রোফের অর্থ, lines recited during returning movement from left to right in Greek choruses। স্ত্রোফের অনুরূপ পারিভাষিক অর্থ আছে। অন্তরা বা স্থায়ী সেই বিশিষ্ট অর্থ বহন করে না; বরং এ-ধরনের প্রতিশব্দ ব্যবহারে ভুল বোঝার—এবং না-বোঝার—আশঙ্কা বাড়ে। একই কারণে, কোরাসের মুখে ঋক্‌মন্ত্র বসানো যুক্তিহীন। ষষ্ঠ ওডে গ্রিক দেবতা দিয়নুসাসের স্তব আছে। অলোকরঞ্জন তার প্রথমে ঋগ্‌বেদের অগ্নিবন্দনা সংযোজন করেছেন। অগ্নি ও দিয়নুসাসের একত্ব এতই দুর্নিরীক্ষ্য যে এখানে দিয়নুসাস-বন্দনার যা উদ্দেশ্য তার সঙ্গে অগ্নিস্তবের যোগ খুঁজে বার করা অসম্ভব। অনুবাদের এই রীতি অর্থ পরিগ্রহের দিক দিয়ে কী বিপত্তির সৃষ্টি করে ক্রেয়োনেক এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত :

> ঈশ্বরের ঈগলের ঝাঁক
> মৃতের কঙ্কাল বয়ে জিউসের শীর্ষসিংহাসনে
> নিয়ে যাক। (পৃষ্ঠা ৫৯)

ঈগলগুলো যে আসলে জিউসেরই, এ-ভাবে অনুবাদ করলে তা বোঝা দুষ্কর।

অলোকরঞ্জন আর একটি রীতি নাটকের ভাবলোক অবিকৃত রাখার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হচ্ছে : কথার আধিক্য। পণ্ডিতেরা বলেন, সোফোক্লেস গ্রিক নাট্যকারদের মধ্যেও আবার বিশেষভাবে মিতবাক। এই সংযত সমাহৃত ঋজু গড়নের সঙ্গে নাটকের তাৎপর্য অমোঘভাবে যুক্ত। ইংরেজ অনুবাদকরা লিখেছেন, সোফোক্লেসের ভাষার বাহুল্যবর্জিত রূপ ইংরেজিতে অব্যাহত রাখা কঠিন। বাঙলায় যে তা কঠিনতর, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে জেব বা কিটোর তর্জমা মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে, তাঁর অনুবাদে কথার যে কলোচ্ছ্বাস, বাঙলা ভাষায় স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাই তার একমাত্র কারণ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্রেয়োনের এই উক্তিটি নেওয়া যেতে পারে :

'এ-কোন লাগামছাড়া মুখ-আলগা অবাধ্য বাচাল!'	(পৃষ্ঠা ৩৫)
Thou art a born babbler	(জেব)
You are a babbling fool	(কিটো)

যেখানে অলোকরঞ্জন চারটে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, জেব ও কিটো সেখানে দুটো।

'ঘাসের চাপড়া ঠিক আছে' (পৃষ্ঠা ৩৩) প্রহরীর এই সংলাপের অথবা "বুকে ভৈরবী 'ভোর ভয়ি' ভোর ভয়ি" দ্বিতীয় ওডের ওই চরণটির (পৃষ্ঠা ৩৬) অনুরূপ কোনও পঙ্‌ক্তি আমি যে-কটা ইংরেজি তর্জমা দেখেছি, তার একটাতেও পাইনি।

এমনিতে শেষ ওডের তর্জমা রীতিমতো সুখপাঠ্য ও কবিত্বঘন। সবটা উদ্ধৃত করি :

মানুষের কাছে প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর
আর-কিছু নেই। বিধাতার বাণী সগৌরবে
নিত্য ধ্বনিছে, সেইখানে মাথা নোয়াতে হবে।
মুখর দম্ভ প্রভুর অনল এড়ালো কবে?
মহানির্বাণে দর্প হরো,
তার আগে তুমি বৃদ্ধেরে করো জ্ঞানবৃদ্ধ, গোধূলিনভে। (পৃষ্ঠা ৬৯)

আমার আপত্তি ওই শেষের 'গোধূলিনভে' শব্দবন্ধে। ইংরেজি অনুবাদগুলোয় এ-রকম কোনও শব্দ দেখিনি। সম্ভবত ওটা সংযোজন। অনুষঙ্গের টানে 'গোধূলিনভে' আমায় এখানে অস্বস্তিকরভাবে অলোকরঞ্জনের কবিতার জগৎ মনে পড়িয়ে দেয়। তাই এটা শুধু সাধারণ সংযোজন নয়, এখানে অনুবাদকের কবি-ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ ঘটেছে।

এবার অনুবাদ-নীতির দ্বিতীয় সূত্রে আসা যাক। *আন্তিগোনের* নিজস্ব নিহিত শক্তিই আছে আমাদের দেশ-কালের মানুষকে স্পর্শ করার, এ-কথা আগেই বলেছি। তাই আমাদের সংবেদ্য করে তোলার জন্য অন্তত অনুবাদে কোনওরকম বাইরের অলংকরণ-রূপান্তরণের দরকার পড়ে না। ভাব ও স্টাইল যথাসম্ভব অবিকৃত রাখা অনুবাদকের প্রাথমিক দায়িত্ব। তাছাড়া তাঁর করণীয় শুধু সমকালীন বাগ্‌রীতির ওপর তর্জমার ভাষাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা। নাটকে এ-দায় আবার অন্য শিল্পরূপের চেয়ে বেশি। বাগ্‌রীতিবিরুদ্ধ ভাষা সংলাপে চলে না। তাছাড়া, আবেগের চাপ, পরিস্থিতি ও চরিত্র-বিশেষের চাহিদা অনুযায়ী সংলাপের ভাষার ওঠা-নামা করতে পারা চাই; এ-কারণেও স্নায়ুময় জীবন্ত ভাষার সঙ্গে তার যোগ অপরিহার্য। অলোকরঞ্জনের অনুবাদে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট বাগ্‌রীতি সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে কি না, এ-বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে।

১. 'কেউ তাকে এককাঠা কবর কি একফোঁটা জল দিতে পারবে না' (পৃষ্ঠা ২৬)
২. 'জোর চল' (পৃষ্ঠা ৩২)
৩. 'মৃতের পুণ্যাহ করতে দাও' (পৃষ্ঠা ৪২)
৪. 'এ মেয়েটি নিরিবিলি কবর সাজাচ্ছিলো মড়া লোকটার' (পৃষ্ঠা ৩৭)
৫. 'বেআইনি মড়া লোকটাকে যেই কবর দিচ্ছিলো আমি ওকে দেখতে পাই' (পৃষ্ঠা ৩৭)
৬. 'মড়া পোলুনাইকেস প'ড়ে ছিল' (পৃষ্ঠা ৬৪)

চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে 'মড়া' হয় বানান ভুলের, নয়তো বাগ্‌রীতি লঙ্ঘনের উদাহরণ।

কাব্যনাট্যে, শেষ বিশ্লেষণ, বাগ্‌রীতির সঙ্গে বাক্‌স্পন্দের প্রশ্ন জড়িত। বিদেশি নাটকের তর্জমায় এ-দিকটার ওপর বাঙলায় এখনও যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ম্যাকবেথের তর্জমায় গিরিশ ঘোষ বা যতীন সেনগুপ্ত যে-সব সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন সেগুলোই যথেষ্ট নয়; Edward II-এর ভাষান্তর করতে গিয়ে ব্রেখ্‌ট যে-সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে অব্যহিত ছিলেন, সেগুলো এড়িয়ে চললে কাব্যনাট্যের অনুবাদের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ মসৃণ নিয়মিত প্যাটার্ন বজায় রাখাই সব নয়; আবেগের চাপে দরকার মতো বাঁধা ছাঁদ ভেঙে ফেলে কথা বলার জীবন্ত ও জটিল ছন্দ-স্পন্দের ওপর নাট্যভাষাকে দাঁড় করাতে হয়। এ-ধরনের বেড়ি-ভাঙার চেষ্টা অলোকরঞ্জন করেছেন বলে মনে হয়নি। আমার বিশ্বাস, 'আন্তিগোনে'র সর্বসাকুল্যে ১৩৫৩ পঙ্‌ক্তির মধ্যেই আবেগের এত বিচিত্র মাত্রাভেদ, বিস্তার ও নাটকীয় প্রতিন্যাস আছে যে ছন্দোমুক্তির প্রসারিত আকাশ-গঙ্গাতেই তার সেই বহুস্বর কাঁপনকে তিনি ধরতে পারতেন। আর,

পেরিক্লেসের আথেন্সের জীবন-যাত্রার ছন্দকে বাঙলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করার অন্য কী উপায় আছে? আমার ধারণা, প্রাকৃতিক ছন্দের তালে তালে শব্দগুলোকে বাজিয়ে নিতে পারলে আজকের বাঙলা দেশের বহরহীন দৈর্ঘ্যহীন মধ্যবিত্ততার প্যাটার্ন থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক দুরন্তবীর্য জগতের আদল আনা সম্ভবপর।

পরিশিষ্টে 'আন্তিগোনে নাটকের দেবতায়ন' যোজিত হয়েছে। দেবতায়ন সম্ভবত প্যান্থিয়ানের তর্জমা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে : ফিনেউস বা লাইআস-এর নাম দেব-দেবীর তালিকায় কেন এল? আমার মনে হয় নাটকে উল্লিখিত সমস্ত পুরাণ-প্রসঙ্গের ওপরেই টীকা থাকলে ভালো হত।

সাহিত্য অকাদেমির বই বলেই কিছু মুদ্রণ-ত্রুটির উল্লেখ করছি। একচল্লিশ পৃষ্ঠায় 'কোন'-র জায়গায় 'কোণ' ছাপা হয়েছে। কয়েকক্ষেত্রে বানানসম্মিতি রক্ষিত হয়নি। যেমন, প্রথম পৃষ্ঠায় 'উষা' অথচ ৬৯ পৃষ্ঠায় 'প্রত্যুষা'; ৫৬ পৃষ্ঠায় 'লুকাউর্গাস', কিন্তু ৭৫ পৃষ্ঠায় 'লুকাউর্গোস'।

গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসি। গ্রিক না জানার জন্য এ আলোচনায় আমি প্রায় পদে পদে হোঁচট খেয়েছি। আর লিখতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, পুরো বিষয়টা সম্বন্ধেই আমার অজ্ঞতা কী আকাট। আসলে আমরা প্রায় সকলেই এখনও যবন পণ্ডিতের গুরু-মারা চেলা। আর সেইজন্যই আমাদের সংস্কৃতিচর্চার মৌলিক গৌণতা কিছুতেই ঘুচছে না। গ্রিকভাষা ও সংস্কৃতি যথোপযুক্ত অনুশীলন ওই গৌণতা কাটানোর একটা প্রশস্ত উপায় তবে সেটা বাণিজ্যিক পুঁজিতে অথবা শৌখিন পাণ্ডিত্যবিলাসে দাঁড়িয়ে যাবার একটা ভয় আছে। সেই অনুশীলন চরিতার্থতা পায় আমাদের জাতিগত সত্তার পরিচয় খুঁজে বার করার তদ্‌গত স্বনির্ভর চেষ্টার সঙ্গে সংলগ্ন হলে। স্বদেশচেতনা, অন্তত এ-যুগে, আত্মবোধেরই ওপিঠ। নিজেকে এবং নিজেদের শনাক্ত করার ব্যাপারে অনুবাদচর্চা কখনও কখনও পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে; সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার বহু নজিরও আছে।

আর একটা কথা। অনুবাদের নীতি সম্বন্ধে সাহিত্য অকাদেমি ভাববেন এবং তাঁদের সুসংবদ্ধ ভাবনা সাধারণ্যে বিবৃত করবেন, অকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবি পেশ করতে চাই। এটা এমন একটা কাজ যেটা অকাদেমির মতো সাহিত্য-সঙ্ঘের এক্তিয়ারে পড়ে। তাছাড়া, ওঁদের কর্মসূচিতে তর্জমার প্রাধান্যও কিছু কম নয়।

১ সোফোক্লেস, 'আন্তিগোনে', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি ১৯৬৩

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
(ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৩)

অরুণ সেন

বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি'

চোরাবালি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার পর প্রায় তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু ওই কাব্যগ্রন্থটির উজ্জ্বলতা এখনও হ্রাস পায়নি। 'উজ্জ্বলতা' শব্দটি আমি ইচ্ছা করেই বসালাম, কারণ *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর ঈষৎ ভাবালুতার চিহ্নমাত্রও নেই এখানে — সপ্রতিভ, ব্যঙ্গ চতুর, মননশীল কবির কখনও তির্যক হাসি, কখনও সংযত ও সচেতন আবেগ কবিতাগুলোতে যেন আছড়ে এসে পড়ছে। এই বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতা এতই মৌলিক এবং হৃদয়গ্রাহী যে, এর নবীনতা এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অথচ এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে — অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র বয়স যখন আঠারো থেকে আঠাশের মধ্যে। অবশ্য অধিকাংশ কবিতা ১৯৩৩ থেকে রচিত (একুশটির মধ্যে তেরোটি) — অর্থাৎ *চোরাবালি*-র অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়, যখন বিষ্ণু দে-র বয়স পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, অনেকে *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর পরে *চোরাবালি*-কে বিষ্ণু দে-র কাব্য-বিবর্তনের আরেকটি ধাপ বলে মনে করেন। এ ভুল আগে আমিও করেছি। কিন্তু সালের হিসেব দেখিয়ে দেয় যে, *চোরাবালি* এবং *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর বহু কবিতা একই সময়কালের মধ্যে রচিত এমন কি *চোরাবালির* কিছু কবিতা *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর আগে—যদিও *চোরাবালি*-র রচনাকালের ব্যাপ্তি সামান্য বেশি। কোন ভিত্তিতে কবিতাগুলোকে দুভাগে ভাগ করে কবি প্রকাশ করলেন? কবিতাগুলোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। অর্থাৎ দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা প্রায় অনিবার্য ছিল। কিন্তু *উর্বশী ও আর্টেমিস* বেরিয়েছে ১৯৩৩ সালে, *চোরাবালি* ১৯৩৭ সালে। শুনেছি, প্রায় একই সময়ে রচিত এই কবিতাগুলো সুধীন্দ্রনাথের পরামর্শেই দুটি ভাগে ভাগ করে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা অসংগত নয় যে, সুধীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলোকে আপেক্ষিকভাবে বেশি পছন্দ করতেন সেগুলোকেই, অর্থাৎ সমাজসচেতন ও নানার্থব্যঞ্জক কবিতাগুলোকেই *চোরাবালি*-তে স্থান দেওয়ার কথা ভেবেছেন। অবশ্য আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে শুধু কলাকৌশলের দিক থেকেই নয়, সামগ্রিক কাব্য অভিজ্ঞতাতেও *চোরাবালি* অনেক পরিণত এবং আগেই বলেছি, অত্যাধুনিক পাঠকের কাছে আজও চিত্তাকর্ষক।

বুদ্ধদেব বসুর লেখা পড়ে জানা যায়, বহু কবিতা, বিশেষত সমাজসচেতন ব্যঙ্গ কবিতাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে *প্রগতি* ও *কবিতা* পত্রিকায় বেরিয়েছিল, পরে সেগুলি একত্রিত করে সাধারণ শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। যেমন, 'গার্হস্থ্যাশ্রম' বা 'শিখণ্ডীর গান'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন : 'ট্রিওলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ করেছেন (কবি) তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।'

অবশ্য নানা দিক থেকে *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর সঙ্গে এ গ্রন্থের যে সম্পর্ক নেই, সে কথাও বলা যায় না। বিশেষত *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর বহু কবিতায় তিনি যে প্রেম সম্পর্কে বিরাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, এমনকি কখনও অপ্রেমও যাচ্ঞা করেছেন, তা *চোরাবালি*তে বরং আরও উগ্র হয়েছে এবং তিনি নিজেও যেন এই দুরবস্থাটা উপভোগ করছেন। *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর কিছু কবিতায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবকের যে দীপ্ত প্রেম ফুটে উঠেছে তা এখানে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত।

প্রেম সম্পর্কে মোহভঙ্গ তাঁর সতেরো-আঠারো বছরের নিপুণ কবিতা 'মন-দেওয়া-নেওয়া'তেই প্রকাশ পাচ্ছে। আর্তনাদ নয়, বরং মারাত্মক যুক্তিবাদী এবং অত্যন্ত পরিপক্ব মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে এই অতি-তরুণ কবির কণ্ঠে :

আসল কথাটা আমি যা বুঝি,
প্রেম ফ্রেম বাজে, আসলে নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
এরই নাম "প্রেম "।

কিংবা আরও পরে :

আগেই বলেছি অজানাই হল প্রেমের নানা,
শরীর মানস, ভাবের বাণী... ইত্যাদি।

অবশ্য এটাকে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই কবি উপস্থিত করেছেন, মনে হয় — যেটাকে আমরা আমাদের দেশের বিশেষ বুর্জোয়া বিকাশের পটভূমিকায় নিরালম্ব নাগরিক মধ্যবিত্তদের লক্ষণ বলতে পারি।

চোরাবালির এই পটভূমিকে ভুললে চলবে না। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ের বাংলাদেশের, কলকাতার বাস্তবতা এই আত্মঘাতী ব্যঙ্গ কবিতাগুলির পরিবেশ। এ সময়ে রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক যে শূন্যতাকে আমরা অতিক্রম করেছিলাম, তা এখন ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু, এই কবিতাগুলি সমাজের যে অংশকে মুখ্যত প্রতিফলিত করছে, সেই বাঙালি নগরবাসী উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান সমাজ এখনও অল্পবিস্তর সেই চরিত্র নিয়েই আছে। তাই এই সমাজচিত্র এখনও আমাদের খুব চেনা লাগে। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজ বললে ঠিক বলা হয় না—কিছুটা কপালফেরা বিত্তবান ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, যারা হয়তো উনিশ শতকের অনেক আতিশয্যেরই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছে, তাদের কথাই বলা হয়েছে। এখনও তাদের খুঁজে পেতে স্বর্গমর্ত্য সেচতে হবে না। সম্প্রতি একটি লেখায় তার কৌতুকময় বিবরণ পাওয়া গেল : 'এরা সব বালিগঞ্জের ছটাকি-সভ্য কালোবাজারি পরিবারের, মা যেখানে ডাঙরি-পরে কালো-চশমা-চোখে প্রচণ্ড গাড়ি চালিয়ে ছেলেকে বা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেয় — স্কুলে তারা পেটকাটা জামা পরা আন্টির শিথিল ভুঁড়ি দেখতে দেখতে আর্ট শেখে'। এখন অবশ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গীয় চর্চার উল্টো সফিস্টিকেশন দেখা দিয়েছে, যেখানে অনুবাদের গন্ধ প্রায় সমপরিমাণ উগ্র। আর সেই তিরিশের যুগে তো বলারই নেই, এই ভুঁইফোঁড় চরিত্রহীন, কাপুরুষ, মধ্যবিত্ত সমাজ অন্ধ অনুকরণে এবং নীরক্ত শৌখিনতার চর্চাতেই ব্যস্ত। এই সমাজই বিষ্ণু দে-র তথাকথিত সামাজিক কবিতাগুলির ব্যঙ্গের বিষয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রকারান্তরে '*চোরাবালি*'র কবিতাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, 'নানার্থব্যঞ্জক' কবিতা—যার মধ্যে পড়ছে সম্ভবত 'ঘোড়সওয়ার', 'ওফেলিয়া' ' ক্রেসিডা' ইত্যাদি কিছু কবিতা। বলা বাহুল্য এগুলো শেষের দিককার রচনা এবং এগুলো সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের অনুরাগ উচ্ছ্বসিত—এগুলোর কারণেই বোধহয় তিনি পৃথক-গ্রন্থ প্রকাশের প্ররোচনা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত আরেক ধরনের কবিতা, যাকে কখনও তিনি বলেছেন 'স্বচ্ছ ও ঋজু কবিতা, কখনও 'যথাযথ সমাজচিত্র' — যেগুলো, তাঁর স্বীকার করতে বাধেনি, তাকে অপেক্ষাকৃত কম টানে। তিনি নিজেই এই রুচিবোধের তারতম্যের কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, তিনি যেহেতু, সামান্যীকরণের মোহ' কাটাতে পারেন না, তাই 'বিষয়াতিরিক্ত কাব্যচর্চা আর নৈর্ব্যক্তিক পুরুষসিদ্ধি' যেখানে ঘটে, ' নৈরাত্ম্য উপকরণে স্বকীয়তার সৃষ্টি' যেখানে হয়, সেখানেই তাঁর মন সায় দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাব্যসংস্কার ভিন্ন পথে চলে। বিভিন্ন ধরনের কাব্যোপভোগ সম্ভব বলেই শুধু নয়, কাব্যের মধ্যে সমাজের, একেবারে বিশেষ কালের ও সমাজের রং পড়লে বা তার টান থেকে কবিতার জন্ম হলে, সার্থকতার ক্ষতি হয়, এমন অভিজ্ঞতা

আমার হয়নি। তাছাড়া, *চোরাবালি*-র কবিতাগুলোকে এক সঙ্গে পড়তে বা একটি কবিতার স্মৃতিতে (রেশ থাকতে থাকতে) আরেকটি কবিতা পড়তে আমি অভ্যস্ত বলেই হয়তো এরকম বিভাগে আমার মন সায়ও দেয় না (যা হয়তো সম্ভব ছিল না সমসাময়িকদের কাছে, যাঁরা কবিতাগুলোকে বেশ সময়ের ব্যবধানে পত্রস্থ হতে দেখেছেন)।

*চোরাবালি*তে যাকে বলা হয় পাণ্ডিত্য—অর্থাৎ গ্রিক নামের উল্লেখ, য়ুং-এর তত্ত্ব, ক্রেৎসমার-এর মন্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করেছে। ফলে বহু কবিতাই যথোচিতভাবে হয়তো পৌঁছোয় না— অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত থাকে। এই পাণ্ডিত্য অনিবার্য নয়, একথা যেমন আমার মনে হয় না, তেমনি পাণ্ডিত্যের বিষয়টাই একটা মজার ব্যাপার, একথা আমি ভুলেও ভাবতে পারি না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু যখন সুধীন্দ্রনাথের উক্তি 'বিষ্ণু দে-র মতো এলিয়ট-ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না' উধৃতি করে প্রশ্ন করেন : 'তবে কিসের তাড়নায় লেখেন?' — তখন যেমন বুঝি, শুধু 'নিছক' শব্দটি চোখ এড়িয়ে গেছে বলেই নয়, এই পাঠকের অনাধুনিকতা আরও গভীরে (সুধীন্দ্রনাথের বর্তমানভক্ত বুদ্ধদেব বসু আশা করি এখন আর সে প্রশ্ন করেন না), তেমনি *চোরাবালি*-র পাণ্ডিত্য-চর্চাতেই যিনি কালক্ষেপ করবেন এবং কোন্ শাস্ত্র না জানলে কবিতা বোঝাই যাবে না, এই হিসেবে মাতবেন, সেই অরসিকের ছায়া না মাড়িয়ে গ্রন্থটি পাঠ করারই আমি পক্ষপাতী।

১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি কবিতা স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হয়েছে — প্রত্যেকের বছর একটি করে (১৯২৭ সাল বাদ)। তাছাড়া ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে লেখা ষোলোটি ছোট ছোট কবিতা (কবিতাগুলি বিচিত্র ও তাৎকালিক অভিজ্ঞতার দ্বারা আক্রান্ত) একসঙ্গে পরে গ্রথিত হয়েছে, বোঝা যায়। এই একুশটি কবিতাকে মোটামুটিভাবে সমাজসচেতন ব্যঙ্গ কবিতা বলে গ্রহণ করা যায় এবং এগুলো *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর আগে বা সঙ্গে সঙ্গে লেখা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণু দে-র মনে এ সময়ে বিচিত্র ও বিপ্রতীপ কতকগুলি অভিজ্ঞতা কাজ করে যাচ্ছিল। একদিকে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের 'প্রত্যক্ষ' (১৯৩০), 'সাগর উত্থিতা'র (১৯২৯) মতো উৎফুল্ল কবিতা তিনি লিখছেন, অন্যদিকে ঠিক তখনই তিনি *চোরাবালি*-তে 'বিবমিষা', 'উভচর', 'প্রথম পার্টি'র মতো কবিতায় ব্যঙ্গ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। একদিকে সমাজসচেতন ব্যঙ্গ, অন্যদিকে খানিকটা কবিতা-নির্দিষ্ট আবেগ একই সঙ্গে আসছিল বটে, কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি দ্বিতীয়ভাগের কবিতাগুলিকে স্থান দেন, বোধহয় খানিকটা বিনয়ী সূচনা করার সুবুদ্ধিতে। বহুদিন পরে *চোরাবালি* গ্রন্থে আবার ওই উজ্জ্বল সমাজব্যঙ্গমূলক কবিতাগুলো যেন মুক্তি পেল।

চোরাবালি-র কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে দেখলে দেখা যায় প্রথম থেকেই প্রকরণের কী নৈপুণ্য তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯২৬ সালে রচিত 'মন-দেওয়া-নেওয়া'র কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তরুণ কবির এই বিদগ্ধ নাগরিকতা ও সুতীব্র বিরাগ বিস্ময়কর। তারপর একবছর বাদ দিয়েই ১৯২৮ সালে রচিত হয় 'প্রথম পার্টি'। খানিকটা সেন্টিমেন্টাল শোনালেও এর অভিজ্ঞতার সততা প্রথম কবির কাজ থেকে খুব আশাপ্রদ — বিশেষত এর চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্বে ও শব্দব্যবহারের চাতুর্যে। তারপর ১৯২৯ সালে 'বিবমিষা' এবং ১৯৩০ সালে 'উভচর'। এই কবিতা দুটোই কিন্তু এক হিসেবে *উর্বশী ও আর্টেমিস* গ্রন্থের সুরটাকে মনে করিয়ে দেয় — একদিকে 'বিবমিষা' কবিতার তীব্র ঘৃণা, 'উভচর' কবিতার নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তি এবং অন্যদিকে বাঁধভাঙা আবেগের জন্য দুর্মর প্রতীক্ষা।

১. গভীর আমার ঘৃণা— ঘৃণার এ সমুদ্রের পাশে
প্রেম যে গোষ্পদজল শুষ্ক গ্রামের ডোবার। (বিবমিষা)

২. নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক!
দু'পাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ। (উভচর)

বিষ্ণু দে-র কবিতার মূল বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি যেন প্রথম কাব্যগ্রন্থেই স্থির হয়ে গেছে, তারপর

সারা জীবন ধরে চলেছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রকরণের মধ্যে দিয়ে সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ে রচিত কবিতার সংখ্যাই বেশি — এসময়ে তিনি দু-ধরনের কবিতাই লিখেছেন — সেই তথাকথিত সমাজসচেতন এবং নানার্থব্যঞ্জক কবিতা। তার মধ্যে ১৯৩৩-৩৪-৩৫—এই তিন বছরেই হচ্ছে সবচেয়ে উর্বর সময়— এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো এ সময়েই রচিত, এ কথাও বলা চলে।

চোরাবালি গ্রন্থের মূল থীম আলোচনা করলে দেখতে পাব, যে কয়েকটি বিষয় পূর্বগ্রন্থ *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এ ছিল, তা এখানেও ঘুরে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ ঘৃণা ও ক্লান্তি ; প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব বা অসারত্ব সম্পর্কে চেতনা এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমের একটি দীপ্ত ও প্রসন্ন রূপ। তাই 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র সিগনেট সংস্করণের (বৈশাখ ১৩৬৭) পেছনের মলাটে লেখা আছে বটে : "ঘৃণা আর হিংসা, হতাশা আর শ্লেষ যখন একশ্রেণীর আধুনিক লেখকদের মূলধন, বিষ্ণু দে-র অবলম্বন তখন প্রীতি আর প্রেম", কিন্তু একথা পুরোপুরি সত্য নয়। এই দুটি কাব্যগ্রন্থেই ঘৃণা বা হতাশা বা শ্লেষ পুরোমাত্রায় আছে — কিন্তু লক্ষ করবার যেটা তা হচ্ছে এগুলো কোনও নেতিবাচক বা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে নেই এখানে। বরং প্রবল ভালবাসা ও প্রবল ঘৃণা একই সত্য থেকে বা একই উপলব্ধি থেকে আসছে, এদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক তাঁর চিন্তার কাঠামোয় সুনিশ্চিতভাবেই রয়েছে। এটাই বরং আরও স্পষ্ট এবং শাণিত হয়েছে তাঁর পরিণত জীবনের কাব্যে। তুলনা করলে অবশ্য দেখা যায় *চোরাবালি*-তে শ্লেষটাই জোরালো, *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এ যেমন প্রেম।

চোরাবালি-র বেশ কতকগুলি কবিতাতেই দেখছি ক্লান্তি-হতাশা-নিঃসঙ্গতাবোধ কখনও ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে, কখনও ব্যাপকতর সমাজচেতনায় হানা দিচ্ছে —*উর্বশী ও আর্টেমিস*-এ যে লক্ষণ আমরা প্রধানত ১৯৩১ সালের কবিতাগুলোতে বার বার পেয়েছি।

১. তোমাকে দেখিলে রী রি করে মোর গ্রন্থিস্নায়ুশিরা... (বিবমিষা, ১৯২৯)

২. প্রহর যায়,
প্রহর যায়
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন। (হেলেনিস্ট, ১৯৩২)

৩. ভুলে গেছি কিবা ভুল — দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো। (প্রিরাফায়েলাইট, ১৯৩২)

৪. কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের স্তব্ধ প্রান্তে,
বিস্বাদ হৃদয়ে
বিষণ্ণ আলোয় বসে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি... (খোঁয়ারি, ১৯৩২)

উর্বশী ও আর্টেমিস গ্রন্থে কিন্তু দেখেছিলাম, ১৯৩১ সালের ওই ক্লান্তি ও বিরাগ থেকে উঠে এসে ১৯৩২ সালের কবিতাগুলোর মধ্যে যেন প্রেমে আস্থা ফিরে পেয়েছেন। অবশ্য দু-এক বছরের মধ্যে এরকম চুলচেরা বিচার করা হয়তো অবাস্তব, বিশেষত কবির জীবনের তৎকালীন ঘটনা আমার যখন জানা নেই। বড় জোর বলা যায় এসময়ের রচনায় দুটো মনোভাবই পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের এখানে মূলত লক্ষণীয় এ গ্রন্থে একদিকে 'দিনগুলি যায় ক্লান্তিতে উচ্ছলি' এবং অন্যদিকে 'এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস' খুব অনিবার্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বলাবাহুল্য, পূর্বে উল্লিখিত সামাজিক পটভূমি এবং সে সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।

এই মনোভাব থেকেই সংগতভাবে জন্মায় প্রেম সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা, অর্থাৎ 'প্রেম-ফ্রেম' সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপরিহাস। প্রথমটা অবশ্য *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এই পেয়েছিলাম, কিন্তু

এখানে তার প্রকাশ আরও তীব্রভাবে এবং আবেগের তুলনায় মননের চাপে রূপান্তরিত হয়ে।

১. অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।

('কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স', *গার্হস্থ্যাশ্রম*)

২. সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক লিলি।

('আত্মজ্ঞান', ওই)

৩. নতুন তো নেই কিছুই! এখন করব কি যে!
করব কি যে?
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!

('মন-দেওয়া-নেওয়া')

৪. সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই ...
হৃদয়দানের সুর ভেঁজে যাই অভ্যাসেই।

('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')

কিন্তু ব্যঙ্গপরিহাসটা নতুন — চোরাবালি-তেই প্রথম পেলাম সমাজসচেতন ব্যঙ্গ। অর্থাৎ এই ঘৃণা, ক্লান্তি, অবিশ্বাস এগুলো প্রধানত আবেগাশ্রিত *উর্বশী* ও *আর্টেমিস*-এর কবিতায়, *চোরাবালি*-তে সেখানে স্থান নিয়েছে বুদ্ধি ও মনন। আমার ব্যক্তিগতভাবে এই সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতাগুলো ভারি পছন্দ। পরবর্তীকালে এই ধরনের বহু কবিতা লেখা হয়েছে এবং এগুলোর পেছনে বিষ্ণু দে-র প্রভাব বিশেষ কাজ করেছে বলে মনে হয়। উদ্ধৃতি দেওয়া খুব মুশকিল, সারা গ্রন্থ জুড়েই রয়েছে। তবু আমি একটু বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টাই করব।

১. নাকি আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি
পড়েছি প্যারিসে গিয়ে, তাই চোখে আনো
কৌতূহল নামে বস্তু, অলকা, বলো তো। (পূর্বরঙ্গ, গার্হস্থ্যশ্রম)

২. লেকে আজকাল সকলেই যায়!
সকলেরই মতো ম্লান সন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছ! কী বুর্জোয়া! (বেতাল, ওই)

৩. তোমার পাশে তো তাই ঘেষে এসে মিলি
সিগারেট না খেয়েই হাসছ যে লিলি! (আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ, ওই)

৪. শহরের বুকে পাঁচতলায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট!
ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চ বৃক্ষচূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায়!
গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট! (কবি কিশোর)

৫. অতএব, মেসে কাটাও তক্তপোষে
দৈনিক দেখ কাজ খালি কোথা কষে
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চষে
আর দেখ রসে সিনেমার পোস্টার,
এলবার্ট হলে তারপর শোনো বসে
ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার। (বেকার বিহঙ্গ)

৬. সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া হেথা। (প্রথম পার্টি)

৭. ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ড্রয়িংরুমে — হে অতনু! বীর তনুতে সাজো। (কথকতা)

৮. ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল বিচিত্র সন্ধ্যায়,
গোধূলি মায়ায় মুগ্ধ মোটরের সীটে,
চুম্বনতাড়নাকম্প্রবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ? (কথকতা)

৯. সুরেশের অবসরক্ষয়ের ধরন
তাই
সুরেশের মানসজীবন। (ওই)

১০. অথবা শোনো—
মানুষ যে পশু প্রমাণ তার
আহার তার।
মুখব্যাদান, দন্তবিকাশ, চর্বণ, ঠোঁটে হাতে মাখামাখি,
অজীর্ণতা
ইত্যাদি সব কী দারুণ রূঢ় বর্বরতা! (কথকতা)

বলাবাহুল্য, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের উদ্দিষ্ট স্থল আমাদের খুব পরিচিত উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনী সমাজের সেই অংশ, যাদের কৃত্রিমতা এবং স্বার্থপরতা শেষপর্যন্ত ক্লীব বৃহন্নলার রূপ ধারণ করেছে। জীবন তাদের কাছে সাজানো বানানো এক কূপ। এদের সম্পর্কে কোনও সামাজিক দলিল আমাদের হাতে নেই। বরং দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন এই সমাজের চেহারা সাহিত্য থেকেই পেতে হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় আমরা তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম। বুর্জোয়া সমাজের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সেই চরিত্রহীন সেবকদের সম্পর্কে ঘৃণা জমা করেছেন এখানে বিষ্ণু দে, তারাই তো আধুনিক কবি ও পাঠকের সবচেয়ে পরিচিত জগৎ।

সুধীন্দ্রনাথ এই ধরনের কবিতা, যেখানে 'অর্থবৈচিত্র বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প', তার প্রতি অনীহা থাকার জন্যই অন্যায়ভাবে মন্তব্য করেন : 'ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দে-র করুণা-কণা জোটেনি ... এবং এর ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেনি, শুধুই জুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার উপলক্ষ'। ব্যঙ্গের সঙ্গে করুণার যে বিরোধ নেই, এ কথা সুধীন্দ্রনাথ তখন খেয়াল করেননি — বরং সুনিশ্চিত মানবপ্রীতির সঙ্গেই আছে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের নিকট সম্পর্ক। নেতিবাচক অবজ্ঞা তো নয়ই। এটা মনে রেখেই ব্রেখট বলেছিলেন, নাটকে মেয়েটির দুঃখে কাঁদব বটে, কাঁদব নাও বটে। সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'বোঝা যায় না বিষ্ণু দে কখন হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন'— তখন তার জবাবে ব্রেখটের ওই উক্তির প্রতিধ্বনিতে রঙ্গ করে বলা যায়, তিনি সব সময়ই কাঁদছেন বটে, হাসছেনও বটে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রুপেই যেহেতু তাঁর কবিতা শেষ হয়ে যায় না, তাই বোঝা যায় তাঁর মানসিকতার সর্বগ্রাসী সমগ্রতাকে, সমব্যথীর তৎপরতাকে। প্রেম সম্পর্কে একটি সন্দিগ্ধ মনোভাব যেমন এই ব্যঙ্গের উৎস এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক পটভূমির অবিকৃত প্রতিক্রিয়া হিসেবে, তেমনি কবির সীমাতিশায়ী এবং পরাক্রান্ত জীবনচেতনার পরিচয় পাই, যেখানে প্রেম সম্পর্কে তাঁর উৎসাহী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে—যদিও *উর্বশী ও আর্টেমিস*-এর তুলনায় এই বোধ খানিকটা হয়তো এখানে

সংকুচিত।

১. বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝরে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা।
তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনও তরুণ তমালে,
একদিন, একরাতে, কোনও এক কালে। (পঞ্চমুখ ৩)

২. হে বীর অতনু, নচিকেতা ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা। (মহাশ্বেতা)

সুধীন্দ্রনাথের সুলিখিত রচনাটির গুণে এবং আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনগুলোর আনুকূল্যে 'চোরাবালি'র বিশেষ কয়েকটি কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে পাঠকসমাজে। তার মধ্যে অবশ্য তিনটিই সুধীন্দ্রনাথ-কথিত বিবিধার্থক কবিতা : ওফেলিয়া, ক্রেসিডা এবং ঘোড়সওয়ার। বাকিটা 'প্রহসনজাতীয় নাট্যরচনা' : টপ্পা-ঠুংরি।

'ওফেলিয়া' এবং 'ক্রেসিডা' দুটো কবিতার পেছনেই শেক্সপীয়রের নাটক এবং অন্যান্য বহু রচনা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। অথচ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তিনি অসামান্য মৌলিক দুটি কবিতা রচনা করেছেন — সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নৈরাত্ম্য উপকরণেও এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি'। এই অর্থেই তিনি কবিতা দুটিকে বলেছেন 'সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ'। আরও বলেছেন, গীতিকবিতা ও নাট্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এখানে। 'বাহ্যত ওফেলিয়া যদিচ গীতিকবিতার শ্রেণীভুক্ত ; তবু তার ভাববিস্তার একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী।' অথচ শেক্সপীয়রের এই নাটকের পুনর্বর্ণন করে তিনি কিন্তু ব্যাপকতর সত্যের কথাই বলেছেন— 'প্রেমিক সাধারণের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনির সারসংগ্রহই শুধু নয়,' তাদের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডিকেও। ওফেলিয়া তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় 'সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক'। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ট্র্যাজেডির মহিমা আরোপের জন্যই তিনি হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় এই কথা বলেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে 'শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে'। ক্রেসিডা কবিতাতেও আছে এই নাট্যরচনার প্রচেষ্টা — তিনি নাকি এখানে 'বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েছেন'। এ বিষয়ে তিনি চসর, হেনরিসন ও শেক্সপীয়রকে এককভাবে গ্রহণ করেননি, প্রত্যেককেই অসম্পূর্ণ ঠেকেছে, প্রয়োজনমতো তাঁদের মিলিয়েছেন স্বাধীন ও স্বকীয় নির্বাচনে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 'প্রাণযাত্রার প্রত্যাবর্তন নেই এবং অভ্যাসবশে আমরা ক্রমাগত পিছনে তাকাই বটে, কিন্তু কার্যত পুনরুজ্জীবিত অতীতের সাদর সংবর্ধনা মর্ত্যবাসীর স্বভাববিরুদ্ধ'। কবিতাদুটি সম্পর্কে এই হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

সন্দেহ নেই *চোরাবালি*-তে প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং মোহবর্জন যে বহু সমাজব্যঙ্গমূলক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেই মনোভাব থেকেই কবিতা দুটি রচিত। অবশ্য উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে, তিরিশের কবিদের, বিশেষত সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র তৎকালীন কাব্যাদর্শের পরিচয় মেলে। নিজের একান্ত প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ববীক্ষা নয়, বরং কোনও নৈরাত্ম্য উপকরণের মধ্যেই স্বকীয় অভিজ্ঞতার সমীকরণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। 'কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন'। (কাব্যের মুক্তি, সুধীন্দ্রনাথ)। এবং তখন এই কাব্যাদর্শের তাগিদেই পাণ্ডিত্য এবং মননচর্চা এবং প্রাসঙ্গিক দুর্বোধ্যতা খানিকটা অনিবার্য ব্যাপার। ইংরেজি সাহিত্যের এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন, তার কারণ 'বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্তা' এই চরিত্র-দুটিই তো হতে পারে তাঁর তৎকালীন চিন্তার সার্থক objective correlative।

হ্যামলেট মনে করেছিলেন, ওফেলিয়া অবিশ্বাসিনী — তাই প্রেম সম্পর্কে তার সব সাধ-আশা ধূলিসাৎ হয়। ক্রেসিডা কবিতাতেও ট্রয়লাসের জবানিতে এই অবিশ্বাসিনীকে দেখানো হয়েছে। চসার, শেক্সপীয়র কিংবা হেনরিসনের কাব্যে বর্ণিত এই চরিত্রটি পুনরায় বিষ্ণু দে-র কবিতায় ফিরে এসেছে বিশ্বাসভঙ্গের প্রতীক হিসেবে।

এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তাতে আমরা বুঝতে পারি তিরিশের যুগের বাংলা দেশের বিত্তবান সমাজের পটভূমিকায় মুক্ত ও সুস্থ প্রেমের অভাব কীভাবে এই নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যে পৌঁছে দিয়েছে কবিকে। যে ওফেলিয়া হ্যামলেটের মন ভুলিয়েছিল, তার মনে জাগিয়েছিল উদ্ধত প্রেমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা — তিনি দেখতে পাননি মেঘের রেশমি আড়ালে বজ্রের যাওয়া আসা— ফলে যা ঘটবার ঘটল : 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকে'। হ্যামলেটের মোহ; প্রেম সম্পর্কে আশা এবং সম্ভাবনা বারবার জাগছে বহু চিত্রকল্পের মধ্যে — মাঝে মাঝেই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে বটে — কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আলোছায়ার লীলা ভেঙে যায় চূড়ান্ত বিনাশে। ক্রেসিডা কবিতাতেও তাই : আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, স্মৃতি ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত নির্বিকার অভাবে শেষ হয়। একদা যে ক্রেসিডা ট্রয়লাসকে ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাকেই আবার তিনি পান অসুস্থ, হৃত-ঐশ্বর্য রূপে। ক্রেসিডার স্মৃতি বারবার আসে, বারবার মনে পড়ে তার প্রাক্তন সাহচর্যের মাধুর্য— কিন্তু ফেরার উপায় নেই, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে — শুধু অবশিষ্ট পড়ে থাকে বড় জোর একটি লাইন : 'স্মরণে তোমার হানে আজো তরবারি'। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয় কবিতা-দুটির — এই দ্বন্দ্ব — তারই প্রেরণায় আসছে একের পর এক চিত্রকল্প ; অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগছে ; চিত্রকল্পের বিন্যাসে, আপাতবিচ্ছিন্ন সমাহারে ও আকস্মিকতায় তার আভাস।

ওফেলিয়া ও ক্রেসিডা — কবিতার 'নৈরাত্ম্য উপকরণে'র মধ্যে দিয়ে যা বলার চেষ্টা হয়েছে, তাই সামাজিক বাস্তবতার ভাষায় বলেছেন তিনি 'টপ্পা-ঠুংরী' কবিতাটিতে। অর্থাৎ আমাদের নাগরিক জীবনের খণ্ডতা ও অসংলগ্নতা এবং নৈরাশ্যের ফলশ্রুতি। *চোরাবালি*-তে এলিয়টের প্রভাব গভীরভাবে কাজ করেছে, সবাই বলেছেন। গীতিকবিতায় নাটকীয়তা বা টেনসন সৃষ্টির যে নির্দেশ এলিয়ট দিয়েছেন, তার ব্যবহার পেলাম 'ক্রেসিডা ও ওফেলিয়া' কবিতায় এবং বস্তুধর্মিতার চূড়ান্ত সাধনা। 'টপ্পা-ঠুংরী' কবিতাতেও এলিয়টের প্রকরণ কৌশলের স্পষ্ট ছাপ আছে। এ ধারায় অবশ্য পরবর্তীকালে আরও অনেক কবিতা লেখেন, যেমন সমর সেন। অর্থাৎ কোনও প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতাকে পুনর্লিখন করে বৈপরীত্যটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হল দুই যুগের, দুই জগতের পার্থক্য। তাছাড়া কবিতার ভেতরেও সর্বত্র, উপমায় চিত্রকল্পে উল্লেখে পুরনো কবিতার ছিন্ন চরণ, টুকরো শব্দ বসিয়ে বসিয়ে কখনও প্রতিতুলনায়, কখনও সার্থক অনুষঙ্গে বিচিত্র মেজাজ তৈরি করা হয়েছে — আবেগ ও মননের এক জটিল মিশ্রণ, ব্যঙ্গ ও সরলতার দ্বৈতলীলা। কবিতাটি যেন রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বঞ্চিত' ও 'অপর পক্ষ' কবিতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সম্পূর্ণ মৌলিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সরল আবেগ অনুপস্থিত, আমাদের খণ্ডিত বর্তমান ফুটে উঠেছে এর বক্রোক্তিতে ও প্রকরণে।

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল...
ডাকলাম নাম ধরে,
কী জানি ছাড়া আর কোনও কারণ নেই
যেন পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্ল্যাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত। (অপরপক্ষ)

এল ট্রেন
মন্থিত করে রক্তের জোয়ার...
হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন তো এল!
কয়লাখনি ধ্বসে পড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল!' (টপ্পা-ঠুংরী)

লিপিকার জগৎ, বলাকার জগৎ, কখনও বা লৌকিক ছড়া — পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব চিত্রকল্প, তার ঘন আবেগ, কখনও নিকষ গদ্য (' স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো'...), শেষ স্তবকে হঠাৎ ভাবালু আত্মপ্রকাশ, ইত্যাদি ইত্যাদি এক সমাজনাট্য তৈরি করেছে, যেখানে ওই অপ্রাপ্তির নৈরাশ্যই বাজছে তীব্রভাবে। ওফেলিয়ার পাশে 'টপ্পা-ঠুংরী'র এই পার্থক্য বিষ্ণু দে-র বিচিত্র আঙ্গিক-সাধনার ও পরীক্ষানিরীক্ষার সচেতনতা প্রমাণ করে।

এর পাশে একই বছরে লেখা (১৯৩৫) ' ঘোড়সওয়ার' কবিতাটিকে আমি এই নৈরাশ্য থেকে মুক্তির নিদর্শন হিসেবে দেখি।

'টপ্পা-ঠুংরী' কবিতাটি শেষ হয়েছিল এই আত্ম-সংলাপে :

হায় রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাবো
কোন বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?'

লিবিডোকে শেষ পর্যন্ত কোনও বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে কিংবা ধ্রুপদী অবদমনে চালাতে হয়নি; এই লিবিডোরই অবাধ প্রকাশ দেখছি ' ঘোড়সওয়ার' কবিতায়। সবাই জানেন, ফ্রয়েড যার মধ্যে যৌনতার প্রাধান্য দেখতেন, মনোবিজ্ঞানী য়ুং সেই লিবিডো বা জীবনীশক্তিকে আরও ব্যাপক পৌরাণিক ভিত্তিতে দেখেছেন। এই কবিতার পিছনে ফ্রয়েড বা য়ুং কোনটার প্রভাব অধিক কার্যকর, সে প্রশ্নও ততখানি জরুরি নয়। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন, অনেকে পরবর্তীকালে বিপ্লবের বার্তাবহ হিসেবেও এটাকে দেখেছেন।' বিষ্ণু দে-র জীবনেতিহাস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু মনে হয়, শেষোক্ত ব্যাখ্যা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হবে, অন্তত কবির প্রেরণা বিচার করতে বসলে। বরং ফ্রয়েড বা য়ুং-নির্দিষ্ট মনস্তত্ত্বের প্রভাব *চোরাবালি*-র বহু কবিতাতে আছে মনে করলে এই কবিতা বিষয়েও সেই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাই অনেক যুক্তিসহ।

অবশ্য আমি দেখেছি এই কবিতা ব্যাপক পাঠক সাধারণের কাছে জনপ্রিয় যে কারণে, তা হচ্ছে এর কেন্দ্রীয় আবেগ, যে আবেগ প্রতিটি চিত্রকল্পে, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি শব্দে সঞ্চারিত। ধ্বনি ও বিষয়ের এমন সুষ্ঠু বিবাহ বাংলা কবিতাতে অল্পই ঘটেছে। সমস্ত কবিতায় প্রতীক্ষার সুর এমন আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে, প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা ও আবেগে কাঁপছে যে, কবিতাটির টেনসন সকলকে তাড়িত করে।

নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা পড়া?...
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর...
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো থরো।...
কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার।...

এই ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর মিলন ঘটবে যখন, তখন বলার থাকবে শুধু, 'হালকা হাওয়ায় হৃদয়

আমার ধরো'। লক্ষণীয় যে, সমস্ত কবিতায় এই 'হালকা হাওয়া'র সম্ভাবনা বা প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে বার বার।

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।...
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো।...
পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে...
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে / লোকনিন্দার দিন ...

এর কোনও মনোবৈজ্ঞানিক গূঢ়তত্ত্ব আছে কিনা জানি না, আমার কাছে এর মানে আনন্দ বা প্রীতির সেই আকাঙ্ক্ষিত জগৎ, যার জন্য এই প্রাণাবেগের আকুল উৎসার। 'গার্হস্থ্যাশ্রমে'র অন্তর্গত 'গ্রহণ' কবিতাটিতেও এই স্বীকৃতি আছে :

তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে।...
অন্ধকার চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।

উর্বশী ও আর্টেমিস গ্রন্থের যেমন সামাজিক বিস্বাদের পর উচ্চারণ করলেন 'ভয়ের আবেগে ছেঁড়া তোমার সে নির্ভরের দান / চিরজীবী নোজগে আমার'। এই কবিতাটি যে আবেগের কথা বলছে, তারই রেশ যেন বাজছে বহু পরবর্তী আরও একটি কবিতাতে — অন্তত আমার তা-ই ভাবতে ভালো লাগছে :

সমষ্টি গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
ধার দিক সবাইকেই বিপ্লবীর লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?

(বহু বড়বা / *নাম রেখেছি কোমলগান্ধার*)

সুতরাং, যতই কালের ও সমাজের প্রভাবে তিক্ততা জমুক, ব্যঙ্গ শাণিত হয়ে উঠুক, এ সমস্তই আসছে সেই প্রাণাবেগ চঞ্চল প্রেমিকের কাছ থেকে যিনি হালকা হাওয়ায় হঠকারিতার ভীরু দ্বার ভেঙে দিতে উদ্যত, যিনি আবেগের সমুদ্রে ভাসবেন অতঃপর নিজের অভিজ্ঞতার দেওয়ালকে ক্রমশ ভাঙতে থাকবেন।

চোরাবালি-র কলাকৌশলের প্রশ্ন খুব মূল্যবান। এর প্রশংসায় অনেকেই মুখর। কেউ প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের তারিফ করেছেন, কেউ রাবীন্দ্রিক মাত্রাবৃত্তকেও তিনি যে 'নিজের সুরে' বাজিয়েছেন, সেজন্য প্রশংসা করেছেন, কেউ বা শব্দব্যবহারের অসামান্য চাতুর্যের কথা বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখেছেন, মাত্রা বন্টনের কৌশলে তিনি কীরকম গদ্য-পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন করেছেন কোথাও কোথাও; কথ্যরীতি থেকে তিনি দূরে সরে যাননি, অথচ ব্যাকরণগত নৈরাজ্যও ঘটাননি। কিছু কিছু শৈথিল্যের অভিযোগ করেছেন বটে, কিন্তু সাধারণত এর কলাকৌশলের প্রশংসায় তিনি বিস্ময়করভাবে প্রগল্‌ভ—বিশেষত সুধীন্দ্রনাথের মতো আঙ্গিকসচেতন লেখক।

শুধু ছন্দের নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের কারণেই নয় বা ধ্বনিগৌরবেই নয়, চিত্রকল্প সমাবেশেও তাঁর নূতনত্ব ও অক্লান্ত ঔৎসুক্য দেখা যায়। কখনও বা রোমান্টিক মেজাজে ইন্দ্রিয়ঘন আচ্ছন্নতায় কখনও স্বদেশী-বিদেশি শব্দের সমারোহে তিনি নানা মেজাজ তৈরি করেছেন।

১. খরস্নায়ু স্তব্ধতার পাখা মেলে চকিত শহরে
রুদ্ধ পেশী মেঘবন্ধে সন্ধ্যা নামে কান্তি মুখে। (সন্ধ্যা)
২. খর যৌবনে হৃদয়বিহীন তোমার হিয়া,
হাসি তো তোমার বৃথাই ছড়াল তুষার, প্রিয়া! (পঞ্চমুখ ২)

৩. উদাস উর্দুসুর মৃদুমিঠে স্বরে
শহুরে ছাতেও অকাল দখিনা করে
উতলা উদাস ... (শৃঙ্গ চ.../ গার্হস্থ্যাশ্রম)
৪. হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নজীবনীর বীজনে
এসো এসো এই মলিন আলোয় সাগরের শ্বেত কেশর
পাণ্ডু দুপায়ে ঢেকে। (জ্যোকন্দা)
৫. নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া। (মহাশ্বেতা)

৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪)

পরেশ চট্টোপাধ্যায়

তরুণ মার্কস

মার্কসবাদকে যাঁরা তত্ত্বের অচলায়তনে আবদ্ধ না রেখে জগৎ-পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করবেন
—তাঁদের উদ্দেশ্যে।

তরুণ মার্কস সম্পর্কে উৎসাহ এদেশে সাম্প্রতিক। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে মার্কস-রচিত, *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি*-র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই[১] ইয়োরোপের মার্কস বিশেষজ্ঞ মহলে তরুণ মার্কস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়। আমাদের দেশে সে আলোচনার আরম্ভ বোধহয় উক্ত 'পাণ্ডুলিপি'র মস্কো-প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ এদেশে পৌঁছানোর পরে। কিন্তু সে আলোচনা বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করেনি ; তদুপরি সে আলোচনা থেকে তরুণ মার্কসের অন্যান্য লেখা প্রায় বাদ পড়েছে বললেই হয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তরুণ মার্কসের সামগ্রিক চিন্তাধারার আলোচনা মোটেই সহজ নয়। ভাষার অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও প্রধান অসুবিধে বোধহয় এই যে আলোচনাকারীর পক্ষে হেগেল ও ফয়ারবাখের দর্শন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রাখা ভালো যে বর্তমান আলোচক দর্শনের ছাত্র নয়, কিংবা মার্কসবাদীও নয়, এমনকি মার্কসবাদের বিশেষ কোনও জ্ঞানের দাবিও করে না। তথাপি এ দুঃসাহসে সে প্রবৃত্ত হয়েছে মার্কসবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আগ্রহ আছে বলেই। ফলে প্রবন্ধটিতে তার ভ্রমপ্রমাদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি আকর্ষণ করে সুধী পাঠকবৃন্দ আশা করি প্রবন্ধলেখককে অনুগৃহীত করবেন।

লুকাচ[২] (G. Lukace) এবং আল্‌থুসে[৩] (L. Althusser)-কে অনুসরণ করে বলা যায়, যে পর্বের রচনাবলি 'তরুণ মার্কসের রচনা' নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে তার ব্যাপ্তি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর ডক্টরেট থিসিস ' ডেমক্রিটুস ও এপিকুরুসের প্রাকৃতিক দর্শনের পার্থক্য'। (*Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophic*) থেকে *পবিত্র পরিবার* (*Die Heilige Familie*) পর্যন্ত।

বর্তমান প্রবন্ধের জন্য তরুণ মার্কসের প্রধান রচনাগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি' ছাড়া অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে এই আলোচনায় বের্লিন থেকে প্রকাশিত মূল জার্মান সংস্করণগুলির উপরে নির্ভর করা হয়েছে।[৪] '১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি'র মূল জার্মান পাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মস্কো থেকে প্রকাশিত উক্ত রচনার ইংরেজি অনুবাদের তুলনায় এমিল বত্তিজেল্লি (Emile Bottigelli)-কৃত ফরাসি অনুবাদটি[৫] অধিকতর সন্তোষজনক মনে হওয়ায় সেটিকেই ব্যবহার করেছি। এর প্রধান কারণ এই যে ১৯৫৯ সালের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশকালেও মূল পাণ্ডুলিপিটির কোনও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি — তখনো মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউটে নানা ধরনের ভ্রমপ্রমাদের সংশোধন চলেছে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ফরাসি অনুবাদটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হওয়ায় তাতে সে-সব ত্রুটির অনেকটা সংশোধন সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া এই ফরাসি সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকাটিও অতিশয় মূল্যবান। বর্তমান প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারে লেখকের সর্বাধিক ঋণ কর্নু (A. Cornu)-কৃত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস'[৬] নামক অসামান্য গ্রন্থের কাছে। তরুণ মার্কস স্পর্কে এটিই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আর্ভ (H. Arvon) লিখিত *মার্কসবাদ* নামক স্বল্পায়তন অথচ পরিচ্ছন্ন গ্রন্থটি (*Le Marxisme*)[৭] থেকেও অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে।

একটি মাত্র প্রবন্ধের পরিসরে এবংবিধ বিস্তীর্ণ বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং তৎপরিবর্তে মোটামুটি রকমের একটা সামগ্রিক খসড়া উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

লক্ষ করা যায় যে *পবিত্র পরিবার* গ্রন্থের পূর্ব পর্যন্ত তরুণ মার্কসের চিন্তার বিকাশ 'বিযুক্তি' (Entfremdung ; Entausserung) প্রত্যয়টিকে কেন্দ্র করে। অবশ্য প্রত্যয়টি মার্কসের আবিষ্কার নয়, হেগেল ও ফয়ারবাখ থেকে পাওয়া।

হেগেলীয় দর্শনে, বিশেষত তাঁর *মনের চেতনা-বিজ্ঞান* গ্রন্থে[৮] (*Phanomenologie des Geistes*) ইংরেজি অনুবাদে (*Phenomenology of the Mind*) বিযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। লুকাচের ভাষায় বলতে গেলে, হেগেল-কৃত উক্ত গ্রন্থের প্রত্যয় (*zentralbegriff*) হল বিযুক্তি[৯]। এর প্রকাশ প্রধানত ভাব ও বস্তু এবং বিষয় ও বিষয়ীর বিচ্ছিন্নতায়। হেগেলের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে এবং দাসের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে আলোচনা আছে[১০] সেই আলোচনাকে আমরা হেগেলীয় বিযুক্তিতত্ত্বের একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, যদিও পরস্পরবিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে দাস ও প্রকৃতি এই উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রভু মুক্ত। দাসত্ব থেকে সে মুক্ত যেহেতু তাকে প্রভু বলে স্বীকার করে এবং প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্ত যেহেতু দাস প্রকৃতিদত্ত বিষয়গুলিকে প্রভুর ভোগের বস্তুতে পরিণত করে। অতএব প্রভু মনে করে যে দাস এবং প্রকৃতি এই উভয়ের উপরেই তার প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। আসলে কিন্তু এটি ভ্রান্তি। প্রভু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বন্দী মাত্র। যেহেতু তার প্রভুত্ব দাসের শ্রমের উপরে নির্ভরশীল, সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে সে দাসের দাস। অবশ্য দাস যদি বিদ্রোহ করে জয়লাভ করে তবে পূর্বেকার সম্পর্ক বিপরীত সম্পর্কে পরিণত হবে মাত্র, দাসের প্রকৃত মুক্তি হবে না। প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব যখন বাইরের কোনও ব্যক্তির উপর আধিপত্য করা আর সম্ভব হবে না, যখন প্রভুত্ব করা যাবে কেবলমাত্র নিজের উপরেই—অর্থাৎ যখন একই ব্যক্তির মধ্যে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মিলন ঘটবে। এমন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে স্টোয়িক (stoic)[১১]। এই হল হেগেলীয় ডায়ালেক্টিকের মূল কথা। এই পদ্ধতির তিনটি মুহূর্ত : প্রভু, দাস এবং স্টোয়িক। প্রথমটি ইতি, দ্বিতীয়টি নেতি এবং তৃতীয়টি নেতির নেতি। মনে রাখতে হবে যে নেতি ইতির বিপরীতধর্মী বলেই নেতি। স্বতন্ত্রভাবে দেখতে গেলে নেতিও ইতি। ইতি এবং নেতির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই নেতির নেতিকরণ ঘটে, অর্থাৎ উচ্চতর ইতির সৃষ্টি হয় নেতিকে জয় করে এবং মূল ইতি ও নেতি এই উভয়ের শ্রেষ্ঠাংশকে আত্মসাৎ করে। ইতি ও নেতির মধ্যে যে সম্পর্ক তারই অপর নাম 'বিযুক্তি'। নেতির মধ্যে ইতি নিজেকে খুঁজে পায় না, যেন মনে হয় নিজের কাছে নিজেই পর হয়ে গেছে। এই বিযুক্তির সমাধান হবে যেভাবে স্টোয়িকের মধ্যে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের সমাধান হয় সেইভাবে, অর্থাৎ ইতি ও নেতি যখন তাদের বিরোধকে এক উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যেখানে এই পারস্পরিক বিরোধের শ্রেষ্ঠাংশকে নিয়েই এক উচ্চতর মিলন সম্ভব।

বলাই বাহুল্য যে হেগেলের বিযুক্তিতত্ত্ব মূলত ভাবরাজ্যেই সীমাবদ্ধ। হেগেলের শিষ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ফায়ারবাখ বিযুক্তিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিযুক্তিকে ভাবরাজ্যে সীমিত না রেখে তার সন্ধান করলেন মানুষের বাস্তব জীবনে। *খ্রিস্টধর্মের সারমর্ম* (*Das Wesen des Christentums* ১৮৪১) গ্রন্থে তিনি বিযুক্তি প্রত্যয়টিকে ধর্মের সমালোচনায় প্রয়োগ করলেন। তিনি দেখালেন যে মানুষের মধ্যে যে বিশেষ বৃত্তিগুলি আছে — যার জন্য মানুষ অন্যান্য জীব থেকে পৃথক — সে সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয় তখনই যখন সেগুলি তার চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ যখন মানুষ তাদের সম্পর্কে ভাবতে পারে তাদেরকে নিজ থেকে পৃথক করে। এ অবস্থায়ই ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়। মানুষের চেতনায় ঈশ্বরের আবির্ভাব এমন এক সত্তা হিসেবে যাকে মানুষ তার সমস্ত সদ্‌বৃত্তি আরোপ করতে পারে। এভাবেই এক দ্বৈতাবস্থার সৃষ্টি হয়। মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ঈশ্বরকে তার সমস্ত সদ্‌বৃত্তির আধার হিসেবে কল্পনা করে[১২]। এই প্রাথমিক স্তর নেতির স্তর ; মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে

ঈশ্বরের কাল্পনিক সত্তার মধ্যে। সে নিজেকে ফিরে পেতে পারে একমাত্র এই প্রাথমিক স্তরের নেতিকরণ করে অর্থাৎ নেতির নেতিকরণ করে। অর্থাৎ প্রাথমিক দ্বৈতকে বিনষ্ট করে তাকে ফিরে আসতে হবে আবার পরিপূর্ণতায়, যে পরিপূর্ণতা ঈশ্বরে আরোপ করে সে নিজ সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল। ধর্মীয় বিযুক্তিকে লঙ্ঘন করে মানুষকে নিজ সত্তাব উপলব্ধি করতে হবে নিজের মধ্যে। লক্ষণীয় যে, বিযুক্তি সম্পর্কে ফয়ারবাখের এই আলোচনা কিন্তু শুধু ধর্মের সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষ ঈশ্বরকে বিসর্জন দিয়ে নিজেই ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী লেখায় অবশ্য ফয়ারবাখ এই ত্রুটি কাটিয়ে উঠেছেন আংশিকভাবে। পরবর্তী গ্রন্থ 'ভবিষ্যতের দর্শনের নীতি' (Grundsatze der Philosophie der zukunft ১৮৪৩)-তে ফয়ারবাখ বিযুক্তি প্রত্যয়টিকে আর ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত রাখলেন না, তিনি তাকে প্রসারিত করলেন মানুষের সত্তা ও চিন্তার সমগ্র সম্পর্কের মধ্যে। তিনি দেখালেন যে ধর্ম যেমন মানুষের সমস্ত সারবস্তুকে গ্রাস করে, সেই একইভাবে মানুষের চিন্তা তার সত্তার উপর অন্যায়ভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব ভাব ও সত্তার মধ্যে হেগেল-প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে উল্টে দিয়ে প্রাধান্য দিতে হবে সত্তাকে, ভাবকে নয়। সত্তা ও ভাবের ঐক্য মিলবে একমাত্র বাস্তব মানুষের মধ্যে। ফয়ারবাখের এই মানুষ কিন্তু সমাজজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকিত্বের মধ্যে আশ্রয় নেয় না। সমাজের সমষ্টিগত জীবনের মধ্যেই তার মহত্ত্বের প্রকাশ।

বিযুক্তির বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংগ্রাম এখান থেকেই শুরু। এ সংগ্রাম বিমূর্ত চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয় না, এ সংগ্রাম পরিচালনা করে বাস্তব মানুষ। চিন্তা বা ভাব দিয়ে বিযুক্তিকে দূর করা যাবে না, একে দূর করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে এবং সেই কাজটি হবে সমষ্টিগত।

ফয়ারবাখ যেখানে শেষ করলেন সেখান থেকেই বিযুক্তিসমস্যার মার্কসীয় আলোচনা আরম্ভ। এ সম্পর্কে মার্কসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনা : হেগেলের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সমালোচনা' (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts, ১৮৪৩)[১৩]। হেগেলের সমালোচনায় ফয়ারবাখ দেখিয়েছিলেন যে হেগেল জগতের স্রষ্টা হিসেবে ভাবকে দেখেছেন এবং বাস্তবের সারমর্ম দেখেছেন প্রত্যয়ের মধ্যে। আসলে এর বিপরীতটাই ঠিক। ফয়ারবাখের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মার্কসকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে ফযারবাখের বিমূর্ত মানবতাবোধ মার্কসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং মার্কস হেগেলের সমালোচনা করতে গিয়েও মনে রেখেছেন যে সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক নিয়মগুলির হেগেলীয় বিশ্লেষণের তুলনায় — মূলত তা ভাববাদী হলেও — ফয়ারবাখীয় বিশ্লেষণ বহুলাংশে ম্লান। তদানীন্তন একটি চিঠিতে মার্কস লিখেছেন : 'আমার মতে তিনি (ফয়ারবাখ) রাজনীতির তুলনায় প্রকৃতির উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আমি মনে করি যে একমাত্র রাজনীতির উপর নির্ভর করেই দর্শন আত্মোপলব্ধি করতে পারে'[১৪]। বস্তুত হেগেল ও ফয়ারবাখ—উভয়ের কাছেই তিনি প্রেরণা লাভ করেন। হেগেল থেকে নিলেন তাঁর ইতিহাসের ডায়ালেকটিক বিশ্লেষণ এবং ফয়ারবাখ থেকে নিলেন তাঁর দর্শনের বস্তুবাদী দিক ও বিযুক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য। এইভাবে যুগপৎ উভয়ের থেকে গ্রহণ করে উভয়ের মতবাদকে খণ্ডন করেই মার্কস অগ্রসর হলেন।

মার্কস তাঁর উল্লিখিত রচনাটি শুরু করেন হেগেলের *অধিকার দর্শন* (*Philosophie des Rechts*) গ্রন্থের প্রতিটি পঙ্ক্তির বিশ্লেষণ করে। উক্ত গ্রন্থে হেগেলের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রথমটি প্রতিফলিত হয় পরিবার ও সমাজে, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রে। হেগেলের সমালোচনা মার্কস এই বলে আরম্ভ করলেন যে 'হেগেল সর্বত্র ভাবকে বিষয়ীতে (subjekt) পরিণত করেছেন'[১৫]। ভাব এবং বিষয়ীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে এভাবে বিপরীত সম্পর্কে পরিণত করাকেই মার্কস হেগেলের প্রধান দোষ বলে মনে করলেন। হেগেল দেখিয়েছিলেন যে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের স্তর বিন্যাসে রাষ্ট্রের আসন সর্বোচ্চ। তার নীচে সমাজ এবং সমাজের নীচে পরিবার। মার্কস

তার সমালোচনায় বললেন যে হেগেল সহজ ব্যাপারটাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘোলাটে করে তুলেছেন। (হেগেলের মতে) পরিবার এবং বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের প্রত্যয়ের এলাকায় (bagriffsspharen)। ... এদের মধ্যেই রাষ্ট্র নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এবং এদের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্যই (der sie voraussetzt)[১৬]। অতএব বাস্তবতা ঠিক যেমনটি তেমন করে হেগেল তাকে দেখাচ্ছেন না, তিনি তাকে দেখাচ্ছেন স্ববিচ্ছিন্ন রূপে [১৭]। বাস্তবিকপক্ষে সমাজই রাষ্ট্রের উপরে, রাষ্ট্র সমাজের উপরে নয়। এই স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিপরীত সম্পর্কে পরিণত করে হেগেল বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে আদর্শ রূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। হেগেল যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই সাধারণ ভিত্তি হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকানাকে দেখাতে চেয়েছেন সেখানে কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী রূপকেই প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ যদিও একদিকে বলা হচ্ছে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র সামগ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই রাষ্ট্র আসলে বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং তার ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থকেই রক্ষা করছে। মনে হতে পারে যে মানুষের সাধারণ স্বার্থ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও উচ্চতর স্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছে। এটা নিছক ভ্রান্তি। যেভাবে ঈশ্বরে আরোপিত মানুষের শ্রেষ্ঠাংশকে মানুষের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে সেই একই ভাবে রাষ্ট্রে আরোপিত সমাজের সারাংশকে (wesen) সমাজের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। এই হল রাজনৈতিক বিযুক্তির মূল সমস্যা। রাজনৈতিক বিযুক্তির অবসান তখনই হবে যখন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনও বিভেদ থাকবে না, ব্যক্তিগত এবং সৃষ্টিগত স্বার্থ এক হয়ে যাবে।

মার্কসের মতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভেদ দূর হতে পারে একমাত্র 'যথার্থ' গণতন্ত্রে। একমাত্র এখানেই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বিরোধ থাকবে না। এখানে সাধারণ বিষয় ব্যক্তিগত বিষয় থেকে স্বতন্ত্র নয়; এখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মিলনের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র ও সমাজ একাকার হয়ে যায়। মার্কস বলেন, 'গণতন্ত্রে তাত্ত্বিক ও বাস্তব নীতি একই। সেজন্যই সাধারণ এবং বিশেষের মধ্যে সত্যিকারের মিলন এখানে সম্ভব। ... গণতন্ত্রে সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্র জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণেরই প্রকাশ'।[১৮]

মার্কসের এই আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি যে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিযুক্তির অবসান খুঁজছেন গণতন্ত্রের মধ্যে। তিনি তখনও বিযুক্তিকে সামাজিক বিরোধ বা শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছেন না। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আসবে তখনও তিনি তা ভাবছেন না। তাঁর সমাধান তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাধানের গণ্ডি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারছে না। তবে তিনি ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন যে সমাজের শ্রেণীবিভাগের মূলে রয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা।

মার্কসের পরবর্তী রচনা *জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী* (*Deutsch-Franzosische Jahrbucher*, ১৮৪৪) -তে প্রকাশিত *ইহুদি সমস্যা প্রসঙ্গে* (*Zur Judenfrage*) প্রবন্ধ [১৯]। এই প্রবন্ধটিকে পূর্বেকার হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনা প্রবন্ধটির সম্প্রসারণ হিসেবে দেখতে হবে। সমকালীন জার্মানিতে বিশেষ করে সেখানকার হেগেলপন্থী বামগোষ্ঠীর মধ্যে ইহুদি-সমস্যাটি বহু বিতর্কিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহুদিদের সমান অধিকারের দাবি তুলছেন তদানীন্তন উদারনৈতিকেরা। এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে মার্কস আলোচনা আরম্ভ করলেও তিনি তার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখলেন না; মানুষের মুক্তির সমগ্র প্রশ্নটি তিনি তুলে ধরলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বেকার প্রবন্ধে বিশ্লেষিত রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্কের সমস্যাকে আরও বিশদভাবে আলোচনা করলেন। রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও বুর্জোয়া সমাজের বিরোধকেই তিনি মানুষের মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখলেন।

১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে মার্কস দেখালেন যে ফরাসি বিপ্লব সমাজের তুলনায় রাষ্ট্রকে অধিকতর শক্তিশালী করে উভয়ের দ্বন্দ্বকে তীব্র করেছে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে মানুষের সারাংশকে রাষ্ট্রে আরোপ করেছে। ফলে রাজনৈতিক বিযুক্তি

তীব্রতর হয়েছে। মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘোষণাকে 'Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen' বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখালেন যে এটি আসলে মানুষের অধিকারেরই ঘোষণা, নাগরিকের নয়, এবং সে মানুষ আসলে বুর্জোয়া মানুষ। স্বাধীনতা, সম্পত্তি, সাম্য ও নিরাপত্তার অধিকার মানুষ ভোগ করে বুর্জোয়া সমাজের সভ্য হিসেবে যে সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সমাজে স্বার্থপর মানুষ সমষ্টিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। নাগরিকের অধিকার শুধু এক কাল্পনিক সত্তার অধিকার, অবাস্তব মানুষের অধিকার, যার সঙ্গে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। বস্তুত ফরাসি বিপ্লব রাজনৈতিক মুক্তির নামে আসলে বুর্জোয়া মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনেরই সুযোগ করে দিয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে দৈন্য ও দাসত্বের পথে ঠেলে দিয়েছে।

ইহুদি সমস্যা প্রবন্ধে রাজনৈতিক মুক্তি সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য তাঁর পূর্বেকার রচনা ' হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনা'র মূল বক্তব্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিযুক্তিসমস্যার সৃষ্টি ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাই স্বার্থপরতার উৎস। এই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং বুর্জোয়া সমাজ ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রের বিরোধিতার মধ্যে। পূর্বের মতোই বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনা, কিন্তু যে বিষয়টি নতুন সেটি হল এই যে এই প্রবন্ধে মার্কস বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনাকে তুলে ধরেছেন মানুষের মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এমনকি পূর্বেকার রচনার তুলনায় বর্তমান প্রবন্ধটিতে মার্কস আরও পরিষ্কারভাবে বললেন যে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের মধ্যে দিয়েই মানুষের মুক্তি সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানার সমালোচনা করে মার্কস প্রবন্ধশেষে সমাজের অর্থের ধর্ম ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলেন এবং বিযুক্তিসমস্যাকে এই প্রথম অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলেন।[২০] এই প্রবন্ধে মূল সমস্যার যে সমাধানের কথও মার্কস চিন্তা করলেন তার পরিষ্কার ঈঙ্গিত সাম্যবাদের দিকে। এদিক থেকেও পূর্বেকার রচনার সঙ্গে এই লেখাটির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধটির প্রথমাংশের শেষে মার্কস দেখালেন যে যখন মানুষ এবং নাগরিক এক হয়ে যাবে, যখন মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে, ব্যক্তিগত কাজে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে সমষ্টিগত সত্তার (*gattungswesen*) সঙ্গে মিলে যাবে, যখন সে তার নিজস্ব শক্তিকে সামাজিক শক্তি হিসেবে চিনবে ও সংগঠিত করবে এবং এইভাবে সামাজিক শক্তিকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজের থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখবে — একমাত্র তখনই মানুষের মুক্তি সম্ভব হবে [২১]। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে তিনি এ সিদ্ধান্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন[২২]। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতা সম্পর্কে তদানীন্তন অগভীর আলোচনাকে আক্রমণ করে তিনি দেখালেন যে খ্রিস্টানদের মধ্যে ইহুদি মনোভাব প্রবেশ করেছে এরং খ্রিস্টধর্মকে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবাদর্শের প্রকাশ হিসেবে। ফলে বুর্জোয়া সমাজের রূপ প্রকাশ পাচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতায় এবং মুনাফা ও অর্থের জন্য অপরিসীম লোভে। এ অবস্থায় মানুষের মুক্তি — অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদি উভয়েরই মুক্তি — আসতে পারে একমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎখাত করে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী (১৮৪৪)-তে মার্কসের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা' (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung)[২৩]। মার্কসীয় চিন্তার বিকাশে এই প্রবন্ধটির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে ইহুদি-সমস্যা প্রবন্ধে মার্কস ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন; আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে দেখালেন কীভাবে এই ঈঙ্গিত পরিবর্তন আসবে এক সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার লক্ষ্য থাকবে সাম্যবাদ।

ফয়ারবাখ তাঁর খ্রিস্টধর্মের সারমর্ম গ্রন্থে বিযুক্তিকে ধর্মের চতুঃসীমায় আবদ্ধ রেখে তার আধাভাববাদী

সমাধান খুঁজেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মার্কস মূল ফয়ারবাখীয় বিশ্লেষণ থেকে শুরু করলেও ক্রমে তিনি বিযুক্তিসমস্যাটিকে ধর্মীয় সমালোচনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থেকে সামাজিক সমালোচনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন। ধর্মের সমালোচনায় ফয়ারবাখ দেখিয়েছিলেন মানুষ কীভাবে ঈশ্বরে তার সত্তার সারাংশকে আরোপ করে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। মার্কস দেখালেন যে শুধুমাত্র এই আত্মাহুতিকে সমালোচনা করলেই মানুষ তার সত্তাকে ফিরে পাবে না। ধর্মীয় মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখনই সফল হবে যখন তার মূলে আঘাত করা যাবে, ধর্মীয় বিযুক্তির উদ্ভব যে অবস্থার মধ্যে সে অবস্থাকে যখন আঘাত করা যাবে। অর্থাৎ সংগ্রাম করতে হবে সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

মার্কস দেখালেন : ধর্মের দৈন্য যুগপৎ বাস্তব দৈন্যের প্রকাশ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম শোষিতের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর আত্মা, মনোহীন জগতের মন-ধর্ম জনগনের অহিফেন[২৪]। ধর্ম মানুষকে মুক্তির মোহ এনে দেয় এবং তার সত্যিকারের মুক্তিসংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করে। মোহ হিসেবে ধর্মকে দূর করতে হলে যে অবস্থার মধ্যে এই মোহের উদ্ভব তাকে দূর করতে হবে। অতএব যখন আমরা ধর্মের সমালোচনা করছি তখন আমরা আসলে সমালোচনা করছি সেই অশ্রুর উপত্যকাকে (Jammertales) ধর্ম যার স্বর্গীয় প্রতিফলন (Heiligenschein) [২৫]। পরলোকের সত্যকে ধ্বংস করার পর ইহলোকের সত্যকে ধ্বংস করাই ইতিহাসের কাজ। আবার ইতিহাসের সেবক হিসেবে দর্শনের কাজ হবে মানুষের আত্মবিযুক্তির (selbstenmtfremdung) স্বর্গীয় মুখোশ খোলার পর তার জাগতিক মুখোশ খুলে ফেলা। এইভাবে স্বর্গের সমালোচনা পরিণত হবে মর্ত্যের সমালোচনায়, ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা পরিণত হবে রাজনীতির সমালোচনায়[২৬]।

আলোচ্য প্রবন্ধটি তরুণ মার্কসের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়েই মার্কসের তরুণ হেগেলীয় যুগের সমাপ্তি। এখানেই এক নতুন যুগ শুরু হল যে যুগে মার্কসের প্রধান অবদান বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। প্রবন্ধটির প্রধান বক্তব্য যদিও মানুষের মুক্তি, তথাপি মার্কস এখানে ফয়ারবাখের নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন। ইহুদি-সমস্যা-র বক্তব্যবে অতিক্রম করে তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে দেখালেন যে মানব মুক্তির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মানবমুক্তির বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে দর্শনের মিলনের ফলে। শ্রমিকশ্রেণি যেমন দর্শনের বাস্তব অস্ত্র (materiellen waffen), দর্শন তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর মানসিক অস্ত্র (geistigen waffen)। দর্শন মানবমুক্তির মস্তক, শ্রমিকশ্রেণি তার হৃদয়। শ্রমিকশ্রেণীর অবলুপ্তি (Aufhebung) না হলে দর্শন রূপায়িত হতে পারে না, আবার দর্শনের বাস্তব রূপায়ণ না হলে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মাবলুপ্তি সম্ভব নয়[২৭]।

মার্কসের প্রথম যুগের লেখায় রাজনৈতিক বিযুক্তি দেখা দিচ্ছে ছিন্ন চেতনার ফল হিসেবে। মানুষ নিঃসম্বল হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠাংশ রাষ্ট্রকে আরোপ করে ঠিক যেমনভাবে সে নিজেকে দেউলে করে ঈশ্বরকে উজার করে দেয় আপন সারমর্মটুকু। রাজনৈতিক বিযুক্তি সম্পর্কে মার্কসের এই প্রথম যুগের লেখায় দেখা যাচ্ছে যে তাঁর আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র ও মানুষের সম্পর্ক। ক্রমে মার্কস দেখলেন যে রাজনৈতিক বিযুক্তির সন্তোষজনক আলোচনা করতে গেলে শুধু রাষ্ট্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা করলেই চলবে না, সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই পথ অনুধাবন করে মার্কস যখন দেখলেন যে বর্তমান সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত তখন তিনি পূর্বের মতো আর মনে করলেন না যে রাষ্ট্র শুধুমাত্র মানুষের শ্রেষ্ঠাংশকে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে ; রাষ্ট্রকে তখন ভাবতে লাগলেন শাসকশ্রেণীর শোষণযন্ত্র হিসেবে।

সমগ্র সমাজব্যবস্থার এই বিশদ আলোচনার সূত্রপাত ১৮৪৪-এর 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'-তে।

ঈশ্বর এবং রাষ্ট্র উভয়েই মানুষের আংশিক বিযুক্তি। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জগতের সমস্ত বিশ্লেষণ শেষ অবধি পর্যবসিত হচ্ছে অর্থনৈতিক বিযুক্তিতে বিকৃত সমাজের বিশ্লেষণে। ১৮৪৪-এর

পাণ্ডুলিপি-তেই মার্কস প্রথম অর্থনৈতিক বিযুক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য রাখলেন : মানুষ এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে ধনতন্ত্রে এসে বিপরীত সম্পর্কে পরিণত করেছে। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থায় উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্য থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যাকে সৃষ্টি করে সে মানুষের অধীনে না থেকে উল্টে মানুষের উপরেই আধিপত্য স্থাপন করে। বিষয় বিষয়ী থেকে বিযুক্ত হয়ে পণ্যে পরিণত হয় এবং মানুষের পারস্পরিক স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিকৃত করে নিছক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করে। সমস্ত কিছুর মূল্যবিচার হয় অর্থের মাপকাঠিতে। মানুষ অর্থকে এক বাইরের শক্তি বলে মনে করে, ভাবে না যে অর্থ তারই আংশিক বিযুক্তির প্রকাশ মাত্র। এবং ক্রমে সে হয়ে দাঁড়ায় অর্থেরই দাস। এইভাবে অর্থ 'বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে, প্রেমকে ঘৃণায় এবং ঘৃণাকে প্রেমে, পাপকে পুণ্যে এবং পুণ্যকে পাপে, প্রভুকে দাসে এবং দাসকে প্রভুতে, মূর্খতাকে বুদ্ধিমত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তাকে মূর্খতায় পরিণত করে'[১৮]।

পারি-র বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে রচিত *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি* মার্কসীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্বের লেখাগুলির তুলনায় আলোচ্য রচনাটিতে জগৎ সম্পর্কে মার্কসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর প্রসারিত।

মানুষ সম্পর্কে হেগেলীয় ধারণাকে — বিশেষত যে ধারণা হেগেল-কৃত *মনের চেতনা বিজ্ঞান* গ্রন্থের বিষয়বস্তু — সমালোচনা করেই মার্কস অগ্রসর হলেন। হেগেলের মতে জগতের সারমর্মে প্রবেশ করে মানুষ নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করে। মানুষের আত্মসৃষ্টি শেষঅবধি পর্যবসিত হয় চেতনার ক্রমবিকাশে, স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে ভাবের অগ্রগতিতে। মানুষের বিকাশ যখনই চিন্তার বিকাশে পর্যবসিত হল তখনই হেগেলের কাছে আর বিযুক্তি সমস্যা রইল না, কেন না চিন্তা তার নিজের বিষয় (objekt) মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে না অর্থাৎ বিযুক্ত হতে পারে না। হেগেলের সমালোচনায় ফয়ারবাখের মতোই মার্কস দেখালেন যে বিযুক্তিই হল আধুনিক কালের মূল সমস্যা এবং বিযুক্তির সম্পূর্ণ অবসানের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তি সম্ভব। কিন্তু ফয়ারবাখের সঙ্গে মার্কসের মতানৈক্য এখানেই যে মার্কস শেষ পর্যন্ত বিযুক্তি সমস্যাকে শ্রেণীসমস্যারূপে দেখতে আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ মার্কস দেখালেন যে বিযুক্তি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে শ্রমিকশ্রেণীকে এবং বিযুক্তির চরম প্রকাশ বিযুক্ত শ্রমে যাকে সৃষ্টি করেছে ধনতান্ত্রিক সমাজ। এই বিযুক্ত শ্রমের প্রশ্ন থেকেই মার্কস বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র ও ধনতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাদন পরিণত হয় পণ্যে, এই পণ্য উৎপাদক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিযুক্তির প্রকাশ দেখা যায় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থাৎ বিনিময়, বাণিজ্য, মূল্য, অর্থ প্রভৃতির মধ্যে। এই বিযুক্ত শ্রম সমাজের আভ্যন্তরীন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে পণ্যরূপে, যার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পরিণত হয় প্রধানত পণ্য বিনিময়ের সম্পর্কে। এইভাবে বিযুক্ত হয়ে শ্রম তার প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক মানবসম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষমতা সে ফেলে হারিয়ে। শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করে এবং শ্রমের বিযুক্ত রূপকে অবহেলা করে বুর্জোয়া অর্থবিজ্ঞানীরা বুর্জোয়া সমাজের যথার্থ বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিযুক্ত শ্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখালেন যে এখানে শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য শ্রমিক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান দৈন্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকের সৃজনশীল অংশের প্রকাশ না হয়ে শ্রম হয়ে দাঁড়ায় তার নেতির সূচক। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থায় কোনও মানুষই বিযুক্তির প্রভাবমুক্ত নয়। 'প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত বাস্তব এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিযুক্ত মানবজীবনের বাস্তব প্রকাশ। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃতি ও গতির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে অতীতের সমগ্র উৎপাদন। ধর্ম, পরিবার, রাষ্ট্র, অধিকার, নীতি, বিজ্ঞান, কলা এই উৎপাদনেরই বিশেষ বিশেষ রূপ এবং এরই সাধারণ নিয়মের অধীন'[১৯]। শুধু তাই নয়। ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে প্রতিযোগিতার জন্ম হয় এবং এই প্রতিযোগিতা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধিতার সৃষ্টি করে সমাজকে

পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমবিযুক্তির বিশ্লেষণ করে মার্কস ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি বললেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যথার্থ অবলুপ্তির অর্থই হল সমস্ত বিযুক্তির যথার্থ অবসান, যার ফলে মানুষ ফিরে আসে তার নিজস্ব অর্থাৎ সামাজিক সত্তায়। ধর্মীয় বিযুক্তি চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ মানুষের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, কিন্তু অর্থনৈতিক বিযুক্তি বাস্তব জীবনের সমস্যা। অতএব তার বিলুপ্তির মধ্যে উভয় সমস্যারই সমাধান নিহিত আছে [৬০]। এই ভাবে মার্কস দেখালেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সমস্ত রকম বিযুক্তির অবসান হতে পারে। বিযুক্ত শ্রমের আলোচনা করে মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের চরম সমালোচনা করলেন এবং এই সমালোচনার মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের জীবন এবং ইতিহাসের ক্রমবিকাশে শ্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন।

তরুণ মার্কসের পরবর্তী এবং শেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা *পবিত্র পরিবার* (Die Heilige Familie ১৮৪৪)। এটিই মার্কস ও এঙ্গেলস-এর প্রথম যৌথ রচনা। অবশ্য এখানে মার্কসের অবদান নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। এই গ্রন্থ রচনায় মার্কস শুধু পূর্বোল্লিখিত 'পাণ্ডুলিপি'ই ব্যবহার করেননি, তিনি সমানভাবে কাজে লাগিয়েছেন ইংরেজি ও ফরাসি বস্তুবাদ এবং ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব পাঠ ও চিন্তা। এই লেখাটির মধ্য দিয়ে তিনি ঐতিহাসির বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন।

প্রাক্তন বন্ধু বাউয়ের (Bauer)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস দেখালেন যে কল্পনাসর্বস্ব দর্শন (spekulative philosophie) — বিশেষত হেগেলের বাস্তবকে দেখে ভাবের ছায়া হিসেবে মনকে দেখে জগতের সারাংশ হিসেবে এবং ইতিহাসকে দেখে মনের ক্রমবিকাশ হিসেবে। এই ভাবসর্বস্ব জগতের শুদ্ধরূপ পাওয়া যায় হেগেলের *মনের চেতনা বিজ্ঞান* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে মানুষের স্থান অধিকার করেছে স্বচেতনা (selbstbewusstsein), প্রকৃতির স্থান অধিকার করেছে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চেতনা এবং মানুষ ও প্রকৃতির ক্রমবিকাশের স্থান অধিকার করেছে ভাবের ক্রমবিকাশ। যে মানুষ বাস্তব জগতে প্রাণধারণ করছে এবং বাস্তবজগতের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাকে বিষয়ী এবং স্বচেতনাকে বিষয় না করে হেগেল তার বিপরীতটাই করেছেন। অর্থাৎ হেগেলের জগৎ পায়ের উপর না দাঁড়িয়ে মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। চেতনা বিজ্ঞান দেখাচ্ছে যে স্বচেতনাই একমাত্র এবং সমগ্র বাস্তব [৬১]।

বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনকে আরও চরমে নিয়ে গেছেন। হেগেলীয় দর্শনে ভাবের প্রাধান্য থাকলেও আমরা সেখানে দেখি যে ভাব এবং জগৎ অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। কিন্তু বাউ-এর মধ্যে দেখি যে ভাব ও জগৎ পরস্পরবিরোধী এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি পর্যবসিত হয়েছে বিমূর্ত জাতিসমূহে (kategorie)। সেদিক থেকে বাউয়ের হেগেলের সমৃদ্ধ দর্শনকে এক প্রহসনে পরিণত করেছেন। বস্তুত হেগেলীয় দর্শনকে কেউ যদি অতিক্রম করে থাকেন তিনি ফয়ারবাথ। কিন্তু বাউয়ের এবং তাঁর গোষ্ঠী নন। ফয়ারবাখ হেগেলীয় পরম ভাবের (der absolute Geist) স্থলে নিয়ে এসেছেন বাস্তব মানুষকে যে মানুষ প্রকৃতি এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৬২] বাউয়ের ও তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ রূপায়িত হয়েছে চেতনা ও জগতের পারস্পরিক বিরোধে এবং এই বিরোধ বস্তুত পর্যবসিত হয়েছে বুদ্ধি (Geist) এবং জনগণের (Masse) বিরোধে। বুদ্ধি জনগণের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, সে জনগণের বিরোধিতা করে তাকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ জনগণ পর্যবসিত হয় পরম ও পরিপূর্ণ মূর্খতায়। মার্কস দেখালেন যে এই জনগণের সঙ্গে সত্যিকারের জনগণের কোনও সম্পর্ক নেই। বাউয়ের-এর জনগণ আসলে একটি বিমূর্ত জাতি (kategorie) এবং সে বিশ্বচেতনার নেতীকরণ করে ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বুদ্ধি বা মন ইতিহাসের সক্রিয় অংশ এবং জনগণ তার নিষ্ক্রিয় অংশ এ বক্তব্যটি সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের মধ্যেই দেখা যায়। বাউয়ের

বক্তব্যের অনুসারে বুদ্ধি স্বাধীন সত্তা হিসেবে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জনগণের মুক্তি আনবে যেহেতু জনগণ স্বচেষ্টায় মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ বাউয়ের মতে মানুষের যথার্থ উন্নতির পথে জনগণ বাধাস্বরূপ। এই বক্তব্যের সমালোচনা করে মার্কস লিখলেন যে প্রগতির শত্রু জনগণ নয়, জনগণের আত্মাবমাননা (selbsterniedrigung), এবং প্রগতির শত্রু আত্মবিযুক্তির (selbstentausserung) ফল হিসেবেই জন্মলাভ করে। জনগণ রুখে দাঁড়ায় তার নিজস্ব অভাবের বিরুদ্ধে, তার আত্মাবমাননার ফলের বিরুদ্ধে। যেহেতু জনগণের বিযুক্তির ফলগুলি বাস্তব জগতে বর্তমান সেহেতু এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামও জনগন করবে বাস্তবভাবেই। এইগুলিকে নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে জনগণ ভাবতে পারে না যেমনি পারে না এইগুলিকে তার স্বচেতনার নিছক বিযুক্তি হিসেবে দেখতে এবং ভাবতে যে কেবলমাত্র মানসিক প্রয়াসের দ্বারা এদের অবসান ঘটান যাবে[৩৩]। মার্কসের মতে বাউয়ের সম্প্রদায় যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন তার উত্তর মিলবে একমাত্র সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক স্তর জ্ঞান এমনকি শুরুও হতে পারে না যতক্ষণ ইতিহাসের গতি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতিবিজ্ঞানের এবং শিল্পের (Industrie) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সম্পর্ককে। কোনো ঐতিহাসিক যুগের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না যদি না পরিচিত হওয়া যায় যে যুগের জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি (die unmittelbare Produktionsweise des Lebens) এবং শিল্পের সঙ্গে[৩৪]।

পবিত্র পরিবারের এই হল মূল তাত্ত্বিক বক্তব্য। গ্রন্থটিতে বিশেষ বিশেষ সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস বার বার এই বক্তব্যটিকেই বিভিন্নরূপে তুলে ধরেছেন। ফরাসি বিপ্লবের আলোচনায় তিনি দেখালেন যে বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নামে জনগণের সাধারণ স্বার্থরক্ষা না করে নিজেরই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করছে। ইংরেজি ও ফরাসি বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে ই বস্তুবাদ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে ওই দুই দেশের শিল্পের উন্নতি ও শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের জন্য। এই বস্তুবাদ কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা সীমিত। প্রুধ (Proudhon)-র সমালোচনায় তিনি প্রুধ-র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখালেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচনায় প্রুধ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি, কেননা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধ্বংসের পরিবর্তে তিনি তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। অবশেষে ইহুদি-সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র তুলে ধরেন এবং দেখান যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রদত্ত তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা শ্রমিকশ্রেণীর বিযুক্তি সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

পবিত্র পরিবার তরুণ মার্কসের শেষ রচনা। এই রচনাটির সঙ্গেই মার্কসীয় চিন্তার ক্রমবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হয়। এই অধ্যায়ের আরম্ভ হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনা দিয়ে। এই সমালোচনার মুখ্য বক্তব্য এই যে সামাজিক সমস্যাই *মূল* সমস্যা এবং এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিব সমাধান বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অবসানের মধ্য দিয়েই সম্ভব। এই বক্তব্য আরও পরিষ্কার ভাবে আমরা দেখি মার্কসের পরবর্তী দুটি রচনায় *জার্মান-ফরাসি বার্ষিকী*-তে প্রকাশিত 'ইহুদি সমস্যা' ও 'হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনার ভূমিকা' প্রবন্ধে। এখানে তিনি সচেতনভাবে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষ সমর্থন করে বললেন যে মানুষের মুক্তির জন্যই ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের প্রয়োজন এবং এই কার্য সম্পন্ন করবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী। মার্কস কিন্তু তখনও পরিষ্কারভাবে ভাবছেন না যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্বশ্রমজীবী ও পরশ্রমজীবীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র করে তুলবে এবং এরই ফলে আসবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব। সে সময় এঙ্গেলস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার' (Umrisse zu einer Kritik der Nationalokonomie)[৩৫] প্রবন্ধে দেখালেন যে বুর্জোয়া সমাজ শ্রমিকশ্রেণিকে জন্ম দিয়ে অনিবার্যভাবেই সাম্যবাদী বিপ্লবকে ডেকে এনে নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত

করে। এই প্রবন্ধটি মার্কসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে এবং তাঁকে অর্থশাস্ত্রের গভীর গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি* তারই পরিণতি। রচনাটির আলোচ্য বিষয় দুটি — বুর্জোয়া সমাজে বিযুক্ত মানুষের বর্ণনা এবং সাম্যবাদী সমাজে এই বিযুক্তির অবসান। এই দুটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস দেখালেন যে বিযুক্তির উদ্ভব ও তার অবসান ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বলা যেতে পারে যে উক্ত 'পাণ্ডুলিপি'র সমগ্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 'বিযুক্ত শ্রম'। ক্লাসিকাল জার্মান দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে 'বিযুক্ত শ্রম' সম্পর্কে মার্কসের আলোচনা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এই সমস্যা সম্পর্কে মার্কস তখনও চিন্তা করছেন প্রধানত দার্শনিক হিসেবে, অর্থাৎ বিমূর্তভাবে। এ ধরনের চিন্তার সুযোগ নিয়েই মার্কসের বুর্জোয়া এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক সমালোচকেরা 'পাণ্ডুলিপি'র সত্যিকারের বৈপ্লবিক দিকটি বাদ দিয়ে তাকে মার্কসবাদের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এমনকি কোনও কোনও সমালোচক একথাও বলেছেন যে উত্তরকালের মার্কসের মধ্যে আর তাঁর তারুণ্যের মানবতাবোধ নেই, অর্থাৎ পরিণত মার্কস তরুণ মার্কসকে প্রতারিত করেছেন। পরিণত মার্কস দর্শনকে বলি দিয়েছেন অর্থশাস্ত্রের কাছে, নীতিকে বিজ্ঞানের কাছে, মানুষকে ইতিহাসের কাছে। বলা বাহুল্য যে মার্কসের চিন্তাধারার স্বাভাবিক বিকাশকে বিকৃত করে তাঁকে এভাবে দ্বিখণ্ডিত করা রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নামান্তর মাত্র। একথা ভুললে চলবে না যে *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি*-র গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও রচনাটি মার্কসের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র এবং স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটিহীন নয়। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বহু জাতিকে তখনও মার্কস বর্জন করেননি। সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের উপর তাঁর ধারণা তখনও স্বচ্ছ নয় এবং তখনও তিনি পরিষ্কারভাবে ভাবছেন না যে প্রত্যেক সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক তার আভ্যন্তরীণ সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে তবেই সমকালীন ইতিহাস থেকে বিদায় নেয়। দ্বিতীয়ত শ্রেণী সম্পর্কে মার্কস বিস্তৃত আলোচনা করলেও ইতিহাসের অগ্রগতির মূল শক্তি হিসেবে শ্রেণীসংগ্রাম তখনও তাঁর স্বীকৃতি লাভ করেনি।

'পাণ্ডুলিপি'তে বিযুক্তি প্রত্যয় মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হলেও পরবর্তীকালে অতি শীঘ্রই মার্কস তাকে বর্জন করেন। কেননা 'বিযুক্ত শ্রমে'-র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের শ্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেন এবং সেই সঙ্গেই উপলব্ধি করেন সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ প্রয়োগ (praxis)-এর অসামান্য গুরুত্ব। এর ফলেই তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে 'বিযুক্তি'-কে বর্জন করে গ্রহণ করেন 'প্রয়োগ'-কে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, বরং এটাই তরুণ মার্কসের চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি। যে চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিযুক্তির চরম প্রকাশ অর্থনৈতিক বিযুক্তি তথা শ্রমবিযুক্তির মধ্যে দেখতে পেলেন সেই চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেই তিনি দেখলেন যে এই বিযুক্তির অবসান একমাত্র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে হতে পারে এবং সেই প্রয়োগের চরম প্রকাশ শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি হিসেবে প্রলেতারীয় বিপ্লব। অতএব বিযুক্তিসমস্যার স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের আর প্রয়োজন রইল না। ১৮৪৫ সালে ফয়ারবাখ সম্পর্কে মার্কস রচিত থিসিসগুলিতেই এর সুস্পষ্ট এবং নির্ভুল প্রমাণ মিলবে। উত্তরকালে মার্কসের সমগ্র কর্মকাণ্ড এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে ঘিরে [৩৬]। বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেখকেরা এবং পরোক্ষভাবে আজকের দিনের অনেক 'মার্কসবাদী' মার্কসের মানবতার জয়গান করতে গিয়ে তাঁর 'প্রয়োগ' সম্পর্কে আলোচনাকে অনেকাংশে অবহেলা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর বৈপ্লবিক দিকটাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। বিযুক্তি থেকে প্রয়োগে উত্তরণের প্রথম প্রকাশ 'পবিত্র পরিবার'। এই গ্রন্থে পূর্বেকার রচনাগুলির তুলনায় ফয়ারবাখীয় দর্শনের প্রভাব গৌণ এবং বিযুক্তির তুলনায় প্রয়োগ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। *পবিত্র পরিবার* যেমন তরুণ মার্কসের শেষ রচনা (এঙ্গেলসের সহযোগিতায়) তেমনি এই গ্রন্থটি মার্কসের আসন্ন পরিণতির প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ সূচক। বলতে গেলে এই গ্রন্থ থেকেই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত মার্কসের ফায়ারবাখ সম্পর্কে

থিসিস (১৮৪৫) এবং (এঙ্গেলসের সহযোগিতায় রচিত) *জার্মান ভাবাদর্শ* (১৮৪৫)।

সূত্রনির্দেশ :

১। ১৯৩২ সালে।

২। লুকাচ, তরুণ মার্কসের দার্শনিক বিকাশ প্রসঙ্গে (Zur philosophischen Eutwicklung des jungen Marx, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত।

৩। আলথুসে, 'তরুণ মার্কস প্রসঙ্গে' (Sur le jeune Marxe), La Pensee, মার্চ এপ্রিল, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।

৪। এদের মধ্যে 'পবিত্র পরিবার' ছাড়া অন্যান্য রচনার জন্য আমরা 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলী'র (Karl Marx, Friedrich Engels, Werke) প্রথম খণ্ডের ১৯৬৪ সালের বের্লিন সংস্করণের উল্লেখ করব। 'পবিত্র পরিবার'-এর ক্ষেত্রে ১৯৬৫ সালের বের্লিন সংস্করণের উল্লেখ থাকবে।

৫। এমিল বাত্তিজেল্লি, '১৮৪৪-র পাণ্ডুলিপি' (Manuscrits de 1844) পারি, ১৯৬২।

৬। যুগপৎ জার্মান ও ফরাসিতে প্রকাশিত। আমরা ফরাসি সংস্করণের (পারি, ১৯৫৫-১৯৬২) ব্যবহার করেছি।

৭। পারি, ১৯৫৫।

৮। গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ রেখেই আমরা এই নামকরণ করেছি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে হেগেলের নিজস্ব বক্তব্য তুলনীয় : 'বিষয়ের (Gegenstand) সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিরোধ থেকে আরম্ভ করে পরমজ্ঞান পর্যন্ত চেতনার ক্রমবিকাশকে আমি (এই গ্রন্থে) রূপ দিয়েছি।'—যুক্তিবিজ্ঞান (Wissenschaft der Logik, লাস-সম্পাদিত) প্রথম খণ্ড, হামবুর্গ ১৯৬৩, পৃ ২৯।

৯। লুকাচের 'তরুণ হেগেল' (Der junge Hegel, বের্লিন, ১৯৫৪) গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের নামকরণই হয়েছে 'মনের চেতনা বিজ্ঞানে' দার্শনিক কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে বিযুক্তি' ("Die Entaussɛrung als philosophischer Zentralbegriff der Phanomenoclgie des Geistes")

১০। 'মনের চেতনা বিজ্ঞানে' বের্লিন. ১৯৬৪ সংস্করণ, ১৪৬ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি।

১১। গ্রিক দর্শনে যিনি বহির্বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ও তাকে জয় করে এবং নিজের উপর নিজের প্রভূত্ব বিস্তার করে আপনার মধ্যেই সুখ উপলব্ধি করেন।

১২। তুলনীয়, প্লেখানভ : 'ঈশ্বরের সারাংশ মানুষেরই সারাংশ অর্থাৎ মানুষের শুদ্ধীকৃত সারাংশ' — এঙ্গেলস রচিত 'লুডভিক ফয়ারবাখ' গ্রন্থের রুশ অনুবাদের টীকা, নির্বাচিত দার্শনিক রচনাবলী (ইংরেজি অনুবাদ মস্কো) প্রথম খণ্ড পৃ ৫০৩।

১৩। মার্কস-এঙ্গেলস্ রচনাবলি (Werke) প্রথম খণ্ড, বের্লিন ১৯৬৪, পৃ ২০৩-৩৩৩। রচনাটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ সালে। কখনও কখনও রচনাটিকে '১৮৪৩-ব পাণ্ডুলিপি' নামে অভিহিত করা হয়।

১৪। রুগে (Ruge) -কে লেখা ১৩/৩/১৮৪৩-এব চিঠি কর্ণু (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ১৯১) কর্তৃক উদ্ধৃত। অল্পকাল পরে রচিত 'জার্মান ভাবদর্শ' (১৮৪৫) গ্রন্থে ফয়ারবাখ সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনা আরও পরিষ্কার : 'ফয়ারবাখ যখন বস্তুবাদী তখন তাঁর মধ্যে ইতিহাসকে দেখতে পাই নে। যখন তিনি ইতিহাস আলোচনা করেন তখন তিনি আর বস্তুবাদী নন।' (Die Deutsche Ideologiea বের্লিন, ১৯৬০, পৃ ৪৩)

১৫-২৭। মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলি প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে : ২০৯, ২০৫, ২০৬,২৩১-২, ৩৪৭-৭৭, ৩৭৫, ৩৭০, ৩৭১, এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, ৩৭৮-৩৯১, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৭৯, ৩৯১।

২৮-৩০। '১৮৪৪-র পাণ্ডুলিপি' বত্তিজেল্লি-কৃত ফরাসি অনুবাদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১২৩, ৮৮, ৮৮।

৩১-৩৪। 'পবিত্র পরিবার' বের্লিন ১৯৬৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ২০৪, ১৪৭, ৮৬-৭, ১৫৮-৯।

৩৫। জার্মান ফরাসি বার্ষিকীতে (Deutsch Franzosische Jahrbucher) ১৮৪৪ এ প্রকাশিত।

৩৬। এই অর্থেই আন্তোনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) মার্কসবাদকে প্রয়োগ দর্শন (Filosofia della Prassi) নামে অভিহিত করেছেন। দ্রষ্টব্য গ্রামসি : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও বেনেদেত্তা ক্রোচের দর্শন (Il Materialisomo storici e la Filosofia di Benedetto Croce) মিলানো ১৯৫৫ সালের সংস্করণ, ৭৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি।

৫ম বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৪)

অশোক সেন

মার্কসের ক্যাপিটাল ও আজকের মার্কস্‌বাদ

মার্কসের বিরাট কীর্তি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটির একশো হছর পূর্ণ হল। ১৮৬৭ সালের অগস্ট মাসে জার্মান ভাষায় বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। মার্কসের আলোচ্য বিষয়, তাঁর যুগান্তকারী বিশ্লেষণ ও মীমাংসার কথা ভাবলে আজ আশা আশংকায় মিশ্রিত নানা চিন্তা মনে আসে।

প্রবল আশার উৎস নিশ্চয়ই মার্কস ইতিহাসের বিজ্ঞানকে যে পরিপূর্ণ মানবিকতার সম্ভাবনায় আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছিলেন তার মধ্যে আমরা পাই। বিশেষত গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে ধনতন্ত্রের প্রতিপত্তি যেভাবে খর্ব হয়েছে, তার আভ্যন্তরীণ সংকটের চাপ যত বেড়েছে, পৃথিবীর বিরাট অংশে তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপুল উদ্যমে গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বিশ্লেষণের যুক্তিতে মানবসমাজের সামনে যে শোষণমুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস নির্দেশ করেছিলেন তার দিকে আজ আর শুধু অনাগত ভবিষ্যতের দূরবীক্ষণে চেয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। সেই শোষণমুক্ত সমাজের সূচনা ও বিকাশ আমাদের কালের প্রত্যক্ষ ইতিহাসে বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর পৃথিবীতে আজও দরিদ্র দেশের সংখ্যাই বেশি। তাদের দারিদ্র্যের ইতিহাসে ধনতন্ত্র এবং তার সেই বিকট আন্তর্জাতিক প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম ভূমিকা নিতান্ত প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। ফলে নানা বাধাবিপত্তি, সাময়িক বিফলতা, এমনকি কখনও কখনও বিবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতায় বিভ্রান্ত অবস্থা সত্ত্বেও এশিয়া আফ্রিকার মানচিত্র জুড়ে দেশে দেশে আজ দরিদ্র নিপীড়িত মানুষ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অনুসারে সমাজ ও আর্থব্যবস্থা গড়তে চাইছে। দরিদ্র দেশগুলিতে ওই গণশক্তির সার্থক নেতৃত্ব ও পথনির্দেশের প্রশ্ন সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে অতীব গুরুত্ব লাভ করেছে।

সাম্প্রতিক দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পরিমাণ ও পরিস্থিতি নির্দেশ করতে গেলে অন্য একটি প্রশ্ন উঠে পড়ে। অন্তত প্রথম খণ্ড ক্যাপিটালের আলোচনা মনে রাখলে প্রশ্নটির তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। ওই প্রশ্নের সূত্রে আবার মার্কসীয় ইতিহাসবিচারের যোগ্যতা সম্পর্কে ব্যর্থতার অভিযোগ বা নিরাশার কারণ টেনে আনবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে মার্কস ধনতন্ত্রের যে গতিবিধি নির্ধারণ করেছিলেন তাতে শিল্পবিপ্লবোত্তর পরিণত ধনতান্ত্রিক পর্যায় থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের যুক্তি ছিল সর্বাগ্রগণ্য। আজ পর্যন্ত কিন্তু ও রকম কোনও দেশে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেনি। পূর্ব ইওরোপে চেকোশ্লোভাকিয়া বা খণ্ডিত জার্মানির দৃষ্টান্তগুলি নানাকারণে খুব টিপিকল বলা চলে না। তাই অভিযোগ ওঠে যে ধনতন্ত্রের গতিবিধি সম্পর্কে মার্কসের মৌল মীমাংসায় কোনো গলদ দেখা যাচ্ছে।

মার্কসের বিশ্লেষণ সম্পর্কে এ ধরনের সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় পাই। কোনো ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বৈজ্ঞানিক রীতিতে নির্ধারণ করতে গেলে তার সূচনার পরিস্থিতি অনুযায়ী কয়েকটি প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করতে হয়। আর এই প্রাথমিক ধারণাদির গ্রহণ-বর্জনে বৈজ্ঞানিক তাঁর অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হবেন সেটা স্বাভাবিক। ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে মার্কস ধনতন্ত্রের গতিবিধি বিশ্লেষণের যে বৈজ্ঞানিক মডেল বা প্রকল্পটি গড়েছিলেন তার বিচার সেই বিশেষ চিন্তাবিন্যাসে প্রাথমিক ধারণাগুলির তাৎপর্য বাদ দিয়ে করা সঙ্গত নয়। বলা বাহুল্য প্রাথমিক সূত্রগুলি পাল্‌টে দিলে বিশেষ ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলিতেও তদনুযায়ী পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্বিত্তশ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতি সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বটির উল্লেখ-করা যায়। ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে মজুরির লড়াইতে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং তার ফলাফল পুরোপুরি ধরে নেওয়ার সূত্রটি প্রাসঙ্গিক ছিল না। অন্যপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবিস্তারে ঔপনিবেশিক অতিমুনাফার সুযোগও মার্কসীয় মডেলের আদ্যসূত্রে বিধৃত নেই। ফলে বিশ্লেষণের সেই বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় ধনিক-শ্রমিক সম্পর্কের আত্যন্তিক যুক্তিতে, সর্বোচ্চ মুনাফার বিপরীত মেরুতে নির্বিত্ত শ্রেণীর অবস্থার ক্রমাবনতি একটি অনিবার্য সত্যরূপে প্রতিপন্ন।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও সাফল্যের জোরে এবং ঔপনিবেশিক অতিমুনাফার সাশ্রয়ে আজ পরিণত ধনতন্ত্রের দেশগুলিতে ক্রমাবনতির অভিজ্ঞতা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সত্য। কিন্তু তার দরুন মার্কসীয় মডেলের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কিছু কমে না। বরং উনিশ শতকের বুর্জোয়া বিজয়পর্বে ইংরজ মজুর শ্রেণীর শোচনীয় অবস্থা, সর্বগ্রাসী ধনিক শোষণের মুখোমুখি তাদের প্রতিরোধের আশু প্রয়োজন মনে রাখলে মার্কসের বৈজ্ঞানিক মডেল এবং তার আদ্যসূত্রাবলির যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর সেই প্রতিরোধের দীর্ঘ ঐতিহাসিক কর্মধারাতেই তো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সফল ভূমিকা গড়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক সংকটের অনিবার্যতা নিয়ে মার্কসের বিশ্লেষণও উল্লেখযোগ্য। পরিণত ধনতন্ত্রের দেশে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে ভ্রান্তির অভিযোগ এই সংকটতত্ত্বের সমালোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন এবং সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের সূত্রে মার্কস সংকটের মূল কারণ আবিষ্কার করেছিলেন। এই মৌল বিরোধের বিবিধ লক্ষণ মুনাফার হার কমে যাওয়ার ঝোঁক, ভোগের পরিমাণে ঘাটতি এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্যের মার্কসীয় তত্ত্বসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ধনতান্ত্রিক বিবর্তনের পারম্পর্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেশি মূলধনের জোরে একচেটিয়া প্রতিপত্তি অর্জন করে। শিল্পসংস্থার আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। ফলে ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না এবং ক্রমশ কয়েকটি বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীনে বিরাট মূলধনের অধিকার কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নির্বিত্ত মজুর শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক শোষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রায় সেই শ্রেণীর অবস্থা চরম অসহনীয় দুর্দশায় পৌঁছায়। সেই দুর্দশার প্রকাশ বিপুল সংখ্যক লোকের সীমাবদ্ধ ক্রয়ক্ষমতায় পরিস্ফুট, যার ফলে ভোগের ঘাট্‌তি ও উৎপাদনের বিরাট অংশ অবিক্রীত থেকে যাওয়ার অবস্থা ঘটে।

আবার মজুরিবৃদ্ধি করে এই বাজারের সমস্যা সমাধানের পথেও নানা বাধা এসে পড়ে। মজুরিবৃদ্ধিতে শোষণের মাত্রা কমে গেলে তার থেকে মুনাফার হারে টান পড়বে। তাই উভয়সংকটে আক্রান্ত ধনতান্ত্রিব ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ ও পরিচালনে স্থায়িত্ব বা সৌষ্ঠবের চিহ্নমাত্র থাকে না। অন্যপক্ষে চরম বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদে মজুরশ্রেণির সংগঠন তুমুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সেই বিরোধের বৈপ্লবিক মীমাংসায় সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথনির্দেশ মার্কস দিয়েছিলেন, যাতে সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থা ব্যক্তিগত মুনাফার অরাজক আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ত্রিশের বিশ্বমন্দার অনুরূপ ঘোরতর কোনও সংকট ঘটেনি। উপরন্তু জাপান, পশ্চিম জার্মানি বা ইতালিতে যুদ্ধোত্তর দশকে বেশ চড়া হারে অর্থনৈতিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই সব অভিজ্ঞতার নজিরে মার্কসীয় সংকটতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভ্রান্তির অভিযোগ আনবার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এক্ষেত্রেও মার্কসের তত্ত্বকে তাঁর বিশিষ্ট প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বাদ দিয়ে সমালোচনার ঝোঁকটা প্রকট হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতার পর্যায় ছিল মার্কসের আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্র। ওই ব্যবস্থার গতিবিধি আর তার অনতিক্রম্য সংকটের যুক্তি মার্কস প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের সীমার মধ্যে অনুসন্ধান এবং নির্ধারণ করেছিলেন। মূলধনের

কেন্দ্রীকরণ ও একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভবের সম্ভাবনা মার্কসের বিশ্লেষণে স্পষ্ট। কিন্তু সেই পরিবর্তনের বিরোধদীর্ণ পরিস্থিতিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবলুপ্তির সম্ভাবনা যে সব কারণে প্রবল হয়ে ওঠে তার বৈজ্ঞানিক বিন্যাস ছিল ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ; একচেটিয়া ধনতন্ত্রের গতিবিধি ওই বিশ্লেষণের প্রতিপাদ্য ছিল না।

তাই আজ ধনতন্ত্রের একচেটিয়া পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ ও ফলাফল নির্ণয়ে মার্কসীয় সংকটতত্ত্বের হুবহু মীমাংসা খুঁজলে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতিতে গোড়ায় গলদের দোষ বর্তাবে। আর একচেটিয়া প্রতিপত্তি ও ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কেন যে ধনতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী অবলোপ ঘটেনি তার কারণ বাস্তব ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক জটিলতায় অন্বেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি। সেই জটিলতার বিচারে মার্কসের পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ সঠিক পথের সন্ধান দেয়। মার্কস কখনওই কোষ্ঠির ফলাফলের মতো ধনতন্ত্রের রিষ্টিযোগ গুনতে বসেননি। সেটা ঠিক বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়, সমাজবিজ্ঞানের তো নয়ই।

যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের তথাকথিত সংকটমুক্তির কারণগুলি তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। প্রথম খণ্ড ক্যাপিটালের আলোচনায় ধনিক শোষণের একটি প্রক্রিয়ার ভূমিকা ছিল প্রধান। পণ্যোৎপাদনে সরাসরি মজুর নিয়োগ এবং মজুরি ও পণ্যমূল্যের মধ্যে পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত মূল্য সেই শোষণপ্রক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপ। বাজারদরের উপর কোনও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের জোর অবাধ প্রতিযোগিতার পর্যায়ে ধনিকদের থাকে না। একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পর্যায়ে পণ্যোৎপাদনের ব্যয় বা ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয়মূল্যের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী যথেচ্ছ ব্যবধান সৃষ্টির সুযোগে ধনিক শোষণের আর একটি প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। তা ছাড়া ব্যাঙ্কিং ও শিল্পবাণিজ্যে নিয়োজিত মূলধনের নিবিড়তর যোগাযোগ মারফত নিছক আর্থিক বিনিয়োগের (financial investment) উপর মুনাফার সুযোগও বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে। মজুরির উদ্বৃত্ত, বাজারদরের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ এবং নিছক আর্থিক মূলধনের কুসীদজীবী মুনাফা এই ত্রিবিধ শোষণ প্রক্রিয়ার যোগসাজশ সাম্প্রতিক ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতিতে সদাবিদ্যমান এবং ফলে তার সঙ্গে ক্যাপিট্যাল-নির্দিষ্ট গতিবিধির খানিকটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাই।

শোষণপ্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যের উপর আবার যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার অবদান বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। তার আদি নির্দেশ কেইনসীয় তত্ত্ব থেকে এসেছে। উদীয়মান সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের সামনে ধনতন্ত্র তার মৌল অসঙ্গতি সম্পর্কে অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। ধনতান্ত্রিক শোষণের অনিবার্য ফলস্বরূপ ক্রয়ক্ষমতার ঘাটতি এবং বাজারের সমস্যা মেটাবার জন্য আজ তাই রাষ্ট্রীয় ব্যায়ের পরিপূরণ পৃথিবীর প্রায় সব ধনিক দেশে গুরুত্ব আকার ধারণ করেছে। অবাধনীতি (laissez faire) থেকেও এই ব্যাপক অপসরণে মার্কস-নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক গতিবিধির সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে, কারণ আজ ধনতন্ত্রের পাকা সমর্থকেরাও মানতে বাধ্য যে নিছক ব্যক্তিগত মুনাফার স্বয়ংক্রিয়ায় চরম সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেইনুসীয় অর্থনীতির মূল কথাও তাই। আর ওই বাজারসমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন ধরনের ব্যয়বাহুল্য ঘটে যার সঙ্গে যুক্তিসম্মত মানবকল্যাণের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তার একটি প্রকট উদাহরণ সামরিক ব্যয়ের পরিমাণে মিলবে। আমেরিকায় বিপুল জাতীয় উৎপাদনের শতকরা দশভাগেরও বেশি সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত হিসেবে ধরা পড়ে যে একটি ভারী বোমারু বিমানের খরচে ত্রিশটি আধুনিক স্কুলবাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব, কিংবা দুটি এমন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎযন্ত্র যাতে ষাট হাজার জনসংখ্যাবিশিষ্ট দুটি শহরের সব প্রয়োজন মিটতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া সম্ভব। তাই ধনতন্ত্রের সংকট মুক্তি নিয়ে মার্কসকে নস্যাৎ করবার আগে মনে রাখা দরকার যে মরণের সরঞ্জামের পরিবর্তে অপর্যাপ্ত জীবনের সম্বলের মধ্যে সভ্যতার সমাধান চিরদিন ধনতন্ত্রের আয়ত্তাতীত থেকে যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক অন্তর্বিরোধের এবংবিধ প্রকৃতির দরুণ আজ শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের যোগাযোগ নিবিড় হয়ে পড়েছে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রয়ক্ষমতার ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত আদায়ের সমস্যা নিবারণের জন্য অসামরিক ক্ষেত্রেও অপচয়ের পরিমান বিপুল আকার নিয়েছে। পণ্যরতির সম্মোহন বিস্তারের জন্য বিজ্ঞাপন, প্রচার, জনসম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের মাত্রা অপর্যাপ্ত। সমস্যাটির মূলসূত্র মার্কস ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি একে বলতেন 'মূলধনের সুরৎ জাহির করবার খরচা' (expenses of representation of capital)। তবে মার্কসের প্রত্যক্ষ পরিবেশে, তাঁর প্রতিযোগী ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণে এই অপচয়ের প্রকৃতি ও পরিমাপ গুরুতর ছিল না। আজকের মার্কিন জীবনে এর অবিরত আক্রমণ মানুষের জীবন ও মনকে পণ্যরতির সর্বময় গ্রাসে ঠেলে দিয়েছে। ত্রিশের সংকটের মতো কোনও বিপর্যয় যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্র এখন পর্যন্ত এড়িয়ে গেছে তা সত্য। কিন্তু সেই সংকটমুক্তির প্রক্রিয়ায় মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তার চৈতন্যের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্র যে মারাত্মক দিনানুদৈনিক আঘাত হানছে সেই সর্বনাশের প্রতি চোখ ঠেরে আজ কোনো হিসেবনিকেশ সম্পূর্ণ হবে না। অহোরাত্র ভোগসর্বস্বতার দৌড়ে নাকাল, আপন অস্তিত্বের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের করুণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই নিশ্চয় টয়েনবি বলেছিলেন কমিউনিজমের সঙ্গে নয়, ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর সঙ্গে লড়াইয়ের উপর পশ্চিমা সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

অথচ এত অপচয়, ক্রিয়াপ্রক্রিয়া এবং শোষণবৈচিত্র্য সত্ত্বেও সংকটমুক্তির ব্যাপারটা ধনতন্ত্রের নেহাৎ একটি মুখোশ বললেও চলে। প্রায়শ মার্কসের নির্ধারিত সেই গতিবিধি অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক সংকটের আংশিক প্রকাশ যুদ্ধোত্তর কালেও আমরা দেখেছি। নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেও ধনতন্ত্র কেবল সংকটের বেগ ও তীব্রতা খানিকটা হ্রাস করতে পেরেছে। মার্কিন অর্থনীতিতে অনবরত স্বল্পস্থায়ী বাণিজ্যচক্রের ওঠানামা, সমৃদ্ধির চূড়াতেও বেকারের আধিক্য, ইংরেজ অর্থনীতির অটল অবসাদ বা বিভিন্ন বাজারে অবাধ অধিকার নিয়ে বিরোধে আমরা ধনতন্ত্রের অন্তর্লীন সংকটের পরিচয় বহুবার পেয়েছি। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত লড়াই-লড়াই ভাব, গরিব দেশের উপর নব্য উপনিবেশবাদের হামলা বা ভিয়েতনামের উপর নির্মম আক্রমণের অর্থনৈতিক তাৎপর্যেও তো সেই সংকটের অভিব্যক্তি আমাদের সামনে বিকটভাবে ঘটছে।

সৃজনশীল মার্কসবাদের পক্ষে ওই মুখোশের আড়ালে গভীর সংকটের সত্যকে চেনাটাই যথেষ্ট নয়। নতুন পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের সংগ্রামকে সফল ও সার্থক করে তুলবার জন্য সাম্প্রতিক ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে বোঝা দরকার। বিরাট অপচয়, বিপুল সমরসম্ভারের উৎপাদন এবং তার সঙ্গে খানিকটা প্রায় চিরস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা মিলিয়ে আজকের পরিণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা সর্বদা চলেছে। ফলে নিছক টাকার হিসেবে মজুরির দাবি খানিকটা মানলেও ধনিকেরা পণ্যমূল্যের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণের মারফত তাদের মুনাফা পুষিয়ে নিতে পারে। তার উপরে সর্বমোট চাহিদার স্বল্পতাজনিত পণ্যবিক্রয়ের সমস্যা অতিক্রম করবার জন্য সামরিক ও অসামরিক অপচয়ের বহরবৃদ্ধি তো সাম্প্রতিক ধনতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারের আয়তন এবং তার বাধাবিপত্তি সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে উঠবার পর ধনতন্ত্র আজ আর প্রত্যক্ষ শোষণের মাত্রার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়। শিল্প, বাণিজ্য ও কুসীদজীবী মুনাফার যুগপৎ আয়ত্তিকরণের জোরে আজ ধনতন্ত্রের কর্মপন্থা পুঁজিবাদী লেনদেনের একটি মৌল সত্যকে নানা কৌশলে প্রয়োগ করছে। মজুরি বা বেতনবৃদ্ধির জন্য বুর্জোয়াসির ব্যয়ের মাত্রা বাড়তে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত লেনদেনের চক্রাবর্তে তা পণ্যবিক্রয়লব্ধ আয়রূপে ধনিকশ্রেণীর কাছে ফিরে আসবে। ফলে মজুরিবৃদ্ধিতে উদ্বৃত্তের যা সংকোচন তাই আবার পণ্যমূল্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ মারফত পুষিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ক্রেতাসাধারণকে প্রলুব্ধ করবার বিবিধ ব্যবস্থা কাজে লাগছে, যা আবার শোষণপ্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যের জন্যই সম্ভব, যেমন ভাড়া ও সুদের যুগ্ম শর্তে ধারে বিক্রির আয়োজন বা কিস্তির আকর্ষণের আড়ালে সুদকষার নিপুণ বন্দোবস্ত।

এরকম নানা উপায়ে আজ যেমন ধনতান্ত্রিক সংকটের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, তার বেগ এবং তীব্রতা বেশ কিছুটা চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে, তেমনি অন্যপক্ষে এর ফলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ধনতন্ত্র বিরোধী উদ্যম-উদ্দীপনাও বহুক্ষেত্রে খানিকটা আড়ষ্ট, দিশাহারা হয়ে পড়তে দেখা যায়। ইয়োরোপ আমেরিকার পরিণত ধনতন্ত্রে এই সমস্যাটি খুব জটিল, কারণ উদ্বৃত্তের ঐতিহাসিক প্রাচুর্য, একচেটিয়া শোষণের রকমারি এবং তার সঙ্গে বিপুল অপচয়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াতে দেশগুলির পুরো চেহারা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সেখানে সাধারণ শ্রমিকের চোখে মনেও খানিকটা ধনতান্ত্রিক বৈভবের আকর্ষণ প্রায় অবশ্যম্ভাবী মোহজাল বিস্তার করে। এমতাবস্থায় ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের সেই ধনিক-শ্রমিক বিরোধের পটভূমি সাম্প্রতিক ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। তার জন্য অবশ্য মার্কসীয় বিশ্লেষণের কোনও মূলগত সংশোধন নিষ্প্রয়োজন। শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক কারবারে নিযুক্ত মূলধনের মধ্যে প্রকারভেদ, দ্বন্দ্ব ও যোগাযোগের ব্যাপারটা মার্কস নিজেই ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছিলেন। অসমাপ্ত হলেও সেসব আলোচনার সার্থকতা আজ অপরিসীম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ এবং গতিবিধির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মার্কসের ওই দিগ্‌দর্শন অনুসারে আজ সম্পূর্ণ হওয়া দরকার।

আর সেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামের যুগোপযোগী দক্ষতা ও নেতৃত্বের সংস্থাপনা সাম্যবাদী আন্দোলনের আশু কর্তব্য। জীবিকার তাড়না প্রাথমিক ব্যাপার। কিন্তু শুধুমাত্র সেই চাপের সীমায় আজ রূপান্তরের অনুজ্ঞা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। পরিণত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নতুন কলাকৌশল এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকার প্রবর্তনে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের আগ্রহকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টাটাই বড় কথা। সাধারণ সংকটের মধ্যেও আজ যে বিরাট সামরিক অসামরিক অপচয়ের আড়ালে ধনতন্ত্র টিকে থাকছে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের কর্মপন্থা রচিত হওয়া দরকার। ফলে আজ জীবিকার উন্নতির সমস্যা শুধু মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র জীবনের নানাস্তরে তার তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলেই ধনতান্ত্রিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সম্যক মোকাবিলা সম্ভব। ধনতান্ত্রিক সংকট প্রসঙ্গে কেইন্‌স মন্তব্য করেছিলেন যে পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের (full employment) উপযুক্ত সর্বমোট চাহিদা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ব্যয়ের ব্যবস্থা আদৎ সমস্যা, কিসের জন্য, কোন দিকে ব্যয় তা জরুরি নয়। কেইনসীয় মীমাংসার ওই পথনির্দেশে বিপুল সামরিক ও অসামরিক অপচয়ের মারফত যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্র তার রক্ষাকবচ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর কেইনসীয় সমাধানের ধনতান্ত্রিক প্রয়োগ এবং তার অন্তর্নিহিত নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অভিযান আজ তাই সভ্যতার সম্পূর্ণ দাবিতে ব্যাপক হয়ে ওঠা সম্ভব। চৈতন্যের সেই ব্যাপ্তি এবং আন্দোলনের দৈনন্দিন কর্মসূচীতে তার পরিগ্রহণ বাদ দিলে পশ্চিমের পুঁজিসমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বিত্তের আন্দোলন বারবার বুর্জোয়া বৈভবের বাজিতে বেকুব বনে যাবে। তার নজির ইতিমধ্যে আমরা খুব কম দেখিনি। এমনকি ভিয়েতনামের নির্লজ্জ আক্রমণের বিরুদ্ধেও বিশ্বশ্রমিকের স্বরূপে ভাস্বর কোনও জগৎজোড়া দুর্দম প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত এখনো ঘটেনি।

যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে নতুন পদ্ধতিতে লড়াই করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার গুরুত্ব আজ দেশেদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের কর্মসূচীতে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধনতন্ত্রের নতুন প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ফলে দশটি মেদিনী-কাঁপানো দিনের বিপ্লব বা দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধে তাকে পরাজিত করবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। আচম্বিতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিষ্ফল প্রয়াসে অবস্থা ফ্যাসিজমের অনুকূলে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ মারফত ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে গেলে আণবিক অস্ত্রের চূড়ান্ত আঘাত প্রত্যাঘাতে সভ্যতার চরম বিলুপ্তি নিদারুণভাবেই সম্ভব। যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার বিস্তার আবার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রয়োজন ও তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের সামনে

ধনতন্ত্র আপন সংকটের চরম প্রকাশ থেকে অব্যাহতি চায়। তাই আজ ধনতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় ঘোষণায়, প্রতিশ্রুতিতে নানা অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অব্যবস্থার দায়ভাগে রাষ্ট্রও সরাসরি জড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপক জনমতের সমর্থন লাভের জন্য রাষ্ট্র বারবার বিবিধ গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য। আবার অনুরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। গণতন্ত্রের সাধ ও ধনতন্ত্রের সাধ্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সূত্রে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপক গণসমাবেশ গড়ে তোলা দরকার এবং তার জোরে শান্তিপূর্ণ সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য যে এই গণআন্দোলনের কর্মধারায় কোনো আপোষচুক্তির অবকাশ নেই, সামরিক ও অসামরিক অপচয়ের ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্ত, তার রকমারি শোষণপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদকে জীবনের বহুস্তরে দৃঢ়সংবদ্ধ প্রকাশের জোরেই ধনতন্ত্রের বিনাশ সম্ভব হবে।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সমস্যার পটভূমি খানিকটা আলাদা। নানাবিধ শোষণপ্রক্রিয়ায় সমর্থ একচেটিয়া ধনতন্ত্রের আধিপত্য ভারতবর্ষেও ঘটেছে। শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ফলস্বরূপ আমাদের শিল্পোন্নয়ন সদাব্যাহত। এদেশে একচেটিয়া ধনতন্ত্র অকিঞ্চিৎকর শিল্পজ উৎপাদনের আওতায় গড়ে উঠেছে। ফলে পশ্চিমের অনুরূপ একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রশিল্পের যথাযথ বিকাশ ঘটেনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কৃষিবিপ্লবের অভিজ্ঞতায় আমরা বঞ্চিত রয়েছি। উপরন্তু ভূমিসংস্কারের চিন্তা ও কর্মে নানা গলদের ফাঁক দিয়ে বৃহৎ ভূম্যধিকারের সঙ্গে বণিক ও কুসীদবৃত্তির নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছে। তা ছাড়া শিল্পোন্নয়নের বেগ এত স্তিমিত যে কৃষি থেকে শিল্পে স্থানান্তরিত কর্মীর সংখ্যাও আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এই পারিপার্শ্বিকে ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশে কোনওদিন শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়নি, বণিকবৃত্তি ও আর্থিক বিনিয়োগের মারফত শোষণপ্রক্রিয়ার প্রতিপত্তি বজায় থেকেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূচনা ও বিবর্তনে আমরা চিরদিন যে ছিন্নমূল বর্তমান ও অনায়ত্ত ভবিষ্যতের মধ্যে ঘুরে ফিরেছি, আজ স্বাধীনতার কুড়ি বৎসর পরেও সেই সৃষ্টিছাড়া দ্বন্দ্ব থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেনি।

'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডের ধনতান্ত্রিক গতিবিধি, তার শ্রমিক-শিল্পপতি বিরোধের একান্ত গুরুত্ব এবং শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত মূলধনের বিশ্লেষণ আমাদের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে পারে না। বরং এই কালো টাকা, কালোবাজার, জোতদারী, ফাটকাবাজিতে পর্যুদস্ত অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ডের বিশ্লেষণ থেকে, মূলধনের প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক আদিম গতিবিধির বিচার থেকে আমরা পথের সন্ধান করতে পারি। সামন্ততান্ত্রিক ভাঙনের শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও রূপান্তরের ভূমিকা বিচারে মার্কস বণিকবৃত্তি, কুসীদজীবী এবং শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নানারকম মূলধনের বিভিন্ন সম্পর্কে ওই পার্থক্যের ভিত্তি মার্কসের বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়েছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন এবং উৎপাদনপ্রক্রিয়ার উন্নতির সঙ্গে শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও মুনাফার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যায়। এরকম মূলধনের আবির্ভাব ও বিকাশ কৃষিবিপ্লবের পরিপূরণ ব্যতীত যুগান্তরের বেগ ও উদ্যম অর্জন করতে পারে না। অন্যপক্ষে বণিকবৃত্তি বা কুসীদজীবী মূলধনের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনও সম্পর্ক থাকে না। শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের আধিপত্য এবং তার ফলে ব্যক্তিগত মুনাফা ও উৎপাদন বিকাশের মধ্যে পূর্বোক্ত যোগাযোগের দরুন পুঁজিবাদী শিল্পোন্নয়নের দিগ্বিজয় ধনতন্ত্রের সাবেক দৃষ্টান্তে সম্ভব হয়েছিল। আগেই বলেছি ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কারণে উৎপাদন ও ধনতন্ত্রের মধেও সেই যুগান্তকারী সংযোগ কোনওদিন স্থাপিত হয়নি। আর দূরীকৃত কৃষিবিপ্লব ও অপরিণত শিল্পজ উৎপাদনের পারিপার্শ্বিকে যে খাপছাড়া একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব তার উৎপাদনবিমুখ শোষণপ্রক্রিয়ার আধিপত্যে কোনও বলিষ্ঠ বেগবান শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

তাই আমাদের পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পবিপ্লবের কর্তব্য গণতন্ত্রের সাধ এবং ধনতন্ত্রের

সাধ্যের মধ্যে ব্যত্যয়ের প্রশ্ন স্পষ্ট করে দেয়। জাতীয় স্বার্থে আজ আমাদের পক্ষে শিল্পবিপ্লবের গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক প্রভাব, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবরোধ থেকে মুক্তি শিল্পবিপ্লব ভিন্ন সম্ভব নয়। ইতিহাসের ধারায় ভারতবর্ষে শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে আসে নি। নেতৃত্বের এই ঐতিহাসিক শূন্যতাপূরণ আজ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অপরিহার্য দায়িত্ব এবং তার ব্যাপক গণতান্ত্রিক অনুষঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের কর্মসূচি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আর আমাদের পরিস্থিতিতে শিল্পবিপ্লবের কার্যক্রম শুধু কয়েকটি কলকারখানা নির্মাণের ব্যাপার নয়। কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক রূপান্তর জাতীয় জীবন ও চেতনার সর্বস্তরে এক অভূতপূর্ব সৃষ্টিময় উজ্জীবনের ধারাতেই শুধু তা সম্ভব। নেতৃত্বের জোর থাকলে সেই বিরাট কার্যক্রমের যথোচিত বিন্যাস ও সমাপনের জন্য আজ গণআন্দোলনের শক্তি দুর্নিবার হয়ে উঠবার কথা। উৎপাদনবিমুখ ভারতীয় ধনতন্ত্রের স্বরূপ, তার জাতীয় মুক্তির পরিপন্থী শোষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনিবার সংগ্রাম ওই কার্যক্রমের আশু দায়িত্ব। বৃহৎ পুঁজি ও ভূসম্পত্তির অনাচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জাতীয় প্রতিরোধ এবং সেই গণতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে আজ ভারতবর্ষের শিল্পবিপ্লব সার্থক রূপ ও গতিতে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

তাই উৎপাদনের সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য জাতীয় দায়িত্বের অঙ্গীকার গণতান্ত্রিক প্রগতির মৌল শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক সমাজ ও অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সর্বনাশ এই যে তার ফলে জীবনের সব স্তর থেকে কর্মের সার্থক সংজ্ঞা, উৎপাদনের অগ্রগণ্য তাৎপর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। চাষি নিষ্পিষ্ট হয় উৎপাদনের দায়িত্ববর্জিত সম্পত্তির আধিপত্যে, কারিগর ধ্বংস হয়ে যায় পরাক্রান্ত বিরুদ্ধতার সংঘাতে, জাতীয় জীবনের সমগ্রতা থেকে উৎসন্ন উৎপাদনের নিরিখ থেকে বিচ্যুত মধ্যবিত্ত নিদারুণ গৌণতার গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে, বুর্জোয়াসিও আদিম লুণ্ঠনের লোভ কাটিয়ে মুনাফার স্বার্থের সঙ্গে যুগান্তরের প্রয়োজনকে মেলাতে পারে না, আর তার মুখোমুখি সামান্য শিল্পজ উৎপাদনের সংকীর্ণ সীমায় শ্রমিকের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ও আড়ষ্ট, সদাব্যাহত থেকে যায়। আর এই দুঃসহ বিরুদ্ধতার প্রকোপে মানুষের নানা কাজকে প্রগতিমূলক সামাজিক উৎপাদনের মূলসূত্রের সঙ্গে মেলাতে না পারায় আমাদের হাতে সভ্যতার কোনও ক্যাটিগরি সৃষ্টির পরিপূর্ণতায় গড়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকে গত বিশ বছরের স্বাধীনতার অভিজ্ঞতায় এই নিষ্ফলতার সত্য বারবার প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এইরকম নিষ্ফলতার অনবিচ্ছিন্ন ধারায় আজ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিদারুণ সংকট চরম অবস্থায় পৌঁছিয়েছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামে চাষিকে জয়যুক্ত করতে পারিনি, অভাবের সুযোগে অধিষ্ঠিত অতিমুনাফার নির্মম, নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তির কাছে প্রতিনিয়ত হার মানছি। অনাচার, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। আর শিল্পবিপ্লবের ফাঁকাবুলির আড়ালে দেশকে আকণ্ঠ দেনায় ডুবিয়ে আবার সাম্রাজ্যবাদের হাতছানিতে ওঠা-বসার কথা ভাবতে সুরু করেছি। এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন দেশজোড়া মানুষের জীবনে কর্মের হারানো সংজ্ঞা, উৎপাদনের অভিধার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাই হবে শিল্পবিপ্লবের পথে আমাদের মৌলিক ভাবাদর্শ, আমাদের জাতীয় গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। তার প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের রুজি রোজগারের দৈনন্দিনে, ট্রেডইউনিয়ন, কৃষকসভার শ্রমদৃপ্ত পদক্ষেপে, শিক্ষার্থীর বাল্যকৈশোরযৌবনের প্রাণময় উন্মীলনে, মধ্যবিত্তের বন্ধনমুক্তিতে। সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির নেতৃত্ব ও পরিচালনাই আজ ভারতবর্ষের সৃজনশীল মার্কসবাদের অগ্রণী দায়িত্ব।

রাজনীতির কৌশলবিচারে আমাদের এই পরিক্রমা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোরে হওয়া সম্ভব, কারণ শিল্পবিপ্লবের সংকল্পে দেশশুদ্ধু মানুষের প্রয়াস প্রতিক্রিয়া খোদ কর্তাদের বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে ঠেলে দিতে পারে। অন্যপক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের চরমরীতিতে প্রগতির শিবিরেই নিঃসঙ্গতার সমস্যা দেখা যাবে। অনুরূপ বিদ্রোহের আশু বা সুদূর সাফল্যের সম্ভাবনা ইতিহাস ভূগোলেও মিলছে না। তাই গণতান্ত্রিক

শক্তির সম্মিলিত আধিপত্যের জোরে প্রতিক্রিয়ার অবসান এখন আমাদের ইতিহাসের পথনির্দেশ। উপরন্তু বৃহৎ একচেটিয়া স্বার্থ, বণিকবৃত্তির ও কুসীদজীবী মুনাফার মোহমুক্ত বুর্জোয়াসির কোনও অংশের পক্ষে গণতান্ত্রিক শক্তি নিচয়ে যোগদানের যুক্তি আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেনিন যাকে এশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল বুর্জোয়াসির মুখ্য প্রতিনিধি বা সামাজিক অবলম্বন মনে করেছিলেন সেই উৎপাদনরত কৃষকের উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। ছোট কারিগরদের কথা বা ছোট ও মাঝারি শিল্পমালিকদের গণতান্ত্রিক শক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ এবং তজ্জনিত দায়িত্বের পরিগ্রহণে জাতীয় বুর্জোয়ার সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। সেই জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে বর্তমান পর্যায়ে গণতান্ত্রিক কর্মসূচির দুস্তর বিরোধ ঘটবে না। ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের শ্রমিক-শিল্পপতি বিরোধের গুরুত্ব এখানে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়, কারণ প্রকৃত গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি ও জোরে এখানে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার অন্য উপায় আছে। তার জন্য এখনই উৎপাদনের ব্যক্তিস্বত্বমূলক উদ্যমকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে উৎপাদনের মূলগত গুরুত্বের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থানুগ বন্টনের ন্যায় কীভাবে সমন্বিত হবে। মার্কসীয় বিচারে বণ্টনের সমস্যা, তার ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা উৎপাদনের সামাজিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে বিবেচ্য নয়। পুঁজিবাদ বিলোপের যুক্তি চূড়ান্ত হয়ে ওঠে যখন উদ্বৃত্ত মূল্যঘটিত শোষণরীতির সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের বিরোধ ধনতান্ত্রিক সংকটে পর্যবসিত হয়। মার্কসের বিশ্লেষণে বণ্টনের ন্যায় এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমিকের অগ্রণী ভূমিকা বাদ গিয়ে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পায়নি। তাই ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের বিশেষ মডেলে ট্রেড ইউনিয়ন মারফত শ্রমিকের সুখসুবিধার সম্ভাবনা বড় কথা নয়, তার লজিকে উৎপাদনের নৈরাজ্যের সঙ্গে উদ্বৃত্তমূল্য শোষণের যোগাযোগ ধনতন্ত্রের গতিবিধিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর আমাদের আজকের অবস্থায় দিল্লির মসনদ থেকে বারবার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উৎপাদনবৃদ্ধির যে ফতোয়া শোনা যায় তার মধ্যে বিরাট একটি ফাঁকি থাকে, কারণ দেশব্যাপী উৎপাদবিচ্যুত শোষণপ্রক্রিয়ার অপনোদন ব্যতীত সেই বহুঘোষিত উদ্দেশ্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তাই উৎপাদনের মূলসূত্র শিল্পবিপ্লবের উপযুক্ত ভাবাদর্শ একমাত্র গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্মসূচিতে সার্থক সক্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

ভারতবর্ষের আজ বন্টনব্যবস্থার নিদারুণ বৈষম্য উৎপাদনবিচ্যুত শোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রমজীবী মানুষের বিপক্ষে আয়বণ্টনের গতি পরিচালনে বণিকবৃত্তি ও কুসীদজীবী শোষণের অপ্রতিহত ভূমিকা সর্বাগ্রণ্য। ছোট চাষি, ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর তো তার চাপে সর্বদা নিষ্পেষিত। আবার উৎপাদনে চাষির সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ বড় জোতদারের (যিনি এখন মহাজন ও ফসলের কারবারিও বটে) কাছে কর্জ ও খাজনার চাপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার লড়াইতেও বাজারদরের অনিবার ঊর্ধ্বগতির পটভূমি প্রধান সত্য। সেই পরোক্ষ শোষণপ্রক্রিয়ার প্রচণ্ড শক্তি মজুরিবৃদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। তাই উৎপাদনবিচ্যুত শোষণরীতির সঙ্গে সংগ্রাম বণ্টনের ন্যায়নীতির সঙ্গে সংযুক্ত এবং বণ্টন ও উৎপাদনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সংযোগের ফলে আমাদের শিল্পবিপ্লবের জন্য শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণতান্ত্রিক শিবিরের অধিকারে এলে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ এবং তাদের সমাপন আর ব্যক্তিগত মুনাফার স্বেচ্ছাচার চলবে না। গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে ওই রাষ্ট্রের আধিপত্য জাতীয় গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রমুক্ত (non-capitalist) শিল্পবিপ্লবের মূল কথা।

ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের বিশেষ প্রকল্প, সেই মডেলের বিশেষ ক্ষেত্র এবং তার যুগান্তকারী মীমাংসা থেকে বোধ হয় খানিকটা দূরে সরে এলাম। কিন্তু পরিবর্তমান ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়কে দেশকালের বাস্তবতায় বুঝবার চেষ্টা এবং সেই অবহিতির বিজ্ঞানে ভবিষ্যৎকে গড়বার প্রয়াসেই তো মার্কসের শ্রেষ্ঠ

ঐতিহ্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত। আর ক্যাপিটালের অবদান শুধু ধনতন্ত্রের বিশেষ একটি পর্যায়ের বিশ্লেষণে কখনওই নিঃশেষ হয়ে যায় না, সেই বিশ্লেষণে শোষণমুক্তির পরিপূর্ণ মানবিক তাৎপর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে, সমাজ অর্থনীতির আপেক্ষিকতায় মানুষের ওই মুক্তি অভিযানের রূপরেখা, তার আশু কর্তব্যের নির্ধারণে খানিকটা বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের এবংবিধ বৈচিত্র্যকে বিজ্ঞানের আলোয় বুঝবার প্রয়োজন মার্কস স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস-বিজ্ঞানের রীতিতে আমরা শ্রমের সামাজিক লক্ষণ, ঐতিহাসিক রূপান্তরের উৎক্রান্তিতে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা এবং সামাজিক অস্তিত্বের প্রকারভেদ অনুযায়ী তার নেতৃত্বের প্রগতিশীল তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি। তাই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের সঙ্গে, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্বিষ্টের সঙ্গে ঐতিহাসিক অগ্রসৃতির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে মজুর-কৃষকের যুগান্তকারী ভূমিকা আমাদের অবধার্য, যে সত্যের স্বীকৃতিতে এঙ্গেলস জগৎহিতায় চরিতার্থে নির্বৃত্ত শ্রেণীর স্বরূপ নির্দেশে করেছিলেন, 'To carry through this world emancipating action is the historical mission of the proletariat.'

পরিণত ধনতন্ত্র বা দরিদ্র ভারতবর্ষে কোনও ক্ষেত্রে সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি অবহেলাভরে প্রগতির পথনির্দেশ সম্ভব নয়। আর অবহেলার প্রকাশ বিচিত্র হলেও তার মৌল বিচ্যুতি মানুষের ভবিষ্যৎকে দুরপনেয় অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। তাই বুর্জোয়া বৈভবের দেশে সামরিক অসামরিক অপচয়ের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামের প্রশ্নটি এত জরুরি, কিংবা শতাধিক বৎসর ধরে সাম্রাজ্যের সর্বনাশা বোঝা টানার পরে শিল্পবিপ্লবের শ্রমিক নেতৃত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। না হলে সমাজ অর্থনীতির সমগ্র সমস্যা থেকে আলাদা করে কেবল মজুরি ঠেকা দেওয়ার আন্দোলনে আমরা ইতিহাসের চাবিকাঠি খুঁজে পাব না। পেটি-বুর্জোয়ার মন দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য নির্ধারণের কথা মার্কস লেনিন কখনও বলেননি, চিরদিন তার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। আর শ্রমিকে কৃষকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সংকল্প কি শুধু কেতাবের কথা হয়ে থাকবে? গরিব চাষি, ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর মিলিয়ে কৃষিকর্মে উৎসৃষ্ট বহু মানুষের সর্বনাশ যদি বছরের পর বছর বাকি দেশ মেনে নেয়, তাহলে তারপরে কোনও একদিন চাষির সেই সর্বনাশের দায়ভাগ দেশব্যাপী নিদারুণ দুর্ভিক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তো নিশ্চয়ই মজুর-চাষিতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সত্য হয়ে উঠবার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিজয় অভিষেকের পর থেকে ঐ প্রতিরোধের, সীমাবদ্ধ হলেও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা ঘটবে আশা করেছি। জানি না এই লেখা যখন কেউ পড়বেন, তখন সেই আশার চেহারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

সেই অনিশ্চয়তার আয়নায় আজ মার্কসবাদের কর্তব্য চিনে নেওয়ার সময় হয়েছে। সময় হয়েছে বলা অনৃতকথন, কারণ অনেক দেরির ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে তাই এখন প্রখর সমস্যা। বছরের পর বছর মধ্যবিত্ত গৌণতার গণ্ডিতে রাজনীতির ছক টেনে, আর কথায় কথায় বিপ্লবের কাল্পনিকতায় যে দায়সারা ব্যাপার চলে আসছে তার সঙ্গে মার্কসীয় পথনির্দেশের তো কোনো সম্পর্ক নেই। লোভের গুদাম থেকে খাদ্যের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা এখনও মুক্ত না করতে পারার কারণ ওই সীমাবদ্ধ রাজনীতিতে মিলবে, যে রাজনীতির ফলে শ্রমজীবী মানুষের সার্থক সামাজিক ভূমিকা গায়েব হয়ে গেছে। খাদ্যসমস্যায় প্রতিক্রিয়ার জঘন্যতম আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণপ্রতিরোধ গড়ে না উঠবার ব্যর্থতায় তার স্বীকৃতি। গণ আন্দোলনের দুর্দম শক্তি, সুদৃঢ় ঐক্য ও সৌষ্ঠব থাকলে কোনো একজন মন্ত্রী বা ভেতরে-বাইরে তাঁর সহধর্মীর দল, পুলিশের অনাচার বা এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের যথেচ্ছাচারও আমাদের এরকম প্রতিকারহীন পরাভবের লজ্জা দিতে পারত না। আজ খাদ্যের লড়াই শুধু কোনো সরকারের সঙ্গে নয়, আরও মূলে নির্বিত্ত মানুষের শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে, যা আবার সামগ্রিক বিন্যাসে জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায়। এই লড়াইতে নিতান্ত প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের হারানো ভূমিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাই এখন আমাদের মার্কসবাদ ও গণতান্ত্রিক শিবিরের সামনে কঠোর অগ্নিপরীক্ষা, কারণ শ্রমিক-কৃষকের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রস্তুতি ও বিকাশ, তার বাঁচবার ও বাঁচাবার পরিপূর্ণ আয়ত্তিতেই

কেবল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের কর্মধারা গঠিত হতে পারে। সেই সংগ্রামের সঙ্গে ব্যাপক অর্থে জড়িয়ে আছে প্রকৃত কৃষিবিপ্লবের সম্ভাবনা যা ছাড়া শিল্পবিপ্লব সুদূরপরাহত থেকে যাবে। আর সব দায়িত্ব ফাঁকি দিয়ে যাঁরা শুধু অশান্তির আস্ফালনে কাজ সারতে চান, ব্যর্থতাক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত মনের উপর তাঁদের প্রভাব দুরপনেয় হলেও তাতে ইতিহাসের কাজ আর কিছু এগায় না। তাই আজ নকশালবাড়ির যুগসঞ্চিত প্রশ্নের মুখোমুখি মাদুরাই-এর স্ববিরোধ বড় সৃষ্টিছাড়া লাগছে। আবার দাবির নিহিত ন্যায্যতা সত্ত্বেও অবাস্তব পদ্ধতির প্রয়োগ যে বৈপ্লবিক প্রয়াসকে ব্যর্থতার গ্লানিতে বিলীন করে, ইতিমধ্যে নকশালবাড়িতে তার করুণ প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

দরিদ্র জনসাধারণের দেশ আমাদের। গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রাম এখানে জীবনের প্রাথমিক দাবি, যার সাহস, উদ্যম, শিক্ষায় শ্রমজীবী মানুষ তার ইমানের জোর পুরোপুরি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে, সামাজিক মনুষ্যত্বের সর্বপ্রকার পরাভবের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রথম সারিতে হাজির হবে। জীবিকার যুদ্ধ ও জীবনের অগ্রগতির মধ্যে এই পারম্পর্যে মার্কস শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ইতিহাসের স্রষ্টাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাই আজ ক্যাপিটালের শতবার্ষিকীতে, রুশ-বিপ্লবের পঞ্চাশৎ বছরে মনুষ্যত্বের নির্লজ্জ পরাভবের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলিকে চরম বলে মেনে নেওয়ার অপরাধ করব না। ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড রচনার পর মার্কস বার্লিনে এক বন্ধুকে চিঠিতে লেখেন যে, ষাঁড়ের চামড়ার মানুষ হলে স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারে ডুবে থাকা যেত, শ্রেণীসমাজে মনুষ্যত্বের কঠিন যন্ত্রণা নিয়ে ভাববার দরকার হত না। আজকের চৈনিক বিচ্যুতি, স্বদেশে তার বিভিন্ন প্রকাশ এবং তারও প্রতিষেধে প্রকৃত কমিউনিস্ট প্রভাব ও উদ্যমের অকিঞ্চনতা কিংবা কোনও কোনও ধনীদেশে বুর্জোয়া বৈভবের বাজিতে বেকুব শ্রমিকের ফেরারিপনায় ইতিহাসের এক অসহনীয় নিরুদ্দেশ যাত্রার আশঙ্কা মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠলেও, শেষ পর্যন্ত মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ওই মার্কস-কথিত মনুষ্যেতর প্রতিক্রিয়ার কাছে হার মানতে পারে না। সেই অপরাজিত ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তায় ক্যাপিটালের মানবসংকল্প ভাস্বর হয়ে ওঠে।

'নির্বাচিত এক্ষণ'-এ লেখকের সংযোজন :

১. লেখাটি তৈরি হওয়ার পর বছর চল্লিশ কেটে গেছে। আশঙ্কার কথা যা ছিল, সবই বহুগুণ বেড়েছে। বিকট হয়েছে তার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং আরও অনেক জটিল চেহারা। আশা ভরসার কথা যা ছিল, তা এখন প্রায় শূন্য। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তখনও কিছু প্রশ্ন ছিল নিশ্চয়। কিন্তু সবটাই যে এমন হারের ব্যাপার, তা তখন বুঝতাম না। Bad faith-এর এরকম ধাক্কা আগে টের পাওয়ার অনেক বাধা। যা হওয়ার, তা হয়ে যায়।

২. লেখাটিতে শিল্প বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আমার বক্তব্যে মারাত্মক এক সরলীকরণ ছিল। পুঁজির (capital) নিজের নিয়মেই শিল্পায়নের কিছু বাধা তৈরি হয়। ঔপনিবেশিক অতীত তার ইতিহাসে নিশ্চয় যুক্ত। কিন্তু স্বাধীন হলেই সে বাধা চলে যায় না। যেমন, মস্ত বড় এক সমস্যা হল, ধনতান্ত্রিক বিকাশের পাশাপাশি স্বনিযুক্ত আর অসংগঠিত মেহনতি মানুষের বিপুল প্রাচুর্য। কৃষক এবং আরও অনেকরকম কাজের লোক। তাদের বেশির ভাগই উচ্ছন্ন যেন। তবে সেভাবেই তাদের বাঁচামরা। পুঁজির সঙ্গে লুণ্ঠনের (মার্কস বলতেন primitive accumulation) যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য আবার লুণ্ঠিত, নিঃস্ব মানুষ যে পুঁজির মজুর হতে পারবে, সেটাও নিশ্চিত নয়। যে-সময়ে এই লেখা, তার আগে-পরে এমন বিপদের দৃষ্টান্ত প্রচুর ছিল। গত দু-আড়াই দশক থেকে বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতায় তা আরও জটিল এবং ভয়ানক হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই তো *ডাস ক্যাপিটাল*-এর বিশেষ সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনা যথেষ্ট নিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন।

৩. তখনকার সমসাময়িক কিছু সমস্যা—রাজনীতি সমাজ অর্থনীতির কথা লেখাটিতে আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং তার জন্য জনমানুষের সমাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে যে-সব কথা বলেছিলাম, তার দায় ক্রমেই আরও জটিল হয়েছে। এ-দল, ও-দলের বাদবিচার, সবই কেমন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ফেরার হল! নানাস্তরে সামাজিক উদ্যোগের আয়তন ও সমার্থ্য বাড়ানোই হয়তো একমাত্র উপায়। তা আজও প্রায় অনারব্ধ এবং খুবই কঠিন হলেও নান্যপন্থা। সমাজের অনুকূল দলীয় স্বার্থের, তা সে যে-দলই হোক, যেন আর পাত্তাই নেই।

৪. গত শতাব্দীর সাতের দশকের আগে মার্কস-এর *গ্রুন্‌ডরিস*-এর সঙ্গে বিস্তৃত পরিচয় আমার কিছু ছিল না। তার বেশ কিছু জয়গা বারবার পড়বার পরে অনেক কথা নতুন করে বুঝেছি। সে-বোঝাপড়ার অনেক আগে এই লেখা। *ডাস ক্যাপিটাল* কোথায় বিশেষ বাস্তব, কী অর্থে বিশেষ, কোথায়ই বা নির্বিশেষ, তা-ও কী অর্থে, এসব ধারণায় তখন যে-সব অস্পষ্টতা আমার ছিল, তার পরিচয় লেখাটিতে আছে।

৫ম বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৪)

অশোক মিত্র

'দাস কাপিটাল' প্রসঙ্গে

কৌতুক করছি না, এটা সত্যিই আমার আন্তরিক বিশ্বাস : আমাদের দুর্ভাগ্য, পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে *Das Kapital* জর্মন ভাষায় মার্কস্‌কে লিখতে হয়েছিল। জর্মন সংগীত এবং জর্মন ভাষার মধ্যে এক আশ্চর্য বৈষম্য। জর্মন সংগীতে যে উত্থান অবরোহণ আলোড়ন ব্যাপ্তি গাম্ভীর্য লালিত্য, তার তুলনা নেই : সংগীত অবলীলায় চপল হচ্ছে, গভীরে প্রবেশ করছে, ফিরে আসছে, কখনও উদাসীনতা, কখনও শান্তি, কখনও ঝড়, কখনও উদ্বেগ, কখনও কান্না, কখনও হিংসা, পরক্ষণেই হয়তো প্রেম-আনন্দ-উচ্ছলতার উপচে-ওঠা ঝলকানি। একসঙ্গে এতগুলি বিভঙ্গ, অথচ জট পাকিয়ে যায় না, এক অনুভাব থেকে অপর অনুভাবে প্রস্থানের পরিসরে কোনও আয়াসের চিহ্ন নেই, মনে হয় না যেন জোর করে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মীড়ের ব্যঞ্জনায় কোনও ফাঁকি নেই, কৃত্রিমতাও নেই।

জর্মন ভাষা অথচ আদপেই তা নয়। অলংকারবহুল এই ভাষা, ব্যাকরণের অনুশাসনে সবদিকে বাঁধা, একমাত্র দুরূহতার দৌত্যই যেন এই ভাষাকে সাজে। তারল্যের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি সারল্যও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জর্মনের মধ্যবর্তিতায় পরাহত। ভাষার এমনই জটিলতা, যে-কোনও চিন্তাভাবনাই তত্ত্বকথার কঠিন বর্ম পরে তবে সভাস্থলে উপস্থিত হতে সফল হয়, তা আপাত বিচারে যত সামান্য চিন্তাই হোক না কেন। আমার এই বক্তব্য গর্হিত বলে মনে হতে পারে, গ্যেয়টে-হেগেল-কান্টের সৃষ্টিকে নস্যাৎ করবার স্পর্ধা অক্ষমার্হ এমনতর কথাবার্তাও অবশ্যই শুনতে হতে পারে। এই কবিমনীষীদের আমি অবহেলা করছি না; শুধু বলতে চাইছি, তাঁদেরও দুর্ভাগ্য, জর্মন ভাষার নিগড়ে তাঁদের প্রতিভার প্রকাশকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। কারণ যা মহৎ, তা-ও জর্মন ভাষার রুদ্ধশ্বাস গুহায় একটু হাঁপিয়ে ওঠে, অন্য কোনও ভাষার—ফরাসি বা ইংরেজির- —ঋজু, মুক্ত পরিবেশে তা সম্ভবত আরও বহুগুণ উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হতে পারত। প্যাঁচানো, ঘোরানো, ঠোঁট জিভ-ক্লান্ত-করা শব্দ অক্ষর চক্রমণে জর্মন ভাষা বোধকে নিস্তেজ করে আনে, খানিক দূরে এগিয়ে প্রায়ই এটা মনে হয়, থাক, এবার থামি।

মার্কস্‌কে আজীবন এই ভাষার বোঝা বইতে হয়েছে। মাতৃভাষার পরিধি পেরিয়ে অন্য বৃত্তে আশ্রয় নেওয়ার মতো ঘটনা কদাচিৎই ঘটে, তাছাড়া মার্কসের ক্ষেত্রে তার কোনও প্রশ্নই ছিল না। অবশ্যই তিনি বহুভাষী ছিলেন, কিন্তু শৈশব থেকে অধ্যয়ন-চিন্তা-অনুশীলনের একমাত্র না হলেও প্রধান বাহন ছিল জর্মন। কান্ট-হেগেলের পাঠ নিয়েছেন এই ভাষায়, ইয়োরোপের নানা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিন্যাস-বিবর্তনের বিবরণ জেনেছেন এই ভাষার সূত্রে, যুক্তিতর্ক-মীমাংসার প্রকরণের উৎক্ষেপণ কেমন হওয়া উচিত, তা-ও শিখেছেন জর্মন ভাষাশ্রয়ী আদর্শে। এবং নিজের সমস্ত চিন্তাভাবনাদর্শন-ইতিহাসবিচার-সামাজিক অভিজ্ঞান-ধনবিজ্ঞানেরসূত্র প্রকাশ করেছেন জর্মন ভাষায়। *Das Kapital*-এর মহীরুহ কীর্তি, গোথা কার্যক্রমের আলোচনা, এঙ্গেল্‌স এবং আরও নানা অমুক-তমুককে লেখা চিঠিপত্র কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র, সাংবাদিকতার এলোমেলো পাহাড়, সব-কিছুতেই জর্মন ভাষার হাঁসফাঁস বন্ধন।

মহৎ চিন্তা অবশ্য আধারের বাধার অপেক্ষা রাখে না, তা ফুঁড়ে বেরোয়, জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, চারদিক উদ্ভাসিত করে। তাহলেও আমার আক্ষেপ থেকেই যায়। *Das Kapital*-কে উপলক্ষ করেই বলি, বড়ো কষ্টকর এই বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিটোল স্থৈর্য এবং অভিনিবেশ নিয়ে পড়ে ওঠা, থেকে

থেকে জিরোতে হয়, ভাষার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়, কী বলা হচ্ছে একপাতা-দেড়পাতা অন্তর-অন্তর ভালো করে ভেবে, সাজিয়ে নিতে হয়। কোনও কোনও জায়গায় মনে হয়, একটু আগে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বুঝি সমানুকম্পা নেই; যে বিরাট কাঠামো মনে মনে দাঁড় করিয়ে নিয়ে মার্কস্ ভাষ্য লিখতে বসেছিলেন, ভাষার কর্কশ ভূখণ্ডে দীর্ণ-লাঞ্ছিত হতে হতে তা গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। *Das Kapital* দুরূহ গ্রন্থ আসলে নয়, দুরূহ করে লেখাও নয়, কিন্তু দুরূহ ভাষায় লেখা। অন্যথা আমাদের এত প্রতিহত হয়ে ফিরতে হত না, মার্কস্ যা বলতে চেয়েছিলেন তা বোঝবার জন্য, এই একশো বছর বাদেও, টীকা থেকে টীকান্তরে প্রব্রজ্যার কোনও প্রয়োজনই থাকত না, এবং এই গ্রন্থের প্রভাব আরও বহুগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে ব্যাপ্তি পেত।

অনুবাদেও তেমন-কিছু সুরাহা হয় না। তথ্যকে আর এক ভাষায় স্বচ্ছন্দে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া চলে, কিন্তু, যেমন কবিতা আসে না, কল্পনার সূক্ষ্মতর কারুকর্মগুলি ধরা দেয় না, তত্ত্বও তেমনি প্রকাশের অপূর্ণতায় স্থিত থাকে। প্রত্যেক দর্শনেই একটা আন্বীক্ষিক অবয়ব থাকে, ভাষাসূত্রের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। আমরা বড়ো জোর তত্ত্বের সারাংশটুকু ছেঁকে নিয়ে অন্য ভাষায় পরিবেশন করতে পারি, কিন্তু মৌলিক ভাষ্যের সেই নিখাদ ভাস্কর্য ভাষান্তরে অধিকাংশ সময়েই অনুপস্থিত। কট্টর মার্কস্‌বাদীরা আমার এই অনার্য, অনার্ষ উক্তিতে কুপিত হবেন, কিন্তু অবয়বের আকর মানতেই হয়, এবং মানতে হয় সবচেয়ে বেশি মার্কসের নিজের রচনাবলির প্রসঙ্গে।

এবংবিধ বাগাড়ম্বর *Das Kapital*-কে সম্মান জানাবার উপলক্ষ ব্যবহার করে আমি করছি, কারণ আমার সন্দেহ, অনুবাদে এবং অনুবাদের অনুবাদে, বইটির নিহিত ঐশ্বর্য ক্ষুণ্ণ থেকে ক্ষুণ্ণতর হয়েছে, অথচ আদিপাঠে সে-ঐশ্বর্য আহরণ করতে এগোলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এখানেই অবাক হবার পালা। কারণ তা সত্ত্বেও, দেশ থেকে দেশান্তরে, মহাদেশ ছাপিয়ে অন্য মহাদেশ, দশকের পর দশক ধরে, অহরহ, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, পণ্ডিত শ্রমিক নেতা অধ্যাপক কর্মী শিল্পী রাজনীতিক ধনবিজ্ঞানী সমাজতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ববিদ সাধারণ গৃহস্থ কবি শিল্পী কৃষক সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ ঐতিহাসিক ধর্মনায়ক কাতারে কাতারে জড়ো হয়েছেন, এই বইয়ের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে উপলব্ধিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, নিজেদের ভাবনার কল্পনার অনুলেপে বইটি থেকে আপাত জ্ঞানাহরণ করে তৃপ্ত-কৃতার্থ বোধ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-বই অনন্য।

না, ধর্মগ্রন্থের প্রসঙ্গও প্রক্ষিপ্ত, তুলনা চলে না। *Das Kapital*-এর পূর্ণতা অখণ্ডতা-ব্যাপ্তি কোনও ধর্মগ্রন্থেই নেই। বেদ উপনিষদে কবিতার গীতলতা আছে, সমাজসংস্থা নিয়ে চিন্তাও আছে, কোন উপলক্ষে গোমাংস ভক্ষণ প্রেয়, সে সম্বন্ধেও হয়তো নির্দেশ পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাচীন জ্ঞানের নির্ভর কতদূর আর এগোনো যায়, অনেক কিছুই তো নেই, ধনবিজ্ঞানের এমন কোনও নির্দেশ নেই যা আমরা, ঈষৎ পরিশীলন করে নিয়েও হালের পৃথিবীর সঙ্গে পারম্পর্য-সম্পর্কে স্থাপন করতে পারি, এমন কোনও আন্বীক্ষিক প্রজ্ঞাও নেই যাকে স্থান-কাল থেকে বিমূর্ত করে নিয়ে সমকালীন প্রসঙ্গের বিশ্লেষণে নিযুক্ত করতে পারি। বাইবেল পর্যন্ত, তার বিরাট বিস্তার সত্ত্বেও, তুলনায় সংকীর্ণ : লোকগাথা প্রচুর, নানা অধ্যায়ে বিচ্ছুরিত দর্শনকণার অভাব নেই, কিন্তু ইতিহাস কীভাবে এগোয় তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। মানুষের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনে যে নানা ধরনের সমস্যা প্রতিনিয়ত দেখা দেবে—অর্থনীতির সমস্যা, রাজনীতির জটাজট, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পর্কের অয়নযন্ত্রণা—তাদের মুখোমুখি হতে হলে কোনও স্বয়ম্ভর চিন্তার আশ্রয় প্রয়োজন, একটি অখণ্ড কাঠামোর প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি একটার-পর-আরেকটা নেড়ে-চেড়ে দেখা যেতে পারে, পরিশ্রম পণ্ডশ্রম, এরকম সম্পূর্ণ যুক্তির পৃথিবী কোনওটিতেই নেই; সহস্র ভাষাগত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও, *Das Kapital*-এ অথচ আছে।

এমন বলাও অগ্রাহ্য যে ধর্মগ্রন্থগুলি লেখা হয়েছিল দু'হাজার বছর কিংবা আরও বহু আগে, তাছাড়া তারা ধর্মগ্রন্থই, তাদের ভাষ্যে সমাজতত্ত্ব-ধনবিজ্ঞান-ইতিহাসবিচারের প্রকরণ খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা। ধ্রুপদী

সংজ্ঞায় যে-যে কীর্তি আমরা চিহ্নিত করি, তাদের কিছু কিছু লক্ষণ মেনে নিয়েই করি, কতিপয় কালাতীত গুণের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে করি। *Das Kapital* মাত্র একশো বছর আগে লেখা হয়েছিল বলেই তাতে এই কালজয়ী লক্ষণ আছে, তা আদৌ নয়; আরও একহাজার-দেড়হাজার বছর গেলে সেই লক্ষণ মিলিয়ে যাবে, তা-ও নয়। ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণের একটি বিশেষ প্রকরণ গ্রন্থটিতে দৃষ্টান্তিত, প্রকরণটি অব্যয়; একহাজার অথবা চারহাজার বছর পিছনে চলে গিয়েও প্রকরণটিতে এমনই অন্তর্লীন জাদু, সময়ের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে প্রবেশ-প্রস্থানের ব্যাখ্যানও তাতে বিধৃত। কোনও-এক বিশেষ সময়ের সংস্থানে দাঁড়িয়ে অবশ্যই ভবিষ্যৎ মানবসমাজের সহস্রমুখী সমস্যার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, ধর্মগ্রন্থগুলিকে এ-কারণে দুয়ো দিতে যাওয়াও তাই অহেতুক নির্দয়তা, কিন্তু *Das Kapital*-এ অন্তত আগে থেকে একটা ছক কাটা আছে। কোনও সমস্যাই তাই লজ্জা দেবে না, দর্শন এবং প্রকরণ মেশানো বিশ্লেষণের সূত্র প্রস্তুত, মার্কসীয় প্রজ্ঞায় একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর বিকশিত হবেই।

অবশ্য নাক-সিঁটকোবার মতো লোকের অভাব নেই। বলা হবে, *Das Kapital*-এ ব্যাপ্তি আছে, গভীরতার মূলে ঢুকে যাওয়া আছে, উদারতম ইতিহাসবোধ আছে, কিন্তু সব-কিছুই বড়ো বেশি সরল, বড়ো বেশি ছেলেভোলানো। বচন-প্রতিবচন-সংশ্লেষণের নিকষ বিন্যাসে কারও কারও ভক্তি নেই, আবার অন্য কারও কারও আপত্তি ভূতচৈতন্যবাদের দর্শনবৃত্তান্তে। কিন্তু বাণী না মেনেও ভক্তি সম্ভব : আমার নিজের আদর্শ-বিশ্বাসের সঙ্গে অন্বয় না ঘটলে নিশ্চয়ই পৃথগীকৃত বিবৃতি পেশ করব, অথচ সেই সঙ্গে যদি বুঝতে পারি যে-তত্ত্বের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না, যে-যুক্তিতে আমার বুদ্ধি সায় দিচ্ছে না, তাতে তথাপি মহত্ত্বের ছাপ আছে, তাহলে সন্নত নমস্কার জানানো আমার কর্তব্য। আসলে হেগেলীয় ঐতিহ্যধারক বিশ্লেষণশৈলী *Das Kapital*-এর প্রধান কথা নয়; এ শৈলী হাতের কাছে না থাকলে অন্য কোনও প্রকরণের সাহায্যে হয়তো মার্কস্ তাঁর ইতিহাস-সমাজ-ধনবিজ্ঞানচিন্তার কাঠামো রচনা করতেন, সৃষ্টির কাজে ঠেকে থাকত না। তাছাড়া, সারল্যে আপত্তি তোলাটা অতি দুর্বল যুক্তি। এত কথা বলার পর নতুন করে আরেক দফা স্পষ্ট করে বলা প্রায় হাস্যকর। *Das Kapital* আর যা-ই হোক সরল গ্রন্থ নয়, দর্শনের মূল সূত্রটি শুধু সরল। অভিজ্ঞান একপেশে নয়, অভিজ্ঞানকে বছরের পর বছর ধরে পরিচর্যা করে নিয়ে যে-মর্মপাঠ হল, তা একপেশে। ধর্মের ঘোষণা, বিশ্বাসের ঘোষণা একপেশে হতে বাধ্য। কিন্তু *Das Kapital* -এর ক্ষেত্রে অন্তত দরাজ গলায় এটা বলা চলে, বিশ্বাসের প্রকাশ বিজ্ঞানের সূত্র ধরে ঘটেছে। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস, আবেগ ও বুদ্ধি, চিন্তা ও অনুকম্পা, পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে গেছে। মানবসমাজের সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস এভাবে এক নিটোল-নিবিড় যুক্তি-শৃঙ্খলার নিগড়ে বন্দী করে আনা ব্রহ্মপ্রতিম কারুকীর্তি।

তাছাড়া, এপিকের ক্ষেত্রে যেমন, *Das Kapital*-এ চিন্তার অজস্র শাখা-উপশাখা ছড়ানো, তারা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, অথচ সেই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নিছক প্রতিভার ঝিকিমিকি দিয়েই যদি পরিচয় ঝালিয়ে নিতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটি উত্তীর্ণ; অন্যদিকে, যদি এতগুলি চিন্তাকে একটি বৃহৎ সংগতির মধ্যে যুক্ত করাই মহৎ সৃষ্টির পরিচায়ক হয়, তাহলেও কোনও স্খলন নেই। একসঙ্গে ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান; কিন্তু পাশাপাশি সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি আলাদা তত্ত্বের গহনে অণুতত্ত্বের উন্মোচন-বিশ্লেষণ-প্রসাধন। এবং এরকম না হলে *Das Kapital* মহৎ গ্রন্থ হতে পারত না, কারণ কীর্তির এই উভমুখিতা আসলে মানবসমাজের সংস্থান-বিবর্তনের প্রতিবিম্ব। সমাজ কোনও মুহূর্তেই এক জায়গায় থেমে থমকে দাঁড়িয়ে নেই : দুটো আলাদা অর্থেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই ইতিহাসের নিয়ম মেনে নিয়ে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিকতায় দীর্ণ হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, ফের সংঘাতে পিষ্ট হচ্ছে, ফের নতুন সত্তার নির্ভরে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সমান্তরাল পরিবর্তন ঘটছে সমাজের একেবারে মূলে, যে-মানুষের সমষ্টি নিয়ে আমাদের সমাজ, সেই সমষ্টির গভীরে। সামাজিক মানুষের পারস্পরিক বিনিময়সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে, কারণ এখানেও সংঘাত ঘটছে, সংঘাত ঘটছে কারণ সম্পত্তি ও ধনগত চেতনা শ্রেণী-বিভাজনের দায়ভাগভুক্ত, কোনও মানুষই এই শ্রেণীচেতনার আশ্রয়ে বাইরে নিরালম্ব থাকতে পারে না।

দুটো তত্ত্ব পাশাপাশি পা ফেলে : সামাজিক গতির তত্ত্ব, পুরুষগতি, প্রকৃতিগতি। এবং এই দুই গতির গহনে আরও অনেক অণুপ্রতিম গতির প্রবাহ, যে-প্রবাহের শেষে কিন্তু সেই বিশাল মোহানা: সমাজ, সমাজের ইতিহাসের ছক-কাটা ঢল বেয়ে ভবিষ্যতের সমুদ্রস্রোতের দিকে এগিয়ে চলা। ভূতচৈতন্যবাদে যাঁরা আস্থা রাখেন না, দ্বান্দ্বিক অন্বীক্ষায় যাঁদের অনীহা, ইতিহাস চেতনা যাঁদের কাছে জুজুবুড়ি, তাঁদের কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে জব্দ হতে হয়, *Das Kapital*-কে প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক, কুর্নিশ করতে হয়। অন্যসব-কিছু যদি পাশে সরিয়ে রাখা যায়, মার্কস্ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—মহান দার্শনিক ছিলেন—ঐতিহাসিক চেতনাসম্পৃক্ত ন্যায়রত্ন ছিলেন, এ-সমস্তই যদি ভুলে যাওয়া যায়, তাহলেও যা অবহেলা করা চলে না তা চিন্তার খণ্ডিত জগতেও তাঁর অপরূপ আশ্চর্য কর্মকুশলতা।

একটু বিশদ করে বলি, আমি ক্ষুন্নিবৃত্তি করি জ্ঞানের যে-শাখার বেসাতিতে, সেই ধনবিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে। *Das Kapital*-এর তাত্ত্বিক কচকচি বাদ দিয়ে দেওয়া হল, সামাজিক বিবর্তনের প্রসঙ্গ নির্বাসনে পাঠানো হল, কোনও সমাজব্যবস্থার আর্থিক কাঠামোতে কী করে চিড় ধরে, কী করে নিহিত বৈপরীত্যের চাপে তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে, তা-ও খুব ভালো করে উপলব্ধিরশরীর থেকে লেপে মুছে দেওয়া হল, কিন্তু তাহলেও মার্কস্ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী থেকেই যাবেন। কারণ অখণ্ড স্থপতি গড়ার প্রয়োজনে অর্থনীতির যে-কটি ছোটখাটো তত্ত্ব তাঁকে উত্থাপন করতে হয়েছিল, তাদের উৎকর্ষের তুলনা নেই প্রকরণের শাখানদী-উপনদী যে-কটি তাঁকে স্রোতস্বিনী করতে হয়েছিল, ধনবিজ্ঞানে তাদের উচ্ছলতা চোখ-বুদ্ধি-মেধা ধাঁধিয়ে দেয়। ধনবিজ্ঞানের স্রেফ ব্যাকরণিক দিক নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় মার্কসের ছিল না, স্থাপত্যের যে-আদর্শ তাঁর ধ্যানবস্তু, তার প্রয়োজন মেটাতে নেহাৎ যেটুকু অভিনিবেশ না করলেই নয়, তার বেশি নিজেকে তিনি ধনবিজ্ঞানের প্রাকরণিক অরণ্যে জড়াননি। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণিতের চর্চা তিনি করেননি, একেবারে হালে ধনবিজ্ঞানে গাণিতিক সূত্র বেছে নিয়ে, সিদ্ধান্তের অনুলিপি অহরহ বদলে নিয়ে, যে-ধরনের কালোয়াতি দেখানো হচ্ছে, তা তাঁর কাছে অসহ্য না ঠেকে যেত না। অথচ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মূল্যবান যে-কটি আবিষ্কার ও প্রাকরণিক ঝোঁক *Das Kapital*-এ সেই একশো বছর আগে তাদের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি। শ্রীযুক্ত শুম্পেটারের উৎসাহের প্রেরণায় এবং শ্রীযুক্ত লিওন্টিয়েফের অধ্যাবসায়ের কল্যাণে অর্থব্যবস্থা বিশ্লেষণের যে-শৈলী বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে সর্বখ্যাত হয়েছে, *Das Kapital*-এর দুই শাখামণ্ডিত উৎপাদনসংস্থার বিবরণে তার অঙ্কুর। কোনও স্থিত অর্থব্যবস্থার গতিপথে কেন বন্ধুরতা দেখা দেয়, চক্রায়ত পরিক্রমণ কেন অপ্রতিরোধ্য, একশো বছরের পুরনো এই বইতে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা। এমনকি মুদ্রাব্যবস্থার উদ্‌ভ্রান্ত হেঁয়ালি, মুদ্রার সংকোচন-সম্প্রসারণের সামাজিক প্রতিফল, ইত্যাদি নিয়ে *Das Kapital*-এ যে আলোচনা লিপিবদ্ধ, তার সঙ্গে মতভেদ সম্ভব, কিন্তু বিশ্লেষণের আঁটো পদক্ষেপ চমকিত না করে পারে না।

সব শেষে এক চূড়ান্ত সওয়ালের মুখোমুখি হতে হয়। যুক্তি থাক, প্রাকরণিক চমৎকারিত্ব থাক, বিশ্বাস থাক, দর্শন থাক, গভীর মানবিকবোধ থাক, *Das Kapital* তাহলেও তাচ্ছিল্যের বস্তু, কারণ ওই গ্রন্থে মার্কস্ যুক্তি, সাক্ষ্য এবং অন্বীক্ষার সাহায্যে যে-যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ফলেনি, যেখানে যে-বিপ্লব হিসেব কষে বলে দিয়েছিলেন, তা কেঁচে গণ্ডুষ। তাহলে এই বই নিয়ে মাতামাতি-লাফালাফি কেন, সমস্ত দর্শনই যদি অলীক প্রতিপন্ন হয়, তাহলে কী লাভ ইতিহাসবোধে বিস্তৃত-প্রসারিত হয়ে, কী লাভ ভবিষ্যতের রূপকথা রচনায়? কিন্তু এই জিজ্ঞাসারও উত্তর সোজা। মার্কসের বিয়োগ ঘটে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে : পৃথিবীর চেহারা তারপর এই পঁচাশি-নব্বুই বছরে অনেকটাই বদলে গেছে। অনেক তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে, পৃথিবীর অনেকগুলি দেশ জুড়ে, ঝাঁকে-ঝাঁকে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, নিছক জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়েছে। লেনিন রুশ দেশে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এক জাদু ঘটিয়ে দিলেন, তারপর বাকি পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ক্ষিপ্রবেগে এগিয়েছে, মাও-ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চিনে যা ঘটেছে ও ঘটছে তা ইতিহাসকে আরও জোরে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরই মধ্যে শোষণ

যাঁদের রক্তঅস্থিমজ্জাগত, দুটো গোটা মহাযুদ্ধে নিজেদের মধ্যে তাঁরা খাওয়াখাওয়ি করেছেন, ঈষৎ থেমে কিছুটা সামলে নিয়েছেন, কিন্তু ইতিহাস এই দ্বন্দ্বসন্ধি-কাহিনির চোরাগলিতে ঢুকে পড়ে স্বীয় সিদ্ধি আরও একটু এগিয়ে নিয়েছে। অন্যপক্ষে, মার্কস্ যা-যা ঘটবে মনে করেছিলেন, তার বেশ-কিছু সংঘটিত হয়নি, এই এতগুলি দশক বাদেও পশ্চিম ইওরোপে বিপ্লব পরাহত, উত্তর আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন নির্জীব-নিবীর্য, এবং বহু দেশের অভ্যন্তরে তথা বাইরে শোষণের ধারা অব্যাহত।

এ সমস্ত কিছুর জন্যই তো, আমার বিবেচনায়, *Das Kapital*-এর প্রতি বিমুখ হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের অভিভূত-সকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। গত আট-ন'দশকে এই পৃথিবীর চেহারা যদি এমন বিস্ময়জনকভাবে বদলে গিয়ে থাকে, তার কারণ ওই একটি গ্রন্থ। *Das Kapital* লিখিত হয়েছিল বলেই মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে গেছে। *Das Kapital*-এর মর্মকথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন ইউরোপ-আমেরিকায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল বলেই মার্কসের একটি সূত্রের গ্রন্থি ছিঁড়ে পড়ল, মজুরির হার নীচে ঝুঁকল না, বরঞ্চ বেড়েই চলল, ফলে যে-সংকট উপান্তে ছিল, তা অপসৃয়মান হয়ে হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই সংঘটনাকে *Das Kapital*-এর ব্যর্থতা বলে দাবি করার নিহিতার্থ ভাষার উপরে খামখেয়ালি।

সব কথার শেষ কথা, ওই বইটি লেখা না-হলে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় জাতীয় আন্দোলন অন্য রাস্তায় মোড় নিত, আরও অনেক হতাশ্বাস অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর শোষিত মানুষের দিনযাপন চলত। যদি দ্বান্দ্বিকতায় আস্থা রাখি, তাহলে এটাও আমাকে মানতে হয়, একশো বছর আগে যে-বই লেখা হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-অনুশীলনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে এই ব্যাখ্যারও প্রব্রজ্যা, বদলে যাওয়া আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে অহরহ নতুন করে বিশ্লেষণ। আসলে গ্রন্থটিও সমগ্রভাবে দেখলে একটি আদর্শের ভাস্বর প্রতীক, যে-আদর্শ অব্যয়, যে-আদর্শ ঘোষণা করে বহুতর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে মানুষ একদিন শ্রেণীহীন সংঘাতহীন অমরাবতীতে পৌঁছাবে, যেখানে সে, পরিণতির উপান্তে, মহত্তম, বৃহত্তম, উদারতম। এই একশো বছরেও এই আদর্শে সামান্যতম ফাটল ধরেনি, তাই *Das Kapital* যেমন উত্তুঙ্গ বিজ্ঞান, তেমনি নিখাদ মহাকাব্যও।

৫ম বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৪)

বিনয় ঘোষ

মেট্রোপলিটন মন

I sometimes think what future historians will say of us. A single sentence will suffice for modern man : he fornicated and read the papers. After that vigorous definition, the subject will be, if I may say so, exhausted.

The Fall, Albert Camus

কেবল রমণ করেছে এবং খবরের কাগজ পড়েছে, এমন এক জীব হল আধুনিক মানুষ । এই একটি বাক্যেই আধুনিক মানুষের 'ডেফিনিশন' শেষ হয়ে যায়, তারপর আর কিছু বলার থাকে না। দুটোই যান্ত্রিক অভ্যাস, কোনওটাতেই প্রাণ নেই, মন নেই — যেমন রমণ, তেমনি খবরের কাগজ পড়া।

তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি

পুলক হু তইসন জাগু

চুনি চুনি ভএ কাঁচুও ফাটলি

বাহুক বলঅ ভাঁগু ।।

ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো

বোলল বোল ন যায়।

'দেহের প্রস্বেদে (ঘামে) প্রসাধন ভেসে গেল, এমন পুলক জাগল যে কাঁচুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফেটে গেল, বলয় ভাঙল। বিদ্যাপতি বলছেন, তারপর যা হল তা আর বলা যায় না, হাত কাঁপছে।' তখন কবিরও হাত কাঁপত ' সেই' কথা লিখতে। এখন আমাদের হাত কাঁপে না। অটোমোবিলের মতো অটোমেটিক লেখায় আধুনিক মানুষের জীবনের কথা অনর্গল বলা যায়। অথচ মানুষের সেই দেহ তো দেহ-ই আছে, কিন্তু প্রস্বেদ নেই, যা আছে তার নাম দুর্গন্ধ ঘাম। অথচ সেই মানুষের গোনাগুনতি নার্ভগুলো একই আছে, একটিও বাড়েনি বা কমেনি—কিন্তু সেই রোমাঞ্চ নেই, সেই পুলক নেই, সেই শিহরন নেই, যার ঝংকারের প্রতিধ্বনিতে একদা কাঁচুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ফেটে যেত, একদা বাহুর বলয় খান খান হয়ে ভেঙে যেত। ক্লান্তি আর অবসাদের বেড়া দিয়ে ঘেরা স্নায়ুগুলো যেন জীবনের সমস্ত নিবিড় অনুভূতি থেকে বঞ্চিত, এবং মানুষ একটা নির্মম ঔদাস্যের দ্বীপে নির্বাসিত।

জর্জ সিমেল আধুনিক মানুষের এই মনোভাবকে বলেছেন 'blasé attitude'—নির্বাণ নয়, নির্বিকারত্ব বলা যায়। কোনও কিছুতেই 'বিকার' নেই। সমস্ত 'বিকার' ক্রাউডের বা জনতার, ব্যক্তি নির্বিকার। ব্যক্তিসত্তা জনতাপিণ্ডে বিলীন। মনে হয় যেন অসংখ্য অকেজো, অসাড় নার্ভের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রত্যেকের নার্ভেই সাড়া জাগে এবং একটা কী দুটো তারে তীব্র ঝংকার ওঠে। জনতার বাইরে এসে যখন 'ব্যক্তি' দাঁড়ায় তখন সে ভয়ংকর নির্জন। শুধু নির্জন নয়, দেহের নার্ভগুলো যেন তার একগোছা ছেঁড়া তারের বান্ডিল। বাইরের অবিরাম ধর্ষণে ও ঘর্ষণে তার স্নায়ুর শিরাগুলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে। এই 'intensification o nervous stimulation' হল, সিমেলের মতে, 'metropolitan type of individuality' -র বড়ো বিশেষত্ব। মহানাগরিক জীবনের গড্ডলপ্রবাহে ঘন ঘন উত্তেজনার উস্‌কানিতে স্নায়ুগুলো যদি দপ করে জ্বলে উঠে আর নিভে যায়, তাহলে জীবনের ব্যক্তিগত পরিবেশে কোনও মোচড়েই তার আর সাড়া জাগানো যায় না। শহরের রাজপথে ঘূর্ণিঝড়ে ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারের মতো স্নায়ুগুলো পড়ে থাকে, তার

ভিতরে কোনও 'কারেন্ট' থাকে না।

নার্ভে যখন 'কারেন্ট' থাকে না, তখন একটা মাংসের ডেলার মতো আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলি, যেমন মোটর চলে, ট্রাক চলে, টেম্পো চলে, স্কুটার চলে। খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করি। ব্যস্ততার চেতনা ছাড়া আর কিছু থাকে না। বাইরের কোনও দৃশ্য, কোনও দ্রব্য, কোনও ঘটনা মনে কোনও সাড়া জাগায় না। চলন্ত ট্রেনে অন্ধ প্যাসেঞ্জারের মতো বাইরের দিকে চেয়ে থাকি। চোখ অবশ্য আমাদের খোলা থাকে, চোখের মণিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য, দ্রব্যের পর দ্রব্য প্রতিফলিত হতে থাকে, কিন্তু চোখের মণি থেকে মনের মণিকোঠায় তা পৌঁছোয় না। চোখ থেকেই ঠিকরে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। মহানগরের রাজপথে নিরাশ্রয়, অসহায় মানুষের মৃতদেহ বাসি হয়ে শুকিয়ে পড়ে থাকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার পাশ দিয়ে চলে যায়, হয়তো ধাক্কা লেগে হোঁচট খায়, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। শহরের রাজপথে অভুক্ত মানুষের কাত্‌রানি অসংখ্য 'ভেহিকেল'-এর নিউম্যাটিক টায়ারের ঘরঘরানিতে ডুবে যায়, শোনা যায় না। প্রতিদিন জীবনের এই স্রোত বইতে থাকে, একঘেয়ে একটানা স্রোত—এক শব্দ, এক সুর, এক তান, এক তাল, এক ছন্দ। চোখের সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে আরও গভীরের যে হৃদয়ের গুহা, তার কোনও যোগাযোগ থাকে না। টেলিফোনের তারগুলো ছিঁড়ে যায়, চোখের রেটিনাতে রিং বাজে, মনে বাজে না। মনে যদি কখনও রিং শোনা যায়, সেটা ফলস রিং, হৃদয়ের গুহার সঙ্গে সংযোগের তারটি একেবারে 'ডেড' হয়ে থাকে, তার ফলে 'হৃদয়' নামক গুহাটি প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, প্যালিওলিথিক গুহার মতো তাকে খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু মহানগরের ইট-পাথর কংক্রিট-স্টিলের মধ্যে প্যালিওলিথিক গুহা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

কবি বোদলেয়ার তাঁর 'জার্নালে' লিখেছেন :

> I ask any thinking man to show me what now exists of life ....it is not ist political institutions that will especially characterize the universal ruin or universal progress---it matters little what name is given. The essesntial charecteristic will be the *Cheapening of hearts.*

যন্ত্রী যদি যন্ত্রের ব্যবহার না করে তাহলে যন্ত্রে মরচে ধরে যায়, তাতে আর কোনও কাজ হয় না। মহানগরের মানুষের কাছে হৃদয় পরিত্যক্ত। জীবনে ওই বস্তুটি তার কোনও কাজে লাগে না। সেখানে আর বাস করা যায় না, বাস করার প্রয়োজনও হয় না। নির্বংশ পরিবারের বাস্তুভিটের মতো শহুরে-মানুষের হৃদয়ে আজ ঘুঘু চরছে। একখণ্ড ইট, এক টুকরো পাথর, একটা লোহার রড, এক বস্তা সিমেন্ট—এসবের দাম আছে, হৃদয়ের কোনও দাম নেই। শহরের কোনও এক্সপার্ট নিলামওয়ালাও পাব্লিক অকশনে তাকে এক পয়সা দামেও বেচতে পারবে না। বোদলেয়ার তার সুলভতা দেখে বেদনা পেয়েছেন। আমার মনে হয় শুধু সুলভ বললে আজকের নাগরিক হৃদয়ের কথা কিছুই বলা হয় না। হয়তো বোদলেয়রের কালে, শতাধিক বছর আগে, বুর্জোয়া সভ্যতার সংস্পর্শে, বাজারের বহু পণ্যের প্রতিযোগিতায় হৃদয়-পণ্যের মূল্য কম ছিল, তখন এই কথাই ঠিক ছিল। কিন্তু এখন হৃদয় শুধু সস্তা জিনিসেরও অস্তিত্ব আছে, কিন্তু নাগরিক জীবনে হৃদয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। যে মহানগরে চোখ আছে মন নেই, মনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনও যোগ নেই, সেই মহানগরে খবরের কাগজ, প্রাচীর-দেওয়াল, মানুষের মুখ, —'everything sweats with crime.'

সকালে উঠে খবরের কাগজ দেখলে বোদলেয়রের বিবমিষা হত। আমাদেরও হয়, তবে ভোরে ঘুম ভাঙলে স্নায়ুগুলো যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন খবরের কাগজের উত্তেজক চোলাই দিয়ে একবার চারিয়ে নিয়ে সেগুলোকে জাগাতে হয়। এটাও নাগরিক জীবনের অনেক অভ্যাসের মতো একটা যান্ত্রিক অভ্যাস। সেদিন সকালে উঠে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ 'বোল্ড' টাইপের এই সংবাদটির দিকে নজর পড়ল :

SEARCH FOR CAR OWNER WHO SAVED A LIFE

By a Staff Reporter

A Bengali family of Calcutta is searching for a car with the number WBA 2280 to offer its thanks to its owner who saved from death the head of the family, a field-surveyor of the Geological Survey of India. The 44-year old field-surveyor had suffered a cornary stroke immediately after he had alighted from a tram at the crossing of Chowringhee and Red Road on his way to office on Tuesday morning. As he crouched on he road, many pedestrians and cars passed by without caring to look at him or help him.

Out of the stream of passing cars, one stopped. Its owner came out and lifted the disabled man into his car and took him to the G. S. I. Office on Chowringhee where the colleagues of the field-surveyor got him admitted to a hospital.

The Stateman, 10 July 1965

অটোর অনর্গল বন্যার মধ্যে WBA 2280 গাড়ির মালিককে আমিও অনেক দিন খুঁজেছি। কেন খুঁজেছি জানি না, তবে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পথ চলতে চলতে কেবল গাড়ির নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। 'পরশ পাথর' নয়, কিন্তু ওই ধরনের কিছু একটা যেন খুঁজতাম কলকাতার রাজপথে। নির্জলা মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস? চারদিকের পাথর আর লোহার মধ্যে জল কোথায়?

এখানে জল নেই, শুধু পাথর
কালো পাথর, জল নেই, অনাবৃত মরুপথ
পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথ
পাথর-ঢাকা পাহাড়ে এক ফোঁটাও জল নেই—
জল যদি থাকত,
আমরা দাঁড়াতাম,
একটু জল খেতাম।
কিন্তু পাথরের বুকে কি কেউ দাঁড়াতে পারে?
না একটু ভাবতে পারে?
ঘামও শুকিয়ে যায়
পা দুটো বালিতে আটকায়।
যদি একটু জল থাকত
পাথরে
একটু জল
মৃত পাহাড়ের দাঁতে বা জিবে কোথাও জল নেই
এখানে কেউ না পারে দাঁড়াতে,
না পারে বসতে,
না পারে জিরোতে
এ পাহাড়ে স্তব্ধতাও নেই
কেবল খরা বিদ্যুতের গর্জন

এখানে একটু নির্জনতা নেই

শুধু লাল লাল ক্রুদ্ধ মুখের ভ্রূকুটি
আর দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ॥
মাটিঘরের ফাটা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে।
যদি একটু জল থাকত এখানে!
এবং যদি না পাথর থাকত—
অথবা পাথর থাকত
এবং জলও থাকত
একটু জল
ছোট একটা ঝরনা
পাহাড়ের বুকে একটা আবর্ত—অথবা
শুধু যদি জলের শব্দ শোনা যেত
ঝরঝর—
ঝিরঝির—

টি. এস. এলিয়ট অনুসরণে

পাথরের মধ্যে ২২৮০-কে দেখতে পাইনি। ২২৮০-র মালিক বা চালক যে-ই হোন না কেন, তাঁর চোখের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে আদিম অন্তঃকরণের সংযোগ ছিন্ন হয়নি।

সংবাদটা পড়ে মনে হল, মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, এই স্থূলকায় মহানগরে! যদি মহানগরের 'মাল্টি-স্টোরিড্ স্কাইস্ক্রেপার'-এর ইস্পাত-কঙ্কালের পাশে যে কোনও মানুষের হাড়ের কঙ্কাল দাঁড় করিয়ে দূর থেকে দেখা যায়, তাহলে শহরে মানুষ মাপার স্কেলটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন কেন, হাজার মানুষ কী লক্ষ মানুষ যখন এই অট্টালিকা-সারির কোল দিয়ে চলতে থাকে, তখন তার চুড়ো থেকে দেখলে মনে হয় যেন কীটের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কীটের মন নেই। কিন্তু কোনও অক্ষম অসহায় কীটকে অন্য কীটেরা ফেলে যায় না, সকলে মিলে তাকে বহন করে নিয়ে যায়। মহানগরের মানুষ তাও করে না। মৃত মানুষ, অবশ্যই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল মৃতমানুষ, মহানগরের শান-বাঁধানো পেভমেন্টে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। শুকনো গাছের ডালের মতো ঝড়বৃষ্টিতে রাজপথের পাশে পড়ে থাকে, তার পাশ দিয়ে লোকের স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু কীটের মতো কেউ তাকে বহন করে নিয়ে যায় না। দু'দিন পরে হয়তো কোনও প্রতিষ্ঠানের লোক এসে, অথবা কর্পোরেশনের ধাঙড়-ডোমেরা তার সৎকারের ব্যবস্থা করে। মহানগরে প্রতিষ্ঠান বড়ো, ইনস্টিটিউশন বড়ো, জনসভা বড়ো, জনতা বড়ো—ব্যক্তি ছোট, মানুষ নগণ্য। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব স্থূলকায় জনতার জড়পিণ্ডে বিলীন। মহানগরের জনস্রোতে প্রত্যেকটি মানুষ তাই নির্মম, নির্বিকার।

রেড রোড আর চৌরঙ্গির মোড়ে অসংখ্য অটোর উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের মধ্যে একটি গাড়িকে থমকে দাঁড়াতে হল। একজনকে তো দাঁড়াতেই হবে। একটি গাড়িও যদি না থমকে দাঁড়াত, ২২৮০ গাড়ির মালিক যদি অটোর বন্যায় নীরেট কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভেসে যেতেন, আরও সকলের মতো, তাহলে সমাজের হৃৎস্পন্দনটাই থেমে যেত। এখনও তা থেমে যায়নি বলে, উর্ধ্বশ্বাস ছুটোছুটির মধ্যে একজন গাড়ির মালিক থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। করোনারি স্ট্রোকে আক্রান্ত ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, চেতনা তাঁর ছিল না, তা না হলে এই অপূর্ব চলচ্চিত্র দেখে তিনি বলতেন—হোমো স্যাপিয়েন্স দীর্ঘজীবী হোক।

সেইদিনই সন্ধ্যায় এক অনভিজাত সাধারণ সরাবখানায় অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে, হাউলিং হট্টগোলের মধ্যে বসে, কলকাতা শহরের কথা ভাবছিলাম। কী আর ভাবব! ভিড়ের মধ্যে আমার নির্জনতায় আঘাত লেগেছে অনেকবার। এপাশ-ওপাশ থেকে অনেকের উলটো-পালটা প্রশ্নে অনবরত জর্জরিত হতে

হয়েছে। মুটে মজুর মধ্যবিত্ত, সকলের প্রশ্ন। ঠিক প্রশ্ন বলা যায় না। ক্লেদ আর গ্লানি, অবসাদ আর হতাশার একটা দরবিগলিত ধারা একনম্বর-দুনম্বর-তিননম্বরের অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারার মতো ঘরের মধ্যে বইছে। মানুষগুলো সব ক্রন্দনে-উল্লাসে কখনও গর্জে উঠছে, কখনও বা ককিয়ে উঠছে। কর্ণপটাহভেদী বজ্রনির্ঘোষ, তার সঙ্গে নেড়িকুকুরের নাকিকান্না।

এই চালে ভাই জীবনের শেষ,
এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ,
প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষে নয়,
নেড়িকুকুরের নাকিকান্নায়।

এলিয়ট অনুসরণে

হঠাৎ-উত্তেজনার অগ্নি-উদ্গিরণে ঘরের ভিতরটা চুল্লির মতো মনে হল, মুখ থেকে মুখে, দাঁত থেকে দাঁতে, আগুনের হলকা ছুটতে থাকল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। লাল আভাটা কালো হয়ে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মুখগুলো যেন ছাই হয়ে গেল। সকলের ভয় হল, আবার সেই বাইরের একঘেয়ে জীবনে ফিরে যেতে হবে ভেবে। জীবনটা সরাবখানা নয়। যদি তাই হত! তারা জানে, এই জীবনটার শেষ হবে—বজ্রের আওয়াজে নয়, নেড়িকুকুরের নাকিকান্নায়। তারা জানে, এই রাতটুকু ভোর হতে-না-হতেই, এই এক-দুই-তিন নম্বরের। নেশাটুকু কাটতে-না-কাটতেই আবার কাল থেকে কলকাতার ক্লান্তকর কলের চাকায় জীবনের সরাবটুকু সব আখমাড়াইয়ের মতো নিংড়ে বেরিয়ে যাবে।

ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম হাসপাতালে, চুপিচুপি বসে বসে সেই কথা ভাবছিলাম। হাসপাতালে রুগিদের করুণ আর্তনাদ শোনা যায়, শারীরিক যন্ত্রণার গোঙানি শোনা যায় সেখানে। বেদনার বোঝা, সারাদিনের ক্লান্তির পর, সরাবখানায় কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে রেখে, মনটা হালকা করা যায়। যদি সরাব না থাকত! সরাবখানা না থাকত! তাহলে হাড়েমজ্জায় ঘুণধরা এই সমাজটাকে মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে ছেয়ে ফেলতে হত। এই সব সরাবখানায় কতদিন কতলোককে দেখেছি অঝোরে কাঁদতে। কে বলেছে মানুষের মন নেই? মন যে ছিল বা আছে, তা এখানে বোঝা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো মনটা স্নায়ুস্তরের অনেক তলায় সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। স্তরের পর স্তর স্নায়ুর তলা থেকে তাকে খুঁড়ে বার করতে হয়। সরাব তাই করে সরাবখানায়। অভিজাতদের bar-হোটেলে এ দৃশ্য দেখা যায় না। সেখানে ককটেল আর টুইস্টের আবর্তে কালো টাকা ওড়ানোর উল্লাস শোনা যায়। বান্ডিল বান্ডিল নোটের লাটাই খুলছে, আর ফুর্তির ঘুড়ি উঠছে ফুরফুর করে, ব্লুফক্স আর স্কাইরুমের আকাশে, সাধারণের সরাবখানায় তা হয় না। সেখানে সারাদিনের মজুরি অর্ধেক খরচ করে মনের বোঝা নামানো হয়। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে, মানুষের মনকে টুকরো টুকরো করে, মানবসমাজকে যে কী বীভৎস পাগলাগারদে পরিণত করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ যে-কোনও সরাবখানায় গেলে বোঝা যায়।

আড়াইশো বছরের কলকাতা শহর চলচ্চিত্রে মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল। দুশো বছর আগেও কলকাতা শহরে অনেক ট্যাভার্ন ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল ইংলন্ডের জনসন-যুগের ট্যাভার্নের মতো। একালের সরাবখানার মতো জীবনের নালা-নর্দমার সংগম ছিল না সেকালের ট্যাভার্ন। সেই ট্যাভার্নও আর নেই, সেই কলকাতা শহরও আর নেই। জোব চার্নক আর জনসনের যুগ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। পুরো আঠারো শতক, পুরো উনিশ শতক পার হয়ে বিশ শতকের বার্ধক্যে পৌঁছেছি আমরা। ৬৭ বছর বয়স হল বিশ শতকের। কলকাতা শহরেরও, বয়সের দিক থেকে, অতিবার্ধক্য। বার্ধক্যজনিত ভীমরতি ও জরার চিহ্ন তার মনে, তার সর্বাঙ্গে। চার্নক থেকে কুমোরটুলির কালা-নায়েব গোবিন্দরাম মিত্র ও

শোভাবাজারের নবকৃষ্ণের আমল পর্যন্ত গোটা আঠারো শতকের কলকাতাকে নাগরিক সভ্যতার আদিযুগ বলা যায়। নতুন ইংরেজ রাজাদের রাজসভা, প্যারেড, আর বর্ধিষ্ণু রাজধানীর নতুন-পুরাতনের মিশ্ররূপ তখন ছিল কলকাতা শহরের বড় বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের নগরের সমস্ত উত্তরাধিকার নিয়ে কলকাতার নাগরিক পত্তন হয়েছে, এবং তার বাল্যকাল ও কৈশোরও কেটেছে। কলকাতার অধিকাংশই ছিল তখন গ্রাম্য প্রাকৃতিক নিদর্শনে ভরা। ধানখেত পুকুর বাঁশবন পথে বেরোলেই দেখা যেত। সবুজের অভাব ছিল না। গোবিন্দরাম আর নবকৃষ্ণরা তাই সতেজ সজীব মন নিয়ে বেঁচে ছিলেন। কর্ম-অপকর্ম যাই করুন তাঁরা, জ্যান্ত মানুষের মতো করেছেন। প্রতাপ ও প্রাণ দুই-ই ছিল তাঁদের। চার্নক যখন কুঠি বাঁধতে এসেছিলেন, কলকাতার গ্রামগুলোতে তখন আট হাজারের মতো লোক থাকত। আঠারো শতকের গোড়াতে গ্রামগুলোতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক হল, এবং শুধু ইংরেজদের এলাকায়—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা এই তিনটি গ্রামে—লোক হল প্রায় পনেরো হাজার। আরও পঞ্চাশ বছর পরে, উনিশ শতকের গোড়ায়, কলকাতার লোক হল পাঁচলক্ষ। এই পাঁচলক্ষ লোক নিয়ে ওয়েলেসলির আমলে কলকাতা মধ্যযুগের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলে আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করতে থাকল। তার পথঘাট ঘরবাড়ি বদলাতে আরম্ভ করল।

পুরো উনিশ শতকে দেখা যায় লোকসংখ্যা খুব বাড়েনি, একশো বছরে দ্বিগুণও হয়নি, পাঁচলক্ষ থেকে সাড়ে আটলক্ষ হয়েছিল (১৯০১)। কলকাতা শহরের বাড়ি-ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেও তার বিকাশের একটা হদিস পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা শহরে একতলা বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ছ-হাজার, দোতলা প্রায় সাড়ে ছ-হাজার, তিনতলা প্রায় সাতশো, চারতলা দশটি, পাঁচতলা একটি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (১৯০১) এই বাড়ির সংখ্যা বেড়ে হয়—একতলা বাইশ হাজার, দোতলা তেরো হাজার, তিনতলা তিন হাজার, চারতলা তিনশো, পাঁচতলা একুশ খানা। বর্ধিষ্ণু শহরের বসবাসের কোনও সমস্যা উনিশ শতকে দেখা দেয়নি। ওয়েলেসলির আমল থেকে লটারি কমিটি, নগর উন্নয়ন কমিটি এবং তারপর কর্পোরেশনের কাজকর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, মানুষের নতুন সামাজিক জীবনের তাগিদে অন্যান্য দেশে যেমন আধুনিক শহরের বিকাশ হয়েছে; আমাদের দেশেও আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতায় তাই হয়েছিল : 'cities arise out of man's social needs and multiply both their modes and their methods o expression.' (Mumford)। সামাজিক প্রয়োজনের বৈচিত্র্য এবং সেই প্রয়োজন পরিতৃপ্তির কলাকৌশলের জটিলতা শহরে ক্রমে বাড়তে থাকে। শহরের সময় (time) অফুরন্ত নয়। অজ্ঞাতসারে ঢিমেতালে, সূর্যের প্রদক্ষিণের ছন্দে শহরের সময় কাটে না। কোনও একটিমাত্র 'বর্তমান'এর স্বেচ্ছাচারিতা শহরে নেই, কোনও একটিমাত্র 'ভবিষ্যত'এর একঘেয়েমিও নেই, যে ভবিষ্যৎ অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সময় শহরে প্রতিটি সেকেন্ডের টুকরোয় ভাগ করা এবং প্রতিটি সেকেন্ডের অর্থমূল্য আছে। তাই প্রতিটি সেকেন্ডের রং বদলায়। বহু বিচিত্র রঙে রঙিন, বহু বিচিত্র ছন্দে আন্দোলিত শহরের সময়তরঙ্গ। তারই বর্ণচ্ছটা নতুন শহরের মানুষের জীবনে প্রতিফলিত। যেমন সময় তেমনি কর্ম। ছক-বাঁধা কর্মের শৃঙ্খলে শহরের মানুষের জীবন বংশানুক্রমে বাঁধা থাকে না। কুলগত বন্ধন ছিন্ন করে কর্মময় জীবন সমাজের বহুমুখী দিগন্তবিস্তৃত পথে ধাবিত হয় :

> through its complex orchestration of time and space, no less than through the social division of labour, life in the city takes on the character of a symphony...
>
> Mumford

জীবনের এই সিম্ফনি উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরে শোনা গিয়েছিল। সময়ের রং ও সামাজিক কর্মের ছন্দের মধ্যে তখন একটা সংগতি ছিল। এই সিম্ফনি ও সংগতির ফল হল উনিশ শতকের নবজাগরণ। যদিও তার ভিত দৃঢ় ছিল না ঔপনিবেশিক পরিবেশে, তাহলেও নতুন মানুষের নতুন জীবনের চলার ছন্দে ও সুরে নবযুগের একটা নতুন ঐকতান সমগ্র সমাজ-জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ঘোড়া ও

স্টিম-ইঞ্জিনের গতি দিয়ে জীবনের গতি তখন নিয়ন্ত্রিত হত। বর্তমান বিশ শতক থেকে এই সিম্ফনির সুর বদলাতে থাকে। ১৯০১ সালের সাড়ে-আট লক্ষ লোক ১৯২১ সালে হয় নয় লক্ষ, ১৯৩১ সালে এগার লক্ষ, ১৯৪১ সালে একুশ লক্ষ, ১৯৫১ সালে পঁচিশ লক্ষ, ১৯৬১-৬৬ সালের মধ্যে চল্লিশ বছরে, দশ-বার লক্ষ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, এমন কিছু বেশি নয়। মহাযুদ্ধের পর, গত কুড়ি বছরের মধ্যে, কলকাতার লোকসংখ্যা এত বেড়েছে যা তার আগের দুশো বছরেও বাড়েনি। প্রায় আট কোটি লোকের কণ্ঠের আওয়াজে বেঠোফেনের সিম্ফনি যে আর শোনো যাবে না, অথবা কোন ভাগনার-বেঠোফেনের পক্ষেই যে আর সেই পুরনো সিম্ফনি 'কম্পোজ' করা সম্ভব নয়, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব কলকাতার লোকজীবনের নতুন সিম্ফনি যিনি বা যাঁরা রচনা করবেন, সেই সুরশিল্পীদের আজও আবির্ভাব হয়নি। যতদিন তা না হয় ততদিন কলকাতার জীবনে শোনা যাবে 'সিম্ফনি' নয়, কুৎসিত কর্কশ 'ক্যাকোফনি'।'

শহরের সবচেয়ে বেশি কর্মপ্রধান অঞ্চলকে 'down-town area' বলা হয়।

> The hub of the city is the down-town area of maximum land-rent, where sky-scrapers push upward and where the basic fuuctions of finance and government are carried on.
>
> Green।

কলকাতা শহরে এই ডাউন-টাউন অঞ্চল গত আড়াইশো বছর ধরে একটি অঞ্চলেই আছে। লালদিঘি অর্থাৎ ডালহৌসি স্কোয়ার কেন্দ্র করে ধর্মতলা পর্যন্ত ব্যাসার্ধ ধরে একটি বৃত্ত টানলে যে অঞ্চলটি হয়। সেইটাই কলকাতার 'ডাউন-টাউন' অঞ্চল। বিশ শতকের চল্লিশের মধ্যে কলকাতার মানচিত্রে এই অঞ্চলে স্কাইস্ক্র্যাপার বিশে, দেখাই যায় না। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে শতাধিক স্কাইস্ক্রেপার আকাশমুখো ঠেলে উঠেছে। শহরের মানুষের চোখের সামনে থেকে দিগন্তের রেখাটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে। মাথার উপরে নীল আকাশটুকুও ক্রমে ঢেকে যাচ্ছে। রাজপথের উপরে আকাশ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক পথেরই মতো, দুপাশে কংক্রীটের প্রাসাদে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। মনে হয় আকাশটা যেন একটা আয়না, কলকাতা শহর তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে। আকাশটা খণ্ড খণ্ড হয়ে আঁকাবাঁকা অলিগলি ও ছোটবড় রাজপথে পরিণত হয়েছে। পথ চলতে মাথার উপরে আকাশের এই টুকরোগুলোকে দেখা যায়। আকাশ যেখানে টুকরো হয়ে যায় দৃষ্টিপথে, মন সেখানে খোলা আকাশের মতো উদার থাকবে কী করে? শহরের মানুষ আকাশের উদারতা থেকেও বঞ্চিত।

আকাশ মাটি আর সবুজ। আকাশ খণ্ডিত। মাটি প্রায় অবলুপ্ত। যেমন বড়বাজারে মাটি কোথায়? চিৎপুরে? বউ-বাজারে? পিচ-পাথর-খোয়া বাঁধানো পথ, ইট-পাথর-লোহা-কংক্রিটের বাড়ি। মাটি নেই। কর্পোরেশনের আইন অনুসারে পাশে-পশ্চাতে হয়তো মাটি আছে চারফুট আর দশফুট, যেমন মাটি আছে শহরের পার্কে পার্কে। কিন্তু শহরের ইট-পাথর-লোহার কঠিন অবয়বের মধ্যে এই মাটি আর সবুজের টুকরোগুলোকে মামফোর্ড বলেছেন 'soiled handkerchief' বা নোংরা ময়লা রুমালের মতো। শহরের বুকে মাটি আর সবুজের স্পর্শ রাখার এই কঠোর প্রয়াস নিতান্তই হাস্যকর। এই পাথরের মরুভূমিতে পার্কগুলো মরূদ্যানের মতো বিরাজ করবে বলে একদা যাঁরা কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা আজ সেগুলির অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখলে শিউরে উঠবেন। পার্ক শুধু পার্ক নয়, খোলা বস্তি। শহরের যত ব্যাধিগ্রস্ত ভিখিরি, ছদ্মবেশী পলাতক চোর-ডাকাত-গুন্ডা, ভবঘুরে নিরাশ্রয় নোঙরহীন লোক, তাদের উন্মুক্ত ধর্মশালা কলকাতা শহরের পার্ক। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও শহরের এই পার্কগুলিতে, একটু খোলা জায়গা, এক টুকরো সবুজের উপর, একটু নিভৃতে, হয়তো একটা ফুলগাছের পাশে, অভিভাবকদের আড়ালে, অতি-সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে, শহরের তরুণ-তরুণীদের প্রথম প্রেমের রোমান্স জমে উঠত। এখন ভুলেও কেউ পার্কের দিকে পা বাড়ায় না। খোলা ময়দান, লেক বা গঙ্গাতীরের ক্ষণস্থায়ী বুফে, কফিহাউস রেস্তরাঁ বা হোটেল, অথবা কোনও মোটেল হল বর্তমান কলকাতার তরুণ-তরুণীদের give-and-take-এর আদর্শ

স্থান। প্রেম এখন 'ফিজিওলজিকাল অ্যাবারেশন', আর রোমান্স হল 'ইনস্যানিটির লক্ষণ'। কাজেই হোটেল অথবা মোটেল, তার স্ফুরণের চরম কেন্দ্র। কিন্তু যা বলছিলাম, পার্কের কথা। পার্ক এখন শহরের ঘৃণিত, উপেক্ষিত, আবর্জনাতুল্য মানুষের ডাস্টবিন, নোংরা রুমাল বললেও তাকে ট্রিবিউট দেওয়া হয়। পার্কের মাটি সুস্থ মানুষ স্পর্শ করে না। সকাল থেকে উঠে ম্যাকাডামাইজড রাস্তার উপর দিয়ে আমরা চলতে থাকি, ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসে যাই, অফিস থেকে বেরিয়ে ঘরে আসি, পায়ের তলায় মাটির ছোঁয়া লাগে না। দেহের সঙ্গে মাটির সংযোগ নেই। এক-কামরা দু-কামরা বড়ো বড়ো ফ্ল্যাটবাড়িতে আমরা থাকি, শান-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠি আর নামি, আট স্কোয়ার ফুট বারান্দায় টবে ফুলের বাগান করি। ছ-ইঞ্চি আট-ইঞ্চি টবের মধ্যেই প্রকৃতিকে বন্দী করে আমরা জীবনে সবুজের তৃষ্ণা মেটাই। টবের বাইরে কলকাতাকে মনে হয় ধূসর শহর, আমাদের ধূসর জীবনের প্রতিবিম্ব।

জীবনে আকাশ নেই, মাটি নেই। মহানগরের জীবনে। এক কামরার ফ্ল্যাটবাড়ির রুদ্ধ ঘরের টবের ফুলগাছের মতো শহুরে মানুষের মন। আকাশের সূর্যকিরণ তাকে স্পর্শ করে না। মাটির বুক থেকে সে রস সঞ্চয় করে না। একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে শুধু একটু কলের জল আর কয়লার ধোঁয়ার স্পর্শে তার বিকাশ হয়। এই নাগরিক মনে তাই ফুল ফোটে না। যদিও বা ফোটে, তাহলেও তার রং ও রূপ বিকৃত হয়ে যায়। এই টবের মন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য পালন করি মেট্রোপলিটন শহরে—

> Yet we have gone on living
> Living and partly living.
>
> *Eliot*

পরিপূর্ণ বেঁচে থাকি না, আংশিক বেঁচে থাকি। শহরের মানুষের এই বাঁচার জন্য কত অনুষ্ঠানের যে সমারোহ তা বলে শেষ করা যায় না। সিনেমা, ককটেল-বার, ঘোড়া দৌড়, ক্লাব-নাইটক্লাব, গেট-টুগেদার, জুয়ার আড্ডা, নেশার আড্ডা, শেয়ার মার্কেট— এ রকম বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আয়োজন। মেট্রোপলিটন শহরের মানুষের 'partly living'-এর আয়োজন। তাদের শতছিন্ন মন ও স্নায়ুর ছেঁড়া তারগুলোকে যতদূর সম্ভব উত্তেজনার মোচড় দিয়ে দিয়ে চাঙা করার কী নিদারুণ প্রয়াস! ঢালু পাহাড়ের গায়ে সিসিফাসের পাথরের বোল্ডার তোলার চেষ্টার মতো—প্রাণপণ ঠেলে খানিকটা তোলা যায়, তারপর আবার গড়িয়ে পড়ে। মনের ছেঁড়া তারগুলো যত বেসুরো হয়ে যায়, যত অসাড় ও শব্দহীন হয়, তত নাগরিক উত্তেজনার বৈচিত্র বাড়তে থাকে। সব উত্তেজনার বড় উত্তেজনা sex, কিন্তু তাতেও তেমন কাজ হয় না। নেশাখোর যখন সমস্ত নেশাকে জয় করে ফেলে—আফিম ভাং মদ কোকেন—তখন তাকে সাপের বিষ, অথবা তার চেয়েও বিষাক্ত কোনও ড্রাগ ইনজেকশন দিতে হয়। বিজ্ঞাপনে সেক্স, সিনেমায় সেক্স—শেষ পর্যন্ত সেক্সের ভাণ্ডারও শূন্য-প্রায়। বাকি থাকবে সেক্সের ইন্‌জেকশন্। বিষ হজম করতে করতে নীলকণ্ঠের মতো অবস্থা হলে হয়ত উত্তেজনার এমন ডোজ ইনজেকট করতে হবে যে রুগিই মারা যাবে। উত্তেজনার বালুচরে শহবের লোকের জীবনের এই সৌধ গড়ে তোলার চেষ্টা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। একে মামফোর্ড বলেছেন—'the sensation of living without the direct experience of life–a sort of spiritusl masturbation'। জীবনের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন, উত্তেজনা-নির্ভর এই বাঁচা হল এক ধরনের 'আত্মিক আত্মমৈথুন'।

জিওলজিকাল সার্ভের কর্মচারী ভদ্রলোক যদি ৪৪ বছর আগে করোনারি স্ট্রোকে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন কলকাতার পথে, তাহলে সারবন্দী ছ্যাকরা গাড়ি তাঁর চারিদিকে দাঁড়াতো এবং গাড়ি থেকে নেমে এসে যাত্রীরা তাঁর মাথায় মুখে জল দিত, ধরাধরি করে হাসপাতালেও নিয়ে যেত। আজ থেকে ৪৪ বছর আগেও কলকাতা শহর তার বর্তমান মেট্রোপলিটন-মেগালোপলিটন রূপ ধারণ করেনি। মানুষের সত্তার একটি নিভৃত কোণে তখনও 'মন' উঁকিঝুঁকি দিত। এমনকি অত্যাচারী নিষ্ঠুর শাসকদেরও—ফিউডাল যুগের

টাইর‍্যান্টদের মতো—মন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ প্রকৃতির আশীর্বাদ শ্রেণীনির্বিশেষে মানুষের উপর তখন কলকাতা শহরেও বর্ষিত হত, এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ উভয়ের স্পর্শে নির্জীব মনও কিছুটা সজীব হয়ে উঠত।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছিল 'ক্যালকাটা ক্রনিকল্' পত্রিকার প্রায় পৌনে দুশো বছর আগেকার একটি সংবাদের কথা। সংবাদটি এই :

> We are sorry to mention a shocking instance of inhumanity, which occurred in a lane in the Cossitollah, a few days since. A slave girl falling ill, was turned out of doors into an adjacent empty stable, damp and watery where though a small quantity of victuals was daily sent from the house, and by neighbours, she soon pershed from sickness and neglect.
>
> *The Calcutta Chronicle,* 11 Sept. 1792

বেশ বোঝা যায়, নতুন বুর্জোয়া যুগের কসাইদের কলকাতা শহরে নগর-জীবনের যে নাটক ভবিষ্যতে অভিনীত হবে, কসাইতলার আস্তাবলের ঘটনা তার পূর্বরঙ্গ মাত্র। মানুষের মন তখনও সাদা কাগজের মতো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়নি। অনুভূতির আঁচড় তার উপর একটু-আধটু পড়ত, যদিও ভগবানের ভাগ্যবান সন্তানরা সাধারণ মানুষকে পশুর চেয়েও অধম মনে করত। ক্রীতদাসী বালিকাটিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে একটি আস্তাবলে বন্দী করে রাখতে তার প্রভু কোন দ্বিধাবোধ করেনি, যদিও একমুঠো করে খাবার তাকে রোজ দেওয়া হত। অনুভূতির এই হিজিবিজি আঁচড়টুকু পরবর্তীকালে কলকাতার মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছে, ক্রমে যত কলকাতা 'polis'-এর স্তর থেকে 'metropolis'-এর স্তর অতিক্রম করে 'necropolis'-এর স্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

বিখ্যাত নগরবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস ধনতান্ত্রিক যুগের শহরের ছটি ক্রমবিকাশের স্তর নির্দেশ করেছেন :

প্রথম স্তর	Polis
দ্বিতীয় স্তর	Metropolis
তৃতীয় স্তর	Megalopolis
চতুর্থ স্তর	Parasitopolis
পঞ্চম স্তর	Patholopolis
ষষ্ঠ স্তর	Necropolis

মামফোর্ড Parasito-Patholopolis-এর দুটি স্তরকে একত্র করে 'Tyrannopolis' নাম দিয়েছেন, কারণ তিনি বলেছেন যে পূর্বোক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের মধ্যে কালের ব্যবধান বিশেষ লক্ষ করা যায় না। কলকাতা শহরের জীবনে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্তরের মধ্যে কালের ব্যবধান সামান্য, খুব বেশি হলে পঁচিশ-তিরিশ বছরের বেশি নয়। আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের তিরিশের শেষ পর্যন্ত (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু) কলকাতা শহরের বিকাশ প্রাথমিক 'polis'-এর স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রেলপথ গড়ে ওঠার ফলে কলকাতা শহর কেবল জলপথ-নির্ভর না হয়ে স্থলপথেরও বৃহৎ যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, এবং বিশ শতকের গোড়া থেকেই 'automotive era' সূত্রপাত হয়েছিল কলকাতায়, তাহলেও ১৯৩৯-৪০ সালের আগে পর্যন্ত কলকাতার দ্বিতীয় স্তরের মেট্রোপলিটন রূপটাই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি। তার কারণ, কলোনিয়াল শহর বলে কলকাতার অর্থনৈতিক আত্মবিকাশের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। পাশ্চাত্য শহরের মতো—লন্ডন প্যারিস বার্লিন নিউইয়র্ক প্রভৃতি—তাই কালক্রম বজায় রেখে, দুশো বছরের মধ্যেও, তার দ্বিতীয় স্তরের মেট্রোপলিটন জীবনেরই রূপান্তর ঘটেনি। অতি দ্রুত সমস্ত স্তর ডিঙিয়ে, একপুরুষের মধ্যে নেক্রোপলিসের দিকে তার যাত্রা শুরু হয়েছে। ভারতচন্দ্র-হরুঠাকুর-ভোলা ময়রার যুগ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত-মধুসূদন-হেমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ করে, মনে হয় কলকাতা শহর যেন রাতারাতি 'বীট' ও 'হাংরি' জেনারেশনের কবিদের যুগে পদার্পণ করেছে।

কলকাতার মেট্রোপলিটন স্তরের বিকাশ আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে দেখেছি। তারপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পর কখন যে এই মেট্রোপলিটন স্তর মেগালোপলিটন, প্যারাসিটোপলিটন ও প্যাথলোপলিটন স্তরগুলির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল, তা দাগ টেনে বলা যায় না। গ্রীন বলেছেন: 'the metropolitan area is not organised as a community. Separated social worlds pile up close to one another.' সমাজজীবনের অখণ্ডতা নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়—টুকরো টুকরো অনেক সমাজ গড়ে ওঠে, হয়তো অনেক কাছাকাছি, তবু মনে হয় যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। শহরের মেট্রোপলিটন দেহ ক্রমেই ফুলতে ফাঁপতে থাকে, দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। চারিদিক থেকে লোক যেন পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে থাকে শহরের দিকে—জীবিকার ধান্ধায়, অর্থের ধান্ধায়, আশ্রয়ের ধান্ধায়, স্বার্থের ধান্ধায়, এমনকি নির্ধান্ধার নৈরাজ্যে গা ভাসিয়ে দেবার ধান্ধায়। আঠারো বা উনিশ শতকে কলকাতা শহরের দিকে গ্রাম থেকে যে অভিযান হয়েছিল, তাকে বাস্তবিক 'অভিযান' বলা যায়। সে-অভিযান ছিল পর্বত অভিযানের মতো, সমুদ্র অভিযানের মতো। এ রকম অভিযান আঠারো শতকে কলকাতা শহর অভিমুখে রামমোহন করেছিলেন, কলকাতার বড় বড় প্রাচীন পরিবারের পূর্বপুরুষরা করেছিলেন। উনিশ শতকে পথের মাইলস্টোন গুনতে গুনতে বিদ্যাসাগর করেছিলেন, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তরা তরুণ বয়সে করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের মেট্রোপলিটন পর্বের ঠাসাঠাসি করে তারা বসবাস করে, শহরের সীমানা ভেঙেচুরে এগিয়ে নিয়ে যায়, কোথাও মানুষের বাঁচার মতো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। জনকুণ্ডলীর এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মেট্রোপলিটন শহরের বুকে ভেসে ওঠে। সেখানে বাতাস না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, ঘুম না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, আকাশের নীল বা সূর্যের আলো না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, চলার স্বচ্ছন্দ গতি না থাকলেও মানুষ বেঁচে থাকে, বাঁচার মতো খাবার না হলেও মানুষ বেঁচে থাকে। মেট্রোপলিটন শহরের এই বিচ্ছিন্ন জনতার ঘেঁষাঘেঁষি দ্বীপগুলিকে, মামফোর্ডের ভাষায 'do-wigthout areas' বা 'না হলেও চলে' অঞ্চল বলা যায়। না হলেও, না পেলেও কিছু, মানুষের জীবন এগিয়ে চলে। শহর বাড়তে থাকে, কিছু হাওয়ায় যেমন বেলুন বাড়ে তেমনি। কেবল যে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মতো মানুষ বসবাস করে তা নয়, মেট্রোপলিটন শহরের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান জনকুণ্ডলীর চাপে যত ফাঁপতে থাকে, তত ভিতরটা তার ফাঁপা হয়ে যায়। হাসপাতাল, স্কুলকলেজ, খেলার মাঠ, সিনেমা, হোটেল, যানবাহন, পথঘাট বাজার সর্বত্র স্ফীতকায় জনতার ভয়াবহ রূপ দেখা যায়। কোথাও স্থান নেই ছাত্র আছে, কোথাও স্থান নেই যাত্রী আছে। জনকুণ্ডলীর রূপ সব জায়গায় একরকম। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেন 'growth by civic depletion'—বিলীয়মান নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দ্রুতবর্ধমান নাগরিক বিস্তার। দেবালয় থেকে টাউনহল, অ্যাসেম্বলি থেকে কর্পোরেশন, পাড়ার মুদির দোকান থেকে নগরকেন্দ্রের সমবায়িকা ও ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সিনেমাহল থেকে খেলার ময়দান, কিন্ডারগার্টেন থেকে স্কুলকলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, বাস-স্ট্যাণ্ড রেলওয়ে স্টেশন—সর্বত্রই যেন জনকুণ্ডলীর নাভিশ্বাস উঠেছে। একমাত্র শহরের রাজপথে এই জনকুণ্ডলীর স্থান সংকুলান হয়, কিন্তু সেখানেও হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোকের মধ্যে কোনও 'direct sense of unity' নেই। অভিন্নতাবোধ আছে শুধু রাজপথে যান্ত্রিক যানবাহনের বিপুল স্রোতের সঙ্গে, যেখানে 'জনকুণ্ডলী' ও 'যন্ত্রকুণ্ডলী', ক্রাউড ও অটোমোবিল এক হয়ে 'জনযন্ত্র' হয়ে যায়। এই জনযন্ত্রের না আছে চোখ, না আছে মন, পথের পাশে কে করোনারি স্ট্রোকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তা দেখার মতো না আছে সময়—আছে কেবল উদ্‌ব্যস্ত শহরে হাপরের মতো দুটো ফুসফুসের ক্রিয়ায় নিঃসারিত নাভিশ্বাস আর নির্বিকার মনের জৃম্ভন।

মেট্রোপলিটন শহরে প্রকৃতির সবুজ নেই, আছে শুধু কাগজের কারখানার কাগজ। এই শহরে মানুষের স্বপ্ন পর্যন্ত কাগজ দিয়ে তৈরি। কাগজ আর সেলুলয়েডের স্বপ্ন, কাগজ আর সেলুলয়েডের আনন্দ। মেট্রোপলিটন শহরের মহাধ্বনি হল 'swish and crackle of paper' এবং মহাছন্দ হল যান্ত্রিক। কাগজের

ভিতর দিয়ে জীবনের সত্যকে প্রতিদিন এখানে দেখতে হয়। জীবনের যা কিছু কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা ধ্যান-ধারণা সবই কাগজের সঙ্গে যুক্ত। প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং হল মেট্রোপলিসের প্রধান শিল্প। ট্যাবুলেটিং মেশিন, জার্নাল, লেজার, কার্ড-ক্যাটালগ, ডিড-কন্ট্রাক্ট মর্টগেজ, প্রসপেকটাস, বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র—সমস্ত মিলিয়ে একটা প্রাত্যহিক কাগজের উৎসব। থিয়েটারে সাহিত্যে সংগীতে শিল্পকলায় ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি হয় এখানে কাগজে।

> The scholar with his degrees and publications, the actress with her newspaper-clippings, and the financier with his shares and voting proxies, measure their power and inportance by the amount of paper they can command.
>
> Mumford

মেট্রোপলিটন শহরে শাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, সবকিছু যে কত বিরাট ও ব্যাপক, কতখানি জনকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা কেবল কাগজের স্তূপ দেখলে বোঝা যায়। শহরে জলাভাব—কাগজের স্তূপ জমতে থাকল কর্পোরেশনে, সেক্রেটারিয়েটে। শহরে বাসস্থান নেই—ঘরবাড়ির পরিকল্পনাসহ কাগজের স্তূপ জমতে থাকল। পুলিশের নির্যাতন, কালোবাজারির মুনাফা, মনোপলিস্টের মুনাফা, মন্ত্রীদের অন্যায়-অবিচার, শিক্ষার গলদ, শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিযোগ—অনেক সমস্যা যখন জমা হয়ে উঠল, তখন একটার পর একটা তদন্ত-কমিশন বসল, মাসের পর মাস তদন্ত হল, হাজার হাজার পৃষ্ঠার নোট বিরাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, রেকর্ডরুমে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হল। কোনও মানুষ সেই রিপোর্ট পড়ল না, তার বিশাল চেহারার দিকে তাকিয়েও দেখল না, পড়া বা দেখা সম্ভব নয়, ধৈর্য নেই, সময়ও নেই। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কাগজে। সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত দাবি কাগজে মেটানো হল। কাগজের বুরোক্রেসি, কাগজের ডেমোক্রেসি, কাগজের ন্যায্য দাবি, কাগজের অভিযোগ, কাগজের ট্রাজেডি, কাগজের কমেডি, কাগজের খ্যাতি, কাগজের বিদ্যা, কাগজের স্কলারশিপ, কাগজের ঘৃণা, কাগজের প্রেম, কাগজের স্বপ্ন—বিরাট একটা কাগজের পাহাড় মেট্রোপলিটন শহর। অফুরন্ত একটা কাগজের রিলের দুঃস্বপ্ন মেট্রোপলিটন মানুষের জীবন।

> The world of paper, paper profits, paper achievements, paper hopes and paper lusts, the world of sudden fortunes on paper and equally grimy paper tragedies...
>
> Mumford

এই পণ্যময় কাগজময় অবাস্তব নাগরিক পরিবেশে জীবনের ভোগবিলাসিতা, সুখসাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-উল্লাস কখনও স্বাভাবিক বা সত্য হয় না। সমস্ত আনন্দ, সমস্ত উপভোগ, আয়াস ও বিলাস কেবল নিপাতনে ক্লেদনিঃসরণ মাত্র। স্বাভাবিক সুস্থ মনের স্ফূর্তি নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা 'Birth and Copulation and Death'-এর চক্রবৎ যান্ত্রিক আবর্তন। স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্ভোগও 'commercialized' এবং মেট্রোপলিটন শহরে যেহেতু অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা অনেক বেশি, স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন, আর্থিক ও সামাজিক কারণে, মরুমায়ার মতো অলীক ও অবাস্তব বলে মনে হয়, তাই সেখানে দেখা যায়

> a whole fabric of institutions based upon the commercial exploitation of sexual interests : whore-houses, dance-halls, burlesque shows and girl-shows, houses of assignation and hotels that serve the casusl cpople.
>
> Mumford

ঘরে স্থান নেই, রাস্তায় স্থান নেই, ট্রেনে-ট্রামে-বাসে স্থান নেই, অফিসে স্থান নেই, ইডেন-উদ্যান থেকে শ্মশান কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। সর্বত্র জনতার চাপ, জনতার উত্তাপ। চলার পথে কোথাও কোনওখানে পুরুষের পৌরুষ অথবা নারীর নারীত্ব প্রকাশের অবকাশ নেই। যেমন পুরুষ তেমনি নারী—ওয়েদারপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ, শকপ্রুফ, টাচপ্রুফ এবং স্বভাবতই অ্যান্টিম্যাগনেটিক। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর

জৈবিক ভেদাভেদও জনপিণ্ডের স্টিমরোলারের চাপে দলিত মথিত হয়ে যায়। কারও কোনও অঙ্গের সামান্য স্বাতন্ত্র্যবোধও থাকে না, কেউ যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, রবার ও প্ল্যাস্টিকের পুতুলের মতো একটা বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়ায় সকলে চলে ফিরে বেড়ায়, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরছে তো ঘুরছেই। দেহের সঙ্গে দেহের ঘাতপ্রতিঘাত অটোমেটিক যন্ত্রের মতো ঘুরছে। মেট্রোপলিটন শহরে 'the universal presence of crowds' হল অন্যতম নয়নাভিরাম নাগরিক দৃশ্য। লক্ষ মানুষ চলছে, নির্বিকার উদাসীন, জৈবিক আত্মরক্ষার চিন্তায় নিমজ্জিত। হয় অফিসের দিকে, না-হয় ঘরের দিকে চলছে। হঠাৎ হয়তো এমন সময় চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে একজন যাত্রী পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বিশ হাজার লোকের ভিড় জমে গেল, গলার শির ও হাতের মাসল ফুলে উঠল, একখানা দু'খানা তিনখানা বাস পুড়ে গেল, ড্রাইভার কনডাক্টার আধমরা অবস্থায় হাসপাতালে গেল, আশেপাশের দোকানপাট লুঠ হল, পুলিশ এসে টিয়ার-গ্যাস ছাড়ল, গুলি করল, বারোজন আহত ও চারজন নিহত হল, রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রী এসে প্রচণ্ড শব্দ করে বক্তৃতা দিলেন, জনতার কণ্ঠে বজ্রের মতো নিনাদিত হল 'তদন্ত চাই', কমিশন বসল, তদন্ত হল, দেড় হাজার পৃষ্ঠা কাগজে ছাপা এক রিপোর্ট বেরুল, কত টন কাগজ লাগল কেউ তার খোঁজ রাখল না, রিপোর্ট কেউ দেখল না, কারণ সেকথা তখন আর কারও মনে নেই। সামান্য উত্তেজনার শলাকা থেকে আরম্ভ, প্রচণ্ড উচ্চেজনার অগ্ন্যুদ্গিরণে ক্লাইম্যাক্স। তারপর স্তূপাকার ফাইল আর রিপোর্টের টন-টন কাগজের মধ্যে তার সমাপ্তি ও সমাধি। কোনও জীবন্ত মানুষ, অথবা মানবোত্তর জীব—কলকাতা যখন মহেঞ্জোদড়ো হয়ে দুশো ফুট মাটির তলায় চলে যাবে তখনও—এইসব ফাইল ও রিপোর্ট পড়ে দেখবে না। আকাশ থেকে মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণে কাগজের মেট্রোপলিটন শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছেঁড়া কাগজে কাগজ তৈরি হয়, কিন্তু ছাই দিয়ে কাগজও তৈরি হবে না।

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সান্নিধ্য মেট্রোপলিটন শহরে দ্রুত কমতে থাকে। সংযোগ ঘটে টেলিফোনে, বেতারে অথবা খুব বেশি হলে চিঠিপত্রে। দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব, উভয়ের মধ্যে অনেক কিছু লেনদেনও হয়, পরস্পরের নাম জানে, কিন্তু মুখ দেখেনি কেউ। কেউ মুখ চেনে, নাম জানে না, কেউ নাম জানে মুখ চেনে না। কাগজের বন্ধুত্ব, কাগজের সান্নিধ্য, বৈদ্যুতিক তারের বন্ধুত্ব, তারের সান্নিধ্য। মেট্রোপলিটন শহরে তাই জনসংযোগ ও জন-সমাবেশের একমাত্র উপায় হল 'উত্তেজনা'। খেলার মাঠের উত্তেজনা, সিনেমার উত্তেজনা, রাস্তাঘাটে যে কোনও দুর্ঘটনার উত্তেজনা, দাঙ্গা-স্ট্রাইক-মারামারির উত্তেজনা, ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনা, সাইকেল রেসের উত্তেজনা, মোটর-রেসের উত্তেজনা, কুকুর দৌড়ের উত্তেজনা, সাঁতারের উত্তেজনা, বক্সিং-কুস্তির উত্তেজনা, প্রদর্শনীর উত্তেজনা, মেলা ও বারোয়ারি পুজোর উত্তেজনা, ক্লাবে হোটেল সুরা-নৃত্যের উত্তেজনা, বাজারে-বাসে-ট্রামে-লোকাল ট্রেনে আর কিছু না হোক প্রচণ্ড তর্কাতর্কি থেকে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা। মোট কথা যা হোক উত্তেজনা কিছু একটা চাই, তা না হলে অসাড় অচৈতন্য নাগরিককে চেতিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সামান্য একটু উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ হলেই যথেষ্ট। তাই থেকে অগণিত জনসমাবেষ তারপর জনতায় অবশ্যম্ভাবী অগ্নিসংযোগ। মেট্রোপলিটন শহরে কেবল উত্তেজনার মহোৎসব, এবং তার সঙ্গে জনতার বহ্ন্যুৎসব। দেবালয় থেকে বিদ্যালয়, বিদ্যালয় থেকে বিধানসভা, বিধানসভা থেকে কর্পোরেশন, কর্পোরেশন থেকে স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশন ও বিদ্বৎসভা, সর্বত্র একই উত্তেজনার উৎসব চলতে থাকে। যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁদের সামাজিক মর্যাদা আছে, যাঁরা বরেণ্য, সভাসমিতি থেকে বিধানসভা পর্যন্ত তাঁদের যেরকম আচরণ ও ব্যবহার, রাস্তার উপেক্ষিত ড্রেনপাইপ-আঁটা বাউণ্ডুলেদেরও সেই একই আচরণ ও ব্যবহার। শহরের পাতালপুরীতে জুয়াড়ির ও মাতালের 'ডেনে' যে দৃশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে, অ্যাসেমব্লি ও পার্লামেন্টের ভূ-স্বর্গেও সেই একই দৃশ্য। মামফোর্ড বলেছেন, 'What was once called the herd instinct is in fact the residual sociality of the metropolitan crowd'। মানুষ যে আসলে জন্তু, এবং যূথচর জন্তু, এই সত্যটাই মেট্রোপলিটন শহরে প্রকট হয়ে ওঠে। উত্তেজনাবিতাড়িত বিকট জনসংযোগে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাইরের প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃতি এই কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে

বিকৃত হয়ে বিধ্বংসীরূপে প্রতিঘাত করে, প্রতিশোধ নেয়। তখন 'negative vitality'-র যাবতীয় উপাদান থেকে সঞ্জীবনী শক্তি খুঁজতে হয় শহরের মানুষকে। ড্রাগ, সিডেটিভ, হিপনোটিক, অ্যাসপিরিন, অ্যালকোহল কিছুই বাদ থাকে না। মনে হয়, পুরাণের নরকের বর্ণনা নিঃশেষ করে ফেললেও মেট্রোপলিটন শহরের রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না। জেমস জয়সের 'ইউলিসিস'-এর লিওপোল্ড ব্লুম-রা এই মেট্রোপলিটন নরকে বাস করেন। তাঁরা খবরের কাগজ পড়েন, হাই তোলেন, রেডিও শোনেন, কালীমন্দিরে পুজো দেন, তারকেশ্বরে নামত করেন, সরীসৃপের মতো কালোবাজারে চলাফেরা করেন, ঘুমের পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, দুঃস্বপ্নের কিল খেয়ে ধড়ফড় করে জেগে ওঠেন। মনে হয়, মেট্রোপলিটন শহর কলকাতা যেন একটা 'vast manless moonless womoonless marsh' এবং 'lugugugubrous' (James Joyce)।

তবু মেট্রোপলিটন শহর বাড়তে থাকে, ফাঁপতে থাকে, যেমন বর্তমানে কলকাতা শহর বাড়ছে তো বাড়ছেই, ফাঁপছে তো ফাঁপছেই। তাই তো হবে, কারণ, 'aimless acquistion : reckless expansion : progressive disorganization' (Mumford)—এই তিনটি হল মেট্রোপলিটন শহরের বড় লক্ষণ। লক্ষ্যহীন অনির্বাণ লোভ ও অর্জনেচ্ছা, কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রসারণ এবং ধারাবাহিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা মেট্রোপলিটন শহরে ব্যাধির উপসর্গের মতো দেখা দেয়। একদা প্রাচীন কলকাতায় 'ডাউন টাউন' অঞ্চলের কাছে, অর্থাৎ শাসন-বাণিজ্যকেন্দ্রের কাছে, কলকাতার অভিজাতপল্লী ছিল। তারপর কেন্দ্রস্থলের কোলাহল যত বাড়তে থাকে, অভিজাত ও বিত্তবানদের বসবাস তত কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। তার কারণ, সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে 'In general, the socil-economic status of citydwellers rises as residence is removed from the downtown area' (Green)। এই সময় কলকাতার চারিদিকে শহরতলির উৎপত্তি হতে থাকে। কলকাতার এই পুরনো শহরতলির মধ্যে ছিল সিঁথি কাশিপুর পাইকপাড়া চিৎপুর টালা উল্টোডাঙা সিমলা শুঁড়া শিয়ালদা ইন্টালি তপসে ডিহি-শ্রীরামপুর চক্রবেড়ে ভবানীপুর বালিগঞ্জ মুদিয়ালি সাহানগর টালিগঞ্জ ওয়াটগঞ্জ একবালপুর খিদিরপুর গার্ডেনরিচ প্রভৃতি অঞ্চল। উত্তর শহরতলি, দক্ষিণ শহরতলি মানিকতলা ও টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ছিল এইসব শহরতলি অঞ্চল। শহরের পুবদিকে, উল্টোডাঙা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত অঞ্চলে, কলকাতার ধনীলোকদের বড়ো বড়ো বাগানবাড়ি ছিল—ব্যারেটো, সুকিয়া, উমিচাঁদ, গোবিন্দরাম মিত্র, হুজুরিমল, শোভারাম বসাক ও বড়ো বড়ো সাহেবদের। গার্ডেনরিচ অঞ্চলেও ইংরেজদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল। বেলভেডিয়ার ও আলিপুরে ক্যাপ্টেনটালি (যিনি আদিগঙ্গার নালা কেটেছিলেন এবং যাঁর নামে টালির নালা ও টালিগঞ্জ) ও ওয়ারেন হেস্টিংসের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ছিল—বেলভেডিযার হাউস ও হেস্টিংস হাউস। ক্লাইভের বাগানবাড়ি ছিল দমদমে, টেলরের গার্ডেনরিচে, কর্নেল ওয়াটসনের ওয়াটগঞ্জে। ওয়াটসনের নাম থেকেই ওয়াটগঞ্জ হয়েছে। বেলগাছিয়ায় অকল্যাণ্ডের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ছিল, পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নেন, এবং তার পরে ঠাকুররা পাইকপাড়ার রাজাদের বেচে দেন। 'বেলগাছিয়া ভিলা' এখনও পাইকপাড়ার রাজাদেরই আছে। দক্ষিণের রসাপাগলা, বাঁশদ্রোনী, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেও সাহেবদের ও এদেশি বড়লোকদের বড়ো বড়ো বাগানগাড়ি ছিল। বাগানবাড়িগুলি দেখতে রাজবাড়ির মতো হলেও, সামন্তযুগের পরিবেশকে বিশেষ বিকৃত করেনি। কলকাতার পুরনো শহরতলি অঞ্চলে গ্রাম্য নিসর্গেরই প্রাধান্য ছিল—গ্রাম্য লোকের বাস, তাদের কুঁড়েঘর, বাগান, পুকুর, চাষের খেত, ধানজমি, আর মধ্যে মধ্যে অবস্থাপন্ন গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের একতলা-দোতলা পাকাবাড়ি। এই সমস্ত 'sacked' ও 'invaded' গ্রামের অধিবাসীরা তখনও জানত না যে শহরের ধনিক ও মধ্যবিত্ত বা বিবেকহীন ল্যাণ্ডস্পেকুলেটাররা ধীরে ধীরে তাদের গ্রামগুলি গ্রাস করে ফেলবে, ময়াল সাপের মতো, শহর তার দানবীয় বাহু বিস্তার করে এগিয়ে আসবে তাদের দিকে। তাই এসেছিল। উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতার পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের এইসব পুরনো শহরতলির অনেকটা অংশ কলকাতার সীমানাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

নতুন শহরতলির (new suburbia) বিকাশ হয়েছে গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে। পুরনো শহরতলির

সীমানা ভেদ করে, পতিতজমি আবাদীজমি, ধানখেত, জলাজমি, ডোবা, পুষ্করণী, জঙ্গল, বাগান ইত্যাদির উপর শহরের প্রবল জনজোয়ারের ঢেউ ক্রমাগত আছড়ে পড়েছে। হিংস্র হাঙ্গরের মতো একশ্রেণীর জমির স্পেকুলেটাররা শতগুণ হাজারগুণ মুনাফা করে new suburbis-র বৃদ্ধি ও বিস্তারের পথ পরিষ্কার করেছেন। পুরোনো শহরতলির মতো নতুন শহরতলিতেও জমির মুনাফাখোরদের শিকার হয়েছে গ্রামের অসহায় চাষিরা। তবে পুরোনো শহরতলি যেমন বসতি-গ্রামে আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে, খোলস পালটে শহর হয়েছে, নতুন শহরতলি তা হয়নি। নতুন শহরতলির ভিত গড়ে উঠেছে 'waste land' বা পতিত জমির উপর, যদিও তার মালিক বেশির ভাগ গ্রামের মধ্যবিত্ত চাষারা। প্রধানত কলকাতার দক্ষিণ ও পুবদিক হল নতুন শহরতলির বিস্তারের ক্ষেত্র। কলকাতা শহর এইভাবে মেট্রোপলিসের স্তর থেকে কখন যে মেগালোপলিসের স্তরে এবং সেখান থেকে প্যারাসিটোপলিস ও প্যাথোলপলিসের স্তরে এগিয়ে গিয়েছে তা বোঝা যায়নি।

এরমধ্যে কলকাতার নিজস্ব রূপের এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে বর্তমান যুগের তরুণ ও যুবকরা যদি মাত্র তিরিশ বছর আগের কলকাতা শহর সম্বন্ধেও কোনও ধারণা করতে চায়, তাহলে ফিল্ম বা ফোটোগ্রাফ দেখে তা করতে হবে। রাতারাতি যেন কলকাতা রূপকথার অতিকায় দানবের মতো রূপধারণ করেছে। 'Bigness and power' এবং 'Shapeless giantism'—অতিকায়ত্ব ও শক্তির ঔদ্ধত্য, কিমাকার স্থূলত্ব ও জড়পিণ্ডত্ব হল মেগালোপলিসের প্রধান বিশেষত্ব। কলকাতার অফিস-ইনস্টিটিউশন, সরকারি কোয়ার্টার, মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটবাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্ট-হাউস, সবই এখন আকাশমুখী, স্ট্রিমলাইন্ড—ইয়াঙ্কি-স্থাপত্যের নির্বুদ্ধি নিদর্শন। শহরের সর্বস্থানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে stanoardisation-এর সিলমোহর, এমন কি সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার ছাপ সুস্পষ্ট।

> Stanardization largely in pecuniary terms, of the cultural products themselves in art literature, architecture, and language...bigness takes the place of form : voluminousness takes the place of significance.
>
> Mumford

আকার বিরাট, অন্তঃসারশূন্য। সুন্দরশালপ্রাংশু সুপুরুষ, ভিতরে মন নেই। সুন্দর ছিমছাম যোলতলা বাড়ি, ভিতরে জীবনের উপাদান নেই। সুন্দর প্রচ্ছদ, বিশালকায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস—বর্তমান কলকাতার কথাসাহিত্যের নিদর্শন—কিন্তু ভিতরে শাঁস নেই। মেগালোপলিটন কলকাতায় ইটপাথরের দেহই হোক আর রক্তমাংসের দেহই হোক, তার স্থূলতা ও যান্ত্রিক শক্তির ঔদ্ধত্যের প্রকাশটাই বড়—voluminous কিন্তু significance নেই—অর্থাৎ সব আছে শুধু মনটা নেই।

মেগালোপলিস কলকাতা অজ্ঞাতে ও অতর্কিতে কখন যে গেডেসের প্যারাসিটোপলিস-প্যাথলোপলিস-এর স্তরে (মামফোর্ডের 'টিরানোপলিস') উন্নীত হয়েছে, তাও আমরা বুঝতে পারিনি। নেক্রোপলিসের (মৃতের শহর) পূর্বস্তরে কলকাতা শহর বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে পৌঁছে গিয়েছে। সাম্প্রতিক টিরানোপলিস কলকাতার, মামফোর্ডের ভাষায়, প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

> Failure of the economic and political rulers to maintain the bare decencies of administration : place-hunting, privilege-seeking, bonus-collecting, favor-currying, nepotism, grafting, tribute-exacting become rife both in government and business. Widespread moral apathy and failure of civil responsibility : each group, each individual, takes what it can get away with. Widening of he gap between producing classes and spending classes. Multi lication of a *Lumpenproletariat* demanding its share of bread and shows. Overstress of mass-sports. Parasitic love of sinecures in every department of life. Demand for 'protection money' made by armed thugs...organized looting, organized blackmail are 'normal' accompaniments of business and municipal enterprise. Domination of respectable

people who behave like criminals and of criminals whose activities do not debar them from respectability.

মামফোর্ডের প্রতিটি কথা বর্তমানের টিরানোপলিস কলকাতার জীবনে প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসকরা তাঁদের কাজকর্মে সামান্য শালীনতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না। যত রকমের নোংরামি, অসাধুতা ও অন্যায় আজ সরকারি ও বাণিজ্যিক জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। জীবন থেকে ন্যায়বোধ, নীতিবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নগরকর্তাদের নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বলে কিছু নেই। দল হোক, ব্যক্তি হোক, সকলেরই কাম্য ও লক্ষ্য হল 'ওলটপালট করে দাও, লুটেপুটে খাই।' যাঁরা উৎপাদন করেন আর যাঁরা বোগ করেন, সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। শহরের রাজপথ থেকে অলিগলি পর্যন্ত সর্বত্র লুচ্চা-গুন্ডা-অপোগণ্ডরা ডাস্টবিনের মাছির মতো ভন ভন করছে। গণতন্ত্রের যুগে লুম্পেনরাও পূর্ণাঙ্গ নাগরিক, দাবিদাওয়া তারাও দৃপ্তকণ্ঠে জানায়, mass-গণতন্ত্রের গড্ডলপ্রবাহে তারাও তাদের অধিকারের শ্লোগান দিতে দিতে চলে। দলবদ্ধ লুঠতরাজ; দলবদ্ধ রাহাজানি গুণ্ডামি হল মেট্রোপলিটন শহরের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক, এমনকি সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম উপসর্গ। এরকম নাগরিক সমাজে 'respectable' লোকেরা criminal-এর মতো আচরণ করতে কুণ্ঠিত হন না, এবং criminal-দেরও 'respectable' হবার পথ চারিদিকে খোলা থাকে।

মেট্রোপলিটন শহর তার সমস্ত অস্বাভাবিতার উপসর্গ নিয়ে দুরন্ত গতিতে চারিদিকের গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। সেইটাই হল সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ। গ্রামের আত্মরক্ষার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে তাকেও নিজের মতো নির্বিবেক ও নির্মনুষ করতে চায় মেট্রোপলিটন শহর। করার পথে কোন বাধা নেই। অটোমেটিভ যুগে রিবন-রোড রবিরশ্মির মতো শহর থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামাঞ্চলের দিকে— রেলরোড নয়, মোটররোড—শহরের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের বিষাক্ত জীবাণুর বাহক। পথের দৃশ্য একরকম, যেন মেট্রোপলিসের এক-একটা বিচ্ছিন্ন টুকরো, সেই ঘিঞ্জি বাজার, সিনেমা, লাউডস্পিকার, রাস্তার ধারে ধারে লুম্পেন ও সমাজবিরোধীদের চক্র, আর বিষফোঁড়ার মতো সারিবদ্ধ সব ব্লক-বাড়ি, টেকনলজিক্যাল যুগের নয়া-বস্তি। শিরা-উপশিরার মতো এইসব রিবন-রোডের উপর দিয়ে শহর থেকে গ্রামে নাগরিক ব্যাধির বীজাণু ছড়িয়ে পড়েছে, হাইস্পীড অটোর গতিতে। সেই একটানা একঘেয়ে জীবন, বিকৃত বেহাগে ক্লান্তিকর জীবনের বিষণ্ণতার প্রলাপ, সেই সেলুলয়েডি সুরে এবং কণ্ঠের ও যন্ত্রের মিলিত ক্যানেস্তারার আওয়াজ। এইভাবে মেট্রোপলিটন শহরের 'urban blight leads to rural blight'—নাগরিক জীবনের ধূসরতা গ্রাম্যজীবনের শ্যামলতাকে গ্রাস করে ফেলতে থাকে। শহরের মন গ্রামের মানুষের মধ্যেও বাসা বাঁধে। শহর থেকে গ্রাম ও শহরের চিরকালের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে মেট্রোপলিটন শহরের মানসিক শূন্যতা সমস্ত মনুষ্যলোককে যেন গ্রাস করতে উদ্যত হয়। মনে হয় মেট্রোপলিটন শহর থেকে মরুভূমি দূরে নয়। মনে হয়—

> এখানে থেকে মরুভূমি দূরে নয় সাহারায়,
> মরুভূমি তোমার আমার চারিদিকে,
> মরুভূমি তোমার পাশে চলন্ত ট্রেনের ভিড়ে,
> মরুভূমি মনে,
> মরুভূমি দূরে নয় সাহারায়।

অ্যালবিয়র কামুর 'Outsider'। মেট্রোপলিটন শহরের বিষবৃক্ষের ফল। অ্যালজিরিয়ান Meursault-এর মন একালের মেট্রোপলিন শহরের মানুষের মন। মা মারা গিয়েছেন, অফিসের কাজ থেকে Menrsault ছুটি নিতে এসেছেন। বস জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা কবে মারা গেছেন?' নায়ক Meursault উত্তর দিলেন : 'Mother died today. Or may be yesterday. I can't be sure.' উত্তরের মধ্যে নির্মম ঔদাস্যের সুর—'মা আজ মারা গেছেন। গতকালও হতে পারে। ঠিক বলতে পারি না।' প্রাত্যহিক জীবনের

প্রেমিকা তাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে ভালবাসো?' 'then she asked me again if I loved her; I replied, much as before, that her question meant nothing or next to nothing, but I suppose I did'nt.' 'মেয়েটিযখন বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমি তাকে ভালোবাসি কিনা, তখন আগের মতোই আমি তাকে বললাম যে তার এই প্রশ্ন আমার কাছে একেবারে অর্থহীন, তবু প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, 'আমার মনে হয় আমি ভালোবাসি না।' মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে যেমন, দিনসঙ্গিনীর প্রেমের ব্যাপারেও তেমনি, Meursault নির্মম উদাসীন। কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। মনটা সাদা কাগজের একটা রীল, কোনও কিছুরই ছাপ পড়ে না সেখানে। হত্যা করার জন্য Meursault-এর প্রাণদণ্ড হল। গম্ভীরকণ্ঠে প্রসিকিউটার জুরিদের সম্বোধন করে বললেন :

> Gentlemen of the Jury, I would have you not that, on the day after his mother's funeral, that man was visiting a swimming pool, starting a liaison with a girl and going to see a comic film. That is all I wish to say.

'আপনারা শুধু এইটুকু ভেবে দেখুন, এই লোকটি তার মায়ের অন্ত্যেষ্টির পর সেইদিনই 'সুইমিং-পুলে' যায়, একটি মেয়ের সঙ্গে স্ফূর্তি করে বেড়ায় এবং কমিক ফিল্ম দেখে। এর বেশি আর কিছু আপনাদের বলতে চাই না।' অর্থাৎ প্রসিকিউটার বলতে চান যে মায়ের অন্ত্যেষ্টির দিনেও যে-ব্যক্তি এরকম চিত্তবিনোদনে কালযাপন করতে পারে, তার আর যাই থাক, হৃদয় বলে কোনও পদার্থ নেই, মন বলে কিছু নেই। খুন করা তার পক্ষে কিছুই নয়।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামি Meursault নির্জন সেলে অপেক্ষা করছে। পুরোহিত এসে তাকে ধর্মবাক্য শোনাতে লাগল, মৃত্যুর আগে অনুশোচনায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলল। পুরোহিতের ধর্মের ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে Meursault-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হাতের মুঠোয় সজোরে পুরোহিতের কলার ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল : 'থামুন, চুপ করুন। ওসব অনেক শুনেছি। আমার কাছে কোনও জিনিসের কোনও মূল্য ছিল না কোনওদিন। কেন ছিল না তাও জানি। শুনুন—আমার ভবিষ্যতের অন্ধকার দিগন্ত থেকে সবসময় একটা বাতাস মৃদু অথচ স্থির গতিতে আমার দিকে বয়ে এসেছে। আসার পথে ওই বাতাসের গতিতে জীবনের ধ্যানধারণা, স্বপ্ন আশা কল্পনা সমস্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। আমার প্রাণদণ্ড হয়েছে, তাতে কী? সকলকেই তো একদিন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। বিচারকের এই দণ্ড থেকে কারো মুক্তি নেই। আপনি যে একজন ধর্মের যাজক, পুণ্যের বাহক, ঈশ্বরের দূত, আপনারাও মুক্তি নেই। তাহলে আপনার সঙ্গে আমার তফাত কি? আপনি পুণ্যবান বলে একদিন আপনার প্রাণদণ্ড হবে, অর্থাৎ আপনারও মৃত্যু হবে। আর আমি! আমি মার মৃত্যুতে কাঁদিনি, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে সুইমিং পুলে সাঁতার কেটেছি, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেছি, আর কমিক ফিল্ম দেখেছি। এই তো? কাজেই আমার মতো নিষ্ঠুর আর কেউ নেই, এবং খুন করা আমার কাছে হাত-মুখ ধোয়ার মতো। বিচারকে রায় দিয়েছেন, আজকেই আমার প্রাণদণ্ড হবে। ভালো কথা। আপনারও একদিন হবে, এবং দুয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায় আমি তো জানি না?

অনুশোচনা *Outsider*-এর জন্য নয়। যেমন Meursault, তেমনি হেমিংওয়ের Soldier's Home গল্পের নায়ক Mrebs—দুজনের একই নির্বিকার মেট্রোপলিটন মন। গল্পে মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন—

> 'Don't you love your mother, dear boy?'
> 'No', said Krebs.
> His mother looked at him across the table. Her eyes were shiny. She started crying.
> 'I don't love anybody', Krebs said.

এরপর Krebs-এর মা যখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি তোর মা, ছেলেবেলায় কোলে করে বুকে করে তোকে মানুষ করেছি, আর তুই এই কথা বললি?' তখন 'Krebs felt sick and vaguely nauseated.'

কলকাতা শহরে চৌরঙ্গি ও রেডরোড দিয়ে সেদিন যাঁরা যান্ত্রিক অটোস্রোতে ভেসে চলেছিলেন, করোনারি স্ট্রোকের যন্ত্রণায় কাতর ৪৪ বছরের ফিল্ড-সার্ভেয়ারের দিকে না চেয়ে, তাঁরা মেট্রোপলিটন শহরের Outsider, এবং Meursault ও Krebs-এর সগোত্র। তাদের দিকে চেয়ে মনে হয়—

যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়র মানবসাগরে।

জীবনানন্দ দাশ

মেট্রোপলিটন শহরে বৈদ্যুতিক আলোকাজ্জ্বল পথে জীবনের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, বিরাট এক অবক্ষয়ের মানবসাগরের দিকে প্রত্যেকটি মানুষ অটোর গতিতে ছুটে তলতে থাকে। মনে হয়—মেট্রোপলিটন মহানগরে—অ্যালিসের মতো :

Down, down, down. Would the fall *never* come to an end?

গ্রন্থপঞ্জি

Lewis Mumford : *The Culture of Cities* (3rd ed. London 1944)
Lewis Mumford : *City Development* (London 1946)
Lewis Mumford : *The Condition of Man* (London 1945)
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss ed. : *Cities and Society*–The Revised Reader in Urban Sociology (N. Y. 1963)
'Urbanism as a way of life' by Louis Wirth 'Metropolitan Dominance and integration' by Vance and Smith
'The Rise of Metropokitan Communities' by R. D. McKenzie.
'The Metropolis and mental Life' by George Simmel
'The Personality and as Urban Area' by James S. Plant
Patrick Geddes : *Cities in Evolution* (London 1915)
Arnold W. Green : Sociology : An Analysis of Life in Modern Society (4th ed. N.Y.1964)
Frank Lloyd Wright: *The Living City* (N. Y. 1958)
An Autobiography (N. Y. 1943)
Karl Mannheim : *Diagnosis of Our Time* (6th imp, Lond 1954)
William F. Ogburn : *Social Characteristics of Cities* (N. Y. 1937)
Census Report : Calcutta–1881m 1891, 1901, 1051 & 1961.
Calcutta Metropoliton Planning Organisation .
1. *First Report* 1962
2. *Basic Development Plan, Calcutta Metropolinan District* 1966-1986.
3. Regional Planning for West Bengal 1965
S. N. Sen : *The City of Calcutta*, A Socio-Economis Survey 1954-55 to 1957-68.

৫ম বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৪)

নীরদ মজুমদার

আমরা ও জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্

আগেভাগেই প্রচার করা সঙ্গত যে এ নিবন্ধ সংকল্প করা হয়েছে চিত্রশিল্পের দুই কৌণিক দৃষ্টির পটভূমিকায়, অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তির্যক ভেদ ও মিলনে যা মূর্ত। ফলত আলোচ্য বিষয়টি দুই দফায় জটিল; বলার কথা অনেক, সময় অল্প, আনুপূর্বিক সব কথা বলা সম্ভব নয়। তথাপি বক্তব্য যেটুকু সরল-ভাষায় সেইটুকুই মোটামুটি নিবেদন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আর একটি কথা যে আমাদের পরিস্থিতির মর্মে জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্ (Jean Dominique Ingres)-এর কথা প্রসঙ্গকথা। উপরন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পুনঃপ্ররোচিত একারণে যে এই বছর মতুবাঁ-র আচার্য অ্যাঁগ্র্-এর মৃত্যু শতবার্ষিকী।

সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা কর্তব্য, আমাদের বিংশ শতকের চিত্র আন্দোলন সরাসরি দুই বিপরীত নীতি ও পদ্ধতিতে বিভক্ত। ভেদ অতি তীক্ষ্ণ; যথা, গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জলরং হতে তেলরঙের চিত্রসৃষ্টি ও তার সংশ্লিষ্ট ঈক্ষণের রূপান্তরতায়ই চিত্রকলা প্রাক্‌যুদ্ধ ও উত্তরযুদ্ধ অধ্যায়ে চিহ্নিত। এবং সেটাই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের কারণ। বলা বাহুল্য, প্রাক্ ও উত্তর মহাযুদ্ধের যে কালভেদ তা সত্যিই বাস্তব। অবশ্য তার ব্যতিক্রম যে কুত্রাপি দর্শে না তা নয়। আগেও কিছু তৈলচিত্রকর ছিল যেমন এখনও জলরঙের চিত্র আঁকা হয়ে থাকে, হলেও তা আন্দোলন হিসাবে বা তার রসাত্মক মূল্যে নিতান্তই গুরুত্বহীন। বস্তুত সে সব সৃষ্টি আজ গৌণ।

ইদানীং, আমরা আসমুদ্রহিমাচল তৈলচিত্রের নবরূপে চঞ্চল, নতুন উপাদানগত ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। এটা সম্পূর্ণ এক নতুন ক্ষেত্র এবং রোমাঞ্চকর এক নব রঙ্গমঞ্চ।

আবার কোনওরূপ কিছু না করে এ কথা স্বীকার্য যে নব অধ্যায় যতই সুবিন্যস্ত হোক না কেন, তা কিন্তু যথোপযোগী ধ্যানধারণায় পরিপুষ্ট নয়, প্রায়শ বিশৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যবিহীন। একাধারে উপাদানগত বিভ্রাট ও অন্যত্র ঈক্ষণগত অন্ধতা সত্যিই পীড়াদায়ক এবং যথার্থ আক্ষেপের কথা। এবং আমারও ঐ এক আক্ষেপ, শার্ল পেগির মতোই, 'হায়, কেন কোনও মহান যুগে জন্মগ্রহণ করিনি।' যুগ বড় কথা, মহান যুগ অন্য কথা।

ইদানীং আমরা এক পঙ্গু অধ্যায় হতে আর এক খঞ্জ অধ্যায়ে এসে উপস্থিত, আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের অভিব্যক্তির তুলনায় তা মিথ্যা নয়। তবে এই নব উদ্যমের অন্তর্নিহিত যে সম্ভাবনা তা খুব বড় কথা; এককালীন সংক্রমণগত তীব্র অসুবিধা ও দৃশ্যমান অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকই ফেরে আবার সুযোগ ও সুবিধার পরিস্থিতিবলে গণনা করবে তারা, যারা কল্পনা-তেজ উদ্ভাসিত দুঃসাহসিক শিল্পী, নবযুগের সূচনায় যারা নিজেকে বর্তমানরূপে পাবে ও দাবিসুলভ জিদভরে ঘোষণা করবে 'আমি উপস্থিত'।

অধুনা কাজ, তা যত সামান্যই হোক না কেন, তার আরোপিত প্রভাব কিন্তু কম নয়। আমাদের তথাকথিত সাংস্কৃতিক জগতে কী ক্ষয় ধরিয়েছে, কী ধস এনেছে, তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এককালের সমালোচক, চিত্রামোদী, রসিক, যাঁরা সগৌরবে জোরকদমে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের পদতল হতে ধরিত্রী আজ দ্বিধা হয়েছেন। উপাদানগত বিড়ম্বনা ও ঈক্ষণগত পার্থক্য জলরং-প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের শ্বাসরুদ্ধ করেছে, তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাব যে কতখানি তা যে কোনও শিল্প আলোচনা বা সমালোচনার যে কোনও পত্রিকার পাতায় চোখ বোলালেই প্রকট হয়ে দেখা দেবে। একদা যাঁরা

বোদ্‌লেয়ার, এ্যাপলিনের সমকক্ষ আত্মাভিমানী, প্রাক্‌যুদ্ধের কেষ্টু-বিষ্টু, আজ তাঁরা অন্য জন্যকল্পে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং অতিশয় ভাণশীলতার ছদ্ম আয়েসে তাঁরা সমাধিস্থ। ইংরেজিতে যাকে বলে : They are bound through ignorance to ignore। এ অবস্থা কিন্তু শিল্পলোকের কম মুনাফা নয়।

এখন, একদিকে আমাদের নবযৌবনের আস্ফালনও কিছুটা বিসদৃশ সন্দেহ নেই; আমরা অল্পে তুষ্ট, কেউ কেউ লজ্জাকর অনুকরণ ও মেকি ব্যক্তিত্বের ভেঁপু-নিনাদে মুখর, তাদের সব লম্ফঝম্প যে নিছক হাস্যরসাত্মক এ বোধ তাদের শূন্য। শুম্ভ-নিশুম্ভরা আত্মসমালোচনায় পরাঙ্‌মুখ, কোনও মতেই একই কালে rapt and critical হতে পারার মতো বুদ্ধিবৃত্তি দুঃস্থ, এই হেতু চেতনাবান শিল্পসৃষ্টির উদাহরণ সর্বত্রই বিরল।

আসল কথা, তৈলচিত্র হিসাবে পাশ্চাত্যের যে সব সৃষ্টি হতে আমরা দীক্ষিত সে সৃষ্টির পিছনে যে অভিজ্ঞতা তা থেকে আমরা অন্যূনপক্ষে চারশত বৎসর পশ্চাৎবর্তী। অর্থাৎ যে কাল হতে তেলরঙের এবং সংলগ্ন ঈক্ষণগত ভাবের সূত্রপাত তা থেকে কয়েক শত বছর আমরা পশ্চাৎবর্তী, এই বিচারে যে, সেদিনই চিত্রকলা তার ক্ষেত্রগত দাবিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রয়াস পেয়েছে। এই হিসেবে বলা যেতে পারে, জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্ হলেন তার পথিকৃৎ। অর্থাৎ তাঁকে ঘিরেই চিত্রকলার শুরু। যাই হোক, একথায় আমরা আবার ফিরে আসব যথাসময়ে। আপাতত প্রথমে উপাদানগত কতিপয় সমস্যার কথা বিবেচনা করা যাক।

একদা, ফরাসিদেশে থাকাকালীন প্রায়ই শুনতে পেতাম মজার একটি ছড়াগান। ছড়াটি ফরাসিদেশের কী গ্রামে বা কী শহরে কী পারি-তে সর্বত্রই সব শিশুকণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে থাকে। কিন্তু সে গান যতই শিশুসুলভ হোক না কেন, তা যে কোনও চেতনাবান শিল্পীকে থমকিয়ে দাঁড় করাবে, শুনতে বাধ্য করবে :

আন্ এলেফাঁ স' ব্যলাঁসে সুর উন্ তোয়াল দারিনিয়ে,
লা প্যাঁতুর আ লুইল সে বিয়াঁ দিফিসীল্
মে বিয়াঁপ্লু বো ক'লা লা প্যাঁতুর আ লো।

অর্থাৎ, আন্ এলেফাঁ— একটি হাতি ; স'ব্যলাঁসে—দড়ির খেলা খেলছে ; সুর উন্ তোয়াল দারিনিয়ে— একটি মাকড়সার জালের উপর ; লা প্যাতুর আলুইল— তেল রঙের ছবি ; সে বিয়াঁ দিফিসীল্— তা অতীব কঠিন কাজ ; মে— কিন্তু ; বিয়াঁপ্লু বো ক'লা লা প্যাঁতুর আ লো— জল রং হতেও তা অনেক অনেক সুন্দর।

যদিচ গানটি একটি অতি সাধারণ নমুনা, তবু বুঝতে বাকি থাকে না, কী পরিমাণে কোনও বিষয়বস্তু একটি গভীরতর মজ্জায় প্রবেশ করলে এমত অভিব্যক্তির গান শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া সম্ভব। সত্যিই চিত্রকলার রহস্যভাষা এই ছড়ায় বিধৃত এবং ওই দুই পঙ্‌ক্তির মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে যে কোনও চিত্রকলার শিক্ষানবিশির সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে।

কথিত আছে যে রেনেসাঁস-এর শুরুতে ফ্লেমিস্ শিল্পী Van Eyck ও ইতালীয় Antonello প্রমুখরাই তেলরঙের প্রবর্তক। কিয়দংশে তা সত্য। পূর্ণ তৈলচিত্র তখনও হয়নি এবং কে প্রবর্তক তা নিয়ে বিজ্ঞজনোচিত যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আসলে যথার্থ শুরুর হদিশ মেলে না। তবে ওইকালেই যে তার গোড়াপত্তন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরে Lorenzo, di Credi, Pollajuoio, Perugin, Verrochio, Ghirlaudajo-র অবদান কম নয়। কিন্তু তৈলচিত্র ব্যবহারগত শীর্ষস্থানে এসে পৌঁছায় যখন Titien, Leonardo এবং Raphael জীবিত। তারপর তৈলচিত্রের উন্নতি ও অবনতি হয়েছে, ব্যবহার ও পদার্থগত জটিলতার দরুন। কিন্তু সেই হতে আজ অবধি যে তেলরঙের অভিজ্ঞতা তা ঘোরতর অধ্যবসায়ের ফল, এবং তার গুণবত্তাও আজ কম নয়। তেলরঙে আমরা আমাদের

স্নায়ুনিবন্ধভুক্ত স্পন্দন তুলিকাগ্রে চিত্রপটে প্রতিফলিত করতে সক্ষম, যা জলরঙে সম্ভব নয়, যেহেতু জলরং সরাসরি কর্মনিরত কালে এক। এবং পরে তা শুকিয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে। এমন হেরফেরের দরুন সমতল ভূমিগত যে অধুনা camaieu-র কারিগরি তার বিন্দুমাত্র জলরঙে সম্ভব নয়। তাছাড়া matiere-এর যে মহিমা, যার কল্যাণে যে কোনও সমতল ক্ষেত্রের প্রতি অণুকণা রঙিন মোহজাল বিস্তার করতে সক্ষম তা জলরঙে দুরূহ, এবং মোটকথা এই সব মূল্যবান পরিবেশে রেখা ও চিত্র সংস্থান শতগুণে বর্ধিত হওয়ায় চিত্রগত মূল্য বহুতর সত্ত্বে বর্ধিত হয়। অবশ্য জলরঙের যে গুণ নেই তা নয়, তা অন্যরূপে আছে বটে, এখানে, R. Hilder সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করলে শোনায় ভালো যে 'Watercolour painting is to oilpainting what the string quartet is to the full orchestra'।

এদিকে তেলরঙেরও দোষের অবধি নেই। যথা ক্যানভাসের গুণভেদ, বিবিধ তেলের ব্যবহার এবং রাসায়নিক বিপর্যয়—যেমন পদার্থের ভৌতিকসংমিশ্রণ ঘটিত নানা দুর্ঘটনা, ইত্যাদির কথা সর্ববিদিত।

Dinet -বিরোচিত পুস্তক Les Fleaux de la Peinture-এ এবং Brascasst-এর বিশ্লেষণে দেখি, দুজনেই একমত যে, সকল দুর্যোগের যথার্থ কারণ হল আবহাওয়ার গ্যাস এবং আলোর কিরণের সংমিশ্রণ। উভয়ে মিলিত হয়ে যে রাসায়নিক ক্রিয়া রঙে আনে তাই যথার্থ রং-বিভ্রাটের কারণ। অতঃপর, কার্যত সব থেকে গোলমেলে কাণ্ড হল কোন রঙে কতখানি দস্তা বা কোন রঙে কতখানি গন্ধক বা কী প্রকার সংমিশ্রণ ব্যবহারে বিপরীত রাসায়নিক ক্রিয়া ছবিতে আনতে পারে তা চিত্রশিল্পীর জানা প্রয়োজন। রসায়নবিদ না হলেও কিছুটা রসায়নবুদ্ধি সত্যিই উপকারে আসতে পারে। তা না হলে, যথেচ্ছ রঙে ভেসে পড়লে বহুধা ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে, এবং কণামাত্র ভ্রান্তি বহুকালের আক্ষেপের বিষয় হয়ে ওঠে।

ভুল রং প্রয়োগ বা তেলের তারতম্য বা রঙের অতি ঘনত্ববশত ছবি ফেটে চৌচির হতে পারে, বা যে কোনও সুন্দর সৃষ্টি কালের কবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে পারে, বা সমস্ত সংস্থানগত চিত্রভারসাম্য ভেঙে পড়ে যদি কোনও একটি রঙের অপব্যবহারে রঙের রূপান্তর ঘটে। তাছাড়া শিল্পীসুলভ ভ্রান্তি, যেমন কোনও নক্সা রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন করলে, পরে তা আবার প্রকট হয়ে মনোযন্ত্রণার কারণ হয়। Prado জাদুঘরে Velasquez-অঙ্কিত একটি অভিনব চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রটি চতুর্থ ফিলিপের প্রতিকৃতি। তিনি তাঁর ঘোড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিস্ময়ের বিষয় সেই ঘোড়ার চারটি পায়ের পরিবর্তে আজ আটটি পা প্রতীয়মানে সে ছবি এমন এক বিসদৃশ রূপ ধারণ করেছে যে দেখলে দুঃখ হয়। বলা বাহুল্য, এ কাজ Velasquez-এর ইচ্ছাকৃত নয়। আবার Henner-এর আঁকা একটি বনদেবীর চিত্র যা লুক্সাম্বার্গে রক্ষিত আছে—কোনও প্রকাশক সেই চিত্রের ফোটো তোলার কালে একটি বনদেবীর পরিবর্তে পরস্পরবিজড়িত দুটি বনদেবীর উপস্থিতি ফোটোয় দেখে চক্ষু বিস্ফারিত করেন। অবশ্য এতে প্রকাশকের সমূহ লাভ, কিন্তু শিল্পীর ক্ষতি সীমাহীন।

আরও দুঃখের কথা Rembrandt-এর খ্যাতনামা চিত্র Bathsheba, যা সত্যিই অপূর্ব নগ্ন সুন্দরী রমণীর চিত্র, সে সুন্দরীর অপরূপ নগ্ন উরুদেশের উপরাংশে ইদানীং Rembrandt-এর অনিচ্ছাকৃত একটি ন্যাকড়ার নক্সা বর্তমান, যা শিল্পী ত্বক ও মাংসের গোলাপী দিয়ে ঢেকে সংশোধন করেছিলেন। আজ আবার, Rembrandt-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাংস, ত্বক ভেদ করে সেই ন্যাকড়া পরিস্ফুট; বেচারা Rembrandt! শুধু তাই নয়, সব থেকে কৌতুহলের বিষয় হল এই যে, যে শিল্পী অতি খুঁতখুঁতে, সতর্কতা সহকারে রং ব্যবহার করার জন্য খ্যাতনামা, এমনকি তিনি জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্ও, তাঁর বিরাট চিত্র L' Apotheose d'Homere, যা লুভ্র চিত্রগৃহে বর্তমান, তার দুর্ভাগ্য সত্যিই পীড়াদায়ক। চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, চিত্রের দক্ষিণ ঊর্ধ্বকোণে, ঠিক আলেক্জান্দ্রার মাথার উপর আকাশদেশে অতর্কিতে আর একটা নক্সার আবির্ভাব। এই বিরাট চিত্রের যে কী পরিমান ক্ষতি তা

বর্ণনার বাইরে, যে শিল্পী নির্ভুল রং ও রেখা ব্যবহারে অদ্বিতীয়, তাঁরও বিন্দুমাত্র অসর্তকতা আজ অনন্ত দুঃখের কারণ হয়েছে। এসব কথা হেলাফেলার কথা নয়, যেহেতু আর্টই একমাত্র দেশকালের উর্ধ্বে নিরপেক্ষ বিচারসাপেক্ষ। অতএব উপাদানগত বিড়ম্বনা কম নয়, এবং একথা সত্য যাঁদের কিঞ্চিৎমাত্র শিক্ষা এ বিষয়ে আছে তাঁরাই যে কোনও দেশীয় প্রদর্শনীতে গিয়ে যাচাই করতে পারেন যে রং ব্যবহারে আহাম্মক প্রতিক্রিয়া এদেশে কি পরিমাণে সম্ভব। এবং কোন সপ্তম নরকে আমরা ইদানীং অধিষ্ঠিত।

এখন ঈক্ষণগত আলোচনা আরও জটিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয়তা বোধের সাথে সাথে আমাদের দেশে যে চিত্র আন্দোলন তা নিতান্তই উপর উপর ও ভাসা ভাসা। ভারতীয়ত্ব ধারণায় বদ্ধপরিকর হয়ে যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে ভারতীয় শিল্পের উপলব্ধির চর্চা মাত্র বলে গণ্য করা যেতে পারে। একথা কুমারস্বামী যথার্থভাবেই শনাক্ত করেন। ফের, আজ যা প্রায় হয়ে থাকে, তাকে পাশ্চাত্য শিল্পের উপলব্ধির চর্চা বলে মেনে নিতেই হয়। একারণে, যথার্থ ভারতীয়ত্বের যে স্বাতন্ত্র্য তার স্বরগ্রাম ছোঁয়াচ কোথাও নেই বললে হয় — যার প্রথম ও শেষ কথা পরোক্ষরূপতা এবং মহাজাগতিক সম্পর্কের ধাঁচ ও ধরন অন্য সকল শিল্প হতে বিভিন্ন, ভিন্নরূপে ও বৈশিষ্ট্যে তা একক। সে ক্ষেত্রে আজকের পদ্ধতিগত বৈষম্য এক অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি করেছে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে। অধুনা রং,রেখার ব্যবহার মুখ্যত ইন্দ্রিয়জন্য, এই হিসাবে রূপান্তরতা ও স্বকীয় অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সকল প্রচেষ্টাই দ্বিধাগ্রস্ত। বাঁচার খাতিরে নব্য শিল্পীদের যে ওজর তা নিতান্তই বাতুলতার নামান্তর। গতানুগতিক ঐতিহাসিক ছাঁচ ও সুসংস্কারগ্রস্ত ধারণাসমূহ প্রায়ই বড় মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন টেলিস্কোপ আবিষ্কার হবার দরুন মহাজাগতিক চেতনার সম্প্রসারণ, ফলত Baroque শিল্পের সৃষ্টি, তেমনি আমাদের সিদ্ধান্ত হল সুপার্‌সনিক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ হতে ভারত অবধি সমস্ত ভূভাগ উদ্বায়ুরূপে নিশ্চিহ্ন। অতএব আমরা ও সাহেবরা একই কথা। বস্তুত কিয়দংশে একথা সত্য হলেও ক্যামেরা বা গ্যাসের আলোর প্রভাব চিত্রে আসা সত্ত্বেও সমস্ত উক্তিই কাকতালীয়বৎ যুক্তি মাত্র। কোনও সমালোচক, Malraux-র *la psychologie de l'art* উদ্ধৃত করে ও পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করে একমত হন যে 'un art vient toujours d'un autre art, et jamais directement de la nature'— অর্থাৎ 'একা শিল্পরূপ হতে অন্য রূপেরই জন্ম এবং কখনই সরাসরি প্রকৃতি হতে নয়।' আরও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও Levi Strauss -এর গবেষণায়—'Aucune analyse reelle ne permet de saisir le passage entre les faits de nature et les fait de culture' অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির উত্তরণ রূপের কোনও বিশ্লেষণই বাস্তব বলে গ্রহণযোগ্য নয়। এবং মন্তব্য করেন শিল্পে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বর্ণনা করাই সম্ভব, কিন্তু হ্রস্বিকরণের অবকাশ কোথাও নেই। অতএব শিল্পকলার বিবেচনা শিল্পকলা মারফতই সত্যকার বিবেচ্য।

এখন আমাদের পরিস্থিতিগত সারসংক্ষেপ কথা হল : অভিব্যক্তির মাত্রায় ঈক্ষণগত আত্ম-কেন্দ্রিকতা যদি ঔষুধি হয়, তবে উপাদানিক উপায় হবে তার অনুপান। সেই ব্যাপ্তিগুণ যা পাশ্চাত্যের অবদান তা কোন কৌণিক পটভূমিকায় সত্য ও আমাদের আত্মীকরণোপযোগী তারই আলোচনায় জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্-এর কথা আমাদের মনে সর্বাগ্রে উদয় হয়। তাঁকেই ধন্যবাদ যাঁর কল্যাণে এই মিলিত প্রসারের সম্ভাবনা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর যথাযথ প্ররিপ্রেক্ষণে বোঝা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক ভাবে আধুনিক চিত্রকলা অষ্টাদশ শতক হতে আজ অবধি প্রচলিত। এর পত্তন কালকে Neo-classicism যুগ বলে অভিহিত করা হয়। মুখ্যস্থান হল পারি শহর। আরও গভীরভাবে মনে রাখা কর্তব্য যে ঐতিহাসিকভাবে ফরাসি দেশ ছিল মধ্যযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। স্থাপত্য ও মূর্তি ছাড়া চিত্র নিদর্শন খুবই বিরল। তবু ধর্মেকর্মে প্রতীচ্য সংসর্গ কম ছিল না। পরে যখন পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁস যুগে ফরাসি দেশ রাজনৈতিক বিভেদে বহুধা বিভক্ত, তখন চিত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল Avignon, Dijon, Moulins Ý Bourgogne, Bourge এবং Tours। সেই সময় এই সব অঞ্চলে ফ্লেমিস

প্রভাবে কাজ হত। Moulins-এর শিল্পী Nicholas Froment-এর কাজ মহিমান্বিত কুমারী মাতা Moulins ক্যাথেড্রালে আছে। আর এক খ্যাতনামা শিল্পী Tour শহরের জাঁ ফুকে (Jean Fouquet 1415-1477), তিনি মুখ্যত মিনিয়েচার চিত্র আঁকতেন। এই সময়ে ধীরে ফ্লেমিস পদ্ধতি ছেড়ে ফরাসি দেশ ইতালীয় পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফঁতেইনব্লো (Fontaineblau) স্কুলের প্রবর্তন হয়। রেনেসাঁ সভ্যতা ফ্রান্সে প্রবর্তনার মূলে হলেন ফরাসি দেশীয় অ্যাম্বাসেডর, বিশপ, কর্ডিনাল, ব্যবসায়ী শিল্পীগোষ্ঠীও; এবং ফরাসি রাজাদের ইতালি আক্রমণও অন্য এক কারণ যে কারণে ফ্রান্সে ইতালীয় শিল্প প্রচার বহুল পরিমাণে দেখা দেয়। রাজা প্রথম ফ্রান্সিস খ্যাতনামা ইতালিয় শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনেন ফ্রান্সে; যথা Andrea del Sarto, denvenuto Cellini, Leonardo da Vinci এবং Rosso, Primaticcio শেষোক্ত শিল্পীদ্বয় ফঁতেইনব্লোতে ও প্রথমোক্ত শিল্পীত্রয় আঁম্বোয়জ Ambosie-এ বসবাস করতেন।

এইভাবে নানা দেওয়া-নেওয়ায় রেনেসাঁস অভিব্যক্তিগত Plastic বা sculpuresqne রূপায়ণের আবির্ভাব, Henric Wolfflin-এর ভাষায়। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক পরিপুষ্ট আকৃতির পরিপন্থী সর্বত্র ছড়িয়ে দেখা দিল। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রথমে Baroque ও পরে Rococo রীতি প্রবর্তিত হয়, যা আবার Henric Wolfflin -এর ভাষায় painterly বা pictorial বলে অভিহিত হয়ে থাকে। হলেও চিত্রে তা ছিল ত্রিমাত্রা-বদ্ধ, বস্তুনিচয় আলোককিরণে স্নাত, প্রায়শ আলংকারিক। তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন নিকলা পুঁসা (Nicolas Poussin 1594-1665) এবং ক্লোদ লরাঁ (Claude Lorrain 1600-1622) একজন দৃশ্যপট আকৃতি ও অন্যজন দৃশ্যচিত্রের গুণীন ছিলেন। লরাঁই প্রথম খ্যাতনামা শিল্পী যিনি দৃশ্যচিত্রই মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে রূপায়ণ করেছেন।

নিকলা পুঁসা-র চিত্রের বৈশিষ্ট্য অনেক। সমস্ত মনুষ্য আকৃতি, আলো ও অবকাশ মিশ্রিতরূপে অতীব ঐশ্বর্যবান, ছায়া অবকাশ সত্ত্বেও কোথাও Rubens-এর মতো আকৃতি ছায়া ও অবকাশে মিলিয়ে যায় না। নক্সাকেই বর্ধিত করে চিত্র সৃষ্টি করা তাঁর রীতি। সেই নক্সাই আবার উচ্চ, নিম্ন, সমতল, গভীরত্ব পরিস্ফুট করে। পরিবর্তে লরাঁর চিত্রে আলো, দেশ, জল, বাতাস এবং অখণ্ড অবকাশ সম্পূর্ণ দিগ্‌বলয় উপস্থিত করে। অস্তমিত সূর্যের কিরণ স্পন্দিত হয় জলতরঙ্গে ও দীর্ঘ ছায়া তটে পড়ে এগিয়ে আসে চিত্রের সম্মুখভাগে, চিত্রের মধ্যভাগে প্রজ্জ্বলিত ডিমের কুসুমের মতো স্থির সূর্য। ক্লোদের চিত্রে প্রতিফলিত আলোকস্রোত আজ দূরাবহ রূপে ইমপ্রেশনিস্টদের কথা মনে জাগিয়ে তোলে।

সপ্তদশ শতকে le Nain ভ্রাতৃদ্বয়, Louis এবং Mathieu এর প্রতিকৃতির অভিনবত্ব হল, তাতে ফ্লেমিস ইতালিয় পদ্ধতি নামমাত্র রূপে দেখা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে অতি ক্ষমতাবান শিল্পী জাঁ আঁতোয়ান ভাতো (Jean Antoine Watteau 1684-1721), তাঁর তুলিকাজালে এক নব পদ্ধতির রূপদান করেন যা পরে Rococo বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বলে গণ্য ও প্রচলিত হয়। ইনি রুবেন্স-এর চিত্র অনুশীলন করেন। এঁর চিত্র সর্বদাই ক্ষুদ্র, রুবেন্স-এর মতো খুব বড় রীতিতে আঁকা নয়। বড় পটভূমিকা গঠনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ভাতো অন্যত্র Peintre des fetes galautes বলে পরিচিত। সেইমতো হালকা আবহাওয়ার চিত্র, প্রায়শ খোলা ময়দানের মেলার দৃশ্য, যেখানে মহিলারা এবং ভদ্রমহোদয়গণ সিল্ক সজ্জায় ভূষিত। কিন্তু Rococo সম্মত তরলস্বভাবের চিত্র অভিব্যক্তি, পরে Francois Boucher (1708-1770) এবং Jean Honore Fragonard (1732-1806)-এর মধ্যে আমরা দেখি। প্রায়শ রাজকীয় প্রতিকৃতি ও নগ্ন ভেনাস, কিউপিড ইত্যাদির চিত্রগীত তাঁরা রচনা করেন। কিন্তু ১৬০৯-১৭৮৯ হল Jean Baptiste-এর কাল, যাঁর স্বকীয় পদ্ধতি লক্ষণীয়, ঘনত্ব এবং রং ও রেখা দুই মুখ্যরূপে ব্যবহারে তাঁর চিত্রে বেশ একটা নতুন আদল পাওয়া যায়, মনে হয় তাতে আধুনিকত্বের ছায়া আছে। তথাপি আলোছায়া মিলিয়ে যাওয়া আকৃতির অংশে অষ্টাদশ শতকের ধারা তাঁর কাজে পুরোপুরি বাজায় দেখি। এই অষ্টাদশ শতকের কাজ প্রাকৃতিক বাঁধনে আঁটসাট বাঁধা, তরল আলোছায়া ও আবহাওয়াগত

ঘনত্ব মূর্ত। কোথাও আলোকের গতিপথ সংক্রান্ত উৎস প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন। কিন্তু সর্বত্রই বিরাজমান ত্রিমাত্রা এবং সবই পরিপূর্ণভাবে ঘন। ওই কালের বৈসাদৃশ্যগতভাবে আধুনিক যুগ যা ১৮০০ সাল হতে আজ অবধি চালু—তার পুরোধায় হলেন Neo-classicism-এর David (1748-1825)-এর শিষ্য জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্। তিনিই যথার্থ অধুনা মূল্যায়নে, নবধারার সূচনায় জগদ্‌গুরু।

অ্যাঁগ্র্ তাঁর চব্বিশ বছর বয়সেই দখল করেছিলেন তাঁর আর্টের সারাংশ। মতুবাঁ-য় তাঁর জন্ম ২৯ অগস্ট ১৭৮০। পিতা ছিলেন আলংকারিক মূর্তিকার। শিশুকালেই পুত্রকে নক্সার কাজ ও সংগীত শেখান। ১৭৯১ সালে Academis des Arte de Toulouse-তে শিক্ষানবিশির জন্য ভর্তি হন। এই সময় নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ভায়লিনিস্ট হিসাবে কাজ করেন I'orchestre du Capitole -এ এবং পারি শহরে ১৭৯৭ সালে আসেন ও প্রথমে David-এর ছাত্র ও পরে Ecole des Beaux Arts-এ পাঠ নেন। ১৮০১ সালে তখনকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার Grand Prix de Rome লাভ করেন। ১৮০৪ সালে সরকার নিয়োজিত কাজ এই সময় করেন ও Premier Consul বোনাপার্তের প্রতিকৃতি আঁকেন ও আত্মপ্রকৃতিও ওই সালে আঁকা। উপরোক্ত চিত্র Musee des Beaux Arts, Liege এবং দ্বিতীয়টি Muse Conde Chantilly-তে রক্ষিত। দুটিই শিল্পইতিহাসে অনবদ্য চিত্র। বিস্ময়ের অবধি থাকে না একথা ভাবলে যে কেবলমাত্র চব্বিশ বছর বয়সে এ জাতীয় স্বকীয়তা, যাকে বলে chef d'ouvre সৃষ্টি, কোনও যুবকের পক্ষে সম্ভব।

শুধু তাই নয়, অ্যাঁগ্র্-এর সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত পদ্ধতির অবতারণা আমরা দেখতে পাই। পরের বছর তাঁর অঙ্কিত চিত্র মহাশয়, মাদাম ও মাদ্‌মোয়াজল রিভিয়ের-এর প্রতিকৃতিতে অভিব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে মূর্ত—গঠনপ্রণালী, শীলত্ব বোধক, ভাবসাম্য সুগঠিত, বদান্য মনোভাব মূর্ত, রূপ সৃষ্টি মনোরম। madame Riviere-এর প্রতিকৃতিতে লক্ষিত হয় যেন অ্যাঁগ্র্-এর সমূহ শক্তি উন্মোচিত। রেখার সৌন্দর্য, সম্ভ্রান্ত রং, বসনভূষণের উচ্ছ্বাস, জীবন্ত অভিব্যক্তি joi de vivre-এর উচ্ছ্বাস সত্যিই নয়নাভিরাম। ভদ্রমহিলার হাত থেকে এরাবেস্ক্ রেখা যা শালের রেখা থেকে ধাবিত তা যেন জীবন-ইঙ্গিত গতিতে ছন্দিত। শালের কাশ্মিরী কাজ, পরিবেশে প্রাচ্য বৈভব ও আলোক-সমতা চিত্রের কানায় কানায় মোহাচ্ছন্ন করে। ১৮০৬ সালে পারি-তে তিনি চারটি প্রতিকৃতি দান করেন যা ফরাসি শিল্পজগতের সব থেকে সুন্দর রচনা বলে গণ্য করা চলতে পারে। Frank Elgar এই ছবির কথায় বলেন, অ্যাঁগ্র্-ই জানতেন, 'তিনি কী চান, তিনি কী পারেন রচনা করতে'। তাঁর কল্পনা স্বতন্ত্র ও শিল্প অভিনবত্বে ভরাট। এবং, বিশ্বাস অতি স্থির, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তীক্ষ্ণ, পরিমাপহীন। যখন Salon-তে সমালোচক ও জনসাধারণ তাদের সুন্দর দাঁত দিয়ে তাঁর কাজ চিরে দিতে রত তিনি তখন রোমে গিয়ে চিত্রচর্চায় শান্তিতে নিয়োজিত।

এই রকম নানা চিত্রের নানা কথা সত্যিই আজ আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তদানীন্তন কালে সেই সেই গুণই ছিল কটাক্ষ ও বিদ্রুপেরও বিষয়। Robert de la Sizeranne জঘন্যভাবে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'পরিপ্রেক্ষণের আইন মানে না'— সত্যিই তা লক্ষণীয় L' Apothé ose d'Homére, Le Martyre de Saint Symphorien, Jésus parmi les doctcurs এবং Bain ture ও c'Aged'or চিত্রগুলিতে। বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় তিনি কম্পোজিশনের ভারসাম্যের তাগিদে পরিপ্রেক্ষণ অবহেলা করেছেন। এ কিন্তু আবার আধুনিকতার মহা শিক্ষা। অ্যাঁগ্র্-এর আর এক রুচিগত বীতরাগ ছিল অ্যানাটমির অত্যাচার। তাঁর চিত্রের ব্যক্তিগণের হাড়মাংস নিয়ে তিনি ব্যস্ত নয়, ঘনত্ব অতি স্বল্প পরিমাণে উদ্ধৃত ও চিত্র সমতলক্ষেত্রগতভাবে চাপা। যেহেতু অ্যাঁগ্র্ ক্লাসিক বিষয়বস্তুর পক্ষপাতী ও দ্বিমাত্রাপ্রবণ চিত্রী তাই তখনকার কোনও মূর্তিকার শ্রেষ্ঠ বাক্যে বলেন যে অ্যাঁগ্র্ হলেন এক চৈনিক যিনি এথেন্সের ধ্বংসে হারিয়ে গেছেন। Madame Devaucay-র প্রতিকৃতি — Jupiter et Thétis উল্লেখযোগ্য চিত্র — এবং অভূতপূর্ব Grande Odalisque চিত্রটি। কিন্তু তখন তা সমালোচ্য বিষয়

ছিল এই হিসেবে যে Thétis গলগণ্ডযুক্তা এবং ওদালিস্ক-এর নারীদেহটি যেন তিনটি মেরুদণ্ডে প্রলম্বিত। আসলে এই চিত্রেই প্রথম চিত্রজগতে pictorial distortion-এর চক্ষুদান করে এবং যে কল্যাণে পাশ্চাত্য শিল্পীরা চৈনিক, ভারতীয়, সুমেরীয় ও তাদের মধ্যযুগীয় ও নেগ্রে, পারস্য শিল্পকলা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

Distortion কদর্থে নয়, অ্যাঁগ্র্-এর চিত্রে সমস্তই সদর্থে ও সৌন্দর্যের মাত্রায় নব রূপে প্রতীয়মান La Source, Venus, Les Baigneuses, les Odalisques ও apotheoses যেমন L'Aged'or এবং Le Bainturc ইত্যাদি চিত্র ঐতিহাসিক মহাসৃষ্টি। তাঁর প্রতিভার ছোঁয়াচে সমস্ত চিত্র তার পবিত্রতা সবলতা ও অভিব্যক্তির আঙ্গিক ও জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধতায় উন্মীলিত। Elgar-এর মতে যে কোনও শিল্পীই হোক না কেন—Titien, Poussin, Goya, Delacroix, Manet, Courbet ও Renoir— অত পবিত্র রেখা কেয়ারি করতে সক্ষম হয়নি। অ্যাঁগ্র্-এর চিত্ররেখা বা তাঁর রেখাচিত্রও এখনও নকল করার তাগিদ মহা মহা ধনুর্ধর শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত। এবং বলা বাহুল্য, Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso প্রভৃতি ও আরও অনেকেই অ্যাঁগ্র্-এর কাছে একান্ত ঋণী।

চিত্রের যে দ্বিমাত্রিক ও যুগপৎ গঠনপ্রণালী বা Simultaneity তা অ্যাঁগ্র্-এর চিত্রেই আমাদের দৃষ্টি আঁচড়ায়। তাছাড়া কমনীয় ও নমনীয় মুখলাবণ্য তো বটেই, এমনকি হাতের বা আঙুলির ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গি—দক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জের মতো আন্তরিক ঠিকানায় ধৃত। চিত্রের কানায় কানায় আমরা পরিমিতভাবে ছাড়িয়ে পড়ি, শেলাইকরা ফুল ও পাতায়, ময়ূরপাখনার পাখায়, আলজেরিয়ান পাইপ ও গড়গড়া ইত্যাদিতে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের অন্তর মন্থিত করে। এদিকে অ্যাঁগ্র্-এর সমসাময়িক Romanticism-এর যে আন্দোলন তার পুরোধা হলেন অ্যাঁগ্র্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী Eugene Delacroix (1799-1863) এঁদের চিত্ররূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রপটের ধারণা কল্পনার বাইরে।

আমরা পাশ্চাত্যের কাছে চিত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হলেও, ইতিপূর্বে হবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, চিত্রগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা আমাদের দেশের পদ্ধতি আবহমানকাল থেকে হয়ে এসেছে। তবে চিত্ররূপ অর্থবোধক হবার প্রয়োজনীয়তার সে চিত্র অন্যরূপে রচনা হত। কিন্তু অর্থহীন চিত্র, যেমন পশ্চিমে হয়ে থাকে, সেরূপ আধুনিকত্ব আমাদের মধ্যে নেই — অর্থাৎ আমাদের মনন ডৌল ও আকৃতি ওদেশের মতো একেবারেই নয়। এদেশে মঁতেইঙ্ন বা দেকার্ত না জন্মগ্রহণ করারই ফল। অতএব আমরা যে ক্ষেত্রে মিলি তা নিছক প্রণালীবদ্ধ চিত্রকল্পে — এমন একটি জায়গায় যেখানে আমরা ঘর করতে পারি। এ কিন্তু সম্ভব হত না যদি দোলাক্রোয়া মারফত এক ত্রিমাত্রিক সরলপথ আজ অবধি চলে আসত।

অ্যাগ্র্-প্রণোদিত পথেই এক সুখকর জোড়কলমের কাজ সম্ভব হয়েছে পক্ষান্তরে সেখানে আমাদের রুচি মন ও ইচ্ছের স্বীকৃতি পাই। অতএব এখানে Influence -এর কথা ওঠে না, ওঠে Confluence -এর কথা, অবশ্য যদি আমরা আমাদের কাজ ঈক্ষণ ও রচনার দ্বারা তাদের স্বতন্ত্র চিহ্নে চিহ্নিত করতে পারি। এই হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বিমাত্রিক চিত্রপট অবদানের জন্য আমরা জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্-এর কাছে কৃতজ্ঞ, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু নির্মাণে সহায়তা করেছে। মোট কথা, ওপারের তটে ভাঙন ধরাতেই এপারের তট সৃষ্টি, ও সেই ভাঙলের স্রষ্টা হলেন জাঁ দমিনিক্ অ্যাঁগ্র্, মৃত্যু ১৮৬৭ এবং এই তাঁর মৃত্যুশতবার্ষিকী — এই সূত্রে আমরাও তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

৫ম বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা
(শারদীয় ১৩৭৪)

সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ লোকের মুখে তাঁর গানের কী দশা হচ্ছে সেই নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন :

> গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত তাহলে হয়তো বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে।

আজকাল অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই খেদোক্তির পুনরাবৃত্তি করছেন। স্বরলিপিতে অনেক গানের মূল সুর বিকৃত হচ্ছে, বা পুরোনো স্বরলিপির সঙ্গে তার নতুন সংস্করণের বেমিল পাওয়া যাচ্ছে, সে দিকেও কেউ কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

এসব কথা উঠছে এই কারণেই যে, রবীন্দ্রসংগীতের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যেটা আগে কোনও ভারতীয় গানে ছিল না। রামপ্রসাদীর সর্বনাশ হচ্ছে, বা কীর্তনের সুর বিকৃত হচ্ছে — এ ধরনের অভিযোগ বড় একটা শোনা যায় না। এসব গানের বেলা, বা বাংলা টপ্পা, লোকসংগীত ইত্যাদির বেলা, স্বরলিপি রচনা করে গানকে জিইয়ে রাখার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। মার্গসংগীতেই হোক বা লোকসংগীতেই হোক, ভারতবর্ষে চিরকালই যে জিনিসটার উপর জোর দিয়ে আসা হয়েছে সেটা হল গানের জাত। কীর্তনকে কেউ ভুল করেও খেয়ালের মতো গায় না বা বাউলের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়ে তাকে ধ্রুপদের আসনে বসানোর চেষ্টা করে না। এক গানের গাইবার রীতি আরেক গানে প্রয়োগ করা হয় না, কারণ তাদের জাত আলাদা।

গানে রবীন্দ্রনাথের যা একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি, প্রচলিত নিয়মে তার জাত নির্ণয় করা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ জাতের কথা ভাবেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে, এক একটি বিশেষ ভাবকে বিশেষ কথা, বিশেষ সুর-ছন্দে প্রকাশ করার দিকে। জাতের দোহাই যেখানে দেওয়া চলে না, সেখানে চরিত্র রক্ষা করার প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকেও এই প্রশ্নটাই ভাবিয়ে তুলেছিল।

একটি গানের এই যে অবিকল্প রূপের ধারণা, এটা এদেশের নয়। বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার মতোই রবীন্দ্রনাথের গীত রচনার ধারণাটা আসলে ইউরোপীয়। ভক্ত রামপ্রসাদ এককালে কীর্তনের মেজাজে একটি শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন, যাতে তাঁর একান্ত নিজস্ব একটি ভাব নিজস্ব একটি কাঠামোয় প্রকাশিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি মৌলিক রচনা, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেটা হয়ে দাঁড়ালো একটি ছাঁচ, যে ছাঁচে রামপ্রসাদ নিজেই একের পর এক অজস্র ভাবসংগীত রচনা করলেন। এই বিশেষ ঢংয়ের গান তাই আজ স্বরলিপি ছাড়াই টিকে আছে। এর মোটামুটি চেহারাটা সকলেই জানে, কিন্তু গাইবার সময় গায়ক ভেদে এর রদবদল হবেই। মূল সুর যদি বজায় থাকে, তাহলে অলংকরণের রকমফেরে রামপ্রসাদীর সর্বনাশ হয় না। তবে এই অলংকারেও সংগীতের কতকগুলি নিয়ম বজায় রাখতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে।

রামপ্রসাদীর আস্থায়ী-অন্তরার সুর থেকে অলংকার একেবারে বাদ দিয়ে তার নিরাভরণ চেহারাটা দাঁড়ায় এই রকম :

আস্থায়ী

I গা - পা মা I গা সা - রা I গা গা -া I মা পা -া I

I গা - পা মা I গা সা - রা I গা গা -া I মা পা -া I

I পা ধা - র্রা I র্সা - া না I ধা পা -ধা I মা পা - া I

I গা - পা মা I গা সা - রা I গা গা - া I মা পা - া II

অন্তরা

II া া পা I ধা ধা ধা I র্সা -া র্সা I না ধপা -া I

I া া না I না র্সা র্রা I র্সা ধা র্সা I র্সা পা ধা I

I র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া I র্সা না -া I

I ধা ধা র্রা I র্সা না -া I ধা পা -ধা I মা পা -া II

এই সুরে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে এতটা নেড়া ভাবে গাইলেও একে চেনা যায়। কিন্তু কোনও গায়ক বা ভক্ত একে এমনভাবে গাইবেন না, কারণ রামপ্রসাদীর কথায় সচরাচর যে আবেগ-অভিমান অভিযোগ-মিশ্রিত ভাবটা থাকে সেটা ফুটিয়ে তুলতে অলংকারের প্রয়োজন হয়। শুধু প্রথম লাইনটি গাইবার নানারকম সম্ভাব্য ঢং-এর মধ্যে তিনটি নীচে দেওয়া গেল :

১. I গা -পা পমা I -গা রসা রা I গা গমগা - রগা I মা পা - া I

ব ল্ মা ০ তা রা দাঁ ড়া ০ ০ ই ০ কো থা ০

২. I গা -মপা মপমা I -গা রসা সরা I গা গমগমগা -রগা I মা পা -া I

ব ল্০ মা০০ ০ তা০ রা০ দাঁ ড়া০০০০ ই০ কো থা ০

৩. I গা -মপা পমগরা I -গা রসরসা রা I গা মা -গরগা I মা পা -া I

ব ল্ ০ মা০০ ০ তা০০০ রা দাঁ ড়া ই০০ কো থা ০

এই যে জাত ঠাট বজায় রেখে গায়কের ক্ষমতা ও অভিরুচি অনুযায়ী গানের একটু এদিক-ওদিক করবার রীতি, এটা আমাদের দেশে যেমন মার্গসংগীতে। তেমনি লোকসংগীতে চিরকালই আছে। অক্ষম গায়কের হাতে এই রামপ্রসাদীর সুর তাল ভাব সবই নষ্ট হতে পারে ; সাধারণ গায়ক সুর-তাল বজায় রেখে ভাবের অভাবে গানের প্রাণহানি ঘটাতে পারে, আবার তেমন তেমন গাইয়ে হলে এই প্রাচীন অতিপরিচিত সুর নবীন সরসতা লাভ করতে পারে।

যন্ত্রসংগীত, তেলেনা ও খেয়ালের আলাপের অংশ বাদ দিলে এদেশের সব গানেই কথার ব্যবহার হয়ে থাকে। মার্গসংগীতের মধ্যে ধ্রুপদ রীতিতে কথার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ধ্রুপদে যে সমস্ত তাল ব্যবহার হয়, তাতে স্বভাবতই সংগীতে একটা উদাত্ত মেজাজ এসে পড়ে। গানের কথা এই মেজাজের সঙ্গে সংগতি রাখার চেষ্টা করে। তবে শব্দচয়নে যেমন ভাবের কথা ভাবতে হয়, তেমনি স্বরব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দের যে একটা বিমূর্ত ধ্বনির দিক আছে, সেদিকটাও দেখতে হয়। বলা বাহুল্য, এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয় সহজ ব্যাপার নয়। দুইয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্বের প্রশ্ন আসে, তখন ধ্বনির দিকটাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ, গান জিনিসটা আগে সংগীত, পরে কাব্য -- এই ধারণাই প্রচলিত। এই কারণে গায়করাই সব সময় আমাদের দেশে গান রচনা করেছেন। কবি কথার জোগান দিয়েছে, তারপর গায়ক-সুরকার তাতে গান বেঁধেছে, এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

খেয়ালের আলাপে কথার কোনও স্থান নেই। রাগরাগিণীর একেবারে নিভাঁজ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চেহারাটা এই আলাপে পাওয়া যায়। এখানে সুর আছে, কিন্তু গৎ নেই ; লয় আছে, তাল নেই ; ভাব আছে, বক্তব্য নেই। আলাপের ধারণাটা একেবারে ষোলআনাই এদেশের। ভারতীয় সংগীতের রেখাবিন্যস্ত রূপটা আলাপে যেভাবে ফুটে ওঠে, তেমন আর কিছুতেই ওঠে না। স্বভাবতই এর তুলনীয় কোনও

কিছুই ইউরোপীয় সংগীতে নেই।

খেয়ালে কথার দরকার হয় আলাপের পরের পর্বে। কিন্তু এ গানে কথার স্থান ধ্রুপদের তুলনায় গৌণ হতে বাধ্য। গতের শুরুতে কথার একটা মূল্য থাকলেও ক্রমে তানবাটের প্রাচুর্যে ভাবের বাহন হিসেবে তার আর কোনও মূল্য থাকে না।

টপ্পা-ঠুংরিতে এসে কথা আবার একটা বড় জায়গা দখল করে বসে। প্রধানত আদিরসাত্মক এই দুই শ্রেণীর গানে ভাবের খাতিরেই অলংকারের ব্যবহারটা একটু বেশি। ভাবের বাহন হিসেবে কথা এখানে যেটুকু মর্যাদা লাভ করে, সেটা রচয়িতার কাব্যগুণের চেয়েও ওস্তাদের নিজস্ব 'ভাও'-এর উপর নির্ভর করে বেশি। এখানে কথায় রীতিমতো নাট্যরস সঞ্চার করা হয়। বিশেষত ঠুংরির প্রকৃতি এমনই যে গায়ক-শ্রোতার মধ্যে একটা সংযোগ বা rapport স্থাপিত না হলে এখানে গান খোলেই না।

চৈতন্যদেবের আমলে রাগসংগীতকে গড়ে-পিটে বাঙালি ক'রে কীর্তন গানের সৃষ্টিতে একটা প্রথম শ্রেণীর সংগীত-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনের বাঙালিয়ানা তার ভাবে-ছন্দে-সুরে অলংকারে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে। এতে রাগের আমেজ আছে, কিন্তু তার বিস্তারের শাস্ত্রীয় বাধ্যবাধকতা নেই; এতে কাব্যের মাধুর্য আছে—অর্থাৎ, সাহিত্যবিচারে কথার মূল্য আছে, এবং গাইবার রীতিতে কথাকে মর্যাদা দেবার সুযোগ আছে, কিন্তু সেটা অলংকার বাদ দিয়ে নয়। তাছাড়া কীর্তনে একক ও সমবেত কণ্ঠের বৈপরীত্য প্রকাশ করার যে রীতিটা আছে, সেটাও আশ্চর্য নতুন। সবশেষে, কীর্তনের যা উদ্দেশ্য—অর্থাৎ শ্রোতার মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করা—সেটা পূরণ করার স্বাভাবিক ও অসীম ক্ষমতা আছে। এছাড়া আরও যে জিনিসটা আছে, সেটা হল এর তালের বৈচিত্র্যে রচয়িতার মননশীলতার পরিচয়। এই কারণেই কীর্তনকে কেউ কোনও দিন লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে পারেনি।

লোকসংগীতের—সব দেশেরই—একটা প্রধান লক্ষণ হল তার সরলতা। কিন্তু সেইসঙ্গে মাটি ও মানুষের সংযোগে তৈরি বলে এর মধ্যে একটা সজীবতা থাকে যেটা তার সুর-ছন্দ-কথা তিনের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। সংগীতর একটা ঘনীভূত চেহারা লোকসংগীতে পাওয়া যায়। মাটির জিনিস বলেই এতে খানিকটা অমার্জিত ভাব—হয় সুরে, না হয় কথায়, না হয় গাওয়ার ঢংয়ে—থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এটাও এই সজীবতারই একটা অংশ। এর সংস্কার চলে না, বা সংস্কার করতে গেলে এর বৈশিষ্ট্যটুকু আর থাকে না, এবং যা দাঁড়ায় তাকে আর লোকসংগীত বলা চলে না।

২

ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরি-টপ্পা-কীর্তন-লোকসংগীত—এর প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথকে কমবেশি প্রভাবিত করেছিল, এবং সবক'টিরই স্পষ্ট আভাস রবীন্দ্রসংগীতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া কিছু বিদেশি, কিছু কর্ণাটকি, আর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কিছু গানের প্রতিরূপও তাঁর গানে দেখি। এর বাইরে যা আছে, সেগুলিকে একেবারে নতুন জিনিস বলা চলে। তাতে রাগরাগিণীর বা অন্য কোনও প্রচলিত রীতির আমেজ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তার মৌলিকত্ব কমে না। কোনও প্রচলিত রীতি যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, তখনও তার কথায় বা সুরে বা ছন্দে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এনেছেন। ফলে সেগুলিকে অনুকরণ না বলে নবীকরণ বলা চলতে পারে। বাংলা তথা ভারতীয় গানের এই নবীকৃত রূপই হল রবীন্দ্রসংগীত।

প্রথম থেকে শেষ অবধি যে বিশেষত্বটা রবীন্দ্রনাথের সব রচনার মধ্যে একটা ঐক্যস্থাপন করেছে, সেটা হল এর বাঙালিত্ব। তবে বাংলা রাগসংগীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী, লোকসংগীত বা নিধুবাবুর টপ্পায় যে বাঙালি ভাব, এটা সে ভাবে নয়। এটা হল রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব একটি বিশেষ শ্রেণীর বাঙালিয়ানার সাংগীতিক প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের রুচি, তাঁর সংস্কার, তাঁর পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পবোধ, সাহিত্যবোধ—অর্থাৎ তাঁর পুরো চরিত্রটাই এই গানে প্রতিফলিত। এটাও লক্ষণীয় যে গানই তাঁর

একমাত্র সৃষ্টি যার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কাব্য-উপন্যাসের তুলনায় বিবর্তনের মাত্রাটা এতে অনেক কম।

আসলে গান সম্বন্ধে যে মতামত তিনি তাঁর প্রথম জীবনেই ব্যক্ত করেছিলেন সেটা প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। বিশ বছর বয়সের একটি লেখায় তিনি বলেছিলেন :

> (ওস্তাদেরা) গানের কথার উপর সুর দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।

এই একই কথা—অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর সম্পর্ক—তিনি বহুবার বহুভাবে বলেছেন। আর যেটা নানান ভাবে প্রকাশ করেছেন সেটা হল রাগ-রাগিণী সম্পর্কে তাঁর ধারণা। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোয় যদু ভট্টের মুখে ধ্রুপদ গান তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের জিনিস ছিল। এ জিনিসটা এত ভালোবেসেছিলেন বলেই বোধ হয় একের পর এক এত আশ্চর্য সব ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করে ব্রহ্মসংগীতকে তিনি সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। ধ্রুপদের বাণী যেভাবে ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে, সেটা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে তাঁর রচিত ধ্রুপদ গানের মতো সর্বগুণসম্পন্ন রচনা কমই আছে। এর অনেকগুলিতেই অবশ্য তিনি হিন্দির ছাঁচ অবিকল বজায় রেখে কেবলমাত্র তাতে হিন্দির জায়গায় বাংলা কথা বসিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি যে শুধু কাব্যগুণেই মূল রচনাকে অতিক্রম করে গেছেন তা নয়। ভাবের সঙ্গে শব্দের হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরব্যঞ্জনের সুনিপুণ প্রয়োগে সাংগীতিক ধ্বনিবিচারেও হিন্দিকে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেছেন। একটা হিন্দি গানের পাশে তার রবীন্দ্রসংস্করণ রাখলেই এটা বোঝা যাবে। —

১. হিন্দি :

দেবনদেব মহাদেব,
ত্রিশূল খপ্পর ডমরু লিয়ে
বৃখবাহন, অঙ্গে বিভূতি
গরে রণ্ডমালা চন্দ্রমুণ্ড লাটরি।

২. রবীন্দ্রনাথ :

কোটি কণ্ঠে গাহে জয় জয় জয় হে।
দেবাধিদেব মহাদেব
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা
মহাসভা তব আকাশে

এবারে হিন্দুস্থানি রাগসংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের কিছু মতামত তুলে দেওয়া প্রয়োজন। কবে কোথায় এসব কথা বলা হয়েছে সেটা অবান্তর, কারণ এগুলি তাঁর একেবারে পাকা অভিমত, সারা জীবনে যার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

> যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ মাত্র বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা। আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে?
>
> ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। ... আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে

> নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়।
>
> হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে বলেই যে ক্রমাগত তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়।

ওস্তাদি গান রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগলেও শাস্ত্রীয় নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা রাগসংগীতের দীর্ঘ বিস্তারকে তিনি কোনওদিনই বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁর মত ছিল, তানসেনের যুগে যে নিয়ম মানা হয়েছে, আজকের দিনেও কেন সেই একই নিয়ম মানতে হবে তিনি এ কাজটার সঙ্গে 'আধুনিক চিত্রশিল্পীর অজন্তার ছবির উপর দাগা বুলনো'-র তুলনা করেছেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—দু'শো বছর আগের হিন্দুস্তানি সংগীতের শাস্ত্রসম্মত ও শিল্পগুণসম্পন্ন বিস্তারের যদি স্বরলিপি থাকত, আর আজকের দিনের ওস্তাদ যদি তাকে অবিকলভাবে আসরে পরিবেশন করতেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কী বলতেন? ওদেশে আজও কি বাখ্-মোৎসার্ট বা আরও অনেক বেশি প্রাচীন সুরকারদের রচনা ওস্তাদদের হাতে আধুনিক শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে না? একথা ঠিকই যে আজ আর কোনও আধুনিক সুরকার প্রাচীন রীতিতে সংগীত রচনা করেন না। কিন্তু প্রাচীন সংগীতের ব্যাখ্যাকারদের যে ভূমিকা, সেটা তো তা বলে লোপ পেয়ে যেতে পারে না। আজকের চিত্রশিল্পীর কাছে কি অজন্তার কোনও মূল্য নেই? সংগীত যখন গুহার দেয়ালে আঁকা থাকে না, তখন তাকে ওস্তাদের হাত দিয়ে ছাড়া বাঁচিয়ে রাখা যাবে কী করে? আর আমাদের দেশের যে ওস্তাদ, তার কাজ তো শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, তাকে তো সৃষ্টিও করতে হয়। শাস্ত্রে যা লেখা আছে সে তো কেবল সংগীতের সূত্র ; তাকে তো আর রচনা বলা যায় না। রচনা সব সময় ওস্তাদই করেন। ওদেশে সুরকারের রচনা যদি দুর্বল হয়, তাহলে ওস্তাদ সেই রচনার দুর্বলতাটাই প্রকাশ করে। এদেশে রচনার ভালোমন্দ ষোলো আনাই ওস্তাদের উপর নির্ভর করে। এটা কি অনুমান করা যায় না যে তানসেনের আমলে রাগরাগিণীর রূপ যেভাবে প্রকাশিত হত, কালে হয়তো তার বিবর্তন হয়েছে, এবং আমাদের যুগে ফৈয়াজ খাঁ যেভাবে রাগরাগিণীর পরিবেশন করেছেন তার বিস্তারে অলংকারের আঙ্গিকে ইভলিউশনের ইঙ্গিত আছে? ঘরানার তফাতেই তো রাগরাগিনীর পরিবেশনে তফাত হয়। তাহলে সে রীতিকে বন্ধ্যা জরাগ্রস্ত বলা চলে কী করে? ওস্তাদদের মধ্যে যার সত্যিই গুণ আছে, সৃষ্টিশক্তি আছে, তার হাতেই রাগরাগিণী বারবার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

এইসব কারণেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের রীতিটা তেমন ভাবে তলিয়ে দেখেননি। তিনি গান রচনার কাজে লেগেছিলেন প্রধানত বিদ্রোহের ভাব নিয়েই। প্রাচীন রীতিকে ভেঙে ফেলতে হবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই বিদ্রোহের চেহারাটা তাঁর গানে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেটা দেখা দরকার; দেখা দরকার যে, যা ছিল, যা হচ্ছিল তার জায়গায় কী এল কী হল।

৩

বাংলা গান রচনায় শাস্ত্রীয় রীতির দাসত্ব না মানলেও চলে, একথা রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু সেটা এই কারণে নয় যে সে রীতির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গান জিনিসটায় চিরকালই একটা স্বাতন্ত্র্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু সংগীতের কোনও না কোনও নিয়ম সেখানে মানতেই হবে। তবে এক গানের যা নিয়ম, অন্য গানে তা নাও খাটতে পারে। কেবল এটুকু বলা যেতে পারে, যে কথা সুর আর ছন্দ — এই তিনটি জিনিস ছাড়া গান হয় না।

রবীন্দ্রনাথ কথার সঙ্গে সুরের অর্ধনারীশ্বর সম্পর্কের কথা বলেছেন। সাধারণত সব দেশে সব কালেই গানের কথাকে সুরের বাহন হিসেবেই মনে করা হয়। অর্থাৎ সুরই কথাকে চালায়। তার মানে এই নয় যে, কথার ভাবার্থের কোনও দাম নেই। তবে ভাব বজায় রাখতে গিয়ে যদি যদি সুরের স্বাচ্ছন্দ্য

ব্যাহত হয়, তাহলে বলতে হয় কথা আর বাহনের কাজ করছে না, লাগামটা আর চালকের হাতে নেই। কথা সেখানে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংগীতের রাজ্য ছেড়ে ভাবের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন সে কথার উপর জোর করে সুর যোগ করতে গেলে একাধারে কাব্যের অবমাননা ও সংগীতের অপব্যবহার হয়। গানের যে সুর-ছন্দের কথা-নিরপেক্ষ দিকটা আছে, সেটার বিচার সংগীতের মাপকাঠিতেই হয়। কিন্তু সুর-নিরপেক্ষ ভাবে যদি গানের কথার বিচার করতে হয়, তাহলে সেখানে কাব্যের মাপকাঠি লাগে। ভের্দি শেক্সপীয়রের ওথেলো অবলম্বনে একটি অপেরা লেখেন। সেখানে ভাব ও ভাষা ছিল শেক্সপীয়রের। সুরে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু সংগীতের মাপকাঠিতে বোমার্সের প্রহসন অবলম্বনে লেখা মোৎসার্টের Marriage of Figaro অপেরা ভের্দির ওথেলোর অনেক উপরে। গানে তাই কথা আগে, সুর পরে—এ নিয়ম মানতেই হয়।

ভাব ও সুরের সামঞ্জস্য তাই গানের একমাত্র গুণ নয়। তারও উপরে যেটা আছে সেটা হল সুর ও ছন্দের স্বকীয়তা, যেটা ছাড়া সার্থক নতুন সংগীত সৃষ্টি হতে পারে না।

যিনি একাধারে কবি ও সুরকার, তাঁর কাব্যপ্রতিভা যদি তাঁর গীত-প্রতিভার চেয়ে কোনও অংশে কম না হয়, তাঁর পক্ষে বোধ হয় গানের খাতিরে কথার ওজন কমানো ভারি শক্ত। ফলে যেটা প্রায়ই হয়, কথার খাতিরে সুরকে দাবিয়ে রাখতে হয়, অথবা কথার ছন্দ অতিমাত্রায় সুরে সঞ্চারিত হয়ে গানকে দুর্বল করে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা বাংলা গান লিখেছেন, কীর্তন ও লোকসংগীত বাদ দিয়ে তাঁরা সকলেই মার্গসংগীতের ঠাট মেজাজ বজায় রেখেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালির গান রাগসংগীতেই লেখা হয়। কিন্তু রাগাশ্রিত হলেও এ গান কথা ও ভাবের জোরেই বাঙালি হয়ে পড়ত। অনেক পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ডেই এ গানের চেহারাটা বেশ পরিষ্কারভাবেই পাওয়া যায়। এটা বোঝাই যায় যে বাঙালি ভাব না থাকলে এ গানের জনপ্রিয় হবার কোনও সম্ভাবনা থাকত না, কারণ বাংলাদেশে হিন্দুস্তানি সংগীতরীতির চল থাকলেও সেটা এদেশে কোনওদিনই শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ এ রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এটার চর্চা তিনি তেমনভাবে করেননি। অর্থাৎ —তিনি গলা সাধেননি, বা সাধলেও, তাঁর ইস্কুলে পড়ার মতোই সে সাধনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি নিজেও একথা বলেছেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের বন্দেমাতরম গানে এর প্রমাণও আছে। কিন্তু এ গান শুনলে এটাও বোঝা যায় যে তাঁর গলার 'কাজ' খুব বেশি ছিল না। অন্তত, যে কাজে খেয়ালের তান হয়, তা তো নয়ই। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব বেশ লক্ষ করা যায় যে, তাঁর সহজাত ক্ষমতার বাইরে কোনও কিছু শিখে আয়ত্ত করায় তাঁর চিরকালই একটা আপত্তি ছিল। তাঁর শিক্ষায়তনের বিরুদ্ধে আপত্তিটা অ্যাকাডেমিক সব কিছুর বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য ছিল। তাঁর শিল্পবোধ ছিল সহজাত, instinctive। চিত্রপটে তার আশ্চর্য প্রকাশ তাঁর শেষ বয়সে আমরা দেখেছি। কিন্তু কবিতার করুকারিতায় তাঁর সে স্বাভাবিক দখল ছিল, অঙ্কনরীতিতে সেটা ছিল না। তাঁর আঁকা ছবিতে রং-তুলির কাজে তাই তথাকথিত পারিপাট্য নেই, যেটা কবিতায় আছে। যেটা আছে সেটা রং, ছন্দ ও স্পেস সম্পর্কে তাঁর সহজ অথচ গভীর উপলব্ধির নিরবরুদ্ধ অভিব্যক্তি। ছবিতে তিনি চিত্রশিল্পের নিয়ম ছাড়া কোনও নিয়ম মানেননি, এবং এর বিচারও সে নিয়মের বাইরে হতে পারে না।

সংগীতের বেলা রবীন্দ্রনাথ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির অনেক কিছুই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তান জিনিসটা তিনি বাদ দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ বোধহয় এই যে সেটা তাঁর আয়ত্ত ছিল না। তবে রাগসংগীতের প্রতি তাঁর ঋণ কম নয়। খাম্বাজ-বেহাগ-পিলু-কাফি-ভৈবরী-ইমন-দেশ-পুরবী ইত্যাদি বহু রাগরাগিণী ; ত্রিতাল-দাদরা-খেমটা-কাহারবা-কাওয়ালি-তেওরা প্রভৃতি তাল; গানের আস্থায়ী অন্তরার ভাগ — এ সবই তাঁর অনেক গানেই প্রায় অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়। বিশেষ করে প্রথম

দিকের কিছু রচনাতে রাগরাগিণীর চমৎকার একটা ঘনীভূত চেহারা পাওয়া যায়। ইমন রাগে মায়ার খেলার 'পথহারা তুমি পথিক যেন গো' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গানে রাগের স্বচ্ছন্দ বিহার কথাকে ব্যাহত তো করেইনি, বরং গানের লঘু রোমান্টিক মেজাজে কাব্যের স্পর্শ এনে দিয়েছে। এ সময়ের আরও অনেক গান সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। বোধহয় ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক আবহাওয়া ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোতে রাগোচ্ছ্বাস তাঁর প্রথম দিকের রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এসব গানে যে গুণ দেখতে পাই, তাঁর ব্রহ্মসংগীতের ধ্রুপদেও সেই একই গুণ, তফাত কেবল ওজনে। তবে এখানে তিনি সার্থক স্রষ্টা হলেও মৌলিক স্রষ্টা নন, বিদ্রোহীও নন। ঠাকুরবাড়িতেই তখন এমন গান অনেক রচিত হচ্ছিল, তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সংগীতপ্রতিভার বিকাশ ঠাকুরবাড়ির প্রভাব থেকে সরে আসার পর। রাগরাগিণীর প্রভাব তিনি কোনওদিন সম্পূর্ণ ভাবে কাটাতে পারেননি। কিন্তু যে জিনিসটা ক্রমে দেখা দিল, সেটাতে রাগ-সংগীতের শুদ্ধতা আর বজায় রইল না, রইল কিছু রাগের পর্দা, এবং তার সঙ্গে যোগ হল বিশেষ একটি নতুন ঢং। ইমনেরই আরেকটা উদাহরণ দিলে এটা বোঝা যাবে। 'পরবাসী, চলে এসো ঘরে' গানে ইমনের রং আছে, কিন্তু এ গান রাগসংগীতের কথা মনে করায় না। এ হল খাঁটি রবীন্দ্রসংগীত।

তফাতটা আসছে প্রথমত ছন্দ থেকে। এই ছন্দের যেটা বিশেষত্ব, সেটা বারো আনা রবীন্দ্রসংগীতে পাওয়া যায়। সেটা হল কথার ছন্দের প্রতি এর আনুগত্য। 'পথহারা' গানে ইমন রাগ যেন তার গণ্ডির মধ্যে অবলীলাক্রমে কথাকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, আর দ্বিতীয় গানে কথার ভাব ও ছন্দ যেন গানের রাগ ও ছন্দের উপর কর্তৃত্ব করছে, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রাখছে। অথচ প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি বলে তাদের ফেলেও দেওয়া যায়নি। রাগের এই অপ্রতিহত চেহারাটা অনেক রবীন্দ্রসংগীতেই পাওয়া যায়। আর তারই পাশে পাশে পাওয়া যায় ছন্দের একটা কাব্যঘেঁষা ঢং। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বরলিপিতে রাগের উল্লেখ নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মার্গসংগীতের সঙ্গে যাদের সামান্য পরিচয়ও আছে তারা রাগের এই আভাস লক্ষ করে তার ইম্যাসকুলেশনে আক্ষেপ বোধ না করে পারে না।

এবারে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দের দিকটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, কাব্যের যেটা ছন্দ, সংগীতের সেইটেই লয়...অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই উক্তির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত কয়েকটি নতুন তালের উদাহরণ দেন। এই তালে গানও রচনা করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে একটি ন-মাত্রার ও একটি এগারো মাত্রার দুটি গানের স্বরলিপির প্রথম কয়েকটি লাইন নীচে দেওয়া গেল।

১. নব তাল

II না র্সা ঋা I ঋা র্সা র্সনা -দা না র্সা I র্না দা দা I পা পক্ষা গা গা ঋা সা I
ব্যা কু ল ব কু লে র ফু লে ভ্র ম র ম রে প থ ভু লে
I সা মা মা I গা গা মা দা না র্সা I র্না র্সা র্গা I ঋা র্সা র্না দা না দা I
ভ্র ম র ম রে প থ ভু লে ভ্র ম র ম রে প থ ভু লে

২. একাদশী তাল

II রা পা মা I গা রা রা রা I গমা মা গা পমগা I
কাঁ পি ছে দে হ ল তা থ র থ র ০
I রা গা মা I পা ধা ধা পধা I পধা পা মগা রা I
চো খে র জ লে আঁ খি ভ০ র ভ০ র০

দুটি গানেরই বাকি অংশের চেহারা ঠিক প্রথম দিকের মতোই, অর্থাৎ প্রতি লাইনের প্রত্যেকটি মাত্রা উচ্চারিত, এবং কোথাও যতির কোনও চিহ্ন নেই।

সংগীতরসিক মাত্রেই বুঝবেন যে এ গান গাওয়া যায় না, কারণ এতে দম নেবার কোনও সুযোগ রচয়িতা রাখেননি। তাহলে এই রচনার অর্থ কী? রবীন্দ্রনাথ কেন এমন অসাংগীতিক তালের উদ্ভব করলেন? এর একঘেয়েমির দিকটা বাদ দিলেও তালের গাণিতিক দিকটা এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার কোনও সমর্থন তো কোনও সংগীতরীতিতে পাওয়া যায় না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে গান যদি আবৃত্তি করা যায়, তাহলে স্বভাবতই প্রথমটিকে দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয়টিকে হয় বারো না হয় চোদ্দ ধরে নিতে হবে। পয়ার যখন সুর করে পড়া হয়, তখন তাকেও ষোলোমাত্রা ধরে নিয়ে শেষের দু-মাত্রার দম নিয়ে নেওয়া হয়।

সৌভাগ্যবশত, ছন্দের সেই বিদ্রোহী চেহারাটা খুব কম রবীন্দ্রসংগীতেই পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল যে সমস্ত গান, তার বেশির ভাগেই ছন্দের এই যান্ত্রিক দিকটা দেখা যাবে। কিছুটা হয়তো নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনে গানের বক্তব্য আরও বেশি পরিষ্কার করার জন্য তাঁকে এ রীতি অবলম্বন করতে হয়েছিল, কারণ নৃত্যনাট্যের গানেই এই আড়ষ্টতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পরের দিকের উদাত্ত ভাবের বা রৌদ্ররসের অনেক গান ছন্দের দুর্বলতার জন্য ব্যর্থ বলে মনে হয়। 'ঐ মহামানব আসে' বা 'আগুন জ্বালো'র সঙ্গে যে কোনও একটি ব্রহ্মসংগীতের ধ্রুপদের তুলনা করলেই এটা বোঝা যাবে। দ্বিতীয় গানের স্বভাবতই লঘু ত্রিমাত্রিক ছন্দের সঙ্গে সুরে বাউলের ধাঁচ মিশে যা হয়েছে, তা যতই আস্ফালন করুক না কেন, এ গান সংগীতের বিচারে সুরফাক্তা তালের ব্রহ্মসংগীত 'শান্তি কর বরিষণ'র চেয়ে কম শক্তিশালী হতে বাধ্য।

এখানে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আরেকটা গুরুতর প্রশ্নের উত্থাপন করতে হয়। গানের ভাবে ভাষায় সুরে ছন্দে শিষ্টাচারের যে অমোঘ নিয়ম রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর ধরে মেনে এসেছিলেন, সে নিয়ম কি সমের নিয়ম বা বাদী সংবাদীর নিয়মের চেয়ে কিছুমাত্র কম inhibiting? এই যে বকুল-পারুল-টগর চামেলির সম্ভার, এই যে শরতের আলো, ফাগুনের রং, বরষার গুরুগুরু, বসন্তের হাওয়ার হিল্লোল যা মনের দোলায় দেয় দোল, এই যে মনের বীণার সুরের পরশ, হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেদনার ঝংকার — এই যে দূরে যাওয়া কাছে আসা আধো চাওয়া আধো হাসা — এও কি 'কৈসে পনিঘট জাঁউ' আর 'পিয়া পিয়া পাপিয়া' আর 'ভরুভরু আঙ্গ আঁখিয়ার' মতোই ফরমুলা নয়, cliché নয় — আজকের দিনে ঠুংরির গানের কথার মতোই যা প্রায় অর্থহীন? এ কথায় বিদ্রোহের ছাপ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'অধিকাংশ আধুনিক গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে।' তা সত্ত্বেও বাউল-ভাটিয়ালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দরদ ছিল। তাই তিনি লিখলেন : 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ'। সুর লোকসংগীতের, কিন্তু ভাষা ভদ্র মার্জিত। প্রশ্ন ওঠে—এ সংগীতের স্থান কোথায়? পদ্মার বুকে পানসিতে নয় নিশ্চয়ই, কারণ কর্তার হাতে বৈঠা দেখলে যে মাঝি হাসবে। এ গানকে যদি গ্রাম-প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষিত, দরদী-নাগরিক মনোভাবের সংগীতরূপ বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে—সে গানে লোকসংগীতের সুর কেন ছন্দ কেন?

রবীন্দ্রসংগীতের যা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর সেরা ছবির মতোই সতেজ, সাবলীল ও অননুকরণীয়। এখানে রাগরাগিণীর প্রশ্ন আসে না, বাউল-কীর্তনের প্রশ্ন আসে না, বাদী-সংবাদীর প্রশ্ন আসে না। এখানে সবই আছে, আবার সবই যেন নতুন। এমনকি এখানে কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের বিচারটাও অবাস্তব বলে মনে হয়, কারণ সব শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনার মতোই এ গানও বিশ্লেষণের উর্ধ্বে। এসব গানের আদর্শ গীতরূপ আজ স্বপ্নের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু অনেকের মধ্যে কিছু নাম বেছে দিলাম, কারণ গায়কের যদি অভাব হয়, যাঁরা এই গান জানেন, তাঁরা এই গান কল্পনা করেও অনেকটা রস পেতে পারেন : 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী', 'অন্ধজনে

দেহ আলো', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', ' মোর বীণা উঠে কোন সুরে বাজি', 'যদি তারে নাই চিনি গো', 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে', 'বাজিল কাহার বীণা', 'না যেয়ো না যেয়ো না কো', ' বেদনা কী ভাষায় রে' 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে', 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর'।

৪

তাঁর গান সুগীত হচ্ছে না এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করলেও তাঁর স্বরলিপির হুবহু অনুসরণ নিয়ে তিনি কোনওদিন কিছু বলেছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর গান কীভাবে গাওয়া উচিত, শেখানো উচিত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শেষ উক্তি হল :

> একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে, গান শিখিয়ো। এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর যদি তোমরা স্টিমরোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপটা হয়ে যাবে। আমার গান যাতে একটু রস থাকে, তাল থাকে, দরদ থাকে, মীড় থাকে, তুর চেষ্টা তুমি করো।

এছাড়া আরও একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি শুধু আমাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম, বলতে হত, আমার গান সাহানা গাইছে।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রসংগীত কীভাবে গাওয়া উচিত, এবং সে ব্যাপারে স্বরলিপির ভূমিকা কী হওয়া উচিত, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই দুটি উক্তিতে আছে। দরদ, তান, রস, মীড় — এগুলোর কোনওটাই প্রধানত স্বরলিপির জিনিস নয়। সত্যি বলতে কী, স্বরলিপিতে অধিকাংশ গানেরই যে চেহারাটা পাওয়া যায়, সেটাকে চ্যাপটা বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। সেটাকে হুবহু অনুসরণ করে যদি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যে গুণবোধের কথা বলেছিলেন তার কোনওটাই গানে পাওয়া যাবে না। গায়ককে সব সময়ই তার ক্ষমতা অনুযায়ী গানের মূল কাঠামো ও ভাব বজায় রেখে ওই চ্যাপটা চেহারায় প্রাণ-সঞ্চার করতে হয়। তার মানে গানে কোনও অতিরিক্ত তান প্রয়োগ নয় ; তার মানে যেটুকু না করলে নয়, সেইটুকুই। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে সাহানা দেবী স্বরলিপির পাখি-পড়া পুনরাবৃত্তি করতেন না, কারণ সেটা করে গানের প্রতি দরদ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাকে ভালোবাসা যায় তার আসল রূপের পরিবর্তন কেউ সাধ করে করে না, কিন্তু সামান্য সাজগোজ করালে যদি তার রূপ আরও খোলে তাহলে সেটাই বা করা হবে না কেন? সাহানা দেবী রবীন্দ্রসংগীতকে যেভাবে সাজিয়ে উপস্থিত করতেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না এই কারণেই যেন এতে তিনি তাঁর গানের আসল রূপটি নতুন করে ফিরে পেতেন।

রবীন্দ্রনাথের গান যে আজকাল খুব ভালোভাবে গাওয়া হচ্ছে না তার একটা সোজা কারণ অবশ্য এই যে ভালো গাইয়ে ছাড়া ভালো গান ভালোভাবে কেউ গাইতে পারে না। এসব গাইয়েদের অধিকাংশই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মাঝারির দলভুক্ত। অথচ এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন, এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটুকুও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে স্বরলিপি ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। সুতরাং স্বরলিপির দিকটাই আগে দেখতে হবে।

এ বিষয়ে কিছু বলার আগে আমি রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপরিচিত গানের তিনটি বিভিন্ন স্বরলিপির প্রথম দু-লাইন করে তুলে দিচ্ছি। প্রথমটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের করা, দ্বিতীয়টি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও তৃতীয়টি সরলা দেবীর।

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে....'

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

I া সা রা II রগা গা গা I গা গা গা I ^মা -া গমগা I
০ আ মি চি নি গো চি নি তো মা ০ ০০০

I রা -া রগা I রা -গা রা I রা -পা স্মা I পধপা -া -া) I -া
রে ০ ওo গো ০ বি দে ০ শি নী০০ ০ ০ ০

২. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I া সা রা II গা গা গা I গা গা গা I গমা -গপা -মগা I
আ মি চি নি গো চি নি তো মা ০ ০০ ০০

I ᵍরা -া রা I রা -গা ᵍরা I রা -পা পস্মা I ᵈপা -া -া I -া
রে ০ ও গো ০ বি দে ০ শি নী ০ ০ ০

৩. সরলা দেবী

I া সা রা II গা গা গা I সগা গা গা I মা -া মগা I
আ মি চি নি গো চি নি তো মা ০ ০০

I রা -া রগা I রা গা রা I ধা পা স্মা I ধপস্মা -া পা I -া
রে ০ ও০ গো বি দে ০ শি নী০০ ০ ০ ০

বলা বাহুল্য, এই তিনটেই রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালে রচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনওটার সঙ্গে কোনওটার হুবহু মিল নেই। অথচ এটাও ঠিক যে, এর কোনওটাই এমন নয় যে এতে মূল গানটা চেনা যায় না। এখানে কি সব কটিই ঠিক বলে মানতে হবে? তাহলে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ রূপ বলে যে কথাটা বলা হয়, তার কী হবে? পরস্পরে এমন বেমিল কিন্তু শুধু একটা নয়, একাধিক গানের স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে। সেখানে গায়ক বা শিক্ষকের কী করা উচিত?

এখানে শুধু একটি ছাড়া আর রাস্তা নেই। সংগীতের বিচারে যে স্বরলিপি সবচেয়ে ভালো, তাকেই বেছে নিতে হবে। এ বিচারে গানের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের রচনার স্বভাব—এ দুটো জিনিসই খেয়ালে রাখতে হবে।

'চিনি গো চিনি'-র মূল মেজাজে, কথা বাদ দিয়েও, একটা বিদেশি ভাব আছে। তার কারণ এর ছন্দের চালটা ঠিক দিশি নয়, এটা কতকটা waltz-এর মতো। এ চালটা রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই আছে—যেমন 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে', 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'আমাদের শান্তিনিকেতন'—ইত্যাদি। যুবা বয়সে বিলেতের ভিক্টোরীয় পরিবেশে waltz-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়াটা অসম্ভব নয়। হয়তো এ ছন্দে তিনি ইংরিজি গানও গেয়েছেন। যাই হোক, waltz-এ তার সহজাত ত্রিমাত্রিক ছন্দটাকে প্রাধান্য দেবার জন্য তার সুরের অলংকারটা খুব হিসেব করে প্রয়োগ করতে হয়—বিশেষ করে প্রথম লাইনেই যদি একটা গিটকিরি চোখে পড়ে তাহলে মনে সন্দেহ জাগে। দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির প্রথম লাইনের তোমারে-র মা-তে গমা-গপা-মগা সেই কারণে অন্য দুটির তুলনায় কম গ্রাহ্য বলে মনে হয়। আবার সরলা দেবীর স্বরলিপিতে চিনি তোমারে-র চি-তে সগা একটু বেশি মাত্রায় বিলিতি বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপিতে প্রথম তাল যেখানে পড়ছে সেই চি-তে রগা দিনেন্দ্রনাথের গা-এর চেয়ে ভালো, কারণ তালের আরম্ভে ওই ধাক্কাটায় একটা মজা আছে। গানের বিদেশিনী-অংশে সরলা দেবীর রা ধা পা স্মা ইত্যাদি নেহাতই বিলিতি এবং অ-রাবীন্দ্রিকও বটে। এই অংশে দিনেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুটোই চলতে পারে, তবে সব মিলিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনুসরণ করাই উচিত বলে মনে হয়।

এক স্বরলিপির সঙ্গে আরেক স্বরলিপির, অথবা সুরের পরিচিত চেহারার সঙ্গে স্বরলিপির প্রভেদের দৃষ্টান্ত যেখানেই আসবে, সেখানেই এইভাবে তুলনামূলক বিচার ছাড়া গতি নেই। যে কোনও গানেরই একই সুরে বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত মুহূর্তে মীড় গমকের প্রয়োগভেদে তার চেহারার যে তফাত হয় তাতে কোনও শ্রেণীর ভারতীয় গানেরই কোনও অনিষ্ট হতে পারে না, বা গানের রচয়িতার প্রতি অশ্রদ্ধা

প্রকাশ হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ গানের যে স্বরলিপি আছে, তাতে মীড়-গমক কমই আছে। এ গানের অনেকগুলিই কোরাসে গাওয়া হত বলে এ স্বরলিপি তার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু একা গাইতে গেলে এ স্বরলিপিতে সামান্য অলংকরণের প্রয়োজন হবেই, কারণ মনে রাখতে হবে এখানে রাগ-তাল মিলিয়ে গানে ষোলোআনা রাগসংগীতের মেজাজ। স্বরলিপিতে আছে —

II ণা -া পা I মরা -মা পা I ণা -মা -পা I ^পর্সা -া -া I

ম ন্ দি রে০ ০ ম ম ০ ০ কে ০ ০

কোরাসের পক্ষে এটা ঠিক। একক কণ্ঠে গাইতে হলে সংগত হবে—

II ^পণা -া ^পপা I মরা ^মপমা পা I ^পণধণা -মা -পা I ^র্সণর্সা -া -া I

ম ন্ দি রে০ ০০০ ম ম ০ ০ কে ০ ০

রবীন্দ্রনাথের অনেক রাগাশ্রিত গান আছে যা গাইবার সময় সামান্য এদিক ওদিক হলে তার কোনও ক্ষতি হয় না ; বরঞ্চ স্বরলিপির নিরেস পুনরাবৃত্তিতেই তার সৌন্দর্যহানির সম্ভাবনা বেশি। স্বরলিপিতে আছে —

র্সা র্সা II ^ধণা -পা -া মা I ^মপা -ঞ্জা -মা -জ্ঞা I ^ধণা -পা না না) I র্সা

ও হে সু ০ ন্ দ র ০ ০ ০ ম ০ রি ম রি

এটা যদি এইভাবে গাওয়া যায় তাতে কোনও দোষ নেই —

^পর্সা র্সা II ^ধণা -া -া ^পমা I পা -জ্ঞা -মা জ্ঞমা I ^পণা -পা না না I র্সা

ও হে সু ' ০ ন্ দ০ র ০ ০ ০ ম ০ রি ম রি

গানের কোনখানে তার মোক্ষম বিশেষত্ব সেইটে বুঝতে না পারলে বিকৃতি হল কী না হল, বা কী পরিমাণে সে বিকৃতি গানের ক্ষতি করল, সেটা বোঝা যাবে না। সে বিশেষত্ব ছন্দে থাকতে পারে, যেটার সঙ্গে শব্দের বিভক্তি জড়িত, অথবা সেটা সুরে থাকতে পারে। সবচেয়ে বেশি সাবধানতার প্রয়োজন সেখানেই, যেখানে গান একেবারে মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। যেমন —

II ^পর্সা -া র্সা I সা র্সা -া I র্সনা -া না I ^নধা পা -া I

কা ন্ না হা সি র দো ল্ দো লা নো ০

^পনা -া না I ^নধা পা -ম্মা I পা দা -া I -া -া -া I

পৌ ষ ফা গু নে র পা লা ০ ০ ০ ০

I দা দা -া I দা -া পা I ^পমা -া -পা I দা ^দপা -া I

তা রি ০ ম ধ্ ধে চি ০ ০ র জী ০

এ গান শুনলে সহজেই বোঝা যাবে যে এর বিশেষত্ব হচ্ছে 'পালা'-র 'লা'-তে আচমকা কোমল ধৈবতের প্রয়োগ। পুরো গানটাতেই সুরের মধ্যে দ্রুত রং পরিবর্তনের দিকটা লক্ষণীয় এবং সেটা গানের কথার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সংগতি রক্ষা করেছে। এখানে যদি এর দ্বিতীয় লাইনের স্বরলিপি এইভাবে করা হয় —

^পনা -া না I ^নধা ধা -না I ধা পা -া I -া -া -া I

পৌ ষ ফা গু নে র পা লা ০ ০ ০ ০

এবং এর পরে তারি-র তা-এ যদি প্রথম কোমল ধৈবত লাগে, তাহলে সুর তৎক্ষণাৎ একটা মামুলি চেহারা নেয়। এইভাবে গাওয়া বা স্বরলিপি করা হলে সত্যিই বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের রচনার সর্বনাশ হয়েছে।

তবে এটাও ঠিক যে, সুর বা ছন্দের দিক দিয়ে যে সব গানে তেমন কোনও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য

থাকে, সেগুলি বিকৃত হবার সম্ভাবনাও কম, কারণ তাদের বৈশিষ্ট্যের জন্যই মনে তারা দাগ কাটে বেশি।

কিন্তু শুধু সুর বা ছন্দ ছাড়াও আরও যেসব দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার, সেগুলির কোনও ইঙ্গিত স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে না।

এক হল উচ্চারণ। কথা যাতে স্পষ্ট হয় তার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান থেকে তান তুলে দিলেন। রাগসংগীতের শ্রুতি-মীড়-গমক—এ সবের ব্যবহারও কথার খাতিরেই এখানে অনেকটা কম। অর্থাৎ সুরে চেহারাটা এখানে রাগসংগীতের চেয়ে অনেকটা সহজ, সরল। তাহলে উচ্চারণ স্পষ্ট হবে না কেন? কথার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হবে না কেন? কথা যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে তার ভাবের দিকটা ব্যাহত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, কথার অস্পষ্টতা কোনও গানেই চলে না, এবং তাল্ গমকের খাতিরে ছাড়া তার কোনও বিকৃতি বা অস্পষ্টতা বরদাস্ত করা যায় না। শান্তিনিকেতনে এককালে এক ধরনের বাংলা উচ্চারণের চল হয়েছিল যেটা রবীন্দ্রনাথের তথা ঠাকুরবাড়ির একটা বিশেষ বাচনভঙ্গি থেকেই এসেছিল। সে কৌন বৌনেইর হৌরিন ছিইলোউ আউমার মৌনেই — এই ছিল সে উচ্চারণের ঢং। এ জিনিস আজকের দিনের শহরে আর চলে না, এবং একে রবীন্দ্রসংগীতের আদর্শ উচ্চারণ বলা চলে না। এখানে গানের কথাটা কেবল সুরের বাহন বলে ভেবে নিলে তার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হবে না — কারণ রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কথাকে ব্যবহার করেন নি। যেখানে সুরে তেমন বৈচিত্র্য নেই সেখানে কথা স্পষ্ট না হলে গানে আর কিছুই থাকবে না। সে গানের কদর আজকের মাঝারির বাজারে খুব একটা আশাও করা যায় না, কিন্তু তাও, তার পরিবেশন যখন বন্ধ হয়নি, তার গাওয়ার সাবেক রীতিগুলো মানতেই হবে। যিনি স্পষ্ট উচ্চারণ করবেন, শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা তাঁর পক্ষে আরও সহজ হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আরেকটা জিনিস যেটা স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে না সেটা হল গানের সংগতের নির্দেশ। সংগত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলে যাননি। এখানে সুরকারের একটা বড় দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজের গলায় শুধু তাঁর গান গেয়েছেন এবং এইভাবে অনেকের মুখেই রবীন্দ্রসংগীত ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। যাঁরা যন্ত্র ছাড়া গলা সুরে রাখতে পারেন, তাঁদের গলায় যদি দরদ থাকে, গানের ভাব যদি তাঁরা হৃদয়ংগম করতে পারেন, তাঁদের উচ্চারণ যদি সংগীতোপযোগী বিশুদ্ধতা থাকে, তবে যন্ত্র ছাড়াও গান গেয়েও রবীন্দ্রসংগীতের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন। এইভাবে গাওয়ায় কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া 'তবু মনে রেখো' গানে আছে। সব না হলেও অনেক গানই এভাবে গাওয়া সম্ভব এবং উচিত, এটা আমি বিশ্বাস করি। তালের গান তাল-সংগত ছাড়া গাইতে হলে গায়কের যে জিনিসটার দরকার সেটাকে ইংরাজিতে বলে phrasing। এতে আরও আনা গানের সঙ্গে চার আনা আবৃত্তির মিশ্রণ — যেন প্রায় সুর করে ভাব দিয়ে কথা বলা।

তবে সাধারণের জন্য এ রীতি নয়। সত্যি বলতে কী—আজকাল যা হচ্ছে, তাতে সাধারণের বাজারে রবীন্দ্রসংগীতের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কিনা সন্দেহ। সাধারণের কাছে এ গানের ভাবের মূল্য কিছুমাত্র আছে বা থাকতে পারে বলে মনে হয় না ; আর যুগটাও যে পালটেছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসংগীত বেঁচে থাকতে পারে কেবল তার সুর আর ছন্দের জোরে এবং যেটার আসলে দরকার সেটা হল এই দুটো দিককে উপযুক্ত সংগতে আরও সমৃদ্ধ করা।

ধ্রুপদের বাইরে যে গান, তাতে সংগতের কোনও সুচিন্তিত রীতি আজও পর্যন্ত চালু হয়নি। কোনও ছকে বাঁধা একই রীতি সব গানে চলতে পারে না। কীর্তনাঙ্গ গানে খোল-করতাল, ঢিমে লয়ের গানে ছড়ে-টানা যন্ত্রের সঙ্গে তবলা, আর দ্রুত লয়ের সঙ্গে তবলা এবং যা কিছু হোক যন্ত্র — এই মোটামুটি চলে এসেছে।

আর কিছু না হোক, গায়কের বিরামমুহূর্তে সংগীতের রেশ যাতে বজায় থাকে, তার জন্যই সংগতের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বার বার বলে গেলেন তাঁর গান রাগসংগীত নয়, এর মেজাজ ও উদ্দেশ্য দুই আলাদা, এটা একটা নতুন জিনিস — তখন সে গানের সঙ্গে ওস্তাদি বাজনা বাজিয়ে রচয়িতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হয় না কি? এ জিনিসটা করলে রচনায় অযথা একটা diuhotomy এসে পড়ে যেটা গানের পক্ষে কখনই মঙ্গলকর হতে পারে না। আসলে যেটা করা উচিত সেটা দুরূহ কাজ—কিন্তু সে ছাড়া গতি নেই।

গানের তাল বুঝে, মেজাজ বুঝে প্রত্যেক গানের জন্য আলাদা সংগত রচনা করা উচিত। কীর্তন জাতের গানে সরাসরি খোল-করতাল চলবে না, কিন্তু তার ছোঁয়া থাকতে পারে, কারণ সে গান আসলে কীর্তন নয়, কীর্তনের ছায়া। লোকসংগীতেও এই একই পন্থা চলতে পারে — একতারা- দোতারা ইত্যাদি হিসেব করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এখানে একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার— খাঁটি লোকসংগীতে সংগত যেভাবে কাজ করে, তা থেকে রবীন্দ্রসংগীতের সংগত রচয়িতারা অনেক কিছু শিখতে পারেন। সুরের যেমন গোড়ার কথা বাউল-ভাটিয়ালি বলা আছে, তেমনি তার সংগতে গানকে কীভাবে যন্ত্রর তালে কী সুরে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে তারও আশ্চর্য ইঙ্গিত আছে। হার্মনি না হলেও, কর্ডের ব্যবহার ছাড়া গান খোলে না। এই কর্ডের সবচেয়ে সহজ ব্যবহার সানাইয়ের পোঁয়ে। এই পোঁ শুধু সুর নয়। এই সুর বা খরজের সঙ্গে রাগের অন্যান্য পর্দা মিশে যে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির উদ্ভব হতে থাকে, সেটা সুররেখায় বর্ণাঢ্যতা প্রয়োগ করে। গান বা যন্ত্রের সঙ্গে তানপুরার 'সা পা সা' ও ওই একই কাজ করে। কিন্তু লোকসংগীতে সারিন্দা-দোতারার যে ব্যবহার, তার বৈচিত্র ও sophistication এর সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সেটা এই যে, দুটো যন্ত্রকে দিয়েই একাধারে সুরবাদ্য ও তালবাদ্যের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। সারিন্দা বাজানোর যে রীতি তাতে তো মনে হয় আরেক ধাপ এগোলেই হার্মনির গণ্ডিতে এসে পড়বে। এতে তিন তারের একটাতে বাঁধা সা, একটাতে প্রয়োজনমতো মধ্যম ও পঞ্চমের প্রয়োগ ও তৃতীয় গানের মেলডির টীকা। ছড় টানা হতে থাকে মাত্রায় মাত্রায়, এ মাথা থেকে ও মাথা, তিন তারের উপর দিয়ে একসঙ্গে। এই জমাট সুরতাল-সমন্বিত ধ্বনির বনিয়াদের উপর গান চলতে থাকে। এরই মধ্যে সারিন্দাবাদক গানের খেয়াল রেখে প্রয়োজনমতো পঞ্চমের জায়গায় মধ্যম প্রয়োগ করেন। এর ফলে গানের লয় ঢিমে হলেও সংগতের অবিরাম এনার্জি সে গানকে কখনও এলিয়ে পড়তে দেয় না।

দোতারার যে রীতি, তার সঙ্গে অন্য দেশের লোকসংগীতের সংগতে মিল পাওয়া যায়। স্প্যানিশ গিটার, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো, রাজস্থানি বীণ—এ সবই দোতারার সমগোত্রীয় এবং এর সবগুলিই সুর তাল একসঙ্গে চলে। দোতারার বাজনার ঢংয়ে যে wit, সেটাও সারা বিশ্বের নানান জাতের লোকসংগীতে পাওয়া যায়। গান শুরু হচ্ছে —

পা ধর্সা II র্সা -া -া -া I -া -া -া -া I -া -া -া I -া -া ণা ধা I পা

বন্ ধু০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বন্ ধু রে

আর সেই সঙ্গে দোতারা বলছে —

। । II পা । পা পা সা I পা । ণা ধা সা I পা । পা ধা সা I পা । ণা ধা সা I পা

wit ওই কোমল নিখাদ ও ধৈবতের ব্যবহারে। সংগত যেন এখানে বলছে — তুমি কোন পথে যাবে আমি জানি, আমিও সেই পথেই আছি, আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

গানে কথার মূল্য যাই হোক না কেন, উপযুক্ত সংগতে সে মূল্য বাড়ে বই কমে না। আজকাল সংগতের যে নিয়মটা রবীন্দ্রসংগীতে মানা হয় সেটা হল টানাটানা সুরের গানে টানা সুরের যন্ত্র ব্যবহার — তা এসরাজই হোক বা বাঁশিই হোক বা বেহালাই হোক। এছাড়া কোনও প্রচলিত নিয়ম চোখে

পড়ে না। টানা গানের সঙ্গে যদি টানা যন্ত্রে তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তাহলে সংগীত টটলজি-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। একমাত্র অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছাড়া ছড়ের যন্ত্রে গানের সৌন্দর্যবৃদ্ধির কোনও দৃষ্টান্ত আমি দেখিনি। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে রাগসংগীতের জ্ঞান ও রীতির সাহায্যে। এ জিনিসও মাঝারির কম্‌মো নয়। কাজেই সংগতে একজনের উপর নির্ভর না করাই ভালো। যন্ত্রের ব্যবহারে দিশি-বিলিতি বাছবিচার না থাকাই ভালো, তবে হাওয়াইয়ান গিটার হারমোনিয়ামের চেয়েও অনেক গুণে বেশি অসহ্য। ওটা দূর না করা অবধি নিশ্চিন্তি নেই। তবলার সংগতে ওস্তাদি মেজাজটাই বড় চট করে এসে পড়ে। ওটা ব্যবহার করতে হলে তানবিস্তারের রাস্তাও খুলে দিতে হয়। কাজেই ওটার বদলে যন্ত্রকেই তালের কাজে লাগানো উচিত।

কাজে করার চেয়ে মুখে বলা সহজ তা জানি। আর কাজও অনেক। বললে যদি কাজের লোক কিছু করে তারই চেষ্টা। এটা ঠিক, অবিলম্বে কিছু না করলে, কেবল স্বরলিপির শুদ্ধতা নিয়ে মাতামাতি করে বা সংগীত শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে বা সিনেমা-রেডিয়ো-গ্রামোফোনে গান গেয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
(কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

কমলকুমার মজুমদার

বঙ্গীয় শিল্পধারা

হয় কী, একটি ত্রিকোণ যখন কেবলই সাদা কাগজের স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তখন উহা তাহার নিজত্বের ভিতরেই থাকে ; আমরা বেশিক্ষণ উহার দিকে চাহিতে পারি না, সঠিক কালক্ষেপের সহজ বাস্তবতা উহার মধ্যে কতটুকু ; ওই বাস্তবতা অত্যন্ত নির্লিপ্ত, কোনও কিছুর নামমাত্র চিহ্ন সেখানে কই, যে আলো আর তাহার সম্বন্ধের — সমস্ত জগতের নামরূপ অন্তত বহন করিয়া আনে। এবং যে কোনও নির্দিষ্ট লোকের বাস্তবতার সহিত সহজে মিলিয়া যাইতে পারে। এতদিনকার এই অস্তিত্বের সহিত সাধারণত মুখ্য উদ্দেশ্যের কোনও যোগ নাই। এই বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে দৃঢ় হইলেও ছোট একটি অপরিচিত বুদ্ধির মতোই পড়িয়া আছে ; তথাকার এই রূপ হইতেছে সেই রূপ যাহার সহিত আমাদের আন্তরিক যোগসূত্র বুঝি নাই। জানি না, বলিলে উচিত হইবে কী না, যে, আপনার অস্তিত্বকেই সেইখানে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, ইহাকে উচ্চৈঃস্বরে নিন্দা করিবার সময় আমাদের নাই। ইহা আমরা অনেক সহজে বলিতে পারি, কিন্তু উহাকে নহে — যেখানে উল্লেখ আছে আপনার অস্তিত্বের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কতটুকু। প্রথমটির চেতনার সবটুকু নামরূপ দেখা যায়, দ্বিতীয়কে কী বলিতে পারি এমন কথা জানা নাই। আমাদের দৃষ্টির সহিত তাহার হয়তো বা একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ইহা শুধুই কঠিন বস্তুর মতন, যাহা চতুষ্কোণ, যাহা যে কোনও আকারের! তাই কোনও নিজস্ব সম্বন্ধকে ঝটিতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে না, বা কোনও অন্যরূপকে আশ্রয় করে না, কেন না ঠিক সেই সম্বন্ধটিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আর এক রূপ পরিগ্রহ করে না, সেখানে আলোর লীলা কিছু সাহায্য করে হয়তো, ফলে সেখানে আলো যেমন পরিবর্তিত হয় রঙে, স্থান যেমন পরিবর্তিত হয় অবয়বে, আর আমাদের বদ্ধ অন্ধকার এবং সম্মুখের আলোকরেখার অন্যত্ব যাহা, তাহাকে অল্প সম্পূর্ণত অন্যরূপে মানিয়া লওয়া যায় না, সম্ভবও নহে। অন্তরের ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত তাহার যোগসূত্র থাকিলেও নাই। কিন্তু যখন ত্রিকোণ কথা হইয়া যায়, যথা 'অনন্ত ত্রিকোণ', উহা আর আলো ধরে না, আর স্থান অধিকার করে না, উহা শব্দরূপ হইয়া যায়। এবং সহজেই আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি বোধে লইয়া আসে, আমরা বুঝি। শব্দরূপটি আমাদের প্রাণে বড় বেশি জুড়িয়া আছে, শব্দের দিক হইতে আমাদের একটি বিশেষ রূপ আছে, আর তাহার সহিত একটি সম্বন্ধ আছে, যাহা ইহা অপেক্ষা জড়। নিছক শিল্পে শব্দের স্থান নাই, যতটুকু বা থাকে তাহা তুলির সহিত কাগজের, ছোটখাটো খসখসেই পরিণতি পায়, শেষ হইয়া যায়। কিন্তু শব্দের ব্যাপারে এইটুকু অর্থহীন শব্দটা একটু বড় রকমের।

কোনও স্থানে আমাদের রহিতে হইবে। শব্দের ঈঙ্গিত লইয়া সব কিছু পার হওয়া সম্ভব নহে, সব বাস্তবতাই আপনাকে বিলীন করে না। বিশেষত এ বাস্তবতা নিছক আলোর, নিছক স্থানের। তাহা কোনও মায়া সৃষ্টি করে না। এইখানে সেই হেতু একটি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, কেননা আলোর সাহায্যে স্থানটা কোনওদিন ঘটনা হয় না, তথা এমন একটা বাস্তবতা হয় না যাহাকে সহজেই শব্দে রূপান্তরিত করা যায়। তাহার নিজস্ব রসটা মানিয়া লওয়াই এইখানে উচিত এবং উহাকে আমাদের অগোচরে মানিতেই হয়। এবং আরও প্রমাণ সেটা যখন কথায় আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। রস পাই না তাহার আরও একটি কারণ যে, কতকগুলি দূরত্ব সঠিকভাবে আমরা মনে রাখিতে সক্ষম নই, সেইগুলি কোথায় যেন জড়িভূত হইয়া যায়, এবং এক-একটি দূরত্ব আপনার সত্যকে রূপ দিতে সাহায্য

করে না। সমস্ত দিক হইতে একটি সমতা আমাদের মানিয়া চলিতে হয়, এবং সে সমতা শুদ্ধভাবে আমাদেরই সমতা, সেই সত্যটি ক্রমাগত অতীত হইলেও চিরবর্ত্তমান। এবং স্বয়ং একটি কার্যশক্তি। ইহা কিন্তু আমরা ভুল করিব না যে, সেটা সংযম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই শক্তিটি আপনাকে সমস্ত সম্বন্ধের সহিত বড় উত্তমরূপে দেখে, কোনওক্রমেই একটি মাত্র বিচারকে আশ্রয় করে না।

এই সমতা অল্পের থাকে। কারণ অল্পই অতীতকে অতীত বলিয়া মানে, যাহা জনসাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। অতীত তাহার ঠিক একটি রেখায় পরিবর্তিত হয় না, ঠিক একটি সম্যক রূপ না। কোনও লোকে বলে অতীতই চিরবর্তমান, আমরা কিন্তু সেই কথা বলিতেছি না। অতীতের কতকগুলি সত্য অদ্য আমরা মুহূর্তে হাতে হাতে পাই, যাহা অতীতে যায় না, উহা তেমনই আছে, যাহার দূরত্বই আমাদের নিকট বর্ত্তমান, যাহার রহস্য ক্রমাগত যুগে যুগে আলোক ভেদে, বহু অর্থ ধরিয়াছে, সেই কথা আমাদের নহে। অদ্য আমরা বহুভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি, যদিও দেহে আমাদের কোনও রং নাই, যেমন অন্য প্রাণীসকলের আছে ; সুধীরা বলেন আমাদের কিছুই বশ করিতে পারে না, তাহা হইলেও দেখা যায়, মানসিক বৃত্তির কোনও উন্নতি অনেকের হয় নাই। তাহারা শিল্পকে ঠিক শিল্প বলিয়া লইতে পারে না, মহেঞ্জোদারো হরপ্পায় যে মৃৎপাত্র দেখিতে পারেন, যে পুতুল দেখিবেন — আজও ভারতের বহু জায়গায় সেই কাজ দেখা যায় (উহা যে অবয়বের একটি সীমা আছে বলিয়া — সেই দিক হইতে আমরা বলিতেছি না), ঠিক তেমনি জনসাধারণের কোনও বদল হয় নাই। অন্তত বদল হইয়াছে একথা অনেকে মানিলেও কেহ কেহ আবার মানেন না, তাঁহাদের ধারণায় জনসাধারণ যেমন ছিল তেমনই আছে, কোনওরূপ সূক্ষ্মবৃত্তি বা সুকুমারবৃত্তি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। হয়তো কর্মক্লান্তির পর তাহা না থাকাই সম্ভব। রস উপলব্ধির ক্ষমতাকে তাঁহারা নিন্দা করেন, আপনার সহিত পরিচয় ধৃষ্টতার নামান্তর — ইহাই বিদগ্ধ সমাজের রূপ।

অনুমানের বাস্তবতা আমাদের মনকে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। জনসাধারণ এমন জায়গাকে মানিয়া লইয়াছে, যেখান হইতে তাহার সম্মুখের সমস্ত বাস্তবতাই আবছায়া, স্পষ্টভাবে আলোকসম্পাত সেখানে কোনও রূপের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেয় না। অনুমানই তাহার নিকট পন্থা। সাধারণ সত্যগুলি সেইখানে তাহাকে অনুমান হইতে বিশ্বাসে লইয়া আসে না, যে বিশ্বাস তাহাকে সমস্ত রহস্যের সহিত পরিচয় করাইবে। ইহা না হওয়ার অর্থনৈতিক কারণ আমরা যতই দিতে চাই তাহার মধ্যে সত্য কতটুকু! অর্থনৈতিক কারণ বিশ্বের রহস্য নহে, যে রহস্যের আমরা হয়তো খানিক। ভালো খাওয়া-পরার উপর কিছুই নির্ভর করে না ; বিদুরের ধন ছিল না কিন্তু ভগবান তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন ; কুব্জার রূপ ছিল না ! অনুমান লইয়া বহুলোক বাঁচে। তাহার নিকট তাই চিত্রশিল্পের বাস্তবতার কোন মূল্যই নাই, ছবি দেখা ছবিকে ভালবাসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেননা প্রত্যক্ষের সত্যকে সে অবিশ্বাস করে। প্রত্যেক্ষর রস তাহার নিকট তিক্ত,কারণ নিজের নিকটই সে অপরিচিত, নিজেকেই তাহার ভালভাবে জানা নাই। বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ রূপ যাহারা জানে না, তাহারা কীরূপে রস গ্রহণ করিতে পারিবে! চিত্র-চেতনাকে রূপান্তরিত করে বিশ্বপ্রকৃতি, তাহার ঝড়, তাহার জল, তাহার অনন্ত আকাশ, তাহার আলোক-চাপল্য, তাহার মহিমা...। সেই মহিমাকেই সম্পূর্ণত প্রাণের ভিতর না পাইলে কেমন করিয়া আসিবে সেই চেতনা, যে চেতনা অপ্রত্যক্ষরূপে ক্রিয়া করিবে একের ভিতর। অধ্যাত্মভাব না থাকিলে আপনি সবকিছু পাইতে পারেন, কিন্তু রূপরসের কিঞ্চিন্মাত্র পাইবার যোগ্যতা আপনার থাকিবে না। সেই বাস্তবতাকে আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা হইবে না। এই অনুমান যখন প্রত্যক্ষের সত্য দিয়া ভাঙিয়া যায় তখনই একটি অস্তিত্বের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি, যে পরিচয় আমাদের দৃষ্টিদান করে, এবং নব নব বাস্তবতার সহিত আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি।

বাংলা দেশের সমস্ত দিক হইতে নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। সমস্ত দিক হইতে বাংলা দেশ

স্বতন্ত্র। যদিও ভারতের মধ্যে সে একটি প্রদেশ মাত্র, সেই তুলনায় তাহার ঐশ্বর্য অনেক। বাংলা দেশে আবির্ভাব হইয়াছে নূতন নূতন বিশ্বাসের এবং বাস্তবতার। ধর্ম কাব্য চিত্র সংগীত — ইহাদের সহিত বাঙালির নাড়ির যোগ রহিয়াছে। ভারতের ভগবানের কোনও আদর্শ নাই বলিলে হাস্যকর হইবে, তেমনই বাঙালির শিল্পের কোনও আদর্শ নাই এই বাক্য যদি কেহ বলে, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে বিদ্রুপ করিবে। এই আদর্শ কীভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা কিছু কিছু জানি। অন্যান্য দেশে আমরা বহুদিন যাবৎ কোনও উল্লেখই পাই না, কারণ সেইখানে নাকি অনেক যুদ্ধ হইয়াছে, অনেক লোক হতাহত হইয়াছে, এমনটি বাংলা দেশে যে হয় নাই তাহা নহে, তবু তাহার আদর্শের প্রতি গভীর ভক্তির হেতুই বাংলাকে ক্রমাগত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এবং আজ তাই আমাদের একটি বাস্তবতা পাইবার সুযোগ দিয়াছে। বাংলা দেশ শিল্পকে কোনও নামেই জীবন থেকে বাদ দেয় নাই। সমস্ত সময় শিল্পকে আলিঙ্গন করিয়া ছিল। এমনভাবে থাকা তখনই সম্ভব যখন তাহার মধ্যে কিছু বাস্তবতা থাকে এবং সেই বাস্তবতা তাহাকে রাত্রদিন আনন্দ দেয়। সমস্ত শিল্প ও কাব্যকে যে খুব বিচার করিয়াই ভালোবাসা হইত তাহার বহু বহু প্রমাণ আমরা পাই এবং সে শ্রদ্ধা তাই কালের নিয়মে দেশ ছাড়িয়া কোনও অজুহাতেই যাইতে পারে নাই। একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই শিল্পের আদর্শ, নিছকভাবে শিল্পের আঙ্গিককেও ভারতের বাহিরের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আজ তুলনামূলকভাবে দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের শিল্পাঙ্গিকের বাস্তবতাটা আমাদের ধারণা, অন্য দেশ নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিবেন। এই কথা বলিলে হয়তো ধৃষ্টতা হইবে না যে, তাহা অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারে। কারণ এর, বাংলার শিল্পাঙ্গিকের সমস্ত দিক হইতে একটি সর্বজনীনতা আছে। এবং একমাত্র বাংলার আলোক ব্যাতিরেকে, যে কোনও দেশে যে কোনও আলোকে একই থাকে, কৌতুহল হইতে আনন্দই বেশি দেয়।

এতই যদি বাস্তবতা থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিল্পীরা সকলে তাহাকে স্বীকার করেন না কেন, এই কথা স্বভাবতই উঠিতে পারে। তাহার কারণও আমরা জানি, এবং সেই কারণে ব্যাপক প্রচার হইতে পারে নাই। কিন্তু ঘরে ঘরে তাহাকে বিস্মৃত হয় নাই, ঘরে ঘরে তাহার নিত্য পজা হইয়াছে। আর আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের মধ্যে তাহার প্রাণবস্তু আছে। আবার কাহারও মধ্যে তাহার হুবহু অনুশীলন দেখা যায়। ইহারা প্রত্যেকেই নানান দেশের নানান শিল্পপদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলেও এই রসকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ঠিক এই নিজস্ব বাস্তবতা, যাহা বাংলার শিল্পাঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে ইহা তো ছিল, কিংবা অন্য কোথাও আছে। এই কথা সত্য যে অন্যান্য দেশের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রভাব ব্যতীত এইখানে একটি শিল্পাঙ্গিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে বঙ্গের অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে। বাংলার নিজস্ব শিল্পাঙ্গিকের মধ্যে প্রভাবের এখন আর চিহ্নমাত্র নাই বলিলে ভুল বলা হইবে না। এই কথা সকলেই স্বীকার করেন। যদিও সমগ্র ভারতে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতম্' কথার কতটুকু অর্থ ছিল বা আছে তাহা বিবেচনা করা দরকার। নিয়তির নিয়ম তাহারা মানিত না, মানিত না সেই বিষয়ে ইতঃপূর্বে বহু গুণী বহু আলোচনা করিয়াছেন। এবং আমরা আমাদের, তথা ভারতের শিল্পকলায় দেখিতে পাইব এ কথাটি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পালন করা হইয়াছে। সারা জগৎ যখন অর্ধ আলোকে কিছুটা অনিত্যের বাস্তবতা লইয়া ছবি আঁকার চেষ্টা করিতেছে, ভারত তখন সত্যের সন্ধান পাইয়াছে, এই সন্ধান আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ফলস্বরূপ। শাস্ত্র কখন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহার পিছনে যে একটি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা সেই বাণী বহুদিন যাবৎ পালন করিয়াছি এবং তাই সমস্ত ভারতের পথ একরকম স্থিরীকৃত হইয়াছিল ; কিন্তু এখানে কথা উঠিতে পারে যে, সব শিল্পীই তাহা পালন করিয়াছেন। তাহা হয়তো নহে। মানসলোক

হইতে একটা যে কোনও বস্তুকে মনগড়া করিবার উল্লেখ এই বাণীতে নাই, কেননা সব বস্তুই আনন্দ দিতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আলো তাহাকে ঠিকভাবে কৃপা করে। মানসলোকে একমাত্র আলোর উপলব্ধিই সমীচীন। কেননা প্রকৃতিকে সব ক্ষেত্রেই চোখের সম্মুখে রাখার নির্দেশ আছে, প্রকৃতি এক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয় না, এই কথা নিশ্চয়ই স্থির। এইবার অন্য দিক হইতে নিয়তির নিয়মে বাহিরে কথাটা এই অর্থ করে না যে আমরা মনুষ্য আকৃতিকে যেমন-তেমন করিয়া দিব, যাহা আমাকে-আপনাকে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ দিবে বেশি। বাণীটিকে কেউ বা কোনও শিল্পী সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, অতঃপর সেটিই সকলের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। এই আদর্শকে অন্যে অনুসরণ করিয়াছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে সেই উজ্জ্বলতা আসে নাই, সেটা মুদ্রার ছবির মতোই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানে আপনকার উপলব্ধির কোনও চিহ্ন নাই। অবশ্য ইহাতে এই অর্থ হয় না যে, ভারতে চিত্রশিল্প কিছু নহে। ভারতের চিত্রশিল্পের শুধু ইতিহাস হিসাবে দাম আছে আর শিল্প হিসাবে দাম নাই, এ উক্তি নিতান্ত জড়বাদী মূর্খের। অবশ্য এই কথা আমি বলিতেছি না, যেহেতু ওই দস্তুরমতোও সারগর্ভ কথাটি আছে বলিয়াই চিত্রশিল্পের পরিচয় বড়,এমনই যদি আপনারা কেহ চিত্রশিল্প বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে খুব সহজেই স্বীকার করিবেন যে ভারতের চিত্রসম্ভার, ভাস্কর্য যাহা কিছু আছে, তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছু কম নহে। বরং অত্যধিক। ভাস্কর্য দেখিয়া সেই কথা কিছু কিছু উপলব্ধি নিশ্চয়ই হয়। আমরা বলি না গান্ধার বা অশোকের শিল্পপদ্ধতির কথা, যাহা প্রয়শ কলঙ্কময় লোকে বলে। আমি বলি তাহা ছাড়াও ভারতের বহু গিরিগুহা, বহু পোড়ামাটির কাজ দেখিতে, যেখানে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ঋষিরা অনেক বাস্তবতার মধ্য দিয়া পার হইয়াছেন, ফলে আমরা পাই 'ষড়ঙ্গ', আমরা পাইয়াছি এই অমর বাণী। এই কথাটির সার অর্থটি কেমনভাবে আমাদের দেশের শিল্পাঙ্গিকে মিশিয়া আছে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি। অনেক সময় হয়তো ইহার বিধিটা অঙ্কের নহে, ইহা যেমন একের পর আর এক আসে না, ইহাতে এই কথাই সিদ্ধ যে, একটা সংশয় থাকিয়া যাইতেছে। সংশয় কথাটা যদিও আসে না, তবু এ সংশয়ের সহিত সাধারণ ভাবের কোনও সম্বন্ধ নাই। একের উপলব্ধি যেখানে রহস্য, আমাদের সংশয় মনে হইতেই পারে, যদি পরিচয় না থাকে, যদি উপলব্ধি না থাকে। আমরা যে কথা বলিব সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই, কেননা বাস্তবতা তাহাদের কাছে সংশয় যাহারা অন্যফেরে পড়ে। অনেক সময় আমাদের ঋষির তত্ত্বকথা সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাই অনেকেই বেদ পড়িয়া নাস্তিক হয়, তাহার নিকট সমস্ত বাস্তবতা এমনইভাবে চুরমার হইয়া যায়, যে সে অথৈতে পড়িয়া যায়। কেননা যে আলোকপাত ঘটে তাহা একের পক্ষে সময় সময় অসম্ভব, আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। এবং অস্থিরতাকেই অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করি।

আমাদের দেশে আবাল্য প্রত্যেকের নানা ধরনের কল্পনা দেখিতে পাই, বাঙালি কল্পনাপ্রবণ জাতি। জাতির দিক হইতে ইহা তাহার একটি গুণ। কল্পনা তাহার কেমন সে কথা বলিতে আমরা চেষ্টা করিব। এ কল্পনার মধ্যে বৈষয়িক লক্ষণ অতি অল্পই আছে, সব ক্ষেত্রেই তাহার মন অত্যন্ত দূরত্বই চায়। কোথাও গিয়া সে নিজেকে লইয়া থাকিবে। তাহার আদর্শ হইয়া যে ছবিটি ক্রিয়াশীল তাহা বিস্ময়কর। যদিচ তেমন অন্য দেশেও দেখা যায়, কিন্তু তাহার রচনা পদ্ধতির একটু ভিন্ন সমতল শেষে মেশে একটি দিগন্তের সহিত, দূরে তখনও সূর্য আছে, নদী — তাহাতে নৌকা, নদী — তাহাতে কুটির, — কখনও তাল অথবা নারিকেল গাছ। অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত আটপৌরে তাহার কল্পনা হইলেও ইহা একটি বিশেষ বাস্তব। একটি শান্তির ছবি। সে শান্তি নিস্তব্ধতাময়, উপরের অসংখ্য নিস্তব্ধতাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, নিস্তব্ধতার রং আছে, রং হয় নীল। আর বিস্তৃত খেত, যখন সেই খেত সবুজ, সমতল আর ধনুকের মতো বাঁকা আকাশ, অদ্ভুত সমারোহ। কোনও সবিশেষ কিছু নাই, শুধু আলো ছাড়া — আলো ছাড়া আর উপায় নাই, আলো আবার রং হইয়া গেল যখন তখন সন্ধ্যা,

সূর্যের সঙ্গে একটা যেন সম্বন্ধ আছে। সূর্য মামা, চাঁদাও তাই। এই ভাবে বহু কথাই আমাদের মনে পড়ে, 'গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই' — বলিতেই ঝটিতি তাহার সমস্ত রূপটা আমাদের চোখের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। শুধু বলার ধরন নহে, শুধু ছন্দ নহে — বিশেষ করিয়া তাহার কথায় বিচার করিয়া কথা সাজানো ছিল বাংলার কাব্যের মর্ম (*চৈতন্য চরিতামৃত*), কাব্য চিত্রধর্মী: 'জলের ভিতর ন্যাকাচোকা, ফুল ফুটছে চাকা চাকা, ফুলের বরণ কড়ি', এইখানে যেন একটি ছবিকেই বর্ণনা করা হইয়াছে একেবারে পরিষ্কারভাবে, অবশ্য ছোট ছেলেটির চোখে যতটুকু ধরে, এবং আলো যেখানে প্রতীয়মান! এইরূপ কত ছড়াই না আছে, যাহা, হলফ করিয়া বলা যায়, যে কোন কাব্যের মার্গে উঠিতে পারে।

ঠিক এইভাবে বাংলার জীবনধারা বাস্তবতা পাইয়াছে। এই কথা ভুলিলে অন্যায় হইবে, যে ছয় ঋতু আমাদের দিয়াছে শিল্পবোধের অনেকখানি, নিদাঘের গরম আমরা দেখিয়াছি, কাকের স্বর বিকৃত হইয়াছে, আর সমস্তই ধূ ধূ, অতঃপর কালবৈশাখী, তাহার ঝড়, সেই ঝড়ে যত ভয় তত আনন্দ, গাছপালা ঝাপসা হইয়া আসিল, খাল বিল জলে জল শুধু জল, কখনও রামধনু ধূসর মেঘের উপর, এবং শরতের সকালের রোদ কাঁচা সোনার মতোই, ক্রমে কুয়াশা—ধানের রংয়ে শরতের আলো, এইবার শীত, মরা বেলগাছে শালিকের দল, তাহার গলার হলুদে স্পষ্টতই প্রতীয়মান, শুধু পলাশ আর মাদার, শুধু লাল, আর উপরে নীল আকাশ—আকাশে, নীচের আকাশে কচি কলাপাতার রং! জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ; তখনকার এখনকার বাংলার লোকেরা শিল্পবোধ পাইয়াছে। একদিকে তাহার 'সম্যক রূপ' প্রীতি, অন্যদিকে তাহার সরলতা তাহাকে অনেক দূর পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে, এবং ইহাকে সে কীভাবে ত্যাগ করিতে পারে! অবশ্য আমাদের দেশে বহু লোক দাস মনোভাববশত সেই বাস্তবতাকে লওয়া ঠিক হইবে কী না ভাবিয়া লন নাই, কয়েক জনের মধ্যে ছাড়া সে বস্তুর সাক্ষাৎ মেলে না।

'সম্যক রূপ' লক্ষণ এমনি যে, লোকে তাহার ব্যবহারিক জীবনে পর্যন্ত চেষ্টা করে, ইহার প্রতি তাহার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়, মাঝে মাঝে তাহার কথা বড়ই জটিল, একজনের পক্ষে সে কথা বুঝিয়া উঠা কঠিন, হয়তো তাহা শুধু জটিলতার রূপই বর্ণনা করে। আদত বাস্তবতা একটু দূরে সরিয়া যায়। তাই এই 'সম্যক-রূপে'র পাশে সরলতা তাহাকে রাখিতেই হইয়াছে, সরলতা স্বয়ং একটি গুণ এবং তাহা ছাড়াও সে 'সম্যক-রূপ'কে সাহায্য করে এবং একটি সুবোধ্য স্তরেই সব সময় ধরিয়া রাখে, যাহাতে তাহা শুধু প্যাঁচ হইয়া না দাঁড়ায়, আবার অন্য পক্ষে সরলতাকে 'সম্যক-রূপ' সাহায্য করে, যাহার সাহায্যে মনে হয় সরলতা শুধু সরলতা—ফড়িংয়ের ওঠানামা, ওড়া, ভোরের প্রথম আলো, এমনি একটা কিছু। এই সজীবতার ফল আমরা বহুদিন যাবৎ দেখিয়া আসিতেছি, ধর্মপালের সময়কার কাজে, ধীমানের নাম আমরা শুনিয়াছি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতায়, পটে, বৃষকাষ্ঠের দারুশিল্পে — এই সজীবতা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মও বেশি লোকের মন টানিত না।

বৈষ্ণব ধর্মের কাছে বাংলার জীবন যে কী ভাবে ঋণী তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাংলা দেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল নবতম চেতনায়। শুধু মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথাই তাঁহার মধ্যে ছিল, এবং মানুষকে একটি নূতনতম চরিত্র দিয়াছিলেন ; সে চরিত্র অতুলনীয়, যে চরিত্র আলোক উদ্ভাসিত বাস্তবতার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্বন্ধ রাখে, কেননা সে চরিত্র সাযুজ্য চায়, সে মানুষ সাযুজ্যের প্রতীক্ষায় অহর্নিশ অপেক্ষা করে, এ কথাও সে বিশ্বাস করে! সে স্বয়ং একটি শক্তিরূপ যে বৈষ্ণবরা নামকে বিশ্বাস করে, জপমালায় অসংখ্য নাম করে। আমরা জানি না থলির অন্ধকারে, একটুখানি আলোতে জপমালার পরিক্রমায় তাহারা কোন্ সত্য উপলব্ধি করে। তবে একটা জিনিস, একটি সত্য আমরা বুঝি, সেটা ভক্তি, অহেতুক ভক্তি তাহাদের মর্মবাণী, একথা শ্রীচৈতন্য বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজে বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং বিধান দিয়াছিলেন ভক্তি। এই ভক্তি হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, আমরা যখন সাধনার উচ্চমার্গে যাই, তখন একমাত্র ভক্তিই সমস্ত সামঞ্জস্য রাখে, সে ভক্তি যেমন পারে উচ্চতম লোকের আত্মার সহিত

মিলিবার রূপ দিতে, এবং সেই সঙ্গে স্তব্ধভাবে সক্ষম হয়, সমস্ত বিশ্বরহস্যের মধ্যে একটি বিশেষ রূপ আনিতে, তথা সাধক কোনও দ্বিধাই পায় না। বিশ্বরহস্যকে মানিয়া লইবার ভক্তি যদি তাহার মধ্যে থাকে, ভক্তি হইতেছে ব্যবহারিক জগতের যেমন বাস্তব, তেমনই সাধনমার্গে তাহার মূল্য হেয় নয়, সকলের আগে। যেহেতু সাধারণ সত্যকে বাস্তবতা দেয়, যে বাস্তবতা ব্যবহারিক জগতের বাস্তবতার সম্মুখে ঠিক থাকে। ভক্তিরসে মানুষকে জগৎ ছাড়িয়া শেষ পর্যন্ত যাইতে হয় নাই, আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সংকীর্তনে মুখর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেমন নূতন জীবনের চেতনা আসিল এবং প্রকাশের পথও পাইল, নূতন শিল্পচেতনাও উদ্বুদ্ধ হইল। যে শিল্পচেতনা একটি মহৎ প্রাণের নামান্তর, শুধু সরলতা, আমাদের ভক্তিরসের চিত্ররূপ সরলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অবশ্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্বে আমাদের দেশে দু-জন মহাকবি জন্মাইয়াছিলেন, যাঁদের মধ্যে মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ছিল কানায় কানায়, যাঁহাদের সরলতা ছিল প্রাণে প্রচুর। কিন্তু তাহার প্রচার হইল শ্রীচৈতন্যের পর। এবং এত সুষ্ঠুভাবে হইয়াছিল যে, আজও তাহার প্রভাব আছে, কোথাও এতটুকু মরে নাই। হয়তো আবার ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মতোই জনসাধারণের কারণে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কারণ ভক্তির বাস্তবতা তাহারা উপলব্ধি করে নাই, তাহাতে কোনও দুঃখ করিবার কিছু নাই। কিন্তু তাহার চেতনায় সমগ্র বাংলা যে নবচেতনা লাভ করিয়াছিল তাহা দিনের আলোর মতোই সত্য। ঠিক এইভাবে আমাদের চিত্রশিল্পের আঙ্গিক আপনার পথ পাইল এবং ক্রমেই সে আঙ্গিক একটি বিশেষ অবস্থায় আসিল যাহা তাহাকে অমর করিয়াছে এবং জগতের বিষয়কে বাংলা দেশ শুধু ভক্তির জন্যই বাস্তব করিয়া দেখিয়াছে, ভক্তি মূল হইলেও ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞ কোনও ব্যক্তি ছাড়ে নাই। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছেই। ঘরে ঘরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ছিল, এবং আছে, কাহারও বাড়ি নিত্য পূজা, সকাল-সন্ধ্যা আরতি। তাহার কতকগুলি রূপ আমাদের শিল্পাঙ্গিক কে সাহায্য করিয়াছে। ভোরের গঙ্গাস্নানে আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত গেরুয়া রং রাঙা, হিম-হাওয়া বহিতেছে, আর সম্মুখের জনপ্রবাহ মোভ, ছল ছল করে, দূরে মোটা মোটা কালো কালো বিরাট নৌকা, তাহার সিঁদুর আঁকা চোখ ... ওপারে একটু একটু সবুজ ঘাস, এ জল, মোভ জলটি ছোট ঘটে তোলার জন্য সকলেই কী অদ্ভুত ব্যস্ত হইয়া উঠিত। আর সে গঙ্গার কী অদ্ভুত স্থানহীন রূপ, সে আমাদের মনে আছে। পূজার জন্য কচি কচি দূর্বা তোলা, ... ঘাসে ঘাসে শিশির মুক্তার মতন, ঘাসটি সন্তর্পণে তুলিয়া নিতে সে কী অদম্য চেষ্টা, সে শিশির কণা পাছে না ঝরিয়া পড়ে, যখন ঝরিয়া পড়ে নাই তখন আমরা চোখের সম্মুখে আনিয়া দেখিয়াছি সে জল বই অন্য কিছু, সেটা শিশির, তাহার মধ্যে কত রং মৃদুভাবে রহিতেছে, এমনিভাবে বেল পাতাও পাড়িয়াছি, কচি কচি পাতার মধ্য দিয়া গায়ে কাপড়ে যখন রং পড়িত, তখন কেমন অবাক হইয়া যাইত সকলেই, তাহার সেই স্বচ্ছ রংলীলা গায়ের চামড়ায় কী অদ্ভুত! তিন-পাতা রাখিয়া অন্য পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহার সামঞ্জস্যটা অদ্ভুত, যেমন ঘাসের, তবে এটা ফলা-ফলা গাছের — আর ওটা বেশ দিব্য সুন্দর। তিনটি পাতার কেমন সুন্দর একটা মিল আছে, তেমনি আবার আম পাতা পাড়ার মজা সর্বাধিক, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তখন আম পাতা সবে হইয়াছে, তাহার রং বেশ ব্রাউন, একটু হলুদাভ, এ রংটা সকলকে বেশি বিস্মিত করে, আবার আম পাতা কচি কলা পাতার মতো হইবে, পরে গাঢ় সবুজ হইয়া যাইবে। কোনও আম্র পল্লবের পাঁচটা পাতাই আমরা ঠিকভাবে বাহির করিতাম, যেন সব সমান হয়, যেন বেশ সার বাঁধা হয়। পিতলের ঝকঝকে কলসির উপর মোটা করিয়া লাল সিঁদুর দিয়া 'নারায়ণ' আঁকা হইত, তখন আমাদের চোখ কী ভাবে বিস্মিত হইয়াছে, কীভাবে হতবাক হইয়াছি! লাল রংটা একটি বিশেষ আকৃতি হইয়াছে, আর আলো পড়িয়াছে, পিতলের ঘটে, সে যে কী রূপ, কী রসের সৃষ্টি করে তাহা আমরা জানি, দাঁড়-করানো কলা গাছের পাতার রংয়ের আভাস মাঝে মাঝে কলসির উপরে পড়ে, আর লাল আর রোদ, আর সবুজে মিলিয়া যে কী শোভা সৃষ্টি করে তাহা বলা বা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই রকম বহু বহু অনুষ্ঠানের মধ্য

দিয়া আমরা ছন্দটাকে উপলব্ধি করিয়াছি। সবুজ রং দিয়াছে একটি সততার সম্পূর্ণ রূপ — একদিন ছিল রাত্র রাত্রই, দিন দিন। সে ইতিহাস অনেক।

শব্দের উৎসুক্য লইয়া থাকা এই ছিল, শব্দের পিছনে বহু বহু আকার মিলিয়া একটি নিরাকার কোনও কিছু ছিল না, অন্ধকারের পর অন্ধকার! এ মাঠটা কী ভয়ংকর, শৈত্যে পরিপূর্ণ, মনের উপর কী সে বিছাইয়া থাকে, কী তাহা কাজ করে, যে কোনও বস্তু তখন সমস্ত শূন্য, সে শূন্যতা স্থান হইতে অত্যন্ত অধিক। এই শূন্যতা ভয়প্রদায়িনী! সেই ভয়ে হয়তো রক্ত আর তেমন লাল নহে ; তখন শুধু এই কারণেই সমস্ত কিছুই আপনকার স্বরূপ ছাড়িয়া ভয়ংকর হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত বিবেচনা, সমস্ত বুদ্ধি সে হারায় যে সে রাত্রে পথ চলে, বিষয়বুদ্ধি তাহার আর তেমন থাকে না, বিষয়গত চেতনাকে তখন আর তেমনভাবে মন আকর্ষণ করে না, কেননা দিনের প্রয়োজন এ কথাই সব ক্ষেত্রে মনে হয় তো হয়, দিনের জন্য বসিয়া থাকা। আলোকে কতটুকু মানুষ স্মরণ রাখিতে পারে, যাহাতে বিষয়ের সমস্ত বাস্তবতা তাহাকে তেমনিভাবে আকর্ষণ করিবে, রাত্রি অন্ধকার, মানুষ আপনার হইয়া বিষয়কে কল্পনা করিয়াছে, এ কথাও সত্য, আর দিনের আলোয় সে কল্পনা আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়াছে, পরিষ্কারভাবে গাছের গুঁড়িটাকে গাছের গুঁড়ি বলিয়াই সেই দেখিতে পাওয়া মহা আনন্দের, ক্রমে তাহার চেতনা দুই ভাগে বহুদিন পর্যন্ত ভাগ হইয়াই ছিল, ব্যক্তিগতভাবে দেখা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব হইত যাহারা আলোতে অস্তিত্বগুলিকে ভালোভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতই না, মনগড়া রূপচর্চা করিয়া তাহারাই আরওপ করিত একেবারে নিজেদের স্বার্থে। ১-২-৩-৪এর মতো পরিষ্কার প্রকৃতিকে তাহারাই দেখিতে পাইত, যাহারা রাত্রের ভয়ের কথা বিশেষ মনে রাখিত, অনেকটা এইভাবে বিষয়ের সঙ্গে তাহার চেনা জানা হইয়াছে , হইলেও সে একটি দিক মাত্র বিষয়ে লইয়াছে, সেটা হয় আকার, আকারই তাহার সহায়, আকারই সেইখানে বিষয় বাস্তবতা, আর সবটুকু শব্দের. শব্দ সেখানে বানচাল, এবং আরও ব্যক্তিগত করে। আকার দিনেও সত্য। কিন্তু স্থান আর রং আর আলো তখন তেমনভাবে বিষয় নহে, স্মৃতিপটে তাহারা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হইয়াই রহিয়াছে, আকার হিসাবে সেগুলি কাজে লাগে, তাহারা যে নিজেরাই এক একটি বাস্তব সত্য, তা ছিল না। হইলেও মানুষ এরই মধ্য হইতে কিছু সত্য পাইয়াছিল, দুটি বাস্তবতা, সেটি আবার একটি বাস্তব রূপ ধারণ করিলে যাহাকে বলা যায় পরিপ্রেক্ষণ বাস্তবতা, যা সবই সমস্ত। অদ্য দিন আর রাতে কোনও ভেদ নাই, মানুষ যেমন দিনের জন্য উতলা হইত, মানুষে তেমনি রাত্রির জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনি যে সে বিষয়কে বেশ দেখিতে পায়, শুধু দেখিতে পায় না আলো আর আলোকিত স্থান বিস্তৃত, কারণ যাহার ফলে যে, সে দেখিতে পায় তাহা হইতেছে অগ্নি। দিন ও রাত্রির চেতনায় আমাদের দুইটি সত্যের সহিত আড়াআড়িভাবে সম্পর্ক হইয়াছে; একটি বাস্তবতা, অন্তরে আর বাহিরে। একটি বাস্তবতা ব্যক্তিগত, কেননা দিবালোকে সে নিজের কী অদ্ভুত পরিচয় পায়, পাইলেও সে আরও পরিচয় পায় যে তাহার একটি বাস্তবতা আছে, আর সম্মুখে আছে বিষয়। সে দিবালোকের জন্য অপেক্ষা করিত, সে অপেক্ষায় শুধু এই কথাই আমরা শুনি, বিষয়ে পরিচয়। এখন সে রাত্রি অপেক্ষা করে। ক্লান্তি আমাকে-আপনাকে বড় বেশি করিয়া ছাইয়াছে, কোন্‌ও সত্য আর আমাদের আছে তাহা এখানে আলোচনার নহে।

অগ্নির আলো চোখকে কতটা সম্বন্ধ দিয়াছে, আজ তাহা কিছুই লেখাজোখা নাই, পৃথিবীর তথ্য যাঁহারা লেখেন তাঁহারা কোথাও তাহা বলেন নাই। ঋষিরা আমাদের অনেক কথাই বলেন, কিন্তু রাত্রি আর দিন আমার-আপনার রক্তে মিশিয়া গিয়াছে, তাই আমরা সেকথা ঠাহর করিতে পারি না। পরন্তু আমাদের কাছে কদর্থ হইয়াই তাহা দেখা দেয়। সূর্যালোক আর অগ্নির আলোকে নিশ্চয় ভেদ আছে। বিষয়কে এক-এক পদ্ধতিতে আমরা বিচার করি। সেটা বড়ই আশ্চর্যের। কেননা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যে স্থান সে আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া থাকে, অদৃশ্য বলিতে আমরা শিল্পের দিক হইতে বুঝি, এ

স্থানকে বিভক্ত করিয়া উপলব্ধি দিবালোকে সম্ভব হয় না, স্থানের বাস্তবতাকে সাধারণত আমরা রাত্রেই বেশি উপলব্ধি করি। সূর্য্যালোকের যে বিচার তাহা ক্রমাগত তাহার নানান গুণে সম্পন্ন হয়, সেখানে, স্থানলীলা ক্রমাগত রশ্মিময়, দৃশ্যত সেকথা আমরা বুঝিলেও তাহার সম্বন্ধে স্থান কতখানি থাকে, অথচ অন্যপক্ষে রাত্রে আমরা ক্রমে স্থান-চেতন হইয়া থাকি। আপনকার দৃষ্টিতেই স্থানকে বুঝিবার অথবা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা পাই। অগ্নির আলোতে স্থান রশ্মিময় হয় না। যতটুকু দেখা যায় সেটুকু শুধু স্থান, স্থানই, ধ্বনিহীন, রশ্মিহীন, ঠিক এ বিশেষত্ব অত্যন্ত গভীর, সেখানে আলো বস্তুবাচক। তাহার লীলা স্থান-হেতু দৃশ্যমান। একদিন শুধু এই প্রকৃতি জড় ছিলেন, কোথাও প্রাণের আভাস মাত্র ছিল না, লোকচরার নিস্পন্দ, উপরে সৌরলোকে মেঘাবৃত, ক্রমে আলো দেখা যায়, পুরুষত্বরূপ এবং আমরা সৃজনতত্ত্ব সম্যক অনুধাবন করতঃ বিস্মিত হই। কেননা আমরা স্থানকে দেখি। এখানে আর একটি কথা আরও পরিষ্কার হয়, দিবালোকে দেখা বা যাহা দেখি তাহার একমাত্র গুণকে আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে সক্ষম হই। অগ্নির আলোতে বস্তুর বস্তুত্ব তথা স্থান বিস্তার খুব ভালভাবেই উপলব্ধি হয়। বস্তুর একদিক আমরা দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই গভীরতা, — ঠিক যে তাহার চতুর্দিক দেখা যায় এমত বিশ্বাস আমরা উপলব্ধি করি না, এখানে অগ্নি আমাদের বস্তুর বস্তুবোধ দেয় এবং ঠিক স্থান রহস্য যখন বস্তুর মধ্যেই থাকে (ভাস্কর্য) এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সমস্ত রূপকে একটি লীলার মধ্যে আনে, রূপ এইভাবেই আপনকার সত্তা পায় এবং সে চেতনা দিবালোকের অত্যধিক আলোকে বর্তমানতা হেতু ম্রিয়মাণ হয় না। এখন যে বাস্তবতা মানুষের সে শুধু অগ্নির, সে রাত্রির, দিনের বাস্তবতা এখন আমরা ঠিক এমনইভাবে লাভ করি নাই, সেইদিন অবশ্যই আসিবে। যাক সে কথা। অগ্নিই আমাদের আদি, অগ্নি বাস্তব এবং অগ্নি দৃষ্টিদানকারক, অগ্নিই মনুষ্যের ন্যায়ের কর্তা। ঠিক এই অগ্নির সম্পর্কেই বিষয়কে তথা বিষয়বাস্তবতাকে আমরা চিন্তা করি, বিবেচনাও করি, যেহেতু সাধারণত রাত্রেই আপনার অস্তিত্ববোধ সম্যক ভাবে হয়, কেননা আপনাকে আমরা যথেষ্ট সত্যরূপে দেখিবার চেষ্টা করি, কেননা আমার সম্বন্ধে, রাত্রে থাকে কয়েকটি তারা, আর নিরাকার স্থান এবং অগ্নির হেতুই আমার অস্তিত্ব নিবিড়ভাবে দেখায়, প্রজ্বলিত অগ্নি একবার আমার দিকে আসে, কেন্দ্রস্থ হয়, উত্তরে চলিয়া যায়, হে অগ্নি প্রাণস্বরূপ, আমি বাস্তব। আমরা যাহাকে অদ্যও বিষয় বলি তাহা অগ্নির সম্বন্ধেই আসিয়াছে, দিবালোকের নহে। দিবালোকের বাস্তবতা অন্য, এবং সংস্থান ব্যাপার একেবারে দিবালোকের সহিত কোনও অগ্নির সম্পর্ক নাই।

সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, দিনের ব্যাপার ছাড়া ছবি হয় না। রাত্রির ছবি নাই। হয় তো আছে, হইলেও দুই-একটি। দিনের ব্যাপারের মতো রাত্রের অতটা জনপ্রিয়তা নাই। তাহার কারণ আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রত্যহ যে অনেক অনেক ছবি আঁকা হয়, প্রত্যহ যে বহু শিল্পী ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে প্রাচীন একটি রহস্য বর্তমান, যে রহস্যের কথা বলিতেছি, তাহা তাহার আঁকা ব্যাপারের রহস্য। সে সব চিত্র দিবালোকে আঁকা হয়, তথা উত্তর-আলোতে আঁকা হয়, কিন্তু ঠিক তাহা দিবালোকের নহে, আমাদের হয়তো সে আলোকে চিনিতে পারা মুশকিল হয়, তবু একথা নিশ্চিত যে, ছবির মধ্যে যাহা কিছু তাহা অগ্নির সম্বন্ধে দেখা রূপ এবং সে রূপের রূপান্তর। অগ্নিতে দেখা রূপ শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে, কারণ স্থান-চেতনা সে শিল্পীর অগ্নি-আলোতেই আসিয়াছে, তাই তাহার কাছে, হাতের কাছে চোখের পাশে বরাবর সেই নিস্পন্দ অন্ধকার থাকেই, সমস্ত দিবালোকের দৃশ্যটি সেই সেই স্থান-চেতনার উপরেই আশ্রয় করিয়া ক্রমে রূপান্তরিত হইতে থাকে। দিবালোকের বাস্তবতা তাহাকে কতটুকু ধরা দেয়, সে শুধু পরিপ্রেক্ষণ। তাহার সত্য বিচারে থাকে না। দিবালোকের সম্পর্কে আমরা যাহা দেখি তাহা রং। এবং রংয়ের তারতম্য। আর যা তাহা অগ্নির হইলেও আলোকের কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, যাহা আমাদের সব কিছুই দেয়, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা

তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুই পাই না। ইদানীং এই আলোকের রহস্য পাশ্চাত্য দেশ কিছু কিছু বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ঠিক অধ্যাত্ম সম্পর্ক না-থাকার হেতু একটু বিপরীত রূপ লাভ করিতেছে, এবং যন্ত্রকে এড়াইবার চেষ্টা কারণে যাহা হইয়াছে, তাহা কল্পনাতীত ও লোকোত্তর। এই আলোর বাস্তবতা আমাদের দেশীয় শিল্পে বিশেষ পথপ্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

আমরা অনেকখানি বাংলার শিল্পের ভিত্তি সম্বন্ধে, তাহার রূপ-চেতনার ধারাবাহিক ইতিহাস, কেমনভাবে সম্যকরূপ সরলতা পাইয়াছে, কেমনভাবে ভক্তির মাধুর্য কাজ করিয়াছে, বিষয় ও ব্যক্তিগত চেতনা, তাহার স্থানকল্পনা এবং অগ্নির কল্যাণে সংস্থান-চেতনা কীভাবে নামিয়া আসে একটিমাত্র চেতনায়, ও আমাদের দেশের লোকোত্তর শিল্পের মাঝে প্রাণস্বরূপ হইয়াছে এবং শিল্পকে অদ্ভুত গুণসম্পন্ন করিয়াছে তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখার চেষ্টা করিব। ইহাকে সঙ্গতভাবে বাংলার নিজস্ব চেতনা বলিতে পারি, যে চেতনা বহুদিন হইতে আমাদের দেশে কাজ করিয়াছে।

এই ছোট উঠানে খুব আলো আসিয়া পড়িয়াছে, এখন সকাল, আলো স্থির হইয়া আছে, সামনে সমস্ত জমির রং ধূসর—একটু খসখসে; পিটুলির রং সাদা, উঠানময় কলাপাতা টানিয়া চলিয়াছে, এক-এক ব্রতে এক-একরকম মনের বাস্তবতা, আর সেই লতার বাস্তবতা স্বরূপ কোথায় যে একটি বিশেষ রূপ পাইতেছে তাহা আমরা ঠিকমতো বলিতে পারি না, কেমনভাবে তাহা নকশা হইল, কীভাবে বা কোন প্রয়োজনে! সীমা কথাটা শিল্পের পরিমাণ কথাটা বিজ্ঞানের; কিন্তু এমন নয় যে যাহাকে আমরা সীমা বলিব তাহাই পরিমাণ। এখন এই নকশাগুলির সঙ্গে সাধারণত বাংলার যোগ বহুদিনের, পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে যোগসূত্র নাই বা আছে, সেকথা তুলিতে চাই না, কারণ বাংলার আপনার বাস্তবতা আর মাধুর্য এতই উচ্চশ্রেণীর যে তাহা নিজেই প্রমাণ দেয় যে আলপনা আমাদের বহুদিনের। ধূসর সমতলভূমির উপর যে নকশা, তাহার একটি বিশেষ রূপ আছে, এটা হয়তো বলা ঠিক হইবে যে, স্থান যখন প্রকৃতির, আলো যখন সূর্যের তখন মনের রহস্য বুঝি বা এমনি করিয়াই স্থান লয়। ফলে ঠিক সেই সীমা হইতে নিজস্ব দৃষ্টি অন্য সব কিছু ছাড়িয়াই দেয়, এবং থাকে শুধু রেখা টানার ক্ষমতা এবং এমন করিয়াই নকশার সৃষ্টি। এটা আমাদের নিজস্ব ধারণা, এই খোলামেলা জায়গাটা কেমনভাবে একের কল্পনা, তাহার সঙ্গে মিশিয়াও জুড়িয়া থাকে, তাহা উপর হইতে দেখার বিচিত্র বাস্তবতা, আর রেখা-সমন্বয় একটি রসের সন্ধান দিয়াছে। পর পর লক্ষ্মীর পা-গুলি কী অদ্ভুত; প্রকৃতি যেমন পাথরের উপর দিয়া চলিয়া যায়, একটি অদ্ভুত রূপ দান করে, কে জানে আলো বহু আলো আর স্থান দৃষ্টির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর এই বাস্তবতা। প্রায় ব্রতের সবটুকুই হইতেছে খোলামেলা জায়গায়, মেলা জায়গা ঘরের মধ্যেও হয়, কিন্তু খোলা কথাটার এই অর্থ যে, সেখানে আলো আছে। আলোর মধ্যে বসিয়া, খোলা জমির উপরে বসিয়া তাহার আঁকার শুরু, পিটুলির রং সাদী, এই শ্বেত রং আলোকের নামান্তর, ফলে কোন অন্ধকারকে মেয়েটি কল্পনা করে না, যে অন্ধকার তাহাকে সব সময় এড়াইবার চেষ্টা করিতে হয় না, যেমন করিতে হয় সেই তাহাকে, যে চেষ্টা করে, আলো আর ছায়ার (কালো) একটি নাটক সৃষ্টি করিতে!

বাংলার মেয়েদের এই যে শুদ্ধজ্ঞান কবে হইতে হইয়াছে তাহা কে জানে, হয়তো মসলিনের বহু পূর্ব হইতে এই জ্ঞানের শুরু। সমতল ক্ষেত্র আঁকা হয় বলিয়াই রেখা কোনও সময়ই আলোকে উদ্‌ঘাটন করে না, কেন না এই রেখা ঠিক যাহাকে বলে আলোর একটা হিসাবে তাহা নহে, ব্রতের রেখাচিত্র এই কারণে খুব নূতন, যদিও রেখার দিক হইতে এটি চিরকল্পিত তবু, কেননা পাশাপাশি অন্যান্য রেখার ধরন সম্বন্ধে মেয়েরা অভিজ্ঞ ছিল, বাড়ির রাধাকৃষ্ণের পট, সরা ইত্যাদির পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, সেই ধরন দেখা সত্ত্বেও নিজেদের ব্রতচিত্রকে তাহার পূর্ণরূপ হইতে কোনওদিনও সরায় নাই। ব্রত-চিত্র যাহা

ছিল তাহাই আছে। ব্রত-চিত্রের সর্বাধিক বড় গুণ সীমাবোধ, মিলিত করিয়া হইয়াছে, স্থানে। আলোতে এবং দৃষ্টি ও কথনে, বিশেষত যখন এই সব চিত্রবিচিত্রের সম্মুখে এক একটি ফুল ধরা হয়, ইহার সত্যই কী অর্থ হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, ব্রতের ফুলের খুব বাঁধাধরা নিয়ম নাই, জবা দিয়া বৈষ্ণবের পূজা হইবেই না তাহা নহে। এখন ফুলের রং কী রংয়ের কাজ সারে তাহা আমরা জানি না। হইলেও হইতে পারে, না হইলেও কোনও কথাই নাই। সে যাহাই হোক, আর একটি কথা আমাদের বিশেষ স্মরণ করায়, যে তাহার সমস্ত প্রকারই বিশেষ আকর্ষণ করে, চিত্র রূপান্তরের বেলায় তাহার একটি বিশেষ সমতা আছে, যে কোনও ব্রতের চিত্র দেখিলেই মনে হয় তাহার মধ্যে অধোদৃষ্টির চিহ্ন বর্ত্মান এবং সেই অধোদৃষ্টির বাস্তবতা অধোদৃষ্টি দিয়াই আঁকা হয়, চোখের তলার সমতল জমির উপরে। ইহা কোনওক্রমেই তাহার সমস্ত কিছুর বাস্তবতা ছাড়াইয়া যায় না, এই ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই কারণের আলোকেই মেয়েরা প্রাধান্য দিয়াছে বেশি। সেঁজুতি-ব্রতের আলপনার ধরনটা সংস্থানের দিক হইতে এবং সে সংস্থান সমস্ত আঁক-কাটা আঙ্গিক দিয়াই সম্পন্ন হয়, তাহার রূপটা কীরূপ তাহা আমরা টের পাইব। এখানে বাস্তবতার কোনও চিহ্নই নাই, সমস্ত সংস্থানের মধ্যে যতগুলি আকৃতি আছে, তাহা প্রথম চোটে দেখিলে মনে হইবে গুহাবাসীদের সৃষ্টির স্বরূপ, কিন্তু আদতে মাটির উপর পিটুলি দিয়া আঁকা যখন থাকে তাহার রূপটা অন্য, সেখানে আলো, যাহাকে শিল্পী পূর্বেই মানিয়াছে, সে আলো সমস্ত সংগঠনকে বাস্তব করিয়াছে ঘের-চেতনার দিক হইতে। ছবিটা যেমন শিশুকল্পিত নহে, তেমন সংস্থানও তাহার শিশুকল্পনার নহে, কেননা আকৃতির রূপভেদ বেশ ভালভাবে লক্ষ করার বস্তু, ছবিটিতে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি আছে এবং ইহাতে শিল্পীর চেতনার একটু পরিচয় পাই। আর ঘের-চেতনার বিশেষত্ব আমরা বুঝি, যখন দেখি ছবিটার তলার দিকে অনেকখানি স্থান শূন্য রাখা হইয়াছে। এই ছাড়টি অন্য দেশের পুরাতন চিত্রে এইভাবে নাই। ইহা বিস্ময়কর!

ঘের নাই অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র হইতেছে, 'হাতে পো কাঁকে পো'র আলপনা — এটির কাহিনি না শুনিলেও এই ছবিটি দর্শককে অত্যন্তই আকর্ষণ করে। ইহাকে ঠিক কী ধরন বলা যাইবে, ভাব না প্রতীক, না জ্যামিতিক, সত্যই ইহার সীমাটা কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। অথচ সরল সংস্থানের কোনও চিহ্ন এখানে নাই, তাহা থাকিলেও আমরা একটা কিছু বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম, ছবিটি একটি সরলতার নিদর্শন কিন্তু তাহার সংস্থান অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। সাধারণ ব্রত চিত্রে যে স্বাধীনতা নেওয়া হয়, তাহা এখানে আরোপ করা হয় নাই; ছেলেগুলিকে খুব ছড়াইয়া সাজানো যাইতে পারিত, কিন্তু মধ্যের বড় আকৃতির সঙ্গে তাহাদের এক নৈকট্য আনা হইয়াছে, হইলেও সমস্ত জিনিসকে একটি নকশা করা হয় নাই তাহা বুঝি তাহার সামঞ্জস্যের অভাবে। এখানে, একথা লক্ষ করা যায় যে, শিল্পীর পটু হাতের এক এক ঘায়ে এইগুলি মাটির উপর রূপায়িত হইয়াছে এবং সবদিক হইতে এই কথাই মনে হইবে সংস্থানের দিক হইতে ইহার মোটামুটি মূল্য আছে। সংস্থান জিনিসটা প্রাণ পায় খুব সাধারণভাবে তাহার ঘেরের দিক হইতে। সমস্ত দেশেই সংস্থানকে যখন মূল্য দেয় তখনই ঘের কথা থাকে, যদিও খুবই অপ্রত্যক্ষভাবে। এখানে এই সংস্থান স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদিও ঠিক ভাস্কর্যের মতো নয়, ইহার সীমা প্রত্যক্ষভাবে আসিতেছে, ইহা আঙ্গিকগত, বস্তুগত নয় — ! এবং এই সংস্থান সম্পূর্ণভাবে দিনের আলো ও স্থানকে কোনও রকম ব্যাহত না করিয়া চিত্ররূপে তাহার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। এই ধরনটি বা এই বাস্তবতাটি বাংলার নিজস্ব। তাহার সীমাকে কেমন করিয়া সংস্থানের কাজে প্রয়োগ করিতে হয়, সূর্যকে সে মানে, স্থান তো অপরিহার্য! ঠিক রূপটি অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই।

ব্রত বঙ্গীয় শিল্পাঙ্গিকের প্রথম ও প্রধান আলোক। সমস্ত বঙ্গদেশের বাল্যকাল এই বাস্তবতার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জীবনকে বহুযুগ ধরিয়া একটি নূতন বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয়

করাইয়াছে। ভগবানকে ভক্তি করিবার চেতনা বাংলার নিজস্ব, যদিচ বেদ ছিল, যদিচ দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রূপ ছিল, তাহা হইলেও বাংলার আধ্যাত্মিক চেতনা তাহার নিজের, তাহা আমরা জানি। এবং ঠিক এমনিই ঘটিয়াছে শিল্পের বেলায়। শিল্পচেতনা তাহার প্রাণস্বরূপ, যে চেতনা বিষয়কে নূতনভাবে নিজের করিয়া দেখিয়াছে, কোনও যুদ্ধ তাহাকে খর্ব করে নাই, মন্বন্তর পারে নাই, বন্যা নহে। অবশ্য অদ্য সে-বাংলাকে কাবু করিয়াছে রাজনীতির মহামারীতে। বহু রাজা ইতঃপূর্বে আসিয়াছে, গিয়াছে, কেহই রাজনীতি করে নাই, ফিরিঙ্গিরা রাজনীতি করিয়াছে এবং সর্বনাশ করিয়াছে। এবং আমাদের সমস্ত সত্য, সমস্ত বাস্তবতা ইতিহাস হইয়া গিয়াছে; এ বাস্তবতা বাংলার কাহারও মাঝে ধরা দেয় নাই। এমন কেহ নাই, যাহার মধ্যে এই বাস্তবতা ঠিকভাবে কাজ করিতে দেখা যায়। প্রথমত অনেকের ধারণা এ চেতনা আদিমের। যে চেতনা সত্য তাহা আদিমের হউক, আর বুদ্ধের হউক, চৈতন্যের হউক কোনও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি? সুধী পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার করিবেন। ইহা ভিন্ন অনেক বস্তু হয়তো ব্রতের কবিতার মধ্যে আছে, তাহার কারণ হিসাবেই; তাহা হইলেও ছবির মধ্যে স্থান পায় নাই, এখানে প্রত্যহের বাঁচিবার ধর্ম কল্পনায় ছিল না, যাহা ছিল তাহা অন্য, যাহা ছিল তাহা যে কোনও কালের যে কোনও মেয়ের মনস্কামনা! একেবারে মেয়েদের নিজস্ব। প্রকৃতির মধ্যে শুধু ভয়, প্রকৃতির মধ্যে শুধু শত্রুর আবাস, এই কথা তাহাকে বিভ্রান্ত করে নাই। সাধারণত সাপ একটি প্রাণী, যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, সে দৃশ্য এখানে নাই, আর নাই জানোয়ার। শুধু আছে মনুষ্যোচিত ভাব এবং অনুভব, এই মনুষ্যোচিত কল্পনা এখানে, পিছনে প্রাণলীলা। এবং এই কারণে আরও নয় যে ব্রতের রূপ সমগ্রভাবে দের-চেতন, যে তাহার কাব্যে রসচেতনা আছে। আর এক সত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে এই যে ব্রতের কামনা সব সময় বাস্তব কল্পনা করে, মনস্কামনা পূর্ণতা পাইতে চায় — কিন্তু তাহার ছবিগুলি, আলপনাগুলি তাহা হইতে পৃথক। দেখিয়া মনে হইবে, কোনও কাব্যের কোনও রূপের কল্পনা ইহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই, সে যেন তাহার বিষয়বস্তুই নয়, আপনার ধর্মে আপনিই চেতনা লাভ করিয়া আছে। তাহার যাহা কিছু রূপ পরিণতি তাহা সাধারণত দৃষ্টির দিক হইতেই ঘটিয়াছে। অতএব তাহার তথা ব্রত-আলপনার লীলাটা নিজের মধ্যেই আছে অব্যাহতভাবে চিরকাল। বাংলার মেয়েরা শিব গড়ে, পুতুল গড়ে নিজেরাই — অতএব রূপের 'ডাইমেনশন' সম্বন্ধে চেতনা তাহার ছিল, কেননা বাস্তব করার বাসনা একান্ত ছিল, সে কথা আমরা জানি।

এবংবিধ চেতনার বাস্তবিক রূপ কাজ করিয়াছে, পূর্বেই বলিয়াছি। এবং কেমনভাবে রূপান্তর হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিয়া দেখিব।

সভ্য মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টা দেখি যে, তাহারা শিল্পকে ভাবিতে চাহে। ইহা জানি, শিল্প ভাবিবার নহে। কতটুকু সে স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া আর পাঁচের মতো ভাবনার বিষয়বস্তু হইবে, বা ভাবনা কতদূর একস্তরে গেলে সে শিল্পকে ভাবিতে পারিবে, তাহা লেখরি নহে। একথা যথাযথ যে, শিল্পের একটি নিজস্ব বাস্তবতা আছে। এতক্ষণ এ কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, অধিকন্তু সে বাস্তবতা যাহার সহিত মিশিয়া আছে তাহা দৈনন্দিন আলোকের বেশ খানিক, এবং বাস্তবতার এক তরফে আছি আমি- আপনি- সে, সেই হেতু আধখানাই বরাবর পাই। তাহা হইলেও এই বাস্তবতা আর সেই আলোর যোগে এক লৌকিক বাস্তবতার সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং যখন ঠিক আমাদের, সম্বন্ধের সেই বাস্তবতা ঠিক আর তেমনটি থাকে না, সে যে এক রহস্যে পরিণত হইয়াছে তাহা এবং আমাদের সম্বন্ধের কথা মনে মনেই রহিয়া যায়। সেই বাস্তবতার সহিত শত ইচ্ছাতেও সম্বন্ধ পাতানো আর সম্ভব হয় না। তাহার নিকট তাহা একান্তই অবস্তু; অবস্তু নিয়া কতটুকু কাঁহাতক ভাবিতে সক্ষম, বিশেষত আঙ্গিকতা যখন নিছকই অবস্তু ভিন্ন আর কোনও কিছু নহে।

অস্তিত্বের সঙ্গে স্থান নিয়া যে বাস্তবতার সৃষ্টি তাহার একটা অর্থ আমরা স্বভাবতই পাই। তাহার

কারণ এক হইতে বহু। একটি কারণ এই যে, সেই স্থান দিয়া যে জিনিস গড়িয়া উঠে তাহার সার্থকতা আমরা দেখিয়াছি, তাহা একটি বাঁধাবন্দীর মধ্যেই, নিয়মের মধ্যেই । ঠিক ইহার উপর আমরা দেখি আলো আসিয়া পড়িয়াছে, এবং স্থানটা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, নিখুঁত সত্য, এ সত্য কতটুকু একজনকে স্পর্শ করিয়াছে? অণুমাত্র কদাপি নহে, ইহাই একটা ছল মাত্র, স্থানের কোনও অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় না, বে-বারের হাটখোলার মতোই তাহা পড়িয়া থাকে। সে হয় সময়, যাহাকে আমরা এক বলিয়া মানি, সময়কে আমরা স্বীকার করি। আর সেই বশে ক্রমাগতই স্থানকে পরিক্রমণ করি, এমনও কী আলো, তাহাও যে সেই সময়। আমাদের নিকট সুন্দর হইতেছে সময়। সময়ই মানুষের প্রাণে বাস্তবতা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু, যদি আমরা শিল্পের মধ্য হইতে পৃথিবীর দিকে চাহি আর দেখি আর ভাবি, দেখিব যে তাহা আশ্চর্যের, দেখিব যে শিল্পে সময়ের কোনও সূচ্যগ্র স্থানও নাই! স্থান আর আলো, এ দুই সনাতন দুইটিই আছে। সময় লইয়াই, তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিতে গিয়াই, আজ পরিণতির শেষ দৃশ্যে আসিয়া দাঁড়ানো গিয়াছে। যদিও অপ্রত্যক্ষভাবে স্থানের রূপ আছে, যদিও আলোর উল্লেখ দেখি, কিন্তু সেই রূপ এতটুকু সত্যদীপ্ত নহে। বহুদিন হইল সময় নিজের ক্ষমতা পাইয়াছে, এবং তাহার দৃঢ়তা অস্বীকার করা বা ভাবা যায় না। তবু বলিতে হয়, সময় রূপটার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই প্রকৃতির, শুধু ইহার অস্তিত্ব মানুষের মধ্যেই, এবং কোনও সত্য সে দেয় না, না তাহার নিজের আছে।

এবং যে সময়ধর্মী তাহার পক্ষে, সাধারণত দেখা যায়, একেবারে স্থানকে মানিয়া লওয়া বা তাহার সত্যকে তথা বাস্তবতাকে মানিয়া লওয়া, বা সেখানে জীবনের লক্ষণ আছে কী না আছে সেকথা যাচাই করিয়া দেখা সম্ভবপর নহে। কেননা সঙ্গে সঙ্গে আলো আছেই, সে আলো তো শুধু কিরণসম্পাত নয়, যে যা হোক করিয়া সারিয়া দিলাম; এ বিষয়ে ভাবিবার প্রয়োজন, এবং সেই আলোকে স্বীকার করার ধারা অন্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার বাস্তবতার উপর দিয়া তাহার বিস্তৃতি লক্ষ্য হইতেছে, উপলব্ধি হইতেছে, আলোকে এইভাবে স্বীকার করা হয় যে, সে চলমান সময়ের জন্যই। তাহা ভিন্ন তাহার অন্য সত্তা নাই। অবশ্য একথা প্রযোজ্য যে নিছক আলোককে স্বীকার করার মন আমাদের নাই, এখনও সম্ভব হয় নাই, সব ক্ষেত্রেই সে কোনও না কোনও সম্বন্ধেই আসে।

স্থানের সম্বন্ধে যে-আলোকলীলা তাহাই আমাদের ধর্তব্য। আলো আর স্থান মিলিতভাবে রস সৃষ্টি করে। স্থান যখন আলোকে উল্লেখ করে, আলো যেমন স্থানকে, সে রূপলীলা আমার যে বাস্তবতা দিয়া রূপান্তরিত হয়, সেই হইতেছে ছবি। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, এ সমস্তই একটি পটভূমিকাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায়, তখন আমরা তাহাকে গ্রহণ করি। আর সে ক্ষমতা বহুলোকের আছে।

সে ক্ষমতা নিজের কাছেও গোপনে থাকে, সেই গোপনতা যখন একজনের কাছে সম্যকরূপে তাহার সমস্ত লক্ষণ লইয়া দেখা দেয়, এবং সেই একজন যখন আমাদের সে কথা বলেন তখনই তিনি শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হন।

ছবির কতগুলি দিক আছে, তাহার বস্তুগত দিক হইতে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। পট নিজেই এক; যখন তাহাকে ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুত করা হইল, চোখের সামনে যখন দণ্ডায়মান, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা যাইবে যে তাহা নিজেই এক রহস্য; সে রহস্য ভারি অদ্ভুত। এবং বৈদিকরা যে সংশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহাও ঠিক সেইরূপ। শুধু ইহা নহে, আর সেকথা খুবই অকিঞ্চিৎকর যে শুধু রূপের রূপান্তরের জন্য একখণ্ড স্থান, এবং স্থান বৈ আর অন্য নহে। আশ্চর্য তাহার এক দিকে আলো, অন্য পক্ষে অন্ধকার। পটের উপর আলো পূর্বাবধিই থাকে, পরে তুলির টান তাহার স্থান সৃষ্টি করে, এই সত্য। না, স্থান সেখানে আছেই এবং আলো টান পরম্পরা আসে। এ রহস্য বৈ অন্য আর কী! এই বাস্তবতাকে কীভাবে আমরা মানিতে পারি, তাহা আমরা দেখিব।

পটের নিজস্ব সীমা নাই, তাহাই তো রহস্য, যেমন আছে অঙ্গের দিক হইতে কাঠের বা পাথরের, তাহাকে মানিতেই হয়। পটরহস্য অভিনব।

সম্মুখের এই বাধা ক্রমাগত শিল্পীরা আপনকার লীলাস্বরূপে ভাঙিতে চেষ্টা করিতেছে। এ ইতিহাস সৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। বাংলার শিল্পীরা একভাবে রূপপরায়ণ হইয়াছে, অন্য দেশে অন্যভাবে উৎসাহিত। সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ডই আন্দস্বরূপ। কেননা এই বিষয় কার্য নহে, কারণ নহে, এই বিষয় শুধুই শুদ্ধভাবে রূপ।

এই যুদ্ধের কথা, প্রতিনিয়তই যথাযথভাবে যাহা শিল্পীর মনের মধ্যে ঘটিতেছে প্রতিনিয়তই নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে তাহাকে আমরা দেখিতেছি, সে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সংঘাত করিতেছে—সে কথা কাব্যময়, এবং তাহা লইয়া হয়তো কাব্য রচনা করা যাইতে পারে। এ কথা সকলেরই ভালোভাবেই প্রত্যয় হইবে যখন সে সমস্ত কিছুকেই দেখিতে পাইবে দিনের আলোয়। এ সংঘাত মানুষের, শতহস্ত মানুষের, একটি হাতের কভু নহে। এ সংঘাত অন্য, ইহার সহিত বিজয়ী মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই। কেননা এ সংঘাত নিশ্চয়াত্মক মনপ্রসূ, শান্ত একের, সৌম্য ব্যক্তির!

এখন পটের এ রহস্য কোন দূরত্ব অতিক্রম করে, দৃশ্যের মধ্যে ছোট অন্ধকার, এ পারে আমি বা আমরা। এ ছোট ব্যবধানকে আমরা ভুলিয়াই আছি, কবে যে সে আর নাই তাহার কোনও লেখাজোখা নাই। সেটা নাই, কিন্তু এক-একবার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখি তাহা যায় নাই, তাহা রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব বেশ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। কিন্তু দূরত্বের ওপারে সেই রহস্য অদ্যও সম্যক বর্তমান। এই দূরত্বই হইতেছে বাংলার শিল্পের প্রাণ-স্থান। এই দূরত্ব যত বেশি সঠিকরূপে পরিগণিত হয়, শিল্পের আঙ্গিককে স্বকীয়তা দেয় তাহাই প্রমাণ। সেই দূরত্বই একটি সত্তায় পরিণত হয় (আছেই), সত্য বলিয়া মানে, তখনই সম্পূর্ণতা আসে।

চোখের একটি নিজস্ব সত্তা আছে, সে মন নহে। তাহার নিজস্ব একটি রূপ গ্রহণ করিবার ঢং আছে, সেখানে সে নিশ্চয়! একথা তাহার নিকট সত্য, দৃশ্যমান জগতের, তাহার সমস্ত কিছুই, তথা একের সঙ্গে সম্বন্ধ একের, রংয়ের সঙ্গে রংয়ের। আমাদের খানিকটা সেখানে যোগ হয় না, তাহার সমস্ত প্রতিবিম্বিত হয় আপনকার রূপেই; পরিপাটি ঠিকভাবে, সেই অস্তিত্বের উপর কোনও ইচ্ছাই ছায়াপাত করিতে সক্ষম হয় না। বহুতর মানুষের ঘটনা সংঘাত সেখানে কিছুই করিতে পারে না। দেখার রূপকে রূপ বলিয়া গ্রহণ করা বড় কঠিন, আর যেখানে সময়ের চিহ্নমাত্র নাই, কোনও হেতু নহে, আর তাহাকে আরোপ করা সম্ভব নহে। সময়টা বহু পরে আসে। চোখের স্বকীয়তাকে আমরা বহুদিন ভুলিয়া আছি, ঠিক তাহার সীমাকে আমরা কোনওখানেই মানি না। সেই সীমাকে সুন্দর বলিবার চেষ্টা আমরা করি না। কিন্তু তাহাকে না উপলব্ধি করিলে ছবিকে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিব না। শ্রীচৈতন্য সমুদ্র দর্শনে একদা বলিয়াছিলেন, কিছু নাই দেখিবার, সৌন্দর্য মনেতে যাহার আছে, সে দেখিতে পারে, এবং তাহারই ভালো লাগে। দৃষ্টির লীলাই এইখানে স্মরণ করা যায়, আর তাহা সত্য। সেই সীমাকে সর্বভাবে জীবনের অস্তিত্ব ছাপাইয়া গিয়াছে, তাহাকে নিশ্চিহ্ন করে এবং নিজের বাস্তবতাকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আজব এই বাস্তবতা, আমাকে-আপনাকে জড়ই করিয়াছে, জড় ছাড়া আর কী বলি! জীবন দুর্ঘটনার সমন্বয়, তাহার ঘটনাপরম্পরা তাহাকে অস্তিত্ব দিয়াছে এবং বুদ্ধি দিয়াছে, এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করিয়াছে। সে ক্ষমতার মূল্য আমাদের দিক হইতে কতটুকু, কেননা সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ তাহাকে সমভাবেই স্পর্শ করে, একটি মাত্র রূপেই আসে, যেটা সে ব্যবহার করিতে পারে। এ বাস্তবতায় আমরা আমাদের সীমাকে তুচ্ছ করিয়াছি, সীমা যে কী বিরাট সত্য তাহা ভুলিয়াছি। এবং বেশ বুঝা যায় এক জায়গায় আমরা জড় হইয়া আছি, ক্রমাগত জড় হইয়া যাইতেছি। আপনকার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কোনও সম্বন্ধই আর নাই, আলো উদ্ঘাটিত কোনও সত্যের সঙ্গে পরিচয় করায় না।

আমাদের সে দৃষ্টি কোথায়, তাহা আমরা ঠাহর করিতে পারি না, কেননা সাধারণ জীবনের সঙ্গে এর কোনও যোগ নাই, যে দৃষ্টি শ্মশানের আগুনের সম্মুখেও নিরপেক্ষ থাকে, জীবনকে যে শাসন করে, জীবন যাহাকে ভয় করে, লক্ষ্মী বলিয়া মানে। সেখানকার আলো আর তাহারই সম্বন্ধ কিছু একটি অস্তিত্ব সৃষ্টি করে, সুস্পষ্ট অস্তিত্ব, যে অস্তিত্ব হেতু নহে, উপলক্ষ নহে। সেই বাস্তবতা কই, সে দৃঢ় কড়া বাস্তবতা, যাহা মরিয়াও মরে না, চিরস্থির এবং যাহা বাহিরকে দিয়াছে অবিচলিত অমরতা, সত্যই যাহার সত্য নিয়া অদ্যও মানুষ নির্ভীক! সর্বাধিক বড় রহস্য আমার সম্মুখের বিস্তৃতি, আর দৃশ্যমান সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম তথা জড় ও প্রাণ! চোখের সঙ্গে সম্মুখের এই জগতের পরিচয়, এই জগতের আত্মীয়তা বিস্ময়কর! চোখই সমস্ত প্রমাণের শীর্ষে, আর সমস্ত প্রমাণই তাহার তুলায় কিছু নহে। অদ্য সে চোখের সত্তায় আসিবার মস্ত এক আহ্বান সর্বত্রই! দৃশ্যমান জগতকে দৃশ্য বলিয়াই মানিতে হইবে।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অন্য একীভূত হইয়াছে, কোন কিছুর সীমা তাহার নিজের রূপের মধ্যে আবদ্ধ নহে, চোখে-হাতে-কানে-নাকে-মুখে কী অদ্ভুত এক জট পাকাইয়াছে, কী ভয়প্রদ! কেমন করিয়া এই জট খোলা যায়, তাহা ভগবানই জানেন। ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করা শুধু যোগের কাজ নহে, পরন্তু নিজের বাঁচিবার কাজ, ভদ্রভাবে যাহাতে বাঁচা যায় তাহারই একটি একমাত্র পন্থা। যে মানুষের ইন্দ্রিয়ভেদ নাই, সে জ্ঞানহীন।

সেই ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রত্যহের ঘটনা কেমনভাবে এক করিয়া দেয় সেই কথা সাহিত্যের, ফলে সমস্ত কিছুই অচেতন হইয়া যায়, আর তাহার স্বকীয় চেতনা থাকে না। সময় এ সকলের বিকার সৃষ্টি করিয়াছে, সমস্ত কিছুই সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। মৃত্যুভয় কালকে মানে, সেও মহাজীবনের হেতু। সময়ের সংস্কার ভয়ংকর, কিন্তু আমরা এই কথা বলি না, এ সত্য মানি না। ছবিকে ছবি হিসাবেই দেখিব।

আলোকই জীবনের কারণ, এবং আদি পুরুষ। আর তৎপরে এ দৃশ্যমান সৃষ্টি-রহস্য।

বাংলার শিল্প কখনওই সেই কথা ভোলে নাই। যতটুকু সাহস তাহার মধ্যে দেখা যায় তাহা অত্যন্ত নির্ভীক। দূরত্ব এবং সেই দূরত্বের পরই বিস্তৃত আলোক, আর আলোক-আবিষ্কৃত স্থান — এ দুই সত্য বলিয়া মানিতে সাহস চাই। আলোকে কেমনভাবে তাহারা রূপান্তরিত করিয়াছে, সে আমরা দেখি। শুধু তাহা বস্তুর মধ্যে নহে, লাবণ্যটাকে আনিয়াছে নিজের অর্থেই ও বিষয়গতভাবে। আলোকে এতাবৎ আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি দেখিতেই, ব্যক্তিগতভাবে তাহার সত্তা আছে। তাহাতে এটা বিশেষ বুঝায় না যে সেই পদ্ধতিতে বস্তুর গুণই শিল্পীর উদ্দেশ্য নহে, পুরাপুরিই তাহাতে অর্থাৎ সেই প্রকারে বস্তুর গুণই বুঝানো হইয়াছে, নিজের অনুমানকে সত্যে পরিণত করা হইয়াছে, প্রত্যক্ষের কোনও বালাই সেখানে নাই। বাংলার শিল্পে সেই প্রত্যক্ষের সত্য সম্যক বর্তমান, যে কোনও পট দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, আলোকে শিল্পীরা কোনওক্রমেই মনগড়া ভাবে খাটায় নাই।

ভাবের ঘরে চুরি করা বাংলার মনে একেবারে নাই, তাই সত্যকে সত্য বলিয়া মানিতে তাহার উৎসাহ বরাবর যথাযথভাবে আছে। আলোর যে রূপ তাহা বিষয়গতভাবে দেখিয়াছে, এখানে সেই কাজ করিতে গিয়া হয়তো অনেক সময় পদ্ধতি তাহার শুধু অবয়ব-আত্মক হয় নাই। অবশ্য অদ্য সকলেই স্বীকার করেন যে, তাহা না হইলেও কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নিছক আলোটাই আসিয়াছে তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাই। এবং ঠিক এই কারণে তাহার যেমন নিজস্ব আঙ্গিকে আসিয়াছে, তেমনি রংয়ের ব্যাপারেও দেখিতে পাই তাহার নিজস্ব পছন্দ আছে, ঠিকভাবে তাহার একটা সমতা আছে, এবং আলোকে আপনার স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়া প্রাধান্য দিয়াছে, সে প্রমাণ বহু বহু ছবিতে দেখতে পাই। বিষয়গতভাবে আলোকে খাটানো, ইহা আমাদের বহু দিনের, হয়তো এ কারণে অনভিজ্ঞ লোকের মনে হইবে জিনিসটা বহুস্থানে চিত্তির হইয়াছে। কিন্তু সেকথা ঠিক হইবে না, ঠিক এইভাবে আলোকলীলা

দেখাইতে, আগেই বলিয়াছি, আমরা অভ্যস্ত নই, তাই ভ্রম হইতে বাধ্য। আর এ আলো শুধু এক বস্তুর সঙ্গে আর বস্তুর সম্বন্ধ ছাড়া আরও বিশেষ অন্য, আলোর সঙ্গে যে চোখের নিকট সম্বন্ধ আছে সেই কথাই বলে। তৈল রং একটি অদ্ভুত অস্ত্র এবং ইহাতে নিজ হইতেই ছবিকে অনেকখানি সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের দেশে ছবিতে তৈলের স্থান নাই, যদিও প্রতিমার মুখ পালিশ করা হইত, কিন্তু তাহা অন্য ব্যাপার। শুধু কয়েকটি রংকে সহায় করিয়া আলোর স্বরূপকে উন্মুক্ত করা সত্যই আশ্চর্য। অনেক সময় দেখা যায় রসকলি টানিয়া সে সাক্ষ্যকে পুরাপুরি রাখা হইয়াছে — এ কথা মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নয়। রসকলির প্রয়োজন অন্য। এবং কতগুলি রং আলোতেও আপনার সত্তায় থাকে এবং থাকিয়া আলোকে প্রমাণ করে। দেখা যাইবে প্রত্যেক রং-ই ব্যবহার করা হইয়াছে নিবিড় নিপট করিয়া, কোথ্যা স্বচ্ছতা নাই, এবং তাই অব্যাহত হইয়াছে। এবং রেখামাধুর্য যাহা তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছে এবং আলোকে ব্যক্ত করিয়াছে, সে আমরা পরম্পরা দেখিব। আলো শিল্পের চোখের পার দিয়া আসিয়াছে বরাবর, তাহা আমরা টের পাই। আর তাহার সঙ্গে প্রকৃতির একটি আপন স্বকীয়তাপুরঃসর যোগাযোগ আছে।

বহু বহু দেশে যখন রূপের বিষয়ে কথা ওঠে, এবং সেই সংক্রান্ত বহু তর্কের সূত্রপাত হয় — এ যাবৎ সেই প্রসঙ্গে সুধীরা বহু লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে পাঠে আমাদের ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিশ্বাস জন্মায় না, যেহেতু রূপ যেকালে রূপান্তরিত তাহার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ বিশেষ থাকে না। সেগুলি লিখিত বিষয়ের অঙ্গ বৈ অন্য নয়। এবং লিখিত বিষয় ও রূপান্তর দুইটিই আমাদের মতো সাধারণের কাছে এলোমেলো লাগে, আমরা বুঝিতে নারাজ নই, আমরা বুঝিতে পারি না

কেননা আমরা এ যাবৎ দেখিয়াছি, আর আমাদের অভিজ্ঞতা যে, সাধারণ ছবির রূপান্তরিত অবস্থায় একটি বিশেষ ফাঁকি আছে। ফাঁকি বলতে আমরা কোনও নিন্দা প্রকাশ করি না, না সে অধিকার আমাদের কখনও আছে, অবশ্য তাহাকে যদি একান্তই ফাঁকি বলা যায়ই। ফাঁকি আছে এ আমরা অত্যন্ত সরলভাবেই বলিতেছি এবং এও লক্ষ্যের বিষয় যে সেই কাজকে কেহ কোথাও ফাঁকি বলিয়া উত্থাপন পর্যন্ত করেন না, ইহার কারণ হয়তো ইহাকে নিয়া ভাবিবার প্রয়োজন মনে করা তাঁহাদের দিক হইতে ওঠেই না। সেই ফাঁকিটা কী অদ্ভুতভাবে তাঁহাদের নিকট সত্য, একমাত্র সর্বত্রই সর্বৈব সত্য। বাস্তবতার একটি দিকে এ ফাঁকি নিবিড়ভাবে জাঁকিয়া আছে। তাহার অস্তিত্বের অদ্বিতীয় কাঠামো অথবা ভিত্তির উপরে তাহার সমস্ত কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে। এ ভিত্তিকে ঠিক সরাইতে পারা যাইবে না, যদিচ ইদানীং ক্বচিৎ দু-একজনের চেতনায় তাহা বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু আমরা সেটা শুধু সম্যকই উপলব্ধি করি।

বিশেষত বাস্তবতাবোধের অহংকার পাশ্চাত্য দেশের আছে, বাস্তবতাকে তাহারা ছলে-বলে-কৌশলে আনে, এবং সে কার্যে তাহারা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়। কিন্তু যদি কথা ওঠে বাস্তবতাকে গোঁসাইরা কতখানি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা হইলে মনে হয় তাঁহাদের একটু চঞ্চল করিবে!

দেখা যায় সাধারণতই উহারা যে কোনও একটি রূপকে তির্যকভাবে রূপান্তরিত করে, অন্যপক্ষে কেহ হয়তো আলোকেও সেইরূপে রূপান্তর করে, অথচ বৈঠকিভাবে বলে, সেকথা বিবেচনা করা দরকার, সোজাসুজিভাবে রূপান্তরের কথা তোলে, সেটা ঠিক উহার উপরে ভিত্তি করিয়াই বলে, ইহাতে তাহাদের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় না। সেটা অনেক দিক হইতে সত্য না হইলেও বাস্তবতার প্রাণস্বরূপ। ইহার অস্তিত্ব একটু কৌতূহলের সৃষ্টি করে। বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের একটি যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তা একটি দৃষ্টিকোণের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে হয় কী, একটি বিশেষ স্থানের উপর আর একটি বিশেষ স্থানের ছায়া থাকে সুস্পষ্টভাবে। এই যোগফল খুবই সাধারণ,

ইহা আমাদের দেশের ছবির মার্গে আসিতেই পারে না। ইহাকে তাই আমরা ফাঁকি বলিতে সাহসী হইয়াছি। কেননা চোখের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে যাহা এক করে তাহা মানুষের স্মৃতি, তথা মন নিশ্চয়ই, সেই হেতু মন তাহার কর্তা হইয়া দাঁড়ায়—চোখ নয়। ফলে দেখা যায় সমস্ত ছবিই একটু বাঁকাভাবে সাধারণ পরিপ্রেক্ষণে আনিয়া ফেলা হয়। সোজাসুজি ভঙ্গির কোনও ছবি আঁকা একেবারে অসম্ভব। সোজা কোনও দৃশ্যকে বিচার করা, অথবা রূপান্তরিত করা একেবারে অন্য রীতির ব্যাপার। সহজভাবে বলিতে গেলে পদ্ধতির অনেক পারদর্শিতা থাকিলে তাহা সম্ভব হয়, নচেৎ তাহা মিথ্যায় পর্যবসিত। এবং এ যাবৎ বাঁকা করিয়া দেখাটাই চলিয়া আসিতেছে এবং এই চিরাচরিত কোণকে অদ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ বলিয়াই সকলে মানিয়া নিয়াছে। দেখা যায় অত্যন্ত প্রামাণ্য শিল্পীরাও ইহাকে এড়াইতে পারে নাই। সেই দৃষ্টিকোণকে মানিয়া নিয়াই আলোকব্যবস্থা, আলো ও আঁধার বৈকি; আর দিব্য হইয়া উঠিয়াছে একটি বাস্তবতা, এবং সেই বাস্তবতা নিয়া তাহারা কাজ করিয়া চলিয়াছে। তাহার রংকে ইদানীং বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছে। রং-কে কখনও বস্তু হিসাবে, কখনও আলোর দিক হইতে ব্যবহার করিয়াছে, বহু বহু ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা তাহাদের সাফল্য আসিয়াছে। অনেকখানি পথ পরিষ্কার করিয়াছে আলোকের, রং দেওয়া হইয়াছে প্রতীকী ভাবেই। আলোকের অস্তিত্ব এরকম স্বীকার করিয়া আমরা সাধারণ ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই তিনটি জিনিস। একটি বস্তু আর অন্যটি তাহারই সম্বন্ধে আলোকসম্পাত আর একটি সোজা দৃষ্টিকোণ। আর অন্য কিছুই দেখা যায় না। অতঃপর একটি নিবিড় অন্ধকার, সৃষ্টির বহু পূর্বের অন্ধকার, যদি প্রাণ সত্যই থাকে তাহা হইলে সে হাতড়ায় অন্য কিছু, সেখানে সে আপনকার বাস্তবতা খুঁজিয়া পাইতে আশা রাখে, সেই হেতু সে নিশ্চেষ্ট নয়। সেই রূপান্তরিত দৃষ্টিকোণ আর এই দৃষ্টিকোণ সকল সময় আড়াআড়ি যায়, কোনও অছিলায় যে কোনও সুযোগের বশে তাহারা আবার মিলিয়া যাইতে পারে না, বাধা ঘটে। যদি কখনও পারে, এমন সম্ভব হইত, তাহা হইলে একথা স্থির যে একটি নূতন সম্ভাবনা চোখে পড়িতই, এড়াইতে পারিত না।

এবংবিধ দৃষ্টিকোণ সাধারণের থাকে, ইহাই মস্ত মর্মস্পর্শী দুর্যোগ। এ দৃষ্টিকোণ সত্য দিয়া হঠাৎ এড়াইয়া যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। একথা যে কতখানি নিশ্চয়, তখনই তা প্রমাণিত হইবে যখন একটু পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে। ঠিক এর উপস্থিতি সম্যকভাবে বিচার বিবেচনা করা শিল্পের একটি গূঢ় ধর্ম। এর সীমাকে ছড়াইয়া যাওয়া শিল্পী সাধারণের বেশ মুশকিল। এই মায়াকে পৃথকভাবে দেখা অনুশীলনসাপেক্ষ, এ মায়া অনেককে ভুলাইয়া রাখে। আরও অধিকন্তু সম্মুখে এই পটভূমিকার সহ্য যাহা আঁধার ও আলোকে একটি রহস্যের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, ইহা হইতেই জন্মলাভ করে অনেক কিছু রহস্য, আর বিপদ ঘনায় যখন দুইটি রহস্য মিলিয়া একটি মায়ার সৃষ্টি করে। তখন শিল্পীরা চিন্তিত হন, অস্থির হইয়া ওঠেন, তাঁহাদের কল্পনাতেও এই মায়া নিপট হইয়া ওঠে এবং অনড় বস্তুর মতোই মনে হয়। অনেকে আবার দেখা যায় ঠিক এই কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একথা চঞ্চল করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের সুস্পষ্টভাবে কিছু বলিয়া যান নাই, আমরা সেকথা শুধু বুঝিয়াছি, যেহেতু তাঁহাদের প্রাণ আমাদের তাহা বুঝিতে সাহায্য করিয়াছে যথাযথভাবে।

এখন এই যে 'অসম্ভব' আমরা দেখিব কেমনভাবে আমাদের দেশে বরাবর ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং সাফল্য ঠিক এই কারণেই হইয়াছে। তাহাদের যে কাজ আছে তাহার মধ্য হইতে বহু পরিচয়ই আমরা পাই, যদিও ছবি হিসাবে আমাদের হাতে খুব কম সংখ্যায়ই আজও আছে, কেন তাহার পনেরো আনা নষ্ট হইয়াছে, তাহার কারণও আমরা জানি।

এর বাস্তবতার সঙ্গে প্রশ্নের রূপের অনেকটা মিল আছে। অবশ্য অনেক দূর হইতেই। প্রশ্নের একভাগে কালো আর অন্যতে সাদা। পুরাপুরি যাহা একটি অবিশ্বাস, সেই অবিশ্বাস তাহার মূল, আবার ঠিকভাবে বিশ্বাসের জন্য প্রস্তুতিও লক্ষ করা যায়। বিবর্ত-আত্মিক তাহাই যাহাকে আমরা বলিব কোনও

কিছুর সাদৃশ্য বা লক্ষণ থাকা, বিবর্ত বাস্তবতার পর একটি আধা স্থান জুড়িয়া আছে—কেউ কেউ অতিক্রম করার প্রয়াস মাত্র করি, হয়তো সেখানে সফলতা কেউ লাভ করে। যাক সে কথা। কিন্তু এই যে দৃষ্টিকোণ সমষ্টি সে কোনও নির্দিষ্ট বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়, আর তাহার পক্ষে আলোকের কোনও অস্তিত্বই নাই। এ দৃষ্টিকোণ সে সাহায্য চায় না, ঠিক ইহার সম্যক রূপ নিয়া আমরা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু ইহার বর্তমানতা অস্বীকার করিবার নয়, আমাদের বহু কথাও আমরা জানি না। আমরা অস্তিত্বে অস্তিত্বে বহুতর, কতটুকু সত্যই বা ধরা পড়ে আয়নায়! ভাবিলে সত্যই বিস্ময় বোধ হয় যে কতটুকু ঐশ্চর্য নিয়া আমরা সম্পূর্ণ হইতে চাই!

সম্মুখে এই যে বিস্তৃত সকালবেলাকার ধান খেতটি, সবুজ হইয়া পড়িয়া আছে সকালের রোদে, তাহার কতখানি আমরা সত্যই লইয়া থাকি — তাহার স্থানকে কখনও আমরা লই না, আর তাহাকে কেবলই দেখার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সেখানে বুঝিতে পারিব একটি বিশেষ অন্ধকার ছাইয়া আছে। নিছক ভাবে দৃষ্টিকোণের কোনও বাস্তবতা আমাদের সুধী করিবে, আলোই সেখানে একমাত্র কর্তা যাহা সমস্ত কিছুর স্বরূপ হইয়া দেখা দিবে, আলোই একমাত্র বিবর্ত, আর বিস্তৃত স্থান দেখা যাইবে নিজস্ব অস্তিত্বে যাহা এই দৃষ্টিকোণের সম্বন্ধে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমস্ত চেতনা যখন এইটুকু নিয়া অনেকখানি হইয়া থাকিবে।

শুধু একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের মহিমা আমাদের সম্মুখে যে অন্ধতা রহিয়াছে, অনড় হইয়া আছে, তাহাকে মুছিয়া ফেলিবার কাজে লাগিবে। অন্ধকার আর আলোকের সম্বন্ধকে সম্যকভাব আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিবে। আর তাহাকে সৃষ্টি করিবে একটি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে, এবং তাহাকে দেওয়া হইবে একটির চেতনার দৃঢ় অস্তিত্ব, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া, যাহার সম্ভার লইয়া ক্রমাগত প্রত্যক্ষের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে প্রত্যক্ষ হইতে সমস্ত দৃশ্যের যে কোনও বস্তুই তাহার স্বরূপেই দেখা দিবে; গাছ গাছ, পাথর পাথরই। বিশেষ বিশেষই। আর তাহাই সম্যক বোধ হইবে। আমাদের বিবেচনায় এখানে দেখা যাইবে ঠিক ধরনের দৃষ্টিকোণের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, প্রায় জায়গা সমস্ত কিছু ছন্দিত হওয়ার রূপটা দেখা যায়, কিন্তু এখানে যে রূপ অব্যাহত হইয়া আছে।

রূপকে রূপান্তর করা ইহার অঙ্গীভূত হইলেও আর এক কল্পনা। লোকচরাচরে সব অস্তিত্বই ক্রমাগত আমাদের অস্তিত্বের উপর দিয়া আসে। ছোট বড় বহু অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? সে অভিজ্ঞতাগুলিকে ঠিকভাবে বশে আনা দুরূহ, কেননা সেইসব অভিজ্ঞতা বড় কাজের, যে জিনিস অপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কাজের তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষার বস্তু নয়। আর তাহার মধ্য দিয়া সমস্ত দৃষ্টিগোচর বস্তু আসে, কতখানি তা দৃষ্টিকোণের সীমাকে মানে, আর কতখানি তাহা অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া লয়, একতা নিয়া ঝটিতি একটি সিদ্ধান্তে আশা দুঃসাধ্য।

বস্তু একটি বিশেষ কোণে অবস্থিত, পট আর এক কোণে থাকে, ঠিক ইতোমধ্যে সমস্তই অভিজ্ঞতার, ঠিক ইহাকে এড়াইয়া দৃষ্টিকোণের বিশেষ রূপ কতখানি একা আসিতে পারে? মধ্য পথেই তা লুপ্ত হইয়া যায়। আবার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব নয় তো কী! এমনও লোক আছেন যাঁহারা বেশ জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন যে, কেমন হঠাৎ দৃষ্টিকোণ অন্তর্হিত হইল। এবং আবার সাড়া পড়িয়া যায়, আবার কোমর বাঁধা, আবার চেষ্টা নূতনভাবে, আবার নূতন করিয়া তাহার দিকে চোখ মেলিয়া দেখা, এবং তাহারই উপস্থিতিকে সম্যকভাবে মানিয়া নিবার চেষ্টা, যারপরনাই স্বীকার করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এখানকার দুর্যোগ অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত মন আকর্ষণ করে। দেখা যাইবে তাহার অতীত তাহার অভিজ্ঞতা তাহাকে সব সময় ধাক্কা দিতেছে, তাহাকে একপ্রকার চক্ষু রোধ করিয়া আছে, যাহাতে দিনের আলোতেও তাহাকে ভাবিতে হয় এটা কী! যেহেতু সে অভিজ্ঞতায় সম্যক বর্তমান বহুতর

ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ। এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের মায়া এমনিভাবে দৃষ্টিকে তাহার স্বকীয়তা হইতে উদ্‌ঘটিত করিতেছে যে তাহা ভাবনার — ফলেই বারংবার দৃষ্টি আমাদের পথমধ্যেই খোয়া যায়। অন্য পক্ষে, আর একটি বৈচিত্র্য দেখিব, তাহা সমানই বিস্ময়কর, যে, যে কোনও দুইটি বস্তু যখন পাশাপাশি একই দূরত্বে থাকে, তখন আমরা যে বিশেষ দৃষ্টিকোণের কথা বলিতেছি তাহাকে ঠিকভাবে মানা, তাহাকে কার্যে পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়; যেহেতু অভিজ্ঞতা, কোনক্রমেই তাহার এই কিম্ভূত খামখেয়ালি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চাহিবে না, এবং ইহা ছাড়া যদি সম্মুখের কথা আমরা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব — একই ব্যাপার ঘটে। তাহা হইলে যদি সাধারণ স্বীকৃত সহজ পরিপ্রেক্ষণ না স্মরণ করা হয়, এবং সেই পরিপ্রেক্ষণে বসিয়া তাহাকে রূপান্তর করা না হয় তাহা হইলে সকলেই হাহা করিয়া হাস্যলীলা চাপল্যে অস্থির হইয়া সমস্ত আবহাওয়াকে ভরাইয়া তুলিবে।

সম্মুখের কোঁদা থামের পিছনে আরও থাম, এইখানে যথেষ্ট দিবালোক আছে, সমস্ত দৃশ্যই পাঁচজনের কাছে সুস্পষ্ট, আর যখন এই থামগুলিকে ঠিকভাবে দেখার দরকার তখন আমরা তাহাকে দেখি পুরাতন পরিপ্রেক্ষণের অঙ্কে, কেন সেটা মনে রাখা দরকার বেশি, সেই গড়ের পরিপ্রেক্ষণটা কতটুকু ঠিক তা বিবেচনা-সাপেক্ষ, সেই পরিপ্রেক্ষণটা বেশি ছন্দময়, সম্যকভাবে স্থানের দিক হইতে, স্থান যদি বিষয় হয়, তাহা হইলে দেখিব এই পরিপ্রেক্ষণের মূল্য ধূলা।

পাশাপাশি বস্তুর অস্তিত্ব যে কত অদ্ভুত তাহা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিব কী যে তা ভারি অদ্ভুত। সেখানের আলো, আর এ পাশের অন্ধকার, মধ্যে একটি অদ্ভুত বিধি আছে, আর সেটা লক্ষণীয়, প্রতি বস্তুই কেমন যেন বাঁকাচোরা, একটা থাম হয়তো ঠিকভাবে আসিল, পাশেরটি একেবারে ভাঙা ভাঙা, থামের বিশেষ রূপ যাহাকে অঙ্ক খানিক দিয়াছে, বস্তু খানিক দিয়াছে, সেইরূপ কতখানি ঠিকভাবে থাকে তাহা ভাবিবার।

এমনিধারা পরপর বহু বহু দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দরকার, কেননা সেটা বাস্তব, এবং সেই পরিচয় করাইয়া দিবার দায়িত্ব একমাত্র শিল্পীর। পরিপ্রেক্ষণ কতকটার সম্যক রূপ বহুলোকের কাছে, আমাদের পাঁচজনের মতোই ধরা পড়ে নাই। সকলই তাহাকে, পূর্বেই বলিয়াছি, একটি বিধিনিষেধের মধ্যে আনিয়াছে, আর সে নিয়ম অত্যন্ত কাব্যের মতন! শিল্পের দিক হইতে তাহারা কোনও অর্থ ঠিক ভাবে উপলব্ধি হয় না।

দেখা যাইবে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণকে বাংলার শিল্পীর মতো কেউ আমল দেয় নাই, যদিচ যেটি দেখা যায় সেটি অন্য বস্তুর বাস্তবতা নয়, নিছক ছাপ। ছবিতে দৃষ্টিকোণের ব্যঞ্জনা একরূপ থাকে না, সেটাও ছন্দের নকসা হইয়া প্রতীয়মান হয় (অবশ্য অন্যান্য নব্য শিল্পী ছাড়া বহুলোক এ দোষে দূষিত), আর তাহা নিতান্তই জ্যামিতিক। কেননা সেখানে অন্ধকার তাহার আপনার সত্তায় অক্ষুন্ন রহিল এবং বস্তুবিশেষের গড় রূপটাকেই মানা হইল। সেখানে তাহার সিদ্ধি কতটা হইয়াছে তাহার বিচারের ভার চিন্তাশীলদের কাছে, কেননা মনে হয় যে আলোকে তো ঠিকভাবে দেখিতে পায় নাই। না কিছু, না কোন বিশ্বাসের লক্ষণ সেখানে দেখা যায়। একটি স্থিরীকৃত রূপকে ঝটিতি বিষয়ের উপর সোজা চাপাইয়া দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? পর পর যে এত রাশি রাশি বাস্তবতা তা কি হেলাফেলার?

যে চোখ দিয়া আমরা দেখি তাহার স্বভাব অতি বিচিত্র, তাহার নিজস্ব একটি ধর্ম আছেই, দৃষ্টিকোণের কতগুলি দৃঢ় সত্য আছে, যে সত্যকে, সেই পটের বাস্তবিকতাকে, রহস্যকে একের বিশেষভাবে মানা উচিত ছিল। সেকথা মানিলেই সমস্ত তর্কের শেষ হইত হয়তো, একথা আমরা পাঁচজন ভাবি। কেননা সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণের সহজ রূপ আমাদের সমানই আনন্দ দিবে, যেমন অদ্য গড়ের মিল আমাদের আনন্দ বর্ধন করে।

প্রথম যাহাকে কাগজ আর তুলি দিয়া কোমর বাঁধিয়া অনুশীলন করিতে হয়, চোখের উপর ভারী

পর্দার সঙ্গে বারংবার তাহাকে আঘাত পাইতে হয়। সম্মুখের বস্তুটার দিকের পর দিক রহিয়াছে, তাহার আলো আছে, সমস্ত থৈ হারাইয়া যায়। ক্রমে, অন্ধকারে অন্ধকারে সমস্ত কাগজ ভরাইয়া দেয়। ছবির উপর অনেকটা অন্ধকারে লেখা কথা যেমন আঁকাবাঁকা হইয়া যায় তেমনই ঘটে, আলো তাহাকে সাধারণত সমতা দেয়। এইবার দৃষ্টি নিয়া দেখা যাক, দেখা যাইবে নির্দিষ্ট বস্তুর সম্মুখে তাহার দেহ দুলিতেছে একবার এদিক, একবার ওদিক, চোখ ছোট করিয়া চাহিয়া আলোককে নিজের কাজে লাগায়, মন সংযোগ করিতে চেষ্টা পায়। এই মন সংযোগের অপেক্ষা বেশি কি চোখ সংযোগ করার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি? এখানে, হয় কী, আপনার দৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হয়, আর এক দৃষ্টির সঙ্গে দূরত্ব ঠিক হয়। এই কথার তাৎপর্য আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হইবে যে, যখন কোনও পশু সামনে থাকে তাহার নড়াচড়া বড় অস্থির করে, যতক্ষণ না, একটি স্থিরতার সৃষ্টি যে দিক হইতেই সম্ভব হয়, করার জন্য বড় ব্যস্ততা দেখা যায়। এবং সেই দূরত্ব যখন অভিজ্ঞতার নামান্তর হয়, আলো স্মৃতিরূপ লাভ করে, তখনই উহা রূপান্তরের অপেক্ষা করে, রূপান্তর-লক্ষণ যুক্ত হয়, ফলে আমরা একটা রূপ দেখি।

নূতনের প্রথম অনুশীলন তাই চিরাচরিত, গড় পরিপ্রেক্ষণটিকে চোখের পাশে আনিয়া ফেলা, মনে রাখা। উহাই তাহার মূল সত্য। যেখানেই সেই পরিপ্রেক্ষণ ছক পাইল, একটি বিশেষ সত্তায় আসিল, তাহার আর মাধুর্য অন্তত আমাদের ছবির সামনে দাঁড়াইয়া তেমনভাবে উপলব্ধি হয় না, না তাহা আনন্দদায়ক। চিত্রের মাহাত্ম্য সেখানে লুপ্ত হয় এবং এই ধরনের চিত্র ঠিক শিল্পের পর্যায়ে পড়ে কি না তাহা গুণীজনেরাই বলিতে পারেন। এখানে পরিপ্রেক্ষণ ছবির অন্যান্য বাস্তবতাকে ছাপাইয়া নিজেই একটি যোগ্যতা হিসাবে স্থান লাভ করিয়া সকলের প্রিয় হইয়াছে। অথচ একথা কখনও আমরা বলি না, এই এই গুণ থাকিলেই তাহা ছবি হইবে, আর না থাকিলে হইবে না।

তাই চিত্রকরের আশ্চর্য অনন্য। গাছ লতা পাতা, ওই যে সুদূরে চলমান মেঘরাশি, শ্রেণীরাজি, স্থানস্থাপত্য, বস্তুবিভিন্নতা — এই সব তাহার আশ্চর্যের কতটুকুই বা! আপনার দৃষ্টি ও তাহার বিচিত্র দৃষ্টিকোণ তাহার লীলা-অঙ্গ-তাহার রূপভেদ। এই দৃষ্টিকোণের বিচিত্রতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কম শিল্পীরই হয়, অথবা ইহাও হয়তো সত্য, তাহারা আর আমরা সেই স্বতন্ত্র আশ্চর্যের জন্য কোনও ব্যক্তিই প্রস্তুত নহি। কোনও কোনও ব্যক্তি সেই স্বতন্ত্রতার নামে অনেক অদ্ভুতত্ব আমাদের দেখাইয়া চমৎকৃত করে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর বোধ হইলেও ঠিক তাহার মধ্যে সত্যের স্বরূপ নাই।

আপনার আশ্চর্য এমনইভাবে পটের উপর রূপান্তরিত হইয়াছে দেখিতে পাই। তাই সকলের চোখেই তা ধরা দিয়াছে, সকলেই, আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সব চিত্রশিল্পীর নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা এবং এই রূপ তাহার আপনকার বিস্ময়, এবং শিল্পীর সঙ্গে আমরাও আনন্দের ভাগ পাই। বিশেষত আলোকে যেখানে সকলে স্মৃতি হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসে, এবং দৃশ্যের উপর যোগ করে এবং আলো যে আমরা পর পর আপনার সুবিধা অনুযায়ী সাজাই তাহা ভুল প্রতীয়মান হয়। ঠিক সেই সময় দৃষ্টিকোণের সম্বন্ধে আলো সে তো নয়, সে যে আর এক লোক হইতে আসিয়াছে — তাহা একেবারে মানস লোক—সেখানে আলোকের অস্তিত্ব নিতান্তই সময়-ঘেঁষা।

রূপান্তর ক্রিয়াই আমাদের কাছে চির রহস্য। আমাদের কাছে তাই রহস্য, সেই বিশেষ অবস্থা, যেখানে দাঁড়াইয়া আমরা সব কিছুর দেখা পাই, যে, তাহা কেমনভাবে সম্ভব হইতেছে! সেখানে আলোকপাত সত্য প্রকৃতিগত, না, নয় এবং আমরা দেখিতেছি সেখানকার আলোক আর আমাদের আলোক এই দুইটি আলোকরেখা মিলিয়া একীভূত হইয়া যায় নিত্যই হয়তো, হয়তো ঠিক এই জন্যই রহস্য বেশি করিয়া ঘনীভূত হয়। আমরা বিস্ফারিত নেত্রে সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকি। শিল্পী তখন আমাদের ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া যায়। সেখানে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব একেবারে নির্ভর না করিয়া স্থান অতিক্রম করে, কেননা এইখানেই স্পর্শের জগতের শেষ, আর তাহা যাইতে সক্ষম হয় না —

কোনও অবলম্বন না পাইয়া পড়িয়া থাকে। হয়তো তখনও তাহার একটা ছায়া থাকে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নাই, সেটা খুব নির্গুণ, সে স্পর্শচেতনা তাহার নিতান্ত অশরীরী সে স্পর্শের সঙ্গে রক্তের চাঞ্চল্যের জোয়ারভাটার সম্বন্ধ মনে পড়ে না। সে স্পর্শ তাই রক্তের সম্বন্ধ নির্ভর করিয়া নয়।

শুধু একটা আকার-চেতনা শুধু আকার বুঝায়। আগেই এই কথা সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে দৃষ্টির মধ্যে অনেকটা স্পর্শের ব্যাপার আছে। অদ্য যেটা দৃষ্টি সেটা কতখানি দৃষ্টি তা শুধু বোঝা যায় তাহার রূপান্তরের উপর, কেননা, একটি ভঙ্গি নয়, সমষ্টিগতভাবে দৃষ্টিকেই দৃষ্টি বলা হয়, এবং এই সমষ্টিগত দৃষ্টি বিশদভাবে স্পর্শের অঙ্গের কাজ করে, ফলে সকল ক্ষেত্রে স্পর্শের অনুভব আনিয়া দেয়, পরে আলোকপাত ঘটে! সমস্ত দৃশ্যটা ঠিক একই সঙ্গে আসে, আর একই সঙ্গে রূপ দেওয়া যায় না বলিয়া হয়তো ধারণা হয়, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা পাঁচজন বিশ্বাস করি যে কর্মধারা, বা উপায়, সহসা পাঁচমিশালি একটি মায়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম, সে তাহার ইচ্ছাকৃত বা অভিপ্রেত রূপকে রূপান্তর করিতে পারে। তাহার বিবেচনায় ইহার বাস্তবতাকে হেলা করা উচিত নয় — এইটুকুই আমরা বলিব। আর দ্বিতীয়ত আমরা যখন বাংলার শিল্পের মধ্যে ভুরি ভুরি তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই।

অনেক দেশে বিষয়বস্তুর উপরেই নির্ভর করিয়া আলোকে দেখাই স্বাভাবিকতা। অস্মদ্দেশের শিল্পীরা তাহার পক্ষপাতী নহেন। ইহাদের বিশ্বাস, বস্তু হইতেছে বস্তু, আলো হয় আলো। তাই খানিক বস্তুর গুণের জন্য সে আলো নির্ভর করে। বস্তুর উপর প্রতিভাত যে আলোক, তাহাতে বেশি দেখি। ইহাতে হয় কী ফলে আমরা পরিষ্কার স্পষ্টতই দেখি আলো, দেখি স্থান, আর বস্তু। এ তিন মিলিয়া একটি অলৌকিক রসের সৃষ্টি করে। আর একবার স্থির করা যাক — দেখি স্থান, দেখি আলো, আর দেখি দৃষ্টিকোণ, বস্তু নয়। এই তিন দৃঢ়তর সত্য, এ তিন কারণ, তিনিই কর্তা এবং কোনও কিছুকে আঁকার সময় তাহার আলোকব্যবস্থা, তাহার স্থানসংগঠন, দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া ছাঁকিয়া নিয়া আসা সত্যই অদ্ভুত দক্ষের স্বপ্ন, এবং তাহার দ্বারাই সম্ভব। আমাদের যা কিছু বলার তাহা আমরা হয়তো এখনই উপমা দিয়া ঠাহর বলিয়া ফেলিতে পারিব, কিন্তু তাহাতে হয় এই যে বুদ্ধির পরিচয়ই দেওয়া হইবে, তাহাতে কী বর্তাইবে?

অবশ্য এ সত্যটা শিল্পীর কাছেও রহস্য বৈ আর কিছু নয়, এবং সত্যই যদি তাহা না হতই তাহা হইলে আমাদের মতো সাধারণের কাছে শিল্পীই শ্রেষ্ঠ একথা পরিগণিত হইতে পারিত না। সে রহস্যের গভীরতাই হইতেছে মানুষ, এবং ক্রমাগতই দেখা যায় এমন লক্ষ লক্ষ রহস্যের ভার তাহাকে নিয়তই বহিতে হয়, এবং প্রতিনিয়ত সে ভার নিয়া ক্রমাগতই সাধারণ হইতে চাহিতেছে। কোথাও তাহাকে নুইয়া পড়িতে দেখা যায় না।

আমাদের ধারণায় যে কথা এ যাবৎ আলোচনা হইল, বাংলার শিল্পে একথা নিশ্চয় বিশেষভাবে আছেই। ছবিতে যে তিনের সঙ্গে দর্শকে সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা ঘটনা নয়, তাহা বাধা নয় — শুধু সেই তিন — আলো, আলো আর স্থান; স্থান, স্থান আর দৃষ্টিকোণ; দৃষ্টিকোণই তো বাংলার শিল্পের প্রাণবস্তু! একদা অদিম চিত্রে দেখা যায়, লোকে বিশেষভাবেই জোর দিয়া বলে, কোনও পরিপ্রেক্ষণ নাই। এটা সত্য, সে পরিপ্রেক্ষণ নিছক সেই জড় পরিপ্রেক্ষণ, যাহার মূল এক চোখ, তাহার চোখ; আর এক চোখ তাহার হাত ফলে দৃষ্টি সমষ্টি। যদি সত্যই সেই পরিপ্রেক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে আমরা একটু সত্য পাইব। অর্থাৎ আমরা যে সত্যকে এতক্ষণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ঠিক সেই পক্ষ হইতে তাহার বশে আমরা সত্যই বুঝিতে পারিব যে, তাহারা হয়তো দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে আপনারা বেশ সচেতন ছিল, অথবা তখনও দৃষ্টিকে সমষ্টি করার ক্ষমতা মানুষ লাভ করে নাই। সম্মুখের দৃশ্যত সমস্ত স্থান, আলো-উদ্ভাসিত স্থানসমূহ তাহার কাছে রহস্য ছিল। বহু বহু এলোমেলো কোণ হইতে দেখা তাহারা ভালোভাবে পরীক্ষা করিতে পারে নাই, কেমনভাবে নিরীক্ষণ করা কর্তব্য তাহা তাহাদের কাছে ভালোভাবে ধরা দেয়

নাই, তাহার রূপ তাহাদের মনে ছিল না। তখনও, লোকেরা বলে, পরিপ্রেক্ষণ অজানিত অবস্থায় ছিল, যদিও সেকথা আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বাহিরে, কারণ উহারা স্থান সম্বন্ধে আলো আর তাহার দেখিতে পাওয়া উপলব্ধি করিয়াও কাণ্ডজ্ঞানহীন! তবে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইল কেমনভাবে, তাহা বিস্ময়কর নয়! মাঝে মাঝে ঐতিহাসিকদের মজার মজার কথা আমাদের মতো জনসাধারণের মজার কথাকে ছাড়াইয়া যায়।

সাধারণত যেহেতু প্রত্যক্ষ হইতেছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ, সেই প্রত্যক্ষই যখন নিজেই একের অস্তিত্ব নানা দিক অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি করিয়া দেয়, দিনের আলোর মধ্যে আনিতে দেয় না, সে প্রত্যক্ষের বিষয়ে এ ধরনের অবিশ্বাস কোনও রূপেই সম্মত নয়—কেননা তদানীন্তন সর্ব সংস্কারকে মিথ্যাই প্রমাণ করে। একজন চৌকাকে ঠিকভাবে চৌকাই দেখিয়াছে, আর যেটুকু তাহারা দেখে নাই, তাহারা দেখেই নাই। আর সময় সে কতখানি পাইয়াছে তাহারও ভাবিবার এবং কাজের উপর হইতেই তাহার ইত্যাকার অভিজ্ঞতার কথা আজ গুহায় লিখিত অবস্থায় আছে। গুহাবাসীদের চিত্র দেখিয়া মনে হয় অনুকরণই মাত্র।

দৃষ্টি-সম্ভব তথা দৃষ্টিকোণ-সম্ভব চিত্রকলার একটি বিশেষ ঐশ্বর্য। তাহা ছাড়া স্থানের সঙ্গে আলোকের অজস্র মহিমা বৈচিত্র্য ও তাহার আকার বিশেষে রূপান্তর। কেমনভাবে সমস্ত নিখিল বিশ্বে আলোক বিচ্ছুরিত অবস্থায় আছে, লাবণ্য তাহার নাম, সমস্ত কিছু বাস্তবতা এপারে অন্ধকারে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা হয়তো সেখানে যাইতে পারিতেছি না। বিষয় কি অদ্ভুতভাবে ওখানে সুস্পষ্ট হইয়া আছে, নিরেট হইয়া আছে — মেঘাবৃত আকাশে ওড়া পায়রার ঢেউয়ের মতোই চিত্তহারী! তাহার আপনকার রূপ পরিচিতি একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন। আমরা আলোতে দাঁড়াইয়া আলোর লীলা দেখিতেছি, কেমন দেখি, কতখানি দেখি সেটাই চিত্রের আদর্শ।

অদ্য ফরাসি দেশে যেসব চিত্র আঁকা হয় তাহা সত্যই বিস্ময়কর, কেননা তা একটি সঠিক অস্তিত্ব আজকাল স্বীকার করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছে। জনসাধারণ সহজেই সেই চিত্রগুলির মাধুর্য বুঝে যে চিত্র একটি দৃষ্টির, পুরাপুরি দৃষ্টির মাত্র একটি দিক-বিশিষ্ট। তাই তাহার আলো অন্ধকার, সব কিছুই একটি বিশেষ আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। একটি সম্পূর্ণ বাস্তবতার একটি বিশেষ বাস্তবতা। ঠিক এ জিনিস — এই দৃষ্টিধারা ধারাবাহিকভাবে বঙ্গে ঐতিহ্য। আজ যে যে ভাঙা-চোরার কথা দেশে দেশে গুণগ্রাহীদের মুখে শোনা যায়, তাহার আদর্শ হওয়া উচিত দৃষ্টিকোণ, যথাযথভাবে তাহার বাস্তবতা। সে বাস্তবতা যেন কোনওরূপেই বিকৃত না হয়, আমরা যেন তাহাকে প্রমাণ করিয়া দেখিতে পারি যে, তাহার সত্য অক্ষুণ্ণভাবেই আছে।

এ দৃষ্টিকোণকে রূপায়িত করিতে রং-কে তাহাকে ভাবিতে হইয়াছে। রং একটি বিশেষ বস্তু; বিষয়ের আছে, দৃষ্টিকোণের সম্বন্ধে তাহার রূপ আছে, তাহা ছাড়া রং আলোর একটি অঙ্গ। রং জিনিসটার আবিষ্কার তাহাকে, সমস্ত কিছুকে তাই আর একটি সত্তায় নিয়া দাঁড় করাইল। এককালে যখন রং আসিল, তখন মানুষ আর দৃষ্টি নিয়া এতটা মাতামাতি করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না, কেননা রংয়ের একটি জাদু আছে, আর সেই যাদুতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। এবং তখন, অর্থাৎ পূর্বের রং জিনিসটা রংয়ের ব্যবহারই বর্ধিত করিয়াছিল, রংয়ের ব্যবসাই বড় হইল, এবং ছবিকে কোনও বিশেষ রূপ দিতে পারে নাই। মানুষের সাধ মিটিল, বহু বহু জিনিসের উপর রং দেখা গেল। হইলেও সেই আলোকের রূপ বিভিন্ন, হাতের পাশে তাই একথা যে রংই নিজেই আলোক, তা নিয়া অনেকে মাথা ঘামাইবার চেষ্টা করিল না।

রং-কে যখন রং বলিয়াই বোধ হইল, রংকে যখন আলোর অঙ্গ বলিয়া বোধ হইল, বস্তুর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইল, তখন চিত্রকরেরা তৃতীয় নয়ন পাইল; রং বস্তুর না আলোর, কার স্বরূপ? রং সত্যই

কী, না রং শুধু রং, আলো নয়, বস্তু নয়। রং আপনার 'স্বভাব' বশতঃই চিত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাহার আপনকার সত্তা আছে, সেই তাহার অধিকার। এক ছোপ রং-কে আমরা বস্তু বলি না। কখনও এমন ঘটে না যে আমরা তাহাকে আলো বলি, আমরা তাহাকে রংই বলি। হইলে এই কথা ঠিক, তাহার সঙ্গে আলো এবং যে কোনও আকারের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রংয়ের আপনকার সত্তা পরিত্যাগ করিলেও একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয় — রং কাহার, বস্তুর না আলোকের, কাহাকে রূপদান করা হইবে, এই বিষয়ে সকলের মধ্যে একটি ইতস্ততা লক্ষ করা যায়। একাধারে সে রং বস্তুকে উল্লেখিত করে, ঠিক সেই সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্যধারে আলোকেও উল্লেখ করে। এ দুইয়ের মধ্যপথে তাহার নিজস্ব বিশেষত্ব সম্যক বর্তমান। সে কথা আমরা অনেকটা বুঝি।

এবং এই একটি নিজস্ব বিশেষত্ব যা তাহার আছে, তাহার রূপ আমাদের চিত্রে দেখি — রংয়ের ঘনত্ব, বস্তুসাদৃশ্য এবং ইহা আলোকেই অস্তিত্ব পায়। তাই ঋষির মতোই বলিতে হইবে রং হইতেছে আলোই, আর অন্য কিছু নয়। এই বর্ণবিন্যাস বাংলার পটে অদ্ভুতভাবে আপনার স্বকীয়তা রাখিয়াছে। দেখা যাইবে এখানকার বর্ণ বস্তুকে রূপ দিতে গিয়া আপনার সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। রং বরাবর যথাযথভাবে আঙ্গিকতাকে সাহায্য করিয়াছে। অন্যদিকে নিজের আঙ্গিকতাকেও সোজা আর সহজভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কেননা শিল্পীরা রংয়ের মোহে পড়িয়া কোনওক্রমেই একথা ভুলিয়া যান নাই যে, রং আলোকের অংশ, অন্য কোন তাৎপর্য তাহার নাই, অন্য অস্তিত্বের কথা ভাবা বৃথা সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই না এবং সেই কারণে ছবির মধ্যে বেশ ভালভাবে দেখা যাইবে যে রংয়ের ব্যবহার সব সময় আলোর অস্তিত্বই প্রচার করিয়াছে, এবং তাহা খুব সূক্ষ্মভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

অনেক অনেক ছবির উপর রংয়ের আরোপ এক ভাবের। সেখানে বিষয়ের উপর হইতে রং-কে তুলিয়া বিচার করা যায়। সেখানে দেখি শুধু কতটা আলোর অস্তিত্ব বর্তমান; সঠিকভাবে বলিতে গেলে রং আপনার সত্তা এখানে হারাইয়াছে, নেহাত আলোর খাতিরেই আছে, তবে আলোর অঙ্গ হিসাবে খুব নয়। ঠিক তেমনিভাবে রংকে ব্যবহার করা, রংকে শুধু সেই রূপেই দেখা কাজের কাজ, আলোর লাবণ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে দেখাই কর্তব্য। এখানে অনেকটা সাহিত্যের কথার মতো রং থাকে। যেমন কথার পর কথা থাকে তেমনভাবে রংও রূপ হইয়াছে, দুয়ের কোনও মিলিত ইঙ্গিত দেখা যায় না। নীল জল, নীল কথাটা আগে, জল কথাটা পরে, নীল জল কথা একই গলায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না নীলাম্বুর বেলাতেও সেই। দুটি বিভিন্ন গলায় দুটি বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে যদি তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে শুধু একটি অপরিষ্কার ঘোলা শব্দই শোনা যাইবে, আমরা কেউ কিছুই বুঝিতে পারিব না। ঠিক এমনিভাবে অনেক চিত্রের রূপ দেখা যায়, রং আর বস্তু ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছে। অবশ্য অনেক সুচতুর চিত্রকর আমাদের সব ক্ষেত্রে একটি দূরত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন সেকথা বার বার আমাদের স্মরণ করাইয়া দেন। হয়তো একটি বিশেষ দূরত্ব হইতে তাহাকে দেখার দরকার, একথাও স্মরণ না করিয়া পারা যায় না। ইহাতে একটি দূরত্বই শুধু আমাদের কাছে খাড়া করা থাকে; এবং উহাই হইতেছে তাহাদের মূল। সেখানে দাঁড়াইয়া যে কোনও স্বাধীনতা তাঁহারা নিতে পারেন। এ দূরত্ব নিয়া আলোচনা পরে দেখা যাইবে। আপাতত ছবি সম্বন্ধে হয়তো অসাবধানতাবশত অনেক গর্হিত কথাই বলা হইল। সুধীজনেরা যেন মনে না এ ধারণা পোষণ করেন যে আমরা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিতেছি বা উপহাস করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস এক এক সত্য এক একজনের। তাহা ছাড়া এইটুকু বলিলেই ঠিক হইবে যে সে অধিকার আমাদের নাই।

রংয়ের আপনকার মাধুর্য আছে এমতো বিশ্বাস সকলের আছে, এ সকলেই বিশ্বাস করি। আমাদের দেশে ঠিক রংয়ের জন্যই রং-কে ভালোবাসে, আমাদের দেশ সূর্য-প্রচুর দেশ, আমরা রংয়ের মাধুর্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিশেষ পরিচিত। আমাদের দেশ ফুল বর্ণের দেশ, আমরা বর্ণবৈভবের সঙ্গে বিশেষ

পরিচিত। রংয়ের একমাত্র অন্ধকারে কোনও অস্তিত্ব থাকে না। রংটা অনুমান কোনও ক্ষেত্রেই নয়, সব সময় প্রত্যক্ষ। আমাদের দেশে আকাশের শেষে অনেকটা আকাশ সবুজ — ইহা শিল্পী দেখিয়াছে, চাঁদও গাঢ় সবুজ, ঠিক নীল নয়। রং-কে তাই আপনার সত্তায় ভালোবাসার সুযোগ বহু দিক হইতে বহুভাবে পাইয়াছি এবং সে সুযোগের ফল দেখা যায় আমাদের ছবির মধ্যে। রংকে তাহারা চিত্রের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ দিয়াছে (সে অংশ দুয়ের সঙ্গে জড়িত, দূরত্বের ফল নয়, দৃষ্টিকোণের হেতু) তখনই যখন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্গ গড়িয়া উঠে। অঙ্গ এইখানে রংয়ের আধার হিসাবে আছে।

কতখানি রং সূর্যালোকের অঙ্গ জুড়িয়া থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাহা অনুভব হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নাই। এ কথা সত্য যে রংয়ের নিজস্ব একটি স্থান আছে, সে কথা দর্শকমাত্রেই অনুভব করেন। সেই স্থান-চেতনা অব্যাহতভাবে আমরা কালে কালে দেখিতে পাইব এই আশা করি। তবু এখানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না যে, তাহার অস্তিত্ব আমাদের দেশের শিল্পীরা স্বীকার করিয়াছেন, এবং একটি বিশেষ রূপে তাহাকে আরোপ করিয়াছেন। সে আমরা বাংলার যে কোনও 'সরা' দেখিলে টের পাই। রং এখানে সম্যকভাবে আলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আলোর নিজস্ব লীলাও আমাদের চোখে পড়ে। সেটা খুব বেশিভাবে বিষয়গত বা বস্তুগত নয়, যতটা বেশি দৃষ্টিগত। চোখের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে আলোর এ সম্বন্ধ পুরাতন, বড় সনাতন, যখন প্রত্যহ মানুষ আলোর জন্য উবু হইয়া বসিয়া থাকিত — তাহাকে নিছক তাহার গুণে ভালোবাসা হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। যেহেতু শিল্পীর মধ্যে আছে, বহু শতাব্দীর ওপারে, ইতোমধ্যের বহু অন্ধকার পারে একটি ছোট ভূমিকা, যাহাকে যে কোন খাতিরেও ভুলা যায় না, তাহার মেরুদণ্ড এখন সটান সোজা—সেই সম্যক আনন্দ, সেই উষ্ণতা আজ বেশ ভালোভাবেই আছে। সেই বাস্তবতার হদিশ কেমনভাবে আছে, খুঁজিয়া সেই দিনকার সম্বন্ধ তুলিয়া আনিতে কী অদ্ভুত তাহার চেষ্টা ধ্যান ও ধারণা, স্রোতে স্রোতে মুখর! তবু আমরা কতটুকু তাহার পাই, সে বাস্তবতা কোথায় কোথায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, কোথায় সে এ যাবৎ সজীব, শুধু সেইটুকুর উষ্ণতার স্মৃতিকে ঘিরিয়া, কেমনে তাহাকে চিনিয়া নেওয়া সম্ভব, সাদা আর সাদার পর কালো এইটুকুতেই কি সেই উষ্ণতাকে মূর্ত করা সম্ভবপর? সে হয়তো কিছু কিছু আমাদের ধরা দেয়, হইলেই অদ্যকার আমাদের জীবন তাহার কোনওক্রমেই পটভূমিকা নয়। দৃষ্টি আমাদের নাই, যাহার উপর অনায়াসে সে উষ্ণতা রেখাপাত করিতে পারে, যেখান হইতে আমরা মানিয়া নিতে পারিব। মূলত সে লীলা আর একভাবে আছে। রূপ এই স্তূপীকৃত অন্ধকারকে জড়াইয়া সৃষ্টি হইয়াছে, সেই উষ্ণতাকে তেমন বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে কি, অথবা না? এই ছোট 'না' টি বলিতে সত্যই দ্বিধা হয়। তখনকার অস্তিত্বের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নিতান্ত বিষয়গত। পুরাতন সেই অভিজ্ঞতা আজিকার মানসলোকে নেহাৎ যে কোনও বস্তুর মতো, এমন কী যে কোনও একটি বস্তু যাহার ইন্দ্রিয়গত রূপ কোন মূল্য পায় না, কেননা সেটা শুধু বস্তু, সেটা ঠিক কয়েকটি রেখার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, যাহার কোনও রূপকে মানিবার কোনও প্রয়োজন বোধ হয় না। সম্মুখের ছোট বুদ্ধ মূর্ত্তির সামনে আমরা, এইটুকু ফাঁকের মধ্যে বিগত আড়াই হাজার বছর, তিন হাজার বছর সময় (?) আমাদের চাপে পড়িয়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, আমাদের কেমন লাগে! ইহা কি তেমনি স্থান চেতনা দেয়?

কিন্তু শিল্পীর শ্রেষ্ঠ! বাস্তবতা তাহাদের চোখে ফেরে। তাহার কাছে সেই অন্ধকার পারের সমস্ত সম্বন্ধ এখনও আছে। এখনকার শীতলতা, শৈথিল্য কোনও বিকার আনে নাই। সেই নিপট সম্বন্ধটা আপনার মার্গেই সযত্নে রাখা আছে, যে কোনও আলোতে তাহা বস্তু নয়, বিষয় বাস্তব নয়। সেই সত্যকে নিয়া জুয়াখেলা করিবার মতো বৃত্তি তাহাদের নাই, সেই সম্পূর্ণ সম্বন্ধটা কোনওদিন সময়ের কোনও জাদু তাহাকে বশ করিয়া সরাইয়া নিতে পারে না। ধীরতা তাহাকে সমতা দেয়, ব্যগ্রতা থাকে। সেই

বাস্তবতার সঙ্গে এতই নিকট সম্বন্ধ যে প্রাণ মাঝে মাঝে একাকার হইয়া যায়; সাযুজ্য লাভ করে এবং যাহার উপলব্ধি একটি নবতম বাস্তবতার সৃষ্টি করে ও নূতন অস্তিত্ব আনে, যাহা বিষয়গত নয়, ব্যক্তিগত নয়! অথচ তাহা অতি পুরাতন সত্য হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন নয়, কেননা সময়কে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া নেয় নাই, কেন না আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিবার চেষ্টা যথাযথভাবে করিয়াছে এবং প্রখর দিবালোকে রংয়ের মাধুরী যাহা ছিল অদ্যও তাহাই আছে।

রং একদা দেওয়া হইত বিকৃতভাবে। সাধারণ সন্তোষের জন্যই, রংয়ের একটি সহজ ছন্দকে সকলেই মানিত, সেখানে দেখা যায় আলোকে তদানীন্তন চিত্রকরেরা গণ্য করিত, শুধু ঘষা ঘষা আলো করিয়া—স্থান বা তাহার সম্বন্ধ ভালোভাবে মানিত না, মানিত না লাবণ্যময় স্থানকে দৃশ্য। সব ক্ষেত্রে এই দিক হইতে বলা যাইতে পারে রংকে বেশি হালকা করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। তখন রংয়ের নিজস্ব অস্তিত্ব আমরা সাধারণেরা স্বীকার করিতাম নেহাত আটপৌরেভাবে, মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে, সাধারণ কথায় আমরা যেমন ব্যবহার করি, 'রেগে লাল', 'ভয়ে চূর্ণ' ইত্যাকার কথাবার্তায় একের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়, সাহিত্যে গণ্ডির মধ্যে, এই কথা সকল মনেতে গণনার কথা নিছক, এই কথার সঙ্গে দৃষ্টির কতটুকু সম্পর্ক, সে কথা বলা বাহুল্য। এইসব কথা নিছক প্রকাশাত্মিক। অবশ্য আমরা সহজেই অনুভব করি মনের একটি বিশেষ ভাব ঘটিয়াছে, এবং তাহা দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাহিরেই। সেইরূপ রং এইখানে অনেকটা মনের বাহন হিসাবে ব্যবহার হইয়াছে, সাহিত্য হইয়াছে, সত্যই ইহার সঙ্গে স্থান বা আলোক মহিমার কোন সম্পর্ক নাই।

উহা তখনকার একটা ঢং ছিল, এবং সেই বিবেচনার উপর এই ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। তখনকার সময়ে কোনও কিছুর নিখুঁত হিসাব ছিল না, তাহার সঙ্গে অন্যান্য, বাস্তবতার কোনও যোগাযোগ কেউ একবার ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। অথচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আলোর সাক্ষ্য হিসাবে রং রহিয়াছে। এখানে সে রং কতটা কাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন — রং কতখানি আলোর হেতু আর কতখানি তাহা বস্তুর হেতু। খুব সাধারণ কতগুলি রংকে একেবারে আলোর হেতুরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশ্য এদিক হইতে উহাই আলোর এক প্রকার রূপ। কিন্তু এমনও কতকগুলি বস্তু আছে, যাহাকে রূপ দেওয়া মুশকিল, সেগুলির বেলায় কী করা যাইবে তাহা স্থির করা দরকার। অঙ্গ সম্বন্ধে যত বেশি আলোচনা হইয়াছে, তত বেশি রং সম্বন্ধে কথা হয় না। রং-কে সাধারণত অনেকে চট করিয়া l'effet বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। এবং ঠিক উহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা রংটা নানাভাবে দেখিয়াছেন, এবং যাচাই করেন। কিন্তু রংয়ের সঙ্গে বস্তুর যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা! তাহার দিকে তাকানোর মধ্যে কোথাও কোথাও একটা গলদ রহিয়া যাইতেছে।

এটুকু সত্য সকলেই স্বীকার করেন যে অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু কতখানি তাহার সঠিক নির্দেশ নাই। তবে সাধারণ ১ আর একটা রং করা ১-এর যথেষ্ট পার্থক্য বুঝিতে পারি। একটি আলোক-লীলাকে পথ প্রদর্শন করে এবং একটি তাহা করে না। কিন্তু রংয়ে তাহার বাস্তবতা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়না। এতে ঘটে যা তাহাকে ঠিকভাবে বলিতে গেলে, আগে আমরা গুণীদের অনুমতি চাহিব। আমাদের মত সাধারণের মনে হয়, নিশ্চয়ই তাহা একটি স্থানকে লক্ষণযুক্ত করে। এ স্থান রংয়ের স্থান, এবং তাহার যে স্থান জুড়িয়া বিষয় থাকে, এবং হইলেও রংয়ের আধার হয়। রং হইতেছে একটি নবতম স্থান, একাধারে যেমন বাস্তব তেমনি দৃঢ়মতি সত্য। এ সত্য নিছক মায়া নয় ইহা মায়ার সৃষ্টি করে না। অন্যান্য বহু বহু প্রত্যক্ষ কিছু সব সময় কোন না কোনও সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্ব লইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু রং স্বয়ংসম্পূর্ণ, রং নিজেই দাঁড়াইতে পারে।

আলোর আকাশের নীলিমা, রাতের আকাশের শ্যামরূপ তেমনিই আছে, তাহার তারতম্য কতটুকু ঘটে! আপাতদৃষ্টিতে যদি বা ঘটে তাহা হইলে মনেই তাহা ঘটে, সেখানে দেওয়া-নেওয়ার দর কষাকষি

ভাব জড়ানো যায় না, সমস্ত সম্বন্ধে সব কিছু বদলায় হয়তো, বদলায় না মানুষের মন। এমনই রং হইতেছে সমস্ত সম্বন্ধের বাহিরে। সে নিজেও তাই সম্বন্ধের যোগে পরিবর্তন লীলা দেখার একমাত্র অধিকারী। সবেতে থাকিয়া কিছুতে সে নাই। চির সত্য স্থানের মত সত্য ব্যাপ্ত চরাচর। কে বলিতে পারে এ রং সূর্যের না স্থানের মধ্যের কোন অজানা লীলা! কে বলিতে পারে?

আমাদের এখনও বহু জড়তা আছে বলিয়াই তাহাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারি নাই। হয় সেটা একটা সরল রেখার মতো হইয়া যায়, নয় সেটা অনড় থাকে, ঠিক তাহার চাঞ্চল্য তাহার অনঙ্গ মাধুর্য কাহারও চোখে ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে রং-কে একটা বাছাই করা দূরত্বকে স্থির করিয়া নিতে হইয়াছে, এবং রংকে একটা চমৎকার রূপদান করার চেষ্টা হইয়াছে, যেটা বস্তুর কাজ — রংয়ের দায়িত্ব খুব পরিষ্কারভাবে আসে না।

কীভাবে রং-কে আনিতে হইবে সে ফতোয়া দিবার অধিকার আমাদের নয়। আমরা দেখিব কেমনভাবে আসিয়াছে, রং আসিয়াছে, যেটা বস্তু আর আলোর মধ্যপথে একটি বিশেষ হিসাবে রাখা হইয়াছে। এবং আলো আর বস্তু অস্তিত্বের একটা সুচিন্তিত অবস্থা দেখিতে পাই, এবং সমস্তটাই রংয়ের স্থানের উপর খাড়া হইয়া আছে। সে লীলা লক্ষণ অতি অল্প জায়গায়, অন্য জায়গায় দেখি। শুধু আলোতে রং আর রংয়ের গভীরতাই চোখে পড়ে। আমাদের বেলায় সবটাই যেমন প্রত্যেক্ষের বাস্তবতা হইতে ঘটিয়াছে, অন্য ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কিনা সন্দেহের।

আমরা একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কে নির্ভর করিয়া সব সময় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, পাঠক খেয়াল রাখিবেন। ফলে আমাদের কথাবার্তা অনেক সময় আপনার মনে দ্বিধা আনে, ভ্রান্তির সৃষ্টি করে, যেহেতু একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করিয়া কোনও কিছু জানিতে আমরা অভ্যস্ত নই। যাক সে, এবং সেই রংয়ের লীলাই হইল চিত্রের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বস্তুর আঙ্গিকতা এমন বেশিভাবে তেল রং চিত্রে ধাক্কা দেয় যে, রংয়ের লীলা কোথায় যেন হারাইয়া যায়। অনেক দিন পর, ফরাসি দেশে যে আন্দোলন দেখা গিয়াছিল তা কয়েকজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বলিয়াই প্রথম ধরা হইয়াছিল। রাস্তা চলতি লেখা নোট বইতে প্রমাণ আছে। তাহার সত্য একটি বিশেষ তোলপাড় আনিল, এবং সকলের চোখ রংয়ের দিকে ফিরিল। যাক, সেই আন্দোলনের একটি বিজয়ী কথার সঙ্গে জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত। সেটা হইতেছে রংয়ের স্পন্দন। এটা শুধু পাশাপাশি, তাড়াতাড়ি থাকার গুণবশতই ঘটে। কিন্তু এইখানেই এই, ধারার পরিণতি হয় নাই, কেননা তাহা হইতে যাহা সম্ভব হইয়াছে সেটা রংয়ের নয়, সেটা অন্য কিছুর।

কিন্তু রংয়ের স্পন্দন একদিক হইতে সর্বৈব সত্য, অন্য দিক হইতে তেমনই আংশিক সত্য। কেননা বস্তুর বাস্তবতা যেখানে দূরে পড়িয়া থাকে শুধু কতগুলি ছন্দময় রং সৃষ্টি করিয়া একটি মায়ার সৃষ্টিই হয়, বাস্তব সমস্ত কিছু আসিলেই ছবির লক্ষণযুক্ত হইবে। তাই ঠিক রূপটা ওখানে আসে নাই, সূর্যালোকের ব্যাপার লাবণ্য-বিশেষত্ব হিসাবেই আছে, আলো ঠিক এখানে-ওখানে-সেখানে পড়িয়াছে, ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে দেখানো হইয়াছে। আলোর সে গভীরতা ঠিক ছবির সীমা ধরিয়া আসে নাই। আমরা তো তাহাকে একটা ছল-আলোক ফেলিয়া ঠিক হইয়াছে বলি, সেটাও দেখা যাইবে একটি স্মৃতি-আলোক ফেলিয়া বেশ দক্ষতার সঙ্গে আঁকা। কোথাও আলো আর রংয়ের লীলাটা তেমনভাবে স্থান সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

যখনই ওরা বদলায় তখনই যন্ত্রকে এড়াইবার জন্য বদলায়, ঠিক ভিতরকার সাড়া সে পায় না। প্রচ্ছন্ন বাহির তাহাকে বদলাইতেছে। যেমন সবটুকু বদল আমাদের দেশে হইয়াছে অন্তরতম প্রদেশ হইতে, আমাদের দেশের সব কিছুই, তাহার শিল্প, তাহার সভ্যতা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিযা ঘুরিয়াছে। তাই আলো তথা রংয়ের লীলাটা ভালোভাবেই আছে। রংকে কখনও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার তাই হয়

নাই, আমাদের দেশের অতীব নগ্ন পটে যে ছায়াটা আছে, যে লক্ষণ আছে, অন্য কোথাও তাহার জুড়ি মেলে না। রং আছে রংয়ের নিছক গুণে, বিষয়গতভাবে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ফলে আলো ঠিক একইভাবে আছে এবং আপনার স্বকীয়তা না হারাইয়া সর্বক্ষেত্রে রূপকে ব্যক্ত করিয়াছে। তাই দেখি একই পটে আলো অভিব্যক্ত রং অভিব্যক্ত বস্তুর অভিব্যক্তি। যেমনভাবে পদ্মের রং থাকে এবং আলোকসম্পাতে ক্রমে দৃশ্যমান হয়, তাহার মিলন ঘটে, দেখা যাইবে ক্রমে রং হইয়া যায়, রং ক্রমে বস্তু, পদ্মের আকারে রূপান্তর হইয়াছে। সমস্ত ক্রিয়াটা একটা ক্রিয়ার আনোগোনা নয়, ইহাই ছবি। ইহাই আমাদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ যোগে দেখিতে পাই পটের ছোটখাটো ছবির মধ্যে। আলো গভীর হইয়া রং ক্রমে বাস্তবতা।

অবয়বকে নিয়া-ই রংয়ের খেলা, তাহার সবটুকু আলো আর অনেকখানি রং। মধ্যবর্তী আধারের পারে, কত স্পন্দন কত নড়াচড়া, পড়িয়া থাকে কতখানি যে চোখের সামগ্রী তাহা চোখই বিচার করিয়া দেখে। এখানে পাথরের সমস্ত কিছু সোজা, অন্যান্য আর আর সমস্ত কিছুকে না মানিয়া তাহার স্পর্শ এড়াইয়া একা আসিতে একের অনুভব ক্ষমতা মনে হয় শব্দতরঙ্গের মতো ব্যোমপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটি অস্তিত্বের নিকট হইতে অন্য একটি অস্তিত্বে, একটি স্পন্দন হইতে আর একটি ভিন্ন কোন মূক জড়তায়। এ সমস্ত কিছুর রহস্য কোথায় যে সম্যক সাধনায় ছোট একটি প্রস্ফুটিত ফুলের বাস্তবতা পায় — আলো পড়ে সকালের, অধিকন্তু তাহাকে আঁকাবাঁকা রেখায় কখন যে সচেতন অবস্থা অনায়াসে রূপান্তরিত করিয়া নেয় এবং আমাদের হাতে দেয়, সেকথা বিস্ময়ের নিশ্চয়। সেকথার তাৎপর্য আমরা সকলেই বুঝি সরলভাবেই, ইহা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

সামনের সমস্ত কিছু যখন আমরা দেখিতে থাকি তখন খানিক তাহা অনুভব করি, সেকথা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সহজসাধ্য নয়। সমস্ত সম্বন্ধই এত ব্যক্তিগত যে ঠিকভাবে আমাদের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় না, ক্রমে ক্রমে তাহার দূরত্ব আর দৃষ্টি মিলিয়া সে যাহা ছিল, তাহা আর নয়, কেননা দৃষ্টিই যখন, একটি বিশেষ দূরত্বে সমস্ত পরিণতির কারণ নয়, এই দুইয়ের মিলন একটি পটভূমিকার উপর ঘটে, তাহাকে এক বিশেষ রূপদান করে, সে রূপ নিছক না হইলেও তাহার মধ্যে, একথা সত্য, সে দৃষ্টির অনেকখানি আছে। দৃষ্টি সেখানে কতকগুলি রেখার সমষ্টি ও আপনাকে নিবদ্ধ রাখে, যে বস্তুর অন্যপ্রান্তে আর একটি সচেতন অবস্থা আছে, সে সচেতন অবস্থা সমস্ত ক্ষেত্রেই সজাগ। এখন এই প্রসঙ্গে একথা ওঠে যে আকার ব্যাপারটা কতখানি কাহার। দৃষ্টির নিজস্ব বাস্তবতার সঙ্গে তাহার তবে সম্বন্ধ কতটুকু, আর এ সম্বন্ধ যদি নিশ্চয়, তাহা হইলে তাহা কেমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এই কথার সঠিক উত্তর আমরা দিতে চেষ্টা করিব। তুলির মুখের যে রূপান্তর ক্ষমতা পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা রেখার পর রেখা হইয়াই দেখা দেয়, ক্রমাগত সে সরলরেখা, ক্রমাগত সে বাঁকা। সব সময় দুটি অবস্থাকে নিয়া একটিতে পরিণত করিয়া চলিয়াছে, আর এই পরিণতি যখন আলোর বিস্তৃতির উপর দাঁড়ায়, তখন আর এক চেতন অবস্থার সৃষ্টি করে, এবং এই সুযোগে সে ব্যাপারটি পথ করে। আশ্চর্যের এই যে তাহার কোনও নিছক চোখের একেবারে নয়। অপ্রত্যক্ষভাবে তাহা স্থানের বাস্তবতা যদিচ লাভ করে, তবু একথা বলিতেই হইবে যে প্রত্যক্ষাবে তাহা, আমাদের ধারণায় কিছু নয়, আর সে আধারের সব কিছুর সঙ্গে স্পর্শের যোগসূত্র সর্বাপেক্ষা বেশি।

আমাদের ধারণা সম্বন্ধে নিশ্চয় পাঠকের একটি ধারণা লাভ হইয়াছে। ঠিক সেই ধারণার দিক হইতে আমরা প্রশ্ন করিতে পারি যে সত্যই দিক ('ডাইমেনশন') জিনিসটা কতটা চোখের, তাহা সত্যই কি চোখের? কেননা সেখানেও আর একটি সচেতন অবস্থার কথা আমরা টের পাই। সেকথাটা অনেকটা বিষয়গত, কিন্তু তাহার সম্যক চোখের দিক হইতে সর্বৈবভাবে সার্থকতা কোথায়, তাহা আমাদের ঠিক ঠাহর হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সমস্তটার যোগ সোজাসুজি আছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু তাহা নহে। দিক কথাটা সমস্ত দিক হইতে স্পর্শের। আর এই ইন্দ্রিয়ই তাহার যোগসূত্র স্থাপন করে। দিক কথাটার প্রাণবস্তু হইতেছে স্পর্শ, চক্ষুহীন যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

এ কথাটা আমরা জানিয়াও স্থির থাকি, সদর্পে ঘোষণা করি যে তাহার অস্তিত্ব বর্তমান। অনেক সময় একই সঙ্গে পুরা দুইটি দিক আমরা কখনোই দেখিতে পারি না। একই সঙ্গে সেই দুইটি দিক আমরা অনুভব করিতে পারি। এটা স্মৃতির ব্যাপার, ফলে দিকগুলি আমাদের কাছে যথাযথভাবে থাকে এবং পরে আমরা তাহা রূপান্তর করি।

যে অবয়বগুলি দেখি তাহার, তাহার দিক ছবির সীমা আর বাস্তবতার দিক হইতে কতদূর সত্য তাহা আমরা নির্ধারিত করিতে পারি নাই। সাধারণ পটের আপনকার একটা রহস্য আছে, এবং সেই বাস্তবতাকে ভাঙিতে গিয়া সৃষ্টি করা হয় একটা মায়ার — যাহার মধ্যে চোখের কল্পনা কতটুকু আছে, ক্ষমতা কীভাবে তাহার সম্পূর্ণতা লাভ করে, কীভাবে আর আর মনকে তথা চেতনাকে, এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত কিছু মনকে টানে, বিবেচনা করে, এবং কেমন করিয়া সে আপনকার চেতনাকে এমন একটি অবস্থায় নিয়া যায়, এবং অনায়াসে সেখান হইতে বিষয়গত বাস্তবতার কোনও যোগফল কোনও একটি বিশেষ রূপকে প্রাণদান করিয়া নিজে সিদ্ধ হয়, ফলে যে রূপটা আমরা দেখিতে পাই, তাহা মায়াপ্রসূত। তাহাকে যাঁহারা শিল্প ভালোবাসেন তাঁহারা বলেন, মায়াকে মানিতে আমরা নারাজ! 'নিয়মরহিত' যাহাকে বলি সত্য, তাহার সীমার বাহিরে কী তাহা গেল! তাঁহাদের এককথায় অন্যেরা হয়তো যুক্তি দিবে, কিন্তু প্রশ্ন করিতে পারা যাইবে। উত্তর হিসাবে, জীবমাত্রেই সচেতন, জীবমাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে, অতএব সকলেই তাহা হইলে এক। কিন্তু তাহাকে মায়া বলিয়াই মায়া হইয়া যাইবে না। সত্য কিনা আর একটু বিচার-সাপেক্ষ। এখানে সেই সূত্রে আমরা দেখিতে পাইব তাহার সব ব্যবস্থাই আলোর সম্মুখে ধরা রহিয়াছে, ছোট ছোট প্রমাণও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, প্রত্যহের অভিব্যঞ্জনা যাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে, যাহার মধ্যে আছে অগ্নির সংস্কার আর ছোট উষ্ণতার একটি দীর্ঘ ইতিহাস, আমরা কতখানি তাহা বুকে রাখি? আলোতে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়, সেটা কী নূতন অভিজ্ঞতা না অন্য, তাহা আমাদের তাহা নয়, সত্যই এটি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। কোথায় সচেতন অবস্থা আর এক অবস্থায় পর্যবসিত হইতেছে, কোথায় সে ঠিক আপনার বাস্তবতার পরিমাণ রাখার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বারে বারে, একটি রেখার সম্বন্ধ চাহিতেছে, কোথাও সে আপনার সবটুকু ছাড়িয়া একটুখানি ধনিয়া রাত জাগিতেছে তাহা ভাবিলে অহংকারের চাইতে আশ্চর্য হইতে হয় বেশি।

রেখা জিনিসটা ক্রমাগত ঘোরাফেরা পরিবর্তন, ক্রমাগত মেলামেশা, নানান রূপে রূপান্তর হইয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে ক্রমাগত কাটাছাঁটা ছোট বড় যাহা কিছু সব ঘটিতেছে, সেটাই দিক ('ডাইমেনশন'), তাহার ফেরটা চিত্রকরেরা বলিতে পারেন। এবং সেই মায়ার অনুপাতে যাহা কিছু রং যাহা কিছু আলোকপাত, সব কিছু আমাদের বিশ্বাসের দিক হইতে ভ্রমাত্মক। এখানে একথা জানা দরকার, দৃষ্টিকোণের সঙ্গে ইহার পার্থক্য বহু, তাহার ফলে যাহা দিক আসে তাহার নাম বিশেষভাবে দিক বলা যাইবে না। সেটা দৃষ্টিকোণই, কেননা তাহা মনের নয়। প্রথম দিকটা হয়তো চোখের. অতঃপর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্তটা মন হইতে গড়িয়া ওঠে, তাহার বাস্তবতা অতীব প্রকৃতিগত অল্পই।

সরার উপরকার লক্ষ্মীর রূপটি একটি আঙ্গিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম দর্শনে আমাদের মনে হইবে, তাহার মধ্যে আলোকের চৈতন্য নাই। কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাইব, যে কথা আমরা ভাবিতেছি সত্যই তাহা নহে। তাহার মধ্যে নিছক কোনও মায়া নাই, দৃষ্টির পিছনে ছোট জগতের সব সত্যের সঙ্গে ইহাকে মিলিয়া বিচার করিয়া লইয়া সঠিক একটি বাস্তবতা বলিয়া অভিহিত করা যায়, তখনই সেই হেতু ভালো লাগা, মনোগত করিয়া ভালো লাগার কোনও কিছু ইহার মধ্যে নাই। লক্ষ্মীর

রূপটি দৃষ্টির অভিজ্ঞতা, ইহার সবটুকু। এখানে দেখা যাইবে একটি প্রত্যক্ষই অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছে, আর একটি রংয়ের ব্যবস্থায়, একবার দেখি রেখায় আর রংয়ে, অন্যবার রং সহকারে রেখা। এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না, কেননা, যেহেতু অনুমান আর প্রত্যক্ষের যোগফলের ভিত্তির উপর সেখানকার শিল্পসাধনা চিরদিন হইয়াছে, এ কথার সত্যাসত্য সুধীগণের বিবেচ্য। দিক-কে ঠিকভাবে আনিতে গিয়া অনেক সময় ছবির লেভেলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল রংয়ের স্তর, আর আলো তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে ছায়া ফেলিয়াছিল, তাহার মন আর তেমন রহিল না, তাহার মন বাকজ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল, আর চোখে উপলব্ধিও ছিল, এবং পটের বাস্তবতাকে সে মানিত। সেই কারণে সবদিক হইতে তাহার আপনকার বাস্তবতা সহজ সত্যটুকু বুঝাইয়াছিল। অতএব ছবির একটা সীমা আছে। অনেক ফিরিঙ্গিরা বলেন, এতদ্দেশীয় শিল্পে-বঙ্গীয় শিল্পে দিক বলিয়া কোনও বস্তু নাই। কিন্তু জড়বাদীদের ধারণা একপ্রকার, আমাদের ধারণা অন্য। ইন্দ্রিয় জগতের বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা অন্যের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করতে প্রস্তুত নহি। তাহাদেরই আমাদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষার বস্তু এখনও আছে।

যেমন একজনের বাস্তবতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল যেসব রংয়ের স্তর প্রমাণ ছবি নহে, ঠিক তেমনই অনুমানহেতু যে রূপ তাহা চিত্র নহে, তেমনি বাঁকা করিয়া আঁকার সাধনা সাধনা নহে। তাহার বাস্তবতা অন্য, তাহা আগেই আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি। যাহাই হউক এক প্রত্যক্ষ আর এক বাস্তবতার উপর প্রতিফলিত হইয়া এক অদ্ভুত লীলা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই হইতেছে চিত্রের প্রাণবস্তু। ভালোভাবে বলিতে হইলে, দুইটি বিভিন্নতা স্পষ্টরূপেই আসিয়াছে। একটি হয়তো সাধারণ পরিপ্রেক্ষণ, আর অন্যটি তাহা নহে। সরা জিনিসটা গোল, একমাত্র গোলাকার জিনিস অনেকটা বেশি বাস্তবতা আনে, যে কোনও চতুষ্কোণ বস্তু অপেক্ষা একটি দৃষ্টিই অনায়াসে কাজ করিতে পারে। ধরুন সরার উপরে একটি লক্ষ্মীর মূর্তি আঁকা হইয়াছে, আঁকায় যাহা দাঁড়াইল, ঠিক তাহার পর উহাকে দেখা যায় আর একটি সম্পূর্ণ নিছক আলোর বাস্তবতায় এবং দৃষ্টিকোণের ফলে, এবং তাহা হইতে যে রূপ আমরা দেখিতে পাইলাম, যাহা রূপান্তরিত হইল, তাহাই হইল এখানকার ঐতিহ্যময় রূপদৃষ্টি। এমনিভাবেই রূপান্তরের পর রূপান্তর ঘটিয়াছে। এবং উহাই তাহার সত্য। এবং চিত্রের বাস্তবতাকে মানিয়া লইয়া এই ক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, রেখায় রেখায় গভীর হইয়াছে। সেই রেখার তারতম্যে ডৌলত্ব চমৎকৃতি লাভ করিয়াছে, এবং সমস্ত দৃষ্টি আমাদের বহুদিন ধরিয়া আনন্দ বর্ধন করিয়াছে। এখানে তাহারা অনায়াসে পারিত বৃষকাষ্ঠের মূর্তিটাকে কাগজে পরিবর্তিত করিতে। কিন্তু সেটা গর্হিত তাহা তাহারা জানিত, কারণ তাহার বাস্তবতা এক দৃষ্টিতে বস্তুর দিক বুঝায় না।

এই প্রসঙ্গে আমরা গুহাবাসীদের কাজ, যাহা আমরা বহু দেখি, হয়তো উত্থাপন করিলে এইখানে দোষের বলিয়া বোধ হইবে না। সেসব কাজের দিকে চাহিয়া কে বলিতে পারে তাহাদের দৃষ্টি নিছক ছিল কিংবা ছিল না? দর্শনেন্দ্রিয়কে তাহার নিজ স্বরূপে তাহারা দেখিত, সে যে কোনও কারণেই হউক। ফলে দেখিতে পাই বস্তুকে, তাহার দিককে, মানিত না। সম্মুখের মুখাপেক্ষা তাই তাহার নিকট পার্শ্বমুখ ঢের বেশি চিত্তাকর্ষক, এবং উহাই তাহার ধারণায় চিত্রের স্বকীয়তা রক্ষা করিবার সম্যক রূপ। অন্য উত্তর ঐতিহাসিকদের। অদ্য দেখিতে পাই, বহু নামজাদা শিল্পী সেই বাস্তবতাকে বিশেষভাবে মানেন এবং মনেপ্রাণে অনুসরণ করেন। কেমন করিয়া তাহাদের সেই সরলতা, আজ যাহা বলা হয়, তাহা আসিতেছে তাহা কেহ ভালোভাবে আমাদের বলেন নাই। বেশ দেখা যায় যে, বস্তুর অস্তিত্বকে, চিত্রের বিষয় হিসাবে মানিয়াছে, অনুমানকে তাহারা নিশ্চিত মানে নাই। সেকথা আজকের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, অত্যন্ত সাহায্যকারী।

দ্বিতীয়ত আর এক ধরনে সে স্বকীয়তাকে বেশি মানা হয়। উহা যে মানসিক পরিণতির নামান্তর তাহা নহে, পূর্ণতাকে একভাবে বস্তুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেই দৃশ্য তখনও বাস্তবতা তাহা নহে,

নিছকই দৃশ্য, আকারময় মন এবংবিধ সত্যের ব্যাপারে কতখানি সাড়া দেয়! ঠিক এই মনের সুযোগ লইয়া ওদিকে যে রূপান্তর আমরা দেখি, সে বিস্ময়কর। এ সুবিধা লইতে আপনাকে মধ্যে মধ্যে চিনিয়া লইতে হইবে, তাহার অধিকার আর সীমাকে ভালোভাবে বুঝিতে হইবে। এখানে যে চেতনা পরপর সব সাহায্য করিবে, পরে আবার সেই চেতনাকেই নেতি বলিয়া বিদায় দিতে হইবে। কেননা সেখানে তাহার পরীক্ষা যখনই শেষ হইবে, আবার রোদ দেখা দিবে, সে উষ্ণতা কতখানি আপনার, কতখানি পরিমাণে আপনকার সত্তাকে অটুট রাখিতে পারে, ইহার মীমাংসা আলোর জন্যই হইবে। এইখানে আর নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ নহে, যে প্রমাণ খানিক তন্দ্রার মধ্যেই অবলুপ্ত থাকিয়া যায়, আর খানিকটা চেতনার মধ্যে আসে। এখানে আলোই প্রথম, আলোকে যে কীভাবে আমরা স্মৃতির মধ্যে আনিবার প্রয়াস পাই তাহা মাঝে মাঝে আমরা ভাবি, ফলে আমাদের সবটুকু একভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে দেহ, যে অবয়ব চিত্রকরেরা আঁকিয়াছেন, তাহার যদিও কোনও সম্বন্ধ আমাদের সঙ্গে নাই, একমাত্র শিল্পের দিক ছাড়া। আবার দেখা যাইবে সেই অবয়বের সম্যকভাবে নানা রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেখানে তাহারা নিজস্ব পৃথিবীর পথ ধরিয়া যায়। তাই সত্য বলিয়া আমরা মানি, তাই তাহার সত্য। সেই জন্য যখন আলোর সম্বন্ধটা খুব নিকটে পাইবে এবং পুরামাত্রায় পাইবে, সোজা আলোর সঙ্গে ও পটের সঙ্গে, তাহার স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেখানকার সংস্থান পদ্ধতি তাহার নিজের, এবং তাই সংস্থান কথাটার বস্তুর সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ, এই সূত্র অপ্রত্যক্ষভাবে আলোকেই মানি। এখানে তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইবে, মানা হইয়াছে। আলো আর পটের সমস্ত কিছু একটি আধ্যাত্মিক সত্তায় পরিণত হয়, তখন তাহা সত্যই চমকপ্রদ। ঠিক এই কারণে আমাদের ছবি প্রায় সব একপ্রকার, কারণ তা দিকের একটি সত্যকে মানে যা ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, আমাদের আনন্দেরই কথা যে সেখানে আলো আছে। তাহা আমাদের শিল্পের চরম কথা। ঠিক এখানেই রংয়ের জন্য সে আঙ্গিকের সৃষ্টি হইয়াছে, রং সে অঙ্গকে ঘসিয়া মাজিয়া নিয়াছে। রং হয় আলোকের গৌণরূপ। রং যে কেমনভাবে সমস্ত লোকচরাচরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সমান স্থির রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝি। রংয়ের আধার এবার রংয়ের কাঠামো হইয়া দেখা দেয়। এই কাঠামো আরও দৃঢ় হইবে এবং রং আলোকের অস্তিত্ব ও মনোহারিত্ব ঘোষণা করিবে। দৃশ্যাবলী তখন আরও সুন্দর হইবে। রংয়ের বর্ণাত্মক আঙ্গিকগুলি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে শিল্পীরা আঁকেন, রং মাঝে মাঝে রেখার গণ্ডিকে সচেতনভাবেই ছাড়াইয়া যায়, সাধারণ দর্শকের মনে হইবে এইগুলি অত্যন্ত সমান, কিন্তু ইহাকে সমান বলা ভ্রম। কারণ ইহার লীলাটা ভালোভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য। শুধু আলো ছাড়া অন্য কিছু বিচার করার সুযোগ আমাদের বড় একটা দেয় না। আলো যেন আর এক অস্তিত্ব, নিছকভাবে, আঁকা ছবির উপর পড়িয়া তাহাকে প্রাণদান করে, যেমন আলো দৃশ্যমান সব কিছুকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, তেমনি মনে হইবে পটে আলো যেমন বাহির হইতে তাহাকে রূপদান করিয়াছে, যেমন স্থাপত্য করে, এ ধরন অনেকটা নূতন। আবার বহু বন্ধুর ধারণা আমাদের দেশের চিত্র স্থির। বলা যায় এক কথার উত্তরে, আলো নিয়া যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়াছে, তাহাদের শিল্পধর্ম বুঝিয়া নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নহে। সেখানে শুধু সমস্ত ক্ষণ একটি প্রকাণ্ড সম্বন্ধ নিয়া চাঞ্চল্য উপস্থিত, আলোকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার অবয়ব, এবং সেই হেতু তাহার লীলা বুঝা সহজ নহে।

আর একটি কথা এখানে উত্থাপন না করিয়া পারা যায় না। মন আমাদের স্বভাবতই তর্কপরায়ণ। আমরা যদি দেখি তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে একই ধরনের কতগুলি রূপ আমরা সব সময় দেখিতে পাইব। অনেকে এ ব্যাপারকে নিন্দা করেন। অবশ্য ইহার কারণ ছোট করিয়া আমরা আগেই বলিয়াছি। পাথরের স্বকীয়তাকে তাঁহারা মানিতে রাজি আছেন, কাঠের বাস্তবতাকে যে না মানিয়া উপায় নাই। ঠিক তেমনি বাস্তব করার জন্য অন্তত ছবির দিক হইতে তাহাকে একটি জমির কথাই ভাবিতে হইয়াছে, একটি দিকের কথাই ভাবিতে হইয়াছে। আর দেখিলাম দিকটাই, একমাত্র দৃষ্টিই সত্য এবং এই সীমাগুলি

মানিয়া যে অবয়ব দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনেকটা একই হয়। বৃষকাষ্ঠের সীমা মানিয়া যে অবয়ব গড়িয়া ওঠে তাহা প্রায় একই হয়, শুধু দুই একটি কমবেশি ছাড়া। যাহাই হউক, বাস্তবতার উপর ভিত্তি করিয়া যখন রূপান্তর হইয়াছে, তখন একমাত্র ডৌলত্বই দেখা দিয়াছে। এই ডৌলত্বই সেখানে প্রথম, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি আভ্যন্তরিক স্থানসংগঠন হইয়াছে। আভ্যন্তরিক স্থান কী, আমরা পরে বিচার করিয়া দেখিব, আপাতত সেই ডৌলত্বের দিক হইতে যে কোন দৃষ্টিকোণের রূপ ফলত এক রকমই হয় দেখা যাইবে। যাহারা চিত্রের কতগুলি নিজস্বতা মানে না, তাহাদের মধ্যে কোনওকালেই ইহা ঘটে না। তাই যন্ত্রের আবিষ্কারে তাহাদের অন্তরাত্মা ছোট হইয়া যায় — সূর্যালোক পিঠ দেওয়া ছাড়া আর অন্য কাজে লাগে নাই।

হালে অবশ্য অন্যান্য দেশে অনেক কিছু বিশ্বাস হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেক চিত্র ছকা অবয়ব রূপে দেখা গিয়াছে। ইহা ওই সত্যের প্রথম সোপান এবং ওই পথই সমস্ত অন্যান্য চিত্রের স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। কালীঘটের প্যাঁচা বা কুকুর ইত্যাদি কিন্তু ঠিক ছকা অবয়ব নহে। ইহার মধ্যে আমাদের শিল্পের সত্য ঠিকভাবে বর্তমান। কালীঘাটের পুতুল ছিল বিখ্যাত— তাহার বেনে বউ (?)-তে অনেকে বলে, দেখিতে পাই, কাঠের বাস্তবতার সঙ্গে কেমনভাবে আমাদের বাস্তবতা যোগ দিয়েছে! এই সূত্রে বলা যাই পারে, যাহারা পটুয়া তাহারা তো যে যাতে নিখুঁত মূর্তি গড়িত, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া ভারতে ভাস্কর্যের ছাপ (নাম্বার নয়) যাহার মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান, তাহারাই এই কাঠের মূর্তিটি গড়িয়াছে, প্যাঁচাটাকে সৃষ্টি করিয়াছে। ছকা অবয়ব বলিতে আমাদের আপত্তি যে সেখানে বস্তুর উপর দিয়া ঘটিয়াছে, আর এক ছন্দ সেখানে আপনকার কার্যসিদ্ধির জন্য কাজে লাগিতেছে। তাহার মধ্যে চেতনার রস নেই। যাহাই হউক, সেই পটুয়া এতই বাস্তবতার বিশ্বাস করিত যে, সে কখনই তাহার প্যাঁচাটাকে, তাহার বউটিকে শাস্ত্র বিধি নিষেধ, যোগ করে নাই, ষড়ঙ্গ তাহার নিজস্ব লীলায় আছে। তাহার সীমা অদ্ভুতভাবে আলাদা। হইলেও, সরস্বতী-লক্ষ্মীর প্রতিমায় বাংলার নিজস্ব দান আছে, সে কথা ছাড়া আমরা এক চোটেই বলতে পারি, একেবারে তাহার মধ্যে ছবির সার্থকতা আছে। একমাত্র প্রতীক সবখানটিই বিশেষভাবে বাংলার।

ইহার মধ্যে এক দিক হইতে দৃঢ় চরিত্রের স্থান, কৃষ্ণলীলার যখন বিশেষ কোনও বর্ণনা আঁকা হয়, দেখা যাইবে সেখানকার সমস্ত ঘটনা লইয়া বিচার করিবার অবকাশ আমাদের নাই। কোনও কাহিনির যোগসূত্র ধরিয়া আমরা কোনওক্রমেই আগাইয়া যাইতে পারিব না। মনোজগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অত্যন্ত অল্পই। আমরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইব, যতই আমরা ভাবিব, ততই তাহার লীলা আমাদের মধ্যে আলোকসম্পাত করিবে, কোনও ঘটনা বলিবে না, আমাদের সম্বন্ধ তাহার রীতি আর চিত্রাত্মক লীলার সঙ্গে, যে কথা এ যাবৎ আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। সেখানে আমরা বুঝিতে পারিব, এক অবয়ব আর এক অবয়বে গল্প সূত্রে খাড়া হয় নাই। কেহ কাহারও উপরে তেমনভাবে নির্ভর করে না। প্রত্যেকটি অবয়বের নিজস্ব লীলা মহিমা আছে। একটি দৃষ্টিকোণের ফলযুক্ত, একটি আলোকসম্পাতের রং বৈচিত্র্যসম্পন্ন, এখানে অবয়ব স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ কৃষ্ণলীলার সঙ্গে একটি মৌখিক সম্বন্ধ আছে। সে এতই গৌণ যে বিশেষ গুরুত্ব কেহ আরওপ করে না, যাহাকে নিছক কেতাবি ছবি বলে, তাহার কোনও ক্রমেই হয় নাই। অন্তত নব্য চিত্রের মধ্যে এই মাধুর্যের কিয়ৎ পরিচয় পাই। ঠিক এইভাবে অবয়ব সংগঠন রীতি ভারতের অন্যান্য চিত্রের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ইহার ক্রিয়া সম্পাদনা হয় নাই। যেসব রূপের মধ্যে বিশেষভাবে ছন্দকে স্থান দিবার ছাপ আছে। এখানকার অবয়ব ভারি সরল, অতশত খুঁটিনাটি নাই, অত খট মট নাই, খুব সোজা তাহার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি এক-একটি রূপের চরিত্র বর্তমান। তাহার নিজস্ব প্রকার আছে। যে প্রকারের সত্য আছে, সে প্রকারে আংশিক রং আছে, আংশিক আলো থৈ। কোথাও দেখা যাইবে ভাব প্রকাশ করিতেছে না, শুধু রং, শুধু তাহা অবয়বমাত্র—তাহার

বিরাট পটল-চেরা চোখ কোনও কথাই বলে না। অন্যান্য দেশ বাস্তবতার বিশেষ সম্বন্ধ লইয়া চলে, কিন্তু আমাদের দেশ অনুরূপ নহে। পরমাণু হইতে বিশালের মধ্যে আমরা শ্রদ্ধার বস্তু পাই, সে সম্বন্ধের মধ্যে আমাদের উপলব্ধি করা সত্যের অংশ আছে।

সাদামাটা ভাবে যাহাকে সৌন্দর্য বলে তাহাব খানিক কিছু নাই। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস সৌন্দর্য কথাটা অত্যন্ত পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যাপার, তাহার সঙ্গে এক ইন্দ্রিয়ের কোনও যোগসূত্র নাই। এখানে প্রত্যেকটি অবয়ব নিছক বাস্তবতার গুণে অস্তিত্ব পাইয়াছে। পটের মধ্যে প্রত্যেকটি স্থান পাইয়াছে। আপনি আপন চরিত্র নিয়া একটি ডৌলত্বের আভাস দিয়াছে। ইহাকে বুঝিতে হইলে আঁকিয়া বুঝিতে হইবে এবং তখনই বুঝা যাইবে তাহাতে বর্ণ কতখানি। ছক অবয়বে শুধু একটি অবয়ব থাকে, আর তাহা অনুমানের, আলোর বা অন্যান্য বাস্তবতার কোনও অংশ তাহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে দেখা যায় না। কোনও সামঞ্জস্য তাহার নাই। আমাদের অন্যান্য চরিত্রের বেলায় আমরা ব্যাখ্যায় দাঁড়াইতে পারিব। অবশ্য আমাদের সুধীসমাজ ধর্ম কথাটা শুনিলে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন, এবং মনুষ্যধর্ম ভুলিয়া যান। যাহাই হউক ধর্ম্মের বোধের মধ্যে কোন রসের সন্ধান পান না, কিন্তু এসব চিত্রকে ধর্মের সঙ্গে না জড়াইয়া দেখিলেও পারেন, কারণ মানুষের সঙ্গে দেবতার কোনও প্রভেদ নাই।

'নাড়ুগোপাল'-এর আকৃতিটি ধরা যাক। ঠিক এর বাল্যের এই বাস্তবতা লইয়া কোনওদিন কোনও রাজ্যে রূপান্তর করার চেষ্টা দেখা যায় নাই। এখানে শিল্পীর নজরের নিজস্ব ভাব দেখিতে পাই। পিছনে যদিচ বহু গল্পই আছে, হইলেও স্তন্যপানের কোনও ব্যঞ্জনা দেখা যায় নাই। সেখানে তাহার দেবত্ব প্রকাশ পায়, স্বয়ং ভগবান, এই কথা প্রচার হয়! নাড়ুগোপালের ভঙ্গিতে দেখিবেন যে, তাহার সমস্তটা রূপ উপর হইতে দেখিয়া আঁকা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ লক্ষণ এখনও আছে। তাহার মুখটা উপরে তোলা দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। যশোদাদুলাল নবদুর্বাদলশ্যাম ছিলেন, এবং তাহাকে নীল বলাও হইয়াছে। আমরা হয়তো ভাবিব শিল্পীরা তাহার ছবিটা ধাঁ করিয়া টানিয়া করিয়া দিয়াছিল। কতগুলি আলোকময় রেখা সহযোগে সবুজ রং, চিত্রান্তরে লাল—তাহাকে ছাপাইয়া রেখার অস্তিত্বকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

মুখবৈচিত্র্যকে কেহ আজকাল শিল্পের গুণ বলিয়া ধরেন না, এবং সেই দিক হইতে এই অবয়বসকলের বেশ মানে খুঁজিয়া পাই। আর এক দিক হইতে যেহেতু আমাদের দেশে সকলে জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ, সাধারণ ভাবে, অনিত্যতাকে তাহারা বিশ্বাস করে, পুরুষ নামে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করে, আর প্রকৃতিকে চিন্তা করে শ্রীরাধার রূপে। সৃষ্টির রহস্য তাঁহারা, রহস্যের কারণ— এবং তাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আছেন। ঠিক এই সমস্ত রূপের উপর শিল্পীরাও নিজের বাসনা অনুযায়ী যে কোনও স্বাধীনতা লইতে সমর্থ হইত। স্বাধীনতা কথা একেবারে তাহার বাস্তবতার দিক হইতে বলা হইল, সেটা সম্ভব সাধারণ জীবনের উপর আরোপ করা যাইত না, তাহাতে হয়তো কথা উঠিতে পারিত। এ স্বাধীনতা লইলেও দেখিতে পাই, অন্যান্য গোপবালকের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রভেদ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি এখানে কোনও রূপক স্থান পায় নাই, রূপই সব এক-এক ভঙ্গিতে, সেইগুলি নিজেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেখানে ভাবের স্থান নাই, রং সেখানে চোখের রেখাকে ছাপাইয়া গিয়াছে, চোখের কোনও অভিব্যঞ্জনা কাহিনির দিক হইতে নাই। এই ভঙ্গিই আঁকিয়া গিয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল সময় একের চরিত্র বুঝিয়াছে, আর তাহা অনুমানের বিষয়গত খুব কমই, এবং উহা নিছক চোখের বাস্তবতার অঙ্গীভূত।

সাধারণত একজন যদি দু'হাত তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ একজন বলিবে একেবারে গৌরাঙ্গ, যদিচ লোকটি কালো হয়, যদিচ লোকটি কুরূপ হয়, তবু তাহার হাত তোলা দেখিয়াই এমত বিশ্বাস জন্মাইবে। তেমনি আবার কেহ পায়ের উপর পা দিয়ে হেলিয়া দাঁড়ায় — আহা যেন কেষ্টঠাকুর! সমস্ত সময় তাহার চরিত্র তাহার চোখ-নাক-কান হইতে সংগঠিত হয় না, যতটা হয় তাহার অঙ্গ হইতে। বাস্তবতা যেখানে চরম, নিশ্চিন্ত তুলির পারদর্শিতা যাহাকে রূপায়িত করে, উহা হয় অবস্তু, তাহার মধ্যে

সাদৃশ্য থাকে না, শুধু থাকে তাহার চরিত্র; এই চরিত্রই বঙ্গদেশের চিত্রপটে সর্বময় হইয়া উঠিয়াছে। রেখায় সে শিল্পী অনেক খুঁটিনাটিতে যাইতে পারিত, শাস্ত্র তাহাকে খুঁটিনাটিতে যাইবার সাহায্য করিত, হইলেও সেখানে সে যায় নাই। কেননা রেখা হইতেছে আলোর আর স্থানের একটি অশরীরী প্রমাণ। তাই চরিত্র আলো আর রঙে পরিস্ফুট হইয়াছে, এবং চিত্ররূপ পাইয়াছে। এখানে হয়তো ভারতের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের মিল আছে বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু তাহা সত্যই নয়, যেমন সংকীর্তনে রাগরাগিণীর আভাস আছে, তবু তাহার স্বকীয়তা বিশেষভাবে অন্য প্রকতির, তেমনি পটের বেলাতেও সব যোগ থাকিয়াও কোনও যোগ নাই। ভারতের অন্যান্য চিত্র পদ্ধতি আর এক রকমের, তাহার সঙ্গে বাংলার যোগ নাই।

কাঠের অবয়ব ভিন্ন হইত, একটি কাঠের বাস্তবতাকে মানিয়া আর অন্যটির অনেকখানিতে কাঠের বাস্তবতার বিশেষ বিশেষ স্থানে থাকিত, কেননা তাহাকে কাপড় পরানো হইত। তাহার বিশেষত্ব থাকিলেও উহা ঠিক সেই অবয়ব ছাড়া অন্য কোথায় প্রভাববিস্তার করে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রেখাভেদে আমাদের অবয়ব রূপায়িত হয়। এই রেখা জিনিসটা মানুষের শ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব, একমাত্র মানুষের সৃষ্টি তাহার সমতার নিদর্শন। তদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তুই তাহার নাই য়ুরোপ বলিয়াছে প্রকৃতির রেখা নাই, অথচ তাহারা দিক বেশ সুস্পষ্ট দেখে। ইহা কেমনভাবে সম্ভব তাহা অদ্যাবধি চিন্তার কথা। যদিও সেখানে রেখা পূর্বে ও পরে বহু জায়গায় ভালোভাবেই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সেখানে রেখা কোনও আলোর মূল্য, আলোর অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না। তাহার রেখার কোনও সোজা মোটা তারতম্য নাই। টান আছে কিন্তু টানটা সম্পূর্ণ নয়। আরম্ভ আর শেষ নাই। কব্জি যথেষ্ট ভালোভাবে ঘোরে না। আমাদের দেশে আর্ট স্কুলে একটি কথা চলে, আমাদের তুলি যখন ভোঁতা হইয়া যায় তখন উহারা তাহা লইয়া ছবি আঁকে। কথাটায় রস আছে। কে বড় কে ছোট বলিতেছি না, তবু দুইজনের পার্থক্য আছে সে কথা বেশ বুঝা যায়। আমাদের দেশে রেখা আলোর অঙ্গ। রংয়ের গভীরতা। অনেক সময় সমালোচকেরা বলেন, কোন ছবিকে লক্ষ করিয়া, দেহের রেখা, কিন্তু তাহা সত্যই নহে। ওগুলি হইতেছে টোনের রেখা, আলোর অস্তিত্বই প্রমাণ করে, আলোকেই বর্ণনা করে। আবার কোনও বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা সেই রেখা কেমন যায় তাহার পরিচয় আমরা কালীঘাটের পটে পাই, যদিও সেইগুলি প্রায়ই তুলি দিয়া আঁকা হইত না, আবার হইত, সেগুলি কাঁপা কাঁপা রেখা — সমস্ত ছবিকে বিস্তার করিয়া থাকে। এই সব রেখার বরণ যুগপৎ অবয়বের ডৌলত্ব ও আলোর রূপকে ব্যক্ত করে। যদি তাহা শুধু সমান রেখা হইত তাহা হইলে সে রেখা কোনও কাজের হইত না।

রেখাচিত্র বলিতেই সকলে একটা জ্যামিতিক রূপ কল্পনা করে, যাহার কোনও তাৎপর্য নাই। এইটুকুই প্রমাণ হইবে যে তাহারা কেহ ভালো করিয়া ছবির দিকে তাকাইয়া দেখে না। আমাদের দেশ রেখাকেই সর্বাধিক বড় করিয়া দেখে নাই, কেননা তাহা হইলে অন্য বাস্তবতার কোনও সঠিক মূল্যই থাকে না। রেখা সব সময় দিককে নির্ণয় করার সাহায্য করিয়াছে, রং-কে তাহার সুযোগ দিয়াছে, আলোকের অস্তিত্বকে খর্ব করে নাই, যেহেতু রেখার অস্তিত্ব ইহাদেরই অস্তিত্বের নাম-রূপ।

আদিম চিত্রে যে রেখার প্রচার ছিল অদ্য সভ্য দেশে ঠিক সেই ধরনের রেখার প্রচার আছে। কেননা আদিম চিত্রের জন্ম অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে এবং তাহারা সেই রেখাকে বরাবর অনুসরণ করিয়াছে। ঠিকভাবে আলোর অস্তিত্বের দিক হইতে কোনও বিচারই সেখানে ছিল না, একথা আমরা তাহাদের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারি। বাটালি (?) ধরনের অস্ত্রে কতটুকু সম্ভব! আমাদের দেশে রেখাটা আসিয়াছে একেবারে প্রকৃতির মধু হইতে, যেখানে সূর্য আছে, আলো আছে, সন্ধ্যার পাখির সমস্ত কিছু ক্রমে একটি রেখা হইয়া যায় — উড়িয়া যায়।

আদিম চিত্রের সহিত সভ্যদের চিত্রের একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সমালোচকেরা আমাদের শুধু

বলিয়াছেন, তাহাদের পরিপ্রেক্ষণ নাই, যদিও আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। এইটুকুই তাঁহারা বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কিন্তু আর একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, যাহাকে বলিব ঘের-চেতনা, সমস্ত ছবিকে যাহা ঘিরিয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্ত ছবিকে একটি বিশেস ঘেরের মধ্যে রাখা তাহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কেননা তাহারা আসলে ঘের-চেতনাসম্পন্ন ছিল না। এই ঘের-চেতনা আমাদের সভ্য যুগের। এতক্ষণ যাহা কিছু কথা হইয়াছে তাহা একটি ঘেরকে চোখের সামনে রাখিয়াই বলা হইল। ইহাও একটি রহস্য, ছবির প্রচ্ছদপট যেমন সত্য। এই চেতনার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা অভ্যান্তরীণ স্থান বিষয়ে করিব।

যাহাই হউক, এই ঘের-চেতনা ছিল না। ঠিক তেমনই আমাদের দেশ ছাড়া অবয়ব-চেতনাটা এখনও আসে নাই, সেটা যে 'ভয় থাকলেই ভূত দেখবে' গোছের বিবর্তের (ন্যায়) অবতারণা করিবে তাহা নহে। সেটা ঠিক সত্যের উপর নির্ভর করিবে। যেমন আজ ঘের-চেতনা করে, যে কোনও জিনিসের দিকে তাকাইয়া আমরা চকিতে একটা সংস্থান খাড়া করিয়া লই, তাহার ঘের প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও। ধরুন যেমন করিয়া ফুলদানিতে ফুল সাজাই, তাহার ঘের তাহা হইলে কোথা হইতে ঠিক হয়! সেটা অদ্ভুতভাবেই মনে মনে থাকে। তবে সংস্থানকে কতগুলি রেখা রূপ বাহির করিয়া আনিয়া দেখি। আলো আর রং পড়িয়া থাকে, কিন্তু অবয়ব-চেতনা যখন আসে তখন একেবারে সোজা সমস্ত কিছু লইয়াই সে আসে, সে অবয়ব-চেতনা আমাদের দেশের ছবিতে বিশেষভাবেই উল্লেখিত হইয়াছে।

ঠিক এই চেতনাই অভ্যন্তরীণ বিবেচনা করায়, এই সত্যটি সমস্ত ব্যাখ্যার একমাত্র প্রতিপাদ্য। এই অভ্যান্তরীণ স্থানের উল্লেখ অন্য কোথাও দেখা যায় না। কেননা এক-এক দেশ এক-এক ভাবে কাজ করিয়াছে। অন্য দেশে দেখি শিল্পীকে সর্বাধিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলিয়াছে পটের অচলতা। পটের জমিটার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া যাওয়া যায়, এই কথাই শিল্পীর মনকে নাড়া দিয়াছে, একবারও ঘেরের কথা মনে হয় নাই। শুধু সকলেই সেখানে একটি গভীরতা সৃষ্টি করিবার জন্য ব্যস্ত, এবং সেই জন্য তাহাদের সমস্ত পণ করিয়া বসিতে হইয়াছে, এবং দেখা যাইবে, মনে হইবে তাহারা যেন পটভূমিকে খুঁড়িয়া চলিয়াছে। ইহাতে যদিও ফল লাভ হইয়াছে যথেষ্ট। শিল্পের দিক হইতে তাহা নিশ্চয় অদ্ভুত শ্রদ্ধার, তবু কতদূরে আমরা পৌঁছাইতে পারিয়াছি, অনেক বাস্তবতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বাদ দিতে হইয়াছে। যেখানে আপনার বাস্তবতা কোনও রূপ না পাইয়া বরাবর ফিরিয়া গিয়াছে, ক্রমাগত সৃষ্টি করিয়াছে অস্থিরতার, শুধু নিজের মধ্যে নহে, পরন্তু সকলের মধ্যে। কারণ পটের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করার একটা ভাব আছে, যেখানে পটটা পট থাকে, অর্থাৎ পট এক ভাগ আর রূপ এক ভাগ। যেমন পাথরের বেলায় হয়। বহু রং দিক ('ডাইমেনশন') আনিবার চেষ্টাও হইয়াছে অপরিসীম, কিন্তু পথ কোথায়, শেষে চৌকা আর লগা ছাড়া আর কিছু নাই, এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একবার যদি মনে পড়িত, ঘের শুধু মাপ নায়, ঘের হইতেছে ছবির অঙ্গ এবং একদিক হইতে দিকের একটি অভিব্যক্তি, তাহা হইলে সমস্তটা সোজা হইয়া যাইত। আদিম চিত্রে ছিল না বলিয়াই আবার সরলতা ছাড়া কোনও কিছু নাই। এ ঘেরের একটি অপরিহার্য বাস্তবতা আছে, রহস্য, সীমা আছে, যাহার বর্ণনা আমাদের বাংলার চিত্রে দেখিতে পাই। অনেক সমস্ত অনেক ছবির একটু বাদ দিলেই তাহার শোভা নষ্ট হয়, কিন্তু এইখানে সে কথা ওঠে না। ঘেরের নিজের বাস্তবতা লিখিয়া বলা দুঃসাধ্য, ইহার বাস্তবতা অনুভব করা যায়, একমাত্র চোখের সম্বন্ধে এক অস্তিত্ব। আভ্যন্তরীণ স্থান ঠিক ইহার সীমাকে মানাইতে, সে সীমাকে সম্পূর্ণরূপে রহস্য বলিয়া ধরিয়া ছবির শুরু হয়, যেমন পটের বেলাতে হয়। আর দিক হইতে ইহাকে অস্বীকার করাই হইতেছে ইহার মূল। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে, পাথরের কাঠিন্যকে আমরা অনায়াসে অস্বীকার করিয়াছি, কিন্তু তাহার চরিত্রকে মানি, তাহা যদি না হয় তাহা হইলে যে নিছক মায়া হইয়া দাঁড়াইবে, যে মায়া চিত্রের সীমার মধ্যে আসে না, বহুদূরে থাকে! ইহাকে অস্বীকার

করিতে পারা যায় দুইটি সত্য দিয়া, সেটা আলোকের আর আলোকপ্রসূত রং দিয়া। তদ্ভিন্ন হয়তো অন্য উপায় আর নাই। যেভাবে বাংলার শিল্পীরা করিয়াছেন তাহাই আমরা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবং ঘেরকে অস্বীকার করাতেই বাংলার শিল্প-ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য।

পটের মধ্যে সকল সময় সেই আভ্যন্তরীণ স্থানের সাক্ষাৎ ঘটে, এবং তখনই মনে হয় পটটি প্রকৃতির বাস্তবতায় নিবিড়। চৈনিক শিল্পে এবং সেই সূত্রে জাপানের যে কোনও চিত্রে দেখা যাইবে তাহারা ছবিটা যখন আঁকে তখন ঘেরটাকে একটি বেড়ার মতন মনে করে, কিংবা বহু জায়গায় দেখা যায় তাহারা ছবিটি যে বাস্তব এ প্রমাণ করিয়াছে। সহসা কিছু গাছের পাতা অথবা নলখাগড়ার গুচ্ছের বহু বহু টান দিয়া ঘের বাহির হইতে আসিয়াছে, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, শ্রদ্ধাকে কিছু মাত্র খর্ব করিতে পারে না। তবে আভ্যন্তরীণ স্থান পাশ্চাত্যে তো নাই, অন্য কোথাও নাই। ইহা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে বুঝিতে সাহায্য করে না। কারণ আমরা এতাবৎ ছবি এক ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত। ঘেরটার সঙ্গে বাঁধাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক। ঠিকভাবে তাহাকে কাজে পরিণত করা হয় নাই।

বাংলার এই বাস্তব-চেতনাকে আরও ভালোভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার। তাহার শিল্প বহু দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেটুকুই শুধু বিচার করার নয়, তাহার পদ্ধতি কেমনভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা ভালোভাবে দেখা প্রয়োজন। তাহাতে শুধু আমাদের দেশের নয় সর্ব দেশের কিছু উন্নতি হইতে পারে এবং বাংলার প্রাণধর্মের সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটে। এই আভ্যন্তরীণ স্থান তাহার প্রাণ ছিল এবং সে শিল্প অনেকখানি সর্বভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এ চেতনা তাহার অধ্যাত্মবাদ হইতে আসিয়াছে — তাহার আনন্দ হইতে আসিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বসিয়া একটি বালক দেখিয়াছিল অধ্যাত্মস্রোত। ওখানে কাহারা নাম গান করে, তাহার আওয়াজ সমস্ত সৃষ্টিকে একটি বাস্তবতায় পরিণত করিয়াছে, হাতে একটি তাস লইয়া কে যেন বসিয়া আছে, নীচে গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত, কেমন করিয়া ইহারই মধ্য হইতে, ওই তো আকাশ — এই তো আমি, মৃত্যু আসে, কে যেন গোঙায়, তবু ইহার মধ্য দিয়া আসে একটি হঠাৎ হাওয়া, যমকে দেওয়া একটি আনন্দ, সমস্ত শিরা-উপশিরা স্পন্দিত সমস্ত কিছুই, এমন কি মাটির উপর, মৃত্যুর উপর, নারায়ণ ধ্বনির সমস্ত বাস্তবতাকে একটি রূপান্তর আনিয়া দিল, সে আনন্দকে নমস্কার।

এখন সময় নাই, দূরে গ্রামরেখা সবুজ হইয়া আছে, মাঠ ঘাট ফাঁকা, কোথাও গোরু চরে, আর সমস্ত কিছুই নিথর স্তব্ধ। ঠান্ডা হাওয়া আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড্ডীয়মান সেই আলোতে, এমনি সময় দেখা যাইবে কালবৈশাখীর মেঘ সমস্ত আকাশ কালো করিয়া আসেয়াছে, বায়ুবেগ বাড়ে, কালো, কী অদ্ভুত কালো সে মেঘরাশি কালো চুলের মতোই, বায়ুবেগ বাড়ে পাতা উড়ে, গাছের পাতা স্পন্দিত, গোরুগুলি হয়তো ডাক পাড়ে, সমস্ত বিশ্বের রহস্য একেবারে আদিম, এই ছোট মাঠের উপর যেখান সকলেই ত্রস্ত, সমস্ত প্রাণ তাহার জড় ভয়ে শিহরিত, নীলকালো মেঘ, ধূলা উড়ে — হঠাৎ ওই কাহারা, ওই যে সাদা সাদা পাখা মেলিয়া সারি সারি ডানা উঠে নামে, বরাভয়ের চারণ গান কি শুনা যায়, কী অদ্ভুত শোভা এই মাঠে, কালো মেঘ, শ্বেত বলাকার যাত্রা-আনন্দ ঘনীভূত হইয়া উঠে, ছেলেটি চঞ্চল হইয়া অস্থির হইয়া সম্বিৎ হারায়; এই সৌন্দর্য্য তাহাকে দৃষ্টিদান করিল, মাঠে ছেলেটি পড়িয়া রইল, সবুজ মাঠ, বহু ধূলা উড়িয়া গেল তাহার উপর দিয়া!

সমুদ্রের নীল দেখিয়া কী যেন হইল, কী যেন ঘটিয়া গেল, যে আলো ছিল, যে নীল ছিল তাহার মধ্যে সে জন কী যেন দেখতে পাইল, সে নীল তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, রং আর আলোর বাস্তবতা তাহাকে আর চেতনায় রাখিল না। নীলের মধ্যেই তাঁহার শেষ হইল।

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
(কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

মুরারী ঘোষ

কার্ল হাইনরিখ মার্কস

রাইন উপত্যকায় মোজেল নদের দক্ষিণ তীরে প্রাশিয়ার এক প্রাচীন শহর ট্রিয়ের। এই শহরে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে কার্লের জন্ম ; পুরো নাম কার্ল হাইনরিখ মার্কস। কার্লের বয়স যখন ছয় তখন এই ইহুদি পরিবার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। কার্লের পিতা হার্শেল লেভি নতুন নাম গ্রহণ করলেন: হাইনরিখ মার্কস। তখনকার ইহুদি সমাজের নানা গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাই এই ধর্মত্যাগের কারণ। কার্লের মায়ের নাম হেনরিয়েটা, তাঁর আটটি সন্তান। কিন্তু শেষপর্যন্ত জীবিত ছিলেন কার্ল ও তাঁর তিন বোন সোফি, এমিলি ও লুইজি। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে মার্কসের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গণিত, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রবন্ধ রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন কিশোর বয়সেই। ছাত্রজীবনে তাঁর শ্রমশীলতা ছিল উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা সুবিদিত। এ ব্যাপারে কার্লের পিতা, ও বিশেষত তাঁর পিতৃবন্ধু লুডভিক ফন ভেস্টফালেনের প্রভাব স্মরণীয়। উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী ভেস্টফালেন ছিলেন শিক্ষায় ও মতামতের ঔদার্যে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি যাঁরা উনিশ শতকের প্রথম দিকে জার্মানির সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন : গ্যয়টে, শিলার ও হোল্ডারলিনের প্রত্যক্ষ প্রভাব যাঁদের জীবনে, যাঁরা দান্তে-হোমার-শেক্সপিয়র ও তৎসহ গ্রিক নাট্যকারদের সৃষ্টিতে আকণ্ঠ আপ্লুত। এই ভেস্টফালেনের কাছেই ইসকাইলাস, শেক্সপীয়র ও সার্ভেন্টিসের সঙ্গে কার্লের প্রথম পরিচয়। বিদ্যালয়ের শেষ কয়েক বছর এইভাবে মূল্যবান ও মনোরম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের রুচি ও মানসিকতা গঠন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মার্কস তাঁর ডক্টরেট থিসিস ভেস্টফালেনকেই উৎসর্গ করেন। আর ভেস্টফালেনের কন্যা-ট্রিয়েরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী—জেনিকে পরবর্তী জীবনে মার্কস বিবাহ করেছিলেন।

সতেরো বছর বয়সে মার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। আঠারো বছর বয়সে মার্কসকে কিছুটা অস্থিরচিত্ত ও সাময়িক দোদুল্যমান মনের অধিকারী মনে হয়, কিছুটা বহির্মুখীও। একদিকে শ্লেগেলের কাছে হোমারের পাঠ, গ্রিক ও লাতিন কবিতার আস্বাদ গ্রহণ, জুরিসপ্রুডেন্স ও পলিটিকাল ইকোনমি অধ্যয়ন, অন্যদিকে জেনির প্রতি নবোন্মেষিত অনুরাগ।

মার্কসের চেয়ে জেনি চার বছরের বড় — তার দিদি সোফিয়ার সখী। জেনির পিতা বিত্তশালী, সে তুলনায় মার্কস দরিদ্রসন্তান। তাই প্রেমের পথ মসৃণ ছিল না। অবশ্য কঠিন আদর্শবাদী ও পরিশীলিত মননের অধিকারী ছিলেন মার্কস সেই কৈশোর থেকেই! আর জেনি ছিলেন চিরদিন তাঁর প্রেরণাদাত্রী।

পিতার পরামর্শে বন থেকে মার্কস যোগদান করলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তখন দার্শনিক হেগেলের রাজত্ব। তাঁর পদতলে বসে যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লুডহ্বিগ ফয়েরবাখ, ডেভিড স্ট্রাউস, ব্রুনো বাউয়ের। পিতার ইচ্ছা মার্কস আইনশাস্ত্রে পারঙ্গম হবেন। আইন তখন জার্মানির ছাত্রদের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার রাস্তা খুলে দিয়েছে। সরকারি কাজে কর্মে আইনজ্ঞ ছাত্রদের বড় চাকরি বাঁধা থাকত।

মার্কস আইন পাঠে মন দিলেন, কিন্তু মন পড়ে রইল দর্শনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পাঠ্যবস্তুতে। বার্লিনে মার্কসের শিক্ষাজীবন এমন কিছু উজ্জ্বলতর হল না। এখানেই পরিচয় হল তরুণ হেগেলপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে। হেগেলপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন ছিল (DOKTOR KLUB)। র‍্যাডিকাল

চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তরুণ বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতেন এখানে। হেগেলের শিষ্য বলেই নিজেদের তাঁরা পরিচয় দিতেন।

শুধু এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরাই নয়, প্রায় সমস্ত জার্মানিই তখন হেগেলীয় দর্শনে প্রভাবিত। হেগেলের দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হেগেলের অনুজ্ঞার অংশবিশেষ সরকারি কার্যাবলির সমর্থনে সুযোগমতো লাগিয়ে জার্মান রাজতন্ত্রের সমর্থক জমিদারতন্ত্র ও সেনেট সরকারের দমননীতির একটা স্থায়ী ব্যাখ্যা তৈরি রেখেছিলেন।

প্রচলিত ব্যবস্থাকে দর্শনের পদ্ধতি দিয়ে সমর্থন করে হেগেল জার্মান রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার হাতিয়ার জুগিয়েছিলেন। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনের গতিময়তার দিকটি রক্ষণশীলদের কাছে পরিত্যক্ত ছিল। কেননা হেগেল বলেছিলেন যে কোনও এক সময়ে বাস্তব অবস্থা অবাস্তব হয়ে যেতে পারে, তখন তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। এমনিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ফরাসি রাজতন্ত্র। ফরাসি রাজতন্ত্রের যতদিন অস্তিত্ব ছিল ততদিন সেই অস্তিত্বের পেছনে যুক্তি ছিল।

হেগেলের দর্শনের মধ্যে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় দেখি বাস্তব অবস্থা যে কোনও উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। অপরদিকে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে জগৎসংসারের গতিময়তার ব্যাখ্যা স্বীকার করা। শেষোক্ত বৈপ্লবিক দিক তরুণ হেগেলপন্থীদের আকর্ষণ করেছিল। বার্লিনে এঁদেরই নেতা ব্রুনো বাউয়ের, কোপ্পেন, স্ট্রাউস, ফয়েরবাখ। জার্মান রক্ষণশীলতার যথাযথ বিরোধিতা এল এঁদের কাছ থেকেই।

প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বিরোধিতায় যখন হেগেলপন্থীরা তাঁদের বক্তব্যে শান দিচ্ছেন তখনই মার্কস এসে পড়লেন তরুণ হেগেলীয়দের সংগঠনে। আর্নল্ড রুগে-র সম্পাদনায় তরুণ হেগেলীয়দের মুখপত্র *হ্যালে বার্ষিকী (Hallische Jahrbuche)* প্রকাশিত হল (১৮৩৮)। এই পত্রিকাটি জন্মমাত্রেই প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরোধিতা শুরু করল। বাউয়ের ও কোপ্পেনের সঙ্গে মার্কসও সংকলনে লেখা শুরু করলেন। পরিচয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বাউয়ের মার্কসের মনীষার যথাযথ পরিচয় পেলেন। বিশ বছরের এই ছাত্রটিকে তখনিই দলের নেতৃত্বের মর্যাদা দিতে হল। আর সে মর্যাদার মূল্য দিতে মার্কস দ্বিধা করলেন না।

খ্রিস্টান গসপেলের প্রথম সমালোচনা করেছিলেন স্ট্রাউস। পরে আরও কঠিন সমালোচনায় বাউয়ের তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বাউয়ের বললেন বাইবেলীয় গল্প-গাথার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। ওগুলি নিছক গল্প-খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ঈশ্বরের বা যিশুর কোনও লোকোত্তর মহিমায় নয়। বাউয়ের তখন বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। স্বভাবতই তিনি কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়লেন। কিন্তু মার্কসের সঙ্গে বিচ্ছেদ বাউয়ের চান না, বাউয়ের পরামর্শ দিলেন মার্কস পড়াশোনা শেষ করে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি নিয়ে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করুন, বন থেকে দু'জন র‍্যাডিকাল মতামতের এক সাময়িকপত্র বার করবেন।

এদিকে মার্কসও বিদ্রোহী হেগেলপন্থী রূপে র‍্যাডিকাল মতামত ও নাস্তিকবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। গবেষণাগ্রন্থে দার্শনিক মতামতে মার্কস নিজস্ব প্রত্যয় থেকে এক তিলও নেমে আসতে রাজি নন। অথচ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের গবেষণাকর্মে পরীক্ষক হবেন তাঁর মতামতের চূড়ান্ত বিরোধীরাই। বিশ্ববিদ্যালয় বদল করে ১৮৪১ সালে মার্কস জেনা থেকে স্নাতকোত্তর গবেষণার ডিপ্লোমা পেলেন।

মার্কসের বিষয় ছিল ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য। মূলত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নব্য-হেগেলবাদী মার্কসকে বস্তুবাদী গ্রিক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করে। হেগেলবাদে দার্শনিক অনুভাবনা ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে নব্য হেগেলপন্থীদের সেকালে তাই ছিল বিতর্কের বিষয়। সম্পূর্ণ বস্তুগত ধারণায় ঈশ্বরকে নামিয়ে আনার চেষ্টা ইয়োরোপে প্রথম দেখা যায় ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের চিন্তায়।

নব্য-হেগেলবাদীরা যখন নিছক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগে মগ্ন রয়েছেন মার্কস তখন চূড়ান্ত বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সংযোগ ও বিরোধিতার ব্যাখ্যা রচনায় মন দিলেন। আর স্বাভাবিক কারণেই মৌলিক স্রষ্টাদের দিকে মার্কসের দৃষ্টি পড়ল—গ্রিক বস্তুবাদের দুই উদ্ভাবক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনে।

ডিমোক্রিটাস বলেছেন শূন্য থেকে কোনও কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না — কোনও কিছুই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর ঘটে এবং বিনা কারণে ও বিনা প্রয়োজনে কোনও কিছু ঘটে না। জগতের আদিতে রয়েছে পরমাণু, পরমাণু থেকেই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি। পরমাণু সকল সময়ে গতিশীল। তবে পরমাণুর গতির পেছনে প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে। পরমাণুর সবকিছুই প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু পরমাণু দ্বারা মানুষের জীবন গঠিত, মানুষের জীবনও প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা নেই, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করলেও বিপরীতভাবে পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরও দেখিয়েছেন যে মানুষের জীবন স্বাধীন ও স্ব-ইচ্ছায় চালিত। প্রকৃতির অনড় ও অবিচল নিয়মের অসহায় ক্রীড়নক হিসেবে তিনি মানুষকে দেখেননি। মানুষ আপন ইচ্ছায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে। পরমাণু দিয়ে গঠিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে ডিমোক্রিটাস ধর্মতত্ত্বের লোকোত্তর মহিমা স্বীকার করেন না। ডিমোক্রিটাসের এই ব্যাখ্যা এপিকিউরাস গ্রহণ করেছেন। এপিকিউরাস আরও এগিয়ে এসে বলতে চেয়েছেন মানুষের কোনও ব্যাপারে দেবতারা হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের ইচ্ছা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত নয়। ডিমোক্রিটাসের প্রত্যয় থেকে মুক্ত করে এপিকিউরাস মানুষকে স্বাধীন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিলেন।

মানুষের ইচ্ছার পরবশ্যতা বা জড়ত্ব মার্কসের কাছে স্বীকৃত তথ্য নয়। মার্কসের কাছে মানুষ চিরকালই আপন ভাগ্যবিধাতা। এই কারণেই নানা প্রসঙ্গে ডিমেক্রিটাসের প্রতি বিরূপ মার্কসের উৎসাহ দেখা গেছে। তুলনায় এপিকিউরাস মার্কসের প্রত্যয়ে আরও গ্রহণযোগ্য। যে সময়ে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেবতা বা ঈশ্বর মানুষের ভাগ্যের সিঁড়ি তৈরি করে দেয়, সেই কালে মার্কস প্রচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে বলেছেন : 'যত দেবদেবী আছে সকলকেই আমি ঘৃণা করি।' গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকার একাংশে মার্কসের এই উক্তি।

ধর্মতত্ত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা থেকে মার্কস সরাসরি চলে এসেছেন বস্তুজগতের প্রগতিবাদে, যেখানে মানুষ স্বয়ং আপন ভাগ্যনির্মাতা। এ ব্যাপারে মার্কস কিন্তু হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্সের সাহায্য গ্রহণ করেননি। মোটামুটি বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্সের রীতিনীতি মার্কসের আপন ব্যাখ্যায় যুক্তি জুগিয়েছে। একেবারে নিজস্ব পন্থায় মার্কস বলতে চেয়েছেন : ধর্ম নয়, ঈশ্বর নয়, দর্শন থেকেই মানুষ আপন ভাগ্যপরিবর্তনের রসদ জোগাড় করে নেবে। দর্শন থেকেই আসবে বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি—যার শক্তিতে মানুষ জীবন ও জগৎকে প্রয়োজনমতো বদলে নিতে পারবে। মনোগত চেতনা থেকে জন্ম নেবে জাগতিক বিদ্রোহ। দর্শন যেন পুরাণের প্রমিথিয়ুস — স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দেবে। গবেষণা গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের এই উল্লেখ রেখেছেন। কিন্তু তখন কে জানত, মার্কস নিজেই আধুনিক কালের প্রমিথিয়ুস, যিনি একদিন পুরাণের দুরন্ত প্রমিথিয়ুসের মতো ভাগ্য জয় করার চিরকালীন হাতিয়ার মানুষের হাতে তুলে দেবেন।

মার্কসের পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ হল। কিন্তু কতকগুলো ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেল যা প্রত্যাশিত ছিল না। খ্রিস্টধর্মের সমালোচনা করে বাউয়ের-এর দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হলে লেখকের উপর শিক্ষাজগতের রোষ বেড়ে গেল। বন্ থেকে বাউয়ের-এর চাকরি গেল। এমনকি বাউয়ের-এর শিক্ষকতার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। ফলে শুধু বাউয়ের নন, মার্কসও চোখে অন্ধকার দেখলেন।

মার্কসের সামনে একটাই পথ খোলা রইল সাংবাদিকতা। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় মার্কসের

দীক্ষা হয়েছিল। রুগে-র সম্পাদনায় তরুণ হেগেলপন্থীদের মুখপত্র *হ্যালে বার্ষিকী*-তে। রুগে-র পত্রিকা জন্মের আড়াই বছর বাদে বন্ধ হয়ে যায়। রুগে ড্রেসডেনে গিয়ে নতুন সাময়িক পত্রের জন্ম দিলেন — 'ডয়েশ্চে ইয়ারবুখের'। মার্কসের একাধিক আলোচনা *ডয়েশ্চে ইয়ারবুখের*-এ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রাশিয়ান সরকার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করলেন।

একটি কী দুটি পত্রপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে নতুন যুগের চিন্তাধারা রোধ করা যায় না। নব্য হেগেলীয়বাদীদের রাজনৈতিক মতামত ততদিনে পরিণত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। *রাইনিশে ৎসাইটুং* পত্রিকায় নব্য-হেগেলীয়বাদীরা এসে জড়ো হলেন। এলেন মার্কস, বাউয়ের, কোপ্লেন, ম্যাক্স স্টার্নার, হেস, হারহেবেগ। পত্রিকা আরম্ভেব দশমাস পর *রাইনিশে ৎসাইটুং* পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন মার্কস।

দায়িত্ব পেয়ে মার্কসের কলম আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তাঁর চিন্তা তখন প্রখর রাজনীতির দিকে বাঁক নিয়েছে। এই রাজনীতি প্রতিবাদমুখর ছিল সরকারি অব্যবস্থা, নিপীড়ন আর দমননীতির বিরুদ্ধে। মার্কসের হাতে পড়ে পত্রিকার সরকারবিরোধী রূপ আরও তীব্র হয়ে উঠল। সরকারি সেন্সরশিপের বিরোধিতা, ডায়েটের রাজনীতির সমালোচনা, মোজেলের আঙুরচাষিদের সমস্যা, দরিদ্র অরণ্যবাসীদের কাষ্ঠসংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি মার্কসের লেখনীতে তীব্রভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ১৮৪৩-এর মার্চ মাসে পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হল, মার্কসের চাকরি গেল। মনে রাখতে হবে নিষ্কলুষ মানবতার প্রেরণাই তখন মার্কসকে চালিত করেছিল — তখনও কোনো তত্ত্ব বা বিশেষ কোনো দার্শনিক চিন্তার প্রেরণায় মার্কস উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেননি, শুধু সাধারণ নীতিবোধের ভিত্তিতে দুস্থ সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদানায় সরকারি দমননীতির সমালোচনা করে এসেছেন।

এইবার নতুন উদ্যমে পড়াশোনা করতে গিয়ে মার্কস সাক্ষাৎ পেলেন সাঁ সিম-র প্রুধোঁ-র। ফরাসি সমাজতান্ত্রিকদের চিন্তার বিশেষত্ব তাঁর চোখে পড়ল। এরই মধ্যে এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের নাতিস্পষ্ট আভাস তিনি পেলেন।

ইতিমধ্যে জেনির পিতৃদেব ব্যারন ভেস্টফালেন পরলোকগমন করেছেন। তাঁর অবর্তমানে অনেক বাধা অতিক্রম করে মার্কস জেনিকে বিবাহ করলেন। এর পর দু'জনে চলে গেলেন ফরাসি দেশে— পারিতে।

পারিতে তখন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মেলা বসেছে। বার্লিনে বা বনে যা সম্ভব নয়—পারিতে তা সম্ভব। মার্কস ও রুগে দুজনেই পরিকল্পনামতো পারিতে গিয়ে হাজির হলেন। হাইনে, বাকুনিন, কাবে-র মতো তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তখন ফ্রান্সের চিন্তাজগৎ উজ্জ্বল করে রয়েছেন। পত্রিকা বেরুলো—নামকরণ হল, *ডয়েশ্চে ফ্রানৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের*। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল—মার্কস, রুগে, হাইনে, বাকুনিন, হারহেবেগ, ফয়েরবাখ। আর একটি নতুন শক্তিশালী লেখকের সাক্ষাৎ মিলল— ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস।

পত্রিকাটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ, প্রথমত অর্থিক সংগতি ছিল না। দ্বিতীয়ত সম্পাদক দু'জনের মতের অমিল দেখা গেল। মার্কস যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হতে চলেছেন, রুগে উলটোপথ নিলেন, ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের শত্রুপক্ষের দর্শনে আকৃষ্ট হতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত রুগেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে আগ্রহী হলেন।

ডয়েশ্চে ফ্রানৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখে-র পত্রিকার দুটি সংখ্যায় মার্কসের দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। একটি 'হেগেলীয় অধিকার দর্শনের আলোচনা', দ্বিতীয়টি তৎকালীন 'ইহুদি জীবনের সমস্যা' সম্পর্কে। আপাতদৃষ্টিতে রচনা দুটির মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে বলে বোধ হবে না। কিন্তু বিষয়বস্তু আলাদা হলেও রচনা দুটির বক্তব্যে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মিল রয়েছে। মার্কসের মানসিক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট স্তর রচনা দুটির মধ্যে লক্ষণীয়। এই দুটি রচনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে

সমাজ-সম্পর্কিত কোন ধ্যানধারণায় মার্কসের মনের গতি পরিণতি লাভ করতে চলেছে। প্রথম প্রবন্ধ থেকে মার্কসের ধারণামতো নির্বিত্ত মানুষের শ্রেণীসংগ্রামের কথা মোটামুটি জানা যাবে। দ্বিতীয় রচনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের অস্পষ্ট কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুটি রচনাই আমাদের চোখে তুলে ধরবে ভবিষ্যতের কার্ল মার্কসের পরিণত চিন্তার আভাস।

প্রথম রচনায় মার্কস দেখিয়েছেন ধর্মের সমালোচনা নিছক ধর্মের ব্যাপার নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মের যথার্থ সমালোচনা সম্ভব। ফয়েররাখের প্রভাব এখানে লক্ষ করার মতো। এই রচনাতেই প্রথম দেখা গেল মার্কসের আলোচনা আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে চাইছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার এই প্রথম প্রয়োগ মার্কস নিজের রচনাতে দেখাতে চাইলেন। মার্কস বললেন শ্রমশিল্প ও পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে রাজনীতির যোগ রয়েছে। আর তার থেকেই আধুনিক কালের প্রধান প্রধান সমস্যার জন্ম হচ্ছে।

দ্বিতীয় রচনাটি মূলত বাউয়ের-এর এক নিবন্ধের সমালোচনা। ইহুদিদের সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে বাউয়ের বলেছিলেন, জাতীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে ইহুদিদের পরিত্রাণ নেই। মার্কস কিন্তু ধর্মীয় সমাধানের পথে গেলেন না। মার্কস বললেন সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। ধর্মের প্রভাবের থেকেও ইহুদি সমাজের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। ইহুদিদের সামাজিক মুক্তি এই সব ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে। নতুন ধরনের সামাজিক শক্তির জন্ম দিয়ে নতুন সমাজ সংগঠনের সাফল্যে ইহুদি সমাজের মুক্তি। এই মুক্তির চেষ্টা মানুষের হাতেই রয়েছে। মোটামুটি একটা নাতিস্পষ্ট বিশ্লেষণে এই প্রথম মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলেছেন।

ফ্রান্স ইয়োরোপের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গ। এখানে থাকার সুযোগ মার্কস হেলায় হারালেন না। হেলভেশিয়াস ও হলবাখের বস্তুবাদ, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি, জোসেফ প্রুধোঁ-র নৈরাজ্যবাদ, ফুরিয়ের ও বাবুফের ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, গিজো-র ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি মার্কসের দিনরাতের অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠল। গভীরভাবে পড়াশোনায় ডুবে গেলেন মার্কস। পারির আকাশে বাতাসে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় মুখর। সমাজতন্ত্রের নব নব তত্ত্বে ও ব্যাখ্যায় চিন্তাশীল লেখকদের অভাব ছিল না। ফ্রান্সের চিন্তার জগৎ ভরে রেখেছিলেন অনেকেই। ছিলেন সাঁ সিমঁ-র শিষ্যরা, ফুরিয়ের গোষ্ঠীর লেরু, ক্যাথলিক পুরোহিত ল্যামেনে, সিসমন্ডি। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাদ ছিল না। বেরেঙ্গার-এর গীতি আর জর্জ সাঁ-র চমকপ্রদ উপন্যাস থেকেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারিত হত।

সমাজতন্ত্রের এই সব ধারণার মধ্যে কোনওরকম সংগ্রামের কথা খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রায় প্রত্যেক তত্ত্বেই বিত্তবান শ্রেণীর মর্জির পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল। আশা ছিল সমাজসংস্কারের চাপে বিত্তবান মানুষেরা একদিন না একদিন নিজেদের সম্পদ বন্টনে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন।

সম্পদ বন্টনের এই সরল যুক্তির ফাঁকিতে মার্কসের মন সায় দেয়নি। সমাজতন্ত্রের প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে মার্কস সাঁ সিমঁ আর বাবুফের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। মার্কসের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কয়েকটি মৌল উপাদান সাঁ সিমঁ আর বাবুফের চিন্তার মধ্যে ছিল, মার্কস তা স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্রের কথা সাঁ সিমঁ বলেছেন। আরও বলেছেন যে মানুষের সমগ্র ইতিহাস খুঁজলে শ্রেণীসংগ্রামের নানা কাহিনি পাওয়া যাবে। পণ্য উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত থাকার কথাও সাঁ সিমঁ জানিয়েছেন। রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের তত্ত্ব সাঁ সিমঁ বিস্তারিত করেননি, কিন্তু আভাস দিতে পেরেছেন। সাঁ সিমঁ-র ভাবনা থেকে মোটামুটি দুটি মৌল উপাদান মার্কস গ্রহণ করেছেন : ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় মার্কসীয় চিন্তার দুটি উপাদান — প্রথমটি, মানবইতিহাসের শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টি পণ্য উৎপাদনের

সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের গভীরতা। হলবাখ ও হেলভেশিয়াসের বস্তুবাদী দর্শন, বাবুফের বিপ্লবচিন্তা, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, মার্কসীয় দর্শনের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে, যা একান্তভাবেই মার্কসীয়।

ইতিমধ্যে বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে থেকেও এমন মানুষদের আবির্ভাব হল যাঁরা নিজেদের সামাজিক মুক্তির চেষ্টায় তত্ত্ব ও নেতৃত্ব দুই-ই জুগিয়েছেন। লেরু, প্রুধোঁ—দুই চিন্তাবিদই শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তত্ত্বগত চিন্তায় সমমতাবলম্বী না হলেও দুজনের প্রতিই মার্কস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এঁদের তাত্ত্বিক উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা মার্কস নেননি। মার্কস ক্রমশ এক সামগ্রিক প্রকল্পের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছলেন, যার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতন্ত্রবাদ, সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও পরিশেষে শ্রেণীহীন সাম্যবাদের ধারণা এক সমন্বয়ের মধ্যে থাকছে। সামাজিক মানুষের মুক্তির চেষ্টায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মার্কস ওই সামগ্রিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

মার্কসের এই তাত্ত্বিক উপলব্ধির মৌলিকত্ব হল এর সামগ্রিকতায়—মৌলিকত্ব শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ রূপকর্মকে এক প্রতীতির মধ্যে সমন্বিত করার চেষ্টায়। এই প্রতীতি এক নিবিড় দর্শনচিন্তার হাতিয়ারে সমৃদ্ধ - হেগেল থেকে যার শুরু এবং পরিণতি ফয়েরবাখে। বিদ্রোহী হেগেলীয়দের তিনটি শাখার একটির প্রেরণা ফয়েরবাখ। স্ট্রাউস, বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদ থেকে সরে এসে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন ফয়েরবাখের আরম্ভ সেখান থেকে। হেগেলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের নিত্যতায় বা নির্বূঢ় সত্তায় (Absolute Reality) প্রথম আঘাত দিয়েছিলেন স্ট্রাউস। স্ট্রাউসকে অতিক্রম করে গেলেন বাউয়ের। বাউয়ের হেগেলের পরমভাবের (Absolute Idea) কোনও স্বীকৃতি দিলেন না, বরঞ্চ বাইবেল ও ঈশ্বরকে নেহাৎ লৌকিক পর্যায়ে টেনে নামালেন। আরও এগিয়ে এসে ফয়েরবাখ বললেন : 'ধর্মের জগৎ আসলে কোনও জগৎই নয়, নিছক কল্পনা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবগত ও আদর্শগত পরিপূরক।'

ফয়েরবাখকে বলা হল হেগেলের নিয়তি। হেগেল বলেছেন বিশুদ্ধ ভাবের বিকাশ থেকে বিশ্বের জন্ম। বিশ্ব হল পরমভাবের প্রকাশ। কিন্তু ফয়েরবাখ বললেন, প্রাথমিক সত্য হল মানুষ ও মানুষের জগৎ। জাগতিক বিকৃতি ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের ধারণা ও তত্ত্ব মানুষেরই তৈরি। মানুষ তার আদর্শ সত্তাকে ধর্মের প্রতিচ্ছায়ায় স্থাপন করে দেখে। ধর্ম কোনো প্রকৃত সত্তাকে উন্মুক্ত করে না। আসলে হেগেলের পরমভাবের নিত্যতায় বিশ্বাস রাখলে ইতিহাসের গতিশীলতায় আস্থা হারাতে হয়। হেগেলকে অনুসরণ করলে মানুষের ভাগ্য পরমভাবের ইচ্ছার সঙ্গে বাঁধা রাখতে হয় — মানুষের ভাগ্য জয় করার চেষ্টায় তখন ইতি পড়ে, চরম নিয়তিবাদে শেষ হয় সমাজ ও সভ্যতার প্রগতি।

হেগেলের সংঘাতের পদ্ধতি ব্যবহার করেই ফয়েরবাখ খ্রিস্টধর্মের অবাস্তবতা দেখিয়েছিলেন। ফয়েরবাখ দেখালেন হেগেলের দর্শনকে সঠিক ব্যাখ্যা করলে হেগেলের নিজস্ব যা প্রতিপাদ্য, পরমভাব, তা আর ধোপে টেকে না। অথচ হেগেল নিজস্ব যুক্তির ফাঁক দিয়েই পরমভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হেগেলের চিন্তায় পরস্পবিরোধী প্রত্যয়গুলো ফয়েরবাখ উন্মুক্ত করে দিলেন হেগেলীয় বিচারপদ্ধতির রীতি মেনেই। তবু মার্কস দেখালেন ফয়েরবাখ এক জায়গায় এসে থেমে গেছেন। যেটা তাঁর প্রধান ত্রুটি তা হল ফয়েরবাখ বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই বিচার করেছেন—মানুষকে নিছক বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসেবে।

ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলটুকু বুঝতে পারলে মার্কসের মৌল প্রত্যয়গুলো ধরতে কষ্ট হয় না। মানুষকে সম্পূর্ণ বিমূর্ত বা ভাবমূলক পরিবেশে না দেখলেও ফয়েরবাখ মানুষকে জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন—জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের ধারণা হিসেবে। কিন্তু মার্কস দেখতে চাইলেন বাস্তব মানুষকে, মনুষ্যত্বের ধারণাকে নয়, যে মানুষের সত্তা

পরিবেশ প্রভাবের চাপে বিমূর্ত থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে—বিশেষ করে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে অবস্থিত মানুষকে, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিণতি স্বরূপ মানুষকে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানবদর্শনের বিচারে মার্কসকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে। এই উত্তর খোঁজার তাগিদে মার্কসের কাছে সমাজকাঠামোর ছবি পরিষ্কার ধরা পড়ে। দর্শনবিচারের সঙ্গে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের এই নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়াই মার্কসের মৌলিকত্ব। বিচ্ছিন্নভাবে মনুষ্যসত্তাকে খোঁজার প্রবণতা ছিল না বলেই মার্কস সামাজিক সম্পর্কের রূঢ়তা থেকে, অন্যায় থেকে মানবমুক্তির প্রশ্ন তুলতে পেরেছিলেন। দর্শনের ভাবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে—বাস্তব কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় দর্শনকে নামিয়ে এনেছিলেন। মার্কস বললেন মানুষকে বিচার করতে গেলে দর্শন আর নির্লিপ্ত চিন্তাসমষ্টিরূপে প্রকাশ পায় না — দর্শন হয় তখন 'প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন'।

প্রসঙ্গত দর্শনের আলোচনা থেকে মার্কস যুক্তিসংগতভাবে চলে এলেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নে। মার্কস তাঁর প্রথম অর্থনৈতিক বক্তব্য রাখলেন *১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি*-তে। এই অর্থনৈতিক আলোচনাতেও মার্কস ফয়েরবাখের প্রভাব এড়াতে পারেননি। ফয়েরবাখের কতকগুলি দার্শনিক প্রত্যয়ও [প্রাকৃতিকতা (Naturalism), মানবতাবোধ (Humanism), বিযুক্তি (Alienation),— অবশ্য এই সব প্রত্যয়গুলি যথাসাধ্য পরিবর্তিত অর্থে নিজস্ব মতে মার্কস ব্যবহার করেছেন।] মার্কস অর্থনীতির আলোচনাতে ব্যবহার করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বিযুক্তি' প্রত্যয়টি। অবশ্য হেগেলীয় দর্শনেই প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। মার্কস কিন্তু প্রত্যয়টিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোচনায় সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

মার্কস বিযুক্তির প্রশ্নকে শ্রেণীসমস্যারূপে দেখিয়েছেন। তিনি দেখালেন, শ্রমিক আপন শ্রমের পূর্ণ মূল্য পায় না, অর্থাৎ নিজের শ্রম থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এই বিযুক্ত শ্রমের দখল পায় পুঁজিপতি। শ্রমিকের বিযুক্ত শ্রম পুঁজিপতির সম্পদ স্ফীততর করে তোলে। শুধু তাই নয় উৎপাদনব্যবস্থার উপর শ্রমিকের দখল না থাকায় শ্রমিকও উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত থাকে। এই বিযুক্ত শ্রমের প্রশ্ন থেকেই মার্কস বুর্জোয়া সমাজের অর্থশাস্ত্র ও ধনতন্ত্রব্যবস্থার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

অর্থনীতির আলোচনায় এইবার মার্কস একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করলেন—সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতদিনের পুথিগত শিক্ষায় মার্কস যা জেনেছিলেন তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রবাদ। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা রচিত হয়নি, মার্কসের মন তাতে সায় দেয়নি। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডল বলতে তৎকালীন পণ্য উৎপাদনপ্রণালী, শ্রমের মূল্য, মুনাফা, সঞ্চিত পুঁজির ভূমিকা, ব্যক্তিগত মালিকানা—এই সবের সঙ্গে সমাজের যোগ বোঝায়। সমাজ অর্থে সামাজিক মানুষের উপর এদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচলিত আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রথম বিশ্লেষণ করেছিলেন এঙ্গেলস।

এঙ্গেলসের *আউটলাইনস অফ এ ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি* ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাধারণ সমালোচনার এক কাঠামো মাত্র, তবু এই রচনা মার্কসের কাছে অনেকটা পথনির্দেশকারী ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পুঁজির শাসনে সমাজের সঠিক চেহারা এঙ্গেলসই প্রথম তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এঙ্গেলসই মার্কসকে ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও রিকার্ডোর অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট করেছেন। এই সূত্রে স্মরণীয়, রিকার্ডোই প্রথম বলেছিলেন যে, পণ্যের মূল্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, শ্রমিকের শ্রমের মূল্য ও মুনাফা। এই তত্ত্বকে মার্কস আরও বিস্তৃত করেছিলেন। ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে মার্কস যথার্থই ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন যে প্রচলিত পণ্য উৎপাদনপ্রণালীর পরিবেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দুষ্ট প্রভাবে একদিন বিপ্লব জন্ম নেবে — আর এই বিপ্লবই ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে।

১৮৪৫-এর জানুয়ারিতে মার্কস পারি থেকে বিদায় নিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল *পবিত্র*

পরিবার— মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ রচনা। পারির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশের মধ্যে লেখা এই রচনাটি মূলত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

বাউয়ের একদা বামপন্থী শিষ্যদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হেগেলীয় বামপন্থার সঙ্গে বাউয়ের-এর যোগাযোগ শেষপর্যন্ত টিকে রইল না। যদিও বাউয়ের পরমভাবের সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাস না রেখে পরিবর্তন বা বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বাউয়ের কথিত বিপ্লব জনগণের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে না। বাউয়ের-এর মতে শুদ্ধ বুদ্ধি বা চেতনার জাগরণ সমাজে এই বিপ্লব আনবে, এর জন্য কোনও কার্যক্রমের, প্রচারের বা সচেতন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ চেতনার প্রভাব যেদিন মানুষের উপলব্ধিতে আসবে, সেই দিনই মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়ে সত্যিকারের বিপ্লবের জন্ম হবে।

বাউয়ের-এর সহযোগী ছিলেন তাঁর ভাইয়েরা—এডগার বাউয়ের ও এগবার্ট বাউয়ের। এর পর কয়েকটি নিবন্ধে বাউয়ের মার্কসকে কঠিন সমালোচনা করেন। মার্কস জবাব দিলেন *পবিত্র পরিবার* গ্রন্থে। ভ্রাতাসহ বাউয়ের পরিবারকে মার্কস ও এঙ্গেলস আখ্যা দিলেন : *পবিত্র পরিবার*। বাউয়ের - এর পুরো নাম ব্রুনো বাউয়ের—তাঁকে আখ্যা দিলেন ' সেন্ট ব্রুনো'।

হেগেলের দর্শনে ভাবের প্রাধান্য থাকলেও ভাবের সঙ্গে জগৎ অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। বাউয়ের ভাব-কে বস্তু বা জগৎ থেকে আলাদা করে দেখালেন। বাউয়ের বললেন ভাবনা বা চিন্তার প্রবাহ ইতিহাসের রূপান্তর ঘটায়—এ ক্ষেত্রে মানুষের সচেতন কোনও চেষ্টার প্রয়োজন নেই, এ প্রসঙ্গে শ্রেণীভেদের তত্ত্ব কেবল গোলমালই বাড়াবে। মার্কস দেখালেন বাউয়ের-এর চিন্তায় গোড়াতেই গলদ। বস্তু ও জগৎ থেকে ভাব-কে আলাদা করা যায় না। ভাব-কে আলাদা করে দেখার অর্থ হল ভাববাদে ফিরে যাওয়া—পক্ষান্তরে নতুন ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবনায় সাহায্য করা। এই সূত্রে বাউয়ের গোষ্ঠী 'পবিত্র পরিবার' আখ্যায় ভূষিত হতে পারে।

দুটি প্রধান বিষয় *পবিত্র পরিবার* থেকে পাওয়া যায়। প্রথম, হেগেলীয় ভাববাদের সুনিপুণ সমালোচনা। দ্বিতীয়, মার্কস-কথিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বলা চলে, 'পবিত্র পরিবার' রচনা থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিণত চিন্তার অগ্রগতি লক্ষণীয়।

মার্কসের সাংবাদিকতা জার্মান সরকারকে উত্যক্ত করে তুলেছিল, তাই জার্মান সরকারের চাপে ফরাসি সরকার মার্কসকে ফ্রান্স পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছিলেন। মার্কস এসে পৌঁছলেন ব্রুসেল্‌সে। কিছুদিন বাদে এঙ্গেলসও মিলিত হলেন মার্কসের সঙ্গে। দু'জনে একসঙ্গে একটা বড়ো কাজে হাত দিলেন —*জার্মান চিন্তাধারা* রচনায়। এ প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন, তৎকালীন জার্মান চিন্তাধারার আলোচনার ফলে এঙ্গেলস ও তিনি নিজেদের ভাববৈশিষ্ট্য ও চিন্তা সমষ্টি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক বিন্যাসে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই সূত্রে ফয়েরবাখ, বাউয়ের, ম্যাক্‌স স্টার্নার ও জার্মান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের আলোচনা প্রসঙ্গে জাগতিক নিয়মের জটিলতায় ইতিহাসের প্রগতি ও আর্থিক বিকাশের যে বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে লেখকদ্বয় দিয়েছেন তাকে বলা চলে মার্কসীয় চিন্তার প্রথম সামগ্রিক বিন্যাস।

জার্মান চিন্তাধারা-র প্রথম ভাগে রয়েছে ফয়েরবাখ-সম্পর্কিত আলোচনা। মানব ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা শুরু। এখানে দেখানো হয়েছে যে প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রভাব যেমন মানুষের উপর সক্রিয় মানুষও পক্ষান্তরে প্রকৃতি বা পরিবেশকে বদল করে নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের কাজে মানুষকে বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। মানুষের মুখের সামনে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তার প্রয়োজনীয় বস্তু জুগিয়ে দেয় না। এক এক যুগের এক এক ধরনের কলাকৌশলের প্রয়োগ বা বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞানে মানুষ জীবিকানির্বাহ করে থাকে—যথা, পাথরের ধারালো হাতিয়ার, লাঙল, কাঠের বা ধাতুর তাঁতযন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র। প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞান ও তৎসহ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। এগুলির ব্যবহারে মানুষ যেমন প্রকৃতি বা পরিবেশকে আয়ত্ত করতে পারে তেমনি পরিবেশের প্রভাবও মানুষকে গড়ে তোলে।

পরিবেশ মানুষকে ক্রমাগত উন্নত কলাকৌশলের সন্ধানে প্রেরণা দেয়—পরিবেশ ও মানুষ উভয়তই সক্রিয়। ফলে দেখা যায় প্রযুক্তিজ্ঞানের ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমশ নতুন শক্তি ও পণ্য উৎপাদনের হাতিয়ারের সন্ধান পাচ্ছে। এ দুয়ের যোগাযোগে সামাজিক বিন্যাসেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পণ্য উৎপাদনপ্রণালীর বদল হলে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেহারাও বদল হয়, নতুন শ্রম সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয় — ফলেই সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন এসে পড়ে। ফয়েরবাখের নিষ্ক্রিয় অমূর্ত মানুষের ধারণা মার্কসের হাতে পড়ে সক্রিয় সামাজিক মানুষের ধারণায় পরিণতি পেয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের শেষার্ধে মার্কস বিস্তৃত করেছেন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সমাজসম্পর্কের স্বরূপ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সামাজিক বিন্যাসের কারণ হল যুগোপযোগী উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সমাজসম্পর্কের অটুট বন্ধন। উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যে প্রাথমিক সম্পর্ক তাকেই মূলত সমাজের আর্থিক কাঠামো বলা চলে। পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থার ত্রিমাত্রিক বনিয়াদে রচিত সমাজের আর্থিক কাঠামো। এই আর্থিক কাঠামোর উপরেই সামাজিক সংবিধান, আইন, রাজনৈতিক সংগঠন নির্ভরশীল এবং এ-সব কিছুর ভেতর দিয়েই যুগোপযোগী বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটে। গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণে নেমেছেন। কার্ল গ্রুন, অটো লুনিং, হারমান পুটম্যান, মোজেস হেস, ম্যাক্স স্টার্নার — এই সব চিন্তাবিদদের চিন্তার অসংগতি তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

দুটি খণ্ড মিলিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস *জার্মান ভাবধারা* মার্কসীয় তত্ত্বের এক সম্পূর্ণ চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছে। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে মার্কসের প্রথম প্রতিষ্ঠা পারি-তে। ব্রুসেল্‌সে এসে মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই একসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমস্ত সূত্রের সন্ধান পেলেন—*জার্মান চিন্তাধারা*-য় তার সব কটিই বিধৃত হয়েছে।

ব্রুসেল্‌সে মার্কসের অবস্থিতি ছিল শর্তাধীন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শর্ত ছিল মার্কস বেলজিয়ান রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাবেন না। কিন্তু ব্রুসেল্‌সে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সুযোগ গড়ে উঠল। লন্ডন, পারি ও বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগের ভৌগোলিক সুবিধা থাকায় বহু পলাতক বিপ্লবী ব্রুসেল্‌সে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই সাম্যবাদী চিন্তায় দীক্ষিত। লন্ডনে, পারিতে ও ব্রুসেল্‌সে বিপ্লবী শ্রমিকদের কোনো কোনো সংগঠন তৈরি হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের সাম্যবাদী চিন্তার সমস্ত সূত্র আর মৌলিক তত্ত্বগুলি ততদিনে পরিণতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বাস্তব অবস্থার এই যোগাযোগ মার্কসের কাছে পরম কাম্য হয়ে উঠল — এর থেকেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংগঠনের চিন্তার উদয়।

মার্কসের কাজ হল বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সংগঠনগুলিকে একটি সংযোগে মিলিত করা। বিশেষ করে লন্ডনের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মার্কস যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। তাঁর নিজের উপলব্ধিগত তত্ত্বের বিস্তর আলোচনা নানান সমালোচনা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে লন্ডনে পাঠাতে লাগলেন। লণ্ডনের সংগঠন সুষ্ঠু রূপ নিল দি কম্যুনিস্ট লিগ নামে। মার্কসের একান্ত চেষ্টা সফল হল। কম্যুনিস্ট লিগের প্রথম কংগ্রেস আহূত হল লন্ডনে ১৮৪৭ সালের জুনে। দ্বিতীয় কংগ্রেস নভেম্বরে। সম্মেলনে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। তখনই মতবাদগত একটা তাত্ত্বিক খসড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল — যার ভিত্তিতে সংগঠনের আন্দোলন শুরু হতে পারে। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' (১৮৪৮) রচনার এটাই হল পশ্চাৎপট।

বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার বাস্তব চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস তাত্ত্বিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও দেখলেন। কেবলমাত্র কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নয়, আন্দোলন গড়ে তোলার বিভিন্ন চেষ্টার মধ্যেও অনেক ভুলচুক বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছিল, অথচ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ইয়োরোপের দেশে দেশে নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর আগ্রহ ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে,

শ্রমিক সংগঠনও তৈরি হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই নেতৃত্ব দেবার মতো ব্যক্তিদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে — যাঁরা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ও সংগঠন দুই-ই গড়ে তুলতে সক্রিয়, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে কোনও তত্ত্বই শেষপর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর যথাযথ হাতিয়ারে পরিণত হবে না। মার্কস দেখলেন এই সব বিচ্যুতি সম্পর্কে গোড়া থেকে কঠোর মনোভাব না নিলে কোনওদিনই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে না।

এই ধরনের বিচ্যুতি সম্পর্কে মার্কসের সঙ্গে প্রথম বিরোধ বাধল প্রুধোঁর। প্রুধোঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হল : *দারিদ্র্যের দর্শন*। তিনি সম্পত্তি ও দারিদ্র্যের বিরোধের মধ্যেই সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথা তুললেন : সম্পত্তি আসলে চৌর্যবৃত্তি। সামাজিক শ্রমবিভাগই শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমশ নিঃস্ব করে তুলছে। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সৎ ও অসৎ দুটি দিকই আছে। এই দুটি দিকের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। আসলে এই বিরোধের অবসান হবে সমন্বয়ের মধ্যে — এর ফলশ্রুতি হল বস্তু বা ঘটনার মধ্যে অসততার অবসান এবং সততা ও ন্যায়ের জোরালো প্রতিষ্ঠা। অতএব প্রুধোঁর আবেদন ন্যায়পরতন্ত্রতায় - ভ্রাতৃত্বের আদর্শে। যেন কোনও এক শুভ মুহূর্তে সামাজিক শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনস্ফীতি ঘটবে না।

প্রুধোঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কসের রচনা *দর্শনের দারিদ্র্য* (১৮৪৭)। সম্পত্তি অনুসারে সমাজকাঠামোর গঠন প্রুধোঁ যেভাবে দেখিয়েছিলেন মার্কসের কাছে তা স্বীকৃত তত্ত্ব। কিন্তু বিরোধী চেতনার সমন্বয় থেকে প্রগতির নিরঙ্কুশ ধারণায় মার্কস নির্ভরশীল নন; ইতিহাসের বিশেষ স্তরে সমাজবিন্যাসের পরিণতি থেকে সামাজিক সৎ ও অসতের উদ্ভব। যতক্ষম না সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ এক বিশেষ সামাজিক বিন্যাসের অন্তর্গত সৎ ও অসতের বিলোপ হতে পারে না। ধনতন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সমাজের নিকৃষ্ট দিকের পরিচয় বহন করে। শোষণ ও দারিদ্র্য যত বাড়তে থাকে, মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কার্যক্রম প্রখরতর হয়ে ওঠে। ফলে এই মধ্যবর্তী স্তরে সামাজিক বিরোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্রতর হয়ে সামাজিক সংকটের জন্ম দেয়। প্রুধোঁ যা ধরতে পারেন নি তা হল এই যে, ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিরোধে শ্রমিকশ্রেণীই ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই সমাজপরিবর্তনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, যে পরিবর্তনে পূর্বেকার বিরোধগুলি আর থাকে না — পুরোনো সামাজিক সৎ ও অসৎ-এর বিলুপ্তি ঘটে।

সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ জুড়ে শুরু হয়েছিল বিপ্লবের তাণ্ডব। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালির রাষ্ট্রাধিনায়কদের চরম একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের বিপ্লব সফলতার দুয়ারে, সিংহাসন ত্যাগ করে লুই ফিলিপের পলায়ন, জনবিক্ষোভের চাপে কিছুকালের জন্য জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সরকার টেকেনি—নতুন নির্বাচনে যাঁরা ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি সদস্য হয়ে এলেন তাঁরা আগের সরকারের শ্রমিক সহানুভূতি বজায় রাখতে পারলেন না। ফ্রান্সে অবশ্য একটা ব্যাপার ঘটল—তা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের সম্পূর্ণতা। এতকাল রাজতন্ত্র ও সামরিক তন্ত্রের চাপে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ ছিল। ১৮৪৮-এর বিপ্লব ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকাশের সব বাধা দূর করে দিল। বিপ্লবকালীন সময়ের কিছুদিন মার্কস পারিতে কাটালেন। এই সময়ের মার্চে মার্কস কম্যুনিস্ট লিগের সভাপতি (১৮৪৮) নির্বাচিত হলেন। জার্মানিতে তখন গণবিক্ষোভ বিপ্লবের আকার নিচ্ছে — মার্কসের পক্ষে জার্মানিতে প্রত্যাবর্তনের সুষ্ঠু সময়। কোলোন থেকে মার্কসের সম্পাদনায় *নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্* সাময়িক পত্র প্রকাশ পেল। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে এই নতুন পত্রিকা সমস্ত ইয়োরোপের গণ আন্দোলন পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠল। স্বভাবতই পত্রিকায় আয়ুষ্কাল বেশিদিন হয়নি। জার্মানি থেকে মার্কস বিতাড়িত হলেন। এবার লন্ডন প্রবাস। ফ্রান্সের বিপ্লবচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবার পর সমস্ত ইয়োরোপে চকিতে নেমে এল বিপ্লব-ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া।

এই ব্যর্থতার বিশ্লেষণ দিলেন মার্কস তাঁর 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' (১৮৫০) রচনায়। মার্কস বললেন ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের আগে সামাজিক শ্রেণীযুদ্ধের কালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সাফল্যলাভ করে না।

অবশ্য শ্রেণী হিসেবে স্বাধীন সামাজিক শক্তির অধিকারী হিসেবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটল। এর প্রাথমিক লাভ শ্রেণীসমাবেশের সক্রিয় চেষ্টা। দেখা গেল ফ্রান্সে একদা যারা বিপ্লবের অগ্রগামী স্তরে ছিল সেই মধ্যবিত্ত, ছোটখাট পুঁজিপতি, বিত্তবান কারিগর শ্রেণী বুর্জোয়াপক্ষে সামিল হয়ে যায় বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে। শ্রেণীসমাবেশের (পোলারাইজেশন) এই চরিত্র ও প্রক্রিয়া ফরাসি বিপ্লবের পর পরিষ্কার ধরা পড়ে। 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' রচনায় শ্রেণীসমাবেশের ও শ্রেণীবিভাগের তত্ত্বগত দিক মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

পুরোপুরি অর্থনীতি সংক্রান্ত মার্কসের প্রথম রচনা ১৮৪৪-এর *অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি*। কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগসূত্রে ও সামগ্রিক ব্যাখ্যায় সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের বাস্তব সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। এ সম্পর্কের মৌল রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মূলত প্রচলিত পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই মধ্যে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে সমাজে উৎপাদনশক্তির ক্রিয়াকলাপের সংগত প্রশ্নও বিবেচ্য। সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সঙ্গে উৎপাদনক্রিয়ার যে সম্পর্ক মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতিবিচার তারই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। প্রসঙ্গত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌল প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ কারণে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কসের অর্থনীতি চর্চায় একাগ্র মনোনিবেশ। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একনাগাড়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক পড়ে নিলেন —মন্তব্যসহ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে রাখলেন। তৎকালীন আর্থিক জগতের কাঠামো ও তার ইতিহাস, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ ও সমাজসম্পর্ক, সভ্যতার ঊষাকাল থেকে অর্থনীতির গতিপথ — সব কিছুই মার্কস আত্মস্থ করে নিলেন। এর ফল : পরের বছর মে মাসে বারশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি হল মার্কসের ভবিষ্যৎ মহাগ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া। এই খসড়াতেই মার্কসীয় অর্থনীতির সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব—মূল্যমানের নিয়ম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব—ব্যাখ্যাত হল। পরের বছর (১৮৫৯) তাঁর গবেষণায় কিছু অংশ প্রকাশ করলেন—প্রাথমিক অংশটুকুই—*এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি*। এই গ্রন্থেই প্রথম মার্কস তাঁর উপলব্ধিগত মূল্যমানের নিয়মের ব্যাখ্যা দিলেন।

আর এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের জন্য কাজ শুরু করলেন বছর দুই বাদে। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ দু বছরে ৪৮০০ পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের মোটামুটি এক পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল। মূল্যমান ও উদ্বৃত মূল্যের তত্ত্বের বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানও মার্কস নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগে বের করে আনলেন—যথা, গড়পড়তা লাভের নিয়ম, উৎপাদনের মূল্যনির্ণয়, ভূমিকর তত্ত্ব। এই সব তাত্ত্বিক প্রশ্নের সমাধানের ফলে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যমানের মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেল।

মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড বের হয় ১৮৬৭ সালে। বাকি দুটি খণ্ডের প্রকাশনার কাজ মার্কস সুষ্ঠুভাবে করে যেতে পারেননি। ইতিমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে থাকায় এবং অত্যধিক খাটুনির ফলে শারীরিক অসুস্থতার জন্যও *দাস ক্যাপিটাল*-এর বাকি দুটি খণ্ডের প্রকাশনা মার্কসের জীবিত কালে সম্ভব হয়নি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মার্কসের মৃত্যুর দু'বছর পরে এঙ্গেলসের চেষ্টায় ও উৎসাহে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৮৯৪-এ তৃতীয় খণ্ড।

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের অতুল সঞ্চয় থেকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উদ্ভব—এরই বিশ্লেষণ ও সামাজিক সম্পর্ক *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ডের প্রতিপাদ্য। পণ্যের সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ — বিশেষ করে একাধিক পণ্যের বিনিময়যোগ্য তুলনাত্মক সম্পর্ক যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই গড়ে ওঠে — তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিক্রয়যোগ্য পণ্য আসলে উদ্বৃত্ত মূল্যের বস্তুগত রূপ বা অর্থকর রূপ (যেখানে মূল্যের জন্য অর্থও

বিশেষরূপে পণ্য হিসেবে পরিগণিত), সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের উৎপাদনকারী শ্রম ও পণ্যরূপে পর্যবসিত হয়। উৎপাদনকারী শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সহযোগে বিনিময়ের মাধ্যমে যে মুনাফা বা বাড়তি আয় ঘটে তার ক্রমবিনিয়োগে ক্রমশ বর্ধিত হারে মুনাফারও স্ফীতি ঘটে। একটা স্পাইরাল ধর্মী চক্রাবর্তনে যথা, শ্রম-উৎপাদন-বাড়তি মুনাফা-বিনিয়োগ-শ্রম-উৎপাদন-এইভাবে বর্ধিত পুঁজির সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম।

ক্যাপিটাল-এর প্রথম ভাগে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রগতির ইতিহাস বর্ণিত আছে। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের বদল ও নতুন আর্থিক ব্যবস্থার প্রচলনে নতুন সম্পর্কের জন্মের কথাও আমরা জানতে পারি। এই নতুন সমাজসম্পর্কের সামগ্রিক চিত্র থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, আর পুঁজির মালিক উদ্বৃত্ত আয়কে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজিতে পরিণত করার যন্ত্রস্বরূপ।

কিন্তু এই অমানবিক সম্পর্কের অস্তিত্ব পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে চিরস্থায়ী নয় — নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের হাতিয়ার হিসেবে এই অমানবিক সমাজসম্পর্কের বদল ঘটাবে। সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার পরিবেশে এই বদল সম্ভব। সমাজদেহের এই মৌল পরিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়া মার্কসই বিবৃত করেছেন। অবশ্য মার্কসের আগে বিভিন্ন কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ আশ্রয় করে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন স্বর্গ গড়ে উঠেছিল। *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ড সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানের যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা দেয়।

ক্যাপিটাল-এর দ্বিতীয় খণ্ডের উপনাম : পুঁজির সঞ্চালনপ্রক্রিয়া-দি প্রসেস অফ সার্কুলেশন অফ ক্যাপিটাল। এ ক্ষেত্রে মার্কস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজির চক্রবৎ গতি বা আবর্তন, নিয়োজিত পুঁজির পণ্যে রূপান্তর ও পরিশেষে বাজারপদ্ধতির মধ্যে বিনিময়ব্যবস্থায় বিভিন্ন পণ্যে উৎপাদন ও মূল্যমানের ভারসাম্যের অবস্থায় সরল পুনরুৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের প্রশ্নও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব নেই। ভারসাম্যের অবস্থা থেকে তার নিয়মিত বিচ্যুতি, কেননা ক্রমাগত উদ্বৃত্ত মূল্য আকর্ষণের পরিণামে উৎপাদনশক্তি একসময়ে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, তখনই অর্থনৈতিক সংকটের অবস্থা। আর সব সংকটই একটি মাত্র পরিণতির প্রতি দিকনির্দেশ করে — ধনতন্ত্রের যা নিয়তি।

ক্যাপিটাল-এর তৃতীয় খণ্ডের উপ-নাম: পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র। এখানে মার্কস প্রসঙ্গত বিশেষ বিশেষ মূল্যমানের প্রশ্ন, পুঁজির মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভাজন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার কথা তুলেছেন এবং সুদ ও খাজনার প্রশ্নে আগের দুখণ্ডের আলোচনা থেকে আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় এসেছেন। প্রথম খণ্ডে আলোচনার প্রাধান্য ছিল উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের উপর — মার্কস যার গাণিতিক রূপ দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্য ও মজুরি ব্যয়ের অনুপাত হিসেবে। তৃতীয় খণ্ডে এই প্রাধান্য এসেছে মুনাফার হারের উপর।

যে সময়ে মার্কস 'ক্যাপিটালে'র জন্য তথ্যসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন মোটামুটি সেই কালে ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত তিনি 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন'-এ নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে যথার্থ মার্কসীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য তাতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, চীন, স্পেন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলির প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ এই সব লেখায় লক্ষ করা যায়। এ সময়ে ব্রিটেনে 'চার্টিস্ট' আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ছিল — আর ফ্রান্সের লুই বোনাপার্টের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি বেশ সচেষ্ট ছিলেন।

শুধু প্রবন্ধ রচনায় নয়, মার্কস সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ও সংগঠনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 'আন্তর্জাতিকে'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মার্কসই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক। আন্তর্জাতিকের সমস্ত দলিল ও ইস্তাহার মার্কসেরই রচনা।

১৮৭১-এর ১৮ মার্চ পারি শহরে কমিউনের জন্ম—বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর এই অভিনব ভূমিকায় পৃথিবী চমকিত হল। মার্কস লন্ডনে বসে এই কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন এবং নেতাদের সঙ্গে তাঁর গুপ্ত যোগাযোগ গড়ে উঠল। মার্কসের নির্দেশাদি যথাস্থানে পৌঁছাতে লাগল। তবু কমিউনের পতন রোধ করা গেল না। এই সব ইতিহাস বিশ্লেষিত হল ১৮৭১-এ রচিত *ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ* গ্রন্থে। মার্কস জানালেন এই প্রথম বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় চেষ্টায় ও নেতৃত্বে 'নির্বিত্তের রাষ্ট্র' পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেল। অবশ্য এক পূর্ববর্তী গ্রন্থে *এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট* (১৮৫২)-এ পুরোনো শাসনযন্ত্র ধ্বংস করে শ্রমিকরাষ্ট্রে নতুন শাসনব্যবস্থার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা মার্কস দিয়েছিলেন।

কমিউনের অভিজ্ঞতায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগমূল্য যাচাই হয়ে গেল। আরও নতুন তাত্ত্বিক আলোকে এবার মার্কস 'প্রলেতারীয় ডিক্টেটরশিপ-এর চরিত্র বিশ্লেষণ·তৎপর হলেন। তাঁর বক্তব্য হল, একমাত্র কমিউনের রাষ্ট্রিক কাঠামোয় শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক মুক্তি সম্ভব।

'আন্তর্জাতিক'-এর ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে নির্বিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব পার্টির ভূমিকা বা সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপে জোর পড়ল। পারি কমিউনের ব্যর্থতায় মার্কস এই শিক্ষা নিলেন: ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের দুর্বলতাই শত্রুপক্ষকে সবল করেছিল। জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনে প্রধান বাধা লাসালীয় রাজনীতি। শ্রমিক রাজনীতির বিভিন্ন বিচ্যুতি লাসালীয় তত্ত্বের ছত্রছায়ায় সম্মিলিত হল। গোথা অঞ্চলে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতির সম্মেলন মার্কস 'গোথা কার্যক্রমের সমালোচনা' (১৮৭৫)-য় সমালোচিত। লাসালের ধারণায় শ্রেণীযুদ্ধ, ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবান্তর, বরং রাজশক্তির সহানুভূতির সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সম্ভব। এই অবৈজ্ঞানিক ও সুবিধাবাদী রাজনীতির চেহারা মার্কস এখানে উন্মোচিত করলেন— দূরায়ত ভবিষ্যতের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তিনি সাম্যবাদী সমাজের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিলেন।

নিদারুণ কায়িক ও মানসিক শ্রমের আধিক্যে মার্কসের দেহ ভেঙে পড়ে, ১৮৭৪ থেকে তা প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছায়। মাঝে মাঝে স্থানপরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠত। জেনি মার্কসের মৃত্যুতে (১৮৮১) প্রবল আঘাত এল। শেষপর্যন্ত ১৮৮৩-র ৪ মার্চ 'একালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের চিন্তা রুদ্ধ হল।'

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব

সংস্কৃতে কথা আছে যে অজ্ঞানতিমিরে যে অন্ধ, জ্ঞানাঞ্জনের শলাকা দিয়ে তার চক্ষু উন্মীলিত যিনি করতে পারেন তিনিই হলেন গুরু। কাল মার্কসকে যদি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গুরু বলা হয় তো অত্যুক্তি ঘটে না। কারণ ইতিহাসের ধারা বুঝতে হলে, আজকের দুনিয়াকে জানতে হলে, সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হলে কার্ল মার্কস যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার অঞ্জন চোখে না মাখলে বাস্তবিকই চোখ খোলে না, ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোনও সংগতি, কোনও বিধি লক্ষ করা যায় না। আমাদের দেশে গুরুবাদ আর কর্তাভজামি এমন কটু হয়ে প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে যে 'গুরু' শব্দটি ব্যবহার করতে সংকোচ আসে। তবে গুরুবাদ বলে যে বস্তু এদেশে প্রচলিত তা থেকে মার্কসবাদের প্রভেদ একেবারে চূড়ান্ত। শিষ্যদের কাণ্ডকারখানা দেখে মার্কস একবার উত্যক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'কী বাঁচোয়া যে আমি 'মার্কসবাদী' নই।' আন্দোলনের শৃঙ্খলারক্ষার নামে (কখনও কতকটা সংগত কারণে, কখনও বা অসংগতভাবে) মার্কসবাদের বিশুদ্ধ প্রয়োগ নিয়ে গোঁড়ামির যে আতিশয্য বহুবার দেখা দিয়েছে তা একেবারেই মার্কসের অভিপ্রেত ছিল না। মার্কসকে গুরু বলার অর্থ তাই স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে তাঁর চিন্তা ও কর্মের আক্ষরিক ব্যাখ্যা নয়। প্রায় যেন পাখিপড়া বুলি আউড়ে যাওয়া নয়। মার্কসের শিক্ষা চিন্তাকে মুক্ত করেছে, আপ্তবাক্যের চাপে তার শ্বাসরোধ ঘটায়নি, শ্রেণীসভ্যতার সহস্র সংস্কারের জটিল জাল থেকে নিস্তার এনে দিয়েছে। অধিকাংশ পাঠকের কাছে ইতিহাস হল ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা। রাজারাজড়ার কীর্তিকলাপের আর যুদ্ধবিগ্রহের ফিরিস্তি, এই যেন ইতিহাসের উপজীব্য। ছাত্রদের পক্ষ থেকে সাধারণ ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য সমাপ্ত করা হয় কোনওক্রমে কতকগুলো অবাঞ্ছিত তথ্য কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গার করে দেওয়া। শুধু ছাত্রদের কথাই বা কেন, গিবন্-এর মতো ঐতিহাসিক-শিরোমণি একবার সখেদে বলেছিলেন যে ইতিহাস যেন মানুষের অপরাধ আর নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যের তালিকা। কবি শেলি বর্তমানের ক্লেদ দূর করে ভবিষ্যসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তিনিও বলেছিলে : 'অতীতকে নিয়ে পৃথিবী ক্লান্ত; সে-অতীত হয় মরুক নয় একেবারে বিশ্রাম নিক।' আধুনিককালে মার্কিন দেশের বিখ্যাত শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড ইতিহাসকে বলেছিলেন 'বুজরুকি' ('bunk')। এ-সব কথা যে বলা হয়েছে তার মূল হেতু এই যে ইতিহাসকে ভাবা হয়ে এসেছে শুধু কতকগুলো তথ্যের সমষ্টি, যে তথ্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজা নিরর্থক, আর যা নাকি নিছক কতগুলি ঘটনা। আবার অনেকে ভেবেছেন যে সবকিছু ঘটেছে ঈশ্বরনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, যার অর্থভেদ মানুষের অসাধ্য। কেউ কেউ বলেছেন যে মাঝে মাঝে কয়েকজন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কিংবা ব্যাপারটাকে শুধু আরও ধোঁয়াটে করে অনেকে গম্ভীরভাবে বলেছেন যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগধর্ম ইতিহাসকে পরিচালনা করেছে, অথচ এক যুগের 'ধর্ম' আর এক যুগের 'ধর্ম' থেকে তফাত কেন তা বোঝাতে পারেননি। এমন অবস্থায় ইতিহাসকে বুজরুকি অপবাদ যে শুনতে হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কার্ল মার্কস ইতিহাসকে এই পণ্ডিতি বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর আজীবন সহচর ও সহকর্মী এঙ্গেলস তাঁর সমাধিকালে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে প্রকৃতিজগতে ডারউইন যেমন বিবর্তনের বিধান আবিষ্কার করেন, তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব হল কার্ল

মার্কসের। তিনি এই অত্যন্ত সহজ অথচ একেবারে সার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বাঁচতে হলে মানুষকে সবচেয়ে আগে গ্রাসাচ্ছাদন আর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হয় — রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তা না হলে সম্ভব হয় না। তাই মানুষ কীভাবে উৎপাদন করছে, আর উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে কী সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, এই হল এক একটা যুগের ইতিহাসের মূল কথা। যুগে যুগে মানুষ কীভাবে কাজ করে এসেছে, বেঁচে থাকার জন্য কীভাবে উৎপাদন চালিয়ে এসেছে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কীরকম ছিল, এসব জানলে তবেই আমরা তাদের তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিধি এবং চিন্তাধারা কী ছিল এবং কেন ছিল তা বোঝার সম্ভাবনা রাখব। মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব ধারাকে অনুধাবন করলে তবেই বুঝব যে বারবার কেন যুগ বদলেছে, মন্বন্তরে মনু চলে গেছে—পরিবর্তন কেন আসে এবং কেমন করে সমাজের মানুষই ঘটাতে পারে তা জানতে পারব, সমাজবিকাশের মধ্যে যে বিধান কাজ করে চলেছে তার সন্ধান পাব।

সতত সঞ্চারমান এই বিশ্বে কিছুই অটল অবস্থায় থাকে না, সর্বদাই অদলবদল চলছে। কয়েকশো কোটি বছর আগে পৃথিবীটা ছিল প্রকাণ্ড আগুনের গোলার মতো। জীবন বা জীবনের সম্ভাবনা পর্যন্ত তখনও দেখা দেয়নি। বহু কোটি বছর পূর্বে প্রথম পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটল। কয়েক কোটি বছর আগে এখানে প্রচুর গাছপালা আর জলেস্থলে নানারকমের প্রাণী দেখা গেল। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে সেদিনকার পৃথিবীর পার্থক্য প্রচুর, কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে বহুযুগ ধরে অবিরাম পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর বর্তমান চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

যুগযুগব্যাপী এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে বা দৈবক্রমে ঘটেনি, হঠাৎ বেখাপ্পা ধরনে ঘটেনি। একটা নিয়মিত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিধান অনুসারেই তা হয়েছে। আমরা যদি শুধু আজকের জীবন নিয়েই আলোচনা করি তো সেই বিধানের খোঁজ পাব না। তাই দেখা যায় যে যতদিন পৃথিবীর আদিযুগের খবর অজানা ছিল, যতদিন কোটি কোটি বছর আগেকার প্রাণী ও গাছগাছড়ার দেহাবশেষ ভূগর্ভ থেকে বার করা হয়নি, ততদিন বিদ্বান ব্যক্তিরাও বিশ্বাস করতেন যে হঠাৎ একদিন জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল আর গোড়া থেকেই তার চেহারা ছিল মোটামুটি আজকেরই মতোন।

সেদিন পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক রূপকথা প্রচলিত ছিল। একজন মস্ত পাদরি বলেছিলেন—আর প্রায় সবাই সে কথায় সায় দিতেন—যে খ্রিস্টজন্মের ৪০০৪ বছর আগে হঠাৎ এক মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ সময়ে ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে বসেন! আজ যিনি সামান্য শিক্ষাও পেয়েছেন, তিনি একে আজগুবি আর গাঁজাখুরি বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন।

পণ্ডিত-অপণ্ডিত সবাই যে আগে একথা মানতেন, তার কারণ শুধু যথাযথ জ্ঞানের অভাবেই নয়। সমাজে যাদের কর্তৃত্ব, তাদের পক্ষে এরূপ ধারণা খুবই মনঃপূত ছিল। জগৎ যদি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে তাহলে মানুষের সমাজ এবং ভবিতব্য নিশ্চয়ই তাই। আজ যে ব্যবস্থা চলছে, ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদের মতো যেসব প্রথা প্রচলিত, তা আগেও ছিল, পরেও থাকবে, বনিয়াদি কোনও অদলবদল সংসারে ঘটে না, ঘটেনি, ঘটবে না—একথা বিশ্বাস করা এবং অপরকে বিশ্বাস করানো সমাজপতিদের পক্ষে একান্ত মূল্যবান তো বটেই।

ভূতত্ত্ব প্রাণিবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব প্রভৃতির প্রসারের ফলে একদিন আকস্মিকভাবে অপরিবর্তনীয় জগৎসৃষ্টির রূপকথা ভেঙে গেছে। আর যে-রূপকথা বলে যে সমাজ আজ যেমন আছে, আগেও মোটের উপর তেমনই ছিল, সুতরাং পরেও তাই থাকবে, সেই রূপকথার বিনাশ ঘটাচ্ছে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব। মানুষ আর মানুষের সমাজ যুগযুগ ধরে বদলে আসছে, ভবিষ্যতেও বদলে চলবে — এই হল অমোঘ নিয়ম। ভাঙাগড়ার ইতিহাস হল সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস। তাই ইতিহাস দিতে পারে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস, সহায়তা করতে পারে ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জনে। ইতিহাস বিনা

তাই রাষ্ট্রনীতি পঙ্গু। ইতিহাসবোধ না থাকলে অচেতন অবস্থায় বহু সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাই যেন অন্ধকারে যথাসাধ্য হাতড়ে বেড়াতে হবে।

বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বলে এসেছেন এবং আজও বলেন যে ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা, চিন্তা, নীতি প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ বিশেষ যুগে। অর্থাৎ এক-একটি নীতি বা ধারা এক একটি যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে মার্কস লেখেন :

> দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক যে (ইয়োরোপে) একাদশ শতাব্দীতে কর্তৃত্বের নীতি বলবৎ ছিল, ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিকে। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুসারে বলতে হবে যে শতাব্দীকে নীতিই নির্দিষ্ট করেছিল, শতাব্দী নীতিকে নির্দিষ্ট করেনি। অর্থাৎ নীতিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাস নীতিকে সৃষ্টি করে না। তবে যদি আমরা নীতি (principle) এবং ইতিহাস উভয়কেই বাঁচাবার জন্য প্রশ্ন করি যে একাদশ শতাব্দীতে এক নীতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্য এক নীতি আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন, আর উভয় নীতিই বা একই শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেনি কেন, তাহলে বাধ্য হয়ে তখনকার খুঁটিনাটি খবর আমাদের খুঁজতে হবে, জানতে হবে একাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ কেমন ছিল, তাদের সামাজিক জীবনের চাহিদা কী কী ছিল, তাদের উৎপাদনশক্তি কেমন ছিল, উৎপাদনের পদ্ধতিই বা তাদের কীরূপ ছিল, কোন কোন কাঁচামাল নিয়ে তারা উৎপাদন চালাত, আর অবশেষে জানতে হবে তখন মানুষে মানুষে সম্পর্ক কী ছিল...কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা এভাবে মানুষকে তার নিজস্ব ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সেই ইতিহাসে অভিনেতা রূপে দেখি, তখনই আমরা যেন এক চক্র ঘুরে ঠিক আসল রওনা হওয়ার জায়গায় ফেরৎ পৌঁছে যাই, কারণ তখন আমরা যে-শাশ্বত নীতি নিয়ে খোঁজ আরম্ভ করেছিলাম তাকে পথে ফেলে দিয়ে এসেছি।

এখনও শোনা যায় যে এক-একটি নীতি বা ভাবধারা বা চিন্তার প্রকাশ এক একটি যুগকে শুধু চিহ্নিত করা নয় তাকে প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি করেছে — যেমন কোনও একটি যুগ হল ধর্মবিশ্বাসের কিংবা যুক্তিবাদের যুগ। আমাদের দেশে সুপরিচিত ইংরেজ ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ন একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইয়োরোপের তিনশো বছরের ইতিহাসে মূল বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে, এবং গর্বভরে জানিয়েছিলেন যে ওই যুগে তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ড চারবার ইয়োরোপকে বাঁচিয়েছে — স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই এবং নেপোলিয়ন, আর জার্মানির কাইজার উইলিয়ামের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ইতিহাস আলোচনায় এ-ধরনের গুরুগম্ভীর অথচ সত্যই হাস্যকর কথা পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা গিয়েছে। এই অবান্তর বাক্‌বিলাস থেকে আর যাই জানা যাক, ইতিহাসের মর্মবস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায়। তথ্য সংগ্রাহকদের চিন্তায় এই যে তারল্য, মার্কস তাকে কশাঘাত করেছেন। ইতিহাসের প্রকৃতি অনুধাবন করে যে প্রতীতি তাঁর এসেছিল তা হল এই যে যুগে যুগে মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থার ছাপ পড়েছে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার আদর্শ, তার ধ্যানধারণার উপর। চিন্তা কর্মকে নির্ণীত করে না, কর্মই চিন্তাকে নির্ণীত করে, চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ মনীষীদের প্রতি মার্কস প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, কিন্তু ইতিহাসবিষয়ে তাঁদের শৈথিল্য মার্জনা করতে পারেননি। এঙ্গেলস একবার কৌতুক করে লেখেন যে এইসব বিরাট পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন মনে হয় যে যদি ইংল্যাণ্ড একাদশ শতাব্দীতে 'সিংহহৃদয়' রাজা রিচর্ড একটু অর্থনীতির খোঁজ রাখতেন তাহলে ৬০০ বছরের বিড়ম্বনা এড়ানো যেত, কারণ রিচর্ড তাহলে আর খ্রিস্টানদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (ক্রুসেডস) সময় নষ্ট না করে দেশে দেশে স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন, আর ইয়োরোপ স্বস্তিতে থাকত।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার-এর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে : 'আজ পর্যন্ত মানুষের বহুবিধ সমাজ দেখা দিয়েছে এবং তাদের সকলেরই ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।' পাদটিকায় এঙ্গেলস জানিয়েছেন যে এখানে ইতিহাস বলতে বোঝাচ্ছে 'লিখিত ইতিহাস', কারণ ১৮৪৭-৪৮ সালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃত্তান্ত খুবই অস্পষ্ট ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল তখনই, যখন মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন উপভোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। তখনই শ্রেণীবিভাগ সমাজে প্রথম দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের কাহিনি, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের বিবরণ আরম্ভ হল। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতোই রাষ্ট্র স্বয়ম্ভু, সনাতন, নিত্যস্থায়ী কিছু নয়। সমাজপতিরা জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্তৃত্ব চালু রাখার হাতিয়ার হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। তখনই মানুষের যে-ইতিহাস আমরা মোটামুটি জানি তার সূচনা হল, আর তখন থেকেই নানা প্রকরণে শ্রেণীসংগ্রামেরও বিরতি নেই।

অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার পর মানুষকে বহু লক্ষ বছর ধরে জানোয়ারদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, প্রকৃতি-জগতের প্রতিকূলতাকে প্রশমিত করতে হয়েছে। এ-কাজ মানুষ কোনও বিশেষ অধ্যাত্মগুণের অধিকারী বলে করেনি; নিছক বাঁচার তাগিদেই তাকে ক্রমাগত লড়াই করে যেতে হয়েছে। এই লড়াইয়ের ফলেই মানুষ উৎপাদন করতে শিখেছে — একদা যে শুধু গাছের ফল আর জানোয়ারের কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত, সেই মানুষ ক্রমে ভূগর্ভ থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে, আগুনের ব্যবহার জেনেছে, শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে নিস্তার খুঁজতে গিয়ে বহু পরীক্ষার পর ঘর বানাতে পেরেছে, পরনের কাপড় তৈরি করেছে, সেই মানুষই শিকারের উদ্দেশ্যে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে কয়েক লক্ষ বছরের চেষ্টার পর অন্য ধাতুর সন্ধান পেয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের যে-সংগ্রামের বিবরণ মনোমুগ্ধকর ; তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও এখানে দেওয়ার চেষ্টা সম্ভব নয়। শুধু বলা দরকার যে বাঁচার লড়াই চালাতে গিয়েই সভ্যতার জন্ম হয়েছে ; আদিম শিল্পে — যেমন গুহাগাত্রে ছবি কিংবা বহুজনের মিলিত নৃত্যে — ঠিক সেই বাস্তব জীবনেরই রূপ আমরা দেখি। 'অমৃতের পুত্র' হয়ে জন্মে মানুষ যে অকস্মাৎ ভগবৎকৃপায় সভ্যতার ইমারৎ বানাতে লেগেছিল তা একেবারেই নয়। খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে যে প্রথমে আবির্ভূত হল বাক্য (In the beginning was the Word)— অনেকটা হিন্দু চিন্তায় ' ওঁ ' শব্দেরই মতো। কিন্তু আসলে বাক্য নয় কার্য—নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছে। জীবন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই একান্ত সংকীর্ণ ও বিশিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী, ক্রমশবিরল আদিম গোষ্ঠী ব্যতিরেকে সর্বত্র উৎপাদনপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উৎপাদনে উন্নতির মূল্যও মানুষকে দিতে হয়েছে প্রচণ্ড। আদিম সমাজে রাষ্ট্র ছিল না, দণ্ড ছিল না, জুলুম-জবরদস্তির অধিকার কয়েকজনের হাতে ন্যস্ত ছিল না, কতকটা অভ্যাসের বশে এবং সম্মানী ব্যক্তিদের প্রভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন একজনের পরিশ্রম-ফল অপরের পক্ষে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন সেই অতিরিক্ত উৎপাদন গ্রাস করল কিছু লোক যারা হল সমাজপতি, যারা পরশ্রমভোগী হয়ে নানা কৌশলে নিজেদের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করতে লাগল। এই সময় থেকেই দাসপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, আর তখন থেকেই চলে এসেছে শ্রেণীকর্তৃত্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব। দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা, জায়গিরদারি, জমিদারি, পুঁজিদারি—সকল ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য হল যে সমগ্র জনতার তুলনায় নিতান্ত অল্পসংখ্যকের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে; আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের মুখোশ এঁটেও শ্রেণীশাসনের প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি।

গ্রিসের মহামনীষী প্লেটো ও অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে দাসপ্রথা একান্ত স্বাভাবিক, প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মতোই অকাট্য। তৎকালীন সভ্যতার পিলসুজ হয়ে ছিল দাসের দল, উপরে জ্বলত

সভ্যতার প্রদীপ আর তারই ঠিক নীচে অন্ধকারে দাসেরা মেহনতের জোরে সেই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে ক্ষীণ কবিকণ্ঠে দাসপ্রথা নিন্দিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সংগঠনের পথে অপার বাধা সত্ত্বেও দাসেরা বারবার অভ্যুত্থান করেছিল বলেই ক্রমে তা অবলুপ্ত হয়েছিল। মহানুভবদের করুণায় তা ঘটেনি, ঘটেছে কঠোর অকরুণ শ্রেণী-সংঘাতের ফলে। অধিকারীশ্রেণী যখন বুঝল যে আগেকার কায়দায় দাসদের পদানত রাখা আর চলে না তখনই সে-প্রথা রদ হতে লাগল। আজও এমন অঞ্চল আছে যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম ওই পর্যায়ে উঠতে পারেনি বলে দাসপ্রথাও বহাল আছে।

দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসপ্রথার বিবর্তন একটা বিপ্লব বটে, কিন্তু তখনও শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটতে বহু বিলম্ব— মাত্র শোষণের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তখন সমাজে সবচে শক্তিশালী হল জায়গিরদার-জমিদার গোষ্ঠী; রাজাকে পর্যন্ত তাদের সহায়তা ও সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হল; ধর্মযাজকরা মঠ বা গির্জার সংলগ্ন জমির উপর দখল নিয়ে বসল। দেশে দেশে সমান্ততন্ত্রের চেহারা কিছুটা পৃথক হলেও সর্বত্র তখন গ্রাম্যজীবনের ছাপ ছিল বেশি, কৃষিকর্মই প্রধান বৃত্তি। মুষ্টিমেয় শহরবাসীর চাহিদার জন্য, রাজা এবং পারিষদদের বিলাসব্যসনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য, ছোট ছোট কারখানা কিছু ছিল। ক্রমশ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের গুরুত্ব বাড়তে লাগল, তবে জীবনের গ্রন্থি বাঁধা ছিল গ্রামের সঙ্গে শহরগুলো কিছুটা যেন বেখাপ্পা অবস্থায় রয়ে গেল। সামন্ততান্ত্রিক যুগের পূর্বেও অবশ্য দেশে দেশে বাণিজ্যের বহু দৃষ্টান্ত আছে; প্রাচীন ভারতবর্ষ তো পশ্চিম এশিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যাবসা করত। কিন্তু 'ফিউডল' (সামন্ত্রতান্ত্রিক) যুগের শেষ দিকে বাণিজ্যের প্রসার ইয়োরোপের শহরগুলিতে নতুন এক স্তরে উপনীত হল। অজ্ঞাতপূর্ব এক সামাজিক শ্রেণীর তখন উদ্ভব হল যারা 'বুর্জোয়া' ('নগরবাসী'), যারা জায়গিরদারি ব্যবস্থায় বাণিজ্যের ক্ষতি লক্ষ করে প্রায়ই জায়গিরদারদের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত এবং কথঞ্চিৎ বিপন্ন রাজাকে সাহায্য করল, নিজস্ব অধিকার আদায় করল, আর চেষ্টা করল যাতে গোটা দেশে একধরনের শাসন স্থাপিত হয়, ব্যাবসার মাল লেনদেন করতে গিয়ে নানান জমিদারের এলাকায় নানাবিধ শুল্ক না দিতে হয়, আর দরকারমতো গ্রামাঞ্চল থেকে কারিগর জোগাড় করা যায়, হরেক রকম খাজনা, ভেট, বেগারি, মাঝে মাঝে জমিদারের হুকুমে তার হয়ে যুদ্ধে যাওয়া ইত্যাদি দায় থেকে নিস্তার পাবে। শহর আর বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে আর খুব বেশিদিন সামন্ত্রতন্ত্র টিকবে না।

মুসলমানদের দখল থেকে খ্রিস্টান তীর্থগুলোকে উদ্ধার করার যে লড়াই বহুদিন ধরে চলছিল (ক্রুসেড্স) তার টান শুধু ধর্মের নয়, অর্থেরও। এর আনুষঙ্গিক ফল হল বাণিজ্যের বৃদ্ধি, এশিয়ার ঐশ্বর্য দেখে ইয়োরোপের বিস্ময়, আর কিছু পরে অগাধ দৌলতের দেশ বলে বিখ্যাত ভারতবর্ষে পৌঁছাবার জলপথ খুঁজতে গিয়ে কলম্বাস করলেন আমেরিকা আবিষ্কার, আর দুশো বছর ধরে বহু নৌঅভিযান চলল। ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ নবাবিষ্কৃত দেশগুলোকে দুই ভক্ত দেশ স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিলেই ইংল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি খুব খাপ্পা হয়ে ওঠে, পোপকে অমান্য করে প্রটেস্টান্ট হওয়ার একটা বড় কারণ হল তাই। যাই হোক, অর্থনীতির ধাত আর উৎপাদনপদ্ধতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বদলাতে লাগল, যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলছে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে। টিউডর শাসনের যুগে (১৪৮৫-১৬০৩) পশম আর পশমি দ্রব্যের ব্যবসা খুবই লাভজনক হওয়ায় চাষের জমি থেকে চাষিকে খেদিয়ে মেষপালনের বন্দোবস্ত হয়, মস্ত বড় এলাকা (enclosure) ঘিরে একটা রাখাল রাখলেই কাজ চলত বলে চাষিদের উৎখাত করা হল, তারা সর্বস্বান্ত হয়ে বেকারের ভিড় বাড়ালো শহরে, সেখানে 'ভবঘুরে' অপরাধে তাদের বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হল — মানবপ্রেমিক টমাস মূর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে তাই লিখলেন : 'মানুষকে ভেড়ার দল গিলে খাচ্ছে।' এই ব্যবসা জাঁকিয়ে চালাবার জন্য ক্যাথলিক গির্জা আর মঠগুলোর বিপুল ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল, রাজাকে যারা এ কাজে

সাহায্য করেছিল তাদের মধ্যে এই সম্পত্তি বণ্টন করা হল, নতুন এক ধনবান সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। টিউডরের পর স্টুয়ার্ট যুগে (১৬০৩-৮৮) বাণিজ্য এবং তৎসম্পর্কিত পেশা থেকে যাদের উপার্জন তারা রাজা এবং তাঁর অভিজাত বন্ধুদের হাত থেকে দেশশাসন এবং প্রধানত বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে গিয়ে যে লড়াই চালায় (১৬৪২-৬০), তাতেই রাজা প্রথম চার্লস-এর প্রাণ যায়, পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ে। মধ্যযুগে, যখন সামন্ততন্ত্র ছিল প্রধান, তখন রাষ্ট্রশাসনবিষয়ে যাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না, সেই শ্রেণীই এসে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

এর চেয়ে বনিয়াদি ঘটনা হল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯৫), যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল কিছুকাল আগে থেকে। ১৭৬০ সাল নাগাদ শিল্পে, উৎপাদনপদ্ধতিতে বাষ্পায়ন ইত্যাদি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ আরম্ভ হল, উৎপাদনের পরিমাণ যন্ত্রের সহায়তায় পূর্বের তুলনায় অভাবনীয় ধরনে বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে পশ্চিমের বহু জাতির বণিক ও নাবিক মিলে এশিয়ায় (ভারত ও অন্যত্র) এবং আমেরিকায় হাজির হয়ে সেখানকার দৌলত লুঠ করে আনতে পেরেছিল বলে বড় বড় কারখানা ফাঁদার পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকাও ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠীদের হাতে মজুদ ছিল। এ জন্যই যে বাষ্পযান সম্বন্ধে দু-হাজার বছর পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেনি, সেই বাষ্পযানের কদর হল। লোভী ধনবানেরা চাষির জমি কেড়ে তাকে উৎখাত করার ফলে একদিকে পেটের দায়ে বহু লোক মজুরি খুঁজছিল, আর অন্য দিকে নানা দেশে বাণিজ্য করে এবং সওদাগরের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রথম ধাপ পার হয়ে সেখানকার টাকা আর কাঁচামাল শ্রেষ্ঠীরা ইয়োরোপে চালান দিচ্ছিল বলে শিল্পবিপ্লব হল, ঘটল ধনিকের আবির্ভাব, প্রবর্তিত হল বুর্জোয়া যুগ, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটল। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে আছে কার্ল মার্কসের অবিস্মরণীয় উক্তি : 'টাকা দুনিয়ায় প্রথম আসে তার গালে জন্মসময়ের রক্তের ছাপ নিয়ে, কিন্তু পুঁজি যখন এসে হাজির হয় তখন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।' সেই পুঁজির চেহারা যে কত বীভৎস আর অমানুষিক হতে পারে তা যারা আজ অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার হুমকি দিয়ে গোটা দুনিয়াটা কব্জা করে রেখে নিজের মুনাফার পাহাড়কে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে চায়, যারা ভিয়েতনামের অকুতোভয় মুক্তিকামনাকে পরাজিত করার জন্য অমানুষিকতার চূড়ান্ত করতে পশ্চাৎপদ নয়, তাদের দিকে নজর দিলেই জানা যাবে।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার-এ ঘোষিত হয়েছিল :

> আজ পর্যন্ত মানুষের যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাসগণ, অভিজাত ও সাধারণ লোক, মধ্যযুগের 'গিল্ড' (কারিগর-সংস্থা) প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ও তাদের মেহনতকারি কর্মচারীরা, এক কথায় প্রতি যুগের অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদা পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে আবার কখনও মুখোমুখি হয়ে।...'ফিউডল' সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিরোধ স্তব্ধ হয়ে যায়নি। নতুন সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন ব্যবস্থা। পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে শ্রেণীসংগ্রাম এখন সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটো বিশাল শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট (সর্বহারা) এই দুই বিরাট শ্রেণী সোজাসুজি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্কসবাদ লক্ষ করেছে যে এক একটি যুগে উৎপাদনের যে পদ্ধতি প্রচলিত, তারই আনুষঙ্গিক রূপে উৎপাদনের ফলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মানুষের পরস্পর সম্পর্কের বিষম

অসংগতি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া যুগের উৎপাদনপদ্ধতি বিজ্ঞানের কল্যাণে এমনই শক্তিশালী যে উৎপাদন ফল সকল মানুষের জীবনে স্বস্তি আনবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বুর্জোয়া যুগে উৎপাদনসম্পর্ক এমন, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট, বিত্তবান ও নির্বিত্ত, মালিক ও মজুরের সম্পর্ক এমন যে যথাসম্ভব বেশি মুনাফার লোভে মালিক মজুরকে যথাসম্ভব বেশি শোষণের চেষ্টা করে এবং মজুর একজোট হয়ে শ্রেণীস্বার্থ-রক্ষার লড়াইয়ে নেমে ক্রমশ বুঝতে পারে যে বুর্জোয়া শ্রেণীরই উচ্ছেদ-বিনা তার স্বস্তি বা সুখের কোনও সম্ভাবনা নেই। এই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থে যে অবিরাম সংঘাত চলতে থাকে, তারই চরম চেহারা দেখা যায় বিপ্লবের সময়, যখন প্রাচীন সমাজশক্তি নবীনের কাছে পরাজিত হয়, যেমন হয়েছিল ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবে। সমাজের আভ্যন্তরীণ এই সংঘর্ষ একসময় এমনই পরিণতির পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে (কার্ল মার্কসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়) সামাজিক কাঠামোর ভিতরকার গ্রন্থিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয় শোষকদের অন্ত্যেষ্টির দিন এসে উপস্থিত হয়, যারা শ্রমিকদের উৎখাত করেছিল, সবদিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, তারা নিজেরাই উৎখাত হয়ে যায়।

মার্কসের মতে ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে শ্রেণীসমাজের মধ্যে তারই দেহসম্ভূত অসংগতি ঠিক যেন মাতৃগর্ভে নবজাতকের আবির্ভাব ও জন্মের মতো নতুন সমাজের আবির্ভাব ও জন্মের মধ্য দিয়ে পরিপূরিত হয় এবং তখনই সমাজের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ সালে মার্কস লিখেছিলেন :

> আমাদের যুগে প্রত্যেক বস্তুই যেন তার বিপরীত, যা তার সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। আমরা দেখছি, যে-যন্ত্র মানুষের পরিশ্রমের লাঘব ঘটাবার এবং তাকে সুফলপ্রসূ করার আশ্চর্য শক্তি রাখে, সেই যন্ত্র মানুষকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাচ্ছে অথচ উপবাসী রাখছে। কোন এব বিস্ময়কর মোহমন্ত্রে যেন সম্পদের নব রীতিসিদ্ধ উৎসগুলি অভাবের উৎসে পরিণত হচ্ছে। মানুষ যখন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারছে, তখনই সে যেন অপর মানুষের কিংবা নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। তবে আমরা জানি যে সমাজের নতুন ঢঙের যে শক্তি আজ এসেছে তাকে যদি সন্তোষজনক কাজে লাগাতে হয় তাহলে নতুন ঢঙের মানুষকে দিয়েই সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে — আর এই নতুন ঢঙের মানুষ হল মেহনতি মানুষ। যন্ত্রের মতোই এই মেহনতি মানুষ হল আধুনিককালের আবিষ্কার।

ইতিহাসের নিগূঢ় বাস্তব বিশ্লেষণ দ্বারা মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নিঃসংশয় ভবিষ্যদ্বাণী — উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন উৎপাদনসম্পর্কে যখন আর সামঞ্জস্য থাকে না তখন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যাখ্যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসের কাছে মানুষ হল গৌণ, মুখ্য বস্তু হল ইতিহাস বলে প্রায় যেন এক মনঃসৃষ্ট ধারণা—উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি যুগান্তর ঘটে তো মানুষ হল নিষ্ক্রিয়, তার নাগালের বাইরে কোনও এক গূঢ় শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। মার্কসের রচনাবলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি বাক্য তুলে ধরে এই আপত্তিকে যুক্তিসংগত বলে প্রচার করা দুরূহ নয়। 'ক্যাপিটাল'-এ আছে এমন কথা যে ইতিহাস 'অমোঘ লৌহগতিতে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' কিন্তু শুধু বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি তুলে ধরা সততার পরিচয় নয়, আর আজ একশো বছরেরও বেশিকাল মার্কসের সমালোচকরা পাণ্ডিত্য দেখালেও প্রকৃত সততা দেখিয়েছেন অতি কদাচিৎ। জনসমষ্টির সক্রিয়, সদাচলমান আন্দোলন বিনা যে যুগান্তর সম্ভব নয়, তা মার্কস বহুবার বলেছেন, বুঝিয়েছেন, নিজের জীবনে ও কর্মে প্রমাণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অবদানকে অস্বীকার করা দূরে থাক তাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মার্কসবাদের শিক্ষা হল এই যে ইতিহাসের বিধি যথাসম্ভব

জানতে পারার উপর মানুষের স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। সেই বিধির পরিধি না জানা থাকলে মানুষের পক্ষে সফল কর্মে নিরত হওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র স্বাধীন চিন্তার জোরে কেউ কি প্রকৃতির বিধান অগ্রাহ্য করে নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যে একহাত বৃদ্ধি ঘটাতে পারে? পদার্থবিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী মানুষের পক্ষে স্বয়ং আকাশে উড়ে যাওয়া অসম্ভব জেনে তবেই মানুষ আকাশযানে বিচরণ করতে শিখেছে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মানুষকে খর্ব করে না, তার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির উপর।

নিকৃষ্ট স্তরের সমালোচকদের পক্ষ থেকে কুৎসা রটানো হয়েছে যে মার্কসের মতো মানুষ হল স্বার্থপর, নিছক অর্থনীতিগত উদ্দেশ্যে তারা কাজ করে, অর্থাৎ মার্কসবাদ উদার মানবতা র ইতিবৃত্তকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু কখনও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ওই ধরনের নিরেশ কথা বলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফরাসি বিপ্লবকালে 'জিরন্দ' দল সম্পর্কে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক যখন লেখেন তারা নিজেদের শ্রেণীর কর্তৃত্ব বাকি সকলের উপর চাপাবার জন্যই ব্যস্ত ছিল, তখন হয়তো 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র বাণীতে মুগ্ধ হয়ে কেউ বলতে পারেন যে কন্দর্সের মতো দার্শনিক কখনও শুধু শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হতেন কল্পনাও করা যায় না, সুতরাং তাঁর দলের কাজকে ওইভাবে চিহ্নিত করা অপবাদ মাত্র। কিন্তু মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের কাছে নিছক ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অনুসন্ধান করা একটা গৌণ ব্যাপার; ইতিহাসের মঞ্চে যারা নেমেছেন তাঁদের বিচার হবে বাস্তব কৃতকর্মের ভিত্তিতে — এ জন্যই লেনিন একবার বলেন যে কোনও একজন ব্যক্তি খুবই 'আন্তরিক' (sincere)-ভাবে কাজ করে থাকতে পারেন, কিন্তু আন্তরিকতার পরিমাপ করতে পারে এমন যন্ত্র (sincerometer) যখন আমাদের নেই তখন কাজই হবে বিচারের মানদণ্ড, কারণ কাজ হল বাস্তব ব্যাপার, তার হদিস পাওয়া কঠিন নয়। ইতিহাস আলোচনায় মুখ্য কর্তব্য হল জানার চেষ্টা করা যে কেন একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ আদর্শ বহুজনের মনে স্থান পেল। মার্কসবাদ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আদর্শ আকাশ থেকে টুপ করে পড়ে মনের ভিতর ঢোকে না, কিংবা হঠাৎ আপনা-আপনি মাটি থেকে গজিয়ে ওঠে না — জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই তার উদ্ভব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যদি বলত যে মানুষ সর্বদা তার স্বার্থসাধনের জন্যই কাজে নামে তো নিশ্চয়ই তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত। স্বয়ং মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড লেখা শেষ করে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'ষাঁড় হয়ে জন্মালে' তিনি নিশ্চয়ই সব কিছু ভুলে ওই গ্রন্থ রচনায় কায়মনোবাক্যে লাগতে পারতেন না।

> মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে না ইতিহাস মানুষকে গড়ে, এ-প্রশ্নের উত্তর মার্কস-এঙ্গেলস খুবই স্পষ্টভাবে দিয়েছেন : 'মানুষ ইতিহাস গড়ে, তবে যেমন খুশি তেমনভাবে নয়।' তাঁরা একবার লেখেন: ইতিহাস কিছু করে না; তার বিপুল সম্পদ নেই; ইতিহাস যুদ্ধ করে না, এসব কাজ করে মানুষ, জীবন্ত, সক্রিয় মানুষ — তারই আছে সম্পদ, সেই যুদ্ধ করে। 'ইতিহাস' কোনও একটি ব্যক্তির মতো নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মানুষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে না। নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে মানুষের কার্যকলাপ ছাড়া ইতিহাস আর কিছু নয়।
>
> পবিত্র পরিবার

মানুষের মহিমা, মানবমাহাত্ম্যের বিভূতি কার্ল মার্কসের বাক্যে ও কর্মে জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে। ইতিহাস অনুধাবন করেই মার্কসবাদ একদিকে যেমন নভোচারিতাকে বর্জন করতে চেয়েছে তেমনই অপর দিকে বলেছে 'অকাট্য বিধির রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ'-এর কথা (the ascent of man from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom)।

> অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপর সব চেয়ে বেশি জোর দিলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে না যে ইতিহাসে অন্যান্য শক্তির মূল্য নেই, বলে না যে একই সোজা, বাঁধা রাস্তা দিয়ে মানুষের বিবর্তন

ঘটেছে এবং ঘটবে। বরঞ্চ মার্কসের শিক্ষা হল এই যে ইতিহাস হল পরস্পরসম্বন্ধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জটিল সমাবেশ। ১৮৯০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এঙ্গেলস এক চিঠিতে লেখেন :

> ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে ইতিহাসনিয়ন্ত্রণে চরম শক্তি হল বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্কস কিংবা আমি এর বেশি কিছু কখনও দাবি করিনি। সুতরাং যদি কেউ আমাদের কথা বিকৃত করে বলে অর্থনীতি হল ইতিহাসনিয়ন্ত্রিত একমাত্র শক্তি, তাহলে সেটা হবে অর্থহীন, অবাস্তর এবং উদ্ভট। অবশ্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল বনিয়াদ, কিন্তু সেই বনিয়াদের উপর যেসব বিভিন্ন কামরা বানানো হয় — যেমন শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক চেহারা এবং তার ফলাফল, জয়ের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, আইনকানুনের রকমফের, এমনকি তারপর সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করছে তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাষ্ট্রনীতি, শাসনবিধি, দর্শনবিষয়ক মতবাদসমূহ, ধর্মচিন্তা এবং অকাট্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই চিন্তার বিকাশ — এ সমস্ত ব্যাপারই ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে সেই সংগ্রামের রূপকে পর্যন্ত নির্ণীত করে দেয়। এইসব ধারার মধ্যে একটা পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। ... তা না হলে ইতিহাসের যে কোনও যুগে (মার্কসের) ওই নীতি প্রয়োগ করা বীজগণিতের একটা সরল সমীকরণের চেয়েও সহজ হত।

আর একটা চিঠিতে এঙ্গেলস খেদ করে বলেছিলেন যে বস্তুবাদের নামে অনেকে এতদূর যায় যে বিভিন্ন চিন্তাধারা ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে একথাও মানতে চায় না তারা। বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তার কোনও স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই ; চিন্তা কর্মের সঙ্গে, জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বদাই সংলগ্ন থাকতে বাধ্য। কিন্তু চিন্তাধারা যে ইতিহাসে কোনও প্রভাব ফেলে না, একথা ভুল। আবার এক চিঠিতে তিনি অনুযোগ করেন : 'এরা সবাই 'ডায়ালেক্‌টিক' সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান রাখে না। এরা শুধু দেখে যে একদিকে কারণ আর অন্যদিকে কার্য। এরা বোঝে না যে এভাবে বিচার করলে সিদ্ধান্ত হবে একেবারে অবাস্তব। এরা বোঝে না যে বস্তুজগতে এমন প্রখর, প্রকট, চিন্তাপ্রসূত বৈপরীত্য দেখা যায় কেবল তখনই যখন পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সংকট উপস্থিত হয়; এরা বোঝে না যে সাধারণত (সমাজবিকাশের) সমগ্র বিরাট পদ্ধতি বিকশিত হতে থাকে বিভিন্ন ও অসমান শক্তি ও ধারার ঘাতপ্রতিঘাতে, আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে প্রাথমিক এবং যুগান্তকারী হল অর্থনৈতিক অগ্রগতি।' মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষা আত্মস্থ করে লেনিন একবার বলেন যে বিপ্লব কখনও সোজা, পাকা রাস্তা দিয়ে চলে না, সর্বদাই যে বিপ্লবের কাজ একই ঢঙে চলবে তা নয়, অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে, মাঝে মাঝে পিছু হটে পর্যন্ত, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মূলগতভাবে সামাজিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এক-একটা যুগের চিন্তায় নয়, পাওয়া যায় তার বাস্তব উৎপাদনব্যবস্থায়। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে অন্য বহু ধারা অল্পাধিক প্রভাববিস্তার করতে পেরেছে বলে সর্বদা বহুমুখী পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করে তবেই বিপ্লবী কর্তব্যের প্রকৃত সন্ধান মিলবে। বিপ্লব নিশ্চয়ই অনিবার্য, সমাজদেহের মধ্যেই তার অঙ্কুর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু সর্বসময়ে সেই আবশ্যম্ভাবিতার কথা স্মরণ করে যত্রতত্র বিপ্লবের আওয়াজ তুলে বেড়ানো একরকমের বিপজ্জনক বিলাসিতা যাকে মার্কসবাদসম্মত বলা অন্যায় হবে।

বর্তমান যুগে ধনবাদের পতন ও সমাজবাদের জয় সম্বন্ধে সর্বোপরি কার্ল মার্কস বাস্তব বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে শতাধিক বর্ষ পূর্বে সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন। সমাজতাত্ত্বিকরূপে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ তাঁর বৃত্তি ছিল না, গণৎকারের মতো দিনক্ষণ গুণে মানবসমাজের কোষ্ঠীবিচার করতে তিনি বসেননি। বুর্জোয়া ব্যবস্থারই আত্মজ হয়ে যে অমিততেজ

শ্রমজীবী শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, তার চেতনা আজ প্রখর, সর্বদেশে যুগান্তর সংগঠনের অনকূল পরিস্থিতি প্রস্তুত হয়ে আসছে, জগৎ জুড়ে জনতার জয়ের আর অতিরিক্ত বিলম্ব নেই। অর্ধশতাব্দী পূর্বে সোভিয়েত বিপ্লবে যার ভাস্বর সূচনা, বর্তমানে সর্বদেশে জায়মান সেই মবসমাজ আজ সর্বদেশে মহামনীষী কার্ল মার্কসের ১৫০-তম জন্মজয়ন্তীকে অভিবাদন জানাচ্ছে। সর্বোপরি তাঁর কাছ থেকে বিশ্বের মেহনতি মানুষের আন্দোলন শিক্ষা নিয়েছে, অনুপ্রেরণা পেয়েছে। মার্কসের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গুহ্যতত্ত্বে তাদের বিশ্বাস সেই, শুধুমাত্র আবেগ-সঞ্জাত মনোভাব তাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, দৈব অনুগ্রহে বা কোনও অতিমানবিক প্রক্রিয়ার ফলে স্বর্গরাজ্যের দ্বার একদিন উন্মুক্ত হবে সে-আশার কুহকে তারা মুগ্ধ নয়। মার্কসবাদী জানে যে ইতিহাসে যে-শক্তিপুঞ্জ সক্রিয় হয়ে রয়েছে, মানুষ সেখানে প্রধান। মার্কসবাদী জানে যে নিয়তির মতো অনিবার্যভাবে ভবিষ্যৎ সমাজ এসে উপস্থিত হয় না। সমাজের বিবর্তন অকাট্যভাবে ধনিক ব্যবস্থার পতন এবং সমাজবাদের অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করছে বটে, কিন্তু সেই শুভ ঘটনার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হয়ে নেই, মানুষের স্বকীয় সংহত প্রচেষ্টা বিনা বিপ্লব সাঙ্গ হবে না, নব সমাজের আবির্ভাব ঘটবে না। সমাজবাদের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু কল টিপে পুতুল বেরিয়ে আসার মতো একদিন নতুন ব্যবস্থার জন্ম হবে না — 'জয় কখনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এসে হাজির হয় না ; তাকে হাত ধরে টেনে আনতে হয়।'

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

অ্যাডাম শাফ

মার্কস ও একালের মানবতাবাদ

ইতিহাস কেন ফিরে ফিরে নতুন করে লেখা হয় তার আলোচনা ইতিহাসের তত্ত্ব আলোচনায় এক বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক অংশ। দুর্ভাগ্যক্রমে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ইতিহাসে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে করতে পারেন, একই যুগে বাস করেও। তার কারণ তাঁদের সামাজিক পরিবেশ, বিশ্বাস ইত্যাদির বিভিন্নতা। বিভিন্ন যুগে বাস করলে তো এটা আরও বেশি হতে পারে। ঘটনার বিশ্লেষণ, ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাখ্যা যুগে যুগে পাল্‌টে যায়। বিশেষ করে মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্রব্যাখ্যা। কেন এমন হয় ভাবতে গিয়ে আমার নানা ধরনের কারণ মনে আসছে। কয়েকটি অবশ্য সর্বস্বীকৃত মামুলি কারণ, আবার কয়েকটি জটিল ও তর্কসাপেক্ষ। মামুলি কারণগুলি এই :

১. কোনও ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন তথ্যের আবিষ্কার। ২. ঘটনাটি পরবর্তীকালে যখন সুষ্ঠু আকার পায় তখন সে সম্পর্কে ধারণাও সুষ্ঠু আকার পায় (শাস্ত্রে আছে, ফলেন পরিচীয়তে; মার্কসও বলেছিলেন, মানুষের শারীরগঠন দেখে বনমানুষের শারীরগঠন সম্পর্কে অনুমান সম্ভব।) ৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ, বিশেষত রীতিপদ্ধতির ('মেথডলজি'র), যার সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা, ঘটনার যোগাযোগ নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়, ফলে ঘটনাগুলো যে পরস্পর সংযুক্ত যে-সম্পর্কেও ধারণা জন্মায়। ৪. সামাজিক অনুজ্ঞা। এরই প্রভাবে তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তি একটি ঘটনার এমন সব অংশ বেছে নেন যা তাঁর সামাজিক অনুজ্ঞাকে লঙ্ঘন করে না। যে-জন্য একটিই ঘটনা, কিন্তু বিভিন্ন যুগে তো বটেই, একই যুগে সমাজের বিভিন্ন অংশে, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এই অনুজ্ঞা তৈরি হয় অনুসন্ধানীর যুগের এবং সমাজব্যবস্থার প্রভাবে। মার্কস যে ইতিহাসের অন্যতম যুগন্ধর পুরুষ, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাঁর জীবনকালে যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনি, কেউ তাঁকে পূজা করেছে, কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। ইতিহাসের ও ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাখ্যা নতুন নতুন কেন হয় তার চারটি যে-কারণ এই মাত্র বলা হল, সেই কারণেই ইতিহাসে মার্কসের অবদান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি মার্কসের যাঁরা অনুগামী তাঁদের লক্ষ করলেও মনে হবে যে মার্কস একজন ছিলেন না, মার্কস নামে বহু লোক ছিলেন। তা না হলে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী লোক একই মার্কসের অনুগামী হলেন? বহুদিন ধরে আলোচনা চলেছে মার্কসের অর্থনীতি নিয়ে, কখনও কখনও তাঁর সমাজ সম্পর্কে বক্তব্য নিয়ে। আজকের দিনে তাঁর মানবতাবাদ নিয়ে। ঘটনাটি অবশ্য সরল। বর্তমান যুগে, সমাজপ্রকৃতি এবং মানুষের মনের গতি এমন সব প্রেরণায় প্রভাবিত হচ্ছে যে, মানবতার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে মার্কসের মানবতাবাদের দিকেও নজর পড়ছে এবং মার্কসের আলোচনায় আজ নতুন একটা দিক খুলেছে। মোট কথাটা হচ্ছে, এযুগে এই দিকেই ঝোঁক। শুধু এই নয় যে, এই যুগেই কেবল মার্কসের মানবতাবাদ কাজে লাগছে। বর্তমান মার্কস-তত্ত্বের ছাত্ররা অতীতের ইতিহাসেও মার্কসীয় মানবতাবাদ কীভাবে কাজ করেছে যে-বিষয়ে ভাবছেন, ব্যাখ্যা করছেন। এটা পূর্ববর্তী ছাত্ররা করেননি। মার্কসের কিছু লেখা যা আগে অপ্রকাশিত ছিল; আর ভাবগত কারণ, বর্তমান কালের মানুষ মানবতাবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। ফলে মার্কসের সমস্ত রচনাই এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। বস্তুত মানবতাবোধ থেকেই মার্কসবাদের জন্ম—এই চেতনারও জন্ম হয়েছে এবং মানবপূজারী মার্কসের চরিত্র 'আবিষ্কারে'র চেষ্টাই চারধারে আজকাল হচ্ছে।

মানবতাবিরোধী যতরকম অপরাধ, যত পৈশাচিক ধ্বংসলীলা সম্ভব, তা আমাদের যুগ থেকে বেশি

অন্য কোনও যুগে হয়নি। ডেমোক্লিসের খড়্গে নীচে আমরা বেঁচে আছি, যে-কোনওদিন হয়তো সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের যুগেই আবার মানবতার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি। আজকাল যত মারামারি তা এই মানবতাবোধ কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়েই। হঠাৎ শুনলে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, কিন্তু এটা সত্য। ইতিহাসে দেখা গেছে মানবতাবোধ যখন চরম সংকটাপন্ন, যা-কিছু মানুষের পক্ষে মঙ্গলের তাদের ধ্বংস যখন আসন্ন, তখনই মানবতার জন্য বিপ্লব শুরু হয়েছে।

প্রকৃতিকে আয়ত্ত রাখার জ্ঞান ও সামর্থ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কেই আজ শঙ্কিত। এ জন্যই আবার সে নতুন সামর্থ্যের সাহায্যে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করছে। এর কারণ আছে।

প্রথমত, মানুষ আজ নিজেকে দেখতে পাচ্ছে দুই বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণে। এর ফলে যত শঙ্কা ও আশা। এ বিষয়ে তর্ক করে লাভ নেই, তা আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি বা না করি। ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, এই দুই ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণে নানা ধরনের ভূমিকম্প ঘটছে। তাদের প্রধান হচ্ছে মূল্যবোধ সম্পর্কে সাবেকি চেতনায় সংকট। সাবেকি আমলের উৎপাদনব্যবস্থা যতদিন সমাজে পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন মানুষও সেই সমাজব্যবস্থায় আস্থা নিয়েই বাঁচবে, সেই সামাজিক সম্বন্ধগুলোকেই স্বাভাবিক মনে করবে, কারণ সেই সম্বন্ধগুলোই তখন মোটামুটি দৃঢ় ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী তৈরি। আবার উল্টোভাবে দেখলে, সেই মূল্যবোধগুলোই 'স্বাভাবিক' মনে হবে, কারণ সেগুলো তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে খাপ খায় এবং মানুষের প্রয়োজনেও কাজে লাগে। অর্থাৎ, সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধের জন্মই সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে এবং তা-ই আবার সামাজিক সম্বন্ধকে দৃঢ় করে তোলার মূলে। এজন্যই, যখন উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে তখন সমাজের স্বীকৃত মূল্যবোধও শিথিল হয়ে যায়। আবার বিপরীতভাবে, সামাজিক মূল্যবোধে পরিবর্তন সমস্ত সমাজব্যবস্থাই পাল্টে দিতে পারে। অসুখ হলেই দেহের অস্তিত্ব এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে চেতনা জাগে, যা সুস্থ অবস্থায় থাকে না। সেরকমই সমাজব্যবস্থায় 'অসুখ' দেখা দিলে, অর্থাৎ যুগধর্ম অনুযায়ী যা উৎপাদনব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং যা প্রচলিত তার মধ্যে বিভেদ দেখা দিলেই, মানুষ পরস্পর সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। পুরোনো মূল্যবোধ যখন প্রায় শিথিল হয় ওঠে, অথচ নতুন মূল্যবোধও সৃষ্টি হয় না, অন্তত সমাজে স্বীকৃত হয়নি, বা 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য হয়নি, এমন অবস্থায়ই এই বিদ্বেষ বেড়ে ওঠে। এমন অবস্থা ঘটেছিল সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পরিবর্তনের সময়, আজকে ঘটছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনের সময়। অবশ্য বর্তমান যে-পরিবর্তন তা বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে, বিভিন্ন নামে বিখ্যাত হচ্ছে ও হবে। সেইজন্যই, প্রথম পরিবর্তন সম্পর্কে তরুণ মার্কসের রচনা আজ এই দ্বিতীয় পরিবর্তনের যুগে এত আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে। এই দুই পরিবর্তন চরিত্রে বিভিন্ন হলেও, তাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে যেগুলো আবার দুটোকে সংযুক্ত করছে।

মানুষের সমস্যা সম্পর্কে, মানবতাবোধ সম্পর্কে এই সচেতনতা গড়ে ওঠার মূলে আছে শুধু যুগপরিবর্তনজনিত মূল্যবোধের ক্ষয়প্রাপ্তিই নয়, এই চেতনার আরও বড় কারণ যুদ্ধ—যে-যুদ্ধের ফলে সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সেই যুদ্ধের আশঙ্কা। এক জন্মে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ ও হিরোশিমা থেকে এই শঙ্কার জন্ম। সমস্ত সমাজে যে-নতুন উদ্বেগের জন্ম হয়েছে, আজ পর্যন্ত তার সম্যক আলোচনা হয়নি, হয়তো রাজনীতির কারণেই। আলোচনার অভাব থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে, মানুষের চেতনায় এই উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া কী! আমাদের যুগে মানবতাবোধ , মানুষের জীবনের প্রাথমিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতার মূলে আছে এই সব উদ্বেগজনিত প্রতিক্রিয়া।

মানুষের মন ক্রমশ মানবতাবোধের দিকে ফিরছে, তার কারণ আধুনিক যুদ্ধ-যন্ত্রের ভয়াবহ উন্নতি এবং তার ফলে মানুষের অস্তিত্বের বিপদ। তাছাড়া বর্তমান সভ্যতার ধাক্কায় মানুষের প্রাথমিক মূল্যবোধগুলোও শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

এখানে এক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হবে। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়েছেন অস্তিত্ববাদীদের মতো দার্শনিকেরা, কিন্তু সেই উত্তর অস্পষ্ট ভাসাভাসা আত্মমুখ দূর-কল্পনা-দোষে দুষ্ট। আবার 'অস্তিত্ববাদী' (existentialist) বা ব্যক্তিবাদী (personalist) ভাববাদ একেবারে উড়িয়ে দিলে, আধুনিক জীবনের অন্যতম তাৎপর্যময় সমস্যাকে অস্বীকার করা হবে, বর্তমান জীবনকে বোঝার অন্যতম এক দার্শনিক অস্ত্রের সাহায্য থেকেও আমরা বঞ্চিত হব। ফলে বাধ্য হয়েই, এ-রকম বাধ্যতা দার্শনিকদের জীবনে প্রায়ই ঘটে, আমাদের এই দুই বিপরীতের মধ্য দিয়ে চলতে হবে—একদিকে ভাববাদের ফাঁদ, অন্যদিকে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষতি।

বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে বৃহৎ জনমণ্ডলীর সভ্যতা। এর ব্যবহারিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শহরে নগরে, কাজের ও জীবনের মধ্য দিয়ে, জনসংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, সংস্কৃতির নানারকম প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার ভিত্তির এইসব উপকরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়, এইসব উপকরণের সামাজিক কারণ সম্পর্কে আলোচনাও আমি এখন করছি না। শুধু এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট, আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে-বিকাশ বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিভূমি, সেই বিকাশের ফলে মানুষের সমাজজীবনে ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে অসম্ভব সুযোগসুবিধা এসেছে। মানুষ আজ সমাজে যেভাবে জীবন কাটায় তাতে সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগের সূত্র সংখ্যায় যেমন বেড়েছে তেমনই দৃঢ়তর হয়েছে। আবার এই গ্রন্থিসূত্রগুলোই সাবেকি বন্ধনগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে—প্রতিবেশীদের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। সমাজজীবনের নানা দিকেই ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। ভালোই হোক, মন্দই হোক, সমাজজীবনের এই দিকটি অস্বীকার করার উপায় নেই। যুগপরিবর্তনের ধাক্কায় ব্যক্তির নানা সমস্যার উদ্ভব, আর একদিকে জীবনে ব্যক্তিসত্তার বিলোপ, এই দুটো দিক একসঙ্গে মনে রাখলে বর্তমান মানুষের 'বিচ্ছিন্নতাবোধে'র জন্মের কারণ নিয়ে দার্শনিকেরা কেন নানা কল্পনাপ্রবণ আলোচনা করছেন, কেন তাঁরা 'অস্তিত্ববাদী হতাশা'র কথা বলেন তা বোঝা সহজ হবে। এর চরম ভাষ্য বা সমাধান স্বীকার করি না বলে এর সমস্যাগুলোও উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এই সমস্যার আলোচনা করলে আমরা বর্তমান মানুষের জীবনে মানবতাবোধে আকর্ষণ কেন জন্মাচ্ছে তার একটা উৎসের সন্ধান পাব। ব্যক্তির সামাজিক ও তাত্ত্বিক স্থান, সমাজে তার নিজের স্থান এবং তার ভবিষ্যৎ—এইসব নিয়ে আলোচনাই (আজ সমগ্র পশ্চিমি সভ্যতায় যাকে বলা হয় 'মানবতাবোধ সম্পর্কে আকর্ষণ') বর্তমান দার্শনিক চিন্তায় প্রধান অংশ নিচ্ছে।

অন্য ধরনের হলেও আর-একটি কারণ পূর্ববর্তী কারণগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবতাবোধ সম্পর্কে আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য আমাদের উৎসুক করে তুলেছে। আধুনিক দর্শনচিন্তার বিকাশে, বিশেষ করে এর জ্ঞানতত্ত্ব বিভাগে, একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের আত্মমুখীন আলোচনা। এই ধরনের আলোচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্মে: মনোবিদ্যা, বিশেষত মনোবিকলন, ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা ব্যাপারে ভাষার স্থান নির্ণয় করে যে-তর্কশাস্ত্র, মানুষের জ্ঞানের বিকাশে সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে-বিজ্ঞান, সেই সব বিজ্ঞানের জন্মে। এইসব বিশেষজ্ঞ গবেষণার ফলে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে মানুষের মনের যে-বিশেষ স্থান আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি আত্মমুখী ভাববাদে বিলীন হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি। নতুন চিন্তার প্রসার সম্ভব অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ভাববাদের নতুন করে প্রতিষ্ঠার কারণ নেই। পুরনো সাবেকি সমস্যাগুলোও, যথা কান্টের a priori জ্ঞান, নতুনভাবে ভাবা যেতে পারে। আধুনিক দর্শনের এই নতুন চিন্তার বিকাশ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষ করে লোকহিতকর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নানারকম প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের সমস্যা সম্পর্কে, মানবতাবোধ সম্পর্কে নতুন ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছে।

বর্তমান জীবনে মানবতা সম্পর্কে ঔৎসুক্যের মূলে আছে এইসব কারণ। এদেরই প্রভাবে, আমাদের যুগ সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তিকে দেখে মানবতাবোধের চশমার মধ্যে দিয়ে। এদেরই প্রভাবে, মার্কসের যে-

মানবতাবাদ এতদিন পর্যন্ত মার্কস-ভক্তদের মধ্যেও কোনও কৌতূহল জাগায়নি, সেই মানবতাবাদ আজ মার্কসীয় দর্শনের মূল আলোচ্য হয়ে উঠেছে এবং মার্কসবাদের ছাত্রদের মধ্যে নতুন উৎসাহী আলোচনার সৃষ্টি করেছে। আমরা যে-রীতিতে ইতিহাসকে দেখি বা ব্যাখ্যা করি, বর্তমান জগৎ আমাদের সেই রীতিকে সাহায্যই করছে—ইতিহাসের এই দর্শন ও ব্যাখ্যা ইতিহাসে 'বর্তমানবাদ' (presentism) প্রতিষ্ঠা করছে। এই তত্ত্বের চরম রূপটি সবসময়ে ঠিক না হলেও, মোটামুটি এর চিন্তাভাবনাগুলো ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করছে।

বর্তমান জীবনে বিভিন্নসূত্রে মানবতাবাদ সম্পর্কে আকর্ষণের মূলে তাহলে আছে এইসব কারণ। মানবতাবাদ বলতে আমরা যদি সেই তত্ত্বসংগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারিক ধারণা বোঝাই যা 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই কথাটা মেনে নেয়, তাহলে স্বভাবতই মানুষ বলতে কী বুঝি এই ধারণার উপর মানবতাবাদের নানা ভাষ্য হবে। তাছাড়া, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে যে মূল্যবোধগুলো সেই মূল্যবোধগুলো কীভাবে ভাবা হচ্ছে এবং সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য কী ও সেখানে কীভাবে পৌঁছানো যায় সেই ধারণা সম্পর্কেও নানা ভাষ্য ও তাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানবতাবাদের জন্ম হতে পারে। প্রত্যেকটিরই উত্তর নির্ভর করবে, যে-তত্ত্বগত এবং বিশেষ করে যে-দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে এগুলোর উত্তর দেওয়া হবে, তার উপর। যে-জন্যই জন্ম হয়েছে ক্যাথলিক মানবতাবাদ, আর মার্কসীয়, অস্তিত্ববাদী, প্রকৃতিবাদী ইত্যাদি মানবতাবাদ।

স্বভাবতই বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদের জন্ম হয়েছে, একই জিনিসকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার বিভিন্ন ভাষ্যের জন্য। সে-জন্যই বোঝা যায় কেন বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদের মধ্যে শুধু প্রতিযোগিতাই নয় বিরোধও দেখা দিচ্ছে। কথাটা হল এই : মানবতাবাদ নির্ভর করে কর্মের পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সেজন্য একটি মতবাদ অন্য মতবাদের চাইতে বেশি অনুগামী সৃষ্টি করতে পারলে তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন মানবতাবাদের মধ্যে কেন এত প্রতিযোগিতা ও বিরোধ।

মার্কসীয় মানবতাবাদের অনুগামীদের যুক্তিগুলো কী, যার সাহায্যে তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের আশা করেন? তাঁদের বিরোধী বা প্রতিযোগীদের চাইতে তাঁরা যে উন্নত যুক্তির অধিকারী, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কী? বহু দশকের অবহেলা সত্ত্বেও আজ মার্কসীয় মানবতাবাদের এত আকর্ষণের উৎস কোথায়?

উৎস হল, মার্কসীয় মানবতাবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারে বিজ্ঞানবিরোধী না হলেও বৈজ্ঞান-নির্লিপ্ত ধর্মীয় মানবতাবাদের অতীন্দ্রিয় ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাখ্যার সংঘর্ষ। মানবতাবাদের এই দুই ধারাই, মার্কসীয় মানবতাবাদ ও খ্রিস্টান মানবতাবাদ অধুনা প্রচলিত মতবাদগুলোর মধ্যে সব চাইতে প্রবল ও বিস্তৃত। এদের বিরোধের কারণ, জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তিবিরোধী অতীন্দ্রিয় ধর্মপ্রবণ দৃষ্টির বিরোধ। মানবতাবাদে বিরোধ এই বৃহৎ বিরোধেরই সামান্য অংশ। আমার মতে, এই বিরোধের ফল সম্পর্কে কোনও সন্দেহই থাকা উচিত হয়, যদিও যাঁরা উগ্র নিরীশ্বরবাদীর মতো অতিরিক্ত আশাবাদী আমি তাঁদের দলে নই। আজকের পরিস্থিতি এমন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বর্তমান বিকাশ ক্রমশই পুরনো দিনের সাবেকি ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে উঠছে। অবশ্য এই বিকাশ এর নিজেরই অন্যতর প্রকাশের কিংবা ভবিষ্যতে সাবেকি ধর্মে বিশ্বাসের অন্তরায় নয়। তবুও সাধারণ লোকের জীবনে সাবেকি ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমশই, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিকাশের ফলে, অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস যদি করতেই হয় তাহলে লোকের শুধু ইচ্ছাই নয়, সামর্থ্যও থাকতে হবে; অর্থাৎ বিশ্বাস তখনই সম্ভব যদি তার ভিত্তিগুলো credo quia absurdum ইত্যাদি শিথিল না হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি এইসব ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। সত্যের দ্বৈতবাদী তত্ত্ব এখনও আছে, তবুও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতে হলে, সব কথা স্বীকার করেও, চিত্তভ্রংশী ব্যক্তিত্বের (schizohprenic personality) প্রয়োজন হয়, যা থেকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুক্ত। এই কারণেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার কৃষ্টিনির্ভর বর্তমান যুগ বিজ্ঞাননির্ভর মানবতাবাদের

পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এটাই শেষ পর্যন্ত মার্কসীয় মানবতাবাদকে জয়যুক্ত করবে, অবশ্য এই মতবাদকে যদি ঠিকভাবে বিকশিত করা যায়। তাহলেই ধর্মীয় বা ব্যক্তিবাদী মানবতাবাদকে দূর করে মার্কসীয় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মার্কসীয় মানবতাবাদ এবং জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী? সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যাবে, মার্কসবাদে ব্যক্তিকে কীভাবে দেখা হয়েছে তার মধ্যে। এটাই দার্শনিক নৃতত্ত্বের মূলসূত্র।

খ্রিস্টান ব্যক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মস্বীকৃত অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিকে ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখার উপর নির্ভর করে। খ্রিস্টান ব্যক্তিবাদে মানুষকে দেখা হয় personal spiritualis হিসেবে, অস্তিত্ববাদে তাকে দেখা হয় স্বাধীন ইচ্ছার অণু হিসেবে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে এইভাবে ভাবা হয় যাতে এর দর্শনচিন্তার সঙ্গে তা খাপ খায়, যাতে কতগুলো সূত্র তৈরি করা যায়, যার উপর ভিত্তি করে তার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে আসা যায়, স্পষ্টতই মানুষ সম্পর্কে ভাববাদী ধারণা ভাববাদী দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায় (বিশেষ করে ব্যক্তিত্ববাদী মতবাদের সঙ্গে)। এই ধারণা অনেক সুবিধার সৃষ্টিও করে দেয়; সূত্র হিসেবে এটা এমন সব বক্তব্য উপস্থাপিত করে যে সূত্রগুলোই প্রমাণসাপেক্ষ। এই ধরনের দর্শনের একটা অসুবিধা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণসাপেক্ষ সূত্রের দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে যায় এবং যাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা হয়েছে তার আপ্তিকবাদমূলক চরিত্রটি উন্মোচিত হয়। এটা তথ্যনির্ভর তর্কে স্বীকৃত না-ও হতে পারে।

ব্যক্তি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে এই ধরনের বিরোধ নেই এবং বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে এর যথাযথ সামঞ্জস্য আছে। ব্যক্তিবাদী দর্শনের মতো নিজের সুবিধেমতো সূত্রও এ তৈরি করে নেয় না, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলে দুর্বলতার সব বাধা থেকে এ মুক্ত। তথ্যনির্ভর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এর কাঠামো, যাকে তিনটি সূত্রে বিবৃত করা যায় :

ক. ব্যক্তি প্রকৃতিরই অঙ্গ, প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্যে তার জন্ম এবং তাই যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত;

খ. ব্যক্তি সেই সঙ্গে সমাজের অঙ্গ, সমাজের বিকাশের সঙ্গে তার বিকাশ, সামাজিক নিয়ম দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত; এবং

গ. ব্যক্তি আবার নিজের আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। ইতিহাসের স্রষ্টা ব্যক্তি নিজেই তার অস্তিত্বের ভিত্তি তৈরি করে, পরিবর্তিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে, পরিবর্তিত করে। প্রকৃতি এবং সমাজের বিকাশের দ্বারাও আবার সে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হয়।

জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণা খাপ খায়। মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরি করে, এই দর্শন তা স্বীকার করে, তাই এই দর্শন আশাবাদী। অস্তিত্ববাদী দর্শন, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ কল্পনা করে বলে তা 'হতাশার দর্শন'। মার্কসীয় দর্শন সেক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করে — তাই তা 'আশাবাদের দর্শন'।

ইতিহাসের এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির এই যে ব্যাখ্যা, যাতে ব্যক্তির আত্মবিকাশের ধারণা স্বীকৃত হয়েছে, এর ফলে মার্কসীয় মানবতাবাদ অন্যান্য মানবতাবাদের চাইতে, বিশেষ করে ধর্মীয় মানবাতাবদের চাইতে, অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই, আত্মবিকাশের এই স্বীকৃতিই অন্যান্য মানবতাবাদ থেকে মার্কসীয় মানবতাবাদকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে।

মার্কসীয় মানবতাবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এই দর্শনে ব্যক্তি শুধুমাত্র পরম শ্রেয় এবং যাবতীয় ক্রিয়ার লক্ষ্য মাত্রই নয়, নিজের বিকাশের কর্তাও সে নিজে। তার নিজের জগতে যে-সব মূল্যবোধ তা অন্য কোনও জগৎ থেকে আহৃত নয়, তার নিজেরই তৈরি সামাজিক ব্যক্তির তৈরি। এই মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করাও তার কর্তৃত্বাধীন। ব্যক্তি তার নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরি করে এবং সেজন্য সর্বতোভাবে দায়ী যে নিজেই। এই মানবতাবাদে কোনও অন্তর্বিরোধ নেই, কারণ ব্যক্তিকে উপলক্ষ করেই এর উদ্ভব :

মানুষ পরম শ্রেয়, চরম লক্ষ্য, সমাজবিকাশের চরম স্রষ্টা। এই দর্শন আশাবাদী, কারণ এর ক্রমাগত বিকাশের ধারায় কোনও বাধা এ স্বীকার করে না।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কীয় যাবতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িত মানবতাবাদের ক্ষেত্র অন্যরকম। এখানে মূল্যবোধ তৈরি করে ব্যক্তি নিজে নয়, বাইরে থেকে তা আরোপিত হয়। ইতিহাসও, অর্থাৎ ব্যক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে-যাত্রা তা-ও, মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়; হয় অদৃষ্টবাদীরা যেমন মনে করেন, কোনও অতিমানব ইচ্ছার দ্বারা তা পূর্ব থেকেই চালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত। এই মানবতাবাদ স্বভাবতই ভেজাল-দেওয়া এবং অন্তর্বিরোধে ও অসামঞ্জস্যে দুষ্ট। এই দর্শন আশাবাদীও হতে পারে না, কারণ ব্যক্তি এই দর্শনে তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

এই দুই ধরনের মানবতাবাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিচ্ছে আমাদের যুগে। এই সংঘাতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ক্রমাগত প্রভাবে, মার্কসীয় মানবতাবাদই মানুষের মন বেশি অধিকার করছে।

জনগণের মধ্যে মার্কসীয় মানবতাবাদের আকর্ষণের কারণ অবশ্য এই নয় যে মুখ্যত তত্ত্বগতভাবে এই দর্শন অধিকতর গ্রাহ্য। এটা বলা বাড়াবাড়ি হয় যে যুক্তিগ্রাহ্য মানবতাবাদের জন্যই দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যুনিস্টরা বা ফ্রান্স-ইতালির কম্যুনিস্ট সংস্থাগুলো মার্কসীয় মানবতাবাদ গ্রহণ করেছে। বরং এটা ভাবাই সংগত যে অধিকাংশ লোকই এইসব যুক্তিতর্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত এবং এর কঠিন শব্দ-সংজ্ঞা ইত্যাদি বুঝতেই পারবে না। তাহলেও কিন্তু, তাদের অজ্ঞাতসারেই, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।

কর্মের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সোস্যালিজমের মতো কম্যুনিজমও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ, কারণ এ মনে করে মানুষের মঙ্গলই মানুষের চরম লক্ষে। জনগণের কাছে এই দর্শন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ মানুষের মঙ্গলের কথাই এতে সুসংবদ্ধভাবে বলা হয়। এবং যেভাবে বলা হয় তা শুধু শূন্যে কথা ছোড়া নয়, জীবনের সংগ্রামে তা যাতে কার্যকর হয় সেইভাবেই বলা হয়। সেইজন্যই মার্কসীয় মানবতাবাদের আরও দুর্বার আকর্ষণ, এই মানবতাবাদ 'জঙ্গিবাদী' (militant)।

এই লক্ষণকে কোনওমতেই বিচ্ছিন্ন, খাপছাড়া বা শুধু আরও-একটা লক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত হবে না। অন্যান্য যে-সব লক্ষণের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এই লক্ষণটি তাদেরই অঙ্গ এবং তাদেরই পরিণতি। মানুষ তার ভাগ্য নিজেই তৈরি করে, তার ভবিষ্যতের রূপের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার জীবন তার নিজের আত্মবিকাশের উপর নির্ভর করে ইত্যাদি স্বীকার করার অর্থ তাকে তার মূল্যবোধ অনুযায়ী তার নিজের ইতিহাস তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা। শুধু চেষ্টাই নয়, সে-এটাকে তার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে, কারণ চেষ্টা বা চেষ্টার অভাবের ফল তাকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

মার্কসীয় মানবতাবাদের এই দিকটি বহুদিন থেকে সুপরিজ্ঞাত। শুধু মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলে, যে-জন্য মার্কসের অনুগামীরাই দায়ী, এই সংগ্রামের দিক, তত্ত্বগতভাবে ব্যবহারিকভাবে, মানবতাবাদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে গ্রথিত হয়নি, বরং অনেক সময় একে মানবতাবোধের বিরোধীই মনে হয়েছে। সংগ্রামকে কেবলই শারীরিক সংগ্রাম বলে গণ্য করা হয়েছে, সংগ্রাম যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও, সহিষ্ণুতার সঙ্গেও হতে পারে, তা মার্কসীয় ছাত্ররা সঠিকভাবে ব্যক্ত করেন নি। আমার বক্তব্যের উপসংহারে আমি এই দিকটি আলোচনা করব, না হলে মাকাসীয় মানবতাবাদের যে ভুল ব্যাখ্যা আছে সে-সম্পর্কে স্থির ধারণা হবে না।

আমি শুধু এই সাদা কথাটা বলেই ক্ষান্ত হব যে মার্কসীয় দর্শনে সংগ্রাম শুধু শারীরিকই (Physical) নয়, আত্মিক (spiritual) ও আদর্শগতও (ideological) বটে। তত্ত্বের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধপক্ষকে নিজ মতের অনুকূলে আনা। বর্তমান আলোচনায় বিষয়টির এই দিকটি আমাদের নজরে আনা উচিত।

এই সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হল একপক্ষের মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিপক্ষের মূল্যবোধের সংগ্রাম, প্রতিপক্ষের

যুক্তি খণ্ডন করে আপন যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই অহিংস (bloodless) সংগ্রামের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের মন ও হৃদয় জয় করা এবং নিজের চিন্তাধারায় তাকে প্রভাবান্বিত করা।

সংগ্রাম শব্দেই প্রকাশ, দু'পক্ষই পরস্পরের বিরোধী যুক্তির যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে চাইছেন। এই বিরোধে কি চিন্তার আদানপ্রদানের কোনও স্থান নেই? ঘুরিয়ে বললে, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু কি বিরোধই আছে, সাদৃশ্য কি একেবারেই নেই?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেক হতে পারে, অনেক সময় সাদৃশ্য থাকে, অনেক সময় থাকে না। অনেক সময় দু'পক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী হয়। যেখানে সংগ্রাম শুধুই নেতিবাচক, সেখানে আদানপ্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। যথা কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজমে বিরোধ। আবার অনেক সময় দু'পক্ষের ধারণায় বিরোধ থাকে, দু'পক্ষের মধ্যে সংঘাতও অনিবার্য, কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপারে দু'পক্ষের মধ্যে মিলও থাকে। যথা, আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদ। এই মন্তব্যে সেই ধরনের বিরোধই আলোচিত হচ্ছে।

চিন্তার জগতে সংগ্রাম এবং ভাববিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকাল যখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা উঠেছে। এ কথা উঠছে, তার কারণ, রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত বিরোধের ফলে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংসের মুখে। তাছাড়া, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রেও এই বল-প্রয়োগের নীতি সরিয়ে রাখার চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে; উগ্র (militant) মার্কসীয় মানবতাবাদ কি অন্যান্য মানবতাবাদের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান করতে (conducting a dialogue) একেবারেই অসম্মত?

আমার মতে এর উত্তর : না। অন্যান্য মানবতাবাদের সঙ্গে মার্কসীয় মানবতাবাদের সংগ্রামে চিন্তার আদানপ্রদান শুধু থাকতে পারে নয়, এ আদানপ্রদান মার্কসীয় মানবতাবাদেরই অঙ্গ। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্যান্য মানবতাবাদকে একেবারে সমূলে বিসর্জন দিতে হবে, বরং ওইসব মতের যে সব অংশ গ্রহণযোগ্য নয় তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে মানবতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। এর একমাত্র উপায় চিন্তার আদানপ্রদান।

চিন্তার আদানপ্রদানও একধরনের সংগ্রাম, বিভিন্ন বিরোধী যুক্তি না থাকলে আদানপ্রদান হতে পারে না, বা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। তবে, এই আদানপ্রদান কার্যকর হয়ে ওঠে তখনই যখন দু'পক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও মিল থাকে, যখন তারা একই ভাষায় কথা বলে, না হলে আদানপ্রদান অসম্ভব ও নিষ্ফল হয়ে ওঠে। তাই,আলাপ-আলোচনাও এক ধরনের সংগ্রাম, যদিও পুরো যুদ্ধ এটা নয়, এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে খানিকটা আত্মীয়তা আছে। এই সংগ্রামে কিছুটা সহিষ্ণুতা দরকার, অন্যের যুক্তিতে কিছু পদার্থ আছে এটা স্বীকার করা আবশ্যক, এবং আমার মতই একমাত্র খাঁটি এই উগ্রভাবটাও ত্যাগ করা প্রয়োজন। অবশ্য সহিষ্ণুতার অর্থ দৌর্বল্য নয় বা বিশ্বাসের অভাবও নয়, নিজের যুক্তিকে সমর্থন করার অসামর্থ্যও নয়। অন্যের সম্বন্ধে নিজের যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও, তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ কবা ব্যাপারে একনিষ্ঠ হলেও, অপরের যুক্তি সম্পর্কে সহিষ্ণু হওয়া সম্ভবপর। সহিষ্ণু একমাত্র প্রবলেরই হওয়া সাজে, এটা আত্মবিসর্জন বা দ্বিধাগ্রস্ততার চিহ্ন নয়। প্রবল ও নিঃসন্দিগ্ধ ব্যক্তি সহিষ্ণু হলে নিজেকে দুর্বল না করে বরং প্রবলতরই হয়ে ওঠেন। কারণ প্রতিপক্ষের যুক্তির কিছুমাত্র যাথার্থ্য আছে কি না জানার তিনি সুযোগ পান, ফলে নিজের যুক্তিকে আরও বিশ্লেষণ করে প্রবলতর করে তুলতে পারেন।

মার্কসীয় মানবতাবাদ উগ্র দর্শন হলেও তার মধ্যে কি অনুরূপ চিন্তার আদানপ্রদান, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির সুযোগ আছে? নিশ্চয়ই। মার্কসের ছাত্রদের পুরোধা যাঁরা তাঁরা কখনই মার্কসের দর্শনকে একটা বাঁধাধরা ছকে ফেলতে চাননি, তাঁরা অন্যদের মতের কথা সব সময় শুনতে, অন্যের চিন্তাধারা আত্মস্থ ক'রে নতুন ক'রে প্রকাশ করতে প্রস্তুত। মার্কস তাঁর রীতিপদ্ধতি (methodology) হিসেবে কার্তেসীয় সন্দেহবাদকে

অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে নিয়েছিলেন। মার্কসের এই উদার দর্শন, যা আদানপ্রদানকে, সহিষ্ণুতাকে স্বীকার করে, তা কিন্তু বহু কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিকৃত অবস্থায় নেওয়া হয়েছে, যথা চিনে। অবশ্য এই বিকৃতিকে 'শিশুকালে দাঁত ওঠার ব্যথা' (teething pains of leftism) বলেই গণ্য করা উচিত, কোনও কোনও দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার চিহ্ন। এটা সবারই জানা কথা, আত্মবিশ্বাস এবং তার ফলে সহিষ্ণুতা প্রবলেরই গুণ, বহু বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তেমনি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সে যাই হোক, মার্কসীয় মানবতাবাদের বর্তমান বিকাশ, অথবা বলা সংগত পুনর্জীবন, আজ যেভাবে হচ্ছে তাতে চিন্তার আদানপ্রদান এবং সহিষ্ণুতা অনেকাংশে স্থান নিয়েছে। বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসের আবেদন তাই আজ অনেক বেশি। মার্কসীয় মানবতাবাদ আজ এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, জনগণের মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, এর জঙ্গিবাদী রূপের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদানের ক্ষমতাও যুক্ত হচ্ছে। এই মাটিতেই আমরা দেখব নানা মানবতাবাদের ঐক্য ঘটবে, তাতে তাদের স্বরূপ নষ্ট হবে না, সত্যের বিকৃতি ঘটবে না, বরং মানুষের লক্ষ্যপথে যাত্রা আরও সুদৃঢ় হবে। এইভাবেই বিভিন্ন মানবতাবাদের মধ্যে আদানপ্রদান ঘটবে, তাতে তাদের দর্শন আরও সারবান হয়ে উঠবে। এইভাবেই মার্কসীয় মানবতাবাদের প্রভাব পুনরুজ্জীবিত হবে, কার্ল মার্কসের দর্শন যে আজও সজীব, আজও প্রযোজ্য, তার প্রমাণ হবে।

Dr. ADAM SCHAFF কার্ল মার্কস সংখ্যার জন্য পাঠিয়েছেন এই লেখাটি।
নাম: Marx and Contemporary Humanism।
অনুবাদ: প্রিয়ব্রত ঘোষ।

ষষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

ক্রিস্টোফার হিল

দাস ক্যাপিটাল ও আমি

উনিশশো তিরিশের যুগে আমার প্রাক্-স্নাতক জীবনে আমি *ক্যাপিটাল* প্রথম পড়ি এবং গ্রন্থখানি তখন বেশ দুরূহ বলে মনে হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী তিন-চার বছরে মার্কসের অনেক ইতিহাসবিষয়ক রচনা আমার মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে। উদ্দীপনার মাত্রা এতখানি হয়েছিল যে পরীক্ষার, প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখার সময় আমাকে বেশ সচেতন থাকতে হত, কেননা সে যুগের সনাতনপন্থী অক্সফোর্ডে মার্কসবাদ একটা নোংরা শব্দ বলে বিবেচিত হত। তাই আমি আমার মতামত আড়াল করার জন্য প্রথমে যা সত্যিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম সেটা লিখতাম, তারপরেই একটু থেমে জুড়ে দিতাম : 'এটা হল একটা মত, কিন্তু সেই সাথে আমরা অবশ্যই বিস্মৃত হব না যে ...', এইভাবে লিখে পরীক্ষকের কাছে প্রমাণ করতে চাইতাম যে আমি মামুলি উত্তরটাও জানি, যদিও তা আমি স্বীকার করি না। অনুরূপ অবস্থায় এই কৌশল ব্যবহার করতো আমি আমার ছাত্রদের প্রায়ই উপদেশ দিতাম। তারপর থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস বিষয়ে আমার আগ্রহ রয়ে গেছে প্রধানত সপ্তদশ শতকের বিপ্লবকে অনুধাবনের চেষ্টায় ; কারণ এই বিপ্লবকে ইংলন্ডের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ বলে সর্বদাই আমার মনে হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড সম্পর্কে আমার প্রথম কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল 'মেটাফিজিকাল' কবিতা সম্পর্কে আমার প্রাক্—স্নাতক পর্বের তীব্র ভাবাবেগ থেকে। সেই কবিদের মধ্যে ছিলেন জন ডান, জর্জ হার্বার্ট, ক্রশ, ভন্, মার্ভেল, ট্রেহার্ন। তিরিশের যুগে এই দার্শনিক কবিগোষ্ঠীর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অন্যতম কারণ হল বিরোধ ও সংঘাত সম্পর্কে এই কবিদের বোধ ও তাঁদের কবিতায় আপাত-সংগতিহীন ভাবধারার পাশাপাশি সন্নিধান :

> Here is dust and dirt, oh here
> The lilies of his love appear. (Vaughan)
> O who shall from this dungeon raise
> A soul enslaved so many ways?...
> A soul hung up as't were in chains
> Of nerves and arteries and veins,
> Tortured, besides each other part,
> In a vain head and double heart? (Marvell)

যে যুগের তীব্র সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত উদ্ধৃত অংশে প্রতিধ্বনিত তার সঙ্গে আমরা যে যুগে বাস করছি তার যথেষ্টই সাদৃশ্য রয়েছে। যে কালে পাঠ্যপুস্তকে 'অর্থনৈতিক কারণ', 'ধর্মীয় কারণ' ইত্যাদিকে সত্যিকারের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও গৌণ বলে মনে করা হত তখনই আমার ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ইতিহাসের মার্কসীয় বিচারের মূল শক্তি নিহিত আছে এর দৃষ্টিভঙ্গিতে, পদ্ধতিতে — যে পদ্ধতিতে সমাজকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা হয়, দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে তার সামাজিক উৎসের নিরিখে বিচার করা হয়। বা উদ্ধৃত কাব্যাংশে বর্ণিত যে 'দ্বৈত হৃদয় ' ('double heart') সম্পর্কে দার্শনিক কবিরা তীব্র সচেতন ছিলেন এবং যে গভার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে ১৬৪২ সালে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের উদ্ভব হয়—এ দুয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র নির্ণয় করাই হল

প্রকৃত মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি — এ ধারণা আমার হয়েছিল।

মার্কস সম্পর্কে আমার কৌতূহলের প্রথম কারণ, তাঁর ভাবধারা আমায় 'দার্শনিক' কবিতাবলি বুঝতে সাহায্য করেছিল এবং একথা আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই, কেননা মার্কসের এই বিশেষ গুণটির যথোচিত সমাদর আজও হয়নি। যাঁরা কখনও তাঁর কোনও লেখা পড়েননি, তাঁরা মার্কসকে একজন অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী (economic determinist) হিসেবে জানেন, যিনি মানুষকে অর্থনীতির অন্ধ শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে দেখেছিলেন। যাঁরা মার্কসের লেখা পড়ে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি ঠিক এ রকম কিছু ছিলেন না। তিনি ছিলেন (অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে) একজন প্রতিভাধর ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও মননসাধনার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাসের চাইতে কোনও অংশে কম উজ্জ্বল ছিল না। তিনি লিখেছেন : 'মানব ইতিহাসের মূল সূত্র হল জীবন্ত ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব'। 'সক্রিয় মানুষের কর্মশক্তির পরিণামই হল উৎপাদনশক্তি।'

দর্শন ও মননের ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তায় প্রভাবিত কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। জর্জ টমসন, বেঞ্জামিন ফ্যারিংটন, জোসেফ নিডহাম, এরিখ হবসবম, আইজাক ডয়েৎচার, ই এইচ কার, এডওয়ার্ড টমসন, সি বি ম্যাকফারসন, ফ্রেডরিক আনটাল ও অন্যান্য অনেকের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলছি। এবং মার্কস নিজেই তার সূত্রপাত করে গেছেন। ১৮৫৯ সালে তিনি লিখেছেন :

> সমস্ত পুরাণকাহিনিই (mythology) কল্পনার সহায়তায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনে ও আকার দেয় ; এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকলেই পুরাণের অবলোপ ঘটে। মুদ্রণশালার বিকাশে যশোদেবীর অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে! গ্রিক শিল্প যে কতকগুলি সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, এ ধারণা অর্জনে কোনও অসুবিধা হয় না। বরং কেমন করে আজও তা একটা সৌন্দর্য উপভোগের উৎস ও কোনও কোনও দিক থেকে দুরায়ত্তসাধ্য শিল্পদর্শ রূপে বিরাজ করছে সেটা বুঝতে পারাই কঠিন।

ক্যাপিটাল বইটিতে মার্কস লিখেছেন : নিকৃষ্টতম স্থপতির থেকে উৎকৃষ্টতম মৌমাছির পার্থক্য এই যে, স্থপতি বাস্তবে রূপায়ণের আগে তার ঈপ্সিত কাঠামোটির রূপ কল্পনায় ঠিক করে নেয়।

মার্কস ছিলেন একজন বস্তুবাদী। ধর্মতাত্ত্বিক ও পেশাদার দার্শনিকেরা কোনওদিন যে প্রশ্ন তোলেন নি মার্কস তা আগেই ধরে নিয়েছিলেন। যেমন : এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব আছে, এবং আমাদের ভাবরাশি এই বস্তুজগৎ থেকেই উৎসারিত। তিনি যুক্তির দ্বারা বোঝালেন যে মানুষ যেভাবে তার জীবিকা উপার্জন করে, যেভাবে ধন উৎপাদন ও বন্টন হয়, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় সমাজের কাঠামো। 'মানুষ শুধু মাত্র সামাজিক জীব নয়, বরং এমন একটি জীব যে কেবলমাত্র সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হতে পারে।' 'মানুষ নিজেই তার নিজস্ব ইতিহাস রচনা করে।' ১৮৫২ সালে মার্কস লিখেছেন : 'কিন্তু যেমন ইচ্ছে তেমন করে নয় ; তার পছন্দমতো অবস্থায়ও নয়, বরং অতীত থেকে প্রাপ্ত ও আগত সামাজিক পরিবেশেই তারা এটা করে। মৃত অতীত যুগের সব ঐতিহ্য দুঃস্বপ্নের মতো জীবন্ত বর্তমানের মগজে এসে ভর করে।' ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবিধ প্রকৃতি থেকে, মানুষের সামাজিক অবস্থান থেকে স্পষ্ট ও বিশিষ্টভাবে গঠিত আবেগ, অধ্যাস, চিন্তাধারা ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির একটা সম্পূর্ণ উপরিতল (superstructure) মাথা তোলে। সমগ্র শ্রেণী এর বাস্তব ভিত্তি ও অনুরূপ সামাজিক সম্পর্কের মধ্য থেকেই একে সৃষ্টি ও গঠন করে। যে কোনও একজন ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে এগুলিকে লাভ করেন, কল্পনা করতে পারেন যে তাঁর ক্রিয়াকর্মের উৎস ও প্রকৃত অভিপ্রায় এর দ্বারাই নির্ণীত হয়। ...ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যেমন মানুষ সম্পর্কে যা ভাবে ও বলে তার সঙ্গে তার স্বভাব ও কর্মের পার্থক্য দেখতে পায়, তেমনি বা তার চাইতেও বেশি করে, কোনও ঐতিহাসিক সংগ্রামে নিযুক্ত দলগুলির সাংগঠনিক রূপ ও আদর্শকে তাদের প্রকৃত স্বার্থ ও নিজেদের সম্পর্কে ধারণা

থেকে তাদের বাস্তব অবস্থাকে পৃথক করে দেখতে পাওয়া দরকার।' অন্যথায়, সমাজ-বিশ্লেষণে সচেষ্ট ঐতিহাসিক, মার্কস একটি বিখ্যাত উক্তির দ্বারা যা বর্ণনা করেছেন, সেই 'কালের বিভ্রম' ('the illusion of the epoch')-এর শিকার হয়ে পড়বেন।

কিন্তু যদিও, 'উৎপাদনব্যবস্থার মালিকের সাথে প্রকৃত উৎপাদনকারীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ... সমগ্র সামাজিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত রহস্য ও গোপন ভিত্তিসমূহকে উদ্ঘাটিত করে, যেহেতু এই সম্পর্ক 'অসংখ্য বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক প্রভাব প্রভৃতির দ্বারা জড়িয়ে আছে, সেজন্য এগুলিকে খুব সযত্নে বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় করতে হবে।'

বিগত শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদের প্রভাব যতটা লক্ষ করা যায় অন্য কোনও শাখায় ততটা নয়। অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মার্কস প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেন। তাঁর আগে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে এমন কোনও গ্রন্থ লেখা হয়নি যে সম্পর্কে আজকের কোনও ছাত্র কৌতূহলী হতে পারে, অথচ, যাঁরা মার্কসের ভাবধারার সাথে একমত নন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, তিনি আজও অবশ্যপাঠ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

একশো বছর আগের পূর্বসূরীদের থেকে বর্তমানের সকল ঐতিহাসিকেরই অতীত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে, কোনও সমাজব্যবস্থায় ধনসম্পদ যেভাবে উৎপাদন ও বন্টন হয় তা সমাজের সর্বস্তরের কাঠামো ও জীবনযাত্রাকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। এই ভাষ্য শেষ পর্যন্ত মার্কস থেকেই এসেছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই আমূল পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির ভূমিকাকে ক্রমশই স্বীকার করে নেওয়া। যদিও ঐতিহাসিকেরা ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণে একমত হবেন না, তবে তাঁরা সকলেই একশো বছর আগের মতো কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভালো-মন্দ, বুদ্ধি-নির্বুদ্ধির ভিত্তিতে এসব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করবেন না, বরং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হবেন।

বিগত শতকের ঐতিহাসিকেরা মানুষের চিন্তার ও মতাদর্শের সামাজিক উৎস স্বীকার করে নিয়েছেন। যে দু'জন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ঐতিহাসিকের আমলে আমি বড় হয়েছি তার মধ্যে টনি (Tawney) স্পষ্টতই মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, এবং নামিয়ার (Namier) সম্পর্কে স্যার জন নীল (মার্কসবাদী নন) লিখেছেন যে ইতিহাসচর্চায় তিনি যে, নতুন দিগ্‌দর্শন করেছেন তার মূলে কিছু পরিমাণে আছেন মার্কস। একদা স্যার ঈশাইআ বার্লিন (Sir Isaiah Berlin) মার্কসকে সমাজবিদ্যার জনক বলে অভিহিত করেছিলেন, যেমন মার্কস স্বয়ং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ স্যার উইলিয়াম পেটিকে (Sir William Petty) রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্রের (political economy) জনক বলে আখ্যাত করেছিলেন।

এর সাথে সাথে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন আপেক্ষিকতাবাদের সৃষ্টি হল। ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা যে নৈতিক মানকে চূড়ান্ত বলে ভাবতেন, তার নিরিখেই ইতিহাসকে বিচার করতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিকতারও পরিবর্তন হয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে বোধহয় মার্কসবাদের ইতিবাচক প্রভাবের চাইতে নেতিবাচক প্রভাবের অংশই বেশি।

যে উৎসগুলিকে ভিত্তি করে ইতিহাস রচিত হয় বিগত শতাব্দীতে, সেখানেও এক বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে এই উৎসাবলির প্রধান অংশ যেখানে ছিল সাহিত্যগত—যেমন, লোকগাথা, জীবনী, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, সংবাদপত্র—এখন সে উৎস প্রধানতই দলিল-ভিত্তিক : সরকারি নথিপত্র, ধর্মযাজকদের পাঁজিপুথি, সনদ, খোদাই, লিপি প্রভৃতি; বা এমন কী প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক : যন্ত্রপাতি, কলকবজা ঘরবাড়ি ও জমি। এই পরিবর্তনকে আমরা সরাসরি মার্কসের প্রভাব বলে অভিহিত করতে পারি না, যদিও তা মার্কসের ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাঁর নিজস্ব রচনায়, বিশেষত ক্যাপিটাল গ্রন্থে,

মার্কস সরকারি পুথিপত্র ও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণীকে খুব প্রশংসনীয়ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। 'ডকুমেন্ট' সম্পর্কে আধুনিক কালে শ্রদ্ধার যে বন্যা এসেছে তাতে তিনি অংশ নিতেন কি না সে প্রসঙ্গ ভিন্ন, তবে সরকারি প্রকাশনা সম্পর্কে—তা সময় ও জীর্ণতার বিচারে যতই শুদ্ধিলাভ করুক না কেন—মার্কসের বরাবরই একটা সংশয় ছিল। ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর সেরা লেখাগুলিতে সাহিত্যের থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি, শ্লেষ ও বিরোধোক্তি এবং লেখার ভঙ্গিতে কল্পনাশক্তির পরিচয় থাকাতে লেখক হিসেবে তিনি আধুনিক ' বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন' ঐতিহাসিকদের (যাদের লেখার ধরনই এমন যেন মনে হয় সেগুলো পড়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি) থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস তাঁর যুক্তিকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে সজীব করে তুলেছেন। যাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁরা হলেন : হোমার, সোফোক্লিস, হেরাক্লিটাস, থুসিডাইডিস, জেনোফেন, আইসোক্রেটস, প্লেটো, আরিস্টটল, ডিয়োডোরাস, সিকুলাস, লুক্রেসিয়াস, আপ্পিয়ান, সেক্সটাস, এম্পিরিকাস, জোসেফাস, বাইবেল গ্রন্থ, সেন্ট জারোম, লুথার, দান্তে, শেকসপিয়র, মিলটন, গ্যেটে, সারভানতেস, মলিয়ের, ড্রাইডেন, বালজাক, স্যার টমাস মোর, বেকন, হবস, স্পিনোজা, ভিকো, বার্কলে, মন্টেস্কিউ, রুশো, বোলিংব্রোক, বার্ক, হেগেল, মমসেন, ডারউইন প্রমুখ—ডারউইনকে তো মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি খণ্ড উপহারই দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, যেহেতু মার্কস অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং যার সাথে শেষ পর্যন্ত মানুষের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সংযুক্ত করতে চাইতেন, সেজন্য আধুনিক অর্থে ইতিহাসের সামগ্রিকতা বলতে যা বোঝায়, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি, সে সম্পর্কে মার্কসের দিকে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও ফিরে তাকাই।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিবর্ণ উদারনীতির প্রতিক্রিয়ায় অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এক অন্ধ হতাশার কবলে পড়েন। প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্বের ফলে, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে অধিকতর বিনষ্টি সাধনের অশুভ শক্তিও জুগিয়েছে। মানুষ আণবিক বোমা এবং এক জরাগ্রস্ত সভ্যতা তৈরি করেছে। যে মানবতাবাদ মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে শেখায় তা হল একজাতীয় অলস আত্মপ্রবঞ্চনা : হতাশাই একমাত্র যুক্তিসংগত, ঈশ্বরই একমাত্র পরমার্থ — মানুষের অপরিবর্তনীয় দৈন্য সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু সারমর্ম তার কিছুমাত্রই নতুন নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির নৈতিকতার অধঃপতন সূচিত হবে, রুশো-র এই ধারণাকে মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন। ইতিহাস হল, এঙ্গেলসের ভাষায়, 'নিষ্ঠুরতমা' দেবীর বিবরণী — আদিম সমাজে মানুষ যে অধিকার ও সাম্য উপভোগ করত তা থেকে সে কেমনভাবে বিচ্যুত হল সে কথাই এই কাহিনিতে বিবৃত। কিন্তু এ হল ইতিহাসের দ্বৈত প্রক্রিয়ার একটি দিক। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মানুষকে তার সাম্যবোধ বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল, একথা বলে মার্কস রুশো-র অন্তর্দৃষ্টির উপর এক নতুন তাৎপর্য আরওপ করলেন। উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সমাজের অধিকাংশ লোক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধাভোগী ভাগ্যবানের হাতে সেই ক্ষমতা গিয়ে জড়ো হওয়াতে এই মত প্রচলিত হয়ে পড়ল যে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থের উপরেই সমাজের সকলের স্বার্থ নির্ভরশীল। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, ঐতিহাসিক নিয়মে (যদি তা প্রথমেই কোনও আকস্মিক বিপর্যয় না ঘটায়) কীভাবে মানুষ এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার মধ্যে তার হৃত অধিকার শেষ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করবে সে কথা তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দেখিয়ে গেছেন। এই সমাজ এক উন্নতর ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অসাম্য ও নির্যাতন চলেছে তার মধ্য থেকেই এই বিকাশ সম্ভবপর হবে। মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্যাতন ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের উৎপত্তির সাথে সাথে বেড়ে ওঠে এবং আদিম সাম্যবাদের মধ্যে লোপ পায়। লাভ ও লোকসান হল

একই পদ্ধতির দুই বিপরীত দিক : 'Fair is foul and foul is fair'।

উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের স্থূল আশাবাদ থেকে সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে এই গভীর ধারণা অনেকখানি পৃথক। ইতিহাস হচ্ছে এক ট্রাজেডি, কিন্তু তার একটি অর্থহীন ট্রাজেডি হওয়ার দরকার কী। আমরাও শুধু দর্শক নই : আমাদের সক্রিয় ভূমিকা আছে সেই নাটকে। আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র ভালো বা মন্দ বলা চলে না : মানবজাতির উপর এর ফল কী রকম হবে সেটা নির্ভর করে কীভাবে একে ব্যবহার করা হবে তার উপর এবং তাও আবার নির্ভর করে সামাজিক সংগঠনের উপর। সমাজের সংগঠন আমি, আপনি ও অন্য লক্ষ লক্ষ লোকের উপর নির্ভর করে। মার্কস আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন, নির্বাসিত ও দেশান্তরিত হয়ে বিপ্লবী সংগ্রামকে সংগঠিত করেছেন এমন একটি অভীষ্ট ফল লাভের আশায়, যাকে তিনি অবশ্যম্ভাবী সত্যরূপে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন — এ সমস্তই একটা বিরাট প্যারাডক্স মনে হয়। কিন্তু যখনই আমরা বুঝতে পারি যে, মার্কস একজন নির্দেশ্যবাদী (determinist) ছিলেন না, তখনই আর এর মধ্যে কোনও প্যারাডক্স থাকে না।

একটি সামগ্রিক কর্মের বিচারে আমি হয়তো এতক্ষণ একটি অংশের প্রতিই অধিক মাত্রায় মনোনিবেশ করেছি। আমারই মতো যাঁরা মার্কসের লেখা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে একজন সুলেখকরূপে শুধু বিচার করেন না, বা ইতিহাসতত্ত্বে তাঁর গভীর প্রভাবই দেখেন না, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের তীব্র সমালোচক হিসেবে মার্কস তাঁর বলিষ্ঠতম আঘাত হেনেছেন, এটাই সকলে জানেন। তিরিশের যুগে যদিও তাঁরই সাহায্যে আমি 'দার্শনিক কবিতাবলি' বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম, তবুও সে সময়ে তাঁর এই দিকটিই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হত।

মার্কসের আগে শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অজস্র প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে মার্কসের নতুন অবদান হল এই যে, তিনি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী থেকে প্রচুর তথ্য তাঁর যুক্তির সপক্ষে জোগাড় করেছিলেন এবং তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণাকে ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত করে তুলেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পীড়নকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের দুষ্কর্ম হিসেবে না দেখে, একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার—যার কোনও আইনগত প্রতিরোধ নেই — পরিণাম হিসেবে তিনি দেখলেন। ক্যাপিটাল বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস লিখেছিলেন : 'ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নিজেকে যত বড় করেই তুলুক না কেন, সর্বদাই সে সামাজিক ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়ে থাকে বলে অন্য যে কোনও লোকের চাইতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কোনও সামাজিক সম্পর্কের জন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কম দায়ী করি।' তদানীন্তন ইংল্যান্ডের যে অবিচারগুলিকে মার্কস তাঁর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে নির্মমভাবে চিত্রিত করেছিলেন, বস্তুতপক্ষে তার অনেকগুলি — শ্রম সময়ের দীর্ঘতা, শিশু শ্রমিকের শোষণ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা — পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবহিতৈষী কার্যাবলির জন্য আইন প্রণয়নের দ্বারা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের জন্যই মার্কস আজীবন পরিশ্রম করেছিলেন, এবং এই পরিবর্তনকে তিনি অন্তরের সাথে স্বাগত জানাতেন। আমার মনে হয়, তিনি আরও ভাবতেন যে, আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই কোনও একটা গলদ নিহিত আছে যে জন্য একদল লোক অন্যের পরিশ্রমের দ্বারা মুনাফা অর্জন করে নিচ্ছে, যে ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝে বেকারি বা যুদ্ধ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মার্কস ছিলেন এমনই এক বিরাট প্রতিভা যে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে কটি দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃতভাবে কম আলোচনা হয়েছে সেগুলিও স্মরণযোগ্য : যেমন, তাঁর প্রিয় আদর্শ ছিল de omnibus dubitandum, সব কিছুকেই আমাদের সন্দেহ করতে হবে। এবং তাঁর অদম্য বাধাহীন হাসির উচ্ছ্বাসের জন্য তাঁর কন্যা তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করতেন। এমন ক'জন আছেন, যিনি আজ থেকে একশো বছর আগেও ভাবতেন যে, সমাজে নারীর 'মর্যাদা কতখানি সেই মাপকাঠিতে সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়' ; যিনি মনে করতেন 'যার ভিত্তিতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উপযুক্ত ও বিচারসহ হতে পারে এমন কোনও নীতি

স্থির করা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন'; বা 'শিশুরাই তাদের পিতামাতাদের মূল্যবোধে শিক্ষিত করে তুলবে'! এসব কারণে তিনি আজও আমাদের অনেক রাজনীতিকের থেকেই অগ্রগামী।

এতক্ষণ আমি প্রধানত যৌবনে আমার উপর মার্কসের প্রভাবের কথা বললাম, এখন বৃদ্ধ মার্কস সম্পর্কে একটি কাহিনি বিবৃত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যতই বয়সে ও বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছি ততই এর প্রাসঙ্গিকতা আমরা অনুভব করছি। একদা মার্কস এইচ এম হিনডম্যানের সাথে গল্প করছিলেন, সে সময় হিনডম্যান বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের সহনশীলতা কীভাবে বেড়ে যায়, পরিহাসচ্ছলে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে মার্কস সবিস্ময়ে বললেন, 'সত্যিই কি তুমি সহনশীল হয়েছ? সত্যিই?' সত্যিই কি আমরা আমাদের বয়সের সাথে সাথে অসাম্য, অবিচার, দারিদ্র্য ও বোমাবর্ষণে নৃশংস গণ্য হত্যা সম্পর্কে আরও সহনশীল হয়ে পড়ছি? সত্যিই কি তাই ?

DR. CHRISTOPHER HILL 'এক্ষণ'-এর জন্য পাঠিয়েছেন এই লেখাটি—Das Kapital and I। অনুবাদ : সুনীত সেনগুপ্ত।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কার্ল মার্কস ও অ্যালিয়েনেশন

যোসেফ শুমপিটার এক জায়গায় মহৎ সৃষ্টির লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি অথবা কল্পনার অধিকাংশ সৃষ্টিই কালোত্তীর্ণ নয়। কিছুকাল স্থায়ী হলেও অধিকাংশ সৃষ্টিই মহাকালের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করে না, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। শুমপিটার পরিহাস করে বলেছেন যে এ-সব সৃষ্টি কতদিন স্থায়ী হবে—ডিনার-শেষের কয়েকটি ঘণ্টা না একযুগ, তা নির্ভর করে এদের গুণাগুণের উপর। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমন সৃষ্টিও আছে যারা ক্ষণস্থায়ী নয়। এদের উত্থানপতন আছে—কিন্তু বার বার এদের আবির্ভাব ঘটে নিত্যনবরূপে। আর যখন এই আবির্ভাব ঘটে তখন আমরা তাকে অন্তরঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করি। এই সব সৃষ্টি নিজের বর্ণসুষমা নিয়ে হয়তো বা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই প্রকাশ পায়। এবং তখন এদের আমরা 'বিশেষ বস্তু' হিসেবে গ্রহণ করি, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যেন পাই, মনে হয়: 'এরা তো আমাদের অপরিচিত নয়।' শুমপিটার বলেছেন যে এই সব লক্ষণাক্রান্ত সৃষ্টিকে 'মহৎ' আখ্যা দেওয়া চলে এবং মার্কসের বাণীও মহৎ-সৃষ্টির মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'মহাপ্রাজ্ঞ' ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের 'নাইট' ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'বস্তুবাদী' বললেই কার্ল মার্কসের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। ব্যক্তিমানুষের সমস্যা, মানবিকবাদী দৃষ্টি তাঁর লেখার অন্তরঙ্গ অঙ্গ। তাঁর সমালোচকরা তাঁর রচনায় একদেশদর্শীতা, অতিসরলীকরণ, বিতণ্ডা-প্রবণতার অভিযোগ এনেছেন; তৎসত্ত্বেও তাঁর লেখা ভিন্ন মতাবলম্বীদের আকর্ষন করার ক্ষমতা রাখে। বিশেষত তাঁর তরুণ বয়সের রচনাবলি একালে অনেকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষম করেছে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা কার্ল মার্কস যে কবি এবং দার্শনিক, প্রবুদ্ধ মানবিকতার প্রবক্তা একথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই।

কার্ল মার্কস সাম্যবাদকে গ্রহণ করেছিলেন 'স্বাধীনতা'র স্বার্থে। সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের অবাধ বিকাশ সম্ভব হবে, মানুষ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হবে, এই ছিল মার্কসের বিশ্বাস। নিরাপত্তার প্রয়োজনে কিংবা প্রাচুর্যের জন্য সাম্যবাদী সমাজ কাম্য, কিংবা বণ্টনের স্বার্থে এই সমাজ বরণীয়, এ-বক্তব্য আর যারই হোক মার্কসের নয়। *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*-এর শেষভাগে এবং German Ideology-তে মার্কস ভাবীকালের সাম্যবাদী সমাজের ছবি এঁকেছেন। সে ছবি কল্পনায় স্নিগ্ধ, সেই ছবিতে কবি মার্কসের পরিচয়ই প্রধান। সাম্যবাদী সমাজের চিত্রটি কেমন? মার্কস বলেছেন: এই সমাজ নিপীড়নহীন, স্বাধীন, প্রবুদ্ধ মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে ওঠা অভিনব সমাজ। এই সমাজে শোষণ নেই, পরবশ্যতা নেই, শ্রমবিভাগের গ্লানি নেই, নেই লোভ ও টাকার দাসত্ব, অর্থগৃধ্নুতা। সমষ্টিতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষ এ সমাজে বলিপ্রদত্ত নয়। পূর্ণতার সাধনায়, মানবধর্মের সাধনায় সকলেই এখানে আনন্দযোগে নিযুক্ত। এচিত্র যে শুধু তরুণ মার্কসের চিত্তপটে বিধৃত হয়েছিল তাই নয় ; আজীবন মার্কস কল্পনার স্নিগ্ধ এই চিত্রটিকে সযত্নে লালন করেছিলেন। German Ideology-র বহু বিক্ষিপ্ত অংশে, ১৮৫০-৫৯ এর মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায়, ১৮৭৫-এর Critique of the Gotha Programme-এ এবং Capital-এর তিনখণ্ডের নানা অংশে মার্কসের মানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অভিজ্ঞ মার্কস জিজ্ঞাসুরা (সমাজতান্ত্রিক দেশেরও) অনেকেই আজ স্বীকার করছেন যে মার্কস যে শুধু অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক তাই নন, মার্কস নীতিবিদ ও মানবিক দার্শনিকও বটে। মার্কসের দার্শনিক ও সাহিত্যশিল্পবিষয়ক রচনা

পাঠ করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের ও জার্মানির 'এনলাইটেনমেন্টে'র উত্তরসাধক। জার্মানির ক্লাসিকাল আইডিয়ালিজমের উত্তরাধিকার বহন করেই যে মার্কসীয় সাম্যবাদের বিকাশ, দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কস যে প্রবুদ্ধ মানবিকতার সংগ্রামী দার্শনিক এ-সত্যও আজ স্ব-প্রকাশ। স্তালিন আমল পর্যন্ত শোনা গেছে যে মার্কস সামূহিকতার দার্শনিক, ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু সমাজরূপী কিংবা রাষ্ট্ররূপী মহসমুদ্রে বিলীন না হলেই নাকি 'মহতি বিনষ্টি'। স্তালিনোত্তর যুগে মার্কস নবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশসহ অনেক দেশের ভাবুকেরাই অধুনা বলছেন: 'মার্কস ব্যক্তিমানুষের দার্শনিক'। এই যুগে মার্কস চর্চার নতুন জোয়ারও এসেছে। জার্মানির ক্লাসিকাল দর্শন থেকে কোন সূত্র অবলম্বন করে মার্কসীয় সাম্যবাদের আবির্ভাব এই প্রশ্নও নতুন করে আলোচিত হচ্ছে। অধুনা অনেক ভাবুক এ-ও বলেছেন যে মার্কবাদের মধ্যমণি 'বিযুক্তি' (alienation) তত্ত্ব। এবং এই তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিচার না হলে মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা অসমাপ্তই থেকে যাবে।

২

বিযুক্তি (alienation) এবং 'বিচ্ছিন্নতা' (estrangement) এই দুটি পদ সমাজবিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকেরা আজকাল প্রায়শই ব্যবহার করছেন। আধুনিক সমাজে মানুষ বৃন্তচ্যুত। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই, প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। সমাজের সঙ্গে সাধারণীকৃতিও তার নেই। সমকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা — সবেরই অন্যতম বিষয় শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যাপকভাবে বলা চলে (alienation)।

কী সে চায়, মানুষ নিজেই তা জানে না। অথচ ক্ষ্যাপার মতো সে পরশপাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে। জীবনবিমুখতা, অস্থিরতা, আত্মিকবোধহীনতা মানুষকে আজ নৈরাশ্যপীড়িত করে তুলেছে। নীটশের ভাষায় মানুষের জগতে ঈশ্বর আজ মৃত। ফলে জগৎ আজ উন্মুক্ত, প্রকাশিত, ভাগবত সুষমা বঞ্চিত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভবের দিক থেকে জগত পুরোপুরি নিরপেক্ষ। অনির্বচনীয়তার মায়াঞ্জনমুক্ত জগতের সঙ্গে মানুষ কাজের সম্পর্ক স্থাপন করেছে, প্রকৃতিকে অনাবৃত করে বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহারও করেছে। কিন্তু গ্রিক আমলে কিংবা রেনেসাঁসের যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে আত্মিক যোগ ছিল সেই যোগ আজ ছিন্ন। সব মিলিয়ে মানুষ যেন আজ জগতে পরবাসীর মতো। মানুষ আজ আত্মচ্যুত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, একাকী—self-alienated। Karl Jaspers, Sartre, Merleau Ponty, Begot, Rubel ও অন্যান্য খ্যাতিমান ইয়োরোপীয় ভাবুকেরা মানুষের 'অ্যালিয়েনেশন'-এর সমস্যাটিকে মানবজীবনের মূল সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্তালিনোত্তর যুগে সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন নতুন জিজ্ঞাসা এবং কিঞ্চিৎ চিত্তমুক্তির সুযোগ দেখা দিয়েছিল তখন সে সব দেশেও দেখা গিয়েছিল 'অ্যালিয়েনেশন'-এর সমস্যা নিয়ে মুখর বাদানুবাদ। পোলাণ্ডের দার্শনিক Adam Schaff তো নতুন আবহাওয়ায় লিখলেন 'A Philosophy of Man' বললেন যে এতাবৎকাল মার্কসবাদ কতগুলি প্রত্যয়ের দাসত্ব করেছে, মানুষকে রেখেছে নেপথ্যে, অথচ মার্কসবাদ আসলে ব্যক্তিমানুষেরই দর্শন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে হাংগেরির দার্শনিক Georg Lukacs ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন যে 'অ্যালিয়েনেশন' মার্কসবাদের অন্তরঙ্গ অংশ। 'অ্যালিয়েনেশন'-এর মাধ্যমেই মার্কসবাদের সঙ্গে জার্মানির ক্লাসিকাল দর্শনের যোগাযোগ এবং এই তত্ত্বটির সম্যক উপলব্ধি না হলে মার্কসের পুঁজিবাদের সমালোচনার সারমর্ম অনুধাবন করা যায় না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের ধারণা বিশ্লেষণ করতে হলেও 'অ্যালিয়েনেশন' তত্ত্বটির বিচার প্রয়োজন। আমাদের এই তাপ পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক যুগে এ-বিচার নতুন দাবি নিয়ে আজ উপস্থিত। এ যুগে তাপ-পারমাণবিক প্রলয়ের বিপদ মানুষের মাথার উপর ঝুলছে। যন্ত্রনির্ভর, শিল্পায়িত, গণসমাজে ব্যক্তিমানুষ ক্রমশই যাচ্ছে নেপথ্যে। রাষ্ট্রনায়কতা, পার্টিনায়কতা, সামূহিকতা ও আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে ব্যক্তি মানুষ আজ নিরাকার ব্রহ্মের

মতো ক্রমশই হয়ে উঠছে নামগোত্রহীন, মুখাবয়বহীন, গাণিতিক অ্যাবস্ট্র্যাকশন। তাই এই যুগে মানুষের সমস্যা, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার সম্পদগুলি বাঁচানো ও তাকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রশ্নগুলি এখন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই প্রশ্নগুলি যে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বর্তমান, মানুষের স্বাধিকারলাভের সমস্যা যে ওই সমাজে এখনও প্রকট, সমকালীন ইতিহাসের ছাত্রের সে কথা জানা আছে।

মার্কস তরুণ বয়সে মানুষের স্বাধীনতার সমস্যার মুখোমুখি হন, 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বটির স্বরূপ ও প্রকারভেদ, অ্যালিয়েনেশনের নিরাকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস রাজনীতির সমালোচনা, অর্থনীতির সমালোচনা করে আত্মচ্যুতিমুক্ত দ্যুতিময় ব্যক্তিমানুষের চিন্ময় মূর্তিকে তুলে ধরেন। আজও মানুষের সমস্যা, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্নগুলি কোনো সমাজেই অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাতে সন্দেহ নেই।

৩

তরুণ মার্কসের কিছু লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ায় মার্কসবাদের নতুন মূল্যায়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই নতুন মূল্যায়ন দুটি বাধার সম্মুখীন। সরকারি মার্কসবাদীরা তরুণ মার্কসের লেখায় শ্রেণীসংগ্রাম ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ কম থাকায় এই সব লেখাকে 'অর্বাচীন' আখ্যা দিয়ে হেয় করতে চান। তাঁদের মতে শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও আর্থনীতিক শোষণতত্ত্বই মার্কসবাদের সারাৎসার, 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্ব নয়। অন্যদিকে অনেক ভাবুক 'অ্যালিয়েনেশন'-কে মার্কসবাদের তত্ত্বচিন্তামণি আখ্যা দিয়ে শোষণতত্ত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বকে গৌণ মনে করেন। মার্কস-মানসের অখণ্ডতা ও ঐক্য স্বীকার করে এ-কথা বলা চলে যে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বেরই বিস্তার শোষণতত্ত্বে এবং শোষণহীন সমাজরূপায়ণের সাধন হিসাবেই শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের স্বীকৃতি।

তরুণ মার্কস একদিকে যেমন হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবাধীন ছিলেন তেমনি ফয়েরবাখের কাছেও তাঁর ঋণ সামান্য নয়। Phenomenology-তে হেগেল মানুষের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে যে ধারণা তুলে ধরেন সেই ধারণার প্রশংসা করেছেন মার্কস। হেগেল বলেছেন যে ইতিহাসের ধারাপথে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে চলে, আর এই সৃষ্টির সঞ্চালকশক্তি হল মানুষের শ্রম। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ মানুষের কর্মধারা ইতিহাসের সঞ্চালকশক্তি হিসাবে কাজ করে, আর এই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে মানুষ নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়। মার্কসের ভাষায় :

> The outstanding thing in Hegel's phemomenology is that Hegel grasps self-creation of man as a process, regards objectification as...alienation and as transcendence of this alienation ; and that he therefore grasps the nature of *Labour* and conceives the object man...as the result of his own *labour*.

হেগেল দর্শন সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও মার্কস বলছেন যে হেগেল 'শ্রম'কে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের (pure spirit) আত্মচ্যুত অবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের মতে ইতিহাসের প্রবাহে নির্বিশেষ প্রত্যয়েরই (abstract categories) শুধু সংঘাত। ব্যক্তিমানুষ এই প্রত্যয়ের শুধুই ছায়া। হেগেল রাজনৈতিক কিংবা অর্থনীতিক 'অ্যালিয়েনেশন'-এর স্বরূপ বুঝেছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনের পটভূমিতে। ফলে হেগেল-দর্শনে শুদ্ধচিন্তার লোকোত্তর স্তরেই 'অ্যালিয়েনেশন'-এর বিস্তার।

> The phenomenology is a concealed, unclear and mystifying criticism, but so far as it grasps the alienation of man...all the elements of criticism are cont5ained in it, and are often presented and worked out in a manner which goes far beyond in Hegel's own point of view.

'অ্যালিয়েনেশন'-এর নিবৃত্তি কেমন করে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রসঙ্গে হেগেল চলে গেছেন বিমূর্ত চিন্তার স্তরে। সামাজিক সংস্থাগুলির (institutions) সঙ্গে অ্যালিয়েনেশনের যে অন্তরঙ্গ যোগ হেগেল তা স্বীকার করেন নি। ফলে হেগেলের দর্শন পরিবার কিংবা সমাজ, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলি যে যেমনটি আছে ঠিক সেইভাবেই গৃহীত হয়েছে। হেগেল-দর্শনে পুনর্গঠনের (reconstruction) প্রস্তাব আছে, কিন্তু তার পরিসর কল্পলোকেই সীমিত। মার্কস বলছেন যে অ্যালিয়েনেশন-নিবৃত্তির জন্য বাস্তব পুনর্গঠন চাই। মানুষ যেহেতু বায়ুভুক, নিরালম্ব, নিরাশ্রয় নয় সমাজবদ্ধ জীব, সেজন্য সমাজ রূপান্তর না হলে অ্যালিয়েনেশন-নিবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে না। সমাজের মানবিক পুনর্গঠন হলে তবেই মানুষের স্বকীয় গুণাবলির প্রাপ্য-প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরি হবে, সৃষ্টি হবে নতুন নৈতিকতার পরিবেশ। ফয়েরবাখের সমালোচনা করে মার্কস বলেছেন যে ফয়েরবাখ শুধু ধর্মীয় চ্যুতি (alienation)-র পর্যালোচনা করেছেন। হেগেল দর্শনে ছিল alienation of Idea— অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎসর্জনতত্ত্ব। ফয়েরবাখ নতুন পথ পরিক্রমা করে উপনীত হলেন alienation of man — অর্থাৎ মানুষের আত্মচ্যুতিতত্ত্বে, অবশ্য ধর্মচেতনার পরিমণ্ডলে।

কিন্তু কোন অবস্থায় মানুষ স্বকীয় ক্ষমতা অন্য বস্তুতে আরোপ করে, মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের কামনা বাসনা, আবেগ-আকুতিকে চরিতার্থ করবার মানসে কল্পিত ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হয়, সেই 'সামাজিক কারণানুসন্ধান' ফয়েরবাখের দর্শনে নেই। *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি, দি হোলি ফ্যামিলি* (১৮৪৫), *দি থিসিস অন ফয়েরবাখ* (১৮৪৫) ও *জার্মান ইডিওলজি* (১৮৪৬) — এই চারটি পুস্তকে মার্কস ইতিহাসের দর্শন ও সমাজবিকাশের এক নতুন তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন সমাজনির্ভর অ্যালিয়েনেশন-প্রত্যয়ের সাহায্যে। হেগেলের কাছ থেকে মার্কস শিখলেন যে মানুষ নিজেকে ও নিজের জগতকে সৃষ্টি করে ব্যবহারিক ঐতিহাসিক কর্মের মাধ্যমে। এই কর্মের প্রভাবে মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, একই সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে।

> Since for socialist man the whole of what is called world history is nothing but the creation of man by human labour and the emergence of nature for man, he therefore has the evident and irrefutable proof of his self-creation, of his won origins.

ফয়েরবাখের কাছ থেকে মার্কস শিখলেন যে নৃতত্ত্ব ইতিহাসের চাবিকাঠি। কিন্তু ফয়েরবাখের নিত্য সনাতন মনুষ্যস্বরূপের (human essence) তত্ত্ব মার্কসের মতে ভ্রান্ত। মার্কস বললেন যে মানুষকে দেখতে হবে ইতিহাসের পটভূমিতে। মানুষ নিজেকে কীভাবে সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করছে বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের উপর। এই শক্তিগুলির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে 'মানুষের শক্তি', অন্যদিকে তেমনি আছে মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সমবায়ে গঠিত পরিবেশ। মার্কস যে সমাজের 'ক্রিটিক' হলেন তার হেতু এই যে, মার্কসের মতে সমাজ মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারেনি। সমাজজীবনেই মানুষ মনুষ্য-নামধেয় জীব হয়ে ওঠে একথা সত্য, তবুও সমাজই আবার মানুষের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানুষকে এমন অবস্থায় বন্দী করে রাখে যা নিতান্তই অমানবিক। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেহেতু দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধ সেই হেতু মানুষেব সৃজনশীল ক্ষমতা সমাজ-এর রথচক্রের তলায় নিষ্পিষ্টও হতে পারে।

মার্কস মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে না রেখে মানুষকে বসালেন জগতের কেন্দ্রে, স্বীকার করলেন যে মানুষের শ্রমই জগৎ-ক্রিয়ার মূল শক্তি। ফলে ভাববাদীদের মতো তাঁকে বলতে হল না যে মানুষ কর্মের দ্বারা, সামাজিক শ্রমের দ্বারা বদ্ধ। 'মানুষের শ্রম' শুধু তো অর্থনীতির প্রত্যয় নয়, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের সচেতন কর্মধারার সঙ্গে এই শ্রমেরই আত্যান্তক যোগাযোগ। মানুষ যে তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত করে বিশ্বানুগ (universal) হয়ে উঠতে পারে সেও এই শ্রমেরই

মাধ্যমে। ফলে সামাজিক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে দূরে বসিয়ে তাকে কল্পলোকে খুব একটা বড় পদ দিয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করবার দায় অন্তত মার্কসের নেই। সামাজিক শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষ নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বাধিকার লাভ করে, সমাজকে পুনর্গঠিত করে নিজের প্রয়োজন অনুসারে। এই শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তি লাভ করে, স্বাধীনতার আস্বাদ পায়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে স্বাধীনতা মানুষের স্বরূপলক্ষণ, আগন্তুক ধর্ম নয় :

> Freedom is so much the essence of man that its very enemies realise it in struggling against its reality. No man fights against freedom ; at most he fights against the freedom of others ।

আর এই স্বাধীনতা হবে খাঁটি যদি তা সর্বজনে প্রসারিত হয়, যদি মানুষ ব্যক্তিসত্তার মুকুরে মানবসত্যকে (potentialities inherent in the species) প্রতিফলিত করতে পারে। দেখা যাবে এই সব বক্তব্যে জার্মানির ক্লাসিকাল ভাববাদী দর্শনের ধারা, অন্যদিকে ফয়েরবাখের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা মার্কস-ভাবনায় প্রভাব রেখেছে। অবশ্য জার্মান দর্শনের ভাববস্তুকে মার্কস মর্ত্যের মাটিতে প্রোথিত করেছেন, আর ফয়েরবাখের দর্শনকে বেঁধেছেন ইতিহাসের বাঁধনে।

৪

The Shorter Oxford Dictionary 'অ্যালিয়েনেশন' পদটির অর্থ করেছে : ক. the action of estranging or state of estragement ; খ. the action of transferring ownership to another গ. diversion of anything to a different purpose ঘ. the state of being alienated ঙ. loss or derangement of mental faculties ; insanity. । ইয়োরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় 'অ্যালিয়েনেশন' পদটি অপ্রকৃতিস্থ কিংবা উন্মাদ ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। গত শতাব্দীতে হেগেল ও মার্কস পদটি ব্যবহার করেছেন অন্য অর্থে। আত্মচ্যুত ব্যক্তি হয়তো অপ্রকৃতিস্থ নয়, ব্যবহারিক জীবনে হয়তো সে স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে, কিন্তু নানাভাবে সে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা। মার্কস 'অ্যালিয়েনেশন'-কে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে আত্মচ্যুতি হল মানুষের এমন অবস্থা যখন তার নিজের ক্রিয়াকলাপ অনাত্মীয় শক্তি হয়ে ওঠে। তাকে ছাপিয়ে ওঠে, মানুষের শাসনে না থেকে মানুষকেই গৌণ করে ফেলে। 'অ্যালিয়েনেশন' এমন এক অবস্থা:

> where his own act becomes to him an alien power, standing over and against him, instead of being ruled by him।

এই বিশেষ অর্থে যদিও অধুনা পদটির বহুল ব্যবহার, তবুও ধর্মশাস্ত্রে পদটি বহুদিন ধরেই প্রচলিত। একেশ্বরবাদীরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন এ জন্য নয় যে ঈশ্বর এক অতএব বহুদেবতাবাদ ভ্রান্ত। তাঁদের আপত্তিটা এইখানে যে পৌত্তলিকতায় মানুষের আত্মচ্যুতি ঘটে, নিজের শক্তি ও শিল্পক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষই দেবমূর্তি গড়ে, অথচ ওই মূর্তির পায়ে মাথা লুটিয়ে দেয় মানুষ ; এ কথা বোঝেন যে মানুষই স্রষ্টা এবং ওই দেবমূর্তি মানুষেরই সৃষ্ট। যেখানেই স্রষ্টা মানুষ, কর্মী মানুষ, ভাবুক মানুষ, নিজের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা ভুলে নিজেকে দীনহীন বলে ভাবে, নিজেকে বিলিয়ে দেয় দেবতার পায়ে, সে দেবতা লোকোত্তর বা লৌকিক যাই হোক না কেন, নিজের সৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সৃষ্টবস্তুর দাস হয়ে পড়ে, সেখানেই দেখা যায় আত্মচ্যুতির অবস্থা।

মার্কস শ্রেণীবিন্যস্ত সম্পত্তিনির্ভর সমাজে 'অ্যালিয়েনেশন' যে সর্বব্যাপী এ সত্যকে বুঝতে পেরেছেন, বিশেষত আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে। যাঁরা বলেন যে মার্কসের 'অ্যালিয়েনেশন' তত্ত্ব শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাঁরা ইচ্ছে করেই মার্কসবাদকে বিকৃত করেন। কেননা

মার্কসের বিশ্বদর্শনে মানুষের সমগ্র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ইতিহাস বিধৃত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানপতন, তার অন্তর্লীন নিয়মের বিশ্লেষণে মার্কস জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন একথা সত্য। তার কারণ মার্কস পুঁজিবাদের ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রবাহমান ইতিহাসে পুঁজিবাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্ব শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে সীমিত নয় *Economic and Philosophic Manuscripts* ও তরুণ মার্কসের অন্যান্য লেখায় একথা স্পষ্ট। 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্ব আরও অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এই তত্ত্বটির অনুশীলন করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে সমাজের, মানুষের নিজস্ব স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে মার্কসের বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব। সরকারি মার্কসবাদীরা অধুনা বিপাকে পড়ে 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বটি বর্জন করতে পারছেন না। তবুও এই তত্ত্বটিকে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে দেখিয়ে তাঁরা মার্কসবাদকে সংকুচিত করে রেখেছেন।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হেগেল ও ফয়েরবাখ 'অ্যালিয়েনেশন'-এর প্রশ্ন তুলেছেন। একজন ব্রহ্মবাদের অঙ্গ হিসেবে, অপরজন নৃতাত্ত্বিক দর্শনের পটভূমিতে। মার্কস হেগেলের alienation of Idea-কে বর্জন করেছেন। ফয়েরবাখের alienation of man -কে অনেক গভীরে নিয়ে গেছেন।

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ থেকে মানুষের পার্থক্য কোথায়? জীবধর্মের দিক থেকে, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে বিচার করে শংকরাচার্য তো বলেছিলেন মানুষ পশুর চাইতে খুব একটা আলাদা নয় (পশ্চাদিভিঃ চ অবিশেষাৎ)। মার্কস বলছেন মানুষের বিশেষতা অন্যত্র। ক্রমবিকাশের ধারাপথে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে প্রকৃতিকে পাল্টাতে। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সূত্রপাত হয়, শ্রমপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতির জগতকে পরিবর্তিত করে। একদিক থেকে মানুষ শ্রমেরই ঐতিহাসিক ফল। সামাজিক উৎপাদনের ধারাপথে মানুষ প্রকৃতিকে নিত্যনবরূপে অভিষিক্ত করে এবং এই কাজে মানুষ সাহায্য পায় স্বকীয় একটি বিশেষ ক্ষমতা থেকে। এই ক্ষমতাটি হল বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি, যেটি মনুষ্যেতর প্রাণীর নেই। *ক্যাপিটাল*-এ মার্কস তাই বলেছেন :

> What distinguishes the worst architect from the best of bees is this, that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. At the end of every labour process, we get a result that already existed in the imagination of the labourer at its commencement. He not only effects a change of form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives the law to his modus operandi.

মানুষ যে মৌমাছি নয়, কীটপতঙ্গ নয়, অশিক্ষিতপটু জন্তু থেকেও যে মানুষ আলাদা, মানুষের যে স্বকীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা আছে, 'আছে'-র জগতে থেকে 'উচিত'-এর, 'ইষ্ট'-এর জগতের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা আছে, মার্কস বহু লেখায় এ কথা বলেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অবশ্য কাজ করে অনেক সময়, সে কাজ প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত। সে-কাজ তাই নেহাৎই একপেশে, সংকীর্ণ। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী থেকেমানুষ স্বতন্ত্র এইখানে যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি, কর্মশক্তি — যখন বাধামুক্ত হয়ে প্রয়োজনের সীমার বাইরে সৃষ্টি করে তখনই মানবসৃষ্টি সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয় (man produces universally)। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদই মানধর্মের বৈশিষ্ট্য। চেতনার প্রাচুর্য, উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা মানুষের বেলায় অভিব্যক্তির পথ খোঁজে। মানুষ সুন্দরের সাধনা করে, প্রকৃতি ও জীবনকে মনের মাধুরী মিশিয়ে মনোহররূপে সৃষ্টি করে (creates

according to the laws of beauty)। শিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ করে প্রকাশ করে তার মানবিক স্বরূপকে, যে স্বরূপ স্রষ্টা এবং সুন্দর। বিষয়কে রূপকলার মাধ্যমে সুন্দর আকৃতি দেয় মানুষ এবং মানুষেরই সৃষ্ট কর্মই শুধু সর্বমানবে এবং সর্বকালে প্রসারিত হয়, মানুষ সেইভাবেই বিশ্বানুগ হয়ে ওঠে। মার্কস এসব কথাই বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

> To be sure animals also produce. They build nests, dwellings etc. like the bees, beavers, ants and others. But they only produce for their own or their off-springs' immediate needs; they produce one-sidedly. *While man produces universally* ; they produce under the domination of immediate physical needs, while man produces independently of physical needs are really produces when free of these needs. They produce only for themselves while man reproduces all nature ; their product belongs directly to their physical body ; while man *freely* faces his product. Animals create only according to the measure and need of the species while man can produce according to the measure of every species and can everywhere supply the inherent measure of the object. Hence man also creates according to the laws of beauty.

বিষয়-এর তথা সৃষ্টবস্তুর দাস নয় মানুষ, কেননা মানুষ বিষয়কে চেতনাসম্পদের সাহায্যে স্বাধীনভাবে রূপের বাঁধনে আনে (freely faecs his product)—অপ্রয়োজনের ফসল হিসাবে 'সুন্দর'কে সৃষ্টি করে মানুষ (man creates according to the law of beauty) — এই সব নানা ভাষায়, নানাভাবে স্রষ্টা মানুষের প্রশস্তি গেয়েছেন মার্কস। মানুষ যে সামাজিক জীব, সমাজ-আশ্রয়েই যে মানুষ 'সামাজিক' ও 'মানবিক' হয়ে ওঠে একথা মার্কস অবশ্যই স্বীকার করেছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ যে শুধু অ্যাবস্ট্র্যাকশন, সামাজিক সম্পর্কের তন্তুজালে অবস্থিত (ensemble of social relations) মানুষই যে 'ঐতিহাসিক মানুষ' এ বক্তব্যও মার্কসের। কিন্তু মার্কসবাদ কখনও একথা বলেনি যে সমগ্রের মহাসমুদ্রে ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু শুধুই বুদ্‌বুদের মতো, মায়ায় ঘেরা, অযথার্থ। বলেনি যে 'মানুষ কর্মী' মৌমাছির মতো সমগ্রের প্রয়োজনে কাজ করা ও প্রজাতিকে (species) বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই যার চরিতার্থতা। মার্কস বরং বলেছেন যে, স্রষ্টা মানুষের কাজ শুধুই প্রয়োজনের শিকলে বাঁধা নয়। মানুষের কাজের বিশেষত ভাবকর্মের আছে সর্বকালীন বিস্তার। প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ সুন্দরের সাধনা করে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে শ্রেয়কে পাবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানবাত্মাকে মার্কস বহুতন্ত্রী বীণা হিসেবেই দেখেছেন, আত্মার ভাস্বর সূর্যকিরণ ব্যক্তির ও বস্তুর বিচিত্র প্রকাশধর্মিতায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। যখনই দেখেছেন যে নানাভাবে এই বহুতন্ত্রী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করবার চেষ্টার অন্ত নেই, তখনই মসিযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

৬

মানুষের সঙ্গে মৌমাছির যে পার্থক্য মার্কস করেছেন তার তাৎপর্য কী? মৌমাছিতন্ত্র ও মানবধর্ম যে আলাদা, মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত করতে হলে যে মানুষের উদ্দেশ্যকে, চিন্তাভাবনাকে ও শ্রেয়োবোধকে বুঝতে হবে—এ-কথাই মার্কস বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষকে যদি খণ্ডিত করে দেখি, ভাবি যে মানুষ শুধুই টেকনিক্যাল মানুষ, আর্থনীতিক মানুষ, লোভী মানুষ, মানুষকে যদি মানবীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না করে দেখি তবে, মার্কসের মতে, মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করা যাবে না।

মার্কস আত্মচ্যুতি ও আত্মআবিষ্কারের পটভূমিকায় প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের প্রশ্ন তুলেছেন।

জীবনচর্চার সকল ক্ষেত্রে মানুষ যে মহিমাময় হয়ে উঠতে পারেনি, আজও জ্ঞানে, কর্মে, স্নেহপ্রেমপ্রীতিতে, সুন্দরের সাধনায় সার্থকতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি, আশু প্রয়োজনের বৃত্তে ঘুরে ঘুরেই জীবনপাত করেছে, তার মূল কারণ হিসেবে অ্যালিয়েনেশন-কে চিহ্নিত করেছেন মার্কস। মার্কস দেখেছেন যে, শ্রমবিভক্ত, অর্থলোলুপ, সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজে মনুষ্যত্ব সীমা ও তুচ্ছতার বাঁধনে পীড়িত ও অবমানিত। সৌন্দর্যের প্রকাশ নেই এই সমাজে। সামাজিক কর্মে (সে-কর্ম অর্থনৈতিক উৎপাদন হোক, কিংবা সাংস্কৃতিক সৃষ্টিই হোক) আজ যদিও বিশ্বানুগ হয়ে ওঠার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তবু এই সম্পত্তিনির্ভর সমাজে দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, অহংমাভিমান, মালিকানা প্রভৃতির প্রভাবে জীব ব্যক্তিসীমায় সীমিত। মানবজীবনের প্রকাশধর্মিতার আসল রূপ প্রয়োজনাতীত প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। কিন্তু সমাজে সে-রূপ নেই। আধুনিক সমাজে পুঁজি মহারাজ (My Lord Capital) লোভের মোহে বাঁধা। আর শ্রমজীবী সাধারণ শ্রমবিভাগ ও শোষণের শিকলে বাঁধা। এই অসুন্দর যন্ত্রপুরীর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস আবেগমুখর ভাষায় :

> Private property has made us so stupid and onesided that an object is only ours when we have it, when it exists for us as capital or when we possess it dirtectly, eat it, drink it, wear it out on our body, live in it, in short use it...For all the physical and spiritual senses, therefore, the sense of having...has been substituted.

কী দাস সমাজে, কী সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, কী পুঁজিবাদী সমাজে, সর্বত্রই মার্কস অ্যালিয়েনেশনের প্রকাশ দেখেছেন। *পাণ্ডুলিপি*-তে মার্কস সম্পত্তি-নির্ভর, পণ্য উৎপাদনকারী সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে। এ-সমাজে স্ববিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। শ্রমিক যত বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করে ততই তার জীবনধারণের গ্লানি বৃদ্ধি পায়। পুঁজিপতিরা যতই প্রতিযোগিতায় নামে ততই বেশিসংখ্যক পুঁজিপতির বরাতে সর্বনাশ নেমে আসে।

> The more riches the worker produces the more his production increases in power and scope, the poorer he becomes. The more commodities a worker produces the cheaper a commodity becomes. The devaluation of the world of men proceeds in direct proportion to the exploitation of the world of things. Labour not only produces commodities, but it turns itself and the worker into commodities and does so in proportion to the extent that is produces commodities in general.

মার্কস বলছেন যে এটাই হল অর্থনীতির সারাৎসার। আর আমরা যে অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত সেই অর্থনীতির মৌলিক বস্তুই হল অ্যালিয়েনেশন। অ্যালিয়েনেশন আছে বলেই শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি উৎপাদন করে ততই তার নিজের উপভোগের পরিমাণ কমে, যত বেশি সে মূল্যসৃষ্টি করে ততই তার নিজের মূল্যহীনতা প্রকট হয়, তার সৃষ্টবস্তু যত সুন্দর হয়ে ওঠে, ততই সে আকার প্রকারহীন বস্তুতে পরিণত হয়।

> The more the worker produces the less he has to consume, the more values he creates, the less value - the less diginity-he himself has ; the better-shaped the product the more misshapen the worker, the more civilised his product, the more barbaric the worker. Thus labour produces wonders for the rich, but strips the worker...It produces culture, but idiocy cretinism for the worker.

শিল্পায়িত যন্ত্রনির্ভর শ্রমবিভক্ত সমাজের কার্য-পরিস্থিতি (work situation) দেখে মার্কস চার প্রকারের অ্যালিয়েনেশনের কথা তুলেছেন : ক) ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অ্যালিয়েনেশন (alienation from the process of work) ; খ) সৃষ্ট বস্তু হতে অ্যালিয়েনেশন (alienation from the products of work); গ) নিজের মানবিক স্বরূপ থেকে অ্যালিয়েনেশন (alienation of the worker from himself); এবং ঘ) অপর মানুষ থেকে অ্যালিয়েনেশন (alienation of the worker from others)।

মার্কসের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

> What, then, constitutes the alienation of labour ? Firstly in the fact that labour is external to the worker i.e., it does not belong to his essential being, in fact that he therefore does not affirm himself in his work, but negates himself in it, that he does not feel content, but unhappy in it...His work, therefore, is not voluntary but coerced ; it is forced labour. It is therefore, not the satisfaction of a need but only a means for satisfying needs external to it...The relation of the worker to the product of labour as an alien object exercising power over him. The result therefore is that man (the worker) no longer feels himself acting freely except in his animal functions, eating, drinking and procreating, while in his human functions he feels more and more like an animal. What is animal becomes human and what is human becomes animal. Alienated labour therefore turns the generic being of man, both Nature and the intellectual wealth of his species, into a being alien to him...It alienates his own body from man, it alienates from him both outside him and his intellectual being, his human nature. A direct consequence of the fact that man is alienated from the product of his labour, from his life actrivity from his generic being is the alienation of man from man.

উদ্ধৃতিগুলি শ্রমসংক্রান্ত এবং মার্কস কখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উল্লেখ করেননি। কেননা মার্কস অ্যালিয়েনেশনকে ঐতিহাসিক সমাজের সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, যদিও তাঁর মতে এই সমস্যা পূর্ণতা লাভ করে পুঁজিবাদী সমাজে। অ্যালিয়েনেশনকে মার্কস এমন সর্বব্যাপী প্রত্যয় হিসাবে দেখেছেন যে তাঁর মতে পুঁজিপতিও অ্যালিয়েনেশনের দায়ভাগ বহন করে শ্রমিকের মতোই। পার্থক্য শুধু এইখানেই যে শ্রমিক অ্যালিয়েনেশন-সঞ্জাত দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত, আর পুঁজিপতি দুঃখ সম্পর্কে সচেতন নয়। *পবিত্র পরিবার*-এ মার্কস বলেছেন :

> The propertied class and the class of the proletariat present the same human self-alienation. But the former class finds in this self-alienation its confirmation and its good, its own power ; it has in it a semblance of human existence. The class of the proletariat feels annihilated in its self-alienation ; its sees in it its own powerlessness and the reality of an inhuman existence.

জার্মান ইডিওলজি-তে মার্কস বলছেন যে অ্যালিয়েনেশনের উৎস শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ থেকেই অ্যালিয়েনেশন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উভয়েরই আবির্ভাব। স্থূল কমিউনিজমের সমালোচনা করে মার্কস বলেছেন যে এই মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রত্যয়কে অতিক্রম করে অ্যালিয়েনেশনের তত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলে এই মতবাদে বিভ্রম থেকে গেছে। এই মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁরা

ভেবেছেন যে অর্থনীতির স্ববিরোধিতা দূর করবার উপায় শুধু একটি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাকরণ করে সামাজিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা হলেই ইষ্টলাভ, এই অতিসরলীকৃত সূত্রের প্রভাব এই মতবাদে প্রত্যক্ষ। অথচ মার্কসের মতে অ্যালিয়েনেশনের নিবৃত্তি যদি না ঘটে এবং এই নিবৃত্তির ফলশ্রুতি হিসাবেই শুধু সম্পত্তি প্রত্যয়ের দাসত্ব পবিহার করা যদি না যায়, তবে শ্রম স্বধর্মে সংস্থিত হবে না।

> On the one hand communism is so much under the sway of material property, that it wants to destroy everything which cannot be owned by everybody as private property ; on the otherhand, it regards direct physical ownership as the only aim of life and existence. How little this annulment of private property is really an appropriation is in fact proved by the abstract negation of the entire world of culture and civilisation the regression to the unnatural simplicity of the poor and undermanding man who has not only failed to go beyond private property, but has not yet even attuned to it.

মার্কস ভেবেছেন যে প্রকৃত সাম্যবাদে আত্মচ্যুতির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটবে, মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে মানবধর্মে। শ্রমবিভাগ বহাল রইল, মানুষের সত্তা খণ্ডিত হয়ে রইল মুখাবয়বহীন গণসমাজে, রাষ্ট্রনায়কতা, ধর্মনায়কতা, আমলাতন্ত্রের শাসনাধীন হয়ে রইল মানুষ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সাযুজ্য সংসাধিত হল না, ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে মানবিক মানুষের ব্যবধান স্থায়ী হল, এমন অবস্থায় অ্যালিয়েনেশনের নিরাকরণ হবে কেমন করে? মার্কস মনে করেছেন যে এই শ্রমবিভক্ত, অসুন্দর জগতের যূপকাষ্ঠে মনুষ্যস্বরূপ বলি হয়েছে। মানবিক প্রকৃতিকে আপন করে নিয়ে আনন্দ ও সৌন্দর্যোপলব্ধির পথে আজও মানুষ বিশ্বানুগ হয়ে উঠতে পারেনি। মার্কস ভেবেছেন যে শ্রমবিভাগের ও শোষণের অবসান হলে মানুষ স্বাধিকার পাবে, অধিষ্ঠিত হবে মানবধর্মে। বাহ্যজগতে যে এক অর্থে মানুষেরই জগৎ, মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও অনুভবশক্তির পরিসর অনুযায়ী এ-জগৎ তার বিশেষ রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে, মার্কস সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে মার্কস এ-কথাও জানতেন যে মানুষের জ্ঞান কর্ম ও অনুভব শক্তির পরিসর আজও নেহাৎ-ই সংকীর্ণ-বিষয়বুদ্ধি, ক্ষমতালিপ্সা, লোভ ও নানাধরনের শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা। আত্মচ্যুত জীবসত্তা মানবিক জীবনকর্মের মধ্যে দিয়ে (human life activity) মনুষ্যত্বের আদর্শকে যতটা রূপায়িত করতে পারবে, নিজের মানবিক স্বরূপকে (individual social being) আবিষ্কার করে বিশ্বজনীনতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, ততই প্রগতির পথ হবে অবারিত। সেই বিশ্বজনীন পূর্ণতার সাধনাই মানুষের পরম ইষ্ট। মার্কস স্থূল সাম্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ছিলেন। সামাজিক মালিকানা হলেই নতুন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল এই শিশুভোলানো কাহিনিকে গ্রহণ করেননি। *পাণ্ডুলিপি*-তে সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে তাই তিনি লিখেছেন যে আত্মচ্যুতির নিরাকরণ চাই, প্রবুদ্ধ ব্যক্তিমানুষের প্রকাশ চাই, নচেৎ কমিউনিজম ব্যর্থ। তিনি চেয়েছেন যে সাম্যবাদ তা মানবিকবাদের সঙ্গে অভিন্ন:

> Communism as the positive *transcendence* of private property, as human self-estrangement, and therefore as the real *appropriation of the human* essence by and for man ; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i.e. human) being - a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development. ·

যতদিন শ্রমবিভাগ আছে সম্পত্তি চেতনা আছে, স্রষ্টা মানুষের প্রকাশ নেই, যতদিন ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ

কর্মে মানুষ বাঁধা থাকবে, পরবশ হয়ে থাকবে — হয় শিকারী, নয় ধীবর, নয় গোপালক নয়তো তাত্ত্বিক সমালোচক হিসাবে খণ্ডিতভাবে যতদিন মানুষকে জীবনপাত করতে হবে, বুঝতে হবে মানুষ ততদিন স-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সাম্যবাদে স্বাভাবিক মানবিকবাদ পূর্ণতালাভ করবে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটবে :

> This communism is the consummated naturalism = humanism, the consummated humainism = naturalism, it is the genuine resolution of the conflict between man and Nature and between man and man - the true resolution of the strife between existence and true being.

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মার্কসবাদের সমালোচনা

মার্কসবাদ সম্পর্কে, মার্কসবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিগত একশো বিশেষত পঞ্চাশ বছর ধরে এত যে আলোচনা হচ্ছে তা মার্কসীয় চিন্তাধারার মৌলিকতা, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ। মার্কসবাদ বস্তুত কী? এই প্রশ্নে বিভিন্ন মার্কসবাদী পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও প্রভাবশালী পার্টিগুলি ঐক্যমতে উপনীত হতে পারছেন না। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্ববাসীর বিশাল এক অংশ মার্কসবাদী সমাজব্যবস্থায় বসবাস করছেন এবং বিশাল আরেক অংশ মার্কসবাদে বিশ্বাসী। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাটিই মার্কসবাদের আলোচনা ও পুনরালোচনার সপক্ষে মহোত্তম যুক্তি। মার্কসবাদের সমালোচনা নানা দিক থেকেই বোঝা যেতে পারে। ১. যারা মার্কসবাদের বিরোধী তাঁদের দিক থেকে ; কিংবা যাঁরা মার্কসবাদের সমর্থক তাঁদের দিক থেকে। ২. যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিন্তু মার্কসবাদী সমাজব্যবস্থার বাস্তব ইতিহাসের প্রতি সম্পূর্ণ বা অংশত শ্রদ্ধাহীন তাঁদের দিক থেকে ; কিংবা যাঁরা মার্কসবাদের কোনও-না-কোনও বাস্তব রূপায়ণের সমর্থক (কিন্তু ক্ল্যাসিকাল মার্কসবাদ বলতে যা বোঝানো হয় তার প্রতি উদাসীন) তাঁদের দিক থেকে ; ৩. এমন অনেকে আছেন যাঁরা মার্কসবাদের একটি (বা কয়েকটি) দিক (যথা অর্থনীতি) গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য একটি (বা কয়েকটি) দিক (যথা দর্শন) গ্রহণ করেন না। এঁরা মার্কসবাদকে একটি অবিচ্ছেদ্য 'সিস্টেম' বা প্রস্থান বলে মনে করেন না। ৪. এমন অনেকে আছেন যাঁরা মার্কসবাদের মূল প্রবক্তাদের একজনের বক্তব্য গ্রহণ করেন, কিন্তু অপরজনের বক্তব্য গ্রহণ করেন না। ৫. মার্কসবাদের সমালোচনা প্রবক্তা ও সমালোচকদের বক্তব্য ধরেও করা যায়, আবার সমালোচ্য বিশয় ধরেও করা যায়। সমালোচনার এই যে বিভিন্ন দিকের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হল তা যে সব পরস্পরবিরোধী তা নয়। আমার মতে মার্কসবাদের যে ত্রুটিগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমি কেবলমাত্র সেই সমালোচ্য বিষয়গুলিরই পুনরালোচনার অবতারণা করব।

সত্যাসত্য বিনিশ্চয়।

হেগেলের ডায়ালেকটিককে সমালোচনা করে মার্কস যা বলছেন তা সর্বজনবিদিত। হেগেল তাঁর ডায়ালেকটিক-কে (পায়ের বদলে) মাথা দিয়ে হাঁটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, জন-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে হেগেল জড়ের স্থলে মৌলিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন চৈতন্যকে। মার্কসের দাবি, তাঁর ডায়ালেকটিকে জড় তার প্রাপ্য প্রাধান্যের স্বীকৃতি পেয়েছে : মার্কসীয় ডায়ালেকটিক (যা স্বাভাবিক) পা দিয়েই হাঁটে। ফরাসি দার্শনিক মেলো-পন্তি আপত্তি করে বলেছেন, মার্কসীয় ডায়ালেকটিক অনুসারে পা (অর্থাৎ জড়) শুধু হাঁটবার অধিকারই পায় না, চিন্তা করার শক্তিও (স্ব-চৈতন্যও) অর্জন করেছে।

সত্যাসত্যবিনিশ্চয় প্রসঙ্গ মূলত জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। জ্ঞানের সঙ্গে জগতের, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর, এবং কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক না বুঝে সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। মার্কসবাদীর মতে, জগৎ জ্ঞান নিরপেক্ষ। জগৎ জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়। জগৎ সীমাহীন। জ্ঞানেরও সীমান্তও ক্রমবর্ধমান। জ্ঞানকে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জগতের প্রতিবিম্ব বললে কিছু অসুবিধা আছে। তাতে মনে হতে পারে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কান্টের মতো প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদী-বিষয় বিষয়ীর, জ্ঞান-জগতের ও জ্ঞান-কর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও

নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব অস্বীকার করে। মার্কসবাদী যদি বলেন বিষয় (তথাচ বস্তুজগৎ) বিষয়ীর (মনোজগতের) সৃষ্টি, তাহলে তার বস্তুবাদ (রিয়ালিজম) ক্ষুণ্ণ হয়। যদি তিনি বলেন বিষয়ীতে বস্তুজগতের প্রতিবিম্ব মাত্র তাহলে তার দ্বন্দ্ববাদ ক্ষুণ্ণ হয়। ঘনায়মান উভয় বিপদ এড়াতে গিয়ে মার্কসবাদী বলেন, বিষয়ীকে (জ্ঞাতাকে) নির্দ্বন্দ্ব, একক, নিঃসঙ্গ ভাবলে ভুল হবে ; আসলে সে সক্রিয় ও সমাজের প্রতিভূ কোনও এক শ্রেণীর মানুষ। জ্ঞানমাত্রই কর্ম প্রভাবিত এবং কর্মও জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। প্রশ্ন থেকে যায় : কোনও একটি জ্ঞান-কর্ম যে যথার্থই জ্ঞান-কর্ম তার প্রমাণ কি? বিষয়ের প্রতিবিম্ব যে সত্য তা নির্ণয় করতে হবে কী ভাবে?

মার্কসবাদীদের মতে, জ্ঞানের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। তবে নির্বিকল্প (ইমিডিয়েট) প্রত্যক্ষে আমরা জগতের বা বিষয়ের আভাস মাত্র পাই, যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যক্ষ-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আরও নিয়বয়ব (অ্যাবস্ট্রাক্ট) ও সামান্য (জেনারেল) করতে হবে। প্রত্যক্ষোত্তর এই নিরবয়ব ও সামান্য অভিজ্ঞতাকে বলা হয় যথার্থ (লজিকাল) জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানে বিষয়বস্তুর সারমর্ম ধরা পড়ে, স্থূলরূপে নয়। যথার্থ জ্ঞানের লক্ষ্য হল বিশেষ বিষয়বস্তুতে সামান্য বা সারধর্মকে আবিষ্কার করা। জ্ঞান লাভের প্রথম দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে স্থূল জড়বস্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত হয়, পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয় ধারণার মাধ্যমে উচ্চতর সামান্যধর্ম অর্জন করে। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বে এইভাবে বুদ্ধিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করা হয়।

মার্কসবাদী জ্ঞানকে প্রতিবিম্ব বললেও নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্ব বলে স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ থেকে শুরু করে যথার্থ জ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটিই দ্বান্দ্বিক এবং উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, বিচার ও ব্যবহারের মধ্যে মার্কসবাদী কোনও নির্দিষ্ট ভেদরেখা আছে বলে মানেন না। এই বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ব্যবহারের (প্রাক্‌টিসের) ভূমিকা দ্বৈত : জ্ঞানের ভিত্তি এবং সত্যের নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়ান)। যে কোনও ব্যবহার অবশ্য জ্ঞানের ভিত্তি বা সত্যের নির্ণায়ক বলে স্বীকৃত নয়। প্রথমত বৌদ্ধিক (ইন্টেলেকচুয়াল) ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত ব্যবহার সত্যের নির্ণায়ক বলে পরিগণিত হবে না। যে ব্যবহার বাস্তব (মেটিরিয়াল) এবং সমাজায়ত সেই ব্যবহারই কেবলমাত্র সত্য নির্ণয়ের সহায়ক। বাস্তব ব্যবহারের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে সেই ব্যবহারই বাস্তব বা বাস্তব দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামে, শ্রেণীউদ্দেশ্যচেতন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পকর্মে নিযুক্ত। মনুষ্যদেহের স্থূল ইন্দ্রিয়াদি থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম ধ্যানধারণাদি সকল কিছুই ব্যবহারের ফলশ্রুতি। ব্যবহারের দ্বিতীয় কাজ হল সত্য নির্ণয় বা নিরূপণ করা। চিন্তা এককভাবে সত্য নির্ণয়ে অসমর্থ। ভাববাদীরা যে চিন্তার সার্বভৌমত্ব দাবি করেন মার্কসবাদীরা তা গ্রহণ করেন না। মনুষ্য-চিন্তা বিষয়গত সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে কি না তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, মার্কসবাদীর মতে, ব্যবহারসাপেক্ষ। সত্য চিন্তা ব্যবহারিক সাফল্যদায়ক, সফল প্রবৃত্তির জনক। কোনও কোনও মার্কসবাদী ব্যবহার রূপে গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শিল্পসংক্রান্ত কার্যাবলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে সতর্ক করার জন্য এ-ও বলা হয়েছে যে, সত্যনির্ণয়ের সব থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যবহার গবেষণাগারে লভ্য নয়। রুটকেভিচ বলেন : 'পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ উভয়েই ব্যবহারের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু ব্যবহারের সর্বোত্তম পরিচয় হল জনগণের শ্রমে ও রাজনৈতিক কর্মে — উৎপাদনে ও শ্রেণীসংগ্রামে।' জর্জিয়েভের বক্তব্য আরও স্পষ্ট : ' বৈপ্লবিক ব্যবহার ছাড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।' এ বক্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও ব্যবহারের যে অর্থকে মার্কসবাদী মৌল বলে মনে করেন তা স্মরণ করলে এ-বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া এ-বক্তব্যের এক একটি দিক নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য : তা হল সত্যনির্ণয়ে চিন্তার সার্বভৌম দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চিন্তার ক্রিয়াশীলতার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু এ বক্তব্য এইভাবে না হলেও মার্কসবাদীদের পূর্বে (এবং পরে তো বটেই) অনেক দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীই বলেছেন।

মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আরেকটি অভিনন্দনযোগ্য দিক হল নিরপেক্ষ সত্য ও সাপেক্ষ সত্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা। নিরপেক্ষ সত্য বিষয়গত এবং সাপেক্ষ সত্য বিষয়ীগত। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু শাশ্বত নয়। সত্য একটি প্রবাহবৎ (প্রসেস) দ্রব্যবৎ এর অস্তিত্ব আছে কল্পনা করলে ভুল হবে। নিরপেক্ষ সত্য বিষয়গত সত্যের পূর্ণ বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও বিষয়ী-চৈতন্যেই বিষয়গত সত্যের পূর্ণ বিস্তার প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যলভ্য সত্য মাত্রই বিষয়ী-সাপেক্ষ এবং অসম্পূর্ণ। ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ বিষয়ীগত ধারণা থেকে বিষয়গত সত্যের প্রতি এগিয়ে চলেছে। অসম্পূর্ণ বা খণ্ড সত্যে পূর্ণ বা অখণ্ড সত্য প্রকাশিত, যেমন বিশেষ জ্ঞানে সামান্য জ্ঞান প্রকাশিত। যেসব পূর্ণ ও অকাট্য সত্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব।

জ্ঞানতত্ত্বে লেনিন-কথিত প্রতিবিম্ববাদ (কপি থিওরি) সহজ বস্তুবাদের নতুন একটি সংস্করণ মাত্র। ভাববাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে সহজ বস্তুবাদের যে যুক্তিটি অনেকেই স্বীকার করেন তা হল বস্তু-জগৎ চৈতন্য নিরপেক্ষ। এই যুক্তিটি স্বীকার করলেই লেনিন যে প্রতিবিম্ববাদের কথা বলেছেন তা অবশ্য গ্রহণীয় হয় না। বার্কলি-র ভাববাদ বা মাখ-এর প্রত্যক্ষবাদ ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু লেনিনের সরল বস্তুবাদ উন্নততর বিকল্প নয়। এ কথা স্বীকার করা শক্ত যে শ্রুত শব্দ ধ্বনিতরঙ্গের কপি বা ইমেজ। জ্ঞান বিষয়ের প্রতিবিম্ব, নাকি প্রতীক — এই বিষয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যেই মতভেদ আছে। কর্নফোর্থের রচনা দেখে মনে হয় না তিনি প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন। নিওনভ ও মিটিন এ-বিষয়ে যা বলেন তাতে সমস্যার গুরুত্ব ও লেনিন কথিত সমাধান যে আরও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ তা স্বীকৃত। প্রত্যক্ষীভূত বিষয় ও জগতে অবস্থিত চৈতন্য-নিরপেক্ষ বিষয়ের সামঞ্জস্য যে যান্ত্রিকভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না তা অনেক মার্কসবাদীই স্বীকার করেন। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই আবয়বিক সামঞ্জস্য (আইসোমর্ফিজম) ব্যাখ্যার চেষ্টা যদিও হয়েছে, মনে রাখতে হবে, এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব সম্বন্ধেই গুরুতর জিজ্ঞাসা আছে। বলা হয়েছে, হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মতো মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিও প্রমাণশাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি-(স্ব-বিরোধ নীতি) ভঙ্গের দোষে দুষ্য। মুশকিল হল, লেনিনের মতে, প্রমাণশাস্ত্রের এই নীতিগুলিও বিষয়ী-চৈতন্যে বিষয়ের প্রতিবিম্ব। প্রশ্ন থেকে যায় : তা হলে মৌলিক নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যে দ্বান্দ্বিক নীতিগুলো অনুসৃত হয় তাদের স্বরূপ ও উৎপত্তি কীভাবে বুঝব? অনবস্থা দোষ ঘটছে না?

জগৎ যে জ্ঞান নিরপেক্ষ এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণিত বলে স্বীকার করে মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। জ্ঞানকে বিষয়ের প্রতিবিম্ব বলা অর্থহীন, যদি না বিনা সমালোচনায় স্বীকার করা হয় যে, বিষয়ী নিরপেক্ষ বিষয় বর্তমান। তাছাড়া প্রাথমিক আলোচনা না করেই আরও এমন ক'টি গৌণ তত্ত্বকে মার্কসবাদীরা স্বীকার করেছেন যে তাও বহু-বিতর্কিত। যেমন, জ্ঞানের ঐতিহাসিক চরিত্র। এই তত্ত্বটি মার্কসবাদী কর্তৃক স্বীকৃত ঐতিহাসিক বস্তুবাদেরই একটি দিক। জ্ঞানের ঐতিহাসিক চরিত্রে আমি নিজে বিশ্বাসী। জ্ঞানের ঐতিহাসিকতার সঙ্গে বস্তুবাদের কোনও অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। যে-মাখকে লেনিন তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনিও জ্ঞানের ঐতিহাসিত চরিত্রে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানকে যাঁরা জ্ঞান বলে স্বীকার করতে সম্মত এবং নিছক মতামত বলে উড়িয়ে দেন না তাঁরা সকলেই জ্ঞানের ঐতিহাসিকতায় আস্থাবান। যাঁরা মনে করেন জ্ঞান অনৈতিহাসিক এবং অপরিবর্তনীয় দ্রব্য, তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন না করে বিনা প্রশ্নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-নিঃসৃত জ্ঞানের ঐতিহাসিকতায় আস্থা স্থাপন করা অযৌক্তিক।

ব্যবহারকে জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যের নির্ণায়ক বলে মার্কসবাদী যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা চক্রবৎ। ব্যবহারের স্বরূপ (অর্থাৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি ব্যবহারে সমর্থিত হল কি না তা) নির্ণীত হচ্ছে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দ্বারা। কিন্তু মুশকিল হল : যে কোনও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সমর্থন কিংবা অসমর্থন

তো মার্কসবাদী স্বীকার করবেন না। মাখও তো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর চূড়ান্ত আস্থাবান ; কিন্তু তিনি যেহেতু অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বস্তুজগতের (অর্থপূর্ণ) অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তাঁর মত মার্কসবাদীর পক্ষে অগ্রাহ্য। আসল কথা, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্নিহিত এমন কিছু নেই যার জন্য ওই সমর্থন বা অসমর্থন অবশ্যগ্রাহ্য। তাই আবার ব্যবহারের গোত্র (আইডেন্টিটি) নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আবার তো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (অভিজ্ঞতার) ডাক পড়বে ; কারণ মার্কসবাদী তো আর নিখাদ বুদ্ধিকে জ্ঞানের ভিত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাছাড়া মার্কসবাদী ব্যবহারের যে সংকীর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তার সপক্ষে যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ উভয়ই দুর্বল।

হেগেলের মতে, জ্ঞান ও জগতের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্য আছে। মার্কস তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, এই ঐক্য ব্যবহারের মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। যে ব্যবহার দ্বারা এই ঐক্য স্থাপন করতে হবে সেই ব্যবহারও শিক্ষণীয় ; এবং এই শিক্ষা একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী তার বৈপ্লবিক চৈতন্য দ্বারা গ্রহণ করতে সক্ষম। জ্ঞান ও জগতের ঐক্যবিধায়ক সেই ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে এক মতবাদসাপেক্ষ ; মতবাদটি হল : সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক ব্যবহারই কেবলমাত্র সত্যের কষ্টিপাথর। এই মতবাদ যিনি স্বীকার করবেন না তাঁর পক্ষে কি সত্যনির্ণয় অসম্ভব? মার্কসবাদী সত্যের তত্ত্ব শেষ বিশ্লেষণে শ্রেণী সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। সত্যের এই তত্ত্ব নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক মতবাদসমুহের সত্যাসত্যবিনিশ্চয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওই সব মতবাদ যে নিষ্ফল তা বলা শক্ত। সত্যের যে নিরপেক্ষ রূপের কথা মার্কসবাদী বলেন তার একটি ভাষ্য গ্রহণ করলে এই অসুবিধা দূর করা যায় না। কিন্তু সেই ভাষ্য মার্কসবাদীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা সন্দেহের বিষয়।

ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়।

এই শিরোনামায় আমাদের আলোচ্য বিষয় মার্কসীয় নীতিশাস্ত্র (এথিক্স)। সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির তাৎপর্য নিছক আধ্যাত্মিক নয়, সামাজিকও বটে। মার্কসের মতে, নীতিধর্মের সমাজ-নিরপেক্ষ কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। এ দিক থেকে বিচার করলে ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় সত্যাসত্যবিনিশ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। 'কী আমার ধর্ম?' 'কী আমার কর্তব্য?' — এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কসবাদী বলবেন, ' তোমার ধর্ম, কর্তব্য তোমার ঐতিহাসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে ; — এর কোনও সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর নেই।' এই বক্তব্য নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদেরই প্রকাশ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও নীতিধর্ম থাকতে পারে না। নেইও। সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ও বিচার-বর্জিত। এই দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক ও অনিবার্য। সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এই দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে না; সাম্যবাদী সমাজ যে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে সেই পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে না। মার্কসবাদীর বিশ্বাস, সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য ও তার নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের অনতিক্রম্য বিধান। লক্ষণীয় হল, যে সমাজে যে নীতিই পরিদৃষ্ট হোক না কেন, মার্কসবাদীর মতে, তা অনতিক্রম্য। মানবিক প্রচেষ্টায় নীতিধর্ম সৃষ্টি বা বিনাশ কিছুই করা যায় না, শুধু এর আবির্ভাব-তিরোভাব ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করা যায়, কিংবা স্থায়িত্বকালের কিঞ্চিদধিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। মার্কসবাদীর বক্তব্য বিবদমান ও শ্রেণীবিভক্ত মানবিক স্বার্থবুদ্ধিকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দল ও রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শক্তির প্রশ্ন জড়িত। যে শক্তিশালী তার হাতেই যদি অনিবার্যভাবে ইতিহাসের বিধানে নিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তায় তাহলে শক্তিই হয়ে দাঁড়ায় অধিকারের উৎস। অনিবার্য ইতিহাসই যদি হয় অধিকার প্রদায়ক তাহলে মানুষের নতুন নতুন অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও অনেকটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদী ঘটনা (ফ্যাক্ট) ও মূল্যের (ভ্যালু) দ্বৈততা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মূল্যগুলিও ঘটনা। এবং এই যুক্তিতে তিনি নীতিশাস্ত্রকে সমাজবিজ্ঞানের অংশবিশেষ বলে মনে করেন। ধর্মাধর্ম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ (সম্বন্ধ) নির্ভর। মার্কসবাদীদের মতে, সাম্যবাদীর মৌল ধর্ম হল শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংহত, সুশৃঙ্খল ও সম্মিলিত সংগ্রাম। যদিও এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য শোষণ, দারিদ্র্য ও অসম্মান দূর করা, তথাপি, মার্কসাদীর মতে, এ কথা ভাবা ভুল হবে যে এই উদ্দেশ্য সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি কোনও প্রেম-উদ্ভূত। শ্রেণীসংগ্রামের নীতিধর্মে ভাবাবেগের কোনও মৌল স্থান নেই। কারণ ভাবাবেগ, মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাদি শ্রেণী-স্বার্থের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-নির্ভর। মার্কসবাদীর এ কথা যদি যথার্থ, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রশ্নটি বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। বিচারের সঙ্গে দুটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত : প্রথমত মানদণ্ড এবং দ্বিতীয়ত বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিচার্য বিষয়ের নৈতিক গুণাগুণ। আপেক্ষিকতাবাদী মার্কসপন্থীর পক্ষে সকল সমাজের পক্ষে সকল ঐতিহাসিক যুগে প্রযোজ্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদীর পক্ষে (ঐতিহাসিক) বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিচার্য বিষয়ের নৈতিক গুণাগুণের অস্তিত্ব স্বীকার করাও কঠিন। মার্কসবাদীর সপক্ষে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক প্রগতির কথা যেহেতু তিনি স্বীকার করেন সেই হেতু যুগ নিরপেক্ষ কোনও একটি লক্ষ্যও (সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা) তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, এবং এতে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের ত্রুটি কিঞ্চিৎ লঘু হয়। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠবে : যাঁরা ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না এবং স্বীকার করেন না যে ইতিহাসের অনতিক্রম্য লক্ষ্য সাম্যবাদী সমাজ তাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের সমালোচনার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীর যুক্তি কেন স্বীকার করবেন?

মার্কসবাদী বলেন, নীতিধর্মের প্রগতি শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ; শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রগতির অন্তরায় ; এই অন্তরায় দূরীভূত হলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি দেখা দেবে ; এবং শ্রেণীহীন সমাজের নীতিধর্ম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নীতিধর্মের তুলনায় প্রভূত উন্নতি হবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শোষণ-সংঘাতে মানুষ স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মচ্যুত; মার্কসবাদীর বিশ্বাস, শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের এই আত্মচ্যুতির অবসান ঘটবে, — মানুষ পুনরায় স্বধর্মে স্থিত হবে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষের আত্মপরিচয় কি ? এই প্রশ্নের সদুত্তর না মিললে আত্মচ্যুতির আলোচনা নিছকই বিতর্কবিলাস। যদিও তরুণ মার্কস এক সময়ে বলেছিলেন যে, মানুষের আত্মপরিচয় অনির্বচনীয়, তথাপি তাঁর রচনাবলির সামগ্রিক চরিত্র থেকে এই বক্তব্যই স্পষ্ট হয় যে, মানবচরিত্র তার সামাজিক, বিশেষত অর্থনৈতিক, সম্পর্ক-নির্ভর। শ্রেণী-সমাজের সৃষ্টি হলেই যদি মানুষ আত্মচ্যুত হয় এবং এই আত্মচ্যুত যদি হয় নীতিবিধায়ক অনিবার্য ইতিহাসেরই দান তাহলে এই আত্মচ্যুতির অবসান ঘটানোর চেষ্টার যুক্তি কি? শ্রেণী সৃষ্টির পূর্বে বা বিলোপের পর মানুষের আত্মস্বরূপ যা ছিল বা দেখা দেবে, তা সে যাই হোক, তাকে কি আমরা আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি? বোধ হয় না ; কারণ তাতে অনৈতিহাসিক পরাতাত্ত্বিক মানব-আত্মার মতোই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হবে, এবং নীতিধর্মের ইতিহাসাপেক্ষিকতার মৌল বক্তব্য খণ্ডিত হবে। এই সমালোচনার অনুক্রমেই দ্বিতীয় সমালোচনাটি উচ্চারিত হয়েছে। তা হল এই : শিল্পোন্নয়ন কি নৈতিক উন্নয়নের থেকে অভিন্ন — অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন হলেই কি নৈতিক উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী? নাকি, নৈতিক উন্নয়ন শিল্পোন্নয়নের লক্ষণ মাত্র? যদি শিল্পোন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নয়ন অভিন্ন হয় তাহলে নৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ভিন্ন প্রচেষ্টা নিরর্থক। অপর নৈতিক উন্নয়ন যদি শিল্পোন্নয়নেরই লক্ষ্য তাহলেও আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিল্পোন্নয়ন। ফলত (একটি অতি সংকীর্ণ প্রান্তিক তাৎপর্য ছাড়া) নৈতিক প্রচেষ্টার বিশেষ কোনও তাৎপর্য মার্কসবাদের সামগ্রিক কাঠামোয় স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। মানুষের আত্মচ্যুতির অবসান ঘটানো মার্কসবাদীর সতন্ত্র কোনও নৈতিক লক্ষ্য বলে পরিগণিত হতে পারে না।

মার্কসবাদীর মতে, নীতিধর্মের ইতিহাস শাসকশ্রেণীর 'আইডিওলজি' মাত্র। এই যুক্তি অনুসরণ

করে সমালোচক বলতে পারেন : মার্কসীয় ধর্মাধর্ম বিচারও একটি বিজয়ী (সর্বহারা) শ্রেণীর আইডিওলজি বিনা কিছু নয়। নীতির ক্ষেত্রে ডারউইনবাদীর বক্তব্য : যে বিজয়ী তার আচরিত ধর্মই নীতিধর্ম। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদীর বক্তব্য ডারউইনবাদীর মতো হলে আভ্যন্তরীণ সংগতি বজায় থাকত। কিন্তু তাতে যে গুরুতর আপত্তি সৃষ্টি হবে তা ভেবে মার্কসবাদী তাঁর বক্তব্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বললেন, সর্বহারা শ্রেণীর আইডিওলজি যে কোনও শ্রেণীর আইডিওলজি থেকে স্বতন্ত্র। সর্বহারা শ্রেণীর আইডিওলজিতে সত্য চৈতন্যের প্রকাশ ; অন্য সকল আইডিওলজি মিথ্যা চৈতন্যের প্রকাশ। চৈতন্যের এই মিথ্যাত্ব যুগসীমার মধ্যে প্রমাণ করা মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে শ্রেণী যে রকম শিল্পোৎপাদনব্যবস্থা বহাল রাখে সেই যুগের নীতিধর্ম সেই শ্রেণীর আইডিওলজিই ঘোষণা করবে। পক্ষান্তরে, আপেক্ষিকতাবাদী মার্কসপন্থীর পক্ষে যুগ-নিরপেক্ষ আইডিওলজির কথা বলা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-বিরোধী এবং আভ্যন্তরীণ সংগতি-বর্জিত। মার্কসীয় চিন্তার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মার্কস ডারউইনপন্থী না হয়ে হেগেলপন্থী হয়ে গেলেন। হেগেল মনে করতেন, ইতিহাসের সকল যুগের, সকল উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ক্রমেই (অনিবার্যভাবে) স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। মার্কসবাদীর মতের মধ্যেও এই বক্তব্য প্রচ্ছন্ন যে, শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখে অনিবার্য ধাবমান এবং যে যুগে যে শ্রেণী এই চূড়ান্ত লক্ষ সম্বন্ধে যত বেশি সচেতন হতে পারেন সেই যুগে সেই শ্রেণীর চৈতন্যকে তত বেশি সত্যময় বলে মানতে হবে। বলা বাহুল্য, মার্কসবাদী এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু অন্যথায় সর্বহারা শ্রেণীর চৈতন্য কেন যে সকল শ্রেণীর চৈতন্যের তুলনায় বেশি সত্যময় হবে তা বোঝা দুষ্কর।

সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে মার্কসবাদী মিথ্যা চৈতন্য এবং তদ্ভূত নীতিধর্মের যে সমালোচনা করেন তার পূর্ব-প্রকল্প (প্রিসাপোজিশন) হল যে, ওই সব শ্রেণী ইতিহাসের শেষ লক্ষ্য পূর্বাহ্নে বুঝতে পারে নি। এই পূর্বপ্রকল্পের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে এই প্রত্যয় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অভ্রান্ত।

গতিপ্রকৃতি।

মার্কসবাদীর মতে, ইতিহাসের প্রকৃতি ও গতি (তরঙ্গ) একই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামাজিক মানুষের কর্মাবলিই হল ইতিহাস। উদ্দেশ্যহীন মনুষ্য-কর্ম ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় নয়। মনুষ্য কর্ম মনুষ্য প্রকৃতি নির্ভর। মনুষ্য প্রকৃতি অর্থনৈতিক সম্পর্কনির্ভর। অর্থনৈতিক জীবনের পশ্চাতে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। ইতিহাসের প্রাকৃতিক পশ্চাৎপট উল্লেখযোগ্য না হলেও অনস্বীকার্য। মার্কস মনে করতেন, যে- সকল অর্থনৈতিক গতির নিয়ম দ্বারা ইতিহাসের রূপ ও রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই সব নিয়মগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলির মতোই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। তাঁর মতে, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান মূলত একই নিয়মাবলির অধীন। এ কথার পরোক্ষ তাৎপর্য হল : প্রাকৃতিক ঘটনাবলি যেমন মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, সামাজিক ঘটনাগুলিও প্রায় তেমন। প্রায় তেমন, কিন্তু ঠিক তেমন নয়। এই সীমিত পার্থক্যের মূলে রয়েছে মানুষের প্রযত্ন ও কর্মের সীমিত স্বাধীনতা। এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে, মার্কসবাদী ইচ্ছার স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী। কোনও দার্শনিকই স্বীকার করেন না যে, তাঁর বক্তব্যে মনুষ্য-স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। আসল প্রশ্ন হল : স্বাধীনতার কোন্ অর্থে তিনি বিশ্বাসী ?

ইতিহাস ও স্বাধীনতার প্রশ্ন দুটি ভিন্ন হলেও ভিকো ও হেগেল থেকে শুরু করে মার্কস, ক্রোচে ও টয়েনবি অনেকেই এক সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মার্কস ব্যতীত আর ক'জনই বিজ্ঞান থেকে ইতিহাসের, প্রকৃতি থেকে মানুষের, স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। মার্কসের ইতিহাসচিন্তার বিজ্ঞানধর্মী প্রেরণা জুগিয়েছেন কোঁত, মিল ও বার্কলে। ইতিহাস ও স্বাধীনতার সম্পর্কটি দু'ভাবে বোঝা যেতে পারে —

স্থিতির ও গতির দিক থেকে। স্থিতির দিক থেকে প্রশ্নটি এইভাবে তোলা যায় : স্বাধীনতার প্রাথমিক আধার কি ব্যষ্টি, নাকি সমষ্টি? এই প্রশ্নের উত্তরে হেগেল কোঁত ও মার্কস বলবেন, সমষ্টি, আর বাকি মিল ও ক্রোচে বলবেন ব্যষ্টি। অথচ মিল কোঁতের এবং ক্রোচে হেগেলের অনুরাগী। গতির দিক প্রশ্নটি এইভাবে তোলা যায় : মানুষ কি তার ইচ্ছার স্বাধীন শক্তি দ্বারা ইতিহাসের গতি প্রতিহত বা পরিবর্তন করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মিল ও ক্রোচে বলবেন, হ্যাঁ, অনেকটাই পারে, আর মার্কস বললেন হ্যাঁ, সামান্যই। মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে শ্রম করে সেই শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। এমনি করেই প্রকৃতি বিজয়ী মানব-শ্রম হয় ইতিহাসধারার নিয়ামক। প্রকৃতি-মানব দ্বন্দ্ব যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাতে এই দ্বন্দ্ব রূপান্তরিত হয় শ্রেণীদ্বন্দ্বে; এই দ্বন্দ্বের পরিশেষে নতুন রূপে আবার দেখা দেবে প্রকৃতি-মানব দ্বন্দ্ব, সাম্যবাদী সমাজ।

মার্কসের মতে ইতিহাসের ধারায় কয়েকটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ লক্ষ করা যায়—আদিম সাম্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। শেষ তরঙ্গ সাম্যবাদ। ইতিহিাসের তরঙ্গ-তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। নতুন হল এই তরঙ্গের কারয়িত্রী শক্তি সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্য। ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসে তরঙ্গ সৃষ্টির কারণ। প্রশ্ন উঠতে পারে : শ্রেণীহীন অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামহীন ইতিহাস কি সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ হবে? মার্কসের বক্তব্য : মানবের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব শ্রেণীহীন সমাজেও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তরঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য অনেক প্রশ্নই তোলা হয়েছে। সকল সমাজের ইতিহাসেই কি নির্দিষ্ট সংখ্যক তরঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়? এই তত্ত্বটি কি ইতিহাস নির্ভর, নাকি ইতিহাস-নিরপেক্ষ? অনাগত ইতিহাস কি কোনওমতেই এই তত্ত্ববিরোধী হতে পারবে না? এ-কথা জোর করে বললে কি মার্কসবাদ অনৈতিহাসিক ও পরাতাত্ত্বিক দোষে দুষ্ট হবে না? মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্ব কি বিবরণমূলক নাকি ভাষ্যমূলক? বিবরণমূলক বক্তব্য তো সর্বদাই ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হবার সম্ভাবনাপূর্ণ ; সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী বক্তব্য অনাগত ভবিষ্যতেও সত্য বিবেচিত হবে — এই দাবি কি অবৈজ্ঞানিক নয়? আর ভাষ্যমূলক তত্ত্ব যদি বিরোধী সাক্ষ্য প্রমাণাদিকে সর্বদা ভাষ্যান্তরে ঘটিয়ে সপক্ষে প্রদর্শন করাতে পারে তাহলে সেই ভাষ্য কি শূন্যগর্ভ এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নয়? এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যে সমালোচনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

একটি যুগের বা দেশের ইতিহাস আরেকটি যুগের বা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কে আবদ্ধ, এমন কথা বলায় অনেক অসুবিধা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কাল সম্পর্কে আমরা যে অস্তিত্ববাচক (এক্সিস্টেন্‌শিয়াল) উক্তি করি, তার সঙ্গে অপর একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কাল সম্পর্কে অনুরূপ যে উক্তি করি এতদুভয়ের মধ্যে কোনও (লজিকাল) সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি তা করতে হয় তাহলে মানতে হবে যে উভয় উক্তিই একটি সাধারণ সত্যের বা নিয়মের প্রকাশ। ইতিহাসে এই রকম সাধারণ নিয়ম আছে দেখানো খুব কঠিন। যদি অতীত ইতিহাস থেকে আরোহী অনুমানে কোনও সাধারণ নিয়ম দাঁড় করানোও যায়, তা থেকে এ কথা বলা যাবে না যে, ভবিষ্যতেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অথচ পরিকল্পনার জন্য ভবিষ্যৎবাণীর জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম (মার্কসের ভাষায় অর্থনৈতিক গতির নিয়ম) আবশ্যক।

এই বিষয়ে অনেক সমালোচক মার্কসবাদীর বক্তব্য ও আচরণে কিছু অসংগতি আছে বলে মনে করেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য হল, ইতিহাস যদি নির্দিষ্ট তরঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে অনিবার্য গতিতে স্বীয় লক্ষ্যে ধাবিত হবেই তাহলে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর মার্কসবাদীরা এত গুরুত্ব আরোপ করেন কেন? তাহলে কি আমরা এই বুঝব যে, মার্কসবাদীরা ইতিহাসের ঘটনাশ্রয়ী বর্ণনা দেন না, আদর্শাশ্রয়ী ভাষ্য দেন মাত্র, এবং কার্যক্ষেত্রে সেই ভাষ্যও মানেন না? কোনও কোনও সমালোচক সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসের যে বিভিন্ন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে একই ঘটনার যে বিভিন্ন বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ওই সব ইতিহাস

হয়তো ঘটনাশ্রয়ী নয়, ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের স্বার্থানুকূল ভাষ্য মাত্র। কোনও কোনও সমালোচকের বক্তব্য, মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্ব উৎসাহদায়ক শ্রেণীসংগ্রমের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনাবর্জিত। ইতিহাস যদি হয় নীতিবিধায়ক এবং ইতিহাসের অনিবার্য গতি যদি হয় সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখী, তাহলে মার্কসবাদী সংগতভাবেই অনুগামীদের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারেন, 'ইতিহাস আমাদের স্বপক্ষে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে উল্লিখিত যদি দুটিকে নিয়ে। যে ইতিহাস সর্বদেশে সর্বকালে বিবদমান দু'টি (মাত্র দু'টি?) পক্ষের একটির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় সেই ইতিহাসে (কিংবা যে তত্ত্ব অনুসারে সে ইতিহাস রচিত হয় তাতে) কোনও গুরুতর গলদ আছে।

'সব ইতিহাসই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস'— মার্কসবাদীর এই বক্তব্য অতি সরল। এই বাক্যটিকে শূন্যগর্ভ (টটোলজিকাল) সংজ্ঞাও বলা যেতে পারে। কোনও ইতিহাসই যদি শ্রেণীসহযোগিতার ইতিহাস না হয় সে ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্রের উল্লেখ করা চলে ইতিহাসে কি? এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে শ্রেণীসহযোগিতার কোনও উদাহরণ নেই বললে অনেকেই তা স্বীকার করবেন না। কোনও কোনও সমালোচক বলেন, উদাহরণ নির্ণায়ক তত্ত্ব যদি একপেশে হয় তাহলে বিরোধী উদাহরণ শুধু দুর্লভ নয়, সম্পূর্ণ অলভ্য। সর্বোপরি বলা হয় যে, শিল্পোন্নত সমাজে শ্রেণীবিন্যাস মার্কস যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনটি হয়নি। শোষক ও শোষিত সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ও বহির্ভূত এই দুটি শ্রেণীতে সকল সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে — মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বিন্যাস অত্যন্ত জটিল। মাত্র দুটি শ্রেণী-সংবলিত মার্কসীয় মডেলে তার কার্যাবলির, গতি-প্রকৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা অসম্ভব। শিল্পোন্নত সমাজের মানবস্বার্থ দ্বিধা নয়, বহুধাবিভক্ত। তাছাড়া বহুধাবিভক্ত মানবস্বার্থের (তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) দ্বন্দ্বকে দূর ক'রে সংহতি-বিধায়ক সামাজিক শক্তি ও সংস্থাও তো গড়ে উঠেছে। মার্কসবাদী তাঁর মৌল ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বলেন, 'সব শক্তি ও সংস্থাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থসেবী।' এ-বক্তব্য যদি হয় ইতিহাসের সংজ্ঞার মতো শূন্যগর্ভ (টটোলজিকাল) তাহলে বিতর্ক হবে বিতণ্ডা মাত্র। আর যদি বিভিন্ন দেশের ঘটনা দেখে সিদ্ধান্ত করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে (এবং কোনও কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশেও) অন্তত কিছু শক্তি ও সংস্থা আছে যা শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে আন্তঃশ্রেণী সহযোগিতা বা সহাবস্থানের চেষ্টা করে। মার্কসবাদী নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে (যেখানে এখনও শ্রেণী বর্তমান) আইনের শাসন একচক্ষু বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। যারা বুদ্ধিজীবী, বিশেষত যারা শিল্পীসাহিত্যিক, তাদের সৃজনশীল বক্তব্য শ্রেণীস্বার্থের প্রতিধ্বনি নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, সে-সব ব্যক্তির শ্রম ধ্যান-ধারণাসংক্রান্ত তাদের বক্তব্য শাসক শ্রেণীর সমালোচনাপূর্ণ। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি মূলত মানুষের ধ্যান-ধারণা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়; তার অর্থ এই নয় যে, ঐ ধ্যান-ধারণাগুলি সামাজিক ঐতিহ্য প্রভাবিত নয়। ধ্যান-ধারণাগুলি ইতিহাসের স্রষ্টাও বটে, সৃষ্টিও বটে। জীবনের বাস্তব ভিত্তি ও চৈতন্যের নানা প্রকাশের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্ব চলছে। এই প্রক্রিয়া উভয়মুখী। মার্কসের বক্তব্য, এই উভয়মুখী প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তির প্রভাবই সমধিক। অনেক বস্তুবাদী সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন যে, বস্তুবাদী হলেই যে তাকে বস্তু-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে বস্তুর আধিপত্য মানতে হবে তা নয়। সত্তা হিসাবে বস্তু চৈতন্যের তুলনায় আদিম হতে পারে, কিন্তু শক্তি বা ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে চৈতন্য সমধিক চৈতন্যশালী। এই বক্তব্য থেকে বিশ্লেষণ করে এ-ও দেখানো যেতে পারে যে, কায়িক শ্রম সর্বদাই যে বৌদ্ধিক শ্রমের তুলনায় অধিক প্রভাবশালী হবে এই যুক্তি অচল। সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসকবর্গের শ্রেণীগত পরিচয় বিশ্লেষণ করেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ করায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরা প্রধানত কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী-উদ্ভূত। শ্রমিকশ্রেণীর সংজ্ঞা শূন্যগর্ভ না করলে এদের সকলকে শ্রমিক বলা কঠিন। আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অ-শ্রমিক শ্রেণী পালন করতে পারবে,—

এই বক্তব্য গ্রহণে তো মার্কসবাদীর আপত্তি তীব্রতর হবে।

মার্কস ভাবতেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষেরা ক্রমেই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত (পোলারাইস্‌ড) হয়ে যাবে এবং শোষিত শ্রেণী আপেক্ষিকভাবে আরও শোষিত (পপারাইস্‌ড) হবে; এর ফলে শেষপর্যন্ত দুটি শ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে ও তার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, পোলারাইজেশন সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি ভেবে দেখবার মতো। প্রথমত, যদি একথা স্বীকার করা হয়, যা ঘটনা দৃষ্টে অনেকেই এখন স্বীকার করেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অর্থনৈতিক শক্তিনিচয়কে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে সমর্থ, তাহলে শোষক ও শোষিত শ্রেণী অনিবার্যভাবে পোলারাইসড হবে এমন নিয়মিতবাদে বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন সংবাদপত্র, শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং সর্বোপরি জাগ্রত জনমত বিরোধী স্বার্থের সমন্বয়ে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পপারাইসেশন সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, জোয়ান রবিনসনের মতে, মার্কস এই সম্ভাবনার কথা ভাবেননি যে, কোনও কোনও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তনশীল মূলধন ও উদ্বৃত্ত মূল্যের আনুপাতিক সম্বন্ধ (অথবা শোষণের হার) অল্পবিস্তর স্থিরই থাকবে, অথচ মুনাফা নিম্নগামী হবে। উৎপাদন বাড়লে তাহলে মজুরি বাড়বে। (মার্কসের বিরুদ্ধে এই যুক্তি অবশ্য উন্নতিশীল দেশের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়, যতটা প্রযোজ্য শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে।) দ্বিতীয়ত, মার্কসের এই ধারণাও অভ্রান্ত নয় যে, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের মজুরি কখনওই স্থায়ীভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, কারণ তাহলেই নাকি মুনাফার হার হ্রাস পাবে, আর সেক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস পেতে থাকবে। ফলত অর্থনৈতিক সংকট ঘনায়মান হবে। মার্কসের ইতিহাস-তত্ত্বের মধ্যে যে সামগ্রিক অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলা হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটের অনিবার্যতা-তত্ত্বে তার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। যে-উপাত্তের উপর মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেই উপাত্তের উপরেই মার্কসের মূল অর্থনৈতিক তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত। উপাত্তটি হল: মানুষ সামাজিক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ইতিহাসের সাধারণ নিয়মগুলির কার্যকারিতা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে অসমর্থ। এই উপাত্তটি খণ্ডন করবার জন্য কাল পপার ও আইসারা বার্লিন যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা মার্কসবাদের জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

মার্কস তাঁর নিজের রচনাবলিকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করতেন। মার্কসের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ইয়োরোপে যে-ধনতন্ত্র প্রচলিত ছিল তার অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন ঘটনাশ্রয়ী কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি কোথায় এবং তার বাস্তবিক ও সম্ভাব্যপরিণাম সম্পর্কে তাঁর মতামত বিজ্ঞান-বুদ্ধির উজ্জ্বল উদাহরণ। একটি তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক চরিত্র নিম্নলিখিতভাবে বিচার করা যেতে পারে: ১. তত্ত্বের মধ্যে যৌক্তিক সংগতি আছে কি না; ২. তত্ত্বের দ্বারা যে-জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়েছে সে-জাতীয় ঘটনার (বস্তুসত্তা রক্ষা ক'রে — অর্থাৎ বিনা ভাষ্যে) কতটা ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে; ৩. বাস্তব ঘটনা দ্বারা তত্ত্বটি কতটা পরীক্ষাযোগ্য (টেস্টেবল) সমর্থনযোগ্য (কনফার্মাব্‌ল) নয়; ৪. তত্ত্বটি কত সরল এবং ৫. কতো সত্য। প্রথম ১. বিচারে যে মার্কসের চিন্তা উত্তীর্ণ তা অনেক সমালোচকই স্বীকার করেন। তবে যাঁরা মনে করেন দ্বান্দ্বিক যুক্তিশাস্ত্র — তা হেগেলীয়ই হোক কিংবা মার্কসীয়ই হোক — চিন্তার একটি মৌল নিয়ম (স্ব-বিরোধের নিয়ম) ভঙ্গ করে এবং সে-জন্য অন্তঃসারশূন্য, তাঁরা অবশ্য প্রথম বিচারেও মার্কসবাদকে উত্তীর্ণ স্বীকার করতে গর-রাজি। তাঁদের বক্তব্য: প্রত্যেক 'হাঁ' -এ যদি তার 'না' থাকে এবং 'না' -এ যদি তার 'হাঁ' থাকে, তাহলে ইতি-নেতির পার্থক্য করা দুষ্কর এবং পার্থক্য যা

সচরাচর টানা হয় তা এমন এক পরাতাত্ত্বিক উপাত্তের উপর নির্ভরশীল যে সেই উপাত্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিচার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা (এক্সপ্লানেশন) ও ভাষ্যের (ইন্টারপ্রিটেশন) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি তত্ত্ব যে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে ভাবা গিয়েছিল বস্তুত তা পারছে না। অর্থাৎ ঘটনার সম্ভাব্য (পূর্ব-কল্পিত) তাত্ত্বিক রূপের সঙ্গে বাস্তব রূপের যদি অসংগতি দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে তত্ত্বটি (অন্তত অংশত) ভুল। তত্ত্ব-বিরোধী ঘটনা সন্দর্শনে বৈজ্ঞানিক তাঁর তত্ত্বের ভুল অংশ পরিবর্তন করে তত্ত্বটি উন্নততর করার চেষ্টা করেন এবং করার সময়ে অবশ্যই লক্ষ রাখেন যাতে ১. শর্তটি (অর্থাৎ যৌক্তিক সংগতি) না ক্ষুণ্ণ হয়। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা হল যে, বিরোধী ঘটনার সাক্ষ্য দেখেও মার্কসবাদী বিজ্ঞানীসুলভ শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে তাঁর তত্ত্বের ভুল স্বীকার ও মূল তত্ত্বের পরিবর্তন করতে নারাজ। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অসংগতি দেখা দিলে মার্কসবাদী নিম্নলিখিত দুটির একটি (কখনও কখনও দু'টিই) কৌশল অবলম্বন করেন। ক. ঘটনার নতুন ভাষ্য দেন; এবং তার ফলে তত্ত্ববিরোধী ঘটনা তত্ত্বানুকূল বলে, প্রমাণিত হয়ে যায়। খ. মূল তত্ত্বকে অপরিবর্তিত রেখে মার্কসবাদী বিরোধী ঘটনাগুলিকে তত্ত্বানুকূল দেখানোর জন্য একের পর এক নতুন নতুন তত্ত্ব-কল্পনা (অ্যাড হক হাইপথেসিস) মূল তত্ত্বের সঙ্গে সংযোজন করে দেন। এর ফলে প্রায়শই তত্ত্বের যৌক্তিক সংগতি ১. এবং সরলতা ৪. ক্ষুণ্ণ হয়। যে-তত্ত্বের মধ্যে সংগতি (কনসিস্টেন্সি) এবং সরলতা (সিমপ্লিসিটি) নেই সেই তত্ত্বকে ক্রমাগত সমর্থন (কনফম) করা যায় কিন্তু ৪. পরীক্ষা (টেস্ট) করা অসম্ভব। আর সে-ক্ষেত্রে সত্যাসত্যবিনিশ্চয়ের প্রশ্নটিও ৫. নিতান্তই একপেশে ব্যবহার নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সত্যও (অঙ্কসহ) শ্রেণীস্বার্থের ভাষ্য-নির্ভর।

মার্কসবাদ যে উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শর্তগুলি লঙ্ঘন করে থাকেন তা ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে অনেক সমালোচক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। একচেটিয়া ধনতন্ত্র স্থাপিত হবার পূর্ব থেকে পর পর্যন্ত ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতিতে যে-সব বিরোধ বা সংকট অনিবার্যভাবে দেখা যাবে বলে মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে ভাবা গিয়েছিল তা বস্তুত দেখা দেয়নি। ধনতন্ত্রের যে-সব সমস্যা ছিল এবং আছে তার মার্কসবাদেতর সদ্ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। একচেটিয়া ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নেবেই — এই তত্ত্বকে সমর্থন করাতে গিয়ে 'একচেটিয়া ধনতন্ত্র' ও 'সাম্রাজ্যবাদ' পদ দুইটির সংজ্ঞায় একাধিকবার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। তাছাড়া 'ধনতন্ত্র' ও 'সাম্রাজ্যবাদের' প্রকৃত স্বরূপ কী এই প্রশ্নের উত্তরদায়ক ভাষ্যেও মূল তত্ত্বে বাঁচাবার জন্য বার বার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। সাম্রাজ্য চলে যাবার পরেও প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 'আভ্যন্তরিণ সমস্যা (ভাষান্তরে সংকট) কাটিয়ে উঠতে পারবে এ সত্য মার্কস বা লেনিন ভাবেননি। এটা তাঁদের অদূরদর্শিতার প্রমাণ নয়। এটা ইতিহাসস্রষ্টা মানুষদের বুদ্ধি ও শ্রমের ফলশ্রুতি। বর্তমানে যে সমাজে ব্যবস্থাকে মার্কসবাদী 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র' বলছেন আর গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী বলেছেন 'জনকল্যামূলক রাষ্ট্র' সে সমাজব্যবস্থার কথাও মার্কস বা লেনিনের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। তথাপি 'তাঁদের মূল তত্ত্ব আজও সত্য' বলার পশ্চাতে শ্রেণী স্বার্থবুদ্ধি থাকলেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নেই। অবশ্য যদি বলা হয় ' বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও শ্রেণী-স্বার্থপ্রণোদিত' সেকথা আলাদা। যে মূল তত্ত্বের মূল কখনোই খণ্ডিত হয় না, কেবলি সমর্থিত হয়, সে মূল পরাবিদ্যার (মেটাফিজিক্যাল) বিষয় হতে পারে, বৈজ্ঞানিক বিষয় হতে পারে না। মার্কসবাদকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য পরাবিদ্যার নিরাপদ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মার্কস ও লেনিনকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদদের আসন থেকে নামিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তার অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এবং এর ফলে তত্ত্বের দিক থেকেই শুধু সমস্যা দেখা দেয়নি আরও বিপদ দেখা দিয়েছে ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে। যে-সব দেশ নিজেদের মার্কসবাদী বলে নিজেদের দাবি করে সেই সব দেশের অগ্রগণ্য নেতারা ক. মার্কসবাদ, খ. সাম্রাজ্যবাদ, গ. মার্কসবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায়, ঘ. অ-মার্কসবাদী (এমনকি মার্কসবাদী) দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক, ঙ. মার্কসবাদী দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিরোধী মতে বিভক্ত। মার্কসবাদের একটি মূল তত্ত্ব হল : তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে অন্বয়। এই অন্বয় আজ গুরুতরভাবে বিনষ্ট। এই বিনষ্টির জন্য মার্কসের দায়িত্ব সামান্যই। মূল দায়িত্ব মার্কসবাদের সরকারি ভাষ্যকারদের। বিজ্ঞানীকে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রতিপন্ন করার সর্বগ্রাসী সরকারি প্রচেষ্টা শুরু হলে বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয় শাশ্বত পরাবিদ্যায়, বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় অতল গূঢ় তত্ত্বের সমর্থনে ভাষ্যের পর ভাষ্য প্রণয়ন, আর তাঁদের মর্যাদার উত্থান-পতন হয় ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা নির্ভর। সত্য যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থের সেবক নয়, সত্য যে সমাজায়ত — মুক্ত জিজ্ঞাসার ঘটনা-নির্ভর উত্তর — এ কথা একাধিক তিক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মার্কসবাদী মহলের একাংশে তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত ; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক স্বীকৃতির প্রতিফলন এখনও অস্পষ্ট। মার্কসবাদী ঠিকই বলেন যে, 'সত্য শাশ্বত নয় ; নীতিধর্মও শাশ্বত নয়।' সত্য ও নীতিধর্মের পরিবর্তনশীলতার মূলে রয়েছে মানব অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক চরিত্র। এই ঐতিহাসিক চরিত্র একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিবর্তন থেকে ভিন্ন, আরেক দিকে তেমনি ভিন্ন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা থেকে। সত্য যদি কর্তৃত্বের ইচ্ছা-নির্ভর হয় তাহলে কর্তৃত্বের পরিবর্তন হলেই সরকারি স্তরে সত্যের রূপান্তরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রূপান্তরিত সত্যের সরকারি ভাষ্য প্রকাশ হতে স্বভাবতই সময় লাগে; সত্যসন্ধীর পক্ষে অন্তর্বর্তীকাল নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যক্তি বিজ্ঞানী যে সত্য লাভ করেন তা যদি সত্যের সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ না করে তাহলে শুধু কর্তৃত্বের জোরেই বৈজ্ঞানিক সত্য উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বস্তুত এ রকম ঘটনা মার্কসবাদের ইতিহাসে একাধিকবার ঘটেছে। ঔচিত্য অনৌচিত্যের এই প্রশ্নেও বারবার উপেক্ষিত হয়েছে ধর্মা-ধর্মের শ্রেণীভাষ্যের প্রভাবে।

উপসংহার।

যে মতবাদই মানব জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সে মতবাদকেই বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মার্কসবাদও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম নয়। মার্কসবাদের ত্রুটি তার শক্তি ও সাফল্যের অপ্রমাণ নয়। কিন্তু মার্কসবাদের গুরুত্ব শুধু তার ব্যবহারিক শক্তি ও সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহলে মার্কসবাদকে নাৎসিবাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত করা যেত। ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ না করেও এ কথা বলা যায় যে, মার্কসবাদ দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের এক সুগভীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটিয়েছে ও মেটাচ্ছে। মার্কসবাদ ইতিহাসের নিয়তির অবদান নয় ঠিকই ; কিন্তু যে প্রয়োজন মার্কসবাদ মিটিয়েছে তার উপযুক্ত বিকল্প মানুষের মনীষা যথাসময়ে উপস্থাপন করতে পারেনি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের বিকল্প আজ ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ বিপ্লব অনেক দিন ধরেই ছিল। মার্কসবাদের বৈশিষ্ট হল এই সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা যে, তাত্ত্বিক বিকল্প যদি ব্যবহারযোগ্য বিকল্প না হয় তবে তার মূল্য স্বল্পই। মার্কসবাদীর অসুবিধা হল তার মতবাদে 'বিকল্প' মাত্রই বিবদমান কিংবা ভ্রান্ত, এবং তাই বিকল্পই নয়। যদিচ তত্ত্বের স্তরে এ কথা আজ কোনও কোনও মহলে স্বীকৃত যে সমাজতন্ত্রের পথ বহুবিধ, কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে এই স্বীকৃতির প্রমাণ খুবই দুর্লক্ষ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

মার্কসবাদ ও বিপ্লব

মার্কসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এঙ্গেলস বলেছিলেন মার্কসের সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি বিপ্লবী। এঙ্গেলস আরও বলেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পতন ঘটানো, সেই ব্যবস্থা যে রাষ্ট্র-যন্ত্রের জন্ম দিয়েছে তাকে ধ্বংস করা এবং আজকের দিনের শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্ত করাই ছিল মার্কসের জীবনের ব্রত। এঙ্গেলসের মৃত্যুতে লেনিন বলেছিলেন যে ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজ্ঞান ও কর্মপদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন দু-জন পণ্ডিত ও যোদ্ধা। মার্কসবাদ মার্কস আর এঙ্গেলসের যৌথ সৃষ্টি। পরে লেনিন, স্তালিন ও মাও-সে-তুং-এর চিন্তা এবং সংগ্রাম এই মতবাদটিকে আরও বিকশিত করে শ্রমিক-শ্রেণীর পরিবেশ ও যুগ-পরিস্থিতির উপযোগী শাণিত অস্ত্র হিসেবে তার সক্রিয়তা অটুট রেখেছে। মার্কসবাদের জন্ম থেকে আমাদের কাল অবধি তার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। মার্কসবাদের জন্মের মূলে কোন প্রেরণা কাজ করেছিল? প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করার প্রেরণা। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : দার্শনিকেরা জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে জগৎটাকে বদলে দেওয়া। মার্কস পূর্বাচার্যদের কথা সবিনয়ে বলেছেন, কিন্তু অবিনীত সত্য কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে মার্কসের পূর্বে জগৎ ও জীবনের গতিপ্রকৃতি ও রূপান্তরের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অন্য কোনও দার্শনিক উপস্থিত করতে পারেননি। সেই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মার্কসবাদেরও অবিস্মরণীয় দান। সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার কথা কিন্তু মার্কসের বহু যুগ আগে উৎপীড়িত এবং উদার মানুষের মনে জেগেছে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অতি প্রাচীন জিনিস। আধুনিক যুগে তা আরও সংহত রূপ নিয়েছে, চিন্তা ও কল্পনাকে আকুল করে তুলেছে। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার অনগ্রসরতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও সচেতনতার দুর্বলতার জন্য সমাজ-কাঠামোর সঠিক বিশ্লেষণ এগোয়নি এবং তাই শুভকামনায় উদ্বেল মনের কল্পনা রঙিন স্বপ্নে মুখর হয়েছে, সমাজে কোন শক্তির জয়ী হবে এবং কোন সংগ্রামের পথে শোষণকে ধ্বংস করবে তার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি। যাঁরা সমাজবাদের স্বপ্নই শুধু দেখতেন, রাত্রির অন্ধকার বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকালকে ছিঁড়ে আনবার কথা ভাবতে পারতেন না, সেই ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট বা কল্পজগৎ-বিহারী সমাজবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকে দেখতেন এক উৎপীড়িত অসহায় জনসমষ্টি হিসেবে। কেউ কেউ অপেক্ষা করে থাকতেন এক অমিত-বিক্রম মহামানবের জন্য যিনি স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে বিশ্বমানবের বন্ধনশৃঙ্খল নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ইতিহাসের যারা প্রকৃত স্রষ্টা সেই জনতার উপর এই স্বপ্নচারী সমাজবাদীদের কোনও আস্থা ছিল না। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে উপলব্ধি করলেন এবং প্রচার করলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে বহুবাঞ্ছিত রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষকে নতুন জীবনে পৌঁছে দিতে পারে।

মার্কসের বিপ্লব-চিন্তা ১৮৪৪ থেকে সুস্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করে। তাঁর এই সময়ের লেখা প্রবন্ধে বুর্জোয়া বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের সংজ্ঞা তিনি সর্বপ্রথম মোটামুটিভাবে উত্থাপন করেন। হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছালেন যে প্রগতিশীল দর্শনের কাজ হচ্ছে ধর্মবিরোধী সংগ্রামকে সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করতে হবে যে সমাজব্যবস্থা ধর্মকে জন্ম দেয় এবং লালন করে প্রবল করে তোলে। উপলব্ধি করলেন যে 'স্বর্গ' না হয়ে 'মর্ত' হোক সমালোচনার বিষয়বস্তু, ধর্মতত্ত্বের সমালোচনার মোড় ঘুরিয়ে তাকে করা হোক রাজনীতির সমালোচনা। মার্কস এই

প্রসঙ্গে এ-কথাও বললেন যে সে-সমালোচনাকে করতে হবে জোরদার এবং বৈপ্লবিক। কিন্তু আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে তক্ষুনি বললেন বিপ্লবী বলপ্রয়োগের প্রয়োজনের কথা। তাঁর সেই উক্তি সমালোচনাসর্বস্ব মেকি বিপ্লবীদের মুখের সামনে উদ্যত তর্জনীর মতো : 'বলাবাহুল্য, সমালোচনা-অস্ত্রটি অস্ত্রের দ্বারা সমালোচনার প্রয়োজন মেটাতে পারে না, বস্তুশক্তিকে বস্তু-শক্তিই পরাজিত করতে পারে, তবে থিয়োরি বা মতবাদও জনতার মনকে আঁকড়ে ধরা মাত্র বস্তু-শক্তি হয়ে ওঠে'।' প্রশ্ন উঠতে পারে : মতবাদ কখন মনকে আঁকড়ে ধরতে পারে? উত্তরে মার্কস বলেছেন : যখন মতবাদ জনস্বার্থে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। মতবাদের মধ্যে জনসাধারণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলোকে প্রতিফলিত দেখলেই সেটাকে আপনার জিনিস বলে জড়িয়ে ধরে। একটা মন-গড়া আইডিয়া বা আদর্শ নিয়ে সামনের দিকে জোর করে এগোতে গেলে কোনও ফল হবে না, যদি-না বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই সেই আদর্শের জন্ম হয়। মার্কস বললেন নতুন জীবনদর্শন হবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দাবি-দাওযার সংগ্রামের দর্শন—সে-দর্শন সত্যিকার সার্থকতায় তখনই পৌঁছাবে যখন সর্বহারারা নিশ্চিহ্ন হবে, অর্থাৎ তারা যখন হবে সর্বজয়ী। দর্শনের বাস্তব হাতিয়ার হচ্ছে সর্বহারারা আর সর্বহারাদের মনের হাতিয়ার হচ্ছে দর্শন।

তরুণ মার্কসের মনের এই দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের মর্মভেদের প্রয়াস সমাজচিন্তায় নতুন আলোকপাত। তাঁর পথের সবটা তখনও আলোকিত হয়ে ওঠেনি। আলোছায়ার মধ্যে পথের রেখা ফুটে উঠতে শুরু করেছে মাত্র। বিপ্লবী মার্কসের আবির্ভাব হয়েছে। জনসাধারণ এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে সম্বোধন করে মার্কস সমাজ বদলাবার প্রস্তাব ও নির্দেশ তাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বিপ্লবতত্ত্বকে আরও বিকশিত করে তুললেন তাঁদের *পবিত্র পরিবার* গ্রন্থটিতে। বার্লিন থেকে প্রকাশিত ব্রুনো বাউয়ার ও তাঁর ভাইদের এবং তাঁদের সহগামীদের লেখার জবাব হিসেবে *পবিত্র পরিবার* বইখানি বাউয়ার-গোষ্ঠীকে বিদ্রুপ করল এবং সুযুক্তিপূর্ণ কঠোর সমালোচনা করল। জবাবটি অনেক দেরিতে বার হয় বলে কেউ কেউ বলেন যে এ যেন মরা গাধাকে পেটানোর ব্যাপার। কিন্তু বাউয়াররা তেমন জমাতে পারেননি বলে তাঁদের মরা গাধা বলা বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলা, আর জাতীয় গাধা যে সহজে মরে না আধুনিক চিনের অতন্দ্র সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার প্রমাণ। নতুন দর্শনের ওই সংগ্রামী ভূমিকা কত যুগ ধরে যে চালাতে হবে তা আজকের দিনের চিনও সঠিকভাবে বলতে পারছে না, মার্কসের পক্ষে সে-আমলে বলা তো আরও অসম্ভব ছিল। মার্কস-এঙ্গেলস দেরিতে হলেও জবাব দিয়ে ঠিকই করেছিলেন। সে-জবাবের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের বিপ্লব সম্পর্কে বক্তব্য আগের চাইতে আরও খানিকটা এগিয়েছিল।

ব্রুনো বাউয়ারের দল বলেছিলেন যে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের সব বড়ো বড়ো আন্দোলন শুরু থেকেই বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং ব্যর্থতার অভিশাপ বহন করেছে, কারণ জনতা সেগুলোতে উৎসাহ নিয়ে জড়িয়ে পড়ে অথবা পরম আগ্রহে সেগুলোকে সমর্থন করে। অথবা সেই আন্দোলনগুলোর দুঃখময় অপমৃত্যু ঘটে এই জন্য যে, যে-ধারণাকে কেন্দ্র করে তারা গড়ে উঠেছিল সে-ধারণাকে একটু ভাসা-ভাসা ভাবে উপলব্ধি করলেই হত, অর্থাৎ সেই আন্দোলনগুলো নির্ভর করেছিল জনতার অবুঝ হাততালির ওপর। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ থেকে বাউয়াররা এই সত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করেন যে 'বুদ্ধি' আর 'জনতা' পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ বাউয়ারদের মতো 'বুদ্ধিজীবীরা' মনে করেন যে জনতা আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত এবং মেরুদণ্ডের অভাবে অসুস্থ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন বাউয়ার-গোষ্ঠীর প্রচারপত্রে সব 'গণ-আন্দোলনকেই ঘৃণার ঝুল-কাল মাখিয়ে সঙ্ সাজানো হত। 'পবিত্র' এই পরিবারকে আক্রমণ করে মার্কস দেখালেন যে বুদ্ধিজীবীদের 'আইডিয়া' 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' ওঠে না, জনস্বার্থের জমিতে তার শেকড় না থাকলে সে আইডিয়া শুকিয়ে মরতে বাধ্য। বাউয়ারের ফরাসি বিপ্লবের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে মার্কস বললেন সে-বিপ্লব বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে 'বিপথে পরিচালিত' হয়নি, বুর্জোয়া স্বার্থসিদ্ধি ভালোভাবেই করেছে।

স্বার্থসিদ্ধি হওয়ার পর ফরাসি বিপ্লবের প্রগতির ভূমিকা আর রইল না—জনস্বার্থের দিক থেকে বিপ্লব ব্যর্থ হল। এ-ব্যর্থতা অনিবার্য, কারণ বিপ্লবের মূল প্রেরণা আর জনস্বার্থের মধ্যে বিরোধ ঘটল।

রাষ্ট্র বুর্জোয়া সমাজের বিচ্ছিন্ন অণুগুলোকে এক সঙ্গে গেঁথে রাখে—বাউয়ারের এই তত্ত্বকে আক্রমণ করে মার্কস বললেন যে চরম অজ্ঞ লোকেরাই শুধু বলতে পারে যে রাষ্ট্র বুর্জোয়া সমাজকে ধরে রাখে, তার সংহতিকে রক্ষা করে। আসল কথাটা এর উল্টো—বুর্জোয়া সমাজই রাষ্ট্রকে ধরে রাখে।

ব্রুনো বাউয়ার ইতিহাসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিল্প ও প্রকৃতির গুরুত্বকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। জবাব দিতে গিয়ে মার্কস বললেন যে বাউয়ারের মতো বিদ্বানরা ইতিহাসবিদ্যার দ্বারপথেও এসে পৌঁছাননি, কারণ তাঁরা ইতিহাসের অগ্রগতির প্রবাহ-পথ থেকে মানুষের প্রকৃতির প্রতি, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি এবং শিল্পের প্রতি তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত মনোভাবকে বার করে দিয়েছেন। বাউয়ারের দার্শনিকতা যেমন মননকে অনুভূতি থেকে পৃথক করে এবং মনকে দেহ থেকে পৃথক করে ঠিক তেমনি তা ইতিহাসকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে আর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মনে করে ইতিহাসের জন্মস্থান উর্ধ্ব আকাশের কুহেলিকাময় মেঘলোকে, মাটির পৃথিবীতে বস্তু-উৎপাদনের কঠিন কঠোর কর্মক্ষেত্রে নয়।

পবিত্র পরিবার বইখানিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস নির্দিষ্ট বিপ্লব-ব্রত বিবৃত করেছেন। দেখিয়েছেন যে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ইতিহাস বাদ দিলে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছে শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম। ঘোষণা করেছেন যে সর্বহারারাই ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়ে। সর্বহারাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তার সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বও রক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে শ্রমিকশ্রেণীও নিজের অসহনীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধী শক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধ্বংস করতে বাধ্য। কারণ সেই শক্তিই সর্বহারাকে সর্বহারা করে রেখেছে। এই যে পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্ক, এর ভেতর সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সংরক্ষণশীল এবং সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে ধ্বংসপন্থী। মালিকশ্রেণী বিরোধের সম্পর্ক অটুট রাখতে খুবই সক্রিয়, কারণ বিরোধ-রক্ষা মানেই সম্পদ-রক্ষা। অপর পক্ষ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী বিরোধের সম্পর্কটাকে ধ্বংস করতে চায়, কারণ বিরোধকে চুরমার করতে পারলে তাদের যুগযুগান্তের শেকলও গুঁড়িয়ে যাবে। ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে সর্বহারাকে, সৃষ্টি করে সর্বহারার নিজের দেহ মনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে চেতনাকে, অমানুষদের অমনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বোধকে এবং সেই অমানুষিক অবস্থাকে শেষ করে দেবার সংকল্পকে।

ইতিহাসের বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাজে সর্বহারার ভূমিকাকে সবার উপরে স্থান দিয়ে মার্কস তাদের দেবতা করে তুলেছেন—এই অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর উত্তর এই : পরিপূর্ণভাবে বিকশিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ও জীবিকা-ব্যবস্থা সমসাময়িক সমাজের অমানুষিক অবস্থার কেন্দ্রবিন্দু, সর্বহারার মধ্যেই মানুষের সর্বরিক্ত রূপ প্রস্ফুট, আবার এই সর্বহারারাই তত্ত্বের দিক থেকে নিজেদের রিক্ততা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং অবস্থার অনিবার্য চাপে বাধ্য হচ্ছে অমানুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, সুতরাং এই সর্বহারাদের মুক্তি তাদের নিজেদেরই আনতে হবে। যে-অবস্থা তাদের সৃষ্টি করেছে সেই অবস্থাকে নিঃশেষে ধ্বংস না করে সর্বহারারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে না, আর তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধ্বংস করা মানে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সমস্ত অমানুষিক বিধিব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—যে-অমানুষিক বিধিব্যবস্থা বা অব্যবস্থা সর্বহারাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যেই জমাট হয়ে দেখা দেয়।

আরও বিশদ করে বললেন : কঠোর পরিশ্রম এদের পক্ষে এমন একটি বিদ্যালয় যে তা এদের কঠোর করে তোলে—সেখানকার শিক্ষা নিষ্ফল হয় না। সাময়িকভাবে কোনও একজন শ্রমিক বা অপর আরেকজন শ্রমিক, এমনকি গোটা শ্রমিকশ্রেণী লক্ষ্য সম্পর্কে কী কল্পনা করল সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী আসলে কী এবং সে আসলে যা তার দরুন ইতিহাস তাকে কোন কর্তৃব্যের পথে প্রবলভাবে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য আগে থেকে নির্ধারিত আছে—সে-কর্তব্য সুস্পষ্ট এবং

অলঙ্ঘ্য হয়ে আছে শ্রমিকদের নিজেদের অবস্থার মধ্যেই, বুর্জোয়া সমাজের গোটা সংগঠনের মধ্যেই। বার বার করে মার্কস ও এঙ্গেলস বললেন যে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সর্বহারাদের এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সেই সচেতনতাকে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার স্তরে উন্নীত করবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে।

এই *পবিত্র পরিবার* বইটির কাছাকাছি সময়ে লেখা *ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা* এঙ্গেলসের নিজস্ব গবেষণার ফল। বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনে ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্গতির বীভৎসতার বাস্তব চিত্র এই বইটিতে আঁকা হল। তবে সর্বহারার লাঞ্ছনার ছবি আছে বলেই যে মার্কসীয় সাহিত্যে এই বইটি মূল্যবান তা নয়। কারণ এঙ্গেলসের আগেও দুর্গতদের বর্ণনা অনেকেই পরিবেশন করেছেন—যেমন বুরে, গ্যাসকেল প্রমুখ এবং তাঁদের লেখা থেকে এঙ্গেলস উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রচুর। বইখানির গুরুত্ব এই জন্যই যে ইংল্যান্ডের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস সে-ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু রূপ আর শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের উপর জোর দিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্র প্রয়োগ করে তিনি দেখালেন যে শ্রমিকশ্রেণী তার জন্মদাতা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থাকে ধ্বংস করবেই করবে। ঘোষণা করলেন : শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের সর্বহারার শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই বইখানি লেখা শেষ করে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে ব্রাসেল্‌জে দেখা করলেন। ১৮৪৫-এর বসন্তকাল। এঙ্গেলস এই সময়ের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে তখন মার্কস তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল কাঠামোটা তৈরি করে ফেলেছেন এবং তখন থেকে তাঁরা দু-জনে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বহুবিস্তারিত প্রয়োগের যুক্ত প্রয়াসে ব্রতী হলেন[২]।

তাঁদের যুক্ত উদ্যোগে 'জার্মান ভাবাদর্শ' বইখানির সৃষ্টি হল। বইখানির উদ্দেশ্য অবৈজ্ঞানিক জার্মান দর্শনের আলোচনা অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের 'অতীত দার্শনিক বিবেক' সম্পর্কে সমালোচনা। কারণ তাঁরা গোড়ার দিকে হেগেলপন্থী ছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা আপাতত 'জার্মান ভাবাদর্শ' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কারণ, সেখানেই তথাকথিত 'যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে সমালোচনা আছে। কিছু মানবতা, সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে কিছু প্রোলেতারীয় আক্রমণ, শ্রমিক-সংগঠন, অবনত শ্রেণীগুলোর উন্নয়নের জন্য কিছু করুণ চেহারার গোবেচারি সমিতি গঠন এবং অর্থনীতি ও সমাজের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে সর্বব্যাপী অজ্ঞতা—এই নিয়ে 'যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদ'। বিখ্যাত 'কম্যুনিস্ট ইস্তাহার'ও এই খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদের কঠোর সমালোচনা পরবর্তীকালে করেছিল।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব এই বইখানিতে আরও কিছুটা বিশদ হল, দেখানো হল যে বস্তু-নির্ভর কতকগুলো নিয়মের উপরই সর্বহারাদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ভিত্তি। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করলেন যে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সীমানার বাইরের স্ব-নির্ভর অর্থনৈতিক নিয়মের ক্রিয়ার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বিশ্বে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবেই—কোনও শক্তিই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। অনাগত সাম্যবাদী সমাজের মোটামুটি চেহারাটা 'জার্মান ভাবাদর্শ' ফুটিয়ে তুলল।

প্রায় একই সময়ে লেখা প্রবন্ধ হচ্ছে 'ফয়ারবাখ প্রসঙ্গে'। এই প্রবন্ধে যে-কথাটা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে শুধু মনন-চিন্তন যথেষ্ট নয়, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের প্রয়াসকে যুক্ত করতে হবে, কারণ ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে বৈপ্লবিক তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তত্ত্বকে আকাশস্থ নিরালম্ব হয়ে থাকলে চলবে না, তত্ত্ব হবে জীবনের রণক্ষেত্র ভাঙা-গড়ার দুর্জয় অস্ত্র। ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা মার্কসের যে-উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি তা ফয়ারবাখের প্রয়োগবিমুখতার প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছিল—বিপ্লবী দর্শনের প্রকৃত ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন : দার্শনিকেরা শুধু জগৎকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আসল কথা হল জগৎকে পরিবর্তন করা। সমাজকে শুধু জানলে হবে না, পুরোনো সমাজকে ভাঙো, নতুন সমাজ গড়ার কাজে হাত লাগাও—এই হল মার্কসের আহ্বান।

এবারে দেখতে হয় মার্কস ও এঙ্গেলস বিপ্লবী গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের ঐক্যের সূত্র গ্রন্থনের কাজে কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্যুনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক উৎস খুঁজতে গেলে দেখব ইউরোপের তিনটি প্রধান রাজধানীতে—প্যারিস, ব্রাসেল্‌জ ও লন্ডনে—প্রবাসী জার্মান সংগঠনগুলোই এর মূলে ছিল। অবশ্য তারা অন্য দেশের প্রতিনিধিদেরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সঙ্গে পেত। এই জার্মান সংগঠনগুলো কিন্তু প্রায়ই জার্মানির কল্পনা-সর্বস্ব 'কম্যুনিস্ট' ভাইটলিং-এর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করত।

বিপ্লবী দর্শন ও কর্মধারার আলোচনায় ভাইটলিং এবং তাঁর সঙ্গে ফরাসি দেশের প্রুধঁ এসে পড়বেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিপ্লবী দর্শনকে শ্রমিক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে দুটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। এক, বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে। দুই, পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর নানা রকমের সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে। তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মধুকুঞ্জে স্বপ্ন-শয়নে এলিয়ে দিত। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু বুর্জোয়া শোষকদেরই এতে লাভ হত। ভিলহেল্‌ম ভাইটলিং ছিলেন কাল্পনিক সাম্যের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর এবং তাঁর সহগামীদের মুখরোচক প্রচারে বলা হত ভালোবাসা আর ভ্রাতৃভাবের কথা—উদ্দেশ্য হল সর্বহারা ও সর্বস্বাপহারকদের মধ্যেকার বৈরিতাকে প্রলেপের সাহায্যে সর্বহারার পক্ষে খানিকটা সহনীয় করে তোলা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সহযোগিতার পরিবেশ রচনা করা। প্রুধঁর দর্শনের সঙ্গেও সংঘর্ষের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রুধঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রবন্ধের উত্তরে ১৮৪৭-এ মার্কসের লিখতে হল 'দারিদ্র্যের দর্শন।' এই প্রবন্ধটিতে মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন এবং মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধে বললেন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণীর অবলুপ্তি। সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে-বিরোধ তা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, কারণ এই বিরোধকে তার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটবে। শ্রেণীহীন সমাজ যেদিন আসবে শুধু সেদিনই শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংঘর্ষের অবসান হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন প্রতিটি সামাজিক রূপান্তরের পূর্ব-মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত কথা হচ্ছে : 'জয়লাভ অথবা মৃত্যু! রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা অবলুপ্তি! প্রশ্নটা এই রকম নির্মমভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায়।' উদ্ধৃতিটি মার্কস নিলেন জর্জ সাঁদ থেকে। প্রুধঁর প্রবন্ধের উত্তরের উপসংহারে এই রকম সংহারের কথাই মার্কসকে বলতে হল—কারণ, বুর্জোয়া দার্শনিকদের মুখের মতো জবাব এটাই।

'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উত্থাপন করা বাকি আছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচিত হল এই প্রবন্ধে। সঙ্গে সঙ্গে বলা ভালো যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে মার্কস এখানে প্রমাণ করে দেখালেন যে শোষণ, দারিদ্র্য, সংকট, মন্দা ধনতন্ত্রবাদের নিত্যসঙ্গী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উৎসাদনের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ এই অভিশাপগুলো থেকে মুক্ত হবে। সর্বহারার বিশ্বজোড়া ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাপারে তিনি অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের তাৎপর্যও তুলে ধরলেন এবং সর্ববারার শ্রেণী-সংগ্রামের কৌশলের প্রথম আভাস দিলেন।

বিপ্লবী গ্রন্থ থেকে বিপ্লবীদের গ্রন্থন বা সংঘবদ্ধ করার প্রসঙ্গ তুলে একটু দূরে সরে গেছি। যথাস্থানে ফিরে আসা যাক।

বিপ্লবীদের সংগঠন হিসেবে কম্যুনিস্ট লিগ নামের প্রতিষ্ঠানটি সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মের সূত্র ধরে পেছনের দিকে গেলে আমরা দেখব যে জার্মান উদ্বাস্তুদের গোপন সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল সে-যুগের পৃথিবীর বিপ্লবের কেন্দ্র প্যারিসে। জন্ম-তারিখ ১৮৩৪, নাম নির্বাসিতদের লিগ। ১৮৩৬-এ অপেক্ষাকৃত জঙ্গি কর্মীদের চেষ্টায় পুনর্গঠিত হয়ে নাম হল ন্যায়পরায়ণদের লিগ। লিগের সভ্যরা ১৮৩৯-এর অভ্যুত্থানে ফরাসি বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেন। লিগের নেতারা নির্বাসিত

হলে পর তার কেন্দ্রীয় দপ্তর প্যারিস থেকে লন্ডনে উঠে যায়। এঙ্গেলস লিখেছেন যে লন্ডনে আসার পর থেকে এই লিগ একটি জার্মান সংগঠন থেকে ক্রমে এক আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপ নেয়। 'সব মানুষ ভাই ভাই'—সভ্যদের কার্ডের উপর এই কথা ছাপানো থাকত।

মার্কস ও এঙ্গেলসের ইংল্যান্ডের চার্টিস্টদের এবং ফ্রান্সের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যেমন যোগ ছিল তেমনি এই ন্যায়পরায়ণদের লিগের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা চলতেন, কিন্তু গোড়ার দিকে তাঁরা লিগের সভ্য হতে আপত্তি জানান। আপত্তির কারণ এই যে লিগের ভ্রান্ত কাল্পনিক সাম্যবাদী তত্ত্ব এবং সংকীর্ণ গোপন সংগঠনের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রাসেল্‌জে জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ বলে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন—একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য ক্রমে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। ব্রাসেল্‌জে 'কম্যুনিস্ট পত্রালাপ সমিতি' নামে একটি সমিতিও স্থাপিত হল। তারপর ব্রাসেল্‌জের এই সমিতি ইংল্যান্ডের চার্টিস্টাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, লিগের লন্ডন শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং তার প্যারিস শাখার সঙ্গে ও সম্পর্ক স্থাপন করে। জার্মানির কয়েকটা কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। লন্ডনেও একটি সহযোগী পত্রালাপ সমিতি স্থাপিত হয়। নতুন মতবাদ, অর্থাৎ মার্কসবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ন্যায়পরায়ণদের লিগের একজন প্রতিনিধি ১৮৪৭-এর বসন্তকালে ব্রাসেল্‌জে এসে মার্কসের সঙ্গে এবং প্যারিসে এঙ্গেলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এবারে লিগে যোগ দিতে রাজি হলেন। ১৮৪৭-এর গ্রীষ্মকালে লন্ডনে লিগের প্রথম কংগ্রেস হল। মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণদের লিগের পুনর্বিন্যাস হল। লিগ গোপন সমিতির ঐতিহ্য বর্জন করল। তার নতুন নাম হল : 'কম্যুনিস্ট লিগ'। পুরোনো দিনের আহ্বাবাণী 'সব মানুষ ভাই ভাই' বর্জন করে কম্যুনিস্ট লিগ নতুন ডাক দিল : 'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!' এই বাণী-পরিবর্তনের মার্কসীয় তাৎপর্য লক্ষ করবার মতো। 'সব মানুষ ভাই ভাই' আর 'বসুধৈব কুটুমকম্' একই জিনিস—ধোঁয়াটে মানবতার ঘোলাটে প্রচার। আসলে সব মানুষ তো ভাই ভাই নয়। শোষক মানুষ আর শোষিত মানুষ ভাই ভাই নয়। মুষ্টিমেয় অথচ বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী শোষকরা বিশ্বের শোষিত জনসাধারণের পরম শত্রু, তাদের শত্রু মনে করতে হবে, শত্রুর মতো তাদের ঘৃণা করা মুক্তিকামী মানুষের পবিত্র কর্তব্য, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের তাই সঠিক স্লোগান হল 'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!' সংক্ষিপ্ততার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতার খানিকটা কথা এখানে বাদ থেকে গেল, সে-কথা হচ্ছে : 'উপড়ে ফেলো শোষকদের শাসন-ক্ষমতা!' শুধু মানবতাবাদে আমাদের চলবে না, প্রোলেতারীয় মানবতাবাদ চাই—এই বোধ জাগাবার জন্যই মার্কস ও এঙ্গেলস নতুন স্লোগান উচ্চারণ করলেন। যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় বিপ্লবের লক্ষ এইভাবে ঘোষিত হল : 'লিগের লক্ষ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা, সর্বহারার শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণী-সংঘর্ষভিত্তিক পুরোনো বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি-শূন্য নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন।'

লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় ১৮৪৭-এর ডিসেম্বরে, লন্ডনেই। মার্কস সেখানে তাঁর নতুন তত্ত্ব বিবৃত করেন এবং প্রস্তাবিত নতুন নীতিগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ভার পড়ে সম্মেলনে গৃহীত আদর্শ ও কার্যক্রম অনুযায়ী একটি ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার রচনা করবার।

সমসাময়িক জার্মানিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর যে সংগ্রাম চলছিল মার্কস ও এঙ্গেলস তাতে সর্বহারাদের বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন, কারণ বুর্জোয়াদের তখনকার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। বিপ্লবী মার্কসবাদ যে গোঁড়া মতবাদ নয়, কর্মক্ষেত্রে পথনির্দেশ করাই তার কাজ—এঙ্গেলসের এই বিখ্যাত কথাটির অনেক প্রমাণের মধ্যে এটি একটি প্রমাণ। কম্যুনিস্ট লিগের কাজ ছাড়াও মার্কস ও এঙ্গেলস ব্রাসেল্‌জে গণতান্ত্রিক সমিতি বলে একটি সমিতি গড়তে উদ্যোগী হলেন। লক্ষ্য : গণতান্ত্রিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলা। তাঁরা বিনা দ্বিধায় সংকীর্ণতা-বিরোধী এই আদর্শ প্রচার করলেন যে

সর্বহারাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে উৎসাহিত করাই ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য।

লিগের প্রস্তাবিত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথমে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হল লন্ডনে, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে—ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্তে। যে-বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথাগুলো তাঁরা ইতিপূর্বে মোটামুটি প্রচার করেছেন সেগুলোকেই আরও সুস্পষ্ট ও সংহত করে মার্কস ও এঙ্গেলস এই ইস্তাহারে প্রকাশ করলেন। তার সঙ্গে থাকল বিপ্লবের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা। ১৮৮২-তে প্রকাশিত রুশ সংস্করণের ভূমিকায় আছে যে এই ইস্তাহারের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আসন্ন ধ্বংসের কথা প্রচার করা।

কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি, সর্বহারাদের সংগ্রামের পথপ্রদর্শক বিপ্লব-তত্ত্ব ও প্রয়োগপদ্ধতির চুম্বক। যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করে এতে দেখানো হল যে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরুন শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা কেটে যায় এবং তার পরিবর্তে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক ঐক্য—সান্নিধ্যের ফলে। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই তাদের কবর খোঁড়বার লোক সৃষ্টি করে চলেছে। এই শ্রেণীর পতন এবং সর্বহারাদের উত্থান দুই-ই অনিবার্য।

পার্টি এবং আশু দাবিদাওয়া সম্পর্কে ইস্তাহারে যে-কথাগুলো আছে তার সংশোধন পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলটিতে করা হয়নি, পুরোনো স্মৃতির আধার বলে সেটাকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কম্যুনিস্টদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ইস্তাহারে যা বলা হয়েছে সেটাই কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর পক্ষে প্রযোজ্য। সকল সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র কম্যুনিস্টরাই। কারণ তারাই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাগ্রগামী অংশ, কারণ তারা বৈপ্লবিক তত্ত্বের অস্ত্র হাতে পেয়ে যুদ্ধের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই তত্ত্বের সাহায্যে তারা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারে, সংগ্রামের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারে।

সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম ধাপ হচ্ছে শাসনক্ষমতা দখল করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়া। এই কথা বলে এই ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলছেন সর্বহারা শ্রেণী তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে ব্যবহার করবে ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে সব মূলধন ছিনিয়ে নিতে, রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করতে এবং উৎপাদনের শক্তি যত দ্রুত সম্ভব বৃদ্ধি করতে। এইভাবে ক্রমবিকাশের ফলে যখন শ্রেণীগুলো নিশ্চিহ্ন হবে, উৎপাদনের উপর সমাজের সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আসলে এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা। দাবিয়ে রাখার প্রয়োজন শেষ হলে সাম্যবাদী সমাজ দেখা দেবে, আমরা এমন একটি সমাজে বাস করব যেখানে প্রত্যেক মানুষের অবাধ বিকাশই হবে সবার অবাধ বিকাশের পূর্ব-শর্ত।

প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ঘোষণাও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মার্কস ও এঙ্গেলস বললেন যে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ফলে জাতি-সমস্যার সমাধান হবে, অর্থাৎ একজাতির উপর আরেক জাতির শোষণ পীড়নের অবসান ঘটবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পোল্যান্ডের ১৮৩৯-এর অভ্যুত্থানের কথা। ম্যানিফেস্টো লেখার কাছাকাছি সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস সেই অভ্যুত্থানের একটি স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন সর্ববারার সার্থক বিপ্লব উৎপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তি এনে দেবে। এঙ্গেলস জাতি-সমস্যার সমাধানের এই বিখ্যাত সূত্রটি সেদিন তুলে ধরেছিলেন : 'কোনও জাতিই স্বাধীন হতে পারে না যদি সে অন্য জাতিদের পীড়ন করে।'

কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহু-উচ্চারিত শেষ কথাগুলো উদ্ধৃত করে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের এই পর্বের কথা শেষ করি :

> কম্যুনিস্টরা তাদের মতামত ও লক্ষগুলোকে গোপন করতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষে পৌঁছানো যায় কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের সাহায্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ

বিধ্বস্ত করে। শাসকশ্রেণীগুলো কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে কেঁপে উঠুক। শেকল ছাড়া সর্বহারাদের আর কিছু হারাবার নেই। একটা গোটা দুনিয়া জয় করবার আছে।

'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!

ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্তে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছিল, এ-কথা বলেছি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব 'বুর্জোয়া রাজা' লুই ফিলিপকে গদিচ্যুত করে। বুরবঁ রাজবংশের পতনের পর তিনি গদিতে বসেছিলেন ফ্রান্সের ব্যাংক-মালিকদের নায়েব হিসেবে। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট চাপে লুই-র পতনের পর প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। বিত্তবানরা ক্ষমতা দখল করল। যাদের বিপ্লবী আক্রমণে লুই-র স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হল সেই শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করাই হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রথম কাজ। শ্রমিকরা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওই বছরের জুন মাসের শ্রমিক-অভ্যুত্থান পরাজিত হল। ক্রমে লুই ফিলিপের সময়কার মতো পুঁজির বড়ো বড়ো মালিকদের হাতেই আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে গেল।

বিত্তবানদের নিজেদের মধ্যেকার মতান্তরের সুযোগ নিয়ে এক ভাগ্যান্বেষী, সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বংশধর, লুই বোনাপার্ট নিপীড়িত কৃষক জনতার সমর্থনের উপর নির্ভর করে ১৮৫১ তে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল করল এবং সার্বভৌম শাসক হয়ে বসল। লুই বোনাপার্ট তার ভাগ্যান্বেষী-বাহিনী নিয়ে যে শাসন কায়েম করল ইতিহাসে তার নাম হচ্ছে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য'—লুই নিজেকে ঘোষণা করল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বলে।

ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় মার্কস ব্রাসেল্‌জ থেকে নির্বাসিত হলেন, কারণ বেলজিয়ামের সরকার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয়েছিল। ভালই হল, মার্কস ফ্রান্সের বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য প্যারিসে এলেন। জার্মানিতে তখন বিপ্লব আসন্ন। এই সময় বিপ্লবী অভিযাত্রী বাহিনী গঠন করে অন্য দেশে বিপ্লব করতে যাবার উন্মত্ত আগ্রহ প্যারিসকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। মার্কস এবং তাঁর সহকর্মীরা জার্মান কবি হেরভেগের 'জার্মান মুক্তি-বাহিনী' গঠন করে প্যারিস থেকে জার্মানি আক্রমণ করার উদ্ভট পরিকল্পনাকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কারণ মার্কসবাদের পরিষ্কার নির্দেশ বিপ্লব বাইরে থেকে আমদানি করা যায় না।

১৮৪৮-এর এপ্রিল মাসে মার্কস এঙ্গেলস এবং তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা প্যারিস থেকে জার্মানিতে গেলেন। সেখানে তখন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা ঘাঁটি করলেন কোলোনে। কম্যুনিস্ট লিগ এখানে সংগঠনের কঠিন কাজে ব্রতী হল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণী তখন খুবই দুর্বল, অসংগঠিত এবং রাজনীতিবোধের দিক থেকে বেশ অপরিণত। সুতরাং পার্টি গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস অন্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেন এবং 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইতুং' নামে একটি কাগজ বার করলেন। এই পত্রিকায় মার্কস ও এঙ্গেলস আঠারোশো আটচল্লিশ ও উনপঞ্চাশের ঝোড়ো দিনগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তখন প্যারিস ও ভিয়েনায় পথে পথে আর জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, হাঙ্গারি, পোল্যান্ড ও চেক্‌দের অঞ্চলে শহরে-জনপদে জনতার যে সংগ্রাম চলছিল তা তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় তুলে ধরছিলেন, যাতে আগুন আরও ছড়ায়। মার্চ মাসের অগ্নিময় সংগ্রামের ফলে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে পা দিয়ে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল এবং শোষিত শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার শুরু করল - —কৃষকসমাজ এবং অ-জার্মান জাতিগুলোর উপর হিংস্র নীতি চালাতে লাগল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইতুং' সুস্পষ্ট ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ ঘোষণা করে চলল। প্যারিসের শ্রমিকদের ১৮৪৮-এর জুনের অভ্যুত্থান —ফ্রান্সের ইতিহাসে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 'নয়ে রাইনিশে' বিদ্রোহীদের আশ্চর্য বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

ক্রমে ইয়রোপের সর্বত্র প্রতি-বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। মার্কস আর এঙ্গেলস তো শুধু তাত্ত্বিক নন, তাই তাঁরা জনতাকে হতাশা থেকে রক্ষা করবার জন্য সংগঠিত করে তুলতে নানা অঞ্চলে

ঘুরে ঘুরে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রাশিয়ার সরকার জাতীয় পরিষদকে যখন বের্লিন থেকে ব্রান্ডেনবুর্গে স্থানান্তর করবার হুকুমনামা জারি করল মার্কসের উদ্যোগে তখন আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক কমিটি জনসাধারণকে আহ্বান জানাল সরকারকে অর্থসাহায্য না করতে এবং সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে সরকারি ট্যাক্স আদায়ের জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে গেল। বুর্জোয়া আর পেতি-বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রাশিয়ায় প্রতি-বিপ্লব জয়ী হল। মার্কস বিপ্লবের নতুন জোয়ার আসবে আশা করে প্যারিসে চলে এলেন। জার্মানির পালাটিনেট অঞ্চলে তখনও বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবীদের লড়াই চলছিল। এঙ্গেলস সেখানে স্বেচ্ছাসৈন্যের একটি বাহিনীতে নাম লিখিয়ে চারটি খণ্ডযুদ্ধে যোগ দিলেন।

১৮৪৯-এর জুনে ফ্রান্সের পেতি-বুর্জোয়াদের নিষ্ফল সংগ্রামের পর সরকার মার্কসকে নির্বাসিত করল। তিনি লন্ডনে চলে গেলেন এবং এঙ্গেলস ও কম্যুনিস্ট লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও লন্ডনে এলেন।

ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম : ১৮৪৮-৫০ এবং *লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার* (অর্থাৎ 'কু দেতা বা আকস্মিক ক্ষমতা-দখল) —মার্কসের এই দুখানি প্রবন্ধ-সংকলনে ফ্রান্সের যে-বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা এইমাত্র উপস্থিত করলাম তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। এই লেখাগুলোতেই মার্কস সর্বপ্রথম ইতিহাস-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করলেন।

মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের প্রয়োজনে মনের মধ্যে সঞ্চয় করব তা এই : ১৮৪৮-এর বিপ্লবের চালিকাশক্তি ছিল শ্রমিক-শ্রেণী, কিন্তু তারা বুর্জোয়া শ্রেণীতেই গদি দখল করতে সাহায্য করেছিল। বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পেয়ে শ্রমিকদের আক্রমণ করল, তাদের বিচ্ছিন্ন করে পরাজিত করল। তবে এর ফলে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের বিরুদ্ধেই কাজ করল, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং পরিণামে নিজেদের হাতেও শাসনকর্তৃত্ব রাখতে পারল না। পেতি-বুর্জোয়া 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি' নিতান্তই ফাঁপা জিনিস—পার্লামেন্টে গলাবাজির সাহায্যে ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ করবে, এই স্বপ্নে সে বিহুল। পার্লামেন্ট সম্বন্ধে এই মোহ জনস্বার্থ-বিরোধী—'পার্লামেন্টারি বাতুলতা' হল এর সঠিক নাম।। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদীদের শাসন-শোষণের যন্ত্র—বুর্জোয়াশ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। ইতিপূর্বে সব বিপ্লবই রাষ্ট্রের শক্তিকে সুদৃঢ় করেছে, কিন্তু প্রোলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলা। কৃষক সমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু হিসেবে বিপ্লবের পথে টানতে হবে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীই বিপ্লবকে সফল করতে পারে। লুই বোনাপার্ট কৃষকদের সাহায্যেই বিপ্লবকে বিপর্যস্ত করে স্বৈরাচারী শাসক হতে পেরেছিলেন।

জার্মানি : বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব— মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা এই বইখানিতে ১৮৫১-৫২তে জার্মানিতে যে বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল সে-গুলোর আলোচনা আছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে : এই বিপ্লব জার্মানির সামন্তদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব।। শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেতি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়ারা গোড়ার দিকে প্রাশিয়ান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে। বিপ্লব যখন চলতে থাকে তখন বুর্জোয়া-শ্রেণী বেশ কিছু পেতি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে যোগ দেয়, কৃষকরা উদাসীন ভাব দেখায়, শ্রমিকশ্রেণী একা লড়াই করে হেরে যায়।

১৮৫০-এ লেখা এঙ্গেলসের *জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ* বইখানি ১৫২৫-এর জার্মান কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত হল : কৃষক যুদ্ধের মতো বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাহায্যের উপর আধুনিক জার্মানির শ্রেণী-সংগ্রামের সার্থকতা নির্ভর করে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের *স্পেনের বিদ্রোহ* বইখানি স্পেনের ১৮৫৪-৫৬-র ঘটনাবলির ব্যাখ্যা। লেখকরা বলছেন যে সামন্ত আভিজাতদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শ্রমিকরা সেই বিদ্রোহে সাহায্য করে। শেষে বুর্জোয়া ও সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা বিশ্বাসঘাতকতা করে, শ্রমিকরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধ করে পরাজিত হয়।

মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সামান্য এই পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃত বিপ্লবীদের বুঝতে হবে সমাজ-বিবর্তনের কোন স্তরে বিপ্লব সম্ভব, বিপ্লবের সর্বহারা শ্রেণীর মিত্র কে, শত্রু কে, বিপ্লবে কারা সাধারণত খানিক দূর এগিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কৃষক সমাজের সর্বহারাদের বিপ্লবে ভূমিকা কি।

একদিকে লেখার কাজ চলছে, অপর দিকে মার্কস ও এঙ্গেলস কঠোর পরিশ্রম করছেন অগ্রণী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে, শ্রমিকশ্রেণীকে ভবিষ্যতের বিপ্লবের জন্য তৈরি করতে এবং কম্যুনিস্ট লিগকে শক্তিশালী করতে। প্রাশিয়ান সরকার আতঙ্কিত হয়ে ধরপাকড় শুরু করল। কম্যুনিস্ট লিগের অনেকে ধরা পড়াতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ১৮৫২তে কম্যুনিস্ট লিগ ভেঙে দেওয়া হল।

মার্কস এরপর প্রধানত অর্থনীতির অনুশীলনে মন দিলেন। কিন্তু পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখাও ছিল—বিশেষ করে 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে'। এই সব প্রবন্ধে মার্কস ভারতের প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন, চিন ও এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের কথা বলেন, এশিয়ায় সামাজিক বিপ্লব না ঘটলে বিশ্ব মানবের মুক্তি অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। চিনের বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন : 'সবচেয়ে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব, এশিয়াতে নবযুগের শুরু হতে আর দেরি নেই।' ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে মার্কস ও এঙ্গেলস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেছিলেন এবং ভারত, চীন ও অন্যান্য উপনিবেশের বিদ্রোহকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভেতরকার বিপ্লবী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিলেন।

১৮৬১-৬৬ র আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য : এই গৃহযুদ্ধ আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরেকটা ধাপ মাত্র। আমেরিকার বিপ্লবী কর্তব্য হল বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, নিগ্রোদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, আর দাসদের মুক্তি দেওয়া। আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর চাপেই দাসদের মুক্তি সম্ভব হয়েছিল--লিনকনের গর্ভনমেন্ট এই চাপ ছাড়া বেশি এগোত না। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর চাপে বৃটিশ গর্ভনমেন্ট ইচ্ছা সত্ত্বেও দাস-মালিকদের সাহায্য করতে পারেনি।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই লেখাগুলোর উল্লেখ করছি এই জন্য যে এগুলো প্রমাণ করে যে যেখানেই বিপ্লবী শক্তির অভ্যুদয় হয় সেখানেই সহযোদ্ধার হাত বাড়িয়ে দেয় মার্কসবাদীরা। যেমন ১৮৬৭-র আইরিশ বিদ্রোহের পর মার্কস প্রথম আন্তজাতিকের জেনারেল কাউন্সিলে প্রস্তাব করেছিলেন যে ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে আয়ার্ল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করতে হবে এবং ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর প্রভাব থেকে সরে এসে আইরিশ-দের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় যোগ দিতে হবে।

তাই ব্রিটিশ রাজনীতির নগ্নরূপ, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ভণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজি মার্কস প্রকাশ করে দেন এবং বামপন্থী চার্টিস্টদের উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু তখন ইংল্যান্ডে কিছু করা দুই কারণে কঠিন ছিল এবং ১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পর সর্বত্রই প্রতিক্রিয়ার প্রবল আক্রমণ হল; দুই উপনিবেশ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা সঞ্চয় করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর উপরের স্তরের লোকদের টাকাকড়ি দিয়ে কিনে নিল।

মার্কস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক গবেষণা করে যাচ্ছিলেন সাময়িকভাবে তা এখন পাশে সরিয়ে রাখলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খণ্ডিত ইতালির একীকরণ ও মুক্তি আন্দোলনে এবং খণ্ডিত জার্মানির একীকরণ আন্দোলনে তিনি মন দিলেন। মার্কস বললেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সম্প্রাসরিত করতে হবে, তার মধ্যে টেনে আনতে হবে সাধারণভাবে পেতি-বুর্জোয়াদের, বিশেষভাবে কৃষকদের এবং অবশেষে সব বিত্তহীন শ্রেণীগুলোকে[৩]।

জার্মানির একীকরণ আন্দোলন সফল হবে সাধরণ মানুষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে —এই ছিল মার্কসের মত। সুবিধাবাদী শ্রমিকনেতা লাসালে তার বিরোধিতা করলেন। লাসালের মতে রাষ্ট্র সব শ্রেণীর

ঊর্ধ্বে, শ্রমিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হবে এবং আইনের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে সব সময় আটকে রাখবে। শ্রেণী-সংগ্রাম, স্ট্রাইক, ট্রেড ইউনিয়ন ভালো নয়, আর কৃষকরা হল 'একটা প্রক্রিয়াশীল জনসমষ্টি'—এই ধরনের সব ধারণা ছিল লাসালের। তিনি সমাজতন্ত্রবাদের চরম শত্রু বিসমার্কের সঙ্গে গোপন চুক্তি করলেন এই বলে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার যদি বিসমার্ক দেন তবে লাসালে শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে তাঁর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করিয়ে দেবেন। মার্কস তাঁর 'ক্রিটিক অব গৌথা প্রোগ্রামে' লাসালের ভ্রান্ত ও শয়তানি মদবাদের সমালোচনা করেন।

তখন রাশিয়ায় সবে রাত কাটছে। প্রথম উষার আলো মার্কসের চোখ এড়াতে পারল না। তিনি অভিনন্দন জানালেন, বললেন, রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আর আমেরিকায় দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক ঘটনা।

জারের সাম্রাজ্যে যেমন ভাঙন ধরেছিল বোনাপার্টের 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'ও তেমনি শান্তি ছিল না। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে তাঁর সাম্রাজ্যের কবরের ওপর 'জাতীয় প্রতিরক্ষার গভর্নমেন্ট' প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৭১ এর প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী প্যারিসকে রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিল। 'জাতীয়' সরকার প্রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করল কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের শাসন-যন্ত্র গড়ে তুলল—ইতিহাসে যার নাম চিরঅম্লান সেই 'প্যারিস কম্যুন' জন্ম নিল। যে ভুলত্রুটির জন্যে কম্যুনের পতন হল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষক সমাজকে কম্যুনের পক্ষে আনা যায়নি। *ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ* বইখানিতে মার্কস ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের বিশ্লেষণ করলেন। প্যারিস কম্যুন সম্পর্কে মার্কস বললেন : অবশেষে আবিষ্কৃত হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কী রূপ নেবে —তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র কী রকম হবে। কম্যুনই হবে প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের রাজনৈতিক সংগঠন। কম্যুন প্রমাণ করল যে শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করে ব্যবহার করতে পারে না, তাদের উচিত হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করা এবং তার জায়গায় নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের উপযোগী যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ-কথা শুনে আমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে আইনসভায় সংখ্যাগুরু হয়ে মন্ত্রিত্ব আয়ত্ত করে সর্বহারার যে কল্যাণ আমরা চাই তা করা যাবে কি? আরেকটা প্রশ্নও ঠেকানো যাবে না : এ হেন কল্যাণ-কর্মের কোনও ঐতিহাসিক নজির আছে কি?

প্যারিস কম্যুনের আগেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি বা প্রথম আন্তর্জাতিক মার্কসের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সংগঠিত হয়েছিল। কারণ পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ, সর্বহারার অবস্থার ক্রমাবনতি, ১৮৫৭-র বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতি বিপ্লবী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ব্যাপক করেছিল। ফ্রান্সের প্রুঁধ-পন্থীরা, ইংল্যান্ডের ওঁইন-পন্থী ও সুবিধাবাদী ট্রেড-ইউনিয়ন নেতারা, ইতালির মাটসিনি ও জার্মানির লাসালের অনুসরনকারীরা মার্কস-এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে লাগল। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামে মার্কসবাদের শত্রুরা শেষ অবধি পরাজিত হল। স্বপ্নচারী ও আপসপন্থীদের বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরাজয় অনিবার্য। এই সময় রাশিয়ার বাকুনিন-পন্থীরাও মার্কসবাদের বিরোধী ছিলেন। বাকুনিন ছিলেন নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসের শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের তত্ত্ব মানতেন না।

প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর অস্থিরতা দেখে আন্তর্জাতিকের সভায় মার্কস অসময়ে, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের বিদ্রোহ করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিলেন। কিন্তু যখন প্যারিস কম্যুনের খবর লন্ডনে পৌঁছাল তখন তিনি ফরাসি শ্রমিকনেতৃত্বকে 'হঠকারী' বলে গালাগাল করলেন না, বরং পৃথিবীর দেশে দেশে শত শত চিঠি পাঠালেন কম্যুনকে সমর্থন করে, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এবং কম্যুনকে রক্ষা করবার সংগ্রামে যুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে। খাঁটি বিপ্লবী চরিত্র একেই বলে। লেনিন ১৯০৫এ বলেছিলেন : 'বর্তমান আন্দোলনে আমরা সবাই কম্যুনের কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।' মার্কস বললেন ফরাসি বিপ্লবের পরের ধাপ হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করা—সর্বত্রই গণবিপ্লবকে এই কাজটি করতে হবে। কম্যুনের শিক্ষা এই। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে অবশ্য মার্কসের অন্য আশা ছিল। স্তালিন তাঁর *লেনিনবাদের সমস্যাবলি*

গ্রন্থে বলছেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথে প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে মার্কস এ-রকম সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-কথা ভেবেছিলেন যখন একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব হয়নি এবং ওই দেশগুলো তাদের বিকাশের বিশেষ পরিবেশের দরুন আমলাতন্ত্র ও সমরবাদ কৃষ্টি করেনি। লেনিনকে উদ্ধৃত করে স্তালিন বলেছিলেন যে ১৯১৭ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের ইংল্যান্ড আর আমেরিকা সম্বন্ধে ওই কথা আর খাটে না। এখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য পথ নেই। স্তালিন এ-কথা বলে উপসংহারে বললেন : সশস্ত্র প্রোলেতারীয় বিপ্লবের নীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবার নীতি—একটি অনিবার্য নীতি। তিনি আরও বললেন : অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে যদি অধিকাংশ গুরুত্বসম্পন্ন পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারারা জয়ী হয়ে যায়, যদি এখনকার পুঁজিবাদী বেড়াজালের বদলে সমাজবাদী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি হয় তবে কোনও কোনও পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হওয়া খুবই সম্ভব—সে-দেশের পুঁজিবাদীরা 'প্রতিকূল' আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ সর্বহারাশ্রেণীকে 'স্বেচ্ছায়' বেশ খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা দেওয়া সুবিবেচনার কাজ মনে করবে। কিন্তু এ-অনুমান সুদূর ও সম্ভাব্য এক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গেলে এ-রকম অনুমানের কোনও ভিত্তি নেই। আবার লেনিনকে উদ্ধৃত করে স্তালিন বললেন : বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপ্রয়োগে ধ্বংস করে এবং তার জায়গায় একটি নতুন যন্ত্র বসানো ছাড়া সর্বহারার বিপ্লব অসম্ভব।

মার্কস-এঙ্গেলস থেকে আমরা লেনিন-স্তালিনে পৌঁছে গেছি। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করেছি। সুতরাং বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা ও কর্মকৌশল যুগ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু পরিবর্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। লেনিনবাদ হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কস এবং লেনিনের মধ্যে যুগের ব্যবধানের জন্য তফাৎ দাঁড়াল এই যে মার্কস বলেছিলেন বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছানো যাবে না। মার্কস এই শিক্ষাও দিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রামক্ষেত্র থেকে শ্রমিকশ্রেণী সোজা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পদক্ষেপ করবে, বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাদের শক্তিকে সংহত করবার সুযোগ দেবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে দেবে না। মার্কসের এই তত্ত্বকে কখনও কখনও স্থায়ী, অব্যাহত, অবিরাম বিপ্লবের তত্ত্ব বলা হয়। ১৮৪৮-৫০-এর বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগে মার্কস শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সাহায্য দিয়ে আর ধাক্কা দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিপ্লব সফল হলে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের গড়ে তুলতে হবে তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণী-সংগঠন, তাদের নিজেদের পার্টি। এই পার্টি নিজেদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে বিপ্লব চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে। মার্কসের শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকশিত করে তুলে লেনিন ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সময় এই শিক্ষা দিলেন যে বুর্জোয়া-বিপ্লবে নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর নিজের হাতে নিতে হবেই এবং প্রধান মিত্র হিসেবে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত করতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীকে গদিতে বসাবে না, শ্রমিক ও কৃষকের হাতে ক্ষমতা এনে দেবে। শ্রমিক-কৃষকদের অর্জিত এই ক্ষমতার নাম দিলেন লেনিন 'শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'। লেনিন আরো বললেন যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর গণতন্ত্র। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবে লেনিন যে নতুন পথ ধরলেন তা তাঁর 'দুই কৌশল' বইখানিতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা আছে। ওই পথ ধরেই অক্টোবরের মহান বিপ্লব সম্পন্ন হয়, ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-বিপ্লবের পর এগিয়ে গিয়ে অক্টোবরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা হয়। লেনিন ও স্তালিন হাতেকলমে প্রমাণ করলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে একটি মাত্র ধনতান্ত্রিক দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় লাভ সম্ভব। সার্থক রুশ বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন যুগের সুচনা করল —সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ।

বিপ্লবী আন্দোলনের গৃহশত্রু সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লেনিনকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

পুরোনো সংশোধনবাদী বের্নস্টাইন, কাউট্স্কি, অর্থনীতিবাদী ও মেনশেভিকরা আর ট্রট্স্কি এবং বুখারিন থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের ক্রুশ্চভ, তোরে, তোগলিয়াত্তি, আর লিউ শাও-চি —সবাই মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের সংশোধন করে আসছে। আজকের পৃথিবীতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধানতম আভ্যন্তরীণ শত্রু। আধুনিক সংশোধনবাদীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব প্রচার করে দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি করছে। এমনকি উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে এই সুখবর পরিবেশন করে তারা সাম্রাজ্যবাদের নয়-উপনিবেশিক কৌশলকে আঁচল দিয়ে আড়াল করে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় মুক্তিবাদের দ্বন্দ্বকে তারা মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না।

প্রসঙ্গের টানে একটু ভাবীকালে চলে গেছি, এবারে ফিরি। স্তালিন এমিল লুডভিগকে বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে লেনিনের শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। সত্যিই তাই। রুশ বিপ্লবে তিনি ছিলেন লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী। লেনিনবাদ অনুসরণ করে তিনি উৎপীড়িত জাতিদের বিপ্লবী আন্দোলনে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করবার ব্যাপারে আর বিশ্বময় সমাজতন্ত্রকে জয়ী করার সংগ্রামে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তিনি উচ্চ মূল্য দিতেন। জাতীয় মুক্তির সমস্যা মূলত কৃষিবিপ্লবের সমস্যা এবং জাতীয় মুক্তির বিপ্লবে কৃষিবিপ্লবই হচ্চে মৌলিক ও চূড়ান্ত কার্যক্রম— এই ছিল তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব। চীন বিপ্লবে তাঁর দান বিপুল। তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে চিন বিপ্লবের প্রধান ঝোঁক হতে হবে কৃষক সমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, লক্ষ লক্ষ কৃষকের অভ্যুত্থান ঘটানো, শ্রমিক-কৃষককে সশস্ত্র করা এবং সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো। স্তালিন শেষবারের মতো যে-কংগ্রেসে যোগ দিতে পেরেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির সেই ১৯৫২-র অক্টোবরের উনবিংশ কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন : কম্যুনিস্টরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা উচ্চে তুলে ধরুন এবং এগিয়ে যান।'

চিনের বিপ্লব সর্বহারার বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্রমবিকাশের এক নতুন স্তর। লেনিন কম্যুনিস্টদের সেই সব বিজিত দেশ ও উপনিবেশগুলোর উপযোগী করে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন যেখানে কৃষকরা হচ্ছে জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগুরু অংশও। মাও-ৎসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টিই লেনিনের শিক্ষাকে যথার্থ সার্থকতার গৌরবে উজ্জ্বল করে তুলেছে। মাও ৎসে-তুং এর মতবাদই সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্রমবিকাশে মাও ৎসে-তুং-এর দান হচ্ছে এই বিপ্লব তত্ত্ব : যে সব দেশে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিই প্রধান স্থান দখল করে আছে সেখানে কৃষকসমাজকেই প্রধান বিপ্লবী শক্তি বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লবী কৃষকসমাজ জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র জয় করে নেবে এবং সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবে। সে সব দেশে কৃষকদের শুধু শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো মিত্র মনে করা হয় না, শুধু সর্বহারাদের বিপ্লবী শক্তির সব চেয়ে বড়ো আধার বলে মনে করা হয় না, অধিকন্তু মনে করা হয় বিপ্লবের প্রধান শক্তি। সে-সব দেশে বিপ্লবকে সফল করতে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা হচ্ছে : গ্রামাঞ্চলে অভ্যুত্থান। গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরতা। গ্রামাঞ্চল থেকে শহর ঘেরাও। দীর্ঘকাল-স্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম। সুদৃঢ় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন। বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক ফৌজ গড়ে তোলা। ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন—যে ফ্রন্টের ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষক।

ভিয়েতনামে চিন বিপ্লবের তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ ওই তত্ত্বের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। মাও ৎসে-তুং-এর কথার প্রতিধ্বনি করে হোচি মিন্ বলেছেন : 'ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশে বিপ্লব প্রথমত এবং প্রধানত কৃষিবিপ্লব। ব্যাপক ও সুদৃঢ় জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করবার মৌলিক ভিত্তি হবে কৃষকসাধারণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী।' তাই হো চি মিন বলছেন : 'চিনের কম্যুনিস্ট পার্টি আধা ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশের পক্ষে আদর্শ কম্যুনিস্ট পার্টি'।'১৯৬৩-তে ভিয়েতনাম ওয়ার্কা পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটির নবম অধিবেশনে লে দুয়ান-এর স্বীকৃতি শুনুন :

> এই তত্ত্বের (চিনের বিপ্লবের তত্ত্বের) অনুশীলন ও সৃজনশীল প্রয়োগের ফলেই আমরা ভিয়েতনামি কম্যুনিস্টরা আমাদের দেশের বিপ্লবী লক্ষ্যকে জয়যুক্ত করেছি। অতীতে লেনিন বলেছিলেন যে রাশিয়ার বিপ্লবী রণকৌশল বিশ্বের সব কম্যুনিস্টদের পক্ষেই আদর্শ রণ-কৌশল, আজ আমরাও বলতে পারি যে চিনের বিপ্লবী রণ-কৌশল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অগণিত কম্যুনিস্টদের পক্ষে আদর্শ রণ-কৌশল[৬]।

কিউবার বিপ্লবে নাকি মার্কসবাদের ভূমিকা কেন, কোনও সুসংহত তত্ত্বেরই ভূমিকা ছিল না। গুয়েভারা বলেছেন : 'এই বিপ্লবের প্রধান অভিনেতাদের কোনও সুসমঞ্জস তাত্ত্বিক মূল্যমান ছিল না'। তিনি এ কথাও বলেছেন যে স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদী হয়ে যাওয়া উচিত[৭]। তিনি বোধ হয় বলতে চান যে কাজের মধ্য দিয়ে আপনা থেকেই মার্কসবাদসম্মত পথ এসে যায়। গুয়েভারা আরও বলেছেন যে হাতে-কলমে যারা বিপ্লব করে তারা বিজ্ঞানী মার্কসের দ্বারা পূর্ব-রচিত নিয়ম পালন করে। গুয়েভারা হয়তো বোঝাতে চান যে অজ্ঞাতেই এই ধরনের বিপ্লবীরা মার্কসীয় বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করেন। মার্কসবাদের অনুশীলনের আবশ্যিকতা তিনি স্বীকার করেন না। কাস্ত্রো-পন্থী তাত্ত্বিক দ্যব্রে বলেছেন : 'এটা একটা সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে যে ওরিয়েন্টের উপকূলে নাববার আগে ফিদেল মাও ৎসে-তুং-এর সামরিক বিষয়ের লেখাগুলো পড়েননি। তাই তিনি উপস্থিতমতো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এক সামরিক তত্ত্বের মূল নীতি উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন[৮]। গুয়েভারা বলেছেন যে গুটিকয়েক বিপ্লবী কিউবায় অসাধ্য সাধন করেছেন। ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে মাও ৎসে-তুং-এর তত্ত্বের প্রয়োজন নেই, কিছু নির্ভীক দেশপ্রেমিক সশস্ত্র হয়ে গেরিলা বাহিনী বা 'ফোকো' গঠন করে শহর থেকে গ্রামে অভিযান চালালেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে--এই তাঁদের মত। কিন্তু গণচেতনাকে না জাগিয়ে রোমাঞ্চকর বিপ্লবী অভিযানের উপর আস্থা বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদসম্মত নয়। ও-পথে বিপ্লবের সার্থকতাও আসে না। বলিভিয়ায় গুয়েভারার ব্যর্থ আত্মদান তার প্রমাণ। বলিভিয়ার অভিযান সম্পর্কে কাস্ত্রো করুণ সুরে বলছেন যে অভিযাত্রীদের বাঁচতে হলে নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে[৯]। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এ-পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। খোদ কিউবার আজকের চিত্র দেখুন : '...কিউবার জমির বেশি অংশই সেই ক্ষুদে মালিকদের হাতে যারা অপরের কায়িক শ্রম থেকে মুনাফা লোটে...কৃষি-উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক নয় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে....আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি ...বরং বুর্জোয়া শ্রেণী আরও নিরাপদ হচ্ছে এবং নতুন নতুন ক্ষমতার আসন দখল করছে[১০]।

আজকের দিনের মার্কসবাদ অর্থাৎ মাও ৎসে-তুং-এর মতবাদ প্রয়োগ করলে কিউবার এ-রকম ভয়ংকর পরিণাম হত না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাও-এর চিন্তাধারায় উদ্দীপ্ত গেরিলাদের বিজয়যাত্রার সঙ্গে বলিভিয়ার গেরিলাদের নাভিশ্বাসের তুলনা করলেই আমরা সঠিক পদ্ধতির প্রমাণ পেতে পারি।

এখন জিজ্ঞাস্য : ভারত কোন পথে? ১৯২৫-এ স্তালিন বলেছিলেন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসপন্থী অংশটা ভারতীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে, মজুর-কিষাণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বলেছিলেন ভারতের মতো উপনিবেশে শ্রমিকশ্রেণীকেই মুক্তি আন্দোলনের নেতা করে তুলতে হবে, নেতৃত্ব থেকে বুর্জোয়া আর তাদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে দিতে হবে[১১]। এরপর সি পি আই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় চোদ্দো বছরে কী করলেন? যুদ্ধ এল। শ্রী পি.সি. যোশি পলিটব্যুরোর প্রস্তাব উদ্ধৃত করে বললেন : 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম তখনই সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে এবং প্রকৃতপক্ষে সফল হইয়া উঠিবে, যখন কংগ্রেস সংগ্রামের নেতৃত্ব লইবে[১২]।' এরপব টীকা অনাবশ্যক। মহাযুদ্ধের সুযোগে মুক্তিসংগ্রামের সুবিধা সম্পর্কে আরেক জন সি পি আই নেতা শ্রী জি. অধিকারী বললেন : 'ভারতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান ফৌজ মুক্তি ফৌজ হইতে বাধ্য[১৩]।' এখানে টীকা আরও অন্যবশ্যক। তারপর এল ১৯৪৭-এর মেকি স্বাধীনতা--অশ্লীল আপসের অপজাত সন্তান।

ফর এ লাস্টিং পিস্, ফর এ পিপল্স ডেমোক্র্যাসি-তে ১৯৫০-এর ২৭-জানুয়ারি সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হল : ভারতের উপর চাপানো হয়েছে এক কৃত্রিম স্বাধীনতা। ...এই অবস্থায় ভারতের কম্যুনিস্টদের কাজ হচ্ছে চিন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা। আশু কর্তব্য হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে 'ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে' ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা। ১৯৪৯-এর এশিয়া ও ঔশিয়েইনিয়া-অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হল : 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলামদের পরাজিত করবার জন্য চীনের জনগণ যে পথ গ্রহণ করেছেন, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে ও নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলোর জনসাধারণেরও উচিত সেই একই পথ গ্রহণ করা।'

কিন্তু আমাদের দেশের 'সরকারি' কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব তেলেঙ্গানা থেকে নকশালবাড়ি পর্যন্ত সে-পথের উপর প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণ চালিয়েছেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ধ্বজদণ্ডকে বসিয়েছেন বিপ্লবী মেরুদণ্ডের জায়গায়। অতীতে অখণ্ড সি পি আই মাও ৎসে-তুংকে 'সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকা সংশোধনবাদী' বলেছিলেন [১৪]। আজ দক্ষিণ ও বাম একই সুরে এবং প্রায় একই ভাষায় মাওৎসে-তুংকে সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির জন্য দায়ী করছেন। তবে ভরসার কথা গ্রামে গ্রামান্তরে কৃষি বিপ্লবের পথে চলার কঠিন অভিযান শুরু হয়েছে— ' তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' শহুরে কংসের নিধন-যজ্ঞের আসল প্রস্তুতি চলছে দূর গোকুলে।

সূত্রনির্দেশ

১। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, গ্রন্থাবলি, রুশ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯২।

২। মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৫, পৃ ৩৪৩।

৩। লেনিন, রচনাবলি, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২১ খণ্ড, পৃ ১২৮।

৪। পূর্বাঞ্চলের কম্যুনিস্ট সংগঠনগুলির সর্ব-রুশীয় দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভাষণ : লেনিন রচনাবলি, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩০ খণ্ড, পৃ ১৩৯-৪০।

৫। হো চি মিন : নির্বাচিত রচনাবলি।

৬। লে দুয়ান : বর্তমানের কতকগুলি আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রসঙ্গে।

৭। সি.ডব্লিউ, মিলজ : মার্কসবাদী।

৮। দ্যব্রে : বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব, পৃ ২০ (পি. এল পত্রিকার ১৯৬৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার উদ্ধৃতি থেকে)।

৯। ইনফরমেশন ফ্রম কিউবা, অক্টোবর, ১৯৬৭।

১০। ওয়ার্ল্ড রেভলিউশন, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (পি. এল পত্রিকার ১৯৬৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার উদ্ধৃতি থেকে)।

১১। প্রাচ্য দেশের শ্রমজীবীদের কম্যুনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সভায় বক্তৃতা : ১৮ মে, ১৯২৫।

১২ পি.সি. যোশি : কমিউনিস্টদের জবাব : পৃ ১৬

১৩। 'স্তালিনের বক্তৃতা'র ভূমিকা —জি. অধিকারী : পৃ ৮

১৪। কম্যুনিস্ট, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৭৭।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা
(কার্লমার্কস ১৯৬৮)

সত্যজিৎ চৌধুরী

ঐতিহ্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

> Tradition is a matter of much wider significance. It cannat be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense; ...This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time what makes a writer most acutely conscious of his place in time, of his own contemporaneity...I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical, criticism.
>
> T. S. ELIOT

'ক্ষীরের পুতুল' বা 'শাজাহানের মৃত্যু' কিংবা শেষ জীবনের তৈরি খেলনা কাটুম-কাটম—এক অর্থে সবই রূপ রচনা, রূপসৃষ্টির নিহিত প্রেরণার নানামুখী প্রকাশ। কখনও সংচিত্রিত ভাষায়, কখনও সপ্রাণিত রেখায় ও বর্ণে, কখনও-বা শুধুই প্রাকৃত বস্তু রূপান্তরের দক্ষতায়। তাঁর রূপসৃষ্টিতে যে-সিদ্ধির পরিচয় ধরা আছে তাকে মনে হতেও পারে অনায়াসলব্ধ, স্বভাবগত দক্ষতায় রচিত। কিন্তু জীবনব্যাপী নিজেকে নিয়ে ভাঙাগড়ার অন্তহীন পরীক্ষা বিষয়ে অবহিত থাকলে কোনও রচনাকেই অনায়াস সিদ্ধির দৃষ্টান্ত মনে করা চলে না আর। 'বিফলতার পর বিফলতা। ...শেখা, ও কি সহজ জিনিস? কী কষ্ট করে যে আমি ছবি আঁকা শিখেছি'[১]।' কিছুই সহজে আসেনি, না মাতৃভাষার প্রাণময় ছন্দে অনায়াস অধিকার, না রেখা ও রঙের রহস্যভেদে দক্ষতা। তাঁর শিল্পীজীবনের পরতে-পরতে প্রচ্ছন্ন আছে সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যের স্বাভাবিক দায়ে নিজেকেই জানার ক্লান্তিহীন প্রয়াস। সেই পুরুষার্থের, যুযুধান মনোবৃত্তির, আর-এক পরিচয় ফুটেছে কান্তিবিদ্যা বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলিতে। নিছক তত্ত্ব গড়ার শৌখিনতা বা পাণ্ডিত্যাভিমান নয়, এসব রচনার মূলে আছে আপন শিল্পীস্বভাবে নিহিত প্রখর আত্মান্বেষণ এবং সেই সূত্রেই দেশের আবহমান শিল্প-ঐতিহ্যকে আধুনিকতার দিকে বাঁক ফেরানোর দায়িত্ববোধ। শিল্পক্রিয়ার কর্মিষ্ঠ আবেগই সংক্রামিত হয় তত্ত্বভাবনার স্তরে। তাই ঐতিহ্যস্মৃতির মর্ম, বর্তমানের সত্তাধর্ম ও ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথ বিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগে। তাই অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা শিকড় ছড়ায় দেশের আস্তীর্ণ ঐতিহ্যের মর্মের দিকে। নিজেকে জানার গরজেই শিল্পশাস্ত্র বা সৃজিত মহিমান্বিত শিল্প-কীর্তিগুলির মূল্যায়নে তাঁকে নিয়োজিত দেখি, দেখি ব্রাত্যবাঙলার মর্মসন্ধানে নিবিষ্ট হতে। শুধু প্রাচীনকে পাঠ করা নয়, বর্তমানের দায়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে মিলে অখণ্ড শিল্পপ্রবাহের বোধ ধারণায় আনবার পদ্ধতি বিষয়েও ভাবনা আসে। স্ব-দেশ বা স্ব-কালের দায় এড়িয়ে শিল্পী কখনও উল্লম্ফনবত্তায় মহাকালের আশ্রয়ে পৌঁছাবেন—এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

'পৃথিবীর সেকালের ভিত্তির উপরে একালের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা'[২],

'সেকাল ছেড়ে কোনো শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোনো শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক[৩]।'

'শিল্প... সেকাল, একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বর্ধিত হয়ে চলল, কোনও এককালের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাকে ধরে রাখবার উপায় রইল না[৪]।'

প্রত্যেক শিল্পীর কাছে তাঁর বর্তমানই তরঙ্গচূড়া, —ঢেউ ওঠা-পড়ার, অতীত-ভবিষ্যতের সংঘাত এই বর্তমানকেই দিচ্ছে উত্তুঙ্গ মহিমা। বর্তমানেই তিনি সংবদ্ধ, কিন্তু বর্তমানের দায়েই অতীত-ভবিষ্যতের চেতনা তাঁর শিল্পীমানসের জলবায়ুতে মেশে রাসায়নিক মিশ্রণে। বর্তমানের বোধ তাৎপর্য পায় অতীত-

ভবিষ্যতের আতত পটে। বা অতীত ভবিষ্যৎই তাৎপর্যে মণ্ডিত হয় বর্তমানের আলোকে। শিল্পক্রিয়াতে যেমন মুখ্য হয়ে ওঠে প্রকরণের প্রশ্ন, টেক্‌নিকেরই সাধনা শিল্পমুক্তির জন্য; স্বাবলম্বী কোনও তত্ত্বভাবনাতেও তেমনই পদ্ধতির প্রশ্নটি মুখ্য। পদ্ধতির অভ্রান্তিতেই ভাবনা কেলাসিত হয়, সংহতি আসে, গড়ে ওঠে সমর্থ কোনও প্রস্থান। বলার কথা অবনীন্দ্রনাথ মজলিশি চালেই বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। বলার ঢং তাই কথকতার আমেজে রম্য, তবুও ভাবনাক্রম শিথিলিত নয়। নয় যে, তার কারণ তাঁর চিন্তাপদ্ধতির বিজ্ঞাননিষ্ঠ চারিত্র, অনাবিল বুদ্ধির সক্ষম ব্যবহার।

অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যভাবনার মূলে ছিল শিল্পীধর্মের অপরিহার্য আত্মোপলব্ধির গরজ। কিন্তু ব্যাপারটা কোনও অর্থেই বিচ্ছিন্ন একক প্রয়াস নয়। শিল্পকর্মে অবনীন্দ্রনাথের সাবালকত্ব বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলনের সমসাময়িক। সাহিত্যে অন্তত ততদিনে আমাদের আত্মানুসন্ধানী রেনেসাঁস-এর সংকট ও শক্তি নানা কীর্তিতে প্রাঞ্জলভাবে মূর্ত। মাইকেলের প্রাথমিক বিভ্রান্তি ও শিল্পসিদ্ধির বৃত্তান্ত ততদিনে বিদিত, ইয়োরোপের প্রবল আকর্ষণে কেন্দ্রাতিগ বাবুসমাজের বিকার বিকৃতির মধ্যেও অনাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের মূল্যায়নের স্বকীয়তায় বিদ্যাসাগর চরিত্র ধ্রুবতারার মর্যাদায় ভূষিত, বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র ততদিনে আত্মসামর্থ্যের দৃঢ়বনিয়াদ রচনা করেছেন মাতৃভাষায়। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পতিসর-শিলাইদহর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিল্পীমানসের একাগ্র অভ্রান্ত সাধনার ঔপনিবেশিক শাসন-জনিত সংকটের মধ্যেও সাহিত্যসংস্কৃতির নব্যস্তরটিকে অগ্রসর করে নিচ্ছেন পূর্ণতার অভিমুখে। সাহিত্যে অন্তত বিভ্রান্তির যুগ অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, জাতীয় মানস ইংরেজির সমান্তরালে অনুলিপি রচনার মারাত্মক ভ্রান্তি বিষয়ে প্রখরভাবে সচেতন। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের অগ্রসর মানস খাতে প্রবাহিত সংস্কৃতির এই নব্যধারা আপন তটসীমার বাইরের বৃহৎ জনচিত্তভূমির সঙ্গে সংযোগরচনায় ব্যাকুল হয়নি এমনও নয়। স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি স্থাপিত হয়েছে বৈশ্যরাজতন্ত্রে ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটে বিদ্ধ মানুষের পরাক্রান্ত সংগ্রামের ও বেদনার আলেখ্য-নীলদর্পণে। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বন্ধুতার সূত্রে ব্রাত্য বাঙলার শুদ্ধ বিবেক অঙ্গীকারে উৎসুক। অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্গদর্শন প্রকাশ ও ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগের বছরে। বাল্য-কৈশোরের শিক্ষাদীক্ষা দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির পাঁচ আর ছয় নম্বর আবহে, যেখানে ততদিনে নব্য বাঙলার মানস কুসুমগুলি প্রস্ফুট, তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিভায়। স্বাদেশিকতার বাণী ঠাকুরপরিবারের প্রযত্নে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে সেই কালে। এমন পরিবেশের প্রভাবে স্বতঃই অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলেছিল স্বদেশের পট ও ব্যক্তি-প্রতিভার সম্পর্ক সন্নিপাত বিষয়ে। তাঁর সম্পর্কে অন্তত দৃষ্টিবিভ্রমে আর-এক রবিবর্মা হবার চোরাবালিতে পদপাতের আশঙ্কা ছিল না। শিক্ষানবিশির যুগ শেষ না হতেই শিল্পমুক্তির পৃচ্ছনা জাগে তাঁর মনে, ধাপে ধাপে নানা পরীক্ষায় আয়ত্তে আনেন স্বয়ম্ভর টেকনিক, নিজের কাজে সম্ভব করেন চিত্রকলায় রেনেসাঁস। শিল্পচৈতন্যের অনাচ্ছন্ন আলোকে বর্তমানের শিল্পভাষার প্রকৃত স্বরূপ ধরা দিয়েছে অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায়, সেই অভিজ্ঞতারই তাত্ত্বিক বিবৃতি মেলে কান্তিবিদ্যা-বিষয়ক রচনাবলির নানা প্রবন্ধে। সেই বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলি গেঁথে তুলে ঐতিহ্য ও বর্তমান বিষয়ে তাঁ ভাবনার স্বরূপটি তুলে ধরতে ইচ্ছা করি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার মূলে আছে শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে নানামুখী জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সূত্রেই ঐতিহ্য অনুসৃতি বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন ওঠে। দুটি বাঁধা পথ নবীন ভারতের শিল্পীসমাজের সামনে। এক শাস্ত্রবিহিত প্রাচীন ঐতিহ্যের পথ, অপরটি পাশ্চাত্য রীতির আনুগত্য। কিন্তু শিল্পীচৈতন্যের যে আত্মনির্ভরতা তাঁর অন্বিষ্ট, প্রস্তুত এই সমাধান দুটি সেই সিদ্ধির পক্ষে সহায় নয়, প্রবল বাধা। পথই নয়; বিপথ, কুহক মাত্র। তিনি বুঝেছিলেন, ওই বাঁধা পথ শিল্প-মুক্তির পূর্ণিমায় উপনীত করে না, নিয়ে যায় ঘোর বিভ্রান্তির অমাবস্যায়। ঐতিহ্য অনুসৃতি বলতে তিনি স্বদেশীয় নির্বিচার পরিগ্রহ বোঝেননি কখনও। ইংরেজিয়ানার বাঁধা সড়কের প্রগতি যেমন বর্জন করেছেন তেমনি প্রাচীনের নির্বিচার আনুগত্যও প্রকারান্তরে

যে কুহকী মায়া—অবনীন্দ্রনাথে এ-জ্ঞান অনাচ্ছন্ন প্রথমাবধি। ঐতিহ্য ও দেশকালের দায় বিষয়ে এ-প্রমিতি সম্ভবত তাঁর শিল্পপ্রতিভারই আর এক লক্ষণ। ১৩২২ সালে এক প্রবন্ধে লেখেন :

> আমরা যখন চলতে চাচ্ছি, পথ চাচ্ছি, তখন গোড়াতেই প্রাচীনের এই ভয়ংকর বোঝাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবেই, গণ্ডুষের কুক্ষি ভেদ ক'রে আমাদের আর একবার সেইখানে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে আমাদের পুরাতনটা আমাদের বাধা দেবে না, অন্যের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না; এক কথায় প্রাচ্য প্রবীণতার তৈলকটাহ এবং পাশ্চাত্য নূতনতার অগ্নিকুণ্ড এ দুই থেকেই দূরে এমন একমুখে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যে মুখে আমাদের চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত[৫]।

চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত রাখা চাই—শিল্পক্রিয়ায় এ প্রাথমিক শর্ত। এ-জন্য ঘুরে দাঁড়াতে হবে প্রাচীন প্রাচ্য আর সদ্যজ্ঞাত পাশ্চাত্যের দিক থেকে। কোন দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে তার? প্রবীণের শাসন শুধুই তৈলকটাহ? পাশ্চাত্য নতুনতা কেবলই অগ্নিকুণ্ড? আমরা জানি প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রপাঠ এবং তার মর্মোদ্ধারে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। আর ইয়োরোপীয় শিল্পপদ্ধতির শিক্ষা তাঁর কোনওই কাজে আসেনি এ-কথাও সত্য নয়। কোন বিচারে তবে এমন সিদ্ধান্তে আসেন খুঁটিয়ে দেখা কর্তব্য আমাদের। ঘুরে দাঁড়াবার কথা ওঠে, কারণ :

> শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিতধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন ক'রে শিল্প আমাদের হয় না। ... বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না[৬]।

শিল্পীর উত্তরাধিকার নিজেরই সামর্থ্যে অর্জনীয়, এই অর্জনে আত্মজ্ঞান তার একমাত্র সহায়। বর্তমানের পটে নিজের ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ববোধ থেকেই আসে এই আত্মজ্ঞান এবং এই আত্মোপলব্ধির দিক থেকে প্রবেশ করতে হয় ঐতিহ্যের মর্মে। ঐতিহ্যের ধারা অতীত থেকে বর্তমানের বুকের উপর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে স্বচ্ছন্দে বয়ে যায় না। এমন অনায়াস স্বচ্ছন্দ প্রবাহ শিল্প জগতের সত্য নয়। শিল্পসংস্কৃতির বিশিষ্ট কাঠামোর ভিত অতীতের গর্ভেই প্রোথিত। তারই উপরে যুগে যুগে রচিত হয়েছে এক-একটা নতুন মহল। ছকটা সম্পূর্ণ গড়নে রূপ পেয়ে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে কালে কালে। ভিত গড়া হয়েছে যে-আদর্শে তার রূপকল্প নতুন যোজনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেই। আবার যা সংযোজিত হচ্ছে তার স্বকীয়তায় সেই মূল আদর্শটাকেই কালে কালে শিল্পীরা অন্তঃসংগতি রেখেও নবনবায়মান করে তোলেন। ঐতিহ্যে-বর্তমানে এ যোগ যান্ত্রিক নয়, জলধারার আদ্যন্ত প্রবাহের মতোও নয়। প্রত্যেক যুগে শিল্পীকে নিজের দিক থেকে অতীতের সঙ্গে সংযোগের সূত্রটি উদ্ভাবন করতে হয় নতুন করে। শিল্পক্রিয়ায় শিল্পীকে তাই প্রথমেই ঘুরে দাঁড়াতে হয় নিজের দিকে। নির্মোহ হতে হয়। পূর্বপুরুষের বাঁধা পথে সিদ্ধিতে পৌঁছে যাবার যে মোহ টানে, তার প্রভাবসীমার বাইরে আসতে হয়। এই মোহ শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক, নব্য ভারতীয় শিল্পী-সমাজের উদ্দেশ্যে তাই অবনীন্দ্রনাথ সাবধানতার কথা তোলেন :

> সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাতকাণ্ড, অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের কারিগরি কি কারদানিটাকে হিন্দু বা মোগল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের ও জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ ক'রে কলাবৌটি সেজে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াবে, এই যে ধারণা এইটেই হচ্চে সব শিল্পীর যাত্রাপথের আরম্ভে একটুখানি অথচ অতি ভয়ানক, অতি পুরাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার চক্‌চকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম Tradition বা প্রথা। অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ, একে অতিক্রম ক'রে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে, ডোববার আর ভয় থাকে না[৭]।

এ মোহ অতিক্রম করতে হয় অনন্যপরতন্ত্র শিল্পীধর্মের স্বয়ম্ভরতায়। ভারত-শিল্পে রেনেসাঁস ঘটানোর দায়িত্বে স্বেচ্ছাকৃত অবনীন্দ্রনাথ বর্তমানের দায়েই ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। অতীত যে-মূর্তি ধরে আছে তাকে একদিক থেকে বলা যায় অপরিবর্তনীয়, সুচিরপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানের দিক থেকে সেই অতীতের সম্মুখীন যখন হন কোনও শিল্পী—তিনি নিজের সাময়িকতার সমস্যার সূত্রে অতীতের চেহারাটাকেও আপন বোধের ভেতরে ভাঙেন গড়েন নানা প্রকারে। অতীতের স্থাণুতা ঘুচে যায় ক্রিয়াবান শিল্পীর সজীব শিল্পীমানসের জগতে। অনেক গৌণ জিনিস মুখ্য হয়ে ওঠে, প্রখ্যাত কোনও শিল্পকীর্তি তার প্রথিত মহিমা সত্ত্বেও মনে হয় অবান্তর। দৃষ্টি পড়ে আনাচে-কানাচে, একদা উপেক্ষিত পুনরাবিষ্কৃত হয় নতুন তাৎপর্যে। এই তো শিল্পীর ইতিহাসচেতনার বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পচেতনাপ্রবুদ্ধ ইতিহাসবোধ নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের বিচার করেন। একাল-সেকালে সেতুবন্ধ রচনা শুদ্ধ শিল্পচৈতন্যেই সম্ভব, শিল্পীর প্রাতিভজ্ঞানের দ্বারা। ইতিহাস আলোচনায় এইটিই অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ঐতিহাসিকের নয়, অতীত-বর্তমানের দুই কোটি জ্যাবদ্ধ করে শিল্পে তাৎক্ষণিক সমস্যার রহস্যভেদ যাঁর লক্ষ্য, সেই শিল্পীর।

এবার দেখা যেতে পারে প্রাচ্য শিল্পের ঐতিহ্যবিচারে তিনি কীভাবে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন।

'প্রাচ্য প্রবীণতার তৈল কটাহ' কথাটা একটা তীব্র আঘাতের মতো বাজে। ভারত শিল্পের নবজন্ম যাঁর হাতে তাঁরই লেখনী থেকে নিঃসৃত এমন উক্তি! ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের গর্ববোধ ও মমত্ব সর্বজনবিদিত। পুরীতীর্থে জগন্নাথের মাসি বাড়ি (গুণ্ডিচা) সংস্কারের ভয়ানক আয়োজন প্রসঙ্গে তাঁর যন্ত্রণার বিবরণে সেই দরদ ব্যক্তিগত ক্ষতির বোধে মিশে প্রকাশ পায়। ইংরেজি শিক্ষাজনিত বিকারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম বিষয়ে কঠিন সমালোচনা করেন 'স্পষ্টকথা' (*ভারতী*, ফাল্গুন ১৩১৫), 'ভাবসাধন' (*ভারতী*, অগ্রহায়ণ ১৩১৭) প্রভৃতি প্রবন্ধে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি মমত্বের আকর্ষণ জাগানোর আবেগ এসব রচনার ছত্রে-ছত্রে। 'ভারতশিল্প' হবে পাশ্চাত্য প্রভাবের ছায়ায়—এ মোহের প্রতি ধিক্কার এমন স্পষ্ট ভাষায় অবনীন্দ্রনাথই প্রথম উচ্চারণ করেছেন বাঙলায়, হ্যাভেলের উপদেশ অনুসরণ করেই অবশ্য।'পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া সূর্যোদয় দেখিবার প্রত্যাশা' তিনি করেননি কখনও। কিন্তু এ দরদ মোহ নয়, বরং প্রকৃত মমত্বের বলেই তিনি মোহ অতিক্রম করে দৃষ্টির শুদ্ধতা অর্জন করেন। লক্ষ করতে হবে, ভারত শিল্পে রেনেসাঁসের জনক অবনীন্দ্রনাথ—প্রাচ্য শিল্প বলতে শুধু ভারতীয় শিল্প বোঝেননি, চিন-জাপানসহ প্রায় গোটা এশিয়ার শিল্পধারার তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন। আর দেশের ঐতিহ্য বিচার করেছেন শাস্ত্রীয় শিল্প ও লোকশিল্প—এই দুই স্তরে। প্রথমেই অবশ্য শাস্ত্রীয় শিল্পধারার শক্তি ও দুর্বলতার কথা ওঠে।

প্রাচীন ভারতে দক্ষ শিল্পী বা সমজদারের অভাব ছিল না, কিন্তু সব আয়োজন সত্ত্বেও শিল্পের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারেনি সম্পূর্ণ বাইরের থেকে আরোপিত চাপের ফলে। সেই বাইরের শক্তি, শাস্ত্রবিহিত প্রথার শাসন। ভারতে শাস্ত্রবিৎ কুলপুত্রেরা 'দুষ্কুল থেকে আনা স্ত্রীরত্নের মতো' কলালক্ষ্মীকে জাতে না তুললে শুধুই নিজের রূপগুণে তার মর্যাদা পাবার উপায় ছিল না। ভারতশিল্পের সীমাবদ্ধতার কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর অনেক লেখায়। এই বিশ্লেষণে তিনি ধরতে চেয়েছেন, ভারতে শিল্পশাস্ত্রের শাসনে শিল্পীর স্বাধীন ক্রিয়াকর্মের পঙ্গুত্ব ও খর্বতার দিক।—

> পণ্ডিতেরা লিখেছেন দেবতার ধ্যান, আর পণ্ডিতদের চেয়ে জাত্যংশে খাটো শিল্পীগুলো সেই ধ্যানমূর্তিসকল ফুটিয়ে তুলছে পাষাণের অক্ষরে—এমনকি, লেখার ছাঁদটুকুর সম্বন্ধেও শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগপাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্তি মূর্ছাহত। প্রাচীন ভারতের লক্ষ কোটি শিল্পী, যাদের প্রাণের অভাব ছিল না, পণ্ডিতের অপেক্ষা সুকুমার মনোবৃত্তি সকলেরও অভাব ছিল না, তারা একাসনে একমনে বসে শুক্রনীতি ও মানসারের পুথির রেখাগণিত ও অগণিত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ করেছে এবং তারি ফলগুলি স্তূপাকার ক'রে সাজিয়ে যাচ্ছে—কখনো রাজমন্দিরে মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটি মূর্তির বত্রিশ সিংহাসনের মতো। এই মন্দিরে

> এই সিংহাসনে ভারতশিল্পরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছে বললে ভুল হয়, কেননা, সিংহাসন কি মন্দির, যা কিছু তারা গড়েছে, সে তাদের হৃদয়দেবতার জন্যে নিজের মনোমত ক'রে গড়তে তাদের অনুমতি ছিল না। গড়েছে তারা অনুশাসন এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্য সকলের জন্যে যারা প্রাচীনের ছদ্মবেশে আজও সমান বিক্রমে রাজত্ব করছে—আমাদের ধর্মে কর্মে শিক্ষা দীক্ষায়[৮]।

ফলে শিল্পের বিকাশ হয়েছে খর্বিত। 'যথাসুখে নিজের বাঞ্ছিত পথে চলার অধিকারে বঞ্চিত শিল্পীকুল যা গড়েছেন, অবনীন্দ্রনাথের উপমায়, তা মঞ্চে বাঁধা পঞ্চবটীর মতো। তার থেকে অনেকখানি ছায়া পাবার আশা নেই, দেশের অন্তরেও সে শিকড় মেলতে পারেনি। এ শিল্প থেকে আচার্যদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে, আর মেলে 'শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে শিল্পাচার্যগণের হস্তক্ষেপ করার আদ্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস।' পণ্ডিতের মত ধরে, আচার্যের পরিচালন-দক্ষতায় এই যা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, শিল্পীদের পক্ষ থেকে অবনীন্দ্রনাথ তার সবটুকু নিজস্ব বলে মানতে পারেন নি। শাস্ত্র-অনুমোদিত বলেই যার গুরুত্ব, সেই শিল্পীর গর্বে জাত্যভিমানী স্ফীত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় ব্যথিত সেই প্রাচীন শিল্পীকুলের বেদনাই ভাষা পায় অবনীন্দ্রনাথের উক্তিতে :

> পণ্ডিতেরা খুব উচ্চজাতি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত শিল্পটাও খুব বড়ো দরেরও হতে পারে কিন্তু সে বা সে জাতির শিল্প এত বড়ো নয় যে আমাদের বলে, শিল্পীর নিজস্ব বলে পরিচয় দেওয়া চলে। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিতেরা আচার্যেরা ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তাঁদের বচনই ছিল সব। শিল্পটাও তাঁদেরই বচনগুলির তেত্রিশ কোটি পাষাণমূর্তি—দুই পায়ে শিল্পীর হৃদ্‌পদ্ম দলিত ক'রে বরাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারতশিল্পে এই করুণ রসটুকুই সত্যকার, কেননা এই টুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের যোগ ছিল; আর যে রসগুলো পাষাণের ভানে ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্রবচনের যোগ, শাস্ত্রীগণের যোগ; যথার্থ রসের উৎপত্তির যোগাযোগ সেখানে নাই[৯]।

এ বিচারে স্পষ্টতই অবনীন্দ্রনাথ একটা ভেদরেখা টানছেন। শাস্ত্রবিহিত শুদ্ধ শিল্পপ্রথা সে-রেখার একদিকে; অপর দিকে শাসনের চাপে দলিত-হৃদয় শিল্পীদের, যে শিল্পী হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল জুড়ে অনুর্বরতার অভিশাপ পুঞ্জিত। দেখা যাচ্ছে, ঐতিহ্যের আনুগত্যে অবনীন্দ্রনাথ নির্বিচারে প্রাচীন মাত্রেরই সালোক্য বোঝেন নি। শিল্প-ইতিহাসের তথ্যস্তূপের প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই। তিনি ধারণায় আনতে চাইছেন ভারতশিল্পের মর্মগত ধারাটির স্বরূপ—যা বয়ে এসেছে শিল্পীর স্বকীয় ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতাকে ধরে। তাঁর উদ্দেশ্য সেকালের শিল্পীর হৃদয়ের সঙ্গে, তাঁদের কল্পনাবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগসাধন, ভাবসাধন। প্রথার প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও, রাজদ্বারে বা দেবতার দ্বারে মুজরা খাটতে গিয়েও আত্মনিষ্ঠ শিল্পীদের প্রকাশবেদনা কোথায় কতটুকু রূপ পেয়েছে তাই তাঁর অন্বিষ্ট। প্রাচীন শিল্পক্রিয়ায় শিল্পীর শুদ্ধ শিল্পচৈতন্য যেখানে অনাচ্ছন্ন—তারই অঙ্গীকারে একালের প্রয়োজনের দিক থেকে সেকালের শিল্পভাবনার সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনায় তাঁর আগ্রহ। একেই তিনি নিজের পরিভাষায় বলেন 'ভাবসাধন[১০]।' পূর্বপুরুষের ভাব সঞ্জীবিত, শিল্পের সঙ্গে একালের শিল্পের সজীব যোগসম্ভব আত্মসচেতন শিল্পীমানসের নির্মোহ অনুসন্ধিৎসায়। ঐতিহ্যের সেই নিহিত মর্ম—যা যুগে যুগে নানা সংঘাতের মধ্যেও 'ভৃগুপদচিহ্নের মতো' চিরদিন ভারতের বুকে শোভা পাবে—তাকে একালের সঙ্গে মিলিয়ে জানা নব্য ভারতের শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এই বসন্তে যে মুকুল আসছে, সম্ভাবনার দিক থেকে তার একটা যোগ অতীতের বীজটির সঙ্গে। একালের শিল্পীকে সেই যোগাযোগের রহস্য ধরতে হয় অতীতের সঙ্গে ভাবসাধনে, কারণ শিল্পে যা ফুটে ওঠে সে তো শিল্পীরই মানসকুসুম। তার মনই শিল্পের আশ্রয় এবং আধার। শাস্ত্রীয় শাসনের চাপ সত্ত্বেও প্রাচীন শিল্পমুক্তির দৃষ্টান্ত অবিরল। শিল্পে দেবলোকের আদর্শ ফলিয়ে তোলা শাস্ত্রীয় বিধি, মর্তের দিকে দৃষ্টি যদি দেন শিল্পী, তবে তিনি মহাপাতকী হবেন। অন্ধত্ব, বংশলোপ প্রভৃতি ভয় দেখিয়ে এমন অনাচাররোধের আয়োজন করা হল

শিল্পশাস্ত্রে। তবুও ভারতশিল্প থেকে ইহলোক মুছে যায়নি। শিল্পীর শিল্পবৃত্তি বার বার তাকে নিয়ে গেছে শাস্ত্রনির্দিষ্ট মান-পরিমাণ-লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের বাইরে। প্রাচীন প্রতিমাশিল্প পূজার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের নিয়ম ধরে গড়া হলেও—তার গড়নে এবং সাজসজ্জায় নিয়মের ব্যতিক্রম রোধ করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যতিক্রম ধরেই প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর স্বাধীন রুচি। অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়ে এই সব ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তে, এখানেই তিনি বন্ধনমুক্ত শিল্পীর শুদ্ধ আত্মপ্রকাশ দেখেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রাচীন শিল্পক্রিয়ায় বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রগুলি নজরে আসে তাঁর—

> ছবি modelling, plaster cast এমনি অনেক জিনিস এবং স্ফটিক ও নানা রত্নভূষা এবং ছোটখাটো শিল্পদ্রব্য সমস্তই বাঁধনের বাইরে পড়ল, কেবল পাষাণ ও ধাতুজ পূজার জন্য যে মূর্তি তাই রইলো শাস্ত্রের মধ্যে বাঁধা, কিন্তু এখানেও গোল বাধলো ঠিক-ঠিক শাস্ত্রমতো গড়ন কে জানে কেন শিল্পীর হাতে এলো না, এদিক-ওদিক হতেই থাকলো কিছু-কিছু দেশভেদে কালভেদে শিল্পীর কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টিভেদে...।[১১]

শাস্ত্রের বাঁধন দৃঢ় হতে পারেনি, পঙ্গু করে দেয়নি শিল্পীদের। এ স্বাধীনতার মূলে আছে শিল্পীর স্বাভাবিক অনন্যপরতন্ত্র শিল্পজ্ঞান। প্রতিভার আদিম প্রেরণা। শাস্ত্রীয় সংস্কার যে এই ভারতীয় শিল্পীদের মনে দৃঢ়মূল হতে পারেনি—এর একটি বাস্তব কারণ তাদের নিরক্ষরতা। শাস্ত্রীয় প্রথার শাসন রয়ে গেছে বাইরে থেকে আরোপিত বিধিবিধান, ভাবনা-চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য আড়ষ্ট করে আনবার মতো সংস্কার রূপে মজ্জাগত হতে পারেনি। শিল্পশাস্ত্রের পুঁথিপত্র জমা হয়েছে রাজার বা মন্দিরের সংগ্রহশালায়, ক্রিয়াবান শিল্পীদের ঘরে যদি বা মেলে—সে-পুঁথির সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক শিল্পক্রিয়ার কোনও যোগ প্রমাণ করা যায় না। পুথি তাঁরা পুজো করেছেন সিঁদুর চন্দনে, চর্চা করবার উপায় ছিল না। পাঠের উপায় না জানায়।

> শাস্ত্রে অপণ্ডিত কিন্তু শিল্পক্রিয়াতে সম্পূর্ণ পারগ শিল্পীদের পুথি ক্বচিৎ পাওয়া যাচ্ছে।...শাস্ত্রের চাপ ভয়ংকর হয়ে ওঠে নি, তা থেকে বেঁচে গেছে এদেশের শিল্পীরা কাজের দিক দিয়ে শুধু তারা নিরক্ষর ছিল বলে।[১২]

একালের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পীদের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রচর্চার ফল অন্যভাবে ফলবে। শাস্ত্রচর্চায় পাকা হয়ে শিল্পক্রিয়ায় যাঁরা অগ্রসর হবেন—শাস্ত্রের বিধি-বিধান তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতায় একটা রাসের মতো কাজ করবে যদি নিজের আদর্শ স্থির করে নেবার সামর্থ্য তাঁর না থাকে। প্রাচীন মাত্রেরই প্রতি মোহ যেমন শিল্পীর পক্ষে বৈনাশিক, শাস্ত্রের বচনের প্রতি মোহও তেমনি। শাস্ত্রবচন ধরে ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা বার বার অবনীন্দ্রনাথের বিদ্রুপের লক্ষ্য হয়েছে। *ভারতশিল্পে মূর্তি* পুস্তিকার ভূমিকায় শাস্ত্রীয় বিধির মোহ বিষয়ে শিষ্য ও সতীর্থদের সতর্ক করেছেন। শিল্পচৈতন্যের আলোক শিখাটি যদি পূর্ণশক্তিতে জ্বলে ওঠে, নিজেকে যদি চেনেন দেশকালের নানামুখী দায়-দায়িত্বের টানাপোড়েনে জীবনেরই সঙ্গে সংলগ্ন সমর্থ ও ক্রিয়াবান শিল্পীরূপে, তবেই শাস্ত্রও হয়ে ওঠে তাঁর কাজের সহায়। সেকালের বিধিবিধানের সঙ্গে একালের স্বাভাবিক যোগ সম্ভব একালের জীবনরসে তাকে জারিত করে, একালের 'শিল্পমতি'র দিক থেকে। কারণ—

> সেকাল এগিয়ে চলবে একালের ক্রিয়ার ছন্দ ধরে ভবিষ্যৎ কালের সফলতার দিকে...। শিল্পের গতি কালে কালে নতুন-নতুন শিল্পীর মতি ধরে চলেছে, কোনো এক কালের বা এক শাস্ত্রের মত ধরে চলে নি, চলতে পারেও না।[১৩]

'শিল্পীর intention বা ধ্যান, তারই অনুপাতে' চলে শিল্পক্রিয়া কালে কালে। শিল্পবিধি জোর করে আরোপ করার অবশ্যম্ভাবী ফল শিল্পক্রিয়ার পঙ্গুত্ব। সেকালের শিল্পীকুল শাস্ত্রীয় শাসনের বাইরে আসবার সামর্থ্যেই সীমিতভাবেও শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত একালের শিল্পীদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। ইংরেজিয়ানার প্রতিক্রিয়ায় শুদ্ধ হিন্দু আদর্শের পুনরাবৃত্তির প্রবণতা আমাদের চিন্তায় একটা

বিপরীত সংকট সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রামের একটা পর্ব গেছে। শিল্পীচিন্তায় শুদ্ধতার নামে শাস্ত্রবিধির শেকল পরানোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে। সেকালের সঞ্চয়ের সীমা মেনে নিতে বলার অর্থ একালের শিল্পক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ নয়, অতীতের দিকেই বইয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ। 'ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি' যে একালের পক্ষে আত্মহননের নামান্তর—অবনীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক শিল্পপ্রত্যয়ে এ সত্য বোঝেন। 'বর্তমান ধরে তবে বর্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু অতীতমুখীও নয় শিল্প[১৪]।' ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়, ঐতিহ্যকে ব্যবহার বর্তমানের ধর্মের দিক থেকে—একালের শিল্পীর পক্ষে অবশ্যমান্য এ দায়। একালের সকল উদ্যোগ এই লক্ষ্যে নিবিষ্ট হয়েই তাৎপর্য পায়, না হলে সমূহ বিফলতা। অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ভাবনা স্থিরনিবদ্ধ এই লক্ষ্যে :

> একটা জায়গায় এসে সমস্ত ব্যাপারটা ঠেকে—সেটি হচ্চে একাল। প্রাচীন জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার আজকের কালানুযায়ী হল কিনা সেইটেই দেখবার বিষয়।...কালসূত্রে ধরা রইলো কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সঙ্গীতকলা শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনি কালসূত্রে গাঁথা রইলো—বেজোর মুক্তা। আমাদের জাতির উপরে সবচেয়ে যে বড় দায়িত্ব তা হচ্চে এই অতীতকালের মালায় যে বেজোর মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর একটি কালসূত্রে গেঁথে যাওয়া।[১৫]

নিজেরই রচনা দিয়ে সেই জোড় মেলাতে হয়, পুরোনো সঞ্চয়ের পাশে একালের সৃষ্টিটিকে ধরে দিয়ে। জোড় মেলানোর প্রশ্ন আছে, একালের সৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহ্যের সেই নিহিত সাদৃশ্য ফুটে উঠবে, ফুটিয়ে তুলতে হবে। একাল ত্রিশঙ্কু তো নয়, ঐতিহ্যের ভিতের উপরেই গড়ে-ওঠা একটা নতুন মহল। তবুও নতুন। আপনকালের মুদ্রাঙ্কনে তার নতুনত্ব। শাস্ত্রের সীমার বাইরে এসে যে শিল্পীকুল নিজেদের স্বাধীন রুচির পরিচয়চিহ্ন ধরে গেছেন ভারতীয় শিল্পধারায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সেই শিল্পের স্বরূপ জানা এবং আপনকালের দায় মেনে নতুন সৃষ্টিলোকে উত্তরণের পথনির্দেশ—অবনীন্দ্রনাথের এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

ঐতিহ্যের কথায় তিনি ভারতীয় শিল্পবৃত্তের বাইরে—গোটা প্রাচ্যের শিল্পরুচির বিচারও আবশ্যক বিবেচনা করেন। প্রাসঙ্গিক তুলনা আসে চিন জাপানের সঙ্গে ভারতের. আসে ভারতের শিল্পকলা এশিয়ার বৃহত্তর পটে ছড়িয়ে যাবার কথা। ভারতের সীমার মধ্যে শাস্ত্রীয় শাসনের চাপে রুদ্ধশ্বাস শিল্পের খর্বতার পাশে—ভারতশিল্পেরই বহির্মুখী ধারা কেমন সজীব হয়ে বয়ে গেছে দেশের বাইরে, শিল্প মুক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে—তার উল্লেখ এবং এ সজীবতার হেতু নির্ণয় করেন। বৌদ্ধযুগে ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প গেছে বিদেশে। ভিক্ষু শিল্পীদের হাতে সেইসব উপনিবেশে ভারতশিল্প পুষ্ট হয়েছে স্থানীয় আবহাওয়ায়, স্থানীয় প্রবণতার মিশ্রণে।

> অভারতীয় অন্তরের' মধ্যে বয়ে গেছে ভারতশিল্পের নিহিত প্রাণ সম্পদ। বিদেশে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে শিল্পপ্রচারের দায়িত্ব যাঁরা বহণ করেছেন তাঁরা ধর্মের অনুশাসন অন্যব্রতদের ওপরে খুব কঠিনভাবে প্রয়োগ করলেও শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলো ঢিলে করে দিয়েছেন দেশে দেশে। শিল্পের দেশীয়তার সঙ্গে শাস্ত্রমতো বিশুদ্ধ শিল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন—কোনো বাধা দেন নি সে পথে।...কালে কালে দেশে দেশে একই শিল্পের পুনরাবৃত্তি যে একেবারেই দোষ, বিচিত্রতাই যে শিল্পের মূল কথা, সেটা তাঁরা ভালো করেই জানতেন।[১৬]

এ-দৃষ্টান্তে দৃঢ়তর হয় সেই যুক্তি, শিল্পে মুক্তি আসে প্রগতি সম্ভব হয় শিল্পক্রিয়ার স্বাধীনতার পথে। 'শিল্পীর মতি' বা তার অভিপ্রায়টিকে মেরে দিয়ে পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করে দিয়ে শিল্পকে বাঁচানো যায় না। কোনও বিধিব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না শুদ্ধ শিল্প। এই দৃষ্টি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আবার অবেক্ষণ করেন ভারতীয় শিল্পধারায় নানা পদ্ধতি ও প্রকরণ মিশ্রণের তাৎপর্য। শিল্প-শাস্ত্রীকেও মানতে হয়েছে, শিল্পীর হাত

সবসময়ে শুদ্ধ। সংকরত্বে সৃষ্টির জাত যায় না। শুদ্ধি আসে সমর্থ শিল্পীর ধ্যানের শুদ্ধতা থেকে—

> পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতো গোবর গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে শাস্ত্রের মন্ত্র পড়ে ধ্যান করে গড়লেই বিশুদ্ধি আসে না, অন্তরের পূতধারা তারি স্রোত যখন শিল্পীর হাতের কাজ ধুয়ে দেয় তখনই সে হয় বিশুদ্ধ, ভারতশিল্প বা আর কোনো বিশুদ্ধ শিল্প। হিন্দুশাস্ত্রমতে গড়া হলেই ভারতশিল্প হবে একথা বলা চলতো যদি ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুরই হত— গ্রীক মোগল চীন নেপাল, কত কি নিয়ে যে ভারতশিল্প হযেছে তা কে জানে। সুতরাং ভারতবর্ষে যেমন একটি মাত্র ধর্ম নেই তেমনি ভারতশিল্পে কৌলীন্য বলে পদার্থ একেবারেই নেই। কেননা ভারতবর্ষ যেমন প্রকাণ্ড বিস্তার নিয়েছে সেই রকম তার আর্টও বিস্তার পেয়েছে শাস্ত্রগত পদ্ধতি ছেড়েই।[১৭]

শিল্পসাক্ষ্যের বিচার-বিশ্লেষণের পথেই অবনীন্দ্রনাথের ভারতজিজ্ঞাসা অনার্য, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান— ইত্যাকার গণ্ডিবদ্ধ ধারণার ভ্রান্তি এড়িয়ে যায়। উপনীত হয়, নানা ধারার সম্মিলনে, আত্মীকরণে প্রাণবান ভারতশিল্পের উদারতর পটে। ভারতশিল্পের ধারায় কালে কালে বিমিশ্রিত হয়েছে নানা প্রকরণ-পদ্ধতি। 'আর্য শিল্পের ক্রম' (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী) প্রবন্ধে দেখান আর্যকল্পনার রূপান্তর বৌদ্ধশিল্পে, বিশ্লেষণ করেন আর্যেতর জাতির শিল্পচেষ্টার সঙ্গে উৎকৃষ্ট আর্য কল্পনার পরিণয়বন্ধনের তাৎপর্য। বিশ্লেষণ করেন, কীভাবে তুর্কি ধারা ধরেছে ভারতীয় ছন্দ, হিন্দুরীতি মিলিত হয়েছে মোগল রীতিতে। এ মিলন জোর করে সম্ভব হয়নি, শিল্পীর স্বাধীন শিল্পক্রিয়ায় সামঞ্জস্য ফুটে উঠেছে। বিদেশি প্রভাব আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত পান আজমীড়ের মসজিদে, কুতবমিনারে, আল্‌তমাসের, আলাউদ্দিন বা তোগলকশাহের সমাধিতে। তাজমহলকে গ্রহণ করেন সেই সার্থক সম্মিলনেরই তুলনারহিত দৃষ্টান্ত রূপে। তরঙ্গের উত্থান পতনের মতো ভারতশিল্পের ধারায় এক একটি স্তর, পরস্পর্যে গ্রন্থিত এই স্তরগুলি নিয়ে সমগ্রতার ছবি ফোটে। সেই সমগ্রের পরিচয়ে ভারতশিল্পের প্রকৃত পরিচয়। তাকে হিন্দু বা তুর্কি বা মোগল—কোনও একটা পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না কখনও। অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে অক্ষুণ্ন যে ভারতীয়তা—তাকে অনুভব করার দৃষ্টিই মূল্যবান ভারতশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনায়। অনিবার্যভাবে এখানে মনে আসে ভারতীয় ইতিহাসের মর্মবিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মিলের কথা। শিল্পের দৃষ্টান্ত ধরে অবনীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতীয়তার বোধে উত্তীর্ণ হন। ঠিক এই অখণ্ড ঐক্যের, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধনের এই ভারতীয় প্রতিভার কথাই রবীন্দ্রনাথও বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে। ভারতবর্ষময় ছড়ানো শিল্পনিদর্শনগুলির বৈসাদৃশ্যের চেয়ে রূপ ও রীতির গভীরতর সাদৃশ্যের প্রতিই অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি— শিল্পের প্রাণছন্দের মর্মটিকে আবিষ্কার করা। পুরাতত্ত্বের পদ্ধতি পরিহার করে তিনি শিল্পদৃষ্টির উপরেই নির্ভর করেন। প্রকরণ-পদ্ধতির দিক থেকে ভারতশিল্পের এক একটা পর্বকে চিহ্নিত করা যায় ভিন্ন ভিন্ন নামে, পুরাতাত্ত্বিকের উৎসাহ সেই শ্রেণীবিন্যাসে, জাতগোত্রের প্রভাব পরিমাপের বিচারে। কিন্তু এই সব গণ্ডিকে জেনে, গণ্ডিকে পেরিয়ে শিল্পধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সমগ্রতাটুকু অবনীন্দ্রনাথ ধরে দিতে চেয়েছেন আমাদের বোধে। সেই সপ্রাণিত শিল্পধারার প্রসঙ্গেই বলেন :

> হিন্দু ভারতবর্ষের চেয়ে যে বড় ভারতবর্ষ, হিন্দু ভারতশিল্পের চেয়ে যে বড় ভারতশিল্প, তাই গড়ে তোলার প্রকরণ অর্জনের যে আনন্দ তারি মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভাতরশিল্পের মূল যুক্ত রয়েছে বলেই...সে নতুন থেকে নতুনতর অর্জনের মধ্যে চলে বলে বেঁচে রইলো। যুগ যুগান্তরের অর্জন প্রথা প্রকরণ তাকে চেপে মারতে পারলো না, সে আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগলো গড়তে লাগলো সৃষ্টির জিনিস। ভারত সভ্যতার এই বড় দিক,—এই দিক দিয়েই ভারতশিল্পের মর্যাদা ও মহিমা।[১৮]

প্রথা-প্রকরণ বাইরে থেকে আরোপিত হলেই শিল্পক্রিয়ায় খর্বতা ঘটে। শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের শাসন বা যে-কোনও বাঁধন সম্পর্কেই সেই একই কথা অবনীন্দ্রনাথের। শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা চাই। তাঁর

স্বাধীন শিল্পরুচি প্রথা-প্রকরণ গ্রহণে-বর্জনে স্বভাবের পথে আপন প্রতিভাকে ফলবান করে তুলবে। স্বদেশের ঐতিহ্যে সেই শিল্পমুক্তির সাক্ষ্য তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন। সন্ধানের গরজ আসে একালের শিল্পমুক্তির পথ-নির্দেশের, আধুনিক শিল্প আন্দোলনে নায়কত্বের দায়িত্ববোধ থেকে। শিল্পে নবযুগ আনতে চেয়েই শিল্পক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতে গিয়ে এ-বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হল। কারণ, প্রবল পাশ্চাত্য প্রভাবের অভিঘাতে বিভ্রান্ত এই যুগে নিজেকে চেনাই শিল্পীর সবচেয়ে বড়ো দায়। স্বদেশের ঐতিহ্যের পটপ্রেক্ষায় সংস্থিত শিল্পজ্ঞান নিয়েই একালে শিল্পীর স্বকীয় কৃত্য বিষয়ে সংকল্প সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যভাবনার মূল নিহিত আপনকালের শিল্পক্রিয়ায় চরিতার্থতার পথটি ধারণায় আনবার দায়িত্ববোধে। এবং এই কারণেই তাঁর সুবিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ নিরালম্ব তাত্ত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় না কখনও। আলোচনার সমগ্রে সঞ্চারিত হয় সেই কর্মিষ্ঠ আবেগ, যে আবেগে তিনি অন্তহীন পরীক্ষায় নিজেরই শিল্পকীর্তিতে সম্ভব করে তোলেন আধুনিকতার সূচনা।

রীতিমতো চিত্রবিদ্যা চর্চার শুরুতে তখনকার রেওয়াজ অনুসারে অবনীন্দ্রনাথকেও কাজ করতে হয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্প-শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। গিলার্দি ও পামার তাঁকে বিদেশি পদ্ধতি শেখান। কিন্তু সে-শিক্ষা ছিল যান্ত্রিক, নিজের অভিমতে কাজ করে যাবার সুযোগ ছিল না সেখানে। দ্রুত নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করার পাট চুকিয়ে দিলেন। ইচ্ছাসুখে কাজ করবার সুযোগ এল বৈষ্ণব পদাবলির বিষয় নিয়ে চিত্ররচনায়, রবীন্দ্রনাথের উপদেশেই অবশ্য। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা শুরু সেই থেকে। দেখা দিল দেশি রীতি শেখার গরজ। বিষয়ের দিক থেকে দেশীয়তা শুধু নয়, গোটা ছবিটাকেই রীতি-পদ্ধতিতে এদেশের শিল্পধারার মর্মের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে মিলিয়ে দেওয়ার উপায় সন্ধান। ভারতশিল্পের নবজাগরণের পথ নিজের কাজে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করে তোলার সেই সুদীর্ঘ প্রয়াসে মোগল রাজপুত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্পরীতি আয়ত্তে আনতে হয় তাঁকে। শিল্পশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থাগুলির মূল্যবিচার করতে হয় একালের ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হয় ভারতশিল্পের এই নবপ্রবর্তনা বাঙলার মাটি থেকেই শুরু করছেন। শিল্পস্বভাবের স্বাভাবিক টানে তাঁকে নামতে হয় দেশের, বিশেষ করে বাঙলা দেশেরই লোকজীবনের আশ্রয়ে ধরা আছে যে লোকশিল্প—তারও মর্মানুসন্ধানে। পণ্ডিতের মত বা শাস্ত্রে মতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তবুও 'হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে', সেই লোকশিল্প। এ শিল্পের ভাষা মেলে 'পট পাটা গহনাগাটি ঘটি বাটি কাপড় চোপড় এমনি যে সব art', ধর্মকর্ম চাষবাস নিয়ে বাঙলার দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে বয়ে আসা শিল্পক্রিয়ার সচল ধারায়। এখানেই, এই দেশের মাটিতে নানা অনুষ্ঠানে পালাপার্বণে বাঙালি হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ফোটে যে ব্রতকথায় ব্রতের আলপনায় পটচিত্রে লক্ষ্মীমনসার সরায়—আধুনিক শিল্পীর শিক্ষায় তারও উপযোগিতার কথা একালে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন। উচ্চমার্গের ভারতীয় শিল্পধারার মর্মগ্রহণেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হয় না। দেশের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের পথ সন্ধানেই জিজ্ঞাসু শিল্পীকে তাই সুবিস্তৃত অনুশীলন করতে হয় 'বাঙলার ব্রত' নিয়ে। পুরাতত্ত্বের দৃষ্টি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান নয়, লোকজীবনের সজীব আশা আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ পাবার প্রত্যাশায় অবনীন্দ্রনাথ ব্রতকথার ভাবসম্পদ আর আলপনা-শিল্পের রূপ-শুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ করেন। লোক-হৃদয়-পুটে লালিত এই শিল্পকলায় মানুষের সুস্থ কামনা-বাসনার রসে পুষ্ট অঙ্কন ও মণ্ডন রীতিতে শিল্পগত শুদ্ধতার দিকটিই তাঁকে টানে। শিল্পসৃষ্টির মৌলিক আবেগ কীভাবে আলপনাতেও কাজ করে দেখিয়ে দেন। আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিটি কল্পমায় চরিতার্থতার পূর্ণ মূর্তি ধরে ওঠে যখন, শিল্পী তাকে বাইরে আনেন রেখায় বর্ণে প্রস্ফুট করে। সেই কামনার আবেগ থেকেই আসছে ব্রতানুষ্ঠান। যা নেই, যে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থই হবে না হয়তো—ব্রতের কথায় আলপনায় তাকেই প্রমূর্ত করে তোলা হয়। কল্পনা কাজ করবার অবসর পায় এখানে। তাই আলপনা সৃষ্টির পর্যায়ে আসে। লোকশিল্পের বিচারেও দেখি সেই একই পদ্ধতি তাঁর, শিল্পচেতনা-প্রবুদ্ধ ইতিহাসবোধ নিয়ে ঐতিহ্যের মর্মগ্রহণ। সজাগ শিল্পদৃষ্টিই তাঁর সহায়। রূপসৃষ্টিতে রেখার ব্যবহারের নিতান্ত টেক্‌নিক্যাল আলোচনাতে বাঙলার পটুয়াদের কাজের দৃষ্টান্ত আনেন। রেখা দিয়ে রূপকে বাঁধেন না প্রকৃত শিল্পী, রেখা হয়ে ওঠে

রূপমুক্তির উপায়। কালীঘাটের পটে অ-জটিল অলংকারহীন সাবলীল রেখায় রূপমুক্তির দৃষ্টান্ত তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিশ্চিত ভিত্তি জোগায়। রসসৃষ্টির উপায় নিয়মে বেঁধে যে দেওয়া যায় না কখনও, এই উক্তিরই সমর্থন খোঁজেন পুতুল শিল্পের গড়ন ও রং ব্যবহারে শাস্ত্রীয় বিধির কিছুই না মেনেও রসের অনির্বচনীয়তা ধরে দেবার অনায়াস দক্ষতায়। আলপনা, পট-পাটা, মাটি বা কাঠের পুতুল; ফুলকারি কাঁথা সুজনি, দুর্গাঠাকুরের ডাকের সাজ, নৌকোর গলুই—লোকশিল্পীদের হাতের কাজের এমন অজস্র দৃষ্টান্ত—সবই তাঁর কাজে আসে শিল্পে স্বদেশজিজ্ঞাসার সূত্রে। দেশের মাটির উপরে দাঁড়াতে চান বলেই কাজে আসে।

অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ আর একজন কালীঘাটের পটুয়া হবার সাধনা করেননি। লোকশিল্পের পুনরাবৃত্তি একালের শিল্পমুক্তির পথ নয়, যেমন নয় শাস্ত্রীয় শিল্পের পুনরাবৃত্তি। আধুনিক বাঙলায় বা ভারতে গ্রাম্য লোকচিত্তের উপরে যে আর একটি স্তর রচিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের সঙ্গে আদান প্রদানে, দেশের চিত্তের সেই স্তরটিই একালের শিল্প ক্রিয়ার ভিত্তি। এই আধুনিক চিত্তস্তরের ঘনতা যতটাই হোক—এখানেই আধুনিক শিল্পীর আশ্রয়। এখানেই বিশ্বের আলো হাওয়া-খেলা করে। গড়ে ওঠে রুচির বিশ্বগত মান। শাস্ত্রীয় বা লোকশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়, একালের প্রয়োজনের দিক থেকেই সেই ঐতিহ্যকে ব্যবহার আধুনিক শিল্পীর কৃত্য।

কান্তিবিদ্যায় অবনীন্দ্রনাথ এক পূর্ণাঙ্গ প্রস্থান গড়েছেন তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে। তারই এক গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ঐতিহ্য ও আধুনিক শিল্পের দায়দায়িত্ব-বিষয়ক আলোচনা। ভারতশিল্পে নবজাগরণের নায়কত্বে স্বেচ্ছাকৃত অবনীন্দ্রনাথ তত্ত্বগত ভাবে যা বলেন সেই তত্ত্ব শিল্পক্রিয়ায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই নির্যাসিত সূত্র। নিজের কাজের অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিখিয়েছিল আধুনিক শিল্পীর পক্ষে মুক্তির পথ কী। ইংরেজ শিক্ষক পামার এবং ইতালীয় গিলার্দির কাছে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতির। ড্রয়িং-এ দক্ষতা, পারস্পেক্টিভের বোধ, প্যাস্টেলের কাজ, তেলরঙের ব্যবহার ও প্রতিকৃতি আঁকার প্রকরণ—এই শিক্ষার স্তরে তাঁর আয়ত্তে আসে। শিক্ষালব্ধ এই দক্ষতায় পাশ্চাত্য রীতির একজন ভারতীয় চিত্রী হিসেবে খ্যাতি অর্জন তাঁর পক্ষে অনায়াসেই সম্ভব হত। কিন্তু দেশকালের হাওয়ায় ছিল তখন জাগরণের নতুন বাণী, অবনীন্দ্রনাথেও জেগেছিল শিল্পীচৈতন্যের আত্মনির্ভরতার গরজ। সেই গরজেই ঘরের দিকে মুখ ফেরাতে হল। নিশ্চয়ই হ্যাভেলের সৎ পরামর্শ তাঁর আত্মানুসন্ধানে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায় তিনি প্রতিষ্ঠার পথ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজতে চোখ মেলেছিলেন যে যুগে যে পরিবেশে—সেই প্রেরণা এবং পরিবেশের প্রভাবই কি তাঁকে চালনা করেনি ভারতশিল্পে নবযুগ নির্মাণে দুরভিসম্ভব পথে। বর্তমানের সত্তাধর্ম মেনে তাঁকে একালের শিল্পক্রিয়ার প্রয়োজনের দিক থেকে ঐতিহ্যস্মৃতির মর্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হতে হল। শিল্প-ঐতিহ্যের সংস্কারসাধন মাত্র তাঁর উদ্দেশ ছিল না, তিনি জানতেন প্রাচীনের বেশ পরিবর্তন করলেই সে-শিল্প একালের হয়ে ওঠে না। 'আমিই বর্তমান' বা 'আমাতেই বর্তমান' শিল্পী তো এই বোধই ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কাজে। এই বর্তমানের শিল্পীতেই, অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই কাজে মেলে ইয়োরোপীয় শিক্ষা আর শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মোগল-রাজস্থানী রীতি বা লোকশিল্পের প্রাণময় ধারার অভিজ্ঞতা অন্তরঙ্গ সামঞ্জস্যে। সৃষ্টিময় প্রতিভার সামর্থ্যেই এ মিলন সম্ভব। আপন কালের দায়দায়িত্ব বোধের ভিতের উপরেই গড়ে ওঠা সম্ভব ব্যক্তিপ্রতিভার অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞান ও সংকল্প। সমর্থ প্রতিভার অধিকারে অবনীন্দ্রনাথ একালের দাবি পূরণ করে গেছেন সারা জীবনের কাজে। আর তাত্ত্বিক আলোচনায় বিচার-বিশ্লেষণে সেই সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যের অভ্রান্ত উপলব্ধিগুলি ধরে দিয়ে গেছেন নবীন ভারতের শিল্পীসমাজের উদ্দেশে।

সূত্রনির্দেশ

১। *জোড়াসাঁকোর ধারে*, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ১২৫।

২। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড'। কলিকাতা ১৩৬৯। পৃ ১২৫।

৩। ঐ। পৃ ১২৫।

৪। ঐ। পৃ ১১৭।

৫। 'পথে পথে', *ভারতী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৬। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, 'শিল্পে অনধিকার'। পৃ ১১।

৭। ঐ। পৃ ৪-৫।

৮। 'পথে পথে', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

৯। ঐ।

১০। 'ভাবসাধন', *ভারতী*। অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

১১। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড'। পৃ ১৪০।

১২। ঐ। পৃ ১৪০।

১৩। ঐ। পৃ ১৪১।

১৪। *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, 'জাতি ও শিল্প'। পৃ ১৯১।

১৫। ঐ। পৃ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮।

১৬। ঐ, 'শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড'। পৃ ১৪০।

১৭। ঐ, 'শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ'। পৃ ১৫২, ১৫৩।

১৮। ঐ। পৃ ১৫৪।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫)

অসীম রায়

টমাস মানের সঙ্গে

> একালের কথা, গোপাল দেব, দ্বিতীয় জন্ম — এই তিনটি উপন্যাসেই তোর একটি বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ ঝোঁক ক্রমে প্রকট হয়েছে এবং *দ্বিতীয় জন্মে* তা একটি সর্বাত্মক শিল্পগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সে ত্রুটি হল অনেক সময় (সব সময় নয়) আশে পাশের যেখানে যে জ্যোতি রায়, শোভা দত্ত, বিষ্ণু দে, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রাম বসু, মুরলী ঘোষ ও আরও অনেক হতভাগ্য, কোনও একজনের মা, তার বোন, তার ভুরু, তার ভাগ্নে, তার নাক-চোখ-রক্ত, তার মা-র অর্থলোলুপতা, তার বাঁচা-কাঁদা-মরা, তার জীবনের কমা-দাঁড়ি, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম (তা না হলে তুই খুকু ও বাঘার নাম বদলে রাখতে পারতিস) আছে, সব কিছুকে উপন্যাসের কাঁচামাল হিসেবে তুই আবিষ্কার করে ফেলেছিস। কিন্তু মুশকিল হল, তোর শিল্পে তাদের আমদানি হয়েছে প্রায় সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তির মতো।

১৯৫৬ সালে *দ্বিতীয় জন্ম* প্রকাশের পরই এ চিঠির অভিযোগ এমন প্রচণ্ড ও মর্মান্তিক যে তা জবাবের অপেক্ষা রাখে না। এ জবাব সহজলভ্য চাতুরির উপর নির্ভর করে দেওয়া মানে আত্মবঞ্চনা, বিশেষ করে অভিযোগকারীর বছরের পর বছর সান্নিধ্য লেখকের গভীর পরিতৃপ্তির কারণ ঘটানো ছাড়াও এ অভিযোগের উত্তরের সঙ্গে তার নিজের শিল্পপ্রক্রিয়াও যুক্ত। লেখকের সামনে এমন এমন বক্তব্য আসে যা আসলে বক্তব্যের মুখোস পরা শূন্যতা, কখনও তা কথার পিঠে কথা বলার অভ্যাস-দোষ-সঞ্জাত, কখনও বা সংক্রামক চালাকির ব্যাধিতে রুগ্ন ; কিন্তু লেখকের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দেবার ক্ষমতাও বয়ে আনে কোনও বক্তব্য, যখন সে বক্তব্যের সঙ্গে মিশে থাকে শিল্পকর্ম সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা।

আরও বছর পরেও এ চিঠির নৈর্ব্যক্তিক কোনও উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করার মধ্যে বক্তব্যের মর্মান্তিকতা ও প্রচণ্ডতা হারায় না। কারণ চিঠিতে যে সব নামোল্লেখ আছে সেসব নামধারী নরনারী লেখক তাঁর উপন্যাসে কাঁচামাল রূপে ব্যবহার করেছেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ যথেষ্ট থাকলেও, চারপাশের প্রত্যক্ষ যে জগতে লেখক হাঁটেন-ফেরেন-কথা বলেন সেই জগৎ-টাই যে তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে ও আসবে এ অভিযোগ তিনি যে শুধু মাথা পেতে নেবেনই না বরং একথা বলবার চেষ্টা করবেন যে, এই প্রত্যক্ষ জগৎকে মানসলোকের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁর লেখার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রেরণা।

অনেক সময়ই আলোচনায় রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম দুই অভিন্নসত্তা বস্তু রূপে দেখানোর চেষ্টায় ভুল ঘটা স্বাভাবিক। মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রির মতো নিউইয়র্ক ও শিয়াখালার মতো, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো দুই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও পরিবেশে চিহ্নিত হয়ে সত্যের চেহারা আসে না লেখকের কাছে। এ রকম অভিন্নসত্তা, এ রকম নির্দিষ্ট সংজ্ঞা সাহিত্যের মানদণ্ড স্থাপনে হাতের পাঁচ হয়ে দাঁড়ালেও শিল্পকর্মের প্রক্রিয়াটা তলিয়ে দেখতে তা বিঘ্ন ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত কবিতার লাইন 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে' ঘটনা নিশ্চয় বাদ দিয়ে নয়। আর এই ঘটনা কারো-ওর জীবন্ত মঙ্গোলীয় চোখ, নিচু খাদে কারও বা গলার স্বর, কোনও মহিলার ঠোঁটের ভাঁজে কোঁকড়ানো গোলাপের ইঙ্গিত, কথার যথার্থতা প্রতিষ্ঠার অভিলাষে হাত নাচানো, মেকি বিষাদে পরিপূর্ণ জনৈক ব্যক্তির আয়ত চোখ, কারওর বা গলায় লাল স্কার্ফ এমন কী কোনও নাম যা পাল্টাবার যান্ত্রিকতা অতিস্থূল কারণ, তা

সেই মানুষটা ও তার পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এই নাক-চোখ-মুখ বলার ভঙ্গি এগুলো হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে আবিষ্কারের বস্তু না। এগুলো প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, বাস্তব যা জলের মতো আমাদের চারপাশে, আমরা সাঁতরাচ্ছি সেই মুখ-চোখ-নাক-কথা জামা-র জগতে। তাদের বাদ দিয়ে ডুব দিলে রত্নাকরও রত্নহীন।

তার মানে ন্যাচারলিজম, সাংবাদিকতা, ফোটোগ্রাফি কিংবা মাছিমারা কেরানির পেশাই শিল্পকর্ম? এ প্রশ্নের ধাক্কা অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ কোটি কোটি চোখ, কোটি কোটি হাত নাচানো, কোটি কোটি গলার উঁচু-নিচু স্বর আমাদের আগে গিয়েছে, পরে আসছে, কয়েকশো কোটি জামা জুতো চোখ মুখ গলার আওয়াজের ফিরিস্তিই আমাদের শিল্পকর্মে আকর্ষণ? তাহলে নিশ্চয় উপন্যাস নামধেয় শিল্পকর্ম বেশ স্থূল ব্যাপার, চারপাশের যত রসালো চটকদার ঘটনা জমিয়ে লিখতে পারলেই তা দাঁড়িয়ে যাবে উপন্যাসে, এবং তা যতই চটুল চাঞ্চল্যকর হোক কিংবা লেখক কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে জীবন দেখেছেন তার পাতার পর পাতা বর্ণনা থাক, বয়স্ক মানুষের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে বাহ্য।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দেবার ব্যাপারটা না থাকলে কাহিনি কাহিনিমাত্র, উপন্যাস নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করা দরকার, প্রত্যেক উপন্যাস এক গভীর আত্মমুখিনতা ও প্রবল বহির্মুখিনতা এক সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা। আরও বছর আগের চিঠির জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ কথা বলা যেতে পারে যে দুটো আলাদা এবং অনেক সময় সমান্তরাল জগৎ এক সঙ্গে অনেকদিনের ধীর অভিনিবেশে ধরবার চেষ্টাই উপন্যাস লেখার একমাত্র সাফাই। যে জগৎ সেই বিশেষ বইটির (দ্বিতীয় জন্ম) প্রসঙ্গে উল্লিখিত সে-জগতে লেখকের বাস বেশ কিছুকালের। এ-ক্ষেত্রে চেষ্টা করে জীবন দেখবার জন্যে বার হবার কোনও দরকার ছিল না। এ জগতের চেহারাটা এসেছে নিঃশ্বাস নেবার মতো স্বাভাবিকতায়। কাজেই একটা চমৎকার তৈরি বাগানকে আবার উপড়ে নষ্ট করে সেই জায়গায় নতুন বাগান সৃষ্টি না করে শুধু নতুনভাবে সাজিয়ে দেবার প্রয়াস ছিল লেখকের। আর সেই সাজানোর ছকটার জন্যে যেমন তাঁকে ভাবতে হয়েছে তেমনি তাঁর কাছে মূল্যবান ঠেকেছে সেই সত্যের অনুভূতিতে স্পন্দমান জগৎখানা তুলে ধরবার প্রয়াস।

কিন্তু উপন্যাস প্রক্রিয়ার এই তত্ত্ব ডিশে সাজিয়ে দেবার মতো পাঠকের সামনে গুছিয়ে রাখলেই অভিযোগকারীর যুক্তি খণ্ডায় না। বস্তুত অভিযোগ অভিযোগই থেকে যায়, জবাব জবাবই থাকে। আহত মানসের কাছে এ প্রক্রিয়া অসামাজিক, চৌর্যবৃত্তি, সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি, প্রায় ছ্যাঁচড়ামি। যদি পালটাপালটি বসা যায় তবে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের কাছে এ বক্তব্যের যথার্থতা অনস্বীকার্য। আবার লেখক হিসেবে এ ছাড়া কোনও রাস্তা নেই, মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়া বিমূর্ত রূপের ধ্যান অসম্ভব।

এ বক্তব্যের সঙ্গে আর একটি বক্তব্যের সহাবস্থান অনস্বীকার্য। উপন্যাস তা একটাই হোক বা সারা জীবনব্যাপী লেখার মালাই হোক, তা লেখকের এক অবিচ্ছিন্ন আত্মজীবনী। অর্থাৎ লেখক তাঁর জগতে যেভাবে হাঁটেন-চলেন-ফেরেন, তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশেষ মেজাজের ছায়াপথ সমস্ত লেখাতেই প্রতিভাত। তা যদি না হয়, যদি সাহিত্যের জগৎ এবং লেখকের মানসিকতার মধ্যে ব্যবধান থাকে অনড়, ভিতর ও বাহিরের যোগাযোগ অনুপস্থিত, তাহলে আবার পুরোনো কথায় ফিরে আসা যায়, কাহিনি কাহিনি মাত্র, উপন্যাস নয়। এই বিশেষ কারণেই ভালো লেখকের কোনও একটি বিশেষ লেখা নিয়ে চেঁচামেচি অর্থহীন ; মাস্টারপিস-মৃগয়া একেবারে অচল। কারণ লেখকের মানসিকতায় নতুনের আবির্ভাব হ্যাঁচকায় না, বয়ে নিয়ে চলে, বিস্তারিত করে। প্রত্যক্ষের ধাক্কায় উৎসাহিত, ক্ষুব্ধ কিংবা আলোড়িত হয়ে তিনি আবার ফিরে যান তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বে। অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে তাঁকে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকখানি ভাবতে হয় তাঁর বিষয়টা বিষয় কিনা। তারপর লিখতে লিখতে সমস্ত বিষয় এক নতুন নকশায় ধরা পড়ে, যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং একেবারে বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের কাঁচামাল। এই দুই পৃথক বস্তুর দুই সুতোয় বুনোটের কাজ চলে। এই নকশা বোনার উৎসাহে ভরা পালে কাজ

এগোতে থাকে, তখন দুটো সুতোর চেহারা আর আলাদা করে চেনা যায় না, ভিতর ও বাইরের ব্যবধান কমে আসে।

একেবারেই ব্যবধান থাকে না? গোটা উপন্যাসটাই অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে? এ প্রসঙ্গে কোনও পারফেকশানিজমের অবকাশ আছে কিনা সে বিষয় সন্দেহ কাটানো মুশকিল। দুশো-তিনশো কিংবা চার-পাঁচশো পাতার পরিক্রমায় বা দুদিন কী দু-দশ বছরের যাত্রায় কোনও ঘটনা কিংবা চরিত্র নাও জুড়তে পারে, তাতে কি গোটা উপন্যাসটার শিল্পকর্ম ব্যর্থ? সেখানে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ওথেলো নাটকের রুমাল কাহিনির অনিবার্যতা মাত্র স্মরণীয়? বরং এ প্রসঙ্গে লেখকের সমস্ত উপন্যাসব্যাপী পরিক্রমা বিচার্য। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোনও-কোনো আকাঁড়া কাঁচামালের স্বাদ অনাস্বাদিত, জোড়ে নি এমন সুতোও সুন্দর নকশার পরিচায়ক।

তাছাড়া কাহিনি যখন অনেক সময় ধরে অনেক রকম মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বয়ে চলে তখন সমস্ত চরিত্রতেই বইটির অন্তর্লীন ভাব বা 'লেইট মোটিফ ' থাকবে এমন কোনও কথা নেই। অনেক সময় পার্শ্বচরিত্র জমে, তা অনেকটা গ্রিক কোরাসের মতো অবিচ্ছিন্ন হয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ, মূল ঘটনার সঙ্গে তাদের বৈপরীত্যেই তারা প্রাসঙ্গিক। তাদের ছেঁটে ফেলে কাহিনিকে এক সম্পূর্ণ নিটোল রূপ দেবার চেষ্টা শিল্পচর্চায় বিশুদ্ধবাদীদের সন্তোষের কারণ ঘটালেও তা শিল্পের দিগন্ত সংকুচিত করারই নামান্তর। যেমন প্রেমের প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ দুই নরনারীর পরিবেশ হতেই পারে এমন যেখানে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, বাক্ সর্বস্বতা ইত্যাদি মানুষের ক্ষুদ্রতার খেলা চলেছে। অর্থাৎ কোনও পর্বতশিখর যেমন ধাপে ধাপে সমতল থেকে উঠেছে, যার উপর পর্বত-অভিযানকারী দল অনেকটা কম পরিশ্রম ও কষ্টে আরোহণের গৌরব অর্জন করেন তেমনি এমন শিখরও আছে যেখানে ধাপগুলো কম, যেখানে খাড়া চড়াই। প্রকৃতির এই দুই ধরনের সৌন্দর্যের মতো অনেকটা বাস্তবের চেহারা। সেখানে একটা নিটোল মসৃণ, শিল্পসম্ভাবনাপূর্ণ এবং আর একটা কর্কশ স্থূল ভাববার কারণ নেই।

দ্বিতীয় জন্ম প্রকাশের পাঁচ বছর পর ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত টমাস মানের *আমার জীবনের স্কেচ* বইখানা পাওয়া অনেকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার শামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর আবিশ্ব ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একজন অকিঞ্চিৎকর জর্মন ভাষা-অনভিজ্ঞ ভক্তের কাছে এই ছিয়াত্তর পাতার ছোট্ট বইখানা এক আত্মিক সংকটের আশ্রয়। কারণ যে আসামি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপতির বিরুদ্ধ রায় শুনেও ভাবছে সে নির্দোষ এবং জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে আবার তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, তার মানসিক অবস্থা নিশ্চয় আত্মিক সংকটের সমতুল্য। মান অবশ্য অনেক জায়গাতেই শিল্পপ্রক্রিয়ার অপরূপ বর্ণনার মারফত শিল্পের অসাধারণ গুরুত্বে পাঠকের প্রত্যয় এনেছেন, কিন্তু এমন খোলাখুলি সাদামাটা ভাষায় নিজের লেখার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেননি। মান বলেছেন :

> '*টেনিও ক্রোয়গার*'-এর অন্তর্নিহিত প্রতীক এবং বাস্তবের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তুলে ধরবার প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, আমার যৌবনের সেই কাহিনিতে লাইব্রেরি-ঘরে পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে যে সব দৃশ্য তা আমি তৈরি করেছি আমার বক্তব্যের সপক্ষে। কিন্তু তা মোটেই নয় ; স্রেফ যা ঘটেছে তা থেকে তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে 'ভিনিসে মৃত্যু' কাহিনিতেও কোনও কিছু উদ্ভাবিত হয়নি। উত্তুরে কবরখানার তীর্থযাত্রী, ধড়ধড়ে নৌকো, সেই শুভ্রকেশ বাউণ্ডুলে আর অনামুখো গণ্ডোলা-মাঝি, তাজিও আর তার পরিবার, মালপত্তরের গণ্ডোগোলে যাত্রার সাময়িক বিঘ্ন, কলেরা, ট্র্যাভেল ব্যুরোর ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কেরানি আর বজ্জাত কবিয়াল — এই সব কিছু এবং আরও যা আছে তা সব সেখানে ছিল। আমাকে খালি সেগুলো সাজাতে হয়েছে, কারণ অদ্ভুতভাবে হলেও তারা যে একই কম্পোজিশানের অঙ্গ তা আমার কাছে দপ করে মনে পড়েছে।

১৯২৪ সালে প্রকাশিত *ইন্দ্রজাল পর্বত* পাঁচ বছর পর মান-কে দেয় নোবেল পুরস্কার, কিন্তু

সংগতভাবেই মানপত্রে লেখা ছিল যে প্রধানত ল্যুবেক শহরের ব্যবসায়ী পরিবারের জীবনকাহিনি, বুড্ডেনব্রুক বইখানার দরুন উত্তর ইউরোপের বাসিন্দাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এ পুরস্কার। এ সহরেই মানের জন্ম ও বাল্যকাল অতিবাহিত ; তাঁর বাবাও শস্যের ব্যাপারী এবং শহরের জনৈক ব্যবসায়ীর জীবন-কাহিনি লেখাই ছিল তাঁর বইয়ের প্ল্যান। অর্থাৎ আমাদের মূল প্রতিপাদ্য, নাক-চোখ-মুখ, গলার আওয়াজের জগৎ থেকেই লেখকের যাত্রা। মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়া বিমূর্ত রূপের ধ্যান অসম্ভব।

এই মূর্ত ও বিমূর্তের মাঝখানে সেতু বাঁধবার যে বিচিত্র প্রয়াস তা টমাস মানের ছেলে গোলো মানের *পিতৃস্মৃতি*-তে সম্প্রতি চমৎকার প্রকাশিত। বস্তুত এ-প্রয়াস ন্যাচারালিজম ও রিয়ালিজমের বহু আলোচিত বাঁধা সড়ক থেকে আলাদা এবং আরও সম্ভাবনাপূর্ণ। এ প্রয়াসে অন্তর ও বাহির এ দুই জগৎ গুরুত্বপূর্ণ, লেখকের উন্নত মানসিকতা ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেমন গোড়ার কথা তেমনি প্রাথমিক এই চার পাশের জগৎ — মানুষের মুখচোখ-নাককান-গলার আওয়াজ, লেখক যে রাস্তায় হাঁটেন চলেন ফেরেন। এবং এই আত্তীকরণের পেছনে কোনও প্রবল তাড়া নেই, নেই নাটকীয়তা বা উদ্‌ভ্রান্তি।

> একবার যখন আমি গ্রামার স্কুলের ছাত্র বাবা আমার কোনও বন্ধুর কিছু ফটো চাইলেন। সে ছেলেটি নজরে এসেছিল তার স্কুলে আসার সময়। সেই স্পেনীয় তরুণ আজ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী এবং জর্মন ও স্পেনীয় বাণিজ্যের অন্যতম সংযোজক। প্রথমে এ অনুরোধ আমার কাছে ছিল দুর্বোধ্য ; পরে দেখা গেল এই ফোটোগুলোর প্রয়োজনীয়তা তাঁর সেই মহৎ উপন্যাসে জোসেফের গড়নের জন্যে ; যে মুখখানা তিনি আলগোছে দেখেছেন স্কুলে তা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার বাসনা। সচরাচর তাঁর স্মৃতিচারণে দরকার ছিল না এ রকম নোট বইয়ের। একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে তিনি সাধারণত ছিলেন না চরিত্র-উদ্ভাবনকারী, ছিলেন আবিষ্কারক; এবং জীবন থেকেই আঁকতেন চরিত্র। ক্রুল পরিবার কীভাবে এমন দুর্দান্ত জীবন্ত করে আঁকলেন — জনৈক রাইনল্যান্ড-অভিজ্ঞ ব্যক্তির এ প্রশ্নে তাঁর জবাব, 'আরে আমি একবারমাত্র আধ ঘন্টার জন্য রাইন নদীতে এক জাহাজে তাদের দেখেছিলাম'। তাঁর মডেলের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থলে অনেক সময় নামটাও বাদ দিতে তিনি ছিলেন অপারগ ; অর্থাৎ তিনি সেই সব নাম রাখতেন যা অবিকল যে সব লোকদের 'ব্যবহার' করছেন তাদের নামের মতো, কারণ তাঁর এ বোধ ছিল যে ব্যক্তির সঙ্গে তার নামের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। উদাহরণস্বরূপ *ইন্দ্রজাল পর্বতে* প্রিভি-কাউন্সিলারের বা 'পূর্ব বিষাদ' ছোট উপন্যাসে অভিনেতার নাম তাদের আসল নামের প্রতিধ্বনি। এ জন্য মডেল ও চরিত্রের সম্পর্ক তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা মুশকিল হত ; যাঁরা ব্যাপারটা জানতেন তাঁরা মুচকি হাসতেন। আর প্রায়শ তিনি এই সম্পর্ক প্রবলভাবে মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করতেন, কারণ রিয়ালিস্ট বা ন্যাচারালিস্ট কোনওটাই তিনি নন, এ বিষয়ে ছিলেন সচেতন। তাঁর প্রথম উপন্যাস বুড্ডেনব্রুকে একমাত্র প্যারামানেডার ছাড়া কোনও চরিত্রই বানানো নয়। একমাত্র বানানো ছিল বইটার নাম।

তাঁর শেষের দিকের কাজে বানানো বস্তুর ব্যবহার অনেক বেশি ; এক্ষেত্রে জীবন থেকে তিনি ক্রমশ কম এঁকেছেন। তাছাড়া বহির্জগতের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে ছিল কম ; যা দরকার তার উপর ছিল আসল ব্যাপার, অর্থাৎ কল্পনা। খনি শ্রমিকদের জীবনকাহিনি লিখবেন বলে তিনি জোলার মতো খনিসংলগ্ন গাঁয়ে বাস করেননি কয়েকমাস, অথবা হোটেলের মানুষ লিখবার উদ্দেশ্যে ভিকি বামের মতো তাঁকে কয়েক মাসের জন্যে হোটেলের পরিচারিকা হতে হয়নি। এরকম ব্যাপার আমার বাবার কাছে নিশ্চয় জ্যাবড়া লাগত। তিনি মোটেই ন্যাচারালিস্ট ছিলেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল কিছু সময় ধরে দূর থেকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখা, তারপর ফের নিজের অন্তরের দিক থেকে বাইরে তাকানো।

কোনও একটি বিশেষ লেখার প্রসঙ্গে টমাস মানকে টেনে আনা কেন, পাঠকের এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপন্যাস রচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গেই এ আলোচনা। সঙ্গে সঙ্গে মানের গুরুদেব গয়টের এক বিশেষ উক্তি, যার উল্লেখ বারে বারে ঘটেছে মানের লেখায়, সে উক্তিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গি

ক। সম্ভবত 'একারমানের সঙ্গে আলাপ' গ্রন্থে গয়টে বলেছিলেন, 'কিছু করতে গেলে কিছু হতে হবে'। কথাটা গয়টের উপর তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে এবং অন্যত্র মান বার বার উল্লেখ করেছেন। কারণ লেখকের কাজের অসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন বরাবর সচেতন। তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে লেখক একজন 'অসুস্থ দেবদূত' নন, মানুষের সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দায়। এ জন্য তাঁর নিজের উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উন্নত মানসিকতাই বলতে গেলে অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বের অনেকখানি সমাধান ঘটায়, কাহিনিকে রূপান্তরিত করে উপন্যাসে। এ জন্যে লেখকের যে সমৃদ্ধ জীবনবোধ তার পিছনে কাঠ-খড় পোড়ানোর ব্যাপার থাকে।

এ জীবনবোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব তা আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজের ক্ষমতা ও স্বজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বাছবিচারের কথা বলেছেন মান। যেমন তাঁদের গড়ে ওঠার সময় নীটশের এবং কিছু পরবর্তীকালে শোপেনহাওয়ারের অপরিসীম প্রভাব শুধু উল্লেখই করেনি 'বুড্‌ডেনব্রুক' উপন্যাসের নায়ক টমাস বুড্‌ডেনব্রুকের মৃত্যুর দৃশ্যের আগে শোপেনহাওয়ারের প্রভাব তিনি স্বীকারও করেছেন। ইউরোপীয় সংগীতের গড়নে সাজানো বিস্তৃতকালব্যাপী দীর্ঘ উপন্যাসের গঠনপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গেও তিনি সংগীত ঐতিহ্যের ঋণ ভোলেননি। তাছাড়া নীটশের পাঠ তাঁর লেখা কিভাবে প্রভাবিত করেছে, কিভাবে তন্ময় এষণার নীটশে-পাঠের রূপান্তর ঘটালেন তিনি, শৌখিন নীটশেবাদীদের অতিমানবতা ও আত্মিক নৈরাজ্যের অন্ধকার গ্রহণ করলেন কঠিন আত্মানুসন্ধানের তীর্থযাত্রারূপে তা টমাস মানের যে কোনও আলোচনার অঙ্গাঙ্গী। কারণ গয়টের কর্ম ও অস্তিত্বের অখণ্ডতা বোধের প্রয়োজনীয়তা মান প্রসারিত করেছেন পাঠ্য নির্বাচন ও অনুধাবনে। যা পাঠ্য, যা মনীষা আলোড়িত তা কীভাবে লেখক গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে ও অভিজ্ঞতায় তা অনেকখানি জীবনবোধ গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিল্প যেহেতু মনীষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তাই শিল্পীর কাছে পড়ে পাওয়া জিনিস বলে কিছু নেই। প্রথম জীবনে কিছু লেখায় নীটশের প্রভাব থেকে শুরু করে তাঁর 'শেষ রচনায়', তাঁর অবিস্মরণীয় 'সাম্প্রতিক ইতিহাসের আলোয় নীটশে দর্শন'-এর মতো লেখার পরিক্রমায় ঐতিহ্য আত্তীকরণে লেখকের যে অসামান্য দায় সেই কথাই স্মরণীয়। কারণ লেখক দুটো স্পষ্ট বিপরীতমুখী স্রোতের দোটানায় পড়েন, একদিকে অতি উৎসাহে অতিরঞ্জনের নেশায় মনীষার ক্ষেত্রে প্রায় অবতারবাদ প্রতিষ্ঠার সংক্রামক চেষ্টা, অন্যদিকে নকলনবিশি যান্ত্রিকতার বশে রক্ষণশীলতার দাসত্ব বা ঐতিহ্যের নামে নড়বড়ে ধড়ধড়ে বাড়ির দারোয়ানি। ঐতিহ্যকে স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মানুসন্ধানের আলোয় কীভাবে নতুন রূপে আবিষ্কার করা যায় টমাস মান-ছাত্রের তাই প্রথম পাঠ।

মান যেভাবে বলেছেন ইউরোপীয় মনীষার ক্ষেত্রে শেষ অংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর বস্তুত নীটশের শতাব্দী, তেমনি বলা যায় বিংশ শতাব্দীর মার্কস শতাব্দী। অবশ্য মার্কসের ক্ষেত্রে একটা প্রধান অসুবিধে মার্কসবাদ জীবনবোধরূপে দাঁড়ালেও সংস্কৃতি ও শিল্প প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রাসঙ্গিক লেখা প্রায় অনুপস্থিত। কাজেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের অঙ্গাঙ্গী হলেও সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান অনেকখানি নির্ভর করছে লেখক ও শিল্পীদের হাতে ; এক্ষেত্রে নতুন পাঠের প্রয়োজন তর্কাতীত। তাছাড়া শিল্প ও সমাজের রূপ বর্ণনায় এঙ্গেলসের স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচারের তুলনার মতো কতগুলো এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া এ বিষয়ে লেখা বিরল। এই সব বিরল লেখাগুলি নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে যেসব লেখা দাঁড় করানো হয় তা বাস্তবিক পাতে দেওয়ার মতো নয়। একদিকে আর্থিক সামাজিক চিন্তায় সংগতভাবেই উদ্বুদ্ধ এবং দায়িত্বশীল লেখার সঙ্গে মিশে থাকে একেবারে সাংস্কৃতিক দায়শূন্যতা ও বাক্‌সর্বস্বতা, যা লেখক ও শিল্পীর পক্ষে শুধু বাহ্যই নয়, যার অনুসরণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় আত্মিক মৃত্যুর সমান। আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনে নতুন মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তা বিংশ শতাব্দীর মানুষেরই স্বপ্ন। এ স্বপ্ন ও তা বাস্তবে রূপান্তরের আজ আবিশ্ব চেষ্টা। কিন্তু এ যাত্রার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর

করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরলস ও নির্ভীক প্রয়াসে। নীটশে নানা রূপে ফিরে আসে, আপ্তবাক্য ব্যবহারে জবরদস্ত দখলই মানুষের মুক্তির সোপান নয়। মানুষের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিচ্যুত হঠকারিতার নামান্তর নয়। টমাস মান বলেছেন তিনি নীটশেকে প্রকৃত বুর্জোয়া বানিয়েছেন, এ রূপান্তর প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের আসুক। তাঁরা বলুন নতুন মানবতাবোধের প্রতিষ্ঠায় তাঁদের দায়ের কথা। মার্কসবাদী সাহিত্য আলোচনার শৌখিন যান্ত্রিকতা ত্যাগ করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লেখকদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মানুসন্ধানে নতুন আবেগ সঞ্চারিত হোক। এইখানেই টমাস মানের চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীর সংকট : দুটি চিঠি

এখন অত্যন্ত পুরোনো ও বাঁধাধরা তর্কে পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু তবু গত কয়েক বছরের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আমার বারে-বারেই মনে হয়েছে যে এককেকটা সময় আসে যখন পুরোনো প্রশ্নও নতুন উত্তর দবি করে। শিল্পীর দায়িত্ব কী, প্রশ্নটা এতই ছোট ও সামান্য—কিন্তু সর্বগ্রাসী। শিল্পের— এবং আরও জরুরি: শিল্পীর—সঙ্গে কী সম্বন্ধ রাজনীতির? নিশ্চয়ই কোনও সদুত্তর নেই। কারণ কোনও স্পর্শাতুর ব্যক্তিই কি এ-সম্বন্ধে সত্যি করে মনঃস্থির করতে পারবেন? আমার, অন্তত, মনে হয় না। জানি, এখনও যাঁরা উনিশ শতকি কলাকৈবল্যবাদের স্তাবক, তাঁদের মুখে এর উত্তর উঁচিয়ে আছে। তাঁদের একটা মস্ত সুবিধে এই যে তাঁরা যেভাবেই হোক একটা স্থির উত্তর পেয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা, যারা কস্মিনকালেও এই অস্থিরতা কাটাতে পারব বলে বোধ হয় না, আমরা কী করব? আগেকার মতো তেমন-কোনও মূল্যবোধ আমাদের নেই যেটা আঁকড়ে ধরে স্বস্তি পেতে পারি; একের পর এক স্তম্ভপাত হয়েছে —কোনও বিশেষ মতবাদ, কোনো বিশেষ ঈশ্বরে আমরা অনেকেই আর বিশ্বাস করি না। অথচ দেশ যখন আগুনে পোড়ে, জগৎ যখন অধঃপাতে যায়, তখন নিশ্চিন্ত ও নির্বিকারভাবে শিল্পসাহিত্যের চর্চা করতেও বিবেকে বাধে। এই হাৎড়ানিটা সেই জন্যই।

এই হাৎড়াতে গিয়েই প্রথমে চিঠি দুটো চোখে পড়ে। প্রথম চিঠির লেখক গোটফ্রিড বেন, কবি ও চিকিৎসক, রচনাকাল ১৯৩৩, রচনাস্থল নাৎসি-অধ্যুষিত জার্মানি। দ্বিতীয় চিঠির লেখক টমাস মান, ঔপন্যাসিক, রচনাকাল ১৯৪৫, জার্মানির পতনের পর, রচনাস্থল ক্যালিফোরনিয়ার উপকূল। অন্তবর্তী বারো বছরের ইতিহাস ভাবলেই আজ আমাদের গায়ে জ্বর আসে। অথচ সেই সময়ে, হিটলারের রাজত্বকালে ও তার অব্যবহিত পরে, প্রত্যেক জর্মন মনীষা নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা নিয়েই ব্যাকুল ও বিপন্ন বোধ করেছিলেন—অন্তত যে-দুটি চিঠি আমরা এখানে পড়তে চাচ্ছি, তাতে তারই ইঙ্গিত আছে।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জর্মন মনীষার নিদর্শন আগুনে পোড়ানে হয়েছিল। ছিল কড়া সেনসরশিপ, সব শৃগালের মুখে এক রব, অপ্রচার...ইত্যাদি। সেই সময়ে তৎকালীন জার্মানির অনেকেই স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে পুনর্বাসন চাচ্ছিলেন— এই শরণার্থীদের মধ্যে ছিলেন: হাইনরিখ ও টমাস মান, হেরমান হেসসে, বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট, লওনার্ড ফ্রাঙ্ক, ফ্রিৎজ ফোন উনরু প্রমুখ। কিন্তু কেউ-কেউ স্বদেশ ত্যাগ ক'রে যেতে রাজি হননি, গোটফ্রিড বেন তাঁদের অন্যতম। ক্লাউস মান[১] তখন ফরাসি রিভিয়েরার একটি ধীরপল্লী থেকে গোটফ্রীড বেনকে একটি চিঠি লেখেন, বেন-এর খোলা চিঠি ছিল তারই উত্তর। ক্লাউস মান-এর পত্রটির অন্তত অংশবিশেষ এখানে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে বোধ হয়।

> প্রিয় ডাক্তার বেন,
>
> আপনার চিৎ-বৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত বলে, আপনার লেখার কোনো বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম অনুরাগী একটি কথা জিগেস করতে পারি কি?...'জর্মন ঘটনাবলি' সম্বন্ধে আপনার কী মনোভাব— এ সম্বন্ধে- গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি এমন সব গুজব শুনেছি যা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারলে আমি একটা মোক্ষম নাড়া খেতুম। এ-সব জনরবকে আমি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারি নি, অথচ এখন আমি এটা অতি সত্যিকথা বলেই জেনেছি যে আপনি-আমরা যাঁদের উপর আস্থা রেখেছিলুম, আপনিই তাঁদের মধ্যে 'একমাত্র' জর্মন লেখক, যিনি—এখনও আকাডেমিতে ইস্তফা দেননি। ...ওখানে আপনার সঙ্গী কারা? আপনার নাম আমাদের কাছে

ছিল উচ্চমানের সমার্থক-তো মোটেই অন্ধতাময় শুচিবাতিকের দৃষ্টান্ত ছিল না; সেই আপনি কীসের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিজেকে তাদের হাতেই সঁপে দিলেন, ভালো-মন্দ বিচার করার অক্ষমতা যাদের ইয়োরোপের ইতিহাসে অতুলনীয়, আর যাদের নৈতিক কদর্যতা দেখে সারা জগৎ গুটিয়ে যাচ্ছে।... এর গর্হিত ও অসংগত একটি দলে কাকে আপনি বন্ধু পাবেন? ওখানে আপনাকে বোঝে কে? আমি জানি, আপনার তরুণ ভক্তরা আজ সকলেই পারি, ৎজুরিখ, আর প্রাহার সস্তা হোটেলে দিন কাটাচ্ছে— আর আপনি, যিনি তাদের আদর্শমূর্তি, ওই রাষ্ট্রের আকাডেমি সদস্যপদে দিব্যি বাহাল আছেন! না-হয় আপনি আপনার ভক্তদের সম্পর্কে নির্লিপ্তই থাকলেন, কিন্তু আপনার স্পর্শময় আগ্রহ-উদ্দীপনা যে-সব বস্তুর উপর পড়ত, তাদের অবস্থাটা একবার লক্ষ করে দেখুন। হাইনরিখ মান[২], আপনি যাঁকে প্রায় পুজো করতেন, যে-সংগঠন থেকে ধিক্কারজনকভাবে বিতাড়িত হয়েছেন, আপনি স্বয়ং তাতে থেকে গেছেন। এই নতুন প্রভুরা দেশটাকে যে-পরিমাণে উচ্ছন্নে দিতে চাচ্ছেন, অনুপাতে ততটা না-হলেও আমার পিতা এ-দেশের জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা কিঞ্চিৎ বাড়িয়েছিলেন, আর তাঁর কথা আপনি কথায়-কথায় উদ্ধার করতে ভালবাসতেন— সেই তিনি আজ যুযুৎসুদের একটি চাঁদমারি ভিন্ন আর-কিছুই নন। আপনার কাছে যাঁরা মূল্যবান বলে গণ্য হতেন, অন্যান্য দেশের সেই শ্রেষ্ঠ মনীষারাও এখন প্রতিবাদে সোচ্চার। আঁদ্রে জিদ-এর কথাই ভাবুন— তিনি নিশ্চয়ই সেই অন্তঃসারশূন্য 'মার্কসবাদী'দের একজন নন, যারা আপনাকে অমন ক্ষুব্ধ করত।

আর এখানেই বোধহয় আমরা বিনিশ্চায়ক প্রশ্নটায় এসে পড়লুম। জর্মন 'মার্কসবাদী' লেখকদের সম্বন্ধে আপনার বিরাগ আমি সব সময় কত ভাল করে বুঝেছি— কতবার যে আপনার সঙ্গে -সঙ্গে সেই বিরাগবোধের শরিকও হয়েছি।... এ-সব লোকের হাতে আমার মতো নির্যাতিতও আর কেউই হয়নি। অথচ তবু, বহু বছর ধরে এটাই আমাকে এখন উৎকণ্ঠিত করছে যে এই সব স্থূলমুণ্ড জরদ্গবদের প্রতি অনীহাই আপনাকে— গোটফ্রিড বেনকে — তীব্রতর ও ক্রমবর্ধমান কোনও ভয়ংকর যুক্তিহীনতায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গেছে শুধুমাত্র বুদ্ধিজাত— আর, স্বীকার করি, এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকেও প্রলুব্ধ করে— কিন্তু এর বিষম বিপদগুলো আন্দাজ করে নিতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। ... কেউ যদি শয়তানের মতো সজাগ না থাকে, তাহলে আজকাল প্রবল, যুক্তিবর্জিত সহমর্মিতা যে শেষটায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, এটা প্রায় প্রাকৃতিক বিধানে পরিণত হয়েছে। প্রথমে আসে 'সভ্যতা'র বিরুদ্ধে একটা মহান প্রতীকী হাতনাড়া— এই হাতনাড়া যে বুদ্ধিজীবীদের কাছে কত চিত্তাকর্ষক তা আমি জানি; তারপরে দেখা গেল আচম্বিতে পৌঁছে গেছেন শক্তিমদমত্ততায়, আর তারপরের ধাপই আডোলফ হিটলার। ...আমার স্থান যে সত্যি কোথায়, তা আমি এখন জানি — আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট ও স্পষ্টভবে জানি। কোনো মার্কসবাদী অশালীনতা আমাকে আর উত্যক্ত করতে পারবে না। আমি জানি যে কোনো লোককে কাণ্ডজ্ঞানসম্বল হবার জন্য বা স্নায়ুপীড়িত পশুত্বাচরণকে ঘৃণা করবার জন্য স্থূল 'জড়বাদী' হতে হয় না।

আমি যে কোনও ঢাকা না-রেখেই কথা বলেছি — এটা অশোভন; আবারও আপনার ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু আমি চাই যে আপনি জানুন আপনি সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির একজন যাকে 'অপর পক্ষে' হারালে আমি — এবং আরও অনেকে— ভীষণ কষ্ট পাব। আর এই মুহূর্তে যিনিই 'অপর পক্ষে'র সঙ্গে নিজের সমীকরণ করবেন, তিনিই চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য থেকে সরে যাবেন। আপনি, বলাই বাহুল্য, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমাদের বদলে ও-দলে কী পাবেন — এবং ওখানে কী বিপুল বিনিময় আপনাকে নিবেদন করা হবে; আমি যদি অত্যন্ত বাজে প্রবক্তা না-হই, তাহলে তা পরিণামে অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্রুপ হতে বাধ্য। কারণ এখনও যদি

কোনো কোনো মহান মানবাত্মা না-জানেন তাঁদের সত্যিকার স্থান কোথায়, ওখানে ওরা ভাল করেই এটা জানে যে কে ওদের দলের নয়: মানবাত্মা।

যে-কোনও উত্তর পেলেই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব।

ভবতীয়

ক্লাউস মান

ক্লাউস মান-এর স্পষ্টভাষী চিঠি কতগুলো ব্যাপারকে যে সোজাসুজি তুলে ধরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যেমন, কোনও রাজনৈতিক সাহিত্যের যুক্তিহীন কুশ্রীতার উল্‌টো জের হিসেবেই কি কারও পক্ষে বিপরীত দলে গিয়ে যোগ দেয়া উচিত? বা দলাদলি সাহিত্যের ও চিৎবৃত্তির অনুশীলনের পক্ষে অমঙ্গলকর, কিন্তু এই বোধ থেকে কি কারও একেবারে উলটো দলের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলানো উচিত? বাংলাদেশে যে এ-রকম দুঃজনক ডিগবাজি কখনও হয়নি। তা নয়। আজকের পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা কেবল বাক্‌ছল ছাড়া আর কিছুই নয়, এটা আমরা বুঝতে শিখেছি। অথচ ব্যক্তি হিসেবে, কেউ যদি নামগোত্রহীন হয়ে গিয়ে সমষ্টির একজন হয়ে পড়তে না-চান, কিংবা কারও যদি উল্‌টো-সোজা কোনো বিশ্বাসও না-থাকে, তখন?

গোটফ্রিড বেন তাঁর খোলা চিঠি রচনার কালে ভেবেছিলেন যে তিনি রাজনৈতিক নোংরামির মধ্যে কোনওদিন নামবেন না, যেহেতু সেটা তাঁর সত্যিকার স্থান নয়; সেই জন্যই খোলাখুলি তিনি বলেছেন যে তিনি কোনও পার্টির সদস্য নন—হতেও চান না। কিন্তু নাৎসি-হিস্টিরিয়া থেকে বেরুবার চেষ্টা করেননি বলে তাঁর পরিণাম হল মনস্তাপে ভরা। আর তাঁর খোলা চিঠি থেকেই তাঁর ভুলগুলো আমাদের চোখে পড়ে যায় — অথচ তাঁর শুদ্ধতা থাকে তর্কাতীত। যাবতীয় জাগতিক সমস্যাকে, মানবিক সমস্যাকে কেবল অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করেছিলেন বলেই বোধহয় এটা ঘটেছিল। তাঁর চিঠিটির বয়ান এখানে তুলে দেয়াই ভালো— পাঠক নিজেই কতগুলো জিনিস স্পষ্টভাবে সেখানে দেখতে পাবেন।

গোটফ্রিডবেন-এর খোলা চিঠি (১৯৩৩)

মার্সেইর আশেপাশে কোথাও থেকে আপনি আমাকে লিখেছেন। লিয় উপসাগরের ছোটো-ছোটো বসতি, ৎজুরিখ, প্রাহা, আর পারির হোটেলগুলোয়— আপনি লিখেছেন — তরুণ জর্মনরা— যারা একদিন আমার ও আমার বইয়ের ভক্ত ছিল, আর তারা উদ্বাস্তু; আপনি লিখেছেন, খবর-কাগজ পড়ে আপনাদের দেখতে হয় যে আমি নতুন রাষ্ট্রের তাঁবে আছে বলে ঘোষণা করেছি, দেখতে হয় যে একে আমি সর্বসমক্ষে সমর্থন করি ও বাঁচাবার চেষ্টা করি, দেখতে হয় যে আকাডেমি সদস্য হিসেবে আমি এর সাংস্কৃতিক পরিকল্পনাগুলোয় কোনও প্রতিবাদ করি না। আপনি — সুহৃদ হিসেবে — তার কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন এবং বেশ কড়া ভাষায়। আপনি লিখছেন: 'আপনার নাম আমাদের কাছে ছিল উচ্চমানের সমার্থক — তা মোটেই অন্ধতাময় শুচিবাতিকের দৃষ্টান্ত ছিল না — অথচ কীসের প্ররোচনায় আপনি আপনার নাম তাদের ব্যবহার করতে দিলেন, বাকি ইয়োরোপ যাদের একেবারে ত্যাগ করেছে? যে পুরোনো বন্ধুদের আপনি হারাচ্ছেন তাদের বদলে আপনি কাদের পাবেন ওখানে? আপনাকে ওখানে কে বুঝতে পারবে? আপনি হলেন, বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ সন্দেহভাজন — কেউ আপনাকে ওখানে স্বাগত জানাবে না।' আপনি আমাকে সাবধান করেছেন, হদিশ চেয়েছেন সব-কিছুর, দাবি করেছেন সদুত্তর, বাক্‌ছল নয়: 'এই মুহূর্তে যিনি 'অপর পক্ষে' থেকে যাবেন, তিনি চিরকালের মতো আমাদের হারাবেন', এই কথা বলেছেন আপনি। তাহলে দয়া করে আমার উত্তর শুনুন; বলাই বাহুল্য, এটা দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্টভাষণ।

এক, প্রথমেই আপনাকে বলা উচিত যে গত কয়েক সপ্তাহের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাকে নিঃসংশয় করেছে যে জার্মানির ঘটনাগুলোকে যারা জার্মানিতে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, কেবল তাঁদের সঙ্গেই

কোনওরকম আলোচনা সম্ভব। যাঁরা এই মাসগুলোর অস্থিরতা ও উত্তেজনার মধ্যে সারাক্ষণ কাটিয়েছেন, যাঁরা একেবারে কাছে থেকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এই অস্থিরতা ও উত্তেজনা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছেন, কুচকাওয়াজ থেকে কুচকাওয়াজ, বেতার প্রচার থেকে বেতার প্রচারে, খবরের টুকরো থেকে খবরের টুকরোর মধ্য দিয়ে যাঁরা এই অস্থিরতা বোধ করেছেন, — এমনকি যাঁরা এ-সবকে পরমাহ্লাদে অভিনন্দন জানাননি, বরং ঘা খেতে-খেতে সয়েছেন, কিন্তু কাছে ছিলেন— কেবল তাঁদের কাছেই সব কথা খুলে বলা যায় — কিন্তু যে-সব বাস্তুত্যাগী পালিয়ে গেছেন তাঁদের সঙ্গে নৈব নৈব চ। কারণ তাঁরা কাকে জনগণ বলে, এটা বোঝবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; জনগণের সব বোধ ও চেতনা থেকে তাঁরা আমূল বিচ্ছিন্ন — ধীরে ধীরে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে লোকের মধ্যে এই বোধ গজিয়েছে — চিন্তা হিসেবে নয়, নির্বস্তুক ভাবনা হিসেবে নয় — গজিয়েছে সংহত প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে। কাকে জাতীয়তাবাদ বলে তাকে দেখার সুযোগ তাঁরা হারিয়েছেন। যে-জাতীয়তাবাদকে আপনিও আপনার চিঠিতে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণ্যভাবে ব্যবহার করেছেন সেই জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব ধারার একটি অকৃত্রিম প্রাকৃতিক অবস্থা। অবয়বময়, মূর্তিময়, ইতিহাস কী করে একটা ট্র্যাজিক কিন্তু নিয়তিনির্দিষ্ট রূপ নেয়, তার প্রক্রিয়াকে দেখবার সুযোগ হারিয়েছেন তাঁরা। এবং এখানে আমি ঘটনাগুলোর জমকালো ও রমরমে দিকগুলোর কথা বলছি না, মশাল ও গানের বিশ্বধর্মী মোহসৃজনক্ষমতা সম্বন্ধে বলছি না — বলছি তার গভীর ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার কথা, তার সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতার কথা, যা এমনকী এই প্রাথমিক ও অস্থির পর্যবেক্ষকের কাছেও উদ্দীপক মানবিক রূপান্তর ঘটাতে চাচ্ছে।

একমাত্র এই কারণেই বোধহয় আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব না। কিন্তু আরেকটা সমস্যাতেও এসে এই অনুধাবনচেষ্টা হোঁচট খাবে — আপনাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক বছর ধরেই একটা তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিল, যেটা হঠাৎ এখন এমন হৃদয়হীনভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেকের কাছ থেকেই সোজাসুজি ও স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর চাচ্ছে। আমাদের আলোচনার সব চেয়ে ভাল দৃষ্টিকোণ হল 'বর্বরতা' কথাটাকে বিবেচনা করে দেখা — যে-কথাটা আপনার চিঠিতে — ও আমার-কাছে-আসা আরও অনেক চিঠিতে— বারে-বারে ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি ব্যাপারটাকে এমনভাবে দেখিয়েছেন যে জার্মানিতে এখন যা ঘটছে তা যেন সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করতে চাচ্ছে, চাচ্ছে সভ্যতারই সর্বনাশ, যেন এক দঙ্গল বর্বর জমায়েৎ হয়ে মানবতার আদর্শকে প্রচণ্ড ও উপর্যুপরি আঘাত ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু উল্টো আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে দিন: ইতিহাসের প্রবাহকে আপনারা কীভাবে দ্যাখেন? তাকে কি ফরাসি দেশের সমুদ্রতীরের স্নানার্থীদের মতোই বিশেষভাবে সক্রিয় বলে ভাবেন? যেমন ধরুন, আপনারা দ্বাদশ শতাব্দীকে কী চোখে দ্যাখেন — রোমানেস্ক থেকে গথিক ধরনের জীবনে এসে পৌঁছবার সেই জ্বলন্ত দিনগুলোকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেন আপনারা— এই রূপান্তর কি আলোচনানির্ভর ছিল? আপনি কি ভাবছেন যে যে-দেশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আপনি চিঠি লিখছেন তার উত্তর ভাগে কেউ-একটা নতুন স্থাপত্যরীতি ভেবে ফেলেছে, যা গম্বুজ সম্বন্ধে 'মনস্থির' করে ফেলেছে তা বর্তুল হবে না, বহুভুজ সম্বল হবে, না কি লোকে ভোট দিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে যে এর পর থেকে সব খিলেন গোল বা ছুঁচলোভাবে বানানো হবে? আমার মনে হয় ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি উপন্যাসপ্রতিম ভাবনাগুলো ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসকে একেবারে আদিম ও আবেগতাড়িত একটা অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক বিকাশ বলে ভাবলে ভালো করবেন। তোষাখানায় দাখিল-করা একটি হিসেব খাতা—এইভাবে উনিশশতকি বুর্জোয়া মস্তিষ্কপ্রসূত সৃষ্টিরূপে ইতিহাসকে দেখা ছেড়ে দিলে আপনি জর্মন ঘটনাগুলোর কাছাকাছি আসতে পারবেন বলে মনে হয় — আপনার কাছে সে-চিন্তাধারার কোনও ঋণ নেই, কিন্তু আপনারা তো তার কাছে বিকিয়ে বসে আছেন। ইতিহাস ভারী অদ্ভুত বস্তু — সে না জানে আপনাদের গণতন্ত্র, না জানে আপনাদের কষ্ট করে টিকিয়ে-রাখা যুক্তিবাদ; তার না আছে কোনো পূর্বকল্পিত পদ্ধতি, না আছে কোনো বিশেষ শৈলী — কেবল তার মোড় ফেরার মুহূর্ত ও বাঁকগুলোয় জাতির অনবসাদ গর্ভ থেকে প্রসব

করে এক নতুন মানব জাতিরূপ নিজের পথ যাকে নিজেকেই লড়াই করে নিতে হয়, যাকে উপার্জন ক'রে নিতে হয় তার নিজের যুগের ভাবনাকে, নিজেকে প্রবিষ্ট করাতে সব সময়ের গ্রন্থনার মধ্যে — জীবনের বিধান যা দাবি করে সেই অটল কর্মোদ্যোগ, ও যন্ত্রণাই তার সর্বস্ব। এটা আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি — এবং মানুষকে আমি যেভাবে দেখি তাতে তা হয়তো আরও বেশি আধিবিদ্যক। আর সেখানেই আমরা আমাদের পুরোনো বিরোধের একেবারে অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হলুম—যখন আমি যুক্তিহীনতার জন্য লড়াই করছি বলে আপনি আমাকে সোপর্দ করেছেন।

আপনার চিঠি অনুযায়ী ধাপগুলো এই রকম: 'প্রথমে কেউ যুক্তিহীনতার গুণগান করে, তারপরে বর্বরতার আর তারপরেই দ্যাখে যে আডোলফ হিটলারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।' এ-কথা আপনি এমন একটা সময়ে লিখেছেন যখন মানুষ সম্বন্ধে আপনাদের সুবিধাবাদী প্রগতিশীল ভাবনা দূরে-কাছে সবখানেই প্রকাশ্য দিবালোকে দেউলে হয়ে গিয়েছে; যখন এটা চারিদিকেই স্বতঃপ্রমাণ হয়ে উঠেছে যে এটা একটা অন্তঃসারশূন্য, চপল প্রমোদবিলাসী চিন্তাধারা, যখন এটা নিঃসংশয় যে মানব-ইতিহাসের কোনও সত্যিকার মহাযুগই কখনো মানবিক সারাৎসারকে যুক্তিহীনতা ছাড়া অন্য কোনওভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেনি — কারণ যুক্তিহীনতা মানেই হল সৃষ্টিমুহূর্তের নিকটবর্তী ও সৃজনক্ষম। আপনাদের ওই লাতিন বেলাভূমিতে বসে আপনারা কি শেষ মুহূর্তেও অনুধাবন করবেন না যে জার্মানির ঘটনাগুলো মোটেই রাজনীতির হাতসাফাই নয়, যাকে দুমড়ে-মুচড়ে কথা বলে সুপরিজ্ঞাত দ্বন্দ্বমূলক ধরনে মেরে ফেলা যাবে — বরং জার্মানির ঘটনাগুলো হল নতুন এক জীববিদ্যাসম্ভব জাতিরূপে উদ্ভব-ক্ষণ, ইতিহাসের একটা সম্ভাবনার স্ফূর্তি, নিজেকে উৎপন্ন করার জন্য জনগণের একটি উৎকাঙ্ক্ষা! এটা সত্যি যে এই প্রজনচিন্তার মধ্যকার মানবরূপ তাকেই গন্য করে যা যুক্তিবাদী হলেও, যেমন পৌরাণিক, তেমনি গভীর। এটাও সত্যি যে তার ভবিষ্যৎ ভাবা হচ্ছে প্রায় গুঁড়িশুদ্ধ ছেঁটে দিয়ে কলম ক'রে ফেলবার মতো করে — কারণ মানুষ ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও প্রাচীন আর আলোকপ্রাপ্ত, যা বিশ্বাস করেছিল তার চেয়েও শ্রেণীবিন্যস্ত। সত্যি যে তাকে প্রধানত প্রকৃতি হিসাবেই বিবেচনা করা হচ্ছে, সৃজনক্ষণের নিকটবর্তী বলে অনুভব করা হচ্ছে— কারণ এটা তো মানতেই হবে যে যতটা ভেবেছিলুম মানুষকে তার চেয়েও কম স্বাধীন বলে প্রত্যক্ষ করছি — অন্তত তথ্য ও সত্যের ২০০০ বছরের পুরোনো দ্বন্দ্ব মনে রেখে তাকালে যা দেখাত তার চেয়েও বেদনাদায়কভাবে সে অস্তিত্বের মূলের সঙ্গে জড়ানো। আসলে সে হল শাশ্বত চতুর্যোজী (quaternary) এমনকি অন্তিম তুষারযুগেও সে সুরম্যভাব বয়ন করে রেখেছিল দলবদ্ধভাবে ঘূর্ণ্যমান, মানবগোষ্ঠীর ইন্দ্রজাল, বিশ্বপ্লাবনকালীন চেতনার একটি গ্রন্থনা, 'টারশিয়ারি', যুগের টুকিটাকির সমষ্টি; বস্তুত সে হল চিরকালীন আদি পরাদৃষ্টি: জাগরণ, জাগরজীবন, সত্তা— সংগোপন সৃষ্টিশীল উন্মাদনার শিথিলগ্রথিত ছন্দ। আপনারা যারা সভ্যতার শৌখিন বাবুমশাই, প্রতীচী প্রগতির চারণকবি, আপনারা কি শেষমুহূর্তেও এটা অনুধাবন করবেন না যে এখানে যা বিপন্ন সেটা কোনো সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র নয় — বরং মানুষ্যজন্মের এক নতুন পরাদৃষ্টি — হয়তো তা প্রাচীনস্য প্রাচীন, হয়তো তা শ্বেত জাতির শেষ 'জমকালো' চেতনা — সম্ভবত মহাজাগতিক ঐক্যচেতনার এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, গ্যেটের নিসর্গস্তোত্রে যার পূর্বাভাস ছিল! এবং আপনারা কি এটাও মানবেন না যে কোনো সাফল্য, কোনো সামরিক বা শিল্প সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া এই পরাদৃষ্টির কী নিয়তি তা স্থির করতে পারবে না। যদি প্রাচী ও প্রতীচী থেকে এই জর্মন জাতিকে চূর্ণ করার জন্য দশ-দশটা যুদ্ধ বেধে যায়, যদি তার শীলমোহর ভেঙে ফেলে জলেস্থলে আপকালিপসও আসন্ন হয়, তবু মানুষের এই পরাদৃষ্টি আমাদের থেকেই যাবে— এবং যিনি তা সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের স্তরে উন্নীত করাতে চাইবেন না তাঁকেই এর প্রজয়িতা হতে হবে; এবং এত বড় বিধিসংগত ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কাছে সভ্যতা ও বর্বরতা সম্বন্ধে আপনার ভাষাতাত্ত্বিক তদন্ত শেষপর্যত হাস্যকর হয়ে ওঠে।

কিন্তু দর্শন ছেড়ে দিয়ে আমরা বরং রাজনীতির দিকেই তাকাই পরাদৃষ্টি ত্যাগ করে, বরং অভিজ্ঞতা

ও বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াই। তথ্য হল আপনার সৈকতে বসে আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাচ্ছেন কেন আমরা একটি রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সহযোগিতা করছি, যে রাষ্ট্র তার বিশ্বাসে অটল, যার নিষ্ঠা অনুপ্রাণিত; এবং যার আভ্যন্তরীণ ও বহির্পরিস্থিতি এতই ভীষণ যে তার নিয়তির কথা বর্ণনা করতে ইলিয়ড-এর পর ইলিয়াড, ইনিদ-এর পর ইনিদ লেগে যাবে। সব বৈদেশিক রাষ্ট্রের আগে আপনারা এই রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য যুদ্ধ, ধ্বংস, বিনাশ ও সর্বনাশ চাচ্ছেন। যে-জাতির ভাষা আপনাদের মুখে, যার বিদ্যালয়ে আপনারা লেখাপড়া করেছেন, যার জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্যের চর্চার দ্বারা আপনাদের মনকে সমৃদ্ধ করেছেন, যার মুদ্রাযন্ত্র আপনাদের গ্রন্থ মুদ্রণ করেছে, যার মঞ্চ উপস্থাপিত করেছে আপনাদের নাট্য সৃষ্টি, যে-জাতি আপনাদের খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে, যে-দেশের লোক সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আপনাদের রচনাবলি পড়ুক বলে আপনারা কামনা করেন, সে-দেশে ও সে-জাতির মধ্যে আপনারা যদি থেকে যেতেন তবে এই সময়েও সে-দেশ আপনাদের বিশেষ ক্ষতিসাধন করত বলে মনে হয় না। কাজেই আপনারা তাকিয়ে আছেন সেই সমুদ্রের দিকে, যার ঢেউ আর জল আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে— হয়তো কোনও মানোয়ারি জাহাজ নিগ্রো সেনাবাহিনী নিয়ে সেই সমুদ্রের কোথায়ও এখন বিচরণ করছে, কুখ্যাত ফরাসী *forces d'ourtremer* ৬০০০০০ ঔপনিবেশিক পল্টনেরই হয়তো এক অংশ রয়েছে সেই জাহাজে যারা জার্মানির বিরুদ্ধে অভিযানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অন্যরা হয়তো তাকিয়ে আছেন আর্চ অভ ট্রায়াম্ফ বা হ্রাডকানি কাস্‌ল-এর দিকে, এ-দেশের উপর প্রতিহিংসা নেবে বলে বদ্ধপরিকর; কেন—না, যাকে একযোগে এই বিপুল বিদেশ আত্মিকভাবে কেবল শোষণ করেই এসেছে এই জার্মানি তার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করা ছাড়া যেহেতু আর-কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করেনি।

চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে এখনই আপনি 'প্রকৃত মার্কসিস্ট হয়েছেন' —কিন্তু এখন 'অশালীন মার্কসবাদ' বা বস্তুবাদের কোনও নালিশ বা নিগ্রহই আপনাকে আমাদের 'স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণের' বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত করতে পারবে না; আরও : যে এখন আপনি পুরোপুরি 'মানবাত্মার' পক্ষে এবং 'রাজনৈতির প্রতিক্রিয়া'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কথাগুলোর দ্বারা আপনি যে কী বোঝাতে চাচ্ছেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না — মনে হচ্ছে যেন ভূবিদ্যায় উল্লিখিত কোনও বহুপ্রাচীন যুগের কথা শুনছি; হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাদের যে-দেশে মার্কসবাদ জিতে গেছে, আপনি সে-দেশের ২০০০০০০ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণের কথা বলছেন কি না। কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি আপনি সমাজবাদের কথা বলছেন, এবং সত্যিই, গত কয়েক বছরে জর্মন শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ বর্তমানে প্রবাসী অগ্রণী জার্মানির চিন্তানায়কদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে — সবচেয়ে অকৃত্রিম ও স্পষ্টভাবে এবং বারে-বারে টমাস মান দ্বারা। এ-সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে জার্মানির শ্রমিকরা আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। আপনি জানেন চিকিৎসক হিসেবে আমাকে নানাস্তরের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, সামাজিক বীমা চিকিৎসক হিসেবে বহু শ্রমিকের সঙ্গেও আমার চেনা আছে— প্রাক্তন কমিউনিস্ট ও সোস্যাল ডেমোক্রাটরাও আমার পরিচিত। সন্দেহ নেই— যেহেতু এদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি নিজে শুনেছি — তারা আগেকার চেয়ে অনেক ভাল আছে। কারখানায় আগের চেয়ে ঢের ভাল ব্যবহার পায় তারা, সুপারভাইজাররা আরো সতর্ক, কর্তৃপক্ষ অনেক ভদ্র; শ্রমিকদের ক্ষমতা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি, আগের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি সম্মান পায়, কাজ করে অনেক ভালো মেজাজে—সুনাগরিকের ভঙ্গিতে — এবং সোস্যালিস্ট পার্টি তাদের যা দিতে পারেনি এই জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ তাদের তা-ই দিয়েছে; দিয়েছে জীবনের একটা অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্যময় চালনশক্তির বোধ। এটাও নিশ্চিত জানবেন এই নবীন শক্তি দ্বারা শ্রমবিজয়ের অভিযান চলবেই, কারণ জর্মন জাতীয়তাবাদী সংঘ কোনো ক্ষণস্থায়ী, আগুনশ্বাসী অর্থসিংহ অর্ধছাপ কল্পনা নয়, আর পয়লা মে তারিখটা পুঁজিবাদীদের কোনো ছদ্মবেশী ধূর্তকৌশল বা ধাপ্পা নয়। জানেন

না এটা কত বড় দাগ কেটেছে, কী বিপুল এর অকৃত্রিমতা, হঠাৎ কাঁধের জোয়াল সরিয়ে ফেলছে শ্রমিক, গত দশকগুলোয় সর্বহারাদের দুঃখযন্ত্রণার যে শাস্তিমূলক বৈশিষ্ট্য ছিল—আচম্বিতে তা সবে গেছে এখন। তার বদলে বরং এই নতুন চেতনা দাঁড়িয়ে আছে একটি নবগঠিত শ্রেণীবিলোপকারী গোষ্ঠীর একেবারে বুনিয়াদের উপর। কয়েক দশক ধরে ইয়োরোপে সমাজবাদের যে-হাওয়া উঠেছিল, এই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ সেই চেতনার একটা স্পষ্ট, নবীন ও সতেজ চেহারা নিয়েছে। মানবাধিকারের অন্তত একটি অংশকে এই বছর নতুনভাবে ঘোষণা করেছে; আর আপনার 'রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া' কথাটার অর্থ যদি কোনওভাবে এই হয় যে আপনি শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থের জন্য লড়তে চাচ্ছেন, তাহলে আপনার উচিত এই নতুন রাষ্ট্রে এসে যোগ দেয়া — একে অবমানিত করা নয়।

সব শেষে অবিশ্যি আপনি ব্যক্তি হিসেবে আমাকেও সম্বোধন করেছেন। আমাকে প্রশ্ন করেছেন, সাবধান করেছেন, ভাষা সম্বধে আমার মৌলিক ধারণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্ধানী জিজ্ঞাসা উপস্থিত করেছেন — যে-মৌল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অপর পক্ষের ঠাট্টা-টিটকিরি আর-কিছুই জুটবে না; এবং আরও জিজ্ঞেস করেছেন যে এই মুহূর্তে 'আপনাদের দলে' আছেন এ-রকম ক-জন সাহিত্যস্রষ্টা সম্বন্ধে আমার কতটুকু শ্রদ্ধা আছে। এই আমার উত্তরঃ আলেমান ভাষায় যাঁকেই আমার আদর্শ ও শিক্ষণীয় বলে বোধ হয়েছে, তাঁকেই আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করে যাব; এমনকি লুগানো ও লিগুরিয়ান সমুদ্রের জলে ডুবতে ডুবতেও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। কিন্তু আমি, ব্যক্তিগতভাবে এই নতুন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজেকে যুক্ত করেছি, কেননা যেহেতু আমারই দেশের মানুষ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি কে, যে নিজেকে তাদের ভাগ্য থেকে আলাদা করে নেব? আমি কি বেশি জানি তাদের চেয়ে? না। আমি কেবল আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করতে পারি, কোন পথে গেলে ভালো হয় বলে দিতে পারি; আমি যদি হেরেও যাই, আমার সব চেষ্টাই যদি ব্যর্থ হয়, তবুও এরা আমারই দেশের মানুষ থেকে যাবে। আর দেশের মানুষ মানে অনেকখানি। আমার মেধা ও আর্থনীতিক অস্তিত্ব, আমার ভাষা, আমার জীবন, আমার যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক, আমার মস্তিষ্কের সমস্ত যোগফল—,সব আমি দেশের মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি। এই জনগণেই খুঁজে পাই আমাদের পূর্বপুরুষদের; জনগণের মধ্যেই ফিরে যায় আমাদের শিশুরা। আর আমি গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতির কোলে বড় হতে হতে জেনেছি— এবং এখনও জানি — 'স্বদেশ' বলতে সত্যি কী বোঝায়। বড় নগর, শিল্পায়ন, বুদ্ধির চর্চা — সময় আমার চিন্তার উপর যত ছায়াই ফ্যালে, আমার কাজের মধ্য দিয়ে শতাব্দীর যত শক্তির সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে— সব সত্ত্বেও তেমন মুহূর্ত মাঝেমাঝে আসে যখন এই যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন কোথায় মিলিয়ে যায়, শুধু থাকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঋতুর দল, মাটি পৃথিবী, সরল সাদাসিদে কথার টুকরোঃ মানুষ, জনগণ। আপনার মতে সারা পৃথিবী যাকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না, তারই সেবায় সেই জন্যই আমি নিজেকে নিয়োগ করেছি। আর, এই ইয়োরোপ! তার বড়-বড় অনেক মূল্যবোধ থাকতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে সে উৎকোচ দিতে পারে না বা গুলি মেরে চুপ করিয়ে দিতে পারে না, সেখানে তার চেহারা, সত্যিই, করুণা জাগায়। এখন সে আপনাদের কানে মন্ত্র দিচ্ছে যে হিটলার-এর পিছনে জনগণ নেই, আছে কেবল তার 'ভেড়ার পাল' — এই সেদিনও নিউজ ক্রনিক্‌ল-এ লেডি অক্সফোর্ড যে-কথা লিখেছেন। মস্ত ভুল! জনগণই এরা! হিটলার আর নাপোলিয়ঁ — এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বকে একবার তুলনা করে দেখুন। সন্দেহ নেই নাপোলিয়ঁ ছিলেন একটি অসামান্য প্রতিভা — ফরাসিরা দেশসুদ্ধ জনগণসুদ্ধু পিরামিড জয় করতে বেরোয়নি, তারা যে পলটনে সারা ইওরোপ ছেয়ে ফেলেছিল, তার কারণ অন্য কিছু নয়, কেবল সেই বিশাল সামরিক প্রতিভাই তাদের চালিত করেছিলেন। কিন্তু এখানে আজ আপনি বারে-বারে প্রশ্নটা মাথা চারা দিচ্ছে দেখতে পাবেনঃ হিটলারই আন্দোলনের স্রষ্টা, না কি তিনি আন্দোলনের সৃষ্টি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন — কারণ এই থেকেই বোঝা যায় উভয়কে মোটেই ভিন্ন করে দেখা যায় না — তারা অভেদ্য। এখানেই আমরা

সত্যি করে পাই ব্যক্তি আর সমষ্টির সেই ঐন্দ্রজালিক সমাপতন, বুর্খার্ট তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের নীরিক্ষায় বিশ্ব-ইতিহাসের প্রবাহের মধ্যে জগতের বিপুল ব্যক্তিত্বগুলির উপর যেটা আরোপ করেছেন। জগতের বিপুল ব্যক্তিত্ব — সব এখানে দেখা যাবে: জন্মমুহূর্তের ঝড়ঝাপটা, কেবল ভীষণ সময়েই প্রায় সর্বদা তাঁদের আবির্ভাব; সেই প্রচণ্ড সহ্যশক্তি; এমনকি জৈব দিকগুলি সব বৃত্তিরই এক অস্বভাবী উপযোগিতা; কিন্তু শুধু তা-ই নয়, এখানকার তাবৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির এই ধারণা যে এখানেই কেবল সেই ব্যক্তি আছেন, যিনি সমস্ত আবশ্যিককেই পূরণ করতে পারবেন এবং যা কিনা শুধু তাঁরই দ্বারা সম্ভব। আমি যা বলছি, শুনে রাখুন: আপনি এবং সব চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে চিন্তাশক্তিকেই আমি সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিই। 'চিন্তার দ্বারা যা স্বীকার্য নয়, তাকে তত্ত্বগত সম্মতি দিতে অস্বীকার করা একটা প্রচণ্ড ও প্রশংসনীয় জেদের পরিচায়ক'— হেগেল-এর এই কথাগুলো দিয়েই আমি সব সময় আমার রাজনৈতিক আবেগকে যাচাই করে দেখেছি। সেইজন্যই, নিজেকে প্রতারিত না-করে, বিশ্বাস করুন যে ইয়োরোপ আপনার কানে-কানে যা-ই বলুক, এই আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানুষ, যারা শান্তি ভালোবাসে, কাজ করতে উৎসুক, এবং দরকার হলে ধ্বংস হয়ে যেতে প্রস্তুত।

এমন-কিছু দিয়ে আমার কথা শেষ করছি যা আপনি দেশান্তরে — যদি এতদূর অবধি পড়ে থাকেন— নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন; আমি পার্টিতে নাম লেখাইনি, পার্টির নেতাদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই, এবং নতুন বন্ধুদের উপর আমি মোটেই নির্ভর করি না। আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে আমারই অন্ধতাময় শুচিবাতিক, আমারই চিন্তা ও অনুভূতির শুষ্কতা, যার কথা আপনার পত্রে উল্লেখ করে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। যাঁরাই ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই আপনি এরই বনিয়াদ দেখতে পাবেন। একজন বলেছেন, 'বিশ্ব-ইতিহাস মোটেই সুখের নয়' (ফিখ্‌টে); আরেকজন: 'ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা সর্বাধিকসম্ভব গোষ্ঠীসুখের কথা চিন্তা নাকরেই সব জাতি যেন কতগুলো জলজ্যান্ত প্রবণতাকে সামনে তুলে ধরে, (বুর্খার্ট); তৃতীয় একজন: 'মানুষের ক্রমবর্ধমান হ্রস্বীকরণই তাকে বলিষ্ঠতম কোনো জাতির প্রজননবিষয়ে ভাবাচ্ছে, এবং : 'কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির উদ্ভভ হতে পারে কেবল ভীষণ ও সংক্ষুব্ধ সূচনা থেকেই। সমস্যা: বিংশ শতাব্দীর সেই বর্বরেরা কোথায়' (নিট্‌ৎশে)। ব্যক্তিবাদী ও উদারনৈতিক যুগ এ-সব কতা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিল; তা ছাড়া ধীশক্তি ও মেধা দিয়ে একে দাবি হিসেবে গ্রহণ করা ও এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রত্যক্ষ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিপত্তি জেগে ওঠে আচম্বিতে, অতর্কিতে আঁটো হয়ে ওঠে সংঘ ও সম্প্রদায়, আর সবাইকেই, সাহিত্যিদের সুদ্ধু, ঠায় দাঁড়িয়ে বেছে নিতে হয় কী তিনি নেবেন — ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি, নাকি রাষ্ট্রাভিমুখী গতিপথ। আমি বেছে নিয়েছি শেষেরটাই — এবং এই রাষ্ট্রের জন্যই যদি আপনি আপনার সিন্ধুতীর থেকে বিদায় জানান, তাহলে তা আমি গ্রহণ করতে বাধ্য।

বেন-এর চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাউস মান-এর কতগুলো কথা তিনি সঠিক ধরতে পারেন নি। কারণ 'ক্লাউস মান লিখেছিলেন: 'জর্মন লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে 'মার্কসবাদী' শ্রেণির প্রতি আপনার ঘৃণা কত ভালো করে আমি বুঝতে পেরেছিলুম—কতবার আমি নিজেই তা আপনার সঙ্গে-সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে বোধ করেছি। কী দুর্বুদ্ধিতা এঁদের...সমাজতত্ত্বঘটিত উপকরণ দিয়ে এঁরা কিনা কবিতাকে বিচার করতে চান। কাউকে পীড়িত করার পক্ষে তা-ই ছিল যথেষ্ট— আর এঁদের হাতে আমার মতো নির্যাতিত ও নিপীড়িত আর কেউই হননি...।' ক্লাউস মান কেবল বলতে চেয়েছিলেন যে নাৎসিবাদকে আলিঙ্গন করার জন্য সেটা কোনও কারণই নয়: 'আগে জানতুম না, কিন্তু এখন স্পষ্ট করে জানি আমার সত্যিকার স্থান কোথায়। কোনও মার্কসবাদী অশ্লীলতাই আর আমাকে উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। কারণ আমি জানি যে কাণ্ডজ্ঞান যাকে সমর্থন করে তাকে আকাঙ্ক্ষা করার জন্য আর মনপ্রাণ দিয়ে কোনও স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণকে ঘৃণা করবার জন্য কাউকে কোনো স্থূল 'জড়বাদী' হতে হয় না।' এই

কথাগুলো সত্ত্বেও যেন ভেবেছিলেন ক্লাউস মান বুঝি কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। কিন্তু ক্লাউস মান যার উপর জোর দিয়েছিলেন সেটা কাণ্ডজ্ঞান, যুক্তিবোধ — কোনও মতবাদের প্রতি অন্ধ ও জড় অনুগত্য নয়।

আরও কতগুলো দিক লক্ষ করা যেতে পারে। মনে করার কোনও কারণ সেই যে বেন ছিলেন আপোগণ্ড নিঃসাড় মানুষ — তাঁর কবিতা ও রচনাবলি তার উল্টো সাক্ষী দেয়। এই তীব্র চিঠি থেকেই বোঝা যাবে হিটলারকে তাঁর মনে হয়েছিল জর্মন জাতির ত্রাণকর্তা। শুধু তাঁর নয়, তৎকালীন অনেক শিল্পীর। হ্বিলহেল্ম ফুর্টহ্যাঙলার, যিনি ছিলেন জার্মানির সিমফনি-অর্কেস্ট্রার সবচেয়ে সেরা 'কমপোজার' বা সংগীত-রচয়িতা রিখার্ড স্ট্রাউস নাৎসি-বর্বরতার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। গেরার্ট হাউপ্ট মান, আধুনিক নাটকের স্রষ্টাদের যিনি শীর্ষস্থানীয়, তিনিও তৎকালে জর্মন শাসকদের তাঁবেদারি করেছিলেন। জার্মানির সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক গুস্টাফ গ্রয়ন্ডগেন্স, 'ম্যাটিনি-আইডল' হেবারনের ক্রাউস, সবচেয়ে প্রিয় নক্ষত্র এমিল ইয়ানিঙস্—এঁরা প্রত্যেকে তা-ই করেছিলেন। হাউপ্টমান নিজে তো একদা ছিলেন মার্কসবাদেরই সমর্থক—তাঁর এই ডিগবাজি সবচেয়ে বিস্ময়কর। সবাই ধাপ্পায় ভুলেছিলেন? কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সোজা? তাহলে বেন-এর মন্ত্রমুগ্ধ, দ্ব্যর্থহীন, আবেগপ্লুত ও তীব্র চিঠিটিকেও আমাদের ধাপ্পা বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ইতিহাস অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে এটা মোটেই ধাপ্পা ছিল না—বা তাঁরা ধাপ্পায় ভোলেননি। বরং, সত্যি করে বলা ভালো, তাঁরা ভুল করেছিলেন। বেন-এর আত্মচরিত 'দুই জীবন'-এ তারই স্বীকৃতি লক্ষণীয়। বেন নাৎসি ছিলেন না। কোনওদিন পার্টিতে নাম লেখাননি, যতদূর জানা যায় স্বপ্নেও পার্টিতে যোগদান করার কথা ভাবেননি, ১৯৩৩-এ যখন প্রতিটি জর্মন দশ মিনিটি অন্তর নিজেদের নাৎসি বলে ঘোষণা করত, তখনও না — তবে কেন এই 'নতুন রাষ্ট্রের' জন্য তাঁর ঐকান্তিক ঘোষণা। তাঁর বন্ধুরা বলেন বামপন্থী সাহিত্যিকদের সাফল্য ও প্রভাবের সেটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বেন চিরকালই, জার্মানির চরম দুঃখের দিনেও, সাফল্য ও স্তবস্তুতির দিকে ফিরে তাকাননি। খানিকটা মারটিন লুথারের ভঙ্গি বোধ হয়: 'ইখ্ কান নিখ্ট আনডেরস'—'আমি অন্য রকম করতে পারতুম না'; ছিলেন লুথারীয় পাদ্রির ছেলে, লুথারেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কি তাঁর কথায়, যখন ক্লাউস মানকে তিনি বলেন: 'আমারই দেশের মানুষ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি কে, যে নিজেকে তাদের ভাগ্য থেকে আলাদ সর্বশক্তি দিয়ে তাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করতে পারি, কোন পথে গেলে ভাল হয় বলে দিতে পারি... দেশের মানুষ মানে অনেকখানি... ইয়োরোপের আপনার কানে কানে বলে দিয়ে যাচ্ছে জনগণ হিটলারের পিছনে নেই...মস্ত ভুল!... এই আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানুষ — এমনকি পিষে মরার জন্যও তারা প্রস্তুত...।' আর এই জন্যই, দেশের চরমতম দুর্দিনে, বেন সম্ভবত স্বদেশ ত্যাগ করতে পারে নি।

এই চিঠি গ্যেব্বেল নানাভাবে সম্প্রচার করলেন, বারে-বারে বেতারে তা শোনানো হল — এমনকী যেন যখন শিল্পীসত্তার জন্য নাৎসিদের হাতে নির্যাতিতও হচ্ছেন, তখনও।

এবং এইভাবেই কেটে গেল বারো বছর।

বেরলিনের পতনের পর জর্মন কবিতা-আকাডেমির প্রাক্তন সভাপতি হ্বালটের ফোন মোলো — তিনি নিজে একজন মাঝারি পর্যায়ের কবি — ক্যালিফরনিয়ার উপকূলে পত্রযোগে টমাস মানকে স্বদেশে ফেরবার আবেদন জানালেন। উত্তরে মান যা লিখেছিলেন, এই দ্বিতীয় ঐতিহাসিক চিঠি তাই। নিচে তার সম্পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করা হল।

টমাস মান-এর খোলা চিঠি (১৯৪৫)

প্রিয় হের ফোন মোলো,

আমার জন্মদিনে আপনি যে প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, তার জন্য—এবং জার্মানির খবর-কাগজে প্রকাশিত আমার উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠির জন্যও—আপনাকে ধন্যবাদ জানাই; আপনার

সেই খোলা চিঠি মার্কিন কাগজগুলোতেও অংশত পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ওই খোলা চিঠিতে আপনি অত্যন্ত জোরালো ও জরুরিভাবে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যে আমি যেন আবার জার্মানিতে ফিরে গিয়ে বসবাস করি, যেন 'বুদ্ধি পরামর্শ দিই ও কাজ করি' — প্রায় যেন একটা আনুষ্ঠানিক দাবিই করেছেন আপনি এই মর্মে। আপনি যে একাই আমাকে এই আবেদন করেছেন, তা নয়, শুনেছি, রুশ-নিয়ন্ত্রিত বেরলিন-বেতার ও জার্মানির সংযুক্ত গণতান্ত্রিক দলগুলির সরকারি মুখপাত্রও নাকি সেই আবেদনই জানিয়েছে; 'জার্মানিতে আমার নাকি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার আছে' — এ-রকম একটি বেশ অতিরঞ্জিত মস্ত উদ্দেশ্য চাপিয়ে তাঁরা যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কেবল আমার বইগুলোই নয়, ব্যক্তি ও মানুষ হিসেবে আমাকেও যে জার্মানি ফিরে চাচ্ছে এতে আমার সত্যি খুশি হওয়া উচিত। অথচ আমার যেন মনে হয় এ-সব আবেদনের মধ্যে কেমন একটা অস্থির-করা অস্বস্তিকর দিকও আছে — কী একটা আছে যা যুক্তিহীন, অসংগত ও কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। প্রিয় হের ফোন মোলো, আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন যে আমার দুর্ভাগা দেশের মানুষ নিজেদের উপর যে-আশাভরসাহীন দুর্বিপাক ডেকে এনেছে, তাতে ওই 'বুদ্ধিদান ও কর্মোদ্যোগ' ব্যাপারটার দাম আজ খুব চড়া। এই বিপন্ন সময়ে যার বুকের পেশি অবশেষ এই বুড়ো হাড়ে দাবি জানিয়েছে, তার পক্ষে সশরীরে ও ব্যক্তিগতভাবে আপনার দ্বারা স্পর্শাতুরভাবে বর্ণিত, ওই অসাড় ও পঙ্গু মানবতার মধ্যে, উপস্থিত থেকে তার কিছু করতে পারবেন কি না সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সেটা মূল কথা নয়। আমার ধারণা, আমার ফিরে যাবার পথে বাস্তব, সামাজিক ও নৈতিক বাধাগুলির কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার করে দেখা হয়নি।

এই বারো বছর, ও তার বিষময় পরিণামকে কি শ্লেটের গা থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়? যেন কোনও উৎপাতই ঘটেনি, এই ভঙ্গি করে সত্যি কোনও কাজ আমরা করতে পারব কি? আমার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ১৯৩৩-এ যে-ধাক্কা খেয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও শ্বাসরোধকারী — সব কদর্য ঘটনা, সব নির্বাসন ও বিতাড়ন, সব বহিষ্কারের মধ্যেও আমার বাড়িঘর, দেশ, বই, স্মারকচিহ্ন, সম্পত্তি সব আমার সঙ্গেই থেকে গিয়েছে। আমার হ্বাগনার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ম্যুনখেন-এ বেতারে ও খবর-কাগজে সুপরিকল্পিতভাবে যে-অশিক্ষিত, অশ্লীল ও জিঘাংসাপ্রণোদিত প্রচার চালানো হয়েছিল, তা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। আর সেটাই আমাকে প্রথম বুঝতে বাধ্য করেছিল যে ফেরার পথ রুদ্ধ; আত্মপ্রকাশের জন্য আমার সংগ্রাম, আমার লেখার চেষ্টা, উত্তর দেবার চেষ্টা, নিজেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা — সব ব্যর্থ হয়েছিল; আমার হারানো বন্ধুদের একজন — রেনে শিকেল — এই কণ্ঠরোধী একা বাণীগুলোকে 'তিমিরাচ্ছন্ন পত্রগুচ্ছ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তার পরে যা ঘটেছিল, তাও ছিল বেশ কঠিন; দেশ-দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনে, ছাড়পত্র ও কাগজ-পত্রের উদ্বেগ, হোটেলে-হোটেলে যাযাবর অস্তিত্ব, আর এরই মধ্যে রোজ, স্মারক্ষণ, লজ্জা ও ধিক্কারের একের পর এক কাহিনি কানে এসে পৌঁছাত — বর্বরযুগে ফিরে গেল আমার স্বদেশ, হারিয়ে গেল, একেবারে অচেনা হয়ে গেল। আপনারা যারা তখন গ্যেব্‌বেলসের নির্দেশে 'দৈবের দান ফ্যুরের'-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন (জঘন্য, জঘন্য এই বিহ্বল প্রচার) — তাঁরা কেউ এ-সবের মধ্য দিয়ে যায়নি। আমি ভুলিনি যে আপনারা আরও ভয়ংকর-কিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলুম; কিন্তু আপনি তো নির্বাসনের এই শ্বাসকষ্ট টের পাননি, আপনি তো টের পাননি সেই শিকড়ওপড়ানো স্নায়ু-কাঁপানো ভয়, বাড়ি না-থাকার ভয়।

মাঝে-মাঝে আমার মন বিদ্রোহ করেছে, বিশেষত যখন ভাবতুম আপনারা কী-সব সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন। এর ভিতর আমি দেখেছিলুম ঐক্যবোধের প্রত্যাখ্যান। যদি সেই সময় জার্মনির বুদ্ধিজীবী — যাঁদের নাম আছে, যাঁরা ছিলেন জগৎবিখ্যাত — প্রতিটি চিকিৎসক, গায়ক, শিক্ষক, লেখক ও শিল্পী এই পরম অবমাননার বিরুদ্ধে একটি আস্ত মানুষের মতো উঠে দাঁড়াতেন, যদি ঘোষণা করতেন এক

সাধারণ ধর্মঘট — তবে হয়তো ঘটনার স্রোত ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত। কিন্তু ইহুদি না-হলেই ব্যক্তিমানুষ সব সময়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে প্রলুব্ধ হতেন: 'কেন? অন্য-সবাই তো সহযোগিতা করছে। নিশ্চয়ই যতটা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়।'

বলেছি যে আমি মাঝে-মাঝে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করতুম। কিন্তু জানবেন, কোনওদিনই আমি আপনাদের ঈর্ষা করিনি — আপনারা যাঁরা জার্মানিতে থেকে গিয়েছিলেন, আপনাদের চরম সাফল্যের দিনেও আপনাদের আমি ঈর্ষা করিনি। কারণ আমি খুব ভালো করেই জানতুম যে এই তথাকথিত মহান দিনগুলো কেবল রক্তের বুদ্বুদ ছাড়া আর-কিছু নয়, এবং এই বুদ্বুদও যে অচিরেই ফেটে যাবে, তাও আমার জানা ছিল। আমি ঈর্ষা করতুম হেরমান হেসকে — যাঁর সঙ্গে প্রথম সপ্তাহ ও মাসগুলোয় আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলুম, যাঁর সঙ্গে থাকলে আমি সাহস ও সান্ত্বনা পেতুম। আমি তাঁকে ঈর্ষা করতুম, কারণ তিনি অনেকদিন স্বাধীন ছিলেন। এমন-এক ভিত্তিতে তিনি অনেক আগেই নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন, যা ছিল সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত: 'জর্মনরা যে মহান ও প্রতিপত্তিশালী জাতি, তা কে অস্বীকার করছে? পৃথিবীর অভিজাতদের দেশ? হবেও বা, কিন্তু রাজনৈতিক জাতি হিসেবে তারা একেবারেই অসম্ভব। সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে আমি কস্মিনকালেও কোনো সম্বন্ধ রাখতে চাই না।' দিব্যি নিরাপদে তিনি থাকতেন তাঁর মোনটাগনোলার বাড়িতে আর তাঁর অন্যমনস্ক অতিথিদের নিয়ে বাগানের মধ্যে 'বোচ্চিয়া' খেলতেন।

ধীরে-ধীরে, আবার আমার জীবনে সুস্থিরতা এল। আমি গুছিয়ে বসলুম। প্রথমে বাসা বাঁধলুম ফরাসিদেশে, পরে স্যুইটজারল্যান্ডে — ছিলুম সর্বস্বান্ত ও সম্পূর্ণ বিমূঢ়, ক্রমে ফিরে এল কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিতাবস্থা, ফিরে এল কোথা যে 'আছি' তার বোধ, বসবাসের প্রশান্তি। আবার হাতে তুলে নিলুম পরিত্যক্ত কাজ, এক সময়ে ভেবেছিলুম এ-সব কাজের কোনো মানেই নেই, পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা তাই সন্দেহ হয়েছিল একসময়। স্যুইটজারল্যান্ড ঐতিহ্যগতভাবেই অতিথিবৎসল, কিন্তু প্রবলতর প্রতিবেশিদের ভীতিপ্রদ চাপে সবসময় মার খায়, আর তাদের নিরপেক্ষতার বন্ধন প্রায় যেন নৈতিক বন্ধনে পৌঁছেছিল। ফলে এটা বেশ সুবোধ্য কেন সে সবসময় সংকুচিত লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন ছিল— কারণ কাগজপত্রহীন অতিথিটি তার নিজের দেশের সরকারের সঙ্গে এমন এক জঘন্য সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে সেক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবহার অত্যাবশ্যক। তারপরেই অবিশ্যি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এল, আর আচম্বিতে এই বিপুল মুক্ত দেশ — যেখানে আর সন্তর্পণ ব্যবহারের প্রশ্ন নেই, সেখানে — সব কিছু মুক্ত, নির্বোধ ও প্রাণখোলা বন্ধুতায় ভরা। সেখানে মূলমন্ত্র ছিল: 'ধন্যবাদ হিটলার সাহেব।' প্রিয় হের ফোন মোলো, এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে আমার এবং সেই সঙ্গে দায়িত্ব আছে সেই কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করার।

আজ আমি মার্কিন নাগরিক: জার্মানির ভীষণ পতন হবার অনেক আগেই আমি প্রকাশ্যে ও অন্তরঙ্গভাবে ঘোষণা করেছিলুম যে কোনওকালেই আমার মার্কিন মুলুক ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে নেই। আমার ছেলেমেয়েরা — আমার দুই ছেলে এখন মার্কিন পলটনে আছে — এই দেশের মাটিতে আত্মস্থ। আমার নাতি-নাতনিরা আমার আশপাশে ইংরেজি ভাষাতেই মানুষ হচ্ছে। আমিও নানাভাবে এ-দেশে নোঙরবদ্ধ, এবং এদিকে-ওদিকে আমার কতগুলো অবৈতানিক দায়িত্ব আছে — ওয়াশিংটনের প্রতি আছে, এ-দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যায়গুলির প্রতি আছে — তাঁরা আমাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছেন। আমার বাড়ি বানিয়েছি এই সুন্দর সমুদ্রতীরের দিকে — যে-তীর তাকিয়ে আছে দূরকালের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে — আর শক্তি, সুবুদ্ধি, প্রাচুর্য আর শান্তির এই আবহাওয়ার মধ্যে তারই একটি অংশ হিসেবে এই আশ্রয়ের মধ্যে আমার জীবনের সাধনায় ছেদ পড়ুক এটাই আমি চাই। খোলাখুলি বলি আপনাকে: নিয়তির চক্রে আমি যেটুকু সুযোগসুবিধে পেয়েছি, সেগুলি আমি কেন গ্রহণ করব না? বিশেষত যখন এত তিক্ততা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে? আমি বুঝতেই পারি না জর্মন জাতির কোন

সেবা আমি করতে পারব, যা এই ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে করা সম্ভব নয়।

যা-কিছু ঘটেছে, যেমনভাবে ঘটেছে, তা নিশ্চয়ই আমার কৃতকর্ম নয়। জর্মন চরিত্রেরই অনিবার্য ফল ওটা — জর্মন জাতির নিয়তি — এত বৈচিত্র্যময় যে জাতি, যে-জাতি প্রায় ট্র্যাজেডির মতো রহস্যময়, তার আরও-বেশি সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। এটা মেনে নিয়েই সবকিছুর ফলাফল নির্ণয় করতে হবে আমাদের, সবকিছুকেই সাধারণ বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না: 'ফিরে এসো, সব ক্ষমা করা হয়ে গেছে,' এ-রকম একটা কথা বলে সব ঝেড়ে ফেলা যায় না। ধর্মকথা বলা আমার ধাত নয়। বাইরে, বিদেশে বসে, ধর্মের পথ অনুসরণ করা আর হিটলার সম্বন্ধে সব বলে ফেলা খুবই সহজ ছিল আমাদের পক্ষে। আমি কারও উদ্দেশ্যেই ঢিল ছুড়তে চাই না। আমি লোকটা এমনিতে একটু চাপা, লাজুক, ছোটদের মতোই 'অচেনাকে ভয়' পাই। হ্যাঁ— জার্মানি এতদিনে আমার কাছে একেবারে বিদেশ হয়ে গেছে। ও একটা ভয়ংকর দেশ, মানতেই হবে। সত্যি করে বলি, আমি জার্মনির ধ্বংসস্তূপকে ভয় পাই — ধ্বংসস্তূপ— পাথরের আর মানুষের, সবকিছুর। আর আমার ভয়: যে-লোক স্যাবাথ-এর ডাইনির দিকে বাইরে থেকে তাকিয়েছে আর আপনারা যাঁরা ডাইনিদের সঙ্গে নৃত্য করেছেন এবং প্রভু দুরিয়ানের ধামা ধরেছেন — এ-দুয়ের মধ্যে মেলবার সূত্র কিছুই নেই। আমি যে নাড়া খাইনি, তা নয়— জার্মানি থেকে রোজ যে-সব লম্বা-লম্বা চিঠি আছে, দীর্ঘদিন-চাপা-দিয়ে-রাখা-প্রীতিতে ভরা একেকটা চিঠি, তখন নাড়া না-খেয়ে পারি কীভাবে? হৃদয়ের এই টানাপোড়েন খাঁটি এবং মর্মস্পর্শী, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আনন্দ অনেকটাই কমে যায় যখন ভাবি যে হিটলার জিতে গেলে এরা কেউই আমাকে চিঠি লিখতেন না। অধিকন্তু, এ-সব চিঠির লেখকরা বড়ই ভোঁতা আর সরল — এই জন্যই তাঁরা অমন চট করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন, যেন এই বারো বছরের (নাৎসি-শাসনের এই এক যুগের) কোনও অস্তিত্বই ছিল না। বইও পাঠানো হয় আমাকে। সত্যি বলব? তাদের দিকে তাকাতেই আমার ইচ্ছে করে না, প্রায় তক্ষুনি আমি তাদের পাশে সরিয়ে রাখি। হয়তো এটা কুসংস্কার, কিন্তু আমার মতে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে জার্মানিতে যে-সব বই ছাপা হয়েছিল, সে-সব অপাঠ্য জঞ্জাল স্পর্শেরও অযোগ্য। রক্তের ছিটে আর লজ্জার গন্ধ লেগে আছে তাদের গায়ে; এ-সব ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

জার্মানিতে তখন যা ঘটছিল তার মধ্যে বসে সংস্কৃতি 'ফলানো' নিষিদ্ধ ও অসম্ভব ছিল। তার মানে ছিল একটাই: সব কুকর্ম ও অপজন্মকে প্রশ্রয়দান। যে-সব যন্ত্রণা অনবরত ও অবিশ্রাম সহ্য করেছি, তার একটা এই বোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল যে চূড়ান্ত অধঃপাত ও দুরাচারিতার বর্ম ও রক্ষাকর্তা হিসেবেই জর্মন আত্মা ও শিল্প তখন নিজেকে উপস্থাপিত করছিল। এটা একেবারে কল্পনাতীত ঠেকে যে যে হিটালারের Bayreuth-এর জন্য হ্বাগনার মঞ্চসজ্জার সৃষ্টি করা ছাড়া আর-কোনো সম্মানজনক সৃষ্টিকর্ম খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটাকে চরম অনুভূতিহীনতা বলে মনে হয়। জর্মন রাইখ-এর জন্য চতুর সব বক্তৃতা মুখস্থ ক'রে গ্যেব্‌বেলসের অনুমতি নিয়ে হাঙারি বা অন্য-কোনও ইয়োরোপীয় দেশে গিয়ে 'কুলটুরপ্রপাগান্ডা'র উন্নতিসাধন করা — আমি বলি না যে এ না-করে কোনো উপায় ছিল, হয়তো না-করলে তিরস্কার ও শাস্তিও পেতে হত; আমি শুধু বলতে চাই যে আমি তা মোটেই বুঝতে পারি না। আর সেইসব লোকদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে ভাবতেই আমার গায়ে জ্বর আসে।

বেটোফেন বাজাবার জন্য হিটলার-কর্তৃক হুজুরিখ, পারি বা বুডাপেস্ট-এ প্রেরিত কোনো সংগীতনির্দেশক সেইজন্যই এই অশ্লীল ও জঘন্য মিথ্যাচারের জন্য দায়ী, যেহেতু তাঁর ছল ছিল তিনি একজন সংগীতসিল্পী এবং শুধু সংগীতই তাঁর বিবেচ্য বিষয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বদেশেই তখন তাঁর সংগীত মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। বেটোফেনের 'ফিডেলিয়ো' — যে-অপেরা ছিল জার্মানির মুক্তি উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত — যে কী করে ওই বারো বছরে জার্মানিতে নিষিদ্ধ হয় নি, তাই এক তাজ্জব কাণ্ড। এটা যে নিষিদ্ধ হয়নি, তা-ই ছিল ধিক্কারজনক ও কেলেঙ্কারির একশেষ — তার উপর

তার যে অতি পরিমার্জিত অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল, এবং তাতে গলা মেলাবার জন্য গায়ক পাওয়া গিয়েছিল, বাজাবার জন্য মিলেছিল যন্ত্রশিল্পী, আর লোক জুটেছিল শোনবার জন্য — এ সব তথ্য আমার মধ্যে একটা ন্যক্কারজনক অনুভূতি জাগায়। কারণ হিমলারের জার্মানিতে বসে-বসে— দু-হাতে মুখ ঢোকে হল থেকে বেরিয়ে না-গিয়েও — 'ফিডেলিয়ো' শোনবার মতো চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা আমি কল্পনা করতে পারি না।

আমার বিদেশ-হয়ে-যাওয়া, অচেনা-হয়ে যাওয়া মাতৃভূমি থেকে মার্কিন সার্জেন্ট আর লিউটেনান্টরা কত চিঠিই এনে দিয়েছেন আমাকে; কেবল যে নামজাদা লোকের চিঠি তা নয়, সাদাসিদে মানুষ, তরুণ যুবক সকলেই আমাকে লিখেছেন — আর, আশ্চর্য, এদের কোনওতেই আমাকে এক্ষুনি জার্মনিতে ফিরে যাবার জন্য উপরোধ করা হয়নি। 'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন', সে-সব চিঠির সোজা বয়ান, বাকি জীবনটা আপনার নবার্জিত সুখি স্বদেশেই কাটিয়ে দিন! এখানে জীবন দুঃখে ভরা...' শুধু দুঃখে ভরা? হায়রে, যদি তা-ই হত! কিন্তু আছে অপরিহার্য পাপ ও শত্রুতার অবিরাম প্রবাহ! একজন উচ্চপদস্থ নাৎসি অধ্যাপক এবং 'ডক্টর অনরিস কর্জা দ্বারা প্রকাশিত একটা কাগজের পুরোনো সংখ্যা (ফোল্ক্ ইম হেব্বরডেন, মার্চ ১৯৩৭, হানজেয়াটিশে ফেরলাগসানস্টান্ট, হামবুর্গ) পুরস্কার হিসেবে একজন মার্কিন আমাকে পাঠিয়েছেন। অধ্যাপকটির নাম KRIEG নয় Krieck - বানানে 'CK' আছে। পড়তে গিয়ে আতঙ্ক হচ্ছিল। বারো 'বছর ধরে এই ঝাঁঝালো আরক যাদের গেলানো হয়েছে, তাদের জীবন কিছুতেই আক সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। 'সন্দেহ নেই, সেখানে তোমার অনেক নবীন-প্রবীণ সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন', আমি মনে-মনে বলি, 'কিন্তু ঝোপে-ঝোপে নেকড়েও তো আছে কত — গুপ্ত শত্রু; হেরে গেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু জখম বলেই আরও ভয়ংকর ও বিষঢালা!'

এবং তবু, তৎসত্ত্বেও, প্রিয় হের ফোন মেলো, আপনি জানবেন এ-সবই হল কেবল একদিক। আরেকটা দিকও শোনা দরকার। যে-গভীর কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া জার্মানির বার্তার জন্য আমি অপেক্ষা করি এবং আমার কাছে তার যে-বৃহত্তর আবশ্যিকতা আছে বলে অনুভব করি, জার্মানির শোচনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নিয়তি সম্বন্ধে উদাসীন বিশ্বের আর-কোনও অঞ্চলের বার্তার জন্যই আমার সে-অপেক্ষা বা আকুলতা নেই। আর এই উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলই রোজ আমাকে নতুন করে বোঝায় যে সব সত্ত্বেও এক অবর্ণনীয় বন্ধনসূত্রে আমি সেই দেশের সঙ্গে যুক্ত, যে-দেশ একদিন আমার নাগরিকতাহরণ করেছিল। একজন মার্কিন বিশ্বনাগরিক? ভালো কথা। কিন্তু এই সত্য আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে এই বৈদেশিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমার সার্থক অনুরাগ সত্ত্বেও আমার শিকড় রয়েছে সেখানে — সব সত্ত্বেও আমি বেঁচে আছি ও সৃষ্টি করি জর্মন ঐতিহ্যেই, যদিও সমকাল আমাকে বহু ক্ষেত্রেই যা-কিছু জর্মন তার একটা দূরবর্তী প্রতিধ্বনি ও অসুস্থ প্যারডি ছাড়া আর কিছুই রচনা করতে দেয়নি।

জর্মন লেখক ছাড়া আর-কোনোভাবেই আমি নিজেকে ভাবতে পারি না — কোনওদিনই পারব না; এমনকি আমার রচনা যখন কেবল ইংরেজি তরজমাতেই টিকে ছিল, তখনও আমি আলেমান ভাষার প্রতি বিশ্বস্ত ও বশংবদ ছিলুম — তার কারণ শুধু এটাই নয় যে তখন যে ভাষা পাল্টাবার পক্ষে আমি বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছিলুম, তার প্রধান কারণ এটাই ছিল যে আমার রচনার সামান্য যা-কিছু মূল্য ও স্থান, আছে শুধু জর্মন সাহিত্যেরই ইতিহাসে। জামানির নিবিড়তম তমসায় বসে আমি রচনা করেছিলুম গ্যেটের উপর একটি উপন্যাস[৩], যার কয়েক কপি লুকিয়ে-চুরিয়ে চোরাই পথে জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল — সেটা কেবলমাত্র বিস্তৃতি, বর্জন বা আমাকে তাড়িয়ে দেবার দলিল নয়। এবং আপনাকে বোধহয় বলার দরকার নেই: দেখুন, আমি আমার শান্তির দিনগুলোর জন্য বড্ড অনুতপ্ত — আপনাদের সঙ্গে থেকে সব যন্ত্রণা ও মনস্তাপ সহ্য করা আমার পক্ষে ঢের মূল্যবান হত।' জার্মানি আমাকে কোনও দিনই শান্তিতে থাকতে দেয়নি। আমি 'আপনাদের সঙ্গেই যন্ত্রণা ও মনস্তাপ সয়েছি।'

এটা জানবেন যে বেন-এর চিঠিতে আমি যখন উৎকণ্ঠায় ছিঁড়ে যাবার কথা লিখেছিলুম, যখন যন্ত্রণা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কথা লিখেছিলুম, তখন এক বর্ণও বাড়িয়ে বলিনি — 'যা থেকে, চার বছর ধরে, এক ঘন্টার জন্যও আমার জীবন মুক্ত ছিল না এবং যার বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল কাজ চালাবার জন্য রোজ আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে!' মাঝে-মাঝে এমনকী কোনও দোটানাও ছিল না। জার্মানির উদ্দেশে কাকুতিমিনতিতে ভরা যে-পঞ্চাশ বা ততোধিক বেতার ভাষণ প্রচার করেছিলুম — যা এখন সুইডেনে ছাপা হচ্ছে — তারাই সাক্ষী দেবে যে সবসময়েই 'শিল্পকলা' বা আর্ট ছাড়াও অন্য - কিছু আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি ও অব্যবহিত বলে মনে হয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে 'জার্মানি ও জর্মন জাতি' সম্বন্ধে একটা ভাষণ দিয়েছিলুম। লিখেছিলুম আলেমান ভাষাতেই, লেখাটা *নয়ে রুন্ডশাউ*-র (৪৫-এর জুন মাসে যার পুনর্জন্ম হয়েছে) আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এ-সব জার্মানিতে ঘটলো কেন ও কীভাবে সম্ভব হল — ভাষণটায় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষিত মার্কিনদের শুধু তা-ই দেখবার চেষ্টা ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেভাবে তাঁরা আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন, তাতে তাঁদের নীরব ঔৎসুক্যের প্রশংসা না করে আমি পারি না। দৃষ্টিকটু ক্ষমাপ্রার্থনা ও ততোধিক দৃষ্টিকটু দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা — এই দুয়ের মধ্যে আমার পথ খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু কোনোক্রমে ব্যাপারটা সামলেছিলুম। প্রায়ই যে পৃথিবীতে অমঙ্গলের মধ্যে থেকে মঙ্গলে বেরিয়ে আসে, এই দিব্য তথ্যের সঙ্গে -সঙ্গে এই শয়তানি-তথ্যের কথাও আমি বলেছিলুম যে মাঝে-মাঝে শুভ্রবোধের মধ্যে থেকেও গজিয়ে ওঠে পাপ। আমি সংক্ষেপে জর্মন আত্মার কাহিনি শুনিয়েছিলুম তাঁদের। 'আসলে জার্মানি দুটো আছে, একটা সৎ আর অপরটি অসৎ' — এই তত্ত্বের আমি প্রতিবাদ করেছিলুম। অসৎ জার্মান হচ্ছে — আমি বলেছিলুম — সেই সৎ জার্মানি যে ব্যর্থ হয়েছে, যে পাপরোধে পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত; অসৎ জার্মানি হচ্ছে সৎ জার্মনিরই অমঙ্গলদীর্ণ অধঃপতিত রূপ। বলেছিলুম যে, আমি আত্মশ্লাঘা করার জন্য এ-কথা বলছি না— আত্মপ্রশংসার জঘন্য রীতি অনুযায়ী সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, মহান ও শুভ্রবসন জার্মানির প্রতিনিধি হিসেবে এ-কথা বলছি না। শ্রোতাদের যা বলতে চাচ্ছিলুম, তার কিছুই বহিরাগত কোনো ঠাণ্ডা হিম নিরপেক্ষ প্রজ্ঞা থেকে উত্থিত হয়নি। তার প্রতিটি কথা ছিল আমারই কথা — আমারই অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে উত্থিত — এ-সবই ছিল আমার নিজের অভিজ্ঞতার অংশ।

হয়তো যাকে বলে নিশ্চিদ্র ঐক্যের ঘোষণা, এটা তাই: কিন্তু এই মুহূর্তে এই ঘোষণা করা ছিল সবচেয়ে কঠিন। জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের সঙ্গে আমি একাত্মবোধ করিনি, আমি নিজেকে এক ক'রে দেখিয়েছিলুম সেই জার্মানির সঙ্গে যে-প্রলুব্ধ জার্মানি শেষপর্যন্ত শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। জার্মানির ঐতিহ্যের মধ্যেই শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করার একটা গভীর প্রলোভন রয়ে গেছে, এবং গত কয়েক বছরের যন্ত্রণার উপর গড়ে-ওঠা কোনও আলেমান উপন্যাসে[৪] এই ভীষণ চুক্তিকেই বিষয় করে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আমাদের মহত্তম কাব্যবাণীতে[৫] শয়তান শেষপর্যন্ত ঠকে গিয়েছিল — এমনকী ফাউস্টের ব্যক্তিসত্তাকেও সে হারিয়ে বসেছিল; এবং আমরা এই ভাবনাকে যেন সজোরে প্রত্যাখ্যান করি যে এবারই শেষবারের মতো জার্মানি শয়তানের কবলিত হল, ঐশী করুণা আরও-উচুঁ বিধান — পৃথিবীর যে-কোনও রক্তে-লেখা চুক্তির চেয়েও মহান আমি ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস করি, আমি আস্থা রাখি জার্মানির ভবিষ্যতের উপর: বর্তমান মুহূর্তকে যত হতাশ মরীয়া ও অসহায়ই ঠেকুক না কেন, ধ্বংসস্তূপকে যত হতাশ্বাসই মনে হোক না কেন, আমরা যেন কিছুতেই না বলি যে জর্মন ইতিহাসের শেষ হয়ে গেছে। জার্মনি যেন কিছুতেই সেই ক্ষুদ্র ও তামসকাহিনির সঙ্গে নিজেকে এক করে না-দেখে যার নাম আডোলফ হিটলার। প্রশো-জর্মন রাইখ-এর বিসমার্কীয় যুগের সঙ্গে যেন তাকে এক করে না দেখা হয়, যার নিজের আয়ুষ্কাল ছিল অতি অল্প। এবং মহান ফ্রেডেরিকের যুগের দুই শতাব্দীর সঙ্গেও যেন তাকে একীভূত করে না দেখা হয়। জার্মনি কেবল নতুন আকার, নতুন অবয়ব নেবার

প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এখন, বার করতে চাচ্ছে জীবনের একটা নবীন ভঙ্গি — যা হয়তো রূপান্তর ও সন্ধিক্ষণের প্রথম দুর্দশা কেটে গেলে প্রকৃত সুখসম্মানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, হয়তো জাতির গভীরতম প্রবণতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে আগের চেয়েও সৃষ্টিশীলভাবে সাধিত হবে তার সংগতি।

এখানেই কি বিশ্ব-ইতিহাসের শেষ হয়ে গেল বলে ভাবছেন? আমরা এখন বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে সক্রিয় যুগে আছে — আর জার্মানির ভবিষ্যৎও তারই সঙ্গে জড়ানো। অনবচ্ছিন্ন চলেছে ক্ষমতার লড়াই, আর তা-ই আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে যে আমরা কেন অতিরিক্ত-কিছু প্রত্যাশা না-করি। কিন্তু তার মধ্যে এই আশাও কি নেই যে সব বেদনা মনস্তাপ ও বাধ্যতা — অনিশ্চিত ভাবে হলেও—এমন-এক বিশ্বপরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হবে যেখানে উনিশশতকি জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ কালক্রমে একদিন সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে? একটি বিশ্বআর্থনীতিক ব্যবস্থা, জাতীয় ভেদ-চালিত সীমার ক্রমক্ষীণতা, রাষ্ট্র হিসেবে প্রত্যেকটির কিয়ৎপরিমাণ 'রাজনীতিদাসত্ব অস্বীকার', ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এক অকপট ঐক্যচেতনায় মানবজাতির জাগরণ — একটিমাত্র বিশ্বরাষ্ট্রের চেতনার পশ্চাদ্বর্তী যে প্রথম মানবিক চিন্তাধারা — বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেতনার চেয়ে বহু অগ্রবর্তী এতসব 'সমাজবাদী মানবতা' এবং আমাদের কালের যা মহত্তম চিন্তাসূত্র-তা কী করে জর্মন আত্মার কাছে বৈদেশিক ও বিসংগত, এবং সেইজন্যই প্রতিবাদযোগ্য, ঠেকতে পারে? জার্মানির বর্হির্বিশ্ব বিষয়ে আতঙ্কের মধ্যেই ছিল বড্ড বেশি বিশ্বরোধ। কে একে অস্বীকার করতে পারবেন যে এই একাকিত্বের পিছনে — যে-একাকিত্বের জন্য দায়ী তার সব দুষ্ক্রিয়া— আছে ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাবার উৎকাঙ্ক্ষা। জার্মানিতে মিথ্যাগর্ব, বিদ্বেষবোধ ও অহংবোধ ত্যাগ করতে দাও, আবার সে ফিরে পাক তার ভালোবাসা, তখন সবাই তাকে ভালোবাসবে। কারণ, সব সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে জার্মান জাতির প্রাচুর্য ও মূল্যবোধ অসামান্য — জার্মানি এমন এক দেশ যে তার জনগণের ক্ষমতায় ও জগতের সাহায্যের উপর আস্থা রাখতে পারে, এবং যার কাছে এই সাম্প্রতিক দুঃসময় কেটে গেলেই সফল কীর্তি ও বিপুল সম্মানে ভরা এক নবজন্ম আসবে।

প্রিয় হের ফোন মোলো, এই চিঠিতে আমি অনেকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি। অবশ্য জার্মানির উদ্দেশে লেখা কোনও চিঠিতে অনেক কথা না-পেড়েও কোনো উপায় নেই। আমি কেবল আরেকটা কথা বলতে চাই। মার্কিনদেশে আমার আরামে-ভরা অলসজীবন সত্ত্বেও এ-স্বপ্ন আমার দিনরাত্রির সর্বক্ষণের, যে পায়ের তলায় অনুভব করছি পুরনো মহাদেশের মাটি। যখন সময় হবে — যদি আমি বেঁচে থাকি এবং যাতায়াতব্যবস্তার ও কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র মেলে — আমি ফিরে যাবার আশা রাখি। একবার ফিরে গেলে — বহিরাগত বোধ করার ভয় ও অমুভূতি যা এই বারো বছরে গড়ে উঠেছে— বোধহয় সেই টানকে ঠেকাতে পারবে না যার পিছনে আছে হাজার বছরের স্মৃতি। সেইজন্যই, যদি ঈশ্বর করেন, 'আউফ্ হ্বিডের জেহেন' — পুনর্দর্শনায় চ।

এই চিঠিকে ভুল বোঝার অনেক কারণ ছিল জার্মানির — এবং তৎকালীন জার্মানিতে একটি বিপুল জনমত মান-এর প্রতি কটূক্তি ও ধিক্কারে ভরে গিয়েছিল। কেননা যে-বারো বছরের বিভীষিকা। জার্মানি তখন ভুলে যেতে চাচ্ছিল, মান কেবল তাকেই খুঁচিয়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু এ-ছাড়াও এখানে কতগুলো দ্ব্যর্থহীন কথা আছে, যা কলাকৈবল্যবাদী বা শুচিবাতিকগ্রস্তদের মনঃপূত হবার কথা নয়। যেমন মান কল্পনাই করতে পারেননি কী করে তখন জার্মানিতে বেটোফেনের মুক্তিপিপাসু অপেরা 'ফিডেলিয়ো'র অত্যন্ত 'সফিস্টিকেটেড' অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল ও শ্রোতা জুটেছিল। তার কাছে পুরো শিল্পচর্চার প্রহসনটাই *ঠেকেছিল* ন্যক্কারজনক। মান যে বারে-বারে বেতারভাষনে জর্মন জনগণকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, *জার্মানি, শোন* গ্রন্থে যে-ভাষণগুলো পরে সংকলিত হয়েছিল, তা, মান বলেছেন, তাঁর সেই বোধেরই সাক্ষী যা বোঝাবে যে আর্টের চেয়ে জরুরি ও অব্যবহিত

কোনও-কিছু পৃথিবীতে আছে বলে তিনি ভাবতেন। জানি, এই কথা অনেকের পক্ষেই অরুচিকর ঠেকবে—বরং মানুষের দুর্দশার সঙ্গে শিল্পের ও শিল্পীর কোনো সংস্রবই নেই, এই কথা বললেই অনেকের পক্ষেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কারণ হয়, তবু তাঁরা যেহেতু কথায়-কথায় বহুবার মান-এর নামে কলাকৈবল্যবাদের প্রচারকর্ম চালিয়েছেন সেইজন্য এখানে এই চিঠি আদ্যোপান্ত উদ্ধার করা জরুরি বলে মনে হল। এই চিঠির জন্য অনবরত মান-এর বিরুদ্ধে যখন আরেক দফা অপপ্রচার চলেছিল, তখন বাধ্য হয়ে মান-কে বেতার মারফত নিজের বক্তব্য আরও আঁটো করে ও সোজাসুজি প্রকাশ করতে হয়। মান-এর সেই বেতারভাষণও এখানে শোনা যায় — এই জন্যই শোনা যাক যে মান এই শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষা, যিনি বহুবার ব্যক্তি ও সভ্যতার ভাঙনকে নিজের রচনার বিষয় করেছেন।

টমাস মানের বেতার ভাষণ (১৯৪৫)

...ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত এবং উত্তরকালই বলবে যে তা যুক্তিযুক্ত ছিল।

দেখে মনে হচ্ছে, জার্মানিতে থেকে যেমন, না-থেকেও তেমনি কেউ সোহংবাদের পরিচয় দিতে পারেন। মার্কিন সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকারে জগতের প্রমোদ বিতরণের জন্য রিথার্ড স্ট্রাউস যে-পর্বতপ্রতিম নিঃসাড়তার পরিচয় দিয়েছেন, আমি তা থেকে অনেক দূরে বাস করি। শয়তানের বরপুত্র যে জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ, তা আমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে— জীবনে এই প্রথমবার আমি ঘৃণা করতে শিখলুম — অকৃত্রিম, গভীর, অকথ্য ও মারাত্মক এক ঘৃণা—এমন এক ঘৃণা যা আমি আধিদৈবিকভাবে অনুভব করি, এবং তা যে ঘটনাস্রোতের উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি, তা নয়। একেবারে প্রথম দিন থেকেই আমি এই অমঙ্গলের পতন ঘটাবার জন্য চেষ্টা করে এসেছি—কেবল যে জার্মানির উদ্দেশে প্রচারিত আমার বেতারভাষমের মধ্য দিয়ে, তা নয়; আর এই আপদের হাত থেকে জর্মন জাতি যাতে নিজেরাই নিজেদেরই উদ্ধার করে, আমার ভাষণগুলির মধ্যে ছিল তারই একমাত্র অকপট আবেদন। কিন্তু, অন্য সবকিছুর সঙ্গে-সঙ্গে আমার সেই ভাষণের পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেন আপনারা? যে আমাকে বলবামাত্র আমি ফিরে আসব? আর কখন বলা হচ্ছে? যখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরা! কীভাবে যে বছরের পর বছর স্যুইজারলান্ডের অতিথি হিসেবে কাটাতে কাটাতে আমি তার স্বপ্ন দেখেছি, বাড়ি ফেরার প্রত্যাশা করেছি— কী গভীর অগ্রহের সঙ্গে আমি প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি চিহ্ন গ্রহণ করেছি, আর ভেবেছি বুঝি অবশেষে জার্মানির অধঃপাত ও ভিমরতি কেটে গেল! নিজেকে মুক্ত করবার ভার যদি জার্মানিরই থাকত, তাহলে সবকিছু কেমন ভিন্নরকম হত! যদি ১৯৩৩ থেকে '৩৯-এর মধ্যে আপনাদের মধ্যে মুক্তিবিপ্লব ফেটে পড়ত, আপনারা কি ভাবছেন যে আমি তক্ষুনি প্রথম স্বদেশগামী ট্রেনে চেপে বসতুম না।

তা হয়নি, হতে পারেনি! অসম্ভব ছিল— প্রতিটি জর্মন বলছেন এ-কথা — আর আমার নিশ্চয়ই সে-কথা বিশ্বাস করা উচিত। এটা হতেই পারে যে সাত কোটি অতি সুসভ্য ব্যক্তি, কতগুলো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, ছ-বছরের জন্য একটা রক্তাপ্লুত বর্বরতা রাজত্বকালকে মেনে না নিয়ে পারেনি—হতেই পারে যে যেটা আত্মার অন্তঃস্তলে অরুচির ঠেকছিল এবং যাকে চূড়ান্ত উন্মত্ততা বলে জেনেছিল, সেই যুদ্ধে সেই বর্বরতা অনুসরণ না করে কোনও উপায় ছিল না! এবং এই একই মানুষ — সেই সাত কোটি মানুষই — আরও ছ-বছর ধরে তার চূড়ান্ত করেছে, কাজে খাটিয়েছে তার উদ্ভাবনীশক্তি, সাহস, বুদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ, সামরিক ক্ষমতা — তার সমস্ত, যাতে সেই বর্বর রাজত্বকাল জিতে যায় এবং অমরত্বকে স্পর্শ করে। তা-ই ছিল নিয়তিনির্দিষ্ট, আর আমার মতো লোকের কাকুতিমিনতি তাই একেবারে নিষ্ফল হয়েছিল। 'আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের' একজন সদস্য, ফ্র্যাঙ্ক টিস বলে কজন লেখক বলছেন, 'অন্ধরা শুনতে চাচ্ছিল না, আর জ্ঞানবৃদ্ধরা মুখের কথা খসাবার আগেই সব সময় এক পা এগিয়ে যাচ্ছিলেন'

— বলেছেন অবশ্যি একেবারে শেষের দিকে। এই ছিল জার্মানির অবস্থা। সারা ইয়োরোপকে সে নির্যাতিত করেছে, আর অবশিষ্ট পৃথিবীর একাধিক ছিন্নভিন্ন হৃদয় সেই সময় আমার·এই অকেজো ভাষণায় সান্ত্বনা পেয়েছে — কাজেই আমার কোনও খেদ নেই। কিন্তু, জার্মানির কাছে আমার এই সব আবেদন-নিবেদন যতই অর্থহীন ঠেকুক না কেন, তা নিশ্চয়ই আমার জার্মানিতে ফিরে যাবার বাধ্যতামূলক কারণ হতে পারে না। 'আপনি, মশাই, ভান করছেন যেন জর্মন জাতির আধ্যাত্মিক নেতা,' এই তো বলা হচ্ছে ওখানে, 'তা বেশ, আসুন, এই জনগণের মধ্যে বাস করুন, বাঁচুন। কেবল মুখে তাদের যন্ত্রণার শরিক হয়ে কী করবেন, এই যন্ত্রণার হাত থেকে তাদের মুক্তি দিন, আর যে-বিদেশিরা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।'

কিন্তু কোথায় জার্মানি, কোনখানে? কোথায় পাব তাকে— কেবল ভূগোলের মধ্যে, মানচিত্রে? কোনও একক হিসেবেই যার অস্তিত্ব নেই, সেই পিতৃভূমিতে কেউ ফেরে কী করে? ছিন্নভিন্ন একটা দেশ, ভিন্ন-ভিন্ন দখলিকৃত এলাকায় ভাগ-করা, যার একটার খবর আরেকটা অংশ রাখে না। রুশদের কাছে যাব, না কি ফরাসিদের কাছে? না কি ইংরেজদের কাছে? না কি আমার সহনাগরিক মার্কিনদের কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইব তাদের বেয়নেটের আশ্রয় যেন আমাকে জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের হাত থেকে বাঁচায় — যে নাৎসিবাদ এখন গোর দেয়া দূরে থাক আমাদের সৈন্যদের সুদ্ধু নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে? আমি কি — নানা ক্ষেত্রে যেরকম ঔদ্ধত্য ও বিবেচনাহীনতা দেখানো ও তারিফ করা হচ্ছে সে-রকমভাবে — জার্মানির দুঃযন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব, দখলকারী শক্তিদের আঙুল দিয়ে দেখাবো যে জার্মানির সঙ্গে ব্যবহারে ও শাসনব্যবস্থায় তারা একের পর এক ভুল করছে? কেবল এই কর্মই আমার দ্বারা হবে না। জর্মন হিসেবে একজন জর্মনকে কিছু বলবার দাবি ও সামর্থ্য ছিল আমার, জার্মানির আসন্ন বিনাশ সম্বন্ধে সাবধানে করে দেবার ক্ষমতা ছিল। যা-কিছু জর্মন তা এক বিষম জাতীয় পাপবোধ আক্রান্ত হয়ে আছে, জর্মন হিসেবে এ-কথা আমি গভীরভাবে বোধ করি বলেই আমি বিজেতাদের নীতির সমালোচনা করার স্বাধীনতা রাখি না, কারণ আমার সমালোচনাকে সব সময়েই আত্মকেন্দ্রিক স্বাদেশিকতার নজির বলে অন্তরাখ্যাত করা হবে আর অন্য জাতিদের উপর জার্মানি বছরের পর বছর যে বিপুল দুর্দশা চাপিয়েছে, তার প্রতি নিঃসানড় বলে চিহ্নিত করা হবে। জার্মানির সর্বত্র এক পর্বতপ্রমাণ ঘৃণার প্রতিষ্ঠা দেখে যে একবার বিভীষিকা দেখেছিল, এবং যে অনেক আগেই এই বিনিদ্র যামিনীগুলি আন্দাজ করে কল্পনা করবার চেষ্টা করেছেন নাৎসি বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার কী ভীষণভাবে জার্মানির উপরেই ডিগবাজি খেয়ে ফিরে আসবে, সে এখন রুশ চেক ও পোল জাতির বৈরি নির্যাতনের নমুনা দেখে স্বদেশপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে হাত মোচড়াতে পারে না! জার্মানি নিজে যে-দুষ্কর্মের হোতা ছিল, এটা তারই এক যান্ত্রিক ও অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া — যার জন্য এখন একটা গোটা জাতি শাস্তি পাচ্ছে, এবং যেখানে এখন একেকটা প্রাতিস্বিক ন্যায়বিচার বা ব্যক্তিগত অপরাধ বা নির্দোষিতা — দুর্ভাগ্যবশত — মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এখন থেকে ইয়োরোপকে সাহায্য করা, অনাহার মৃত্যু থেকে জর্মন শিশুকে বাঁচাবার চেষ্টা, জর্মন-ভাগ্যকে নমনীয় করার উত্তেজিত চেষ্টার চেয়ে অনেক ভালো — হয়তো ওই উত্তেজনা থেকে আবার নির্বোধভাবে জর্মন জাতীয়তাবাদ গজিয়ে উঠবে। কারণ, আমি নিজে জাতীয়তাবাদী নই। আপনারা তা ক্ষমাই করুন আর না-ই করুন, জার্মানি যখন অন্যান্য দেশকে নিপীড়ন করছিল তখনও আমি কষ্ট পেয়েছি — উল্টোদিকে এখনও কষ্ট পাচ্ছি জার্মানির দুর্দশায়। আর আমার বিদেশে বাস-করা সম্বন্ধে বলি: আমাকে পরদেশি করে তোলবার জন্য আমার দেশ আমাকে যত সময় দিয়েছে তাতে কেবল সমর্পণের ভঙ্গিতে আমি যে নিজেকে অভ্যস্তই ক'রে নিয়েছি তা নয় — অকপটভাবে এটাও মেনে নিয়েছি যে এই ভবিতব্য বিধানই বুঝি সবচেয়ে ভালো হল। অতীতে আমি অধীরভাবে বাড়ি ফেরার জন্য প্রতীক্ষা করতুম। সেদিন হঠাৎ একটা পুরোনো চিঠি চোখে পড়ে গেল — সেই ১৯৪১-এ আমার

এক হাঙ্গারীয় বন্ধুকে লেখা সে-চিঠিতে আমি বলেছিলুম: 'নির্বাসন ক্রমেই অতীতের চেয়ে ভিন্ন রূপ নিচ্ছে—এখন আর প্রত্যাশার অবস্থায় বসে নেই আমি, আর ফিরে যাবার উপায় মনপ্রাণ সঁপে বসে নেই — বরং এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি জাতিগুলোর সীমা ভেঙে যাচ্ছে, আর বিশ্ব-ঐক্যের সম্ভাবনা জেগে উঠছে।' সত্যি কথাই লিখেছিলুম। যা-কিছু জাতীয় তা অনেক আগেই প্রাদেশিক ও গ্রাম্য হয়ে গেছে — এবং পিতৃভূমির আবহাওয়ায় আর যা-ই থাক খোলাবাতাস নেই, আছে বন্দীশালার হাওয়া।

'জার্মানি, জার্মানির— জার্মানিকে ছেড়ে দিলেই অবক্ষয়!' এই ছিল তাঁদের আহ্বান যাঁরা সর্বনাশ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী জেনেও একবারও সাবধান ক'রে দেবার জন্য মুখ খোলেননি, আর সেইজন্যই ১৯৩৩-এর জার্মানিতে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই ছিল পর্বতপ্রতিম ভুল! প্রবাসজীবন আমার পক্ষে ভালোই হয়েছে। আমি আমার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমার জর্মন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার; গত কয়েক বছরে প্রতিটি জর্মন যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কিছুই আমাকে এড়িয়ে যাননি — যদিও আমার বাড়ি যখন ধ্বংস হয়ে গেল তখন আমি ম্যুনখেন-এ ছিলুম না। আমাকে আমার বিশ্ব জর্মনিকতাই দিল — দেশে থাকতেই সেটা আমার কাছে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে এসেছিল — এবং আমাকে দয়া করে জর্মন সংস্কৃতির সীমাবহির্ভূত শিবিরটিই দিন, যার সম্মান — আমি আশা করি — অবশিষ্ট জীবন বজায় রাখতে পারব।

বেন-এর কাছে জার্মানিতে থাকার লুথারীয় তাগিদ আর টমাস মান-এর জার্মানিতে না-ফেরার অতিনৈতিক কৈফিয়ত দুটোই যেহেতু সমান অকপট বলে ঠেকে, তখনই আমাদের পক্ষে সংকট আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বোধহয় লুপ্ত বিবেকের পুনরুজ্জীবন বা সদসৎ জ্ঞানের পুনর্জাগরণই এখন একমাত্র করণীয়। দেশ-বিদেশের ফাসিস্তরা অপপ্রচার চালাবে, শ্লীলতালঙ্ঘন করবে, এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নানাভাবে নিপীড়িত করবে — কিন্তু তবু বিপন্ন শিল্পীরা জানবেন যে যেখানে জীবনের অসম্মান হয়, সেখানে শিল্পেরও সমাধি; অর শিল্পের পক্ষে বলেই জীবনের পক্ষে দাঁড়ানো তাঁদের পক্ষে জরুরি ও আবশ্যিক। জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুর আগে এ-কথা অনুভব করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন:

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই — প্রীতি নেই— করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।
নিশ্চয়ই এখন অনেকের কাছে 'মহৎ সত্য বা রীতি' কিংবা শিল্প অথবা সাধনা'
'শকুন ও শেয়াল' সত্ত্বেও 'স্বাভাবিক বলে বলে বোধ হয়।'[৬]।

সূত্রনির্দেশ

১। টমাস মান-এর জ্যেষ্ঠপুত্র; হিটলারের জার্মানি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। তাঁর সম্বন্ধে পরে গোটফ্রিড বেন তাঁর আত্মজীবনী *দুই জীবন* (১৯৫০)-এ লিখেছেন: 'একদিক থেকে ক্লাউস মান আমার অন্তরঙ্গ ছিলেন, নানা সূত্রে প্রায়ই আমার কাছে তিনি আসতেন; তীক্ষ্ণধী, বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, ভালভাবে প্রতিপালিত ও শিষ্টাচারী, এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সম্মান প্রদর্শন করার অধুনালুপ্ত গুণটিও তাঁর ছিল।'

২. টমাস মান-এর ভ্রাতা; ঔপন্যাসিক; প্রধানত ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস রচনার জন্য বিখ্যাত। জার্মানিতে তৎকালে তাঁর জনপ্রিয়তা কোনো-কোনো দিক থেকে, এমনকি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক ভ্রাতার চেয়েও বেশি ছিল।

৩. *লোট্টে ইন হ্বাইমার* (১৯৪০) উপন্যাসের কথা বলছেন টমাস মান, যাতে গ্যেটে ও শারলোট্টের প্রণয়কাহিনি বিবৃত হয়েছে।

৪. এখানে মান তাঁর বহুস্তর উপন্যাস *ডক্টর ফাউস্টুস* (১৯৪৯)-এর কথা বলছেন, যার বিষয় ছিল হিটলারের জার্মানি, বা হ্বাগনারের সংগীত, বা শিল্প ও ব্যাধি ইত্যাদি — অর্থাৎ ফাউস্ট-পুরাণ, অর্থাৎ যার অর্থ অনেক-কিছুই হতে পারে। 'একটি উপন্যাসের জন্মকথা' গ্রন্থে মান তাঁর এই উপন্যাস কীভাবে লেখা হল তার একটি উদ্দীপক ও মনোজ্ঞ কাহিনি রচনা করেছেন।

৫. বলাই বাহুল্য, গ্যেটের *ফাউস্ট* -এর কথা বলা হচ্ছে — কিন্তু বলা হচ্ছে 'অখণ্ড' *ফাউস্ট*-এর কথা, অর্থাৎ মাত্র তার প্রথম খণ্ডের কথা নয়। আজকাল যে দান্তের পুরো কাব্যের মধ্যে কেবল 'ইনফেরনো' বা গ্যেটের *ফাউস্ট*-এর প্রথম খণ্ডই বারংবার উদ্ধৃত হচ্ছে, তার পিছনে হয়তো কেবল যুচেতনাই নিহিত নেই — কোনো গভীর বারংবার উদ্ধৃত হচ্ছে, তার পিছনে হয়তো কেবল যুগচেতনাই নিহিত নেই — কোনও গভীর উদ্দেশ্যও বিদ্যমান।

৬. গ্যেটফ্রীড বেন ও টমাস মান-এর চিঠি দুটি তরজমা করার সময় যে অবিরলভাবে শ্রীসুবীর রায়চৌধুরীর পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা উপকৃত হয়েছি, এখানে এ-তথ্য কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করা জরুরি মনে করি।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫)

ডেভিড ম্যাককাচিয়ন

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা

১

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মুসলিম আক্রমণকারীদের আগমন বাংলা দেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এই বৈদেশিক বিজয় যাত্রা কেবলমাত্র লুণ্ঠন-উদ্দেশিক নয়, সাংস্কৃতিক বিজয় অভিযানও বটে, কারণ শস্ত্রের সাহায্যে শাস্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এই সময়েই হয়েছিল। ওই সময়ের আতঙ্ক-বিজড়িত সমাজের পরিচয় এখনও পুষ্করিণীতে ও নদীতে মূর্তি-বিধ্বংসীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিক্ষিপ্ত ও বর্তমানে পুনরুদ্ধার-করা প্রাক্-মুসলিম দেবপ্রতিমা থেকেই পাওয়া যায়। মুসলিম ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে প্রভূত পার্থক্যের কথা প্রায়শই উচ্চারিত হয়। সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রচণ্ড কর্মোদ্যমকে মূলবস্তু করে একটি বহির্মুখী এবং অন্যটি পরিবারমুখী ও আত্মশুদ্ধিতে নিয়োজিত। একটি আচারনিষ্ঠ ও সুকঠিন ; অন্যটিতে পরিস্ফুট একটি গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন স্বচ্ছন্দ ঢিলেঢালা ভাব। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ধর্মে ও শিল্পে এই পার্থক্য বিশেষভাবে প্রকটিত। জীবনের আনন্দবোধ হিন্দু চিন্তাধারায় উদ্ভিদে-বনস্পতিতে, বহতা নদীতে, পক্ষী ও প্রাণীকুলে এবং প্রাণস্পন্দিত নিসর্গের বিভিন্ন রূপে হিন্দু পূজা-অর্চনায় ও দেবমন্দিরের অলংকরণে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কিন্তু মরুদেশ-জাত ইসলাম দুর্ধর্ষ মরুজাতিদের সুশৃঙ্খল করার প্রাথমিক প্রয়োজনেই কর্কশ ধর্মান্ধতার সাহায্যে বিচারক-ঈশ্বরের 'সেমিতিক্' ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করে তুলেছে। প্রাণীজগতের শিল্প-রূপায়ণ সম্পর্কে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ছাড়া ইসলাম-চেতনার মূলভাবধারাও মুসলিম শিল্পী ও স্থপতিকে বিমূর্ত জ্যামিতিক শিল্প-প্রকাশে প্রবোচিত করেছে। সমতল গৃহ প্রাচীর, আয়তাকার কক্ষ ও অঙ্গন এবং মসজিদের সাধারণ সুষমানুপাত ইসলামি চেতনায় যে-রকম তৃপ্তিদায়ক বিগ্রহের স্ফীতোন্নত রূপকল্পনা ও অলংকরণের প্রাচুর্য হিন্দু চেতনায় তেমনই সমাদৃত: একটির মূল রেখাভঙ্গি সরল ও ঋজু, অন্যটি বঙ্কিম-রেখাশ্রয়ী। ইসলামি ধারা স্থাপত্য-পরিসরের সংস্থাপনে সাবধানী ও গাণিতিক। অন্যদিকে হিন্দু ভাবধারায় স্থাপত্য-সংস্থাপন প্রাণধর্মী ও উচ্ছ্বসিত। জ্যামিতিক প্রকাশভঙ্গি ও জৈবিক উপলেপের সংযম ও উচ্ছলতার এই পার্থক্য ইয়োরোপীয় 'গ্রিক' ও 'গোথিক' শিল্পকলা অথবা 'ক্ল্যাসিকাল' ও 'রোমান্টিক' ভাবধারার সঙ্গে তুলনীয়।

হিন্দু মন্দিরের পূজার্চনা 'গর্ভগৃহে' কেন্দ্রায়িত। গর্ভগৃহ মাতৃজঠরের মতোই অন্ধকারাবৃত ও জীবন-উন্মেষের মতোই রহস্যময় এবং প্রতিমাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই পূজাচার অনুসৃত। ইসলামে অবশ্য প্রতিমার আরাধনা গভীরতম পাপ। তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিপক্ষে ইসলাম কেবলমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যবাহী 'ঈর্ষাপরায়ণ' অদ্বৈত ঈশ্বরকে এনেছিল। ইসলামের আরাধনা সংকীর্ণ ও অন্ধকার কক্ষের কম্পিত দীপশিখায় ও ইতস্তত ভাসমান ধূম্রাচ্ছাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত দেব 'দর্শনে' আবদ্ধ নয়, কিন্তু আকাশের তলায় মুক্তাঙ্গনে; মিলিত এক সামাজিক ও গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠান। ব্যক্তিগত বা আত্মগত পবিত্রীকরণ এর মূল লক্ষ্য নয়, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে মানবিক একাত্মতা বা সহমর্মিতার প্রকাশ। স্বচ্ছতাই মসজিদের মৌল উপাদান : সংকীর্ণ কক্ষের পরিবর্তে, দীর্ঘ প্রাচীরই মুসলিম আরাধনায় কেন্দ্রস্থিত লক্ষ্যবস্তু। কেবলমাত্র প্রার্থনার দিক নির্দেশই এই প্রাচীরের উপযোগিতা নয়, প্রাচীরের মধ্য দিয়ে মক্কার অভিমুখে উপাসনাই এর উদ্দেশ্য। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে এই প্রাচীর প্রায় পাঁচশো ফুট দীর্ঘ। উপাসনাকারী এর যে কোনও স্থানেই দাঁড়াতে পারেন। 'উপাসনা কুলুঙ্গি' বা 'মিহরাব'-সমূহ কেবলমাত্র মনঃসংযোগের জন্যই প্রয়োজনীয়।

তত্ত্বগতরূপে দৃষ্ট হলে ইসলাম এতই অসহিষ্ণু ও হিন্দুধর্ম এতই স্বতন্ত্র ও মিশ্রণ বর্জনকারী যে এ-দুয়ের সহাবস্থান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অবশ্যই যে কোনও তত্ত্বের চেয়ে শক্তিশালী ও অমোঘ এবং এক শতকের মধ্যেই বাংলাদেশের মুসলিম শাসকেরা উপলব্ধি করেছিল যে দেশকে অধিকৃত রাখতে গেলে ও দেহলির প্রতাপ অস্বীকার করে স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে স্থানীয়দের বিরোধীতে পরিণত করা চলে না এবং সকল স্থানীয় ভূস্বামীদের পরিবর্তন করাও তাদের আয়ত্তের মধ্যে নয়। এর পাঁচশো বছর পরেও বাংলাদেশ দখল করতে গিয়ে ব্রিটিশরাও দেখেছিল যে ভূস্বামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তখনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পরে বর্বরযুগীয় ইয়োরোপে খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রসারতার সময়ের মতোই এ সময়েও গণ ধর্মান্তরণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কারণ যাই হোক না কেন হিন্দুধর্ম এ সময়ে প্রভূতরূপে উন্নত ও গভীর শিকড়ে প্রোথিত ছিল। প্রধানত হিন্দু সংস্কৃতি-জগতের বাইরে অবস্থানকারী নিম্নবর্ণের শ্রেণীসমূহ ও সমাজ-বহির্ভূত শ্রেণীরাই ধর্মান্তরণে আগ্রহী ও সমর্থ ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রাবল্য ও স্বাভাবিক পরিপার্শ্বের প্রভাব এতই শক্তিশালী ছিল যে তারা বহু স্থানেই সত্যপীরের পূজা প্রভৃতি হিন্দু ভাবাদর্শ ও সর্বপ্রাণবাদী মনোভাবকে আত্মস্থ করেছিল — যার জন্য পরবর্তীকাল 'ফারাইদি' প্রভৃতি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। যাই হোক কঠোরভাবে ব্যাখ্যাত নীতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত ক্রিশ্চান ধর্মের মতো ইসলামও বহু দিন হল এর উন্মেষ-কালাগত মতাদর্শ থেকে সরে এসেছে। এর নেতৃস্থানীয়রা যে কেবলমাত্র সত্যপ্রচারের পরিবর্তে বিলাসিতা ও শক্তিমত্তাকে গ্রহণ করেছে তাই নয়, সামাজিকভাবে 'শিয়া' ও 'সুন্নি' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে ও রহস্যবাদী 'সুফি' মতবাদের জন্মদান করেছে—যে মতবাদ বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত জগৎ-সচেতন ইসলামের থেকে এত স্বতন্ত্র — এবং 'ভক্তি'ধর্মের সঙ্গে নিকট-সম্পর্কস্থানীয় ও সাদৃশ্যময়। ঠিক একইভাবে ইসলামি শিল্পকলা তার সম্ভাবনাহীন ও নিরাভরণ উন্মেষের পর থেকে বিকশিত হয়ে পৃথিবীর মহান শিল্প-সাফল্যগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামি শিল্পকলার সাফল্য স্থানীয় ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করার প্রতিভার সাহায্যেই সম্ভবপর হয়েছে। প্রথমে রোমক এবং খ্রিস্টীয় শিল্পধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে অধিকৃত যে কোনও দেশের শিল্পধারাকেই ইসলামি শিল্পকলা গ্রহণ করেছে। পারস্যের ও ভারতের মতো সুপ্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের দেশে গ্রহণের ও মিশ্রণের ফলাফল সর্বোত্তম হয়েছে। পারস্যের পুষ্পপ্রীতি ইসলামি জ্যামিতিক বিমূর্তির চেয়েও শক্তিশালী ছিল বলেই ইস্ফাহান ও শিরাজের মসজিদ উদ্ভিদের বঙ্কিম দেহরেখার ও গোলাপের অলংকার সজ্জিত, পারস্য ও ভারতের পুথিচিত্রে মানুষের ছবি ছড়াছড়ি, তুর্কি পুথিচিত্রে যা নেই : এমনকি পারসিক শিল্পে পয়গম্বরের একটি চিত্র দেখা যায় এবং একটি মসজিদে মনুষ্যমূর্তির খোদাইও! ভারতের প্রাচুর্য-প্রবণতা ত্রয়োদশ শতকে আলতামাসের দেহলিতে নির্মিত কবরে ও তাঁর পুনঃপ্রসারিত মসজিদ-প্রাচীরের অলংকরণে প্রকাশিত। ভারতের বহু প্রাচীন মুসলিম সৌধই হিন্দু দেবগৃহ হতে আহরিত - মনুষ্যমূর্তি অপসারিত অথচ প্রাণীজ ও উদ্ভিদের অলংকারে সজ্জিত—স্থাপত্যাংশ দিয়ে নির্মিত। পলকাটা এবং অন্যান্যভাবে খোদিত অলংকারে ভূষিত গভীরভাবে অ-ইসলামি হিন্দু স্তম্ভাবলি প্রথমে মুসলিম স্থপতিদের দ্বারা ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালের উন্নত মুসলিম সৌধে মুসলিমদের খোদিত মসৃণ ও অলংকারবিহীন কিন্তু হিন্দু ধরনের পলকাটা ও বিভিন্নতলের খাঁজকাটা হিন্দুরীতির স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল। মুসলিম বিজেতাদের হিন্দু ও জৈন শিল্পপ্রীতি এমনই ছিল যে উদাহরণস্বরূপ গুজরাটে তারা কড়িকাঠের উপর নির্ভরশীল শীর্ষভাগ সরাসরি অপসারণ করে নবনির্মিত মসজিদে ব্যবহার করতে থাকে তার উল্লেখ করা যায়। প্রায় এক পুরুষ কাল ধরে মুসলিম স্থাপত্যরীতি হিন্দু রীতির কড়ির সংস্থাপনকে অনুসরণ করে চলে সম্পূর্ণভাবে যথার্থ খিলান ও গম্বুজ প্রচলনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় বাস্তব কার্যকারিতা ও শিল্পসৌকর্যগত সৌন্দর্য অনুভূত হওয়ার পূর্ব যুগে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মুসলিম সৌধ নির্মাণে হিন্দু কারুশিল্পী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দ্বারাই এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল, কারণ

স্থানীয় শিল্পীরা স্বাভাবিকভাবেই নবসৃষ্ট স্থাপত্য-পদ্ধতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে অসমর্থ ছিল। কিন্তু ঢাকার ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের 'বিবি পরী'র সমাধিসৌধে সামগ্রিকভাবেই কড়ির ছাদ গঠনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—এটি এমনকি গম্বুজ-নির্ভর ছাদের সাধারণ ব্যবহারের চারশো বছর পরেও।

বাংলাদেশে মুসলিম-প্রবর্তিত স্থাপত্যরীতিতে রচিত মসজিদ, সমাধিসৌধ, নগর-তোরণ ও ভ্রমণকারীদের আবাসগৃহ সরাই প্রভৃতি এক সম্পূর্ণ অভিনব গঠনশৈলীর পরিচায়ক। মালদহ জিলার পাণ্ডুয়াতে অবস্থিত ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সিকন্দর শাহ্ স্থাপিত আদিনা মসজিদের গঠন-পরিকল্পনা সরাসরিভাবে প্রাচ্যের। হয়তো দামাস্কাস শহরের সুবিশাল মসজিদ অথবা সামারা-র মসজিদসমূহের অনুপ্রেরণাতেই এটি গঠিত হয়। কিন্তু সমসাময়িক কালের বঙ্গীয় মসজিদের গঠন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার পরিধিতে সীমাবদ্ধ। চতুষ্কোণাকার সৌধশীর্ষে একটি গম্বুজ বা আয়তাকার কক্ষের ঊর্ধ্বে একাধিক গম্বুজের অবস্থিতিই এই রীতির উপাসনালয়ে আদিনার মতো বহু স্তম্ভ-বাহিত বৃহৎ আচ্ছাদিত বারান্দার প্রয়োজনকে নিঃশেষ করেছিল। একাধিক দিক থেকে সুলতানি আমলের মসজিদ ও সমাধিসৌধ পরবর্তীকালে বিবর্তিত প্রাদেশিক হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর উত্থানের সূচনাকাল। স্থাপত্যশিল্পের এই ধারা ষোড়শ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, দীনেশচন্দ্র সেন-বর্ণিত 'পৌরাণিক পুনরুজ্জীবনের'ই (রেনেসাঁস) অংশরূপে। চুন ও সৌধ-নির্মাণোপযোগী মিশ্রণ বা মশলার সহায়তায় গ্রথিত প্রকৃত খিলান ও গম্বুজের নির্মাণপদ্ধতি এনেছিল মুসলিমরাই। ইতিপূর্বে হিন্দুরা পরস্পরের উপর রক্ষিত প্রস্তর, বা কাদার উপর বৃহৎ ইষ্টক স্থাপন করত। মুসলিম যুগে ইষ্টকের আয়তন অনেকখানি ক্ষুদ্র হল, এবং মধ্যযুগের শেষপাদে অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরে ছাদও গম্বুজীয় পদ্ধতিতে রচিত। যদিও ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বঙ্গীয় মন্দির বহির্ভাগের বিশেষত্বরূপে গম্বুজকে কখনই গ্রহণ করেনি। বৈদ্যপুরে সু-উচ্চ 'দেউল'-এর মতো কেবলমাত্র কয়েকটি মন্দিরেই বিগতকালের স্তরক্রমে ভার-বিতরণের ('করবেলিং') পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও সাধারণভাবে চতুষ্কোণ গৃহ থেকে বৃত্তাকার গম্বুজের বিবর্তন চতুষ্কোণ স্তরক্রমিক ভার-বিতরণকারী স্থাপত্য-সংস্থাপনকে ভিত্তি করেই গঠিত হয়। প্রায় অবশ্যম্ভাবী রূপেই মুসলিম আগমনের উত্তরকালের হিন্দু মন্দিরসমূহে, এমনকি পূর্বতন প্রক্রিয়ানুসারী শিখরযুক্ত দেবগৃহেও কৌণিক-শীর্ষ-সমন্বিত খিলানের প্রবেশপথ একাধিক পত্রাকার অলংকরণের তরঙ্গে সজ্জিত। সূঁচালো বা তীক্ষ্ণ কোণের খিলান বাংলা সমেত সমগ্র ভারতীয় ইসলামি স্থাপত্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। পত্রালংকারে সজ্জিত খিলানও—মুক্ত রূপরেখে অথবা খোদিত রূপে—মুসলিম স্থাপত্যশৈলীরই একটি সাধারণ বিশেষত্ব। এ ধরনের খিলান পুরাতন দিল্লির সৌধাবলিতে—যেমন আলতামাসের সমাধিতে (১২৩৫) দৃষ্ট হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গৌড়-এর দারাস্‌বাড়ি মসজিদের বহু তরঙ্গ-পত্রে ভূষিত ত্রিকোণ খিলান ইরাকের পশ্চিম সেলজুকীয় শিল্পের একটি বিশিষ্ট রীতিকে প্রতিফলিত করে। আবার পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের মিহ্‌রাবের খোদিত তরঙ্গ-পত্রালংকার পারস্যের ইস্ফাহান শহরস্থিত দশম শতাব্দীর জোরজির মসজিদ অথবা ক্রেস্‌ওয়েল কর্তৃক তরঙ্গ-পত্রালংকারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শনরূপে উল্লিখিত প্রথম শাপুর-এর রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত (২৪১—'৭২ খ্রিস্টাব্দে) সাসানীয় টেসিফোনের তাক-ই-কিস্‌রা-র সঙ্গে তুলনীয়। মুসলিম-পূর্ব হিন্দু স্থাপত্যেও তুলনীয় নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের আজমিরের চওড়া ও অগভীর পত্র-তরঙ্গের খিলানপথে। নবম শতকের সামারার বিরাট মসজিদের গবাক্ষ অথবা হিন্দু শিল্পের সমধর্মী ত্রিপত্রী খিলানের উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে এ প্রকারের হিন্দু কুলুঙ্গির ব্যবহার করা হয়েছে কয়েকটি মিহ্‌রাবের জন্য এবং মসজিদের বহির্ভাগে ইষ্টক নির্মিত এ ধরনের অলংকরণও বর্তমান। একাদশ-দ্বাদশ শতকের গুজরাটি সোলাঙ্কি স্থাপত্যশৈলীর মধেরা-র সূর্যমন্দিরে ও সিদ্ধপুরের রুদ্রালয় মন্দিরের পত্র-তরঙ্গায়িত তোরণের ও কাষ্ঠ-নির্মাণের অনুকরণে রূপায়িত পশ্চিম ভারতীয় চৈত্যগুহাস্থি প্রবেশপথের শীর্ষস্থ অশ্বখুরাকার খিলানের দুইপার্শ্বের বক্রায়িত কড়ির গঠনভঙ্গির সাদৃশ্য ও সম্পর্ক উল্লিখিত হতে পারে।

মুসলিম শাসন যে কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্থাপত্যে ইসলামি রীতির খিলান বা গম্বুজ প্রচলনকারী তাই নয়, উপরন্তু স্থানীয় কয়েকটি স্থাপত্য-প্রবণতাকে এমন ভাবে আয়ত্ত করেছিল যে মুসলিম শাসনকালীন নবপ্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যশৈলীটি একাধারে ইসলামি ও বঙ্গীয় রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। মালদহ জিলার পাণ্ডুয়াতে স্থিত পঞ্চদশ শতকের সূচনাকালের 'একলাখি সমাধিসৌধ'-র বক্রায়িত ছাদই এখনও দণ্ডায়মান ঐতিহাসিক কীর্তি-সৌধগুলির নিরিখে কুটিরে চালার স্থায়ী স্থাপত্য-রূপায়ণের সর্ব-পুরাতন উদাহরণরূপে, বঙ্গীয় স্থাপত্যে এক নবধারার আনয়নকারী; কারণ, উত্তরকালীন বহু স্থাপত্যরীতিই বক্রাকার চালের সঙ্গে যুক্ত। প্রাথমিকভাবে রেখ-দেউলে দৃষ্ট উর্ধ্বায়ত উচ্চতাভিলাষী হিন্দু বাস্তুরীতির পরিবর্তে বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলী একটি অপেক্ষাকৃত নিম্নাকার বিশালত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হয়তো স্থানীয় আবহাওয়া এবং ভূ-প্রকৃতির জন্য ও বর্ষণের জলধারাকে অল্পায়াসে অপসারিত করার প্রয়োজনে এই গঠনভঙ্গির উদ্ভব হয়েছিল। সাধারণ বঙ্গীয় মসজিদ পশ্চিম ভারতীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের সৌধসমূহের চেয়ে কম উচ্চতাবিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। বক্রাকার আলিশাই এর বিশিষ্টতা ও এ প্রকারের আলিশার রীতি মুঘল আমলে ক্রমে ক্রমে দেহলি, রাজস্থান, গুজরাট ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। চতুষ্কোণ কক্ষায়তনের শীর্ষ-স্থায়ী এক-গম্বুজীয় রীতি একলাখি সমাধিসৌধকে পরবর্তী হিন্দু 'রত্ন' ও 'চালা' মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করেছে আকারগত রূপে। 'চালা' মন্দিরের ক্ষেত্রে চারচালা গ্রাম্য কুটিরের মতো ছাদের উপর মধ্যস্থিত শীর্ষালংকারটি নির্মিত হয়েছে। পার্সি ব্রাউন ও ড দানী দু-জনেই অনুমান করেন যে একলাখি-র দেওয়ালের সজ্জারীতি কুটিরের মতো বাঁশের কাঠামো ও তার মধ্যের মাটির দেওয়ালের দ্বারা অনুপ্রাণিত। একলাখি সৌধের চারিদিকে হিন্দুরীতির প্রস্তরের চৌকাঠের শীর্ষে সূঁচালো কোণের ইষ্টকের খিলানবিশিষ্ট একটি করে দরজা বা প্রবেশপথ বর্তমান। কিন্তু এর পরে মসজিদসমূহে সাধারণত একদিকে দেওয়াল বা পরবর্তী বঙ্গীয় হিন্দু মন্দিরের মতো স্তম্ভের দ্বারা পৃথকীকৃত তিনটি বা তার অধিক প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের স্তম্ভ ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না এবং ব্রাউনের মতানুসারে আদিনার 'বাদ্‌শা-কা-তখ্‌ৎ' ধারণকারী স্তম্ভই এ-শ্রেণীর স্তম্ভে প্রথম ব্যবহারের নিদর্শন। এই স্তম্ভের বামনাকার গড়ন, দর্শনীয় প্রস্থ ও পলকাটা অলংকারের বাহুল্য সাধারণভাবে পরিচিত বিশিষ্ট রীতির হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন থেকে পৃথক একটি রূপ দান করেছে। মাঝে মাঝে এ ধরনের স্তম্ভ মুসলিমরা ব্যবহার করার পর (মুসলমানেরা একই হিন্দুরীতির দীর্ঘতর স্তম্ভ ব্যবহার করেছেন তাঁদের একাধিক গম্বুজকে ধরে রাখবার জন্য) একাধিক প্রবেশোপযুক্ত খিলানপথ-সমন্বিত ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক কালের হিন্দু মন্দিরে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সহজেই জটিল অলংকারে ভূষিত হয়েছে। যখন এই সমস্ত স্থাপত্য ভঙ্গিমা—যথা স্থানীয় রীতির স্তম্ভ, কেন্দ্রস্থিত গম্বুজ বা শিখর, নিম্নায়ত আয়তাকার কক্ষ ও বক্রকার আলিশা পরস্পর যুক্ত হল তখন গৌড়ের 'কদম রসুল' (১৫৩১ খ্রি), যাতে পয়গম্বরের পদচিহ্ন রয়েছে (বিষ্ণুপদ বা বুদ্ধপদের মতো) তার অথবা বিষ্ণুপুরের হিন্দু মন্দির 'মদনমোহন'-এর সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠল। কোণে কোণে শিখর (রত্ন) যুক্ত করার হিন্দু স্থাপত্যরীতি (যেমন নবরত্ন, সপ্তদশরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি) সাক্ষাৎরূপে পূর্ববর্ণিত এই বিশিষ্ট শৈলীর থেকেই উৎপন্ন। এটিও আবার একদিক থেকে মুসলিম রীতি বলে গ্রাহ্য হতে পারে এবং সে অর্থে তাজমহল পঞ্চরত্ন এবং সাসারামের সমাধিসৌধের মতো বিভিন্ন স্তরে 'ছত্রী'-বিশিষ্ট বহু স্থাপত্যকীর্তিই যথেষ্ট অর্থবহ। এমনকি শিখরের সংস্থাপনে এ-ধরনের ব্যবহার মুসলিম উদ্ভাবনের ফলমাত্র নয়, কারণ এটি স্থাপত্য-সুসামঞ্জস্যের একটি মানবিক প্রবণতা — যেটি বুদ্ধগয়ার পঞ্চশিখরযুক্ত মন্দির-পরিকল্পনার চতুর্দশ শতকীয় ব্রহ্মদেশীয় উদ্ভাবনে অথবা চারিকোণে ও মধ্যে শিখর-বিশিষ্ট হিন্দু রীতির 'পঞ্চায়তন' মন্দিরে সহজলভ্য।

ভিল্‌হেল্‌ম এইলার-এর সংবর্ধনা-পুস্তকে ড. ক্লাউস ফিশার একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের বাসুদেব (১৬৭৯ খ্রি) মন্দিরের কেন্দ্রস্থিত চতুষ্কোণী

কক্ষও তার শীর্ষস্থ গম্বুজ ও তার চারিদিকের নলাকার ছাদের বারান্দা ও কোণস্থিত শিখরাবলি পূরবর্তী ইসলামি শতাব্দীগুলি অতিক্রম করে সাসানীয় যুগের অন্তিমকালের টেসিফোন শহরের স্থাপত্যকীর্তির সঙ্গে বাস্তুনির্মাণশৈলীগতভাবে সম্পর্কযুক্ত। তবে আমরা ওই রকম এক নিদর্শন অপেক্ষাকৃত নিকটের অর্থাৎ বাংলার গ্রামাঞ্চলের দুইপার্শ্বে ও সম্মুখে বারান্দা-দেওয়া কুটিরের মধ্যেই দেখতে পাই (যদিও এ ধরনের কুটিরে নলাকার খিলানের ছাদ ও গম্বুজ অনুপস্থিত)। আমরা জানি না যে মুসলিম-পূর্বকালে বাংলাদেশে কুটিরসদৃশ মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিনা, কারণ এ ধরনের সৌধ স্থাপিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে এরূপ কোনও স্থাপত্যকীর্তির চিহ্ন নাই। কিন্তু পাল-সেন আমলের প্রস্তর-প্রতিমার প্রাচুর্য ও তৎসহ তদুপযুক্ত সংখ্যক বিরাটাকার মন্দিরের অনুপস্থিতির ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে এ সমস্ত প্রস্তর-প্রতিমা হয়তো আড়ম্বরহীন মাটির কুটিরেই রক্ষিত হত (এখনও এ-প্রথা প্রচলিত আছে) এবং ফলে পরবর্তীকালে মাটির কুটিরের আদর্শেই পাকা ইমারতির মন্দির নির্মিত হতে থাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির উপাদানের সাহায্যে। গ্রিক-প্রভাবিত স্থাপত্যকীর্তি ব্যতীত ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের মূল উদ্ভব এই প্রকারেরই এবং আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর মহাবলিপুরমস্থ দৌপদীরথ কুটির-উদ্ভুত শৈলীর নিরালংকার ও সরলতম প্রকাশ। কিন্তু বিশিষ্টাকারের হিন্দুমন্দির শিখরের সংযোগে স্থানীয় মূলাকারটি পরে হারিয়ে ফেলে এবং শিখরযুক্ত হিন্দুমন্দির থেকে এর মূলরূপটি ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মধ্যযুগের শেষদিকের বাংলাদেশে মূল কুটিরের আকারকে রক্ষা করা হয় এবং সে জন্যই বাংলার মন্দিরের এতখানি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একলাখি সমাধিসৌধ এই মূলরূপটিকে বিবর্তনের সুযোগ দান করে কিভাবে রত্ন ও চারচালা, আটচালা প্রভৃতি আকারের স্থাপত্য-নিদর্শনের প্রচলনে সাহায্য করেছে তা আমরা দেখেছি। কুটির-শৈলীর মধ্যে 'দো-চালা' বা 'বাংলা' রীতি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টকার। গৌড়ে-র ফত্ খানের সমাধি এ-রীতির এক উল্লেখনীয় উদাহরণ (ফত খান ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গত হয়েছিলেন)। সপ্তদশ শতকের শেষপাদের অন্যান্য মুসলিম সৌধে, যথা মৈমনসিংহের এগারাসিন্দুর গ্রামের শাহ মুহম্মদ-এর মসজিদ-এর প্রবেশপথে, বা ঢাকাস্থিত করতলব খানের মসজিদে এই ধারাই লক্ষিত হয়। এগুলি হয়তো হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নিকট হতে মুসলিম স্থাপত্যাদর্শগত ঋণ বা গ্রহণের প্রমাণ, কারণ গুপ্তিপাড়ার জোড়-বাংলা মন্দির এখনও স্থায়ী মুসলিম সৌধগুলি অপেক্ষা প্রাচীন বা পূর্বতন। অবশ্য এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে এ-ধরনের প্রাচীনতর মুসলিম সৌধ ছিল না। অতএব আমরা দেখতে পাই যে কোনও মসজিদই পাল যুগের 'রেখ' বা 'পীঢ়' দেউলকে অনুকরণ করেনি অথবা কোনও মন্দিরই ইসলামি রীতির গম্বুজের বহির্ভাগের আকার অনুসরণ করেনি, কিন্তু যথেষ্ট প্রয়োগগত-ব্যবহারগত ব্যবধান থাকলেও স্থানীয় স্থাপত্য-ঐতিহ্যের নিকট হতে নানাভাবে প্রেরণা পাওয়া বঙ্গীয় মুসলিম সৌধাবলী ও হিন্দু মন্দিরসূমহ পরিকল্পনায় ও গঠনে যথেষ্ট সাদৃশ্যময় হয়ে উঠেছে।

২

অলংকরণের ক্ষেত্রে মূলজ পার্থক্য থাকলেও এই সাযুজ্য সহজেই ধরা পড়ে। হিন্দু অলংকরণে জীবিতাকারের বাহুল্য ও মুসলিম অলংকরণে এর নিষিদ্ধতা বর্তমান থাকলেও বাংলার শিল্পীরা কখনওই মুসলিম সৌধের অলংকারের ক্ষেত্রেও রৈখিক কুটিলতার মধ্যপ্রাচ্যীয় জ্যামিতিক সজ্জা বা নক্সাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার উপযোগী মনোভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। মুসলিম অলংকরণ-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অগভীর, বিমূর্ত, নিয়মাবদ্ধ এবং হিন্দুরীতির মতো প্রাকৃতিক ভাবানুসারী না হলেও উপরোক্ত পার্থক্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্য। বাংলার মুসলিম অলংকার-পদ্ধতি এদিক দিয়ে পারসিকদের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত বঙ্কিম রেখাঙ্কনকেই সাগ্রহে বরণ করেছে।

নিকটতর পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম রীতি অনেকাংশই পূর্বতন হিন্দু শিল্পশৈলী হতে আহরিত। পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের এবং অন্যান্য স্থানের নব প্রতিষ্ঠিত বহু মুসলিম সৌধেই সম্পূর্ণ চৌকাঠ

ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এটি আশ্চর্য নয় যে, এর অলংকারসমূহ অনুকরণ করা হবে। হিন্দু সৌধের দরজার উপরিস্থিত চৌকাঠের স্তম্ভের ও পাল দেবপ্রতিমার দেহে ব্যবহৃত দোলায়মান রত্নমালিকা এবং বস্ত্রখণ্ডে সজ্জিত ও শিকলে ঝোলানো ঘণ্টার অলংকার পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে ও একলাখি সৌধে ঈষৎ স্থূল রূপায়ণে দর্শিত হয়েছে। অগ্নিশিখার ন্যায় কুণ্ডলীতে; প্রসারণে প্রকাশমান বা জলধারার মতো উচ্ছলিত এবং অরণ্যের ন্যায় সতত বর্দ্ধিষ্ণু ও ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদালংকারে ভূষিত পট্ট (তুলনীয় : নক্সা চ) পাল শিল্পকলার এক প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রকারের অলংকারও আদিনার ন্যায় প্রাচীনতর সৌধসমূহে থাকলেও পরবর্তীকালে অতিরিক্ত সজ্জিতভাবের অথবা অতিরিক্ত বন্ধনহীনতার কারণে মুসলিম সৌধ থেকে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আদিনার মিহ্‌রাব-শীর্ষের পালযুগীয় রীতির দীর্ঘ ত্রিভুজাকার উদ্ভিদীয় সজ্জা ড দানির মতানুসারে বৌদ্ধ স্তূপের সঙ্গে এক সুদূরপ্রসারী যোগসূত্রে গ্রথিত। দিনাজপুর ও গৌড়ে প্রাপ্ত হিন্দু রীতির স্তম্ভাবলিতে উপস্থিত পার্শ্বাগত রূপায়ণের প্রস্ফুটিত পদ্মালংকার মুসলিম সৌধের বিশেষাকার 'ঢাল'-অলংকার 'গ্রন্থিসারী' অলংকারেও গৃহীত হয়েছে। কখনও কখনও হিন্দুরীতির নবগ্রহ বা দশাবতার ফলকে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভার্ধ ('পিলাস্টার') দ্বারা এই গ্রন্থিসারীকে বিভক্ত করা হয়েছে। (তরঙ্গায়িত বৃক্ষকাণ্ড, পদ্ম ও হীরকখণ্ড, পদ্মপত্রের ধারা, ত্রিপত্র, ক্ষুদ্রাকার পুষ্পালংকার, শীর্ষালংকার, উড়ন্ত পতাকা, পাক-দেওয়া রশি বা দড়ি এ ধরনের পূর্বতন হিন্দুরীতির নিদর্শনের অনুকৃতির উদাহরণ অনেক বাড়ানো যেতে পারে। অন্যদিকে পূর্বতন হিন্দু স্থাপত্যালংকারেও জ্যামিতিক বিমূর্তির অভাব ছিল না : পরস্পর-সন্নিবিষ্ট চতুষ্কোণ এবং হীরকীয় বহু-কৌণিক পরস্পর অতিক্রমকারী রেখাঙ্কন আমরা পাহাড়পুরের পাকজ মৃৎশিল্পে ('টেরাকোটা'), বাণগড়ে ও মহাস্থানে দেখেছি। এ ধরনের অনেক শৈলীই কেবলমাত্র হিন্দু বা মুসলিম শিল্পকলা নিজস্ব রূপে দাবি করতে পারে না, কারণ গুপ্তযুগীয় উদ্ভিদ পট্টালংকার একই ভাবেই বা সমপরিমাণেই 'গ্রেকো রোমান' বা 'সীদিয়' বলে অভিহিত হতে পারে। হয়তো বিশিষ্ট 'পামেট্'-পুষ্পালংকারটি মুসলিমরা 'ক্ল্যাসিকাল' অথবা 'সাসানীয়' উৎস থেকে আহরণ করেছিল, কিংবা পাল ভাস্কর্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রহণ করেছিল। পাল পুষ্পালংকারের মতো সজ্জা জেরুসালেমের নবম শতাব্দীর 'ডোম্ অব দি রক' নামক মুসলিম সৌধে ব্যবহৃত হবার ব্যবহৃত হবার পর বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ ভাবে অলংকরণে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার পরস্পরে জড়িত স্বস্তিকা চিহ্ন সারনাথের ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ ধামেক স্তূপে ও বাংলাদেশের পরবর্তীকালীন হিন্দু মন্দিরে এবং মসজিদে দেখা যায় - আবার এটি গ্রিক স্থাপত্যেও বহুলব্যবহৃত। সুষ্ঠু বিচারে দেখা যাবে যে বিমূর্ত অলংকরণ এতই বিশ্বজনীন যে আদিনার কেন্দ্রস্থিত মিহ্‌রাবের ভূষণে ও হিন্দু অলংকাররীতির মধ্যে বিশেষ সাযুজ্য বর্তমান। এইভাবেই মকর-পুচ্ছের প্রকৃতি খাঁজ-খাওয়ানো বৃত্তরেখায় পর্যবসিত করা সম্ভবপর হয়েছে।

যদিও আমরা মুসলিম-পূর্ব স্থাপত্যকলা সম্পর্কে অল্পমাত্রই জানি এবং যদিও আমাদের ওই সময়ের স্থাপত্যশৈলীসমূহের সম্পর্কে ধারণাটি আংশিকমাত্র তাহলেও আমরা নিরাপদেই বলতে পারি যে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম রীতির স্থাপত্য অপেক্ষা পরবর্তী হিন্দু ও মুসলিম রীতির স্থাপত্যের অধিকতর ধারাবাহিকতা আছে। সূচনায় বঙ্গীয় মুসলিম শিল্পধারা পূর্বতন ধারা বিরোধী ছিল। আবার পরবর্তী হিন্দু রীতি অপেক্ষাকৃত কম অসহিষ্ণুতার আবহাওয়াতেই বর্ধিত হয়েছিল। এছাড়াও গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ লেখকরা মনে করেন যে পাল-সেন শিল্পকলা অভিজাতধর্মী এবং বহিরাগত আরোপণের ফল এবং পাহাড়পুরের নবম শতাব্দীর দেশজ লোকমানসের অ-বিদগ্ধ শিল্পরীতি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল ইসলামের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুশাসন-বিজড়িত আধিপত্য ভগ্ন হওয়ার সময়ে এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনে, বৈষ্ণব অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে আপনাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ড. দানি আদিনার 'টেরাকোটা' অলংকরণের 'প্রাণোচ্ছলতা ও মূল দৃষ্টিভঙ্গি'কে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিশ্চিতভাবেই মুসলিমরাই পাকজ মৃত্তিকার (টেরাকোটা-র) অলংকারকে স্থাপত্যে ব্যবহারের রীতি

হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ দশম শতকের পরে পাহাড়পুরে এ রীতি অনুসৃত হয়নি এবং পরবর্তী পাল-সেন যুগের মন্দিরেও দেখা যায় না। এবং এর মধ্যে এখনও দণ্ডায়মান কিছু মন্দিরের জমানো চুনের ('স্টুকো') অলংকারই মাত্র রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের মুসলিম ও হিন্দু সৌধাবলিতে পাকজ মৃত্তিকার ব্যবহারের পদ্ধতি সংস্থাপন ও শিল্পপ্রকৃতির দিক থেকে পৃথক। পূর্বতন বৌদ্ধ স্থাপত্যে পাকজ মৃত্তিকার ফলক দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় দুই 'ফুট' ও প্রদক্ষিণ পথপার্শ্বের প্রাচীরের গাত্রে সারিবদ্ধভাবে উপরে নীচে অলংকৃত পাড় দিয়ে সজ্জিত। কিন্তু পরবর্তীকালের ফলক আকারে কয়েক 'ইঞ্চি' মাত্র ও নানানভাবে সজ্জিত খিলানের চারপাশে অথবা সমগ্র সৌধের সম্মুখস্থ দেওয়ালে। মুসলিমরাই পঞ্চদশ শতাব্দীর মসজিদে ও সপ্তদশ শতকের মন্দিরে দৃষ্ট সূক্ষ্মভাবে খোদিত ফলকের প্রচলন করে ও বহু প্রকারের অলংকৃত পাড়ের ব্যবহার করে, যে সমস্ত পাড় পরবর্তী হিন্দুমন্দিরে দেহরূপায়ণ-সমন্বিত ফলকের মধ্যবর্তী স্থানের প্রসারতাকে আচ্ছাদিত করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সৌধ-সম্মুখের মূল রূপরেখকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

একটি বা তিনটি প্রবেশপথ এবং সূঁচালো খিলানের উপরের স্থানই এই অলংকারসজ্জার মূল প্রস্ফুটন-স্থান। প্রস্ফুটিত পদ্মের বৃত্তালংকার খিলানের মধ্যবর্তী স্থানে দিয়ে খিলানশীর্ষের আয়তাকার ক্ষেত্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ধরনের পদ্মালংকার মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম স্থাপত্যের একটি প্রাচীন রীতি ও ভারতে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভেই কুত্‌ব-এ ও আজমিরে ব্যবহৃত হয়েছিল। খিলান-মধ্যবর্তী স্থানের ধারগুলিতে জ্যামিতিক রেখাঙ্কনের অলংকারের অবতরণ—যেটি প্রধানত ইসলামি রীতির এবং সূঁচালো ত্রিপত্র (নক্সা ক ও খ) হতে বিবর্তিত। তবে এ প্রকারের অলংকার মধ্যযুগীয় হিন্দুমন্দিরের চৈত্য-গবাক্ষ প্রতীকেও বর্তমান। এই ধরনের রেখাঙ্কন হিন্দুরীতির শীর্ষালংকারে ভূষিত হত এবং মধ্যভাগ হতে পৃথকীকৃত ছিল। এবং অনেক সময়েই যুগ্ম পদ্মালংকারসহ (যা কখনও বা 'রাসমণ্ডলে' পরিণত) পরবর্তী হিন্দুমন্দিরের প্রবেশপথের উপরে অলংকার রূপে দেখা যায়। পূর্বতন হিন্দুমন্দিরের 'কর্‌বেল'-করা প্রবেশপথে প্রায় প্রচুর খোদিত অলংকারে সজ্জিত প্রস্তরের কাঠামো ব্যবহার
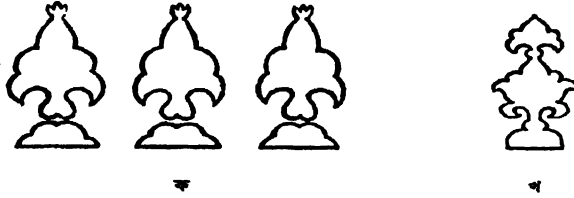
করা হত—এ পদ্ধতি পরবর্তীকালে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালের হিন্দুমন্দিরের প্রবেশপথের একটি পূর্বানুসৃত নিদর্শন হয়তো প্রতিমা-রক্ষণের কুলুঙ্গিতে দেখা যেতে পারে, যেটি মুসলিমরা মিহ্‌রাব-এর জন্য ও বহির্ভাগের প্রাচীর-সজ্জার জন্য ব্যবহার করেছে। যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে যে পত্র-তরঙ্গের খিলান আংশিকভাবে বিগ্রহের কুলুঙ্গির সূঁচালো অথবা বৃত্তায়িত ত্রিপত্র-অলংকরণের দ্বারা প্রভাবিত, যেমন আশুতোষ সংগ্রহশালার বহুল পরিচিত সুন্দরবনের খাড়ি হতে একাদশ শতাব্দীর নিদর্শনটি, - যাতে স্তম্ভার্ধের ব্যবহারও দেখা যায়। একলাখি সমাধিসৌধের বাহির হয়ে স্তম্ভার্ধগুলি খাড়িতে প্রাপ্ত নিদর্শনের স্তম্ভার্ধের এক দূরাগত প্রতিধ্বনিস্বরূপ। আদিনা মসজিদের (চিত্র সংখ্যা ১) বহিঃপ্রাচীর রূপায়ণে স্তম্ভার্ধের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়নি, কিন্তু একদিক থেকে এই সমস্তটিই রামপাল (ঢাকা জিলা) ও সাজাদপুর (পাবনা জিলা) এই দুই স্থানে পরবর্তীকালের মসজিদসমূহের সম্মুখভাগের মতো হিন্দু অলংকরণরীতির আশ্রয়ী। আরও পরের যুগে এ ধরনের অলংকৃত কুলুঙ্গির বিশিষ্ট মুসলিম রীতির অলংকারে ভূষিত হয়ে সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত বর্ধমান জিলার ইছাই ঘোষের দেউলে (চিত্র সংখ্যা ৩ দ্রষ্টব্য) আবির্ভূত হয়েছে। এই শ্রেণীর কুলুঙ্গির আরও ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবহার সমগ্র মুঘল-
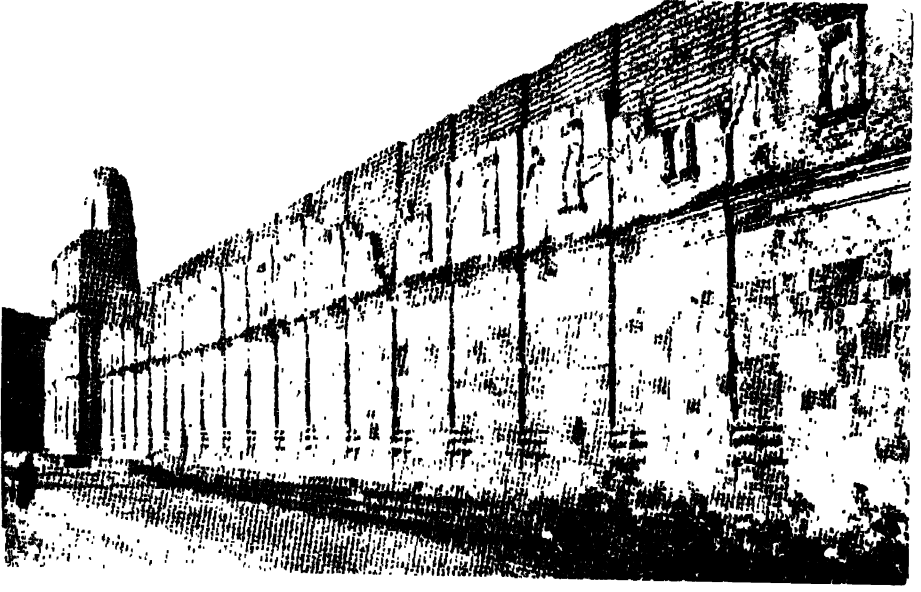
১ উপরে/ পাণ্ডুয়া (মালদহ) - আদিনা মসজিদ (১৩৭৫)। পশ্চিম প্রাচীরের কুলুঙ্গি অলংকরণ ও হিন্দু ধরনের ভিত্তিস্থিত ভূষণ।
২ নিচে বাঁদিকে/ পাণ্ডুয়া (হুগলি) - বড় মসজিদ (১৪ শ শতকের প্রারম্ভ)। হিন্দুরীতির প্রতিমা রক্ষণকারী কুলুঙ্গির অনুকারী মিহ্‌রাব।
৩ নিচে ডানদিকে/ গৌরাঙ্গপুর (বর্ধমান)- ইছাই ঘোষের দেউল (১৭শ শতক?)। প্রতিমা রক্ষণকারী কুলুঙ্গির মুসলিম ব্যবহাবরীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত রূপ।
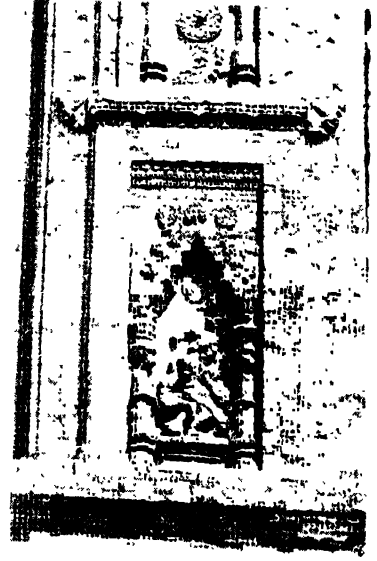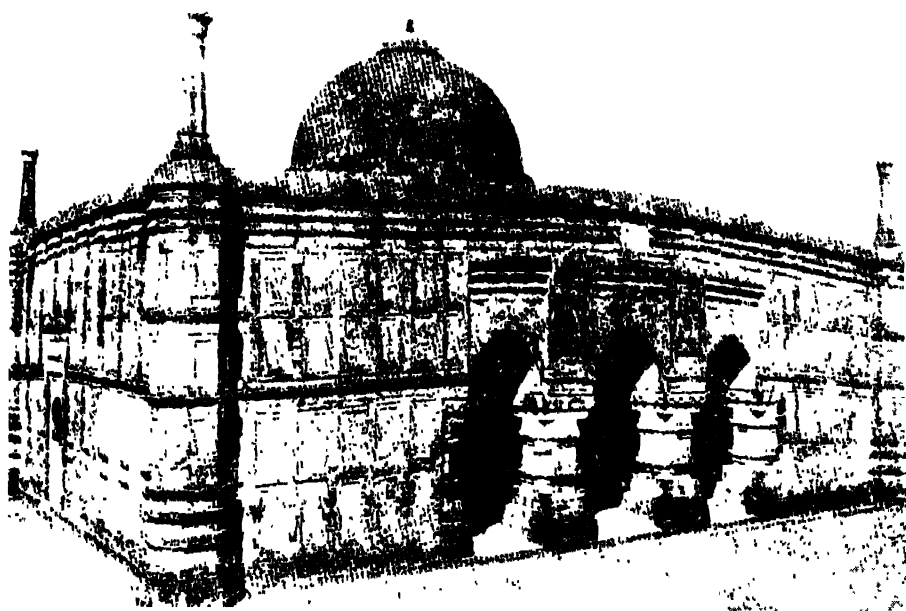
৪ উপরে/ গৌড় (মালদহ)- কদম্ রসুল সৌধ (১৫৩১ খ্রীঃ)।

৫ নিচে / কৃষ্ণনগর (হুগলি) - রাধাবল্লভ মন্দিব (সপ্তদশ শতক?)।
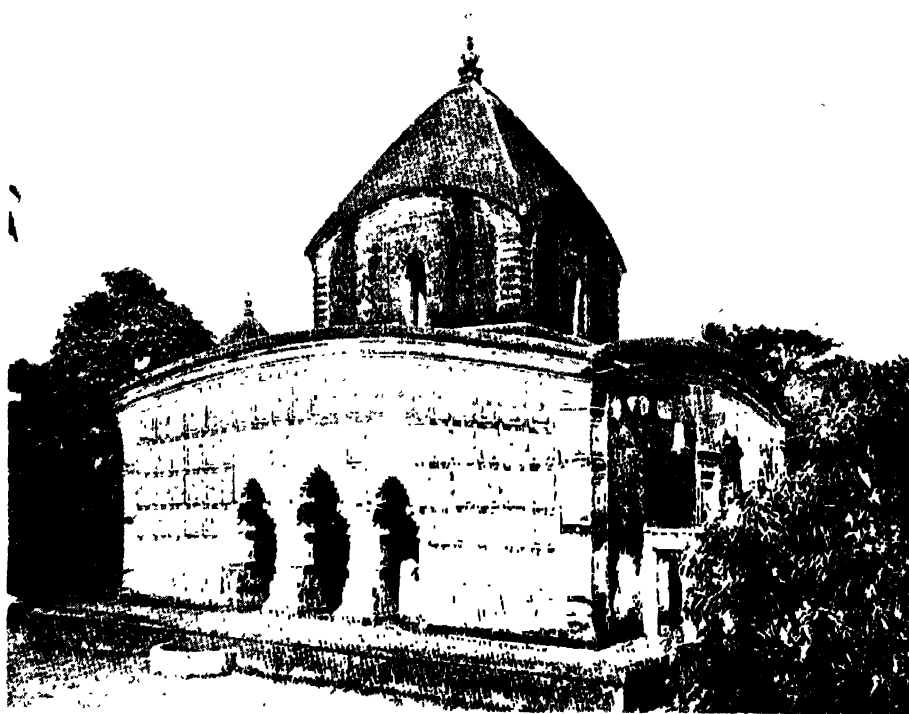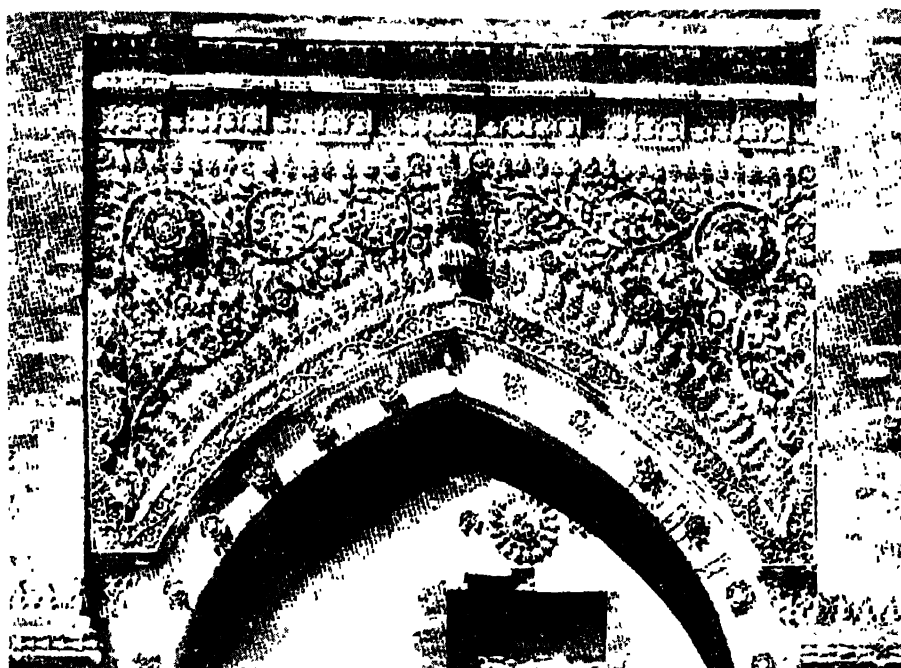
৬ উপরে/ গৌড় (মালদহ) তাঁতিপাড়া মসজিদ (খ্রী পঞ্চদশ শতকের শেষ)। খিলানপথের প্রথাসিদ্ধ অলংকরণ।

৭ নিচে / নলডাঙ্গা (যশোহর)- সিদ্ধেশ্বরী মন্দির (খ্রী সপ্তদশ শতকের শেষ)। হিন্দুরীতির খিলানপথের প্রথাসিদ্ধ অলংকরণ।
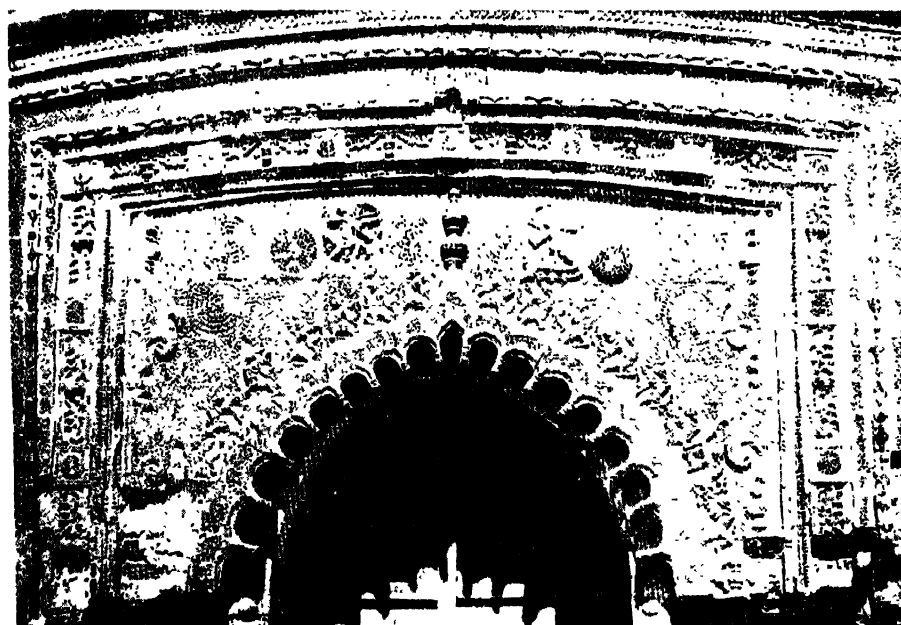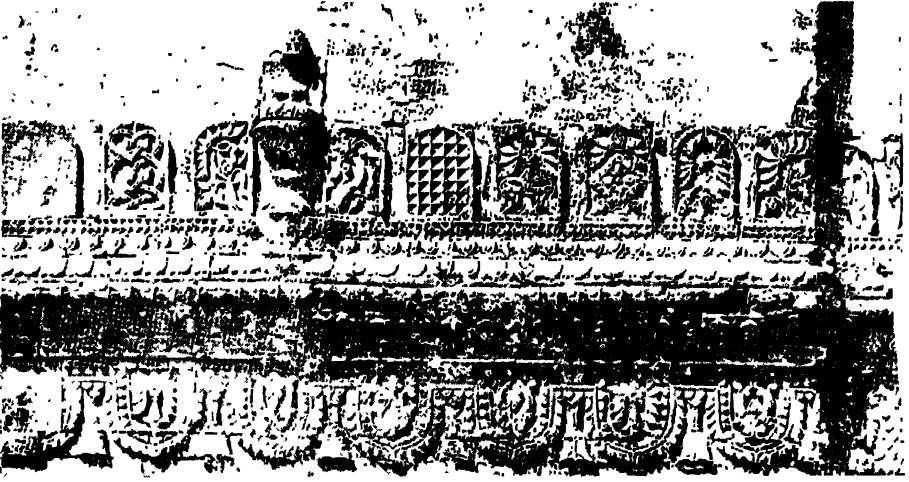
৮ উপরে/ পাণ্ডুয়া (মালদহ) - একলাখী সমাধিসৌধ (খ্রী ১৫শ শতকের প্রারম্ভ)। হিন্দু ' মোটিফ্ '- সমন্বিত ইসলামি বীতির অলংকরণ।

৯ নিচে বাঁদিকে/ গৌড় (মালদহ)- ফিরোজ মিনারে প্রযুক্ত হিন্দুরীতির চৌকাঠের ভগ্নাংশ- প্রাচীন হিন্দুরীতির লম্বমান পট্টালংকার।

১০ নিচে ডানদিকে/ জৌগ্রাম (বর্ধমান)। শিবমন্দির (খ্রী অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ)। পরবর্তী হিন্দুরীতির প্রথাসিদ্ধ অলংকরণ।
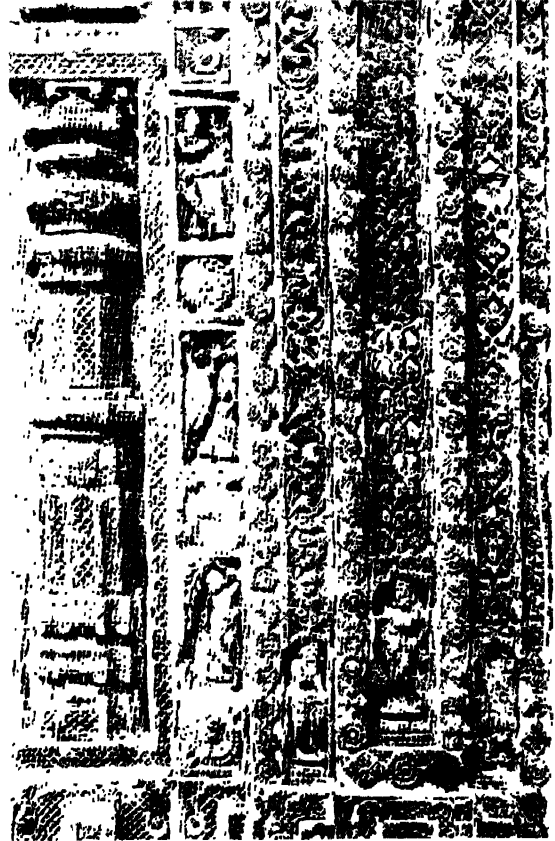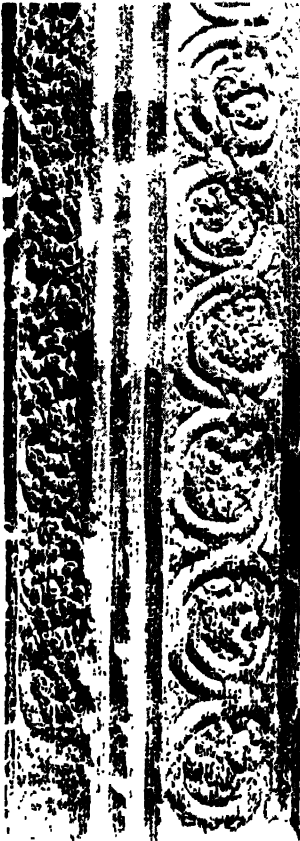
পুর্ব যুগীয় মিহ্‌রাবেই প্রকাশিত। হুগলি জিলার পাণ্ডুয়াস্থ বড়ি মসজিদের ঊনবিংশ মিহ্‌রাবে হিন্দুরীতির স্তম্ভার্ধ ইষ্টকে অনুকরণ করা হয়েছে। এই স্থাপত্যটি জরাজীর্ণ হলেও হয়তো বাংলাদেশের এখনও দাঁড়িয়ে-থাকা অপরিবর্তিত ও সর্ব-প্রাচীন মসজিদরূপে গণ্য হতে পারে। এর স্তম্ভার্ধগুলিতে হিন্দু শৈলীর রত্নমালা, ঝোলানো ঘণ্টা প্রভৃতি আছে, যেমন এই মসজিদেরই মধ্যে (চিত্র সংখ্যা ২) ইতস্তত ছড়ানো প্রাচীনতর প্রস্তর স্তম্ভসমূহে উৎকীর্ণ। এখানে পত্র-তরঙ্গের সংখ্যা পাঁচটির অধিক নয় এবং অন্তত একটি হিন্দুশৈলীর বৃত্তায়ত ত্রিপত্রের ব্যবহার রয়েছে। খিলানের উত্থান-প্রান্তে হিন্দুরীতির অনুগামীরা মকর, হংস, অলংকৃত পেখমের ময়ূর (হংস তোরণ, মরক-তোরণ তুলনীয়) প্রভৃতি স্থাপন করত। মুসলিমরা এ-প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে, আমরা আগেই যেমন লক্ষ করেছি তেমনি, এক ত্রিপত্রের অর্ধাংশের রেখাঙ্কনের প্রচলন করে ও মৃণালশীর্ষের থেকে উত্থিত পদ্মের (সূর্যদেবের হস্তধৃত পুষ্পদ্বয়ের মতো) ব্যবহার করে। উত্তরকালে এ প্রকারে, অলংকারে সজ্জিত অনেক স্তম্ভার্ধযুক্ত কুলুঙ্গি একক প্রবেশপথের হিন্দুমন্দিরে আদর্শ রূপে অনুসৃত হয়েছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মসজিদ ও মন্দিরের স্থাপত্য-সজ্জা পূর্ববর্তী কালাপেক্ষা অধিকতরভাবে একে অন্যের উপর আরোপিত হয়। অনেক প্রকৃতির স্থাপত্যরীতিই মুঘল-পূর্ব যুগের অন্তিমকালের মসজিদ হতে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রাচীনতম মন্দিরসমূহে গৃহীত হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে মসজিদগুলিই হয়তো ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অধিক সংখ্যায় নির্মিত হিন্দু মন্দিরের নিকট হতেই স্থাপত্য-অলংকরণের বেশ কয়েকটি আয়ত্ত করে নেয়। রাজশাহী জিলার কুসুম্বা-র মসজিদের মিহ্‌রাবের মতো ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের মসজিদের মিহ্‌রাবসমূহের বহির্ভাগে একটি অথবা দুটি সমান্তরাল অলংকৃত বন্ধনীর ব্যবহার দেখা যায়। তলা হতে উপরে এবং শীর্ষের প্রস্থ বা প্রসারে শায়িত এই বন্ধনীর সজ্জা হিন্দু প্রবেশপথের সঙ্গে মিহ্‌রাব-সজ্জার সাদৃশ্যকে আরও বর্ধিত করে তুলেছে। প্রায় সমসাময়িক যুগেই পূর্বতন হিন্দুমন্দিরের কয়েকটি অলংকার-সজ্জা পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রবেশদ্বারের উপরিস্থিত এক ধরনের আলংকারিক ধনুকাকার (নক্সা গ) পুরাতন দরজার পাথরের কাঠামোতে ব্যবহৃত হত। এটি

গ

ঘ

ঙ

এখন পদ্মদলে, ঝোলানো আলংকারিক পট্টবস্ত্রে, তরঙ্গায়িত খাঁজে (নক্সা ঘ ও ঙ) আরও সুসজ্জিত ও অলংকৃত হয়ে ওঠে, কিন্তু মিহ্‌রাব-এর চতুস্পার্শ্বস্থ পাড়ের নিকটে এর অবস্থিতিতে মনে হয় যে অলংকৃত সংযোজনের এই নবলব্ধ অনুপ্রেরণা হিন্দু রীতির দ্বারের কাঠামো হতেই এসেছিল। তরঙ্গায়িত খাঁজের মধ্যবর্তী স্থানের বাহিরের দিকে এক শ্রেণী পাকানো শিখার মতো অলংকার ও আরও একটি পুনরাবির্ভূত স্থাপত্যসজ্জা। এটি সেন দেবপ্রতিমা প্রভাবলী-স্থিত শূন্যস্থান পূরণোপযোগী অলংকৃত উদ্ভিদ-সজ্জাকে স্মরণ করিয়ে দেয় (নক্সা চ দ্রষ্টব্য)। এটি কালনার (বর্ধমান জিলা) ষোড়শ শতকের মসজিদে, হাড়োয়ার (চব্বিশ পরগণা জিলা) ও রাজনগরের (বীরভূম) অনিশ্চিত তারিখের পরবর্তীকালের মসজিদে এবং বৈদ্যপুর (বর্ধমান জিলা ১৫৭৮ খ্রি), রায়নগর (যশোহর ১৫৮৮ খ্রী — নক্সা জ), উজানী (ফরিদপুর) প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে সপ্তদশ শতকে নির্মিতরূপে কথিত গুপ্তিপাড়ার (হুগলি জিলা) জোড়াবাংলা মন্দিরে দৃষ্ট হয়। এটি খেরুর-এর (মুর্শিদাবাদ জিলা ১৪৯৪ খ্রি) মসজিদে উন্মেষের ভ্রূণাবস্থায় অথবা ঝোলানো অলংকারের অংশরূপে নতুনহাট (নক্সা ছ) ও কুলুটে লক্ষণীয় এবং পরবর্তী স্থাপত্যরীতিতে লম্ফদানরত সিংহের দ্বারা অপসারিত। পরস্পর জড়ানো বা পাক-খাওয়া উদ্ভিদ ও পুষ্পালংকারের বিমূর্ততর রূপায়ণ ও পত্র হতে বিবর্তিত 'কমা' চিহ্নে সমন্বিত আলংকারিক পট্টালংকার

মন্দির ও মসজিদের স্থাপত্য-সজ্জায় সর্বাধিক পার্থক্যের পরিচয় দান করে। অলংকারের এই উন্নয়নও আমরা কুসুম্বার মিহ্‌রাবে দেখি।

চ

ছ

জ

এই মধ্যবর্তী সময়কালীন সৌধাবলিতে অলংকার-সজ্জার সাদৃশ্যটি দেখবার মতো। স্বাভাবিকভাবেই মসজিদে কখনওই মানুষ বা মনুষ্যেতর জীবের রূপায়ণ হয়নি। তেমনি এই সময়ের হিন্দু মন্দিরেও দেহ-রূপায়ণের নিদর্শন নেই এবং সমস্ত অলংকারই ওই সময়ের মসজিদের অলংকারেরই অনুরূপ। বৈদ্যপুরের মন্দিরে একটি সংকীর্ণ পাড়ের মধ্যে রামায়ণের রূপায়ণ আছে, কিন্তু অন্যভাবে দেখলে খুলনা জিলার কোদ্‌লা মঠের মতো এতে মুসলিম রীতির পাড়ের অলংকারই বেশি। রাজনগরের মসজিদে মৈমনসিংহ জিলার আতিয়া-স্থিত মসজিদে (১৬০৯ খ্রি) অথবা ভূষণা-গোপালপুর বা ননীক্ষীর (ফরিদপুর জিলা) মন্দিরসমূহে একই শ্রেণীর ষোড়শ শতাব্দীর মসজিদে ব্যবহৃত পুষ্পসজ্জিত ফলকালংকারের অবস্থান হয়েছে। হুগলি জিলার আরামবাগ সাব-ডিভিশনের কৃষ্ণনগরস্থিত রাধাবল্লভ মন্দির এ ধরনের স্থাপত্য-প্রবণতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে মন্দিরের সম্মুখভাগ দীর্ঘাকার আয়তক্ষেত্রের মধ্যবর্তী পদ্মচক্রাকার অলংকরণে এবং উর্ধ্বের ও নিম্নের তরঙ্গায়িত রূপায়ণ এবং সম্মুখভাগের আচ্ছাদিত অংশের দুই পার্শ্বের ভিতরের দিকে পান পাতার ('হার্ট শেপ্‌ড') মতো মধ্যবর্তী অলংকার ও উপরে বঙ্কিম চন্দ্রকলার ভিন্নধর্মী স্থাপত্য সজ্জার ব্যবহার দর্শনযোগ্য। এ-সমস্ত রূপায়ণ বিশেষভাবেই ইসলামি রীতির খেরুর, বাজুয়া, নতুনহাট, রাজনগর, এগারাসিন্দুরের পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ হতে সপ্তদশ শতকের মধ্যাহ্ন কালের মসজিদসমূহে বর্তমান। আবার বাঘনাপাড়া (বর্ধমান জিলা ১৬১৬ খ্রি), বৈঁচিগ্রাম (হুগলি জিলা ১৬৮২ খ্রি) ননীক্ষীর (ফরিদপুর জিলা) প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের স্থাপত্যালংকারও অনুরূপ। কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দিরের সম্মুখের আচ্ছাদিত অংশের অভ্যন্তরে অগভীর কুলুঙ্গিতে তরঙ্গায়িত অলংকার দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশে পদ্ম ও কেন্দ্রস্থ ঝোলানো অলংকার এবং পুষ্প ও উদ্ভিদের কুণ্ডলাকার আকর্ষ প্রভৃতি মুসলিম রীতির অলংকার সজ্জিত। আদিনা মসজিদের বহির্ভাগের প্রাচীরগাত্রে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর এই অলংকারটি কদম রসুল সৌধের সম্মুখভাগে ষোড়শ শতকের বহুবার ব্যবহৃত হয়ে একটা স্থায়ী ও প্রচলিত রূপ পেয়েছিল। কৃষ্ণনগরের মন্দিরের ভিতরে দরজার অলংকৃত কাঠামো কুসুম্বা মিহ্‌রাবের অলংকরণের অনুগামী ও সপ্তদশ শতকের বহু মন্দিরেই উপস্থিত (যেমন বাঘনাপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, বিষ্ণুপুর, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি)। সমগ্রভাবে বলতে কৃষ্ণনগরের মন্দিরটিতে দেহজ রূপায়ণ প্রায় নেই বললেই চলে এবং উপরে বর্ণিত ফলকালংকার ও অন্যান্য সজ্জা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মসজিদেরই মতো। গোকর্ণ (মুর্শিদাবাদ জিলা ১৫৮০ খ্রি), রায়নগর (যশোহর জিলা ১৫৮৮ খ্রি), তরাস (পাবনা জিলা ১৬৩৫ খ্রি) এ-সমস্ত অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালের হিন্দুমন্দিরসমূহে পৌরাণিক কাহিনির দেহজ রূপায়ণ ও মসজিদে সহজলভ্য অলংকারের বেড় ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও ষোড়শ শতাব্দীতেই মসজিদের অলংকরণ ব্যতীত শুধুমাত্র হিন্দুরীতির পৌরাণিক চিত্র কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ও অন্যান্য সামাজিক দৃশ্যাবলির সাহায্যেও মন্দির অলংকৃত হয়েছে। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হরিপুরগড়ের (ময়ূরভঞ্জ) রসিক রায় মন্দিরে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবেশপথের ফলকসমূহ বিনিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এর পরবর্তীকালের ঘুরিসা-র (বীরভূম ১৬৩৩ খ্রি) 'লঙ্কাযুদ্ধে'র পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এর থেকে

অনুমিত হতে পারে যে অন্তত ষোড়শ শতাব্দী হতে মন্দিরে কর্মরত একদল কারুশিল্পী আপেক্ষিকভাবে মসজিদের স্থাপত্য-সজ্জার প্রভাবমুক্ত ছিল।

মুঘলযুগে একপ্রকারের গভীরতর ফলকালংকার গৃহনির্মাণের মশলার আস্তরণ দিয়ে মসজিদের প্রাচীর আবৃত করা হতে থাকে পাকজ মৃত্তিকার (টেরাকোটার) অলংকার অপসারিত করে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মৈমনসিংহ জিলার কয়েকটি নিদর্শন ব্যতিরেক 'টেরাকোটা'র অলংকার কেবলমাত্র মন্দিরেই ব্যবহৃত হতে থাকে ও মসজিদের অনুরূপ রূপসজ্জা অপসারিত হয়। পরবর্তীকালীন 'টেরাকোটা' বা পাকজ মৃত্তিকার অলংকারে ভূষিত মৈমনসিংহের এগারাসিন্দুরস্থ সাদি মসজিদ (১৬৫২ খ্রি) অথবা আতিয়াস্থ মসজিদে (১৬০৯ খ্রি) আমরা দেখি যে মিহরাবের সজ্জা (কুসুম্বা (১৫৫৮ খ্রি) মসজিদ হতে হিন্দু মন্দিরের প্রবেশপথের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত। এ ক্ষেত্রে মন্দির থেকে মসজিদ অলংকরণের অভিমুখে যাত্রার চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বীরভূম জিলার রাজনগরস্থ মতিচূড়া মসজিদে ঐতিহ্যমণ্ডিত ইসলামি অলংকার ও হিন্দুরীতির রূপসজ্জার মিশ্রণ দেখা যায় অনুরূপভাবেই। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনি-আশ্রয়ী হিন্দুরীতির দেহজ রূপায়ণের রূপসজ্জায় মণ্ডিত মন্দিরে ইসলামি রীতির বেড়ে অলংকার যেমন একদিকে ব্যবহৃত হয়েছিল তেমনই বাংলাদেশের মসজিদে প্রাচীনতর হিন্দুরীতির অলংকার উপস্থিত ছিল। অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে এই প্রবণতার সাক্ষাৎ সপ্তদশ শতকের সৌধসমূহে অধিকতর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নলডাঙায় আতিয়া মসজিদের মতো ইসলামি রীতির জ্যামিতিকধর্ম-বিজড়িত অলংকার আছে। সরলতর পুষ্পীয় বিজড়িতালংকারের সাধারণ ব্যবহার অষ্টাদশকে অতিক্রম করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থাপত্যস্থান পূর্ণকরণ বা পৃথকীকরণের জন্য নিয়োজিত মসজিদের অলংকারে (প্রায়ই পূর্বতন হিন্দুযুগ হতে প্রবাহিত) হীরক ও বৃত্ত, পাকানো রজ্জু, পদ্ম দলের সারি (পরস্পর জড়িত), ঝোলানো অলংকার অথবা শীর্ষালংকার, ঝুলন্ত পুষ্প অথবা কোরকের শ্রেণী, পরস্পরকে কেটে-যাওয়া বৃত্ত, পুষ্পসজ্জিত তরঙ্গায়িত রেখা, পরস্পর অতিক্রমকারী সরলরেখা, চতুষ্কোণী অলংকার, মুক্তামালা ও কম্পিত বা খাঁজকাটা রূপরেখের অলংকার প্রভৃতি দেখা যায়। এই সমস্ত অলংকার সাধারণত গৌড়ে বিবর্তিত প্রবেশ পথের উপরের সংকীর্ণ বেড় সমূহেই উৎকীর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যে জনপ্রিয় সূঁচালো ত্রিপত্র, বর্শাফলক বা টিক্‌লি মসজিদের খিলান-মধ্যস্থিত রেখাঙ্কনে ও মন্দিরে উপরে প্রসারিত ও নিম্নে ক্ষুদ্রায়িত রূপে আপন অধিকারেই উপস্থিত। পদ্মের মতো একটি বিশিষ্ট হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুসারী অলংকার মুসলিম যুগের সময়ে ও তার পরবর্তী যুগেই আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর উৎপন্ন উন্মুক্তদল পুষ্পালংকার ও চক্রাকার পদ্মদলের সজ্জা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় ছিল। আবার মুসলিম স্থাপত্যরীতির সৌধ-প্রান্তের উচ্চ-নীচ স্থাপত্য অলংকার বা 'ব্যাট্‌লমেন্ট' কান্তনগরের রত্নমন্দিরের মতো স্থাপত্যকর্মে ব্যবহার করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতক এগিয়ে আসার সাথে সাথে মন্দিরের স্থাপত্যালংকার স্থূলতর হয়ে পড়ে। গৌড়ের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ ও সূক্ষ্মতার পরিবর্তে বাস্তবানুগ উদ্ভিদালংকারের প্রচলন হয় এবং এই স্থূল ও অপেক্ষাকৃত অপটু হাতের অলংকরণ হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যুগের প্রারম্ভকালীন পট্টালংকারকে সরিয়ে দেয়। পুষ্পালংকার মুঘল কায়দায় সুসমঞ্জস গুচ্ছে রূপায়িত হতে থাকে। সৌধ-সম্মুখের প্রান্তে বা পাদদেশে, প্রবেশপথের খিলান-শীর্ষে, স্তম্ভে যথেষ্ট জটিল এবং পশু পাখির রূপায়ণ-যুক্ত। হিন্দু সৌধের এই নবসজ্জা বা অলংকার মসজিদের অলংকার অপেক্ষা পুথিচিত্রের মতো অন্য কোনও মাধ্যম হতে আহরিত বলে মনে হয়। কখনও কখনও মন্দালয় (হুগলি জিলা ১৭৫৮ খ্রি) বা গোবরহাটি (মুর্শিদাবাদ জিলা ১৭৭২ খ্রি) এ দুটি স্থানের মন্দিরের মতো সমগ্র স্থাপত্যটিতে এ ধরনের মানবদেহ রূপায়ণহীন অলংকারে সজ্জিত করা হয়েছে মসজিদ হতে মন্দির অলংকারে বিবর্তনের ধারায়। প্রায়ই এই শ্রেণির অলংকারের সম্পর্কযুক্ত রূপায়ণ জামানো চুন বা 'স্টুকো'র সাহায্যে করা হয়েছে। এটি এমন কিছু নতুন প্রথা নয়, কারণ 'ল্যাটেরাইট' বা মাকড়া পাথরের এই পর্যায়ের অলংকার বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার

অনেক মন্দিরেই আছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সূচনাকাল থেকে। এ ছাড়া বেড়াচাঁপার (চব্বিশ পরগণা জিলা) প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত মন্দিরেও 'স্টুকো'র ব্যবহার আছে। সুন্দরবনের সুউচ্চ জটার দেউলে এ শ্রেণীর সুন্দর অলংকারের ব্যবহার যথেষ্ট পুরাতন। আবার বর্ধমানের সাতদেউলিয়ায়, বাঁকুড়ার বহুলাড়া ও সন্তোপাল এবং পুরুলিয়ার বোড়ামস্থিত (দেউলঘাট) মন্দিরসমূহেও দেখা যায় জমানো চুনের অলংকারের ব্যবহার। শেষোক্ত মন্দিরসমূহ পাল-সেন যুগের বলে নির্দিষ্ট হলেও এর অলংকার অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী সংযোজনের ফলমাত্র। এই সমস্ত স্থাপত্য সৌধের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে 'স্টুকো' অলংকরণের উন্নতিশীল ব্যবহার মুসলিমদের বাংলাদেশে আগমনকাল থেকে সুপ্রচলিত ছিল। এই ঘটনা থেকে সিরিয়ায় ও পারস্যদেশে চলিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত 'স্টুকো'-অলংকার মুসলিম আগমনকারীরা বাংলাদেশে গ্রহণ না ক'রে 'টেরাকোটা'-র পুনরুত্থানে অধিক উৎসাহী হয়ে উঠল কেন এই প্রশ্ন ওঠে। পাকজ মৃত্তিকার অলংকার বা 'টেরাকোটা' নিশ্চিতভাবেই সুন্দরতর ও আরও আকর্ষণীয় এবং পরবর্তীকালের হিন্দু মন্দিরে 'টেরাকোটা'র অপসারণ হয়েছিল ইষ্টকের উপর জামাটচুনের অলংকারের দ্বারা এবং এই পদ্ধতি ক্রমশই অবশ্যম্ভাবী নিম্নাভিমুখী মানের দিকে এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'টেরাকোটা'য় ইয়োরোপীয় প্রভাবের এক নব্যরীতি দেখা দেয়। এই ধারা পূর্ব হতে চলিত মুসলিম অলংকরণের অবশিষ্টাংশকে আরও কমিয়ে দেয়। কিন্তু এইভাবেই মূল ইয়োরোপীয় উদ্ভিদালংকারের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ মুঘল প্রতীকসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও সর্বমতগ্রাহিতার যুগ। বীরভূম জিলার দুবরাজপুরস্থ একটি মন্দিরের সম্মুখে একটি বিশিষ্ট নিদর্শন আছে যাতে জ্যামিতিক অথবা জ্যামিতিকভাবাপন্ন পুষ্পালংকার থাকলেও তাকে আমরা বিশেষরূপে ও নির্দিষ্টভাবে মুসলিম রীতির বলে অভিহিত করতে অসমর্থ। আধুনিক যুগের আগমনকালে শিল্পী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ তাদের মনোমতো যথেচ্ছ রূপায়ণের পথ নিয়েছিল। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলায় এই সময়ে হিন্দু রীতির 'রেখ'-রূপটি মন্দিরে পুনরায় অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে মসজিদ ও মন্দির ইয়োরোপীয় প্রভাবের আয়ত্তে এসে পড়ে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাদের বিশিষ্ট রূপটি কার্যত নিশ্চিহ্ন ও হতপ্রাণ হয়ে পড়ে। ক্রমশ অলংকারের পরিমাণ কমে আসতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মন্দির ও মসজিদ উভয়ই পলেস্তারার মসৃণ ও রঙে-ধোওয়া রূপ পরিগ্রহণ করে। কেবলমাত্র গম্বুজ ও শিখর তাদের প্রকৃতির পরিচয় দিতে শুরু করে।

মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য :

১. K.A.C Creswell : *Early Muslim Architecture*
২ Percy Brown : *Indian Architecture* (Islamic Period), ch VIII
৩. H. N. Dani : *Muslim Architecture in Bengal*

Professor David McCutchion এক্ষণ-এর জন্য বিশেষভাবে লিখেছেন এই প্রবন্ধটি-*Hindu-Muslim Artistic Continuites in Bengal*।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ : সান্ত্বনা বসুমল্লিক।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
(কার্তিক-মাঘ ১৩৭৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ১৮০১–১৮৬০

প্রথমেই আমি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। যাঁহারা আমাকে এই সুযোগ দিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সাধারণের মনে হয়তো এই ধারণা বলবৎ যে, শরৎচন্দ্র শুধু কথাশিল্পীই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যচর্চার আর একটি দিকের প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বহু বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংকলন করিয়া পুস্তক আকারে গ্রথিত করেন। এই পত্রাবলি হইতে মানুষ শরৎচন্দ্রকে আমরা ভালো করিয়া জানিতে পারি। তাঁহার সাহিত্যসাধনার কথাও ইহার কয়েকখানি পত্রে বিবৃত রহিয়াছে। তিনি কয়েকবারই লিখিয়াছেন যে, প্রতিদিন বারো ঘণ্টা হইতে চৌদ্দ তিনি অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন। এই অধ্যয়ন বিভিন্ন ধরনের কঠিন কঠিন মননসাহিত্যমূলক গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান তাঁহার একটি প্রিয় বিষয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁহার কতই না আগ্রহ ওই সব পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার তিনি অবসর সময়ে ছবিও আঁকিতেন! এই সকল কথা আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। এই মননসাহিত্যচর্চার প্রতি লক্ষ রাখিয়াই আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সাম্প্রতিক কালে 'অনুবাদ' লইয়া বড়ো কথার ঝড় উঠিয়াছে। আমাদের আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ প্রতিটি অঞ্চলের ব্যবহৃত মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ববিদ্যা উচ্চতর স্তর পর্যন্ত আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য সরকারি অর্থ ও প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রামাণিক বইগুলি প্রত্যেকটি অঞ্চলবাসীর মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। কোনও কোনও বিজ্ঞজন এই অনুবাদের প্রচেষ্টার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেছেন বটে, কিন্তু একথা খুবই ঠিক যে অনুবাদ ছাড়া কোনও সাহিত্যই পরিপুষ্ট হইতে পারে না—কথাসাহিত্যও নয়, মননসাহিত্যও নয়। আজ কিন্তু মননসাহিত্যের দিকেই বেশি ঝোঁক পড়িয়াছে; কেননা উচ্চতম স্তর পর্যন্ত বিবিধ বিদ্যা শিখিবার ও শিখাইবার পক্ষে অনুবাদ একান্তই প্রয়োজন। সকল দেশেই বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় অনুবাদ ব্যাপারটি বিশেষভাবে গ্রাহ্য হইয়াছে। বিবিধ বিদ্যায় বইপুস্তকের অনুবাদ—সে ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনের বই যাহাই হোক না কেন। এক শ্রেণীর শিক্ষিতজনের মধ্যে যেমন আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট, তেমনি অপর বহু লোকের মনে ভাষাসাহিত্যের সত্যিকার উন্নতির জন্য আশার রেখাও উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। অনুবাদ দ্বারা বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য যে কীরূপ উন্নত হইয়াছে আজিকার দিনে তাহা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অনুবাদের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহই বা জাগিবে কেন?

দেড়শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে বাংলা সাহিত্যের এই দিকটি সম্বন্ধে মনীষীদের ও শিক্ষাবিদগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বস্তুত বাংলা গদ্যের গড়নের ইতিহাসই এই অনুবাদসাহিত্যের ইতিহাস, এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়। দেশবরেণ্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষাসাহিত্যকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে উচ্চতম স্থান দিয়া যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। ইহারও শতাধিক বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রি জোশুয়া মার্সম্যান ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্টস' নামক একখানি শিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকায় এই মর্মে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙালিদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে প্রাথমিক হইতে উচ্চতম শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলাকেই বাহন করিতে হইবে। তখন

কিন্তু ইংরেজির আধিপত্য আদপেই শুরু হয় নাই। সংস্কৃত ও ফার্সির মাধ্যমে আমরা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতাম। মার্সম্যান বাংলাকে এই দুইটি ভাষার পাশমুক্ত করিয়া স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। যখন কিছুকাল পরে ইংরেজি আসিয়া সংস্কৃত ও ফার্সির স্থান গ্রহণ করে এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক নতুন খাতে চালনা হইতে শুরু হয় তখনও পাদ্রি মার্সম্যান-পুত্র জন ক্লার্ক মার্সম্যান বাংলার সপক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম পাদের শিক্ষা তথা সাহিত্যপ্রচেষ্টার বিষয় পর্যালোচনা করিলে আমার স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে অনুবাদ দ্বারা বাংলা ভাষাসাহিত্য কতই না সমৃদ্ধ হইতেছে। সাহিত্যাশ্রয়ী কাহিনি, নীতিকথা, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, জীবনী, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভেষজতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, পশুপক্ষীতত্ত্ব কোনওটিই ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই। আবার শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে দেখুন —খ্রিস্টীয়, হিন্দু, নানা শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়া বাংলা ভাষাকে কতই না সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত প্রযত্ন দুই-ই অনুবাদকার্যের মূল রস ও রসদ জোগাইতেছিল। আমি এখানে এই বিষয়টি সম্বন্ধেই আপনাদের কিছু শুনাইব।

২

কিন্তু ইহাতে আমি মৌলিকত্ব আদৌ দাবি করিতে পারি না। বাস্তবিকপক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান আলোচনা গবেষণা চলিয়াছে। এখনও যে ইহার শেষ হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ research কথাটির দ্বারা আমরা ইহার গূঢ়ার্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। এখন পর্যন্ত গত শতাব্দীর প্রথম দিককার অনুবাদসাহিত্য সম্বন্ধে যেসব প্রামাণিক গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে তাহার কথা আগেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডক্টর সুশীলকুমার দে *History of Bengali Language and Literature* গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন। ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য সজনীকান্ত দাসের *বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ*। ইহার পরিবর্ধিত সংস্করণ বর্তমান দশকে *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস* নামে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*-র কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস এবং বর্তমান লেখক বহু পরিশ্রমে প্রামাণিক তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গসাহিত্যসাধকদের সাহিত্যকীর্তির কথা পর্যালোচনা করিয়াছেন। মুখ্যত *সমাচার দর্পণ* হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* দুই খণ্ডেও এ বিষয়ে বহু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। অনুবাদ দ্বারা বঙ্গ ভাষাসাহিত্য যে কীরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা এই সকল গ্রন্থ পাঠে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। গবেষণার কোনও শেষ নাই। নবীন গবেষকগণও এ বিষয়টির অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা অনেকানেক নূতন বিষয় হয়তো জানিতে পারিব।

একটু আগেই সাংগঠনিক প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তিগত প্রযত্নের কথা বলিয়াছি। ইহার মূলে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে কার্য করে। সরকারি উদ্যোগ বেসরকারি প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন ধর্মাশ্রয়ীদের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মের গ্রন্থ প্রকাশ এবং আত্মরক্ষার্থ নানাবিধ প্রয়াস কার্য করিয়াছিল বিশেষভাবে। আমরা ক্রমে এ সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমেই বিভিন্ন ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদের কথা উল্লেখ করিব। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই কেরির সম্পাদনায় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে নিউ টেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায় রামরাম বসু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জন টমাসের আনুকূল্যে নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট ম্যাথুর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। কেরির সম্পাদনাকার্যেও রামরাম বসু বিশেষ সহায় হন। কেরি স্বয়ং এবং রামরাম বসু, জন টমাস, ফাউন্টেন ও জোশুয়া মার্সম্যান একযোগে অনুবাদকার্যে লিপ্ত হওয়ায় অনুবাদপুস্তক অত শীঘ্র বাহির হওয়া সম্ভব হইল। ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ শুরু হয় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া ১৮০৮ সনে সমগ্র ওল্ড টেস্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থের দ্বিতীয়বার বাংলায় অনুবাদ করেন কলিকাতাস্থ ব্যাপটিস্ট পাদ্রিগণ।

পাদ্রি উইলিয়ম ইয়েটসের কর্তৃত্বে ১৮৩৮ সনে এই অনুবাদকার্য আরম্ভ হয়। পরবর্তী ১৮৪৫ সনে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অনুবাদকার্য তাঁহার মিশনারি সহকর্মীগণ সমাপ্ত করেন কয়েক বৎসর পরে। দেখিতেছি কলিকাতা ব্যাপটিস্ট পাদ্রিগণ ১৮৫২ সনে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ 'ধর্মপুস্তক। অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ' প্রকাশিত করিয়াছেন।

প্রথমে ধর্মমুলক ও ধর্মাশ্রয়ী অনুবাদসাহিত্যের কথা বলিতেছি। কাজেই শ্রীরামপুরের পাদ্রিগণ কর্তৃক বাইবেল অনুবাদের পরই রামমোহন রায়ের ধর্মমূলক গ্রন্থাদি অনুবাদের কথা বলিতে হয়। রামমোহন ১৮১৪ সনে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী, একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসক—একেশ্বরবাদের পরিপোষক ও সমর্থক। বেদান্ত এবং উপনিষদ গ্রন্থসমূহ বাংলায় তর্জমাকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'বেদান্ত গ্রন্থ'—সংস্কৃত বেদান্তের অনুবাদ—প্রকাশকাল ১৮১৫ । ১৮১৯ সনের মধ্যে তিনি পর পর পাঁচখানি উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এগুলি যথাক্রমে তলবকার উপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)। তিনি এই ক'বৎসরের মধ্যে রক্ষণশীল সুবিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারেও প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে বাঙালসাহিত্য একটা স্বতঃস্ফূর্ত গতি লাভ করিল। মিশনারিদের ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে এ কথা কিন্তু আদপে প্রযোজ্য নয়। একেশ্বরবাদী হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি মিশনারিদের গালিবর্ষণ রামমোহন রায় কখনও বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। *সমাচার দর্পণে* গালিবর্ষণ দেখিয়া তিনি খুবই বিচলিত হন। ইহার উত্তরদানকল্পে *ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন* নামক একখানি পত্রিকা বাহির করিলেন ১৮২১ সনে। ইহার বাংলা অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়। বাংলা পত্রিকার নাম *ব্রাহ্মণ সেবধি*। রামমোহন মিশনারিদের উদ্দেশ্য করিয়া জোরালো ভাষায় লেখেন, আমরা পরাধীন বলিয়া আমাদের ধর্মের উপর নির্বিচারে গালিবর্ষণ হইতেছে। পাদ্রিগণ তুরস্ক কী পারস্যে যান না? সেখানে গিয়া খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারে রত হইলে কী দণ্ড বিধান হয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

রামমোহন হিন্দুধর্মের উচ্চতম পথ একেশ্বরবাদেরই সমর্থক ও প্রচারক। মূল হিন্দুধর্মের নিন্দা করিয়া তাঁহার লেখনীমুখে কেহ রেহাই পাইতেন না। ১৮১৩ সনে পাদ্রিদের এদেশে অবাধ বসবাসের অধিকার দেওয়া হইলে তাঁহারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রচারকার্যকে ব্যাহত করিবার জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগ আয়োজন চলে। ইহার ফলে অনুবাদসাহিত্য কিরূপ সমৃদ্ধ হয় পরে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। ধর্মমূলক ও ধর্মাশ্রয়ী অনুবাদসাহিত্যের কথা আগে খানিকটা বলিয়া লইলাম। এখন সাংগঠনিক প্রচেষ্টার বিষয় কিছু আলোচনা করি।

৩

কিন্তু ইহার পূর্বে একটি কথার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। প্রশ্ন —বাংলা সাহিত্যের তথা গদ্যসাহিত্যের জনক কে? কেহ বলেন রামমোহন; আবার কেহ বলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টার কথা বলিলে সাধারণের এই ভ্রমের নিরসন হইবে, ঠিক জবাবও হয়তো মিলিবে। আমি এখানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা বলিতেছি। কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। তবে উহার পূর্বে কি বাংলা গদ্য ছিল না? ছিল, কিন্তু তাহা ছিল দলিল দস্তাবেজের মধ্যে আবদ্ধ। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ও কথঞ্চিত অন্যান্য পত্রপত্রিকায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত পত্র ও দলিল কিছু কিছু ছাপা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় কোম্পানির শাসন দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। তখন বাংলার রাজন্যবর্গের সঙ্গে সরকারের পত্রালাপ হইত বাংলায়। ইংরেজি তখন ঐ অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করে নাই এই জন্য। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সরকারি দলিলাদি ঘাঁটিয়া এইরকম বহু চিঠিপত্র উদ্ধার করেন এবং এসব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* (১৯৪২) বইয়ে গ্রথিত হয়। কাজেই বাংলা গদ্য পূর্বেও যে ছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ তখন মোটেই

ছিল না। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অধ্যাপক উইলিয়ম কেরির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থ তাঁহার সহকর্মী পণ্ডিত-মনীষীদের দ্বারা। কলেজের উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাও বিলাত হইতে নবাগত তরুণ সিভিলিয়ানদের শেখানো। যাহারা যে যে প্রদেশে স্থিত হইবে তাহারা সেই সেই প্রদেশের ভাষা শিখিত। কাজেই বাংলায় যাহারা স্থিত হইত তাহারা বাংলাই শিখিত। তরুণ সিভিলিয়ানদের নূতন ভাষা শিখাইতে হইবে, কাজেই এ জন্য প্রথমাবধি কেরি ও সহকর্মীগণ বাংলা পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন কোনও কোনও বইরে ভাষা খুব সহজ, এমনকি চলতি রীতিও তাহার মধ্যে বিবৃত। সাহিত্য ও ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিদান নানা ধরনের বই লেখা হইতে লাগিল। কেরির সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিলেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইহার পরেই রামরাম বসুর স্থান।

কেরি ও তাঁহার সহকর্মীগণ বিবিধ বিষয়ে পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হন। আমি এখানে অনুবাদসাহিত্যেরই কথা বলিতেছি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম দশ-বারো বৎসরের মধ্যে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর পুস্তক বাংলায় ভাষান্তরিত হইল। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য *হিতোপদেশ* বইখানি। ১৮০১ হইতে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইহার সংস্কৃত হইতে তিনটি অনুবাদগ্রন্থ কলেজের আনুকুল্যে বাহির হইতে দেখি। প্রথমখানি পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মা কর্তৃক অনুদিত এবং ১৮০১ সনে প্রকাশিত। হিতোপদেশের দ্বিতীয় অনুবাদক পণ্ডিত রামকিশোর তর্কচূড়ামণি। এ বইখানি বাহির হয় ১৮০৮ সনে। এই বৎসরই কেরির প্রধান সহকর্মী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মূল হিতোপদেশের আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার পনেরো বৎসর পরে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে *সমাচার চন্দ্রিকা*—সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর একখানি অনুবাদপুস্তক প্রকাশ করিলেন। হিতোপদেশ আমাদের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা শুনি। প্রায় দু হাজার বৎসরেরও পুরাতন এই বই দুইখানি কত ভাষায়ই না অনুবাদ হইয়াছে। বিষ্ণুশর্মা-কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' এবং নারায়ণকৃত 'হিতোপদেশ' বই দুইখানির বিষয়বস্তু প্রায় এক, তবে বিষয় সন্নিবেশে কিছু তফাত আছে। হিতোপদেশের পর অনুবাদগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য 'তোতা ইতিহাস'। কলেজের অন্যতম পণ্ডিত চণ্ডীচরণ মুন্সি ১৮০৫ সনে কাদের বক্স প্রণীত ফার্সি 'তুতিনামা' হইতে বাংলায় অনুবাদ করেন। ফার্সি বিভাগের অন্যতম প্রধান তারিণীচরণ মিত্র ঈশপ ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনি হইতে *Oriental Fabulist* নামক একখানি পুস্তক অনুবাদ করেন বাংলা হিন্দুস্থানি ও ফার্সিভাষায়। এখানি প্রকাশিত হয় ১৮০৩ সনে। হরপ্রসাদ রায়ের *পুরুষপরীক্ষা* বাহির হইল ১৮১৫ সনে। এখানি বিদ্যাপতিকৃত সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষার অনুবাদ। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক গৃহীত বই কেরির সহকর্মীগণ ছাড়া বাহিরের লোকেরও অনেকে রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা, কী মূলে কী অনুবাদে, গদ্যসাহিত্য একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। কেরি ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রথমাবধি ইহাকে লালন করেন। কাজেই আধুনিক গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টার গৌরব যদি কাহারও প্রাপ্য হয় তাহা হইলে তাহা এই সাহিত্যকর্মীগোষ্ঠীরই প্রাপ্য।

কেরির 'ইতিহাসমালা' নামক একখানি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। এখানি বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত ১৫০টি কাহিনির বঙ্গানুবাদ। এখানিও কলেজের তরুণ সিবিলিয়ানদের জন্য লিখিত হইয়া থাকিবে। কেরির একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বৃহদাকারে প্রকাশিত বাংলা-ইংরেজি অভিধান। এখানিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল সিভিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষাদানে সহায়তা করা। অনুবাদ প্রসঙ্গে ঠিক না আসিলেও কেরির এই মহান কীর্তির কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

৪

বাংলা গদ্যের গড়নের সময় আর একদিক হইতে বিশেষ প্রেরণা আসে। সাহিত্যে উচ্চ চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশে যে ওই সময়ই বাংলা ভাষা উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল রামমোহন রায়ের অনুবাদ ও বিচারমূলক গ্রন্থাদি হইতে আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। কিন্তু সাধারণ মানুষের শিক্ষণীয় ভাষা কিরূপ হইবে?

ইহার পথ নিরূপণ করেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যকর্মীরা, বিশেষ করিয়া কেরি ও মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ছিল তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের নিমিত্ত একান্তভাবে। সাধারণ মানুষের শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের ভার নিলেন আর একটি সংগঠন বা সংস্থা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপাঠক ও গবেষকের নিকট 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র নাম নূতন নয়। এই সোসাইটি দেশী-বিদেশী জ্ঞানীগুণীদের লইয়া ১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই স্থাপিত হয় । দেখি ইহার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যকর্মীপ্রধানেরা কেহ কেহ রহিয়াছেন।—যেমন উইলিয়ম কেরি, তারিণীচরণ মিত্র প্রমুখ। তারিণীচরণ প্রথমাবধি এই সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারি বা দেশীয় সম্পাদক পদে কার্য করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য, স্থানীয় ভাষাসমূহে বিবিধ বিদ্যার পুস্তক প্রকাশ। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সি, উড়িয়া, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষারই পুস্তক প্রকাশের আয়োজন হয়। বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে সহায়তা করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কিশোরপাঠ্য পুস্তক রচনায় সুবিদ্বান ব্যক্তিরা প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এখানে বাংলার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কিশোরপাঠ্য মৌলিক পুস্তক রচনা সময়সাপেক্ষ। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অনুবাদপুস্তক রচনা ও প্রকাশে অগ্রসর হইলেন। পাঠ্যপুস্তক রচনায় ইংরেজ বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা হাত দিয়াছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে তারিণীচরণ মিত্র, রামচন্দ্র শর্মা, তারাচাঁদ দত্ত, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রামমোহন রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী কখনও একযোগে কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক রচনা করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে দেখি ফেলিক্স কেরি, উইলিয়ম ইয়েটস, জন ক্লার্ক, মার্সম্যান, ডব্লু. এইচ. পীয়ার্স, জে. ওয়েঙ্গার প্রমুখ মনীষীরা এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়েই সোসাইটি পুস্তক প্রকাশ করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করিব। পাঠ্যপুস্তক চালু করিতে হইলে গ্রহণযোগ্য পাঠশালা ও বিদ্যালয় চাই। সোসাইটির কর্তৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকে তাই বৎসরেক কাল যাইতে না যাইতেই 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় পাঠশালাগুলির 'সংস্কারসাধন এবং ক্রমে আদর্শ বাংলা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন। স্কুল বুক সোসাইটির উদ্দেশ্য সার্থকরূপ গ্রহণ করা সম্ভব হইল দ্বিতীয় সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর হইতে।

স্কুল বুক সোসাইটির কার্য অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগল। বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি অনুবাদ হইয়া বাঙালায় বাহির হইতে শুরু হইল অবিলম্বে। মনে রাখিবেন, এখানে শুধু বাংলা সাহিত্যের কথাই বলিতেছি। সোসাইটির, যতদূর যানা যাইতেছে প্রথম অনুবাদপুস্তক সঙ্কলন করেন ইহার দেশীয় সম্পাদক তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে। ইহারা ইংরেজি ও আরবি হইতে ৩১টি কাহিনী বাছাই করিয়া অনুবাদ করেন এবং তাহার নাম দেন 'নীতিকথা'। ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে ইহার প্রথম প্রকাশ। কিশোরদের নিকট এই বইখানি এত প্রিয় হইয়া উঠে যে দুই বৎসরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি সংস্করণে বহু সহস্র খণ্ড ছাপাইতে বাধ্য হইলেন। সোসাইটি সহজ সরল ভাষায় লিখিত বিষরবস্তু হইয়া এই সময় (১৮১৮, এপ্রিল) বাংলা প্রথম মাসিকপত্র শ্রীরামপুর হইতে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রধান লেখক দুইজন—ফেলিক্স কেরি ও জন ক্লার্ক মার্সম্যান। সম্পাদকরূপে মার্সম্যানেরই নাম আমরা পাইতেছি। পত্রিকাখানির নাম *দিগ্‌দর্শন*। ইহাতে ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কাহিনি সরস করিয়া লেখা হইত। সোসাইটি কিশোরপাঠোপযোগী জ্ঞানে ইহার প্রতি সংখ্যার শত শত খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠশালায় বিলি করিতেন। দিগ্‌দর্শনে নানা ঐতিহাসিক কাহিনি এবং কোনও কোনও দেশের ইতিহাসের অনুবাদ স্থান পাইত। ইহাতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু লইয়া পরে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরকম একখানি পুস্তক—*সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস*। মার্সম্যন ইহার লেখক। চারিখণ্ডে প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু দুই খণ্ড মাত্র বাহির হয় যথাক্রমে ১৮২৯ ও ৩০ সনে। ইংরেজি *Anecdotes of Vritue and Valour* পুস্তকের অনুবাদ এখানি। প্রথমাবধি দিগ্‌দর্শনে ইতিহাস নামে বাহির হয়। সোসাইটি এখানি

পাঠশালাসমূহে প্রচুর সংখ্যায় বিলি করিয়াছিলেন। মার্সম্যানের এধরনের অন্য উল্লেখযোগ্য অনুবাদ বই হইল *পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ* (১৮৩৩), ইংরেজি সমেত বাংলায় *ঈশপস ফেবলস* (১৮৩৪) মারিচ গ্রামারের বঙ্গানুবাদ (১৮৩৪) শুনা যায় মার্সম্যান স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত স্কুলগুলির জন্য কয়েকখানি পাঠ্যবই লেখেন। ইহার মধ্যে একখানি হইল 'জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়'। অনুবাদ কী সংকলন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, এ বিষয়টি এখানে উল্লেখমাত্র করিলাম।

পূর্বে যেমন বলিয়াছি সোসাইটি বিবিধ বই বিভিন্ন ভাষায় নিজেও প্রকাশ করিতেন। ইহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস 'পশ্বাবলী' নামক কিশোরপাঠ্য মাসিকপত্রিকা— প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ হইতে। এই পত্রিকাখানি প্রতি সংখ্যায় একটি করিয়া জন্তু, যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির সচিত্র বিবিরণ বাহির হইত। পাদ্রি লসন ইহার ইংরেজি সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং ডব্লু. এইচ. পিয়ার্স বাংলায় অনুবাদ করিতেন। এই বিবরণগুলি কয়েক বৎকরের মধ্যে পুস্তক আকারেও পাঠশালায় প্রচারের নিমিত্ত গ্রথিত হয়। কিছুকালের মধ্যে পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। রামচন্দ্র মিত্র ১৮৩৩ সনে এখানিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইংরেজি ও বাংলা পাশাপাশি রাখিয়া ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল। সোসাইটি প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' পুস্তকখানির খুবই কদর হইয়াছিল। দেখিতেছি ১৮৫২ সনে কর্তৃপক্ষ তারাশঙ্কর তর্করত্নকে দিয়া আমূল সংস্কারসাধনপূর্বক এখানি পুনরায় বাহর করেন।

সোসাইটি প্রকাশিত বা আনুকূল্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ে আরও কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের এখানে উল্লেখ করা দরকার। ফেলিক্স কেরি গোল্ডস্মিথের *History of England* পুস্তকের অনুবাদ 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' নামে অনুবাদ করেন এবং এখানি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দিগ্‌দর্শন-এ তিনি জেমস মিলের ইংরেজি ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থেরও অনুবাদ শুরু করেন, কিন্তু মৃত্যু হওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন না। জন ক্লার্ক মার্সম্যান ইহা সমাপ্ত করিয়া দুই খণ্ডে প্রকাশিত করেন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। উইলিয়ম ইয়েটস সোসাইটি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকখানি অনুবাদ রচনা করেন। এগুলি হইল যথাক্রমে—*পদার্থবিদ্যা সার* (১৮২৫), *জ্যোতির্বিদ্যা* (১৮৩০), *সত্য ইতিহাস সার* (১৮৩০), *প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়* (১৮৩০)। জনসনের বিরাট ইংরেজি অভিধানের বাংলা তর্জমা শুরু করেন রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরি ১৮২১ সনে। কেরির মৃত্যু হওয়ায় ছাপা কার্য মনে হয় কিছু কাল বন্ধ ছিল। এখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এই সময়ে, ১৮২২ সনে মেণ্ডিস নামক এক ব্যক্তি জনসনের ইংরেজি অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত করেন। এখানিও সোসাইটির আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই রকম আরও কোনও অনুবাদগ্রন্থের উল্লেখ করা চলে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হওয়া যাক। বাংলা সাহিত্যের গড়নের যুগে স্কুল বুক সোসাইটি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা কখনও ভুলিবার নয়।

৫

দুইটি সংগঠন বা সংস্থার তরফে অনুবাদ সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে পাই। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একটি পুরাপুরি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি একটি বেসরকারি সংস্থা। আমরা এখন এমন একটি সংগঠনের কথা বলিব যাহা ওই যুগের পক্ষে ছিল নিতান্তই অভিনব। এটি সম্পূর্ণ স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গ সাহিত্য অনুশীলন ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংগঠনের নাম 'গৌড়ীয় সমাজ'। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ সার্থক প্রচেষ্টাগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ওই যুগের প্রবীণ ও নবীন, রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থী বাঙালিরা মাতৃভাষা সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা স্বীয় সমাজের উন্নতিসাধনকল্পে এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের বাসনা করিলেও তখনই উহা

পাওয়া সম্ভবপর ছিল না; এই জন্য অনুবাদগ্রন্থের উপরই বেশি ঝোঁক দেন। ওই সময় খ্রিস্টান পাদ্রিদের পুস্তকপুস্তিকা প্রচারহেতু হিন্দুধর্মের ও সমাজের উপর নানারূপ আঘাত হানিতে দেখা যায়। এ কারণ সমাজকর্তৃপক্ষ আমাদের ধর্মগ্রন্থ এবং 'সাহিত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থের সংকলন-অনুবাদের প্রতিও সভ্যগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ধর্মীয় আচার আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের নিমিত্তও কেহ কেহ পুস্তক পরিবেশনে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসঙ্গে সমাজের সভ্য ভূকৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষালের 'ব্যবহার মুকুর' নামক গ্রন্থখানির উল্লেখ করিতেছি। সমাজ বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় পরবর্তী পনেরো বৎসরের মধ্যে বিস্তর সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের তর্জমা ক্রমান্বয়ে বাহির হইতেছিল। পুরাণ, স্মৃতি, ভাগবদ্‌গীতা, মনুসংহিতা, মুগ্ধবোধ, অমরকোষ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক অনুবাদে পণ্ডিত-মনীষীরা ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। আর এসব গ্রন্থপ্রকাশে কখনও এককভাবে এবং কখনও যৌথভাবে বাঙালি প্রধানেরা অগ্রসর হন। একটি কথা খুবই মনে রাখা দরকার। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নানারূপ সংস্কৃত ও বাংলা শাস্ত্রসাহিত্য গ্রন্থাদি প্রকাশে সোৎসাহে লিপ্ত হন। ওই যুগেই দেখি এক একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান বহু অর্থব্যয়ে এই ধরনের গ্রন্থাদির প্রকাশে উদ্যোগ করিতেছিলেন। 'সংবাদ তিমিরনাশক', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতির পক্ষে নিজ নিজ মুদ্রাযন্ত্রে এই ধরনের বিস্তর বইপুথি ছাপা হইতে থাকে। তখন পাঠকসংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু উৎসাহ ছিল অপরিসীম। ওই সময়কার এই যে সাহিত্যকর্ম-তৎপরতা তাহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের যথেষ্ট প্রেরণা ছিল। তথ্যপ্রমাণাদি বলে এ কথা আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি।

দুইখানি বিশেষ বইয়ের অনুবাদ-সংস্করণের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মনুসংহিতার বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদসহ মূল সংস্কৃত একসঙ্গে প্রকাশ করিতে শুরু করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। বিশ্বনাথ স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একাধিক অনুবাদ ইতিপূর্বে পয়ার ছন্দে হইয়াছিল, কিন্তু সরল বাংলায় মূলানুগ অনুবাদ যতদূর জানা যায় প্রথম প্রকাশ করেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি পরে *সম্বাদভাস্কর* প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গীতাখানি প্রথমে নবম অধ্যায় পর্যন্ত অনূদিত হয়; পরে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সমগ্র গীতা তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তকের উল্লেখ করি : *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড* (১৮২৫), *মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী* (১৮২৫), *চৌরপঞ্চাশিকা* (১৮২৫), *চাণক্য শ্লোক* (১৮২৫), *মোহমুদ্গর* (১৮২৫), *দায়ভাগ* ইত্যাদি (১৮২৫), *মুগ্ধবোধ* (১৮২৬), *অমরকোষ* (১৮৩২)।

এখানে একখানি মাসিকপত্রেরও উল্লেখ করিতেছি। ইহার বিশেষত্ব এই যে শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। পত্রিকাখানির নাম *শাস্ত্রপ্রকাশ*—জুন ১৮৩০ হইতে প্রকাশিত। ইহার সম্পাদক ছিলেন সুপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার। ইহাতে কী কী বিষয় স্থান পাইত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে : শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা, বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদি ইতিকর্ত্তব্যতা নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত এবং সংক্ষেপে চলিত ভাষায় অনূদিত। বৎসর খানেক চলিবার পর 'শাস্ত্রপ্রকাশ' বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যেমন একটু আগেই দেখিয়াছি, ইহার পূর্বে ও পরে বিচিত্র ধরনের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, মায় শাস্ত্র, মূল সংস্কৃত ও টীকাসহ অনুবাদে অথবা শুধু অনুবাদে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

৬

বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রচেষ্টা-ব্যক্তিগত প্রযত্নের কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে স্থূল স্থূল কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। *নীতিকথা* প্রসঙ্গে রামকমল সেনের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এক নূতন ধরনের পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিলেন *ঔষধসার সংগ্রহ* নামে। এখানি কিন্তু ইংরেজি ফার্মাকোপিয়ারই আংশিক অনুবাদ। এই রকম আর একখানি বইয়েরও উল্লেখ করি। এখানির নাম *চিকিৎসা*

গ্রন্থ। রবার্ট ডগলাস ইংরেজি সমেত বাংলা তর্জমা ১৮২১ সনে প্রকাশ করেন।

রামকমল সেনের প্রধান সাহিত্যিক কীর্তি কিন্তু তৎকৃত ইংরেজি-বাংলা অভিধান। তিনি জনসনের বিরাট ইংরেজি অভিধান হইতে ইংরেজি ও বাংলা প্রতিশব্দ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী ও রামকমল একযোগে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং খণ্ডাকারে প্রকাশে র ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু পর বৎসর ফেলিক্সের মৃত্যু হওয়ায় এই কার্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিল। অভিধান প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু রামকমল নিরস্ত হইবার পাত্র নন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত সাঙ্গ করিয়া তিনি এখানি ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখি ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিরাট অভিধানখানি সমগ্রটাই দুইখণ্ডে রামকমল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা জুড়িয়া দেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিককার ইতিহাসের পক্ষে ইহা একটি দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। সাহিত্য গবেষকগণ এই ভূমিকা হইতে বিস্তর মালমশলা পাইতে পারেন।

অপর দুইখানি প্রামাণিক অভিধানের প্রসঙ্গও এখনে করি। এই ১৮৩৪ সনেই সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি শব্দ-সমন্বিত একখানি অভিধান লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলয়িতা সার গ্রেবস্ হোটন (Haughton)। অপর আভিধানখানি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-কৃত ফার্সি-বাংলা প্রতিশব্দ ইহাতে প্রদত্ত হয়। এই অভিধান প্রসঙ্গে ওই সময়কার কথা একটু বলি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৮৩৮ সনে স্থির করেন যে আদালতে ফার্সির পরিবর্তে সব কাজকর্ম বাংলায় নির্বাহ হইবে। কিন্তু ফার্সি শব্দের সাধু বাংলা খুব কম লোকেরই জানা। একারণ এ অভাব পূরণের নিমিত্ত জয়গোপাল অভিধান প্রকাশে মনস্থ করিয়াছিলেন।

৭

এখন আমরা ফেলিক্স কেরীর প্রযত্নের কথা অলোচনা করিব। স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষে তিনি ইল্যান্ডের ইতিহাস অনুবাদ করেন তাহা আগেই বলিয়াছি। তাঁহার বড় কাজটির কথা বলিবার পূর্বে অন্য কোনও কোনও অনুবাদের কার্য বলিয়া লই। দিগ্‌দর্শনের কথা আগেই বলিয়াছি। মিলের বিখ্যাত ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস বইয়েরও তিনি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই! তাঁর আব একখানি পুস্তক বানিয়ানের Pilgrm's Progress-এর বঙ্গানুবাদ—*যাত্রীদের অগ্রসরণ বিবরণ* নামে দুই খণ্ডে এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২১ ও ১৮২২ সনে।

এখন ফেলিক্সের বড় কাজটির কথা বলি। তাঁহার জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়, দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার পূর্ণ। ইহাকেও আমিএই পর্যায়ে ফেলতে পারি। ফেলিক্স এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পঞ্চম সংস্করণ হইতে অনুবাদে লাগিয়া গেলেন। এই কাজে তিনি কোনও কোনও পণ্ডিতের যে সাহায্য গ্রহণ করেন তাহা বলাই বহুল্য। প্রারম্ভিক প্রস্তুতির পর ফেলিক্স ছাপা কার্যে অগ্রসর হন। প্রথম শব্দ Anatomy বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দিয়া অনুবাদ শুরু করেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একটিমাত্র ৱিষয়ের অনুবাদ ১৪টি খণ্ডে প্রকাশ করিতে হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১ অক্টোবর ১৮১৯ এবং শেষ খণ্ড ১ নভেম্বর ১৮২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ৬৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে বিস্তর ছবি এবং শেষ প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা পরিমিত 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অভিধান' নামে পরিভাষা সন্নিবেশিত করেন। ফেলিক্স কেরী পণ্ডিতদের সহায়তায় সংস্কৃত এবং স্থানীয় ভাষ্য হইতে এই মূল্যবান পরিভাষাটি সংকলন করেন। পরবর্তীকালে এবিষয়ক গ্রন্থাদির পক্ষে এই পরিভাষাটি খুবই উপকারে আসে। আজিকার দিনেও অনুবাদ কালে ইহা হইতে পরিভাষাটি খুবই উপকারে আসে। আজিকার দিনেও অনুবাদকালে ইহা হইতে যে আমরা নানা শব্দসম্ভার গ্রহণ করিতে পারি তাহা সুধীজন অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই বিরাট অনুবাদ ব্যাপারের পরিকল্পনাকালে বইয়ের নাম দেওয়া হয় *বিদ্যাহারাবলী*। ফেলিক্স নিজে চিকিৎসাবিদ্যা বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শল্য চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উক্ত Anatomy শব্দটি লইয়া অনুবাদ আরম্ভ করার মধ্যে তাঁহার এই বিষয়ে মানসিক প্রবণতাও লক্ষণীয়। ফেলিক্স কেরী দ্বিতীয় বিষয়টি বাছিয়া লন Jurisprudence। ইহার

নাম দেন তিনি *স্মৃতিশাস্ত্র*—মাত্র দুই খণ্ড ১৮২১ সনে বাহির হইয়াছিল। ফেলিক্সের মৃত্যুর (১০ নভেম্বর ১৮২২) পরেই এই বিরাট হিতকর প্রচেষ্টাটির অবলুপ্তি ঘটে।

আর একটি বিষয়েও ফেলিক্সের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক জন ম্যাক্-কৃত ইংরেজি রসায়ন পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন ১৮২২ সনে। বইখানির নাম *শ্রীরামপুর কলেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা*। ম্যাক এই কলেজেই শুধু রসায়নশাস্ত্র পড়াইতেন না, দেখা যায় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতেও রসায়ন সম্বন্ধে একপ্রস্থ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সজনীকান্ত দাস বলেন ফেলিক্সের এই অনুবাদ বইখানি ম্যাকের পরবর্তী রসায়ন গ্রন্থের মধ্যে হয়তো আত্মগোপন করিয়া আছে। এই গ্রন্থখানি *কিমিয়াবিদ্যার সার* নামে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি বাংলা দুইটি অংশই ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। ইংরেজি ভূমিকাটি আজিকার দিনেও বিশেষ মূল্যবান। ম্যাক এই ভূমিকায় রসায়নের পরিভাষঅ সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন।

যাহা হোক ফেলিক্স কেরীর পরেই উল্লেখযোগ্য জন ক্লার্ক মার্সম্যানের প্রযত্ন। *দিগ্‌দর্শন*, *সমাচার দর্পণ*, এবং *Friend of India* -র সম্পাদক রূপে তিনি সুধী-সমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া ওঠেন। ফেলিক্সের মতে বাংলা ভাষাসাহিত্যেও তাঁহার দখল ছিল সুগভীর। এই মার্সম্যান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। এখানে একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই। মার্সম্যানের পূর্বে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উইলিয়ম কেরিকে ১৮২৪ সনে বাংলা অনুবাদক পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩০ সন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সরকারি আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থার নিয়মিত বাংলা অনুবাদ করিয়া দিতেন। ১৮২২ সনের বাজেয়াপ্তি আইন এবং ১৮২৯ সনের সতীদাহ নিবারক আইনের তৎকৃত অনুবাদ উল্লেখযোগ্য বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কেরির পরে মার্সম্যান এই অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মাতৃভাষা ইংরেজি হইলেও বঙ্গদেশে আশৈশব অবস্থান করায় মার্সম্যান বাংলাকে অতি সহজেই দ্বিতীয় মাতৃভাষা রূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বিষেয়ে তিনি ছিলেন সত্যসত্যই ফেলিক্স কেরির দোসর। মার্সম্যান সব্যসাচী। ইংরেজি ও বাংলায় তিনি বিস্তর বই লেখেন। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও সমসাময়িক ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসনব্যবস্থা, সরকারি আইনকানুন, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক পুস্তক রহিয়াছে। এখানো অনুবাদসাহিত্যের কথাই বলা হইতেছে, একারণ আমার আলোচনা স্বভাবতই সীমিত। মার্সম্যানের দুই ধরনের অনুবাদগ্রন্থ সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু উল্লেখ করিব।

প্রথমেই মার্সম্যান-কৃত অনুবাদপুস্তক *ক্ষেত্র বাগান বিবরণ*-এর কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। কলিকাতাস্থ এগ্রিকালচারাল এন্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি, সংক্ষেপে কৃষিসমাজ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির তথ্যনির্ভর বিবিরণ সংগ্রহ করিয়া নিজ জার্নালে এবং ট্রানজ্যাকশন্সে প্রকাশিত করিতেন। সে যুগের বহু খ্যাতনামা ইউরোপীয় ও ভারতীয় মনীষী ইহাতে স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিতেন, অবশ্য ইংরেজিতে। বাঙালিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সে .নর নাম স্বতঃই মনে উদিত হয়। কৃষিসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২০ সনে। দশ বৎসরের মধ্যে বহু কৃষিবিষয়ক রচনা এই দুইখানিতে প্রকাশিত হইল। সমাজকর্তৃপক্ষ এই সকল হইতে বাছুনি করিয়া আবশ্যক লেখাগুলির অনুবাদ প্রকাশে মনস্থ করেন এবং সুবিজ্ঞ সব্যসাচী জন ক্লার্ক মার্সম্যানের উপর এই ভার দেন। মার্সম্যান বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া *ক্ষেত্র বাগান বিবরণ* নামে প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত করেন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮৩৬ সনে। দুই খণ্ডের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৩০। ভারতবর্ষে জাত ইক্ষু, এরারুট, কফি, চা, তামাক, তুলা, ধান্য, পিচ, গুটিপোকা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। আমি কার্যবিবরণে দেখিয়াছি বিদেশ হইতে মাঝে মাঝে বহু উন্নত ধরনের শস্য ও সবজির বীজ, যেমন আলু, তামাক প্রভৃতি তখন আনা হইতেছিল। সাম্প্রতিক কালে কৃষির উপরে কর্তাব্যক্তিদের নজর পড়িয়াছে। এই সকল তথ্যনির্ভর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মার্সম্যানের দ্বিতীয় বড়ো রকমের অনুবাদকার্যটি সম্বন্ধে এখন আপনাদের কিছু বলি। কেরির পর মার্সম্যান সরকার কর্তৃক অনুবাদকের কর্মে নিযুক্ত হন বলিয়াছি। তিনি সরকারি আইনকানুন বিধিব্যবস্থা প্রশাসনিক আচরণপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি ইংরেজি বই সংকলন করেন। আমি এখানে অনুবাদগ্রন্থের কথাই বলিতেছি। এই শ্রেণীর তৎকৃত প্রথম অনুবাদ পুস্তক হইল : *দেওয়ানী আইনের সংগ্রহ*। অর্থাৎ এখানিতে ১৭৯৩ হইতে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আইন ও আইনের অর্থ, সার্কুলার, অর্ডার প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। এই বই ছাপা হইয়া বাহির হয় ১৮৪৩ সনে। আইন সম্বন্ধীয় আর একখানি বইও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্সম্যান তদীয় *Dictionary of Law Terms* গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ *ব্যবস্থা বিধান* ১৮৫১ সনে প্রকাশিত করেন। সে যুগের সরকারি আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা-সম্বলিত আদেশপত্রাদি বাংলায় হামেশা অনূদিত হইত। এখনও প্রাচীনেরা বাংলা উকিল ও বাংলা মোক্তারের কথা স্মরণ করিতে পারেন। তখনকার দিনে Middle Vernacular বা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষায় অনূদিত আইনকানুন বিধিব্যবস্থা পড়িয়া এ শাস্ত্রে পারঙ্গম হইতেন। পরবর্তীকালে এ রীতি বর্জিত হইয়াছে। নূতন পরিবেশে আইনকানুনের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ অনেকের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদিগকে গতযুগের এইসব প্রযত্নাদি অনুধাবন করিতে বলি। ওই সকল পুস্তকও আমাদের দিগ্‌দর্শন হইবে। সাময়িক পত্রপত্রিকার দ্বারা অনুবাদসাহিত্য কিরূপ পুষ্টিলাভ করে এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লই।

৮

পশ্বাবলী-র কথা আপনাদের বলিয়াছি। এখানি ছিল বড়ো সুন্দর ছোট্ট কিশোরপত্রিকা। কিন্তু এখন বড়োদের কাগজ সম্বন্ধে কিছু বলিব। ১০ মে ১৮২৯ দিবসে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল হেরাল্ড' আত্মপ্রকাশ করে। ইহার দেশীয় ভাষায় চারিপ্রকার সংস্করণ বাহির হয়। বাংলা সংস্করণের নাম 'বঙ্গদূত'। হুবহু অনুবাদ না হইলেও হেরাল্ডে প্রকাশিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির বাংলা তর্জমা বঙ্গদূতে বাহির হইত। এই ধরনের আর একখানি পত্রিকার নাম *সমাচার দর্পণ*। বহু বৎসর পূর্বে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইলেও এই বৎসর ১১ জুলাই হইতে এখানি ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইংরেজির অনুবাদ বাংলা, কী বাংলার অনুবাদ ইংরেজি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু এই সময়কার এবং পূর্বেকার ভাষা নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে দ্বিভাষী পত্রিকার সময় হইতে বাংলা অংশ বেশ গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় পরিবেশিত হইয়া থাকে, একারণ বাংলাভাষার প্রকাশক্ষমতা অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিল। এই শ্রেণীর তৃতীয় সাপ্তাহিক হইল *রিফর্মার*—১৮৩১ সনে প্রকাশিত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই পত্রিকার পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন। কাগজখানির বাংলা অনুবাদ বাহির হয় ১৮৩১ সনের অগস্ট মাসে *অনুবাদিকা* নামে। বৎসর খানেক পরে এখানি বন্ধ হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে প্রথমে শুধু বাংলা এবং পরে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষী সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া সম্পাদনা করিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী দশকের প্রথম দিকে প্রকাশিত আর একখানি সাপ্তাহিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। জন ক্লার্ক মার্সম্যান দীর্ঘকাল পরিচালনা ও সম্পাদনা করার পর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি *সমাচার দর্পণ* প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি পরে ৪ জুলাই ১৮৪০ সনে বাংলা গভর্নমেন্ট গেজেটের সম্পাদক পদে বৃত হইলেন। এখানিতে সরকারি আইনকানুনের বঙ্গানুবাদ নিয়মিতরূপে স্থান পাইত। ১৮৫২ সনের শেষাশেষি মার্সম্যান বিলাতে চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানি সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকারি আইনকানুনের বঙ্গানুবাদ এইরূপে রীতিমতোভাবে প্রচারের সুবিধা হইয়াছিল।

সংবাদধর্মী না হইলেও আর একখানি মাসিকপত্রের কথা এখানে বলা আবশ্যক। ১৮৩২ সনের এপ্রিল মাসে *বিজ্ঞান সেবধি* নামে একখানি বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। এখানি ছিল পুরাপুরি অনুবাদ-পত্রিকা। প্রকাশ করেন *সোসাইটি ফর ট্রানস্লেটিং ইউরোপীয়ান সায়েন্সেস্*। প্রতিষ্ঠানটির নাম

হইতে বুঝা যাইতেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তই ইহার আবির্ভাব। লর্ড ব্রাউহামের বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ইহাতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন সুবিখ্যাত কবি ও সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ। এখানিও কিন্তু দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত মাত্র বাহির হইয়াছিল।

এখানে আর একখানি দ্বিভাষী পত্রিকার উল্লেখ করি। নাম—*বেঙ্গল স্পেক্টেটর*। নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষের অর্থানুকুল্যে ও উপদেশে এখানি ১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে প্রথমে মাসিক, মধ্যে পাক্ষিক এবং শেষে সাপ্তাহিক রূপে বাহির হয়। ওই যুগের প্রসিদ্ধ লেখক তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো রচনা পরিবেশন করিতেন। আমাদের বিবিধ জাতীয় সমস্যা লইয়া নূতন ভাবাদর্শে এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। বাংলা অনুবাদসাহিত্য এইরূপে বিবিধ আলোচনায় মুখর হইয়া উঠিল।

৯

জন ক্লার্ক মার্সম্যান প্রসঙ্গে এখানে আরও কিছু বলা যাক। তাঁহার বাংলা ও ইংরেজি *বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস* ওই সময়ে খুবই প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। বাংলা ইতিহাসের প্রথম অংশ গোবিন্দচন্দ্র সেন অনুবাদ করিয়া ১৮৪০ সনে *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১২০৩-১৮৩৫) প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ নামে আর একখানি অনুবাদগ্রন্থ পরে প্রকাশিত হয়; এ সম্বন্ধে যথাস্থানে বলা যাইবে। মার্সম্যানের *ভারতবর্ষের ইতিহাস* গ্রন্থের অনুবাদ করেন গোপাললাল মিত্র। ইহা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সনে মার্সম্যান-কৃত ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে *বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত* প্রকাশ করেন।

এই চল্লিশের দশকের প্রথম হইতেই আমরা এক নূতন যুগের সম্মুখীন হই। ইহার সূচনা কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বেই লক্ষ করা যায়। শিক্ষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য এ বিষয়টি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক।

সরকারি স্কুলকলেজে শিক্ষার বাহন ইংরেজি স্থির হয় পূর্ব দশকের মাঝামাঝি সময় হইতে। ইংরেজি শিখিলে চাকরি মিলিবে এই ধারণা সাধারণের মধ্যে বলবৎ হইতে থাকে। কলিকাতায় ও মফস্বলে ইংরেজি স্কুল খোলার ধুম্ পড়িয়া গেল। ফলে বাংলা শিক্ষা এবং ইহার অনুষঙ্গরূপে বাংলা সাহিত্যেরও অপহ্নব ঘটিবার আশঙ্কা হয়। সমাজের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ এইরূপ পরিণতির কথা ভাবিয়া হিন্দু কলেজের সঙ্গে ১৮৪০ সনে ১৮ জানুয়ারি 'হিন্দু কলেজ পাঠশালা' বা 'বাংলা পাঠশালা' নামে এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন যেখানে সর্বস্তরে সকল বিষয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই পাঠশালার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে—ওই সনেরই জুন মাসে। সত্বর কলিকাতার সন্নিকটে এবং দূরে শাখা পাঠশালাও স্থাপিত হইল। নেতৃবর্গ শুধু পাঠশালা স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। নূতন যুগের উপযোগী পাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশে মন দিলেন। ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের বই বাংলায় সংকলিত ও প্রকাশিত হইতে শুরু হয়। এইখানেই বাধিল গণ্ডগোল। দেখি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রমুখ অনেকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সংকলন করিলেন একখানি সংস্কৃত-বাংলা ব্যাকরণ।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি নূতন যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে না, অথচ দেশীয় সাহিত্যিক মনীষীদের লেখা পাঠ্য বইও সরকারি কর্তৃপক্ষের পছন্দ নয়। কী করা যাইবে? তাঁহারা শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক উইনিয়ম ইয়েটসের মত লইয়া একটি অভিনব উপায় বাহির করিলেন। স্থির হইল সব বিষয়েরই পাঠ্য বই প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে এবং পরে উহার বাংলা অনুবাদ বা তর্জমা করিয়া প্রকাশিত করা যাইবে। কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন যাবতীয় সরকারি স্কুলকলেজে এই ধরনের বই চালু করা হইবে। ইংরেজি বই সব

ক্ষেত্রে অত তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব নয়। একারণ স্থির হইল লণ্ডনস্থ 'চেম্বার্স এডুকেশোনাল কোর্স'-এর অন্তর্গত কিশোরপাঠ্য বইগুলি এদেশে আনাইয়া বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইতে হইবে। কিন্তু ইহাও দেখা গেল বেশ সময়সাপেক্ষ। তাই দেখি তাঁহারা ড. গ্রাণ্টকে ভার্নাকুলার ক্লাস বুক ইংরেজি হইতে সংকলনের ভার দেন। প্রথম সংকলন-বই হইতে *সার সংগ্রহ* নামে অনুবাদ পুস্তক লেখেন উইলিয়ম ইয়েট্‌স (১৮৪৪)।

এ পরিকল্পনাও বিশেষ কার্যকর হয় নাই। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি চতুর্দশ রিপোর্টে (১৮৪০-৪৪) এই ব্যবস্থাকে নিতান্তই অবাস্তব বলিয়া উল্লেখ করেন। এবং দেখাও যায় ইহা সত্বর কার্যে পরিণত করার পক্ষে বিষম বাধা। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৪৫ সন নাগাদ কর্তৃপক্ষ বঙ্গ প্রদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নিমিত্ত মফস্বলের বিভিন্ন স্থলে ১০১ টি আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৎসর দুয়েকের মধ্যে এই সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিতও হইল। কিন্তু পাঠ্য বই কোথায় মিলিবে? স্কুল বুক সোসাইটি পুনরায় আসিয়া আসর জমাইলেন।

কিন্তু উক্ত ব্যবস্থা যে একেবারে কার্যকর হয় নাই তাহা বলা যায় না। বরং এই ব্যবস্থার দরুন একটি বিষয়ে আমরা খুবই লাভবান হইয়াছি। প্রামাণিক গ্রন্থাদি হইতে বিবিধ বিদ্যার লেখা সংকলন করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করানো উক্ত সরকারি পরিকল্পনার উদ্দেশ ছিল। নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গসন্তানদের যথাযথ ও যথার্থ জ্ঞান বিতরণ তাঁহার বহুদিনের অভিপ্রায়। তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা ইংরেজি *এনসাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলেন্‌সিস্* প্রণয়নে উদ্যোগী হইলেন ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। সরকার তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা বুঝিয়া তাঁহাকে এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রণী হন। নাম হইতেই বুঝা যায় এখানি বিলিতি কোষগ্রন্থেরই অনুসারী। পূর্ব যুগে ফেলিক্স কেরি কোষগ্রন্থ সংকলনের কার্যে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তখন বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এবারে কিন্তু এই প্রযত্ন অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৮৪৬ সন হইতে ১৮৫১ সনের মধ্যে বিদ্যাকল্পদ্রুম ১৩টি খণ্ডে বাহির হইয়াছিল। এই খণ্ডগুলিতে ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, ভূগোল, বৃত্তান্ত, জীবনী, ক্ষেত্রতত্ত্ব, বিবিধ পাঠ প্রভৃতি নানা বিষয় ইংরেজি হইতে কৃষ্ণমোহন সংকলন করেন এবং ইংরেজির পাশাপাশি তাহার বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হয়। একারণ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ করিবারও কোনও কারণ ঘটে নাই। বাঙালিদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিস্তারকল্পে এই কোষগ্রন্থখানি যে সার্থকতা লাভ করে তাহা বিশেষ করিয়া বলার দরকার নাই। এই গ্রন্থের ইংরেজি বাদে সম্পূর্ণ বাংলা সংস্করণও বাহির হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। শুধু বাংলা সংস্করণ দেখার সুবিধা বা সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

এই দশকের প্রারম্ভে বঙ্গ মনীষীগণ জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে এক নূতন ধরনের সময়োপযোগী পাঠ্য বই রচনায় ও প্রকাশে যত্নপর হইয়াছিলেন তাহা তখন পূর্বোল্লিখিত কারণে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু একটি নূতন ধরনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিলেন তাঁহারা। এই কথাই এখন বলি।

১০

অনুবাদসাহিত্যে সাময়িকপত্রের দান ও কৃতিত্বের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। চল্লিশের দশকে এমন একখানি পত্রিকা নূতন ভাবাদর্শ লইয়া প্রকাশিত হইল যাহাতে সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য এবং বিশেষভাবে অনুবাদসাহিত্য সবিশেষ প্রেরণা লাভ করে। আমি এখানে সেকালের সুপ্রসিদ্ধ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কথা উল্লেখ করিতেছি। এ পত্রিকাখানি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পাক্ষিক মুখপত্ররূপে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অগস্ট আত্মপ্রকাশ করে (১৭৬৫ শকাব্দ, ১ ভাদ্র) পত্রিকাখানির পরিচালক ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই পত্রিকাখানি আবার প্রতিষ্ঠাবধি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হইল।

ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ব্যাখ্যান প্রভৃতি বাদে যাবতীয় মানবিক বিদ্যার কথা ইহাতে রীতিমতো আলোচনা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের অনুবাদও বাহির হইতে দেখি। প্রথমাবধি দেখি উপনিষদ গ্রন্থসমূহের রামমোহন-কৃত বঙ্গানুবাদ 'চূর্ণক' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এগুলি তখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুনই ওই ব্যবস্থা। সম্পাদক অক্ষয়কুমার প্রামাণিক ইংরেজি গ্রন্থাদি হইতে ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন। জর্জ কম্ব প্রণীত *Constitution of Man* নামক তৎকালীন প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ তিনি আরম্ভ করিলেন। ইহার নাম দেন *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*। পূর্ব পূর্ব দশকে 'স্কুল বুক সোসাইটি'-র আনুকূল্যে এবং কখনও ব্যক্তিগতভাবে বিবিধ বিদ্যার বিস্তর বইয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সবের বেশির ভাগই ছিল আক্ষরিক অনুবাদ এবং কিশোরপাঠ্যরূপে লিখিত হইলেও অনেক সময় দুর্বোধ্য হইত। অক্ষয়কুমার প্রমুখ সাহিত্যিকগণ অনুবাদের একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা মূল ভাব রক্ষা করিয়া অনুবাদকালে কতকটা দেশকালোপযোগী পরিবর্তন করাও যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কারণ এরূপ করিলে তারা সহজেই সাধারণগ্রাহ্য হইতে পারে। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন অনুবাদকালে বইখানিতে যেসব বিলিতি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তিনি তাহার পরিবর্তে স্বদেশীয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—বিষয়টির তাৎপর্য সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে। এই বিখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ পুস্তকাকারে পূর্ব নামেই দুই খণ্ডে গ্রথিত হয় ১৮৫১ ও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিখণ্ডের শেষে অক্ষয়কুমার এক প্রস্থ করিয়া পরিভাষা সংযোজিত করেন। যে সব ইংরেজি শব্দের তিনি বাংলা তর্জমা করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য এই তালিকায় বাংলা ও তৎপ্রতিশব্দ ইংরেজি পাশাপাশি দিয়াছেন। পরিভাষার দিক হইতে এই দুইটি তালিকাই বিশেষ মূল্যবান। অক্ষয়কুমার-কৃত *চারুপাঠ* পঞ্চাশের দশকে পর পর ১৮৫৩, '৫৪ ও '৫৯ সনে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন এখানিও নানা ইংরেজি গ্রন্থ হইতে সংকলনান্তর দেশোপযোগী করিয়া ভাষান্তর করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাও পূর্ব দশকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাক্রমে প্রকাশিত হয়। চারুপাঠ ওই যুগে কিশোরপাঠ্য বই রূপে খুবই গ্রাহ্য হয় এবং যথাযথ প্রসিদ্ধি লাভ করে। অক্ষয়কুমারের আর দুইখানি বইয়ের কথাও এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করি। একখানি হইল ১৮৫৬ সনে প্রকাশিত *ধর্মনীতি*। ইহার একটি একটি অংশ পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারের ভাষায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের মতো এখানিও 'কোনও গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে; নানা ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।' অক্ষয়কুমারের সুবিখ্যাত *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বহু বৎসর পরে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু উহাও প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ই ধারাক্রমে বাহির হয়, মুখ্যত হোরেস হেম্যান উইলসনের ইংরেজি রচনার উপর নির্ভর করিলেও এখানি অবিকল অনুবাদ নহে এবং অক্ষয়কুমার গবেষণাপ্রসূত বহু নূতন বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এই রকমে বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ও তিনি পত্রিকাস্তম্ভে অনুবাদ করিয়া কখনও সচিত্র কখনও অচিত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অপরাপর সাহিত্যকৃতির কথাও এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। আজিকার দিনে একথা হয়তো অনেকে জানেন না, যে ঋগ্বেদের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশে দেবেন্দ্রনাথ একদা বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিকে সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু সোসাইটি যখন জানিলেন যে বিলাতস্থ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সুপণ্ডিত ম্যাক্স মূলারকে দিয়া ইহার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশে অগ্রণী হইয়াছেন তখন এ কাজ হইতে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিপূর্বেই কাশীধাম হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ সমুদয়ের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৪৮ সনের ১ অগস্ট হইতে মূল সূক্তসহ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ শুরু করিয়া দিলেন দেবেন্দ্রনাথ। পুরা বিশ সবসর পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় তাঁহার এই মূলসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কিন্তু তিনি পুস্তকাকারে গ্রথিত করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্তই সর্বপ্রথম মূলসহ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকশিত করেন বহু বৎসর পরে। শুধু বঙ্গানুবাদও আলাদা গ্রন্থরূপে বাহির হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেব কথাও বলা দরকার। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* তথা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এখানে পত্রিকার কথা বলার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম দিককার তিনখানি অনুবাদগ্রন্থ সম্বন্ধে আগে বলি।

১১

তিনখানির মধ্যে প্রথম উল্লেখ করি *বেতাল পঞ্চবিংশতি* বইখানি। ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দি *বেতাল পঁচিশী* হইতে এই বই অনুবাদ করেন। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত পদে নিযুক্ত। তরুণ সিভিলিয়ানদের পাঠ্য হিসাবে ঐ সময় এখানির বেশ কদর হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমি রাধাকান্ত দেবের চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি বইগুলির মধ্যে কিছু উল্লেখ দেখি। রাধাকান্ত ইহার ভাষার উৎকর্ষ এবং পারিপাট্যাদি বিষয়ে ইহাতে লিখিয়াছেন। এখানিকে সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্রও বলিতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* হইতেই সাহিত্যসাধনায় ঈশ্বরচন্দ্রের জয়যাত্রা শুরু। বইখানির প্রথম প্রকাশ কাল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

দ্বিতীয় বইখানি *বাঙ্গালার ইতিহাস। ২য় ভাগ* ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত। জন ক্লার্ক মার্সম্যানের *An Outline of the History of Bengal* পুস্তকের গোবিন্দচন্দ্র সেন-কৃত অনুবাদের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র ওই পুস্তকের শে, ৯ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'অবলম্বন' কথাটির একটি তাৎপর্য আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলা অবধি বড়ো লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক পর্যন্ত। অনুবাদকালে ঈশ্বরচন্দ্র এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন, এই জন্যই 'অবলম্বন' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছি। তিনি মার্সম্যান-বর্ণিত কোনও কোনও বিষয় বর্জন করেন এবং অনুসন্ধানপ্রসূত কোনও কোনও নূতন বিষয়ও ইহাতে সংযোগ করেন। বইখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। রীতিমতো পাঠ্যপুস্তক না হইলেও সামান্য-শিক্ষিতেরা পর্যন্ত ইহা পাঠে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি বা কর্মসচিব মেজর জি. টি. মার্শ্যাল বইখানি পড়িয়া এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি ইংরেজি অনুবাদ হুবহু প্রকাশের মনস্থ করিলেন। কিন্তু ইহাতে যে বাধা রহিয়া গিয়াছে, মার্শ্যাল সে বাধাও অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি মূল লেখক মার্সম্যানের অনুমতি লইয়া বাংলা সরকারের অর্থে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত করিলেন। আসলে অনুবাদ হইলেও ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থখানি ছিল মৌলিক উপাদানে ঠাসা। মার্শ্যাল ইহার জন্যই ইংরেজি অনুবাদে অতখানি আগ্রহী হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই সময়কার তৃতীয় অনুবাদ বই *জীবন চরিত* প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সনে। এখানিও *বাঙ্গালার ইতিহাসে*-র মতো শুধু কিশোরপাঠ্য নহে। ভাষা এত প্রাঞ্জল যে সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিও পাঠ করিয়া মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। *জীবন চরিত* রবার্ট উইলিয়াম চেম্বার্স প্রণীত *Biography* গ্রন্থের অনুবাদ। ইউরোপের গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থখানিতে লেখা হইয়াছে। পুস্তকের শেষে ঈশ্বরচন্দ্র একটি পরিভাষাও জুড়িয়া দেন। স্বরচিত পরিভাষা পুস্তকের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া এই নূতন নহে। ইতিপূর্বেও যে কোনও কোনও লেখক এইরূপ পরিভাষা নিজ নিজ পুস্তক সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। পরিভাষা সংযোজনের উদ্দেশ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি :

> ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গালা ভাষায় অসঙ্গতি আছে, ওই অসঙ্গতি পূরণার্থে কোনও কোনও স্থলে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থল বিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে, পাঠকগণের বোধ সৌকর্যার্থে পুস্তকের শেষে তাহাদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল।

এখন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র কথায় পুনরায় আসা যাক। এই পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগাযোগের কথা একটু আগেই বলিযাছি। প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ মানবিক বিদ্যার আলোচনায় পত্রিকাখানির পৃষ্ঠা

ছিল ভরপুর। ইহা যে প্রধানত অনুবাদধর্মী তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রও অনুবাদের মাধ্যমে কোনও কোনও বিষয় ইহাতে পরিবেশন করিতে লাগিয়া যান। তাঁহার মনোগত বাসনা ছিল মহাভারতের একটি প্রামাণিক অনুবাদগ্রন্থ তিনি বাহির করিবেন। এই জন্য *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র পৃষ্ঠায় ধারাক্রমে মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ কতকটা বাদসাদ দিয়া অনুবাদ করিতে শুরু করেন। এই অংশটি সম্পূর্ণ প্রকাশিতও হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই অনুবাদ দেখিয়াই মহাভারতের একটি প্রামাণিক অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীপ্রসন্নের অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশে নিবৃত্ত হন এবং কালীপ্রসন্নের উপরে এই ভার ছাড়িয়া দেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ধনীর দুলাল কালীপ্রসন্নের পক্ষেই এইরূপ বিরাট অনুবাদগ্রন্থ সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত করা সম্ভব। ঈশ্বরচন্দ্রের আশীর্বাদ লইয়া কালীপ্রসন্ন এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একথা পরে তাঁহার প্রসঙ্গে কিছু বলিতে হইবে।

এখন পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে আমরা উপনীত হইতেছি। এই দশক ছিল বাংলায় সুকুমার সাহিত্য এবং মননসাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশের এক সুবর্ণযুগ। এ সময় কী ব্যক্তিগত প্রযত্ন, কী সরকারি ও সংবদ্ধ প্রচেষ্টা সবদিকেই এক প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করি। এই সাহিত্যকর্ম-তৎপরতাকে সিপাহি যুদ্ধও ব্যাহত করিতে পারে নাই। বাংলা সাহিত্যের বসন্তকাল যে সমাগত তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটু কবিত্ব করিয়া বলিতে পারি এই সময়কার সাহিত্যসেবীগণ কোকিলের ভূমিকা গ্রহণ করিযাছিলেন। পরবর্তী দশকে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু যে বসন্তের সূচনা করিয়াছিলেন তাহারই আগমনী এই সাহিত্য-তৎপরতার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই বিষয়টির দিকেই আমরা এখন চোখ ফিরাইতেছি।

১২

এখন আমরা পঞ্চাশের দশকে উপনীত হইতেছি। ১৮৫১ হইতে ১৮৬০ এই দশ বৎসর সাহিত্যক্ষেত্রে কী তৎপরতারই না যুগ! একদিকে ব্যক্তিগত প্রযত্ন অন্যদিকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার দরুন নানা প্রচেষ্টা, আবার সংঘবদ্ধভাবে অনুবাদ বিষয়ে প্রয়াস সব মিলিয়া বাংলা সাহিত্যকে এক শক্ত পাকাপোক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইতেছিল। সাহিত্যের ভাষা তথা অনুবাদ সাহিত্যের ভাষাও সাবলীল গতিলাভ করিতে থাকে। অনুবাদসাহিত্যের কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন বাংলা মৌলিক পুস্তক আদৌ লিখিত হয় নাই। এই ভ্রান্তির নিরসনের নিমিত্ত এ যুগের মৌলিক সাহিত্যের কথাই কিছু কিছু বলিতে হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলি বাঙালিচিত্তকে বিবিধ রসে পরিস্নাত করে। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমে মাসিকপত্রিকায় এবং পরে ১৮৫৮ সনে *আলালের ঘরের দুলাল* নামে প্রসিদ্ধ সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* যদিও কিঞ্চিৎ পরে প্রকাশিত, তথাপি এখানে রসসাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮) প্রকাশে বাংলার কাব্যসাহিত্যে এক নবযুগের সঞ্চার হইল। মূলত টডের 'রাজস্থান' হইতে কাহিনিবিশেষ লইয়া এখানি রচিত বটে, তথাপি ইহাতে ইউরোপীয় সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের নূতন নূতন ভাব ভুরি ভুরি গ্রহণ করা হয়। একারণ এখানিকে মৌলিক রচনার কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। যাহা হোক আমরা এখন আসল কথায় আসিতেছি।

এই দশকে অনুবাদ মারফত সুকুমার সাহিত্যের সঙ্গে আমরা বেশি করিয়া পরিচিত হইতেছি। একারণ এই বিষয়টি আগে বলি। এ যাবৎ শেক্সপিয়রের কোনও নাটকই বাংলায় অনূদিত হইতে দেখি নাই। ইহার আখ্যানভাগ অবলম্বনেও কোনও পুস্তক লেখা হইয়াছে বলিয়া জানি না। হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ সনে শেক্সপিয়রের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* অনুসরণে গদ্যেপদ্যে *ভানুমতী চিত্তবিলাস* লিখিলেন। ঠিক ঠিক অনুবাদ না হইলেও উক্ত পুস্তক যে এখানির মূল উপজীব্য হরচন্দ্রের কথা হইতেই এখানে বলিতেছি : যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজি কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি শেক্সপিয়রের

সম্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম গ্রহণ করিয়ছি।

এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস* বইয়ের উল্লেখ করি। এখানি অবশ্য বহু পরে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র শেক্সপিয়র-কৃত *কমেডি অব এররস্* নাটকের আখ্যানভাগ অবলম্বনে *ভ্রান্তিবিলাস* রচনা করেন।

হরচন্দ্রের পরই তারাশঙ্কর তর্করত্নের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ১৮৫৪ সনে *কাদম্বরী-র* অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারই কথায়—"সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহা ওই গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে।..." কাদম্বরী অনুবাদসাহিত্যের ক্লাসিক্স। তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পুস্তক জনসনের ইংরেজি *রাসেলাস* গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পূর্বেও একবার এই ইংরেজি গ্রন্থখানির অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তারাশঙ্করের বইখানিই বিশেষ মান্য হইয়াছে।

নীলমণি বসাক *আরব্য উপন্যাস* প্রথমে আলাদা তিন খণ্ডে এবং পরে তিন খণ্ড একত্রে বাহির করিলেন ১৮৫৪ সনে। কতকটা সংশোধন ও কোনও কোনও নূতন বিষয় সংযোজন করিয়া বাংলা ভাষায় চিত্তবিনোদনকল্পে পুস্তকাদির একান্ত অভাব দেখিয়া তিনি এই বইখানির অনুবাদকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এই মর্মে নীলমণি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্বেও কিন্তু *আরেবিয়ান নাইটস-*এর বঙ্গানুবাদ একবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু বসাক মহাশয়ের অনুবাদই বিশেষ জনাদর লাভ করে।

বঙ্গসন্তানদের চিত্তবিনোদনকল্পে নীলমণি বসাক এই কাজে হাত দেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এরূপ আনন্দদায়ক গ্রন্থের একান্ত অসদ্ভাব। দেখিতেছি বৎসর তিনেকের মধ্যেই চিত্তবিনোদক পুস্তক বিস্তর ছাপা হইতে শুরু হইয়াছে। *আলালের ঘরের দুলাল* বইখানির উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। ইহার প্রায় সমসময়ে বাহির হয় *ঐতিহাসিক উপন্যাস* গ্রন্থখানি। ইহার লেখক সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। আলাল এবং ঐ বইখানির মধ্যে একটি মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। কারণ ভূদেববাবুর বইখানি ইংরেজি গ্রন্থের অনুসরণে লেখা। গ্রন্থের ভূমিকায় ভূদেব এইরূপ লিখিয়াছেন : "ইংরেজিতে 'রোমান্স অব হিস্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ওই পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।"

আলালের ঘরের দুলাল এবং *ঐতিহাসিক উপন্যাস* ইহার কোন্‌টি আগে আত্মপ্রকাশ করে তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতানৈক্য আছে। আমি এখানেও এ তর্ক তুলিতে বিরত রহিলাম।

১৩

পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যাভিনয় বাঙালিচিত্তে কী রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে তাহা আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর অবগত আছি। সাহিত্যের এই বিভাগেরও সূচনা দেখি আলোচ্য পঞ্চাশের দশকে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন উচ্চস্তরের সাহিত্যশিল্পী। তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হইলেন। বাঙালা সাহিত্যকে রামনারায়ণ কিরূপ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ সুস্পষ্ট ধারণা ছিল সে সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি তাঁহার একটি বক্তৃতা হইতে। রামনারায়ণ প্রতিষ্ঠাবধি (২ মে ১৮৫৩) হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের বাংলা ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই উপরের কথাগুলির সারবত্তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত অনুরাগের পরিচয় ওই বক্তৃতা হইতে আমরা পাই। এই দিক দিয়া রামনারায়ণ ছিলেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সমগোত্রীয়।

এই সময়ে রামনারায়ণ পরপর অনেকগুলি নাটক লেখেন। তাঁহার অত্যধিক নাটকপ্রীতি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিত। ১৮৫৮ সনে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক প্রকাশিত হইলে বাঙালিসমাজে বেশ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এখানি রামনারায়ণের মৌলিক রচনা। নাটকখানির নাম হইতেই সমাজের যে সমস্যা ইহাকে দিন দিন জীর্ণ করিতেছিল তাহার আভাস আপনারা পাইবেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত নাটক

হইতে কয়েকখানি হুবহু অনুবাদ করিয়াছিলেন। এগুলি ওই সময় সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব'-সমেত এ সবেরও কিছু কিছু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেখি। রচনাপারিপাট্যে এবং রঙ্গ মঞ্চের দৃশ্যপটে দুই দিক দিয়াই এগুলি সার্থক হইয়াছিল। রামনারায়ণের অনুবাদনাটকগুলি তারিখওয়ারি এইরূপ : ১. *বেণীসংহার নাটক*, ১৮৫৬; ২. *রত্নাবলী নাটক*, ১৮৫৮; ৩. *অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক*, ১৮৬০। এই তিনখানি বাদে রামানারায়ণ মৌলিক নাটক প্রহসনও কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। অনুবাদ-নাটকগুতিতে যে চলিতভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে *বিবিধার্থ সংগ্রহ* তাহার সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

অনুবাদ-নাটক প্রসঙ্গে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃতিত্বের কথাও স্মরণ করি। কিশোর বয়স হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চায় লিপ্ত হন। বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ এবং বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে এই অনুবাদ পুস্তক ক-খানির কথা বলা যাক : ১. *বিক্রমোর্ব্বশী নাটক*, ১৮৫৭ : ২. *মালতী মাধব নাটক*, ১৮৫৯। তাঁহার আর একখানি নাটক, 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'—মহাভারতের মুল আখ্যায়িকা হইতে পরিগৃহীত।

কালীপ্রসন্নের কিন্তু প্রধান সাহিত্যকর্ম মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। মহাভারত অনুবাদের প্রেরণা যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট হইতে পান এবং তাঁহারই আশীর্বাদ হইয়া তিনি যে এ কার্যে অগ্রসর হন সে বিষয়ে আগে উল্লেখ করিযাছি। বস্তুত মহাভারত অনুবাদের বাসনা ত্যাগ করিয়া ইহার ভার তিনি পুরাপুরি কালীপ্রসন্নের হস্তে ছাড়িয়া দেন। কালীপ্রসন্ন সে যুগের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদকার্যের শুরু করেছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৬ সনের মধ্যে অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়া সমগ্র মহাভারত প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের অক্ষয় কীর্তি।

মহাভারতের অনুবাদ প্রসঙ্গে আরও দু-চার কথা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হইতে সিংহভবন একটি সাহিত্যসংস্কৃতির পীঠস্থান হইয়া উঠে। কালীপ্রসন্ন মহাভারত ও রামায়ণের বঙ্গানুবাদ কার্য একই সঙ্গে পরিচালনা করিবেন প্রথম দিকে এইরূপ বাসনা ছিল। কিন্তু মহাভারত লইয়াই তাঁহাকে একান্তভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এই কার্যে কী কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিযাছেন। প্রাচীন পুথিসমূহের পাঠ মিলানো একটি দুরূহ কার্য। সপ্তদশ খণ্ডে মহাভারত সমাপ্ত হয়। ইহার অষ্টাদশ পর্বের শেষে উপসংহারে কালীপ্রসন্ন এইরূপ লেখেন : "বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক পরিচালনার বিলক্ষণ অসদ্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তক সমুদায়ের পরস্পর এ প্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২/৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের শ্লোক, অধ্যায় ও প্রস্তাবঘটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে।..."

মহাভারত অনুবাদকালে যে রীতি অনুসৃত হয় সে সম্বন্ধেও কালীপ্রসন্নের উক্তি স্মরণীয় : "...অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোনও স্থলই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোনও অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।..."

কালীপ্রসন্নের অনুবাদ-সভায় সে যুগের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল। গ্রন্থসমাপ্তিকালে যাঁহারা পরলোক গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন। জীবিতদের মধ্যে মাত্র চারিজন পণ্ডিতের নাম এখানে পাইতেছি। তাঁহারা—অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, রামসেবক বিদ্যালংকার ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট হইতেই কালীপ্রসন্ন যে নানারকম উপদেশ, পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করেন সে কথা এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। আজিকার দিনে হয়তো আমাদের নিকট আশ্চর্য ঠেকিবে কিন্তু সত্য সত্যই

বিপুল অর্থব্যয়ে অনুবাদিত ও প্রকাশিত বিরাট মহাভারত কালীপ্রসন্ন বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় সাহিত্যসংস্কৃতিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন—একথা বলা আজিকার দিনেও বাহুল্য মাত্র।

১৪

এতক্ষণ আমরা ব্যক্তিগত প্রযত্নের কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। আর ইহা যে সুকুমার সাহিত্য সম্পর্কে তাহাও আপনারা লক্ষ করিয়াছেন। এখন মননসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। শতাব্দীরর প্রথমার্ধে যেমন দেখিয়াছি, এ দশকেও তেমনি পাঠ্যভিত্তিক পুস্তকাদি মননসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল, কিন্তু ইহার রকমফের প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এতদিন কিশোরপাঠ্য বইপুথিই বেশি করিয়া প্রকাশিত হইত এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারকল্পে তাহা গৃহীত হইতে থাকে। এখন কিন্তু আর এক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হইতে দেখি যাহা শুধু যে কিশোরপাঠ্য নয় তাহাই নহে, ইহা বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের বিষয়াদি লইয়া বিরচিত। অবশ্য কিশোরপাঠ্য বইও বিস্তর লিখিত হইতেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে নামজাদা সাহিত্যিক মনীষী হস্তক্ষেপ করায় ইহাও একটি উন্নত স্তরে গিয়া পৌঁছায়। এই দুইটি বিষয়েরই কথা অতঃপর আপনাদের কিছু বলিব। প্রথমে উচ্চতর পাঠক্রমের কথায় আসা যাক।

এই যুগের শিক্ষাসংস্কৃতির কথা লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা অবশ্যই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগ বা শ্রেণীর কথা শুনিয়াছেন। বাংলা বিভাগে চিকিৎসাবিষয়ক যাবতীয় বিষয়ই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অনুষঙ্গরূপে। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী দুই একটি কথাও এখানে বলিয়া লই।

মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে একটি হিন্দুস্থানি শ্রেণী খোলা হয় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষে বিভিন্নস্থলে সৈন্যবিভাগের ছাউনি ছিল। সেখানে বিস্তর হিন্দুস্থানি সিপাহির সমাবেশ। তাহাদের চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্তই কলেজে এই বিভাগের উদ্ভব। ১৮৪২-৪৩ সনে বিভাগটি পুনর্গঠিত হয় এবং ইহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন মধুসূদন গুপ্ত। এই বিভাগ পরিচালনা এবং বিশেষ করিয়া রক্ষণশীল হিন্দুস্থানিদের অস্ত্রোপচারে প্রবৃত্ত করানোর ব্যাপারে মধুসূদনের বেশ খ্যাতি হয়। সরকারি শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে বহুবার তাঁহার প্রশস্তি দেখিয়াছি। বাংলা বিভাগ খোলা সম্বন্ধেও যে প্রস্তুতি পূর্ব হইতেই চলিতেছিল একটি বিষয় হইতে তাহা আঁচ করিতে পারি। ১৮৪৫ সনেই মধুসূদন সরকারি নির্দেশে লণ্ডন ফার্মাকোপিযার অনুবাদ শেষ করেন। কিন্তু ইহা ছাপা হইতে আরও চার পাঁচ বসর লাগিয়া যায়। ফার্মাকোপিয়ার প্রথম বঙ্গানুবাদ বাহির হইল ১৮৪৯ সনে। বইখানির পুরা নাম—'লন্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া/অর্থাৎ/ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী'। মধুসূদন প্রদত্ত ভূমিকা হইতে পুস্তকখানি সম্বন্ধে জানিতে পারি :

> শ্রীযুক্ত গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে লণ্ডন ফর্ম্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংরাজী ঔষধ কল্পাবলীর সাধু বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিতা ও মুদ্রিতা হইল। যে রূপ ঐ গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গ ভাষাতে হইবেক এই আজ্ঞাহেতুক আমি সেই রীতিক্রমে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের ইংরাজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি পশ্চাৎ ঐ সকলের নাম বঙ্গভাষাতেও লিখিয়াছি। যে সকল ঔষধাদির নাম বঙ্গভাষাতে নাই তাহা কল্পিত করিয়া অনায়াসে বোধগম্য যাহাতে হয় তাহা করিয়াছি কিন্তু অনেক ইংরাজী দ্রব্যের নাম বঙ্গভাষায় প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাদিগের কেবল ইংরাজ নাম লিখিত হইয়াছে যেমন ইপিকাকুহ্নানা ইত্যাদি। এই চিকিৎসা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ সকল চলিত বঙ্গভাষায় প্রায় না থাকায় এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে কিন্তু বঙ্গভাষাতে যাহা চলিত আছে তাহা সাধ্যমতো পরিত্যাগ করা যায় নাই।
>
> শ্রীমধুসূদন গুপ্ত।

মধুসূদনের দ্বিতীয় বইখানিও হয় অনুবাদ না হয় অনুবাদ-ভিত্তিক রচনা। এখানির কথা বলিবার পূর্বে মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগ খোলা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত

বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক রচনায় এই বাংলা বিভাগ যে বিশেষ, প্রেরণা জোগায় তাহা অনস্বীকার্য। এ বিষয়টি অনুধাবন করার নিমিত্তই এই কথাগুলির অবতারণা। বাংলার অভ্যন্তরে জেলা ও মহকুমা শহরে এবং থানায় ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে পর্যন্ত চিকিৎসক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। স্থানে স্থানে হাসপাতাল স্থাপনেরও কথা চলে। কিন্তু চিকিৎসক হইবেন কাহারা? মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রসংখ্যা সীমিত। প্রতিবৎসর অল্পসংখ্যক ছাত্রই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রধান প্রধান শহরে চাহিদা মিটাইতেই তাঁহারা ছিলেন নিতান্ত অপ্রচুর। এই কারণে বাংলা বিভাগ বা শ্রেণী খোলার উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয় কলেজেরই মধ্যে ১৮৫২ সনে। মধুসূদনকে অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে এই বিভাগটি পরিচালনার ভার লইতে হয় সরকারি নির্দেশে। মধুসূদন হইলেন অ্যানাটমি অর্থাৎ শারীরবিদ্যা এবং শল্য বিদ্যার অধ্যাপক। এই বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা অধ্যক্ষ হনও তিনি। শিবচন্দ্র কর্মকার মেটিরিয়ামেডিকা বা ভৈষজ্যসংহিতা অধ্যাপক হইলেন। মেডিসিন বা ভেষজ পড়াইবার ভার পড়ে প্রসন্নকুমার মিত্রের উপর। এই দু'জনও ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র।

বাংলা বিভাগ খোলা হইল। স্থির হইল, বাংলা জানা এবং নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পড়া ছাত্রদের এখানে বাংলার মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় শিখাইতে হইবে। কিন্তু এ সব বিষয়ে বাংলা বই কোথায় মিলিবে? উপরে ফার্মাকোপিয়ার বঙ্গানুবাদের কথা বলিয়াছি। মধুসূদন এবং তাঁহার সহকর্মীরা কালবিলম্ব না করিয়া এ কার্যে অগ্রসর হইলেন। মৌলিক গ্রন্থ অত অল্প সময়ে রচনা ও প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁহাদের অগত্যা অনুবাদেরই আশ্রয় লইতে হয় চিকিৎসাবিদ্যার সহায়করূপে উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিও ছেলেদের শেখানো দরকার। এ ধরনের পুস্তকাদি প্রণয়নেও কেহ কেহ মন দিলেন। কথা উঠিয়াছে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চতম পরীক্ষা, অন্তত চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া যাইবে কি না। বই কোথায়? গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই দিক দিয়াও যে প্রচেষ্টা শুরু হয় সে সম্বন্ধে আমাদের পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিলে বর্তমান হীনমন্যতা হইতে আমরা কতকটা নিস্তার পাইতে পারি।

মধুসূদন অ্যানটমি বাংলায় রচনা করিয়া ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত করিলেন। কোনও বিশেষ গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া ইহাতে উল্লেখ নাই। তথাপি উক্ত বিষয়ের ইংরেজি গ্রন্থসমূহ হইতেই এখানি সংকলিত বলা যায় ফার্মাকোপিয়ার মতো এ বইয়েরও শেষে শারীরতত্ত্ববিষয়ক একটি মূল্যবান পরিভাষা গ্রন্থকারে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। বইখানি নিরতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আমি সৌভাগ্যক্রমে মধুসূদনের জনৈক বংশধরের নিকট হইতে এখানি আনিয়া ব্যবহার করি। দেখিতেছি মধুসূদন এনাটমির বাংলা প্রতিরূপ দিয়াছেন শারীরবিদ্যা। ফেলিক্স কেরি কিন্তু *বিদ্যাহারাবলী*-তে ইহাকে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা কহিয়াছেন। সাম্প্রতিকালে রাজশেখর বসু ইহার প্রতিশব্দ করিয়াছেন শারীরস্থানবিদ্যা। মধুসূদনের ভূমিকাংশ হইতে বুঝিতেছি এই প্রতিশব্দই যুক্তিসংগত।

মধুসূদন ভূমিকায় লেখেন:

> এনাটৌমীর প্রকৃত অর্থ ছেদবিদ্যা বস্তুতঃ চিকিৎসার্থক শারীর বিদ্যা। শারীরজ্ঞেরা মানব শারীরবিদ্যাকে শাখাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম জেনারেল এনাটৌমী অর্থাৎ সামান্য শারীরবিদ্যা এবং দ্বিতীয় ডিস্ক্রিপটিব্ এনাটৌমী অর্থাৎ নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা। / শরীরের নির্ম্মাপক সমবায়ি দ্রব্য সকলের স্বভাব ও সামান্য গুণ সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীরবিদ্যা। / দেহের নানা ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রদেশ সকল এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ্য আকৃতি ও আভ্যন্তর নির্ম্মিতি এবং তাহাদিগের যথাযথরূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং যোগ ওই সমস্ত অংশের উৎপত্তির পর যে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

বাংলা বিভাগের অধ্যয়নকাল ছিল মাত্র তিন বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রদের মোটামুটি সকল বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। এ সময় হইতে পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে বিস্তর বই যোগ্য ব্যক্তিরা রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার-স্থিত নেটিভ অর্থাৎ বাংলা ডাক্তার চন্দ্রকান্ত কর্মকারের *সর্পদংশনের চিকিৎসা* এবং আশুতোষের পিতা ডা. গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী বিদ্যা'র উল্লেখ করা যায়।

১৫

এখন যে বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যকে সবিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছি। অনুবাদের মাধ্যমে ইহা যে অনেকটা সম্ভব হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই দশকের প্রথমেই শিক্ষা বিষয়ের নিয়ামক সরকারি শিক্ষা সমাজ দুইটি বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপরে ভার অর্পণ করেন। প্রথমটি হইল গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পুনর্বিন্যাস। এখানে একটি কারণে এ বিষয়টি উল্লেখ করিতেছি। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতকে শিক্ষিত সাধারণের গ্রাহ্য করিয়া তোলেন একটি উপায়ে। *মুগ্ধবোধ*-এর অনুবাদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র পাণিনিকে ভিত্তি করিয়া প্রথম *উপক্রমণিকা* ও পরে *ব্যাকরণ কৌমুদী* বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। এই সময় হইতে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সঙ্গে আমরা যে ক্রমে পরিচয় লাভ করিতে থাকি তাহার মূলে বলিতে পারি এই *ব্যাকরণ কৌমুদী*। এখন দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

বঙ্গ সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার যথেষ্ট অপহ্নব ঘটিতে থাকে শিক্ষার বাহন ইংরেজি ধার্য হইবার সময় হইতে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ইহা রোধ করিবার চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা আশানুরূপ আদৌ ফলবতী হয় নাই। রাজনারায়ণ বসু তো বলিয়াই ছিলেন, বাংলা বিদ্যায়তনগুলির প্রতি সরকার 'সপত্নীপুত্র' ব্যবহার করিয়া থাকেন। আলোচ্য দশকের প্রথম দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর এই বাংলা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যও ভার দিলেন ছোট লাট হ্যালিডের নির্দেশে তৎকালীন সরকারি শিক্ষা বিভাগ। ঈশ্বরচন্দ্র দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলার শতাধিক আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহার ব্যয়ভার লইলেন বাংলা সরকার। প্রায় সব সময়ে তিনি বহুস্থলে আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই তো সবটা নয়। বিভিন্ন বিষয়ে সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং প্রকাশও আবশ্যক। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ও বিষয়ে তো মন দিলেনই, উপরন্তু তিনি আরও বহু বিদ্বজ্জনের সহযোগিতা লাভ করেন এই সম্পর্কে। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সাহিত্যিক মনীষীদের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ঈশ্বরচন্দ্র বহু পুস্তক নূতন করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি অনুবাদ-পুস্তক এবং কিছু কিছু সংকলন-গ্রন্থও রহিয়াছে। বইগুলি যথাক্রমে *বোধোদয়* (১৮৫১), *কথামালা*, *চরিতকথা*, *আখ্যান-মঞ্জরী* প্রভৃতি। ইহার মধ্যে *কথামালা* সম্পূর্ণই অনুবাদ-পুস্তক। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলি।

ঈশ্বরচন্দ্র *কথামালা*-র ভূমিকায় লিখিয়াছেন : শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড টমাস জেমস, ঈসপ রচিত গল্পের ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজি বই হইতে ৬৮টি গল্প প্রথমে গ্রথিত করেন, আরও ছয়টি গল্প পরে ইহাতে সংযোজিত হয় আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্ব প্রস্তাবে ঈসপস ফেবলসের উল্লেখ আমি করিয়াছি। তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েণ্টাল ফেব্যুলিস্ট-এ ঈসপের কতকগুলি গল্প অনুবাদিত হয়। জন ক্লার্ক মার্সম্যান ঈসপস ফেবলসের একটি ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এ সময়কার লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনাশৈলিগুণে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যে সব মনীষীপ্রধানদের নাম উপরে করিলাম তাঁহাদের পুস্তকগুলিও এই পর্যায়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৬), রামগতির 'বস্তুবিচার' (১৮৫৮), রাজেন্দ্রলালের *প্রাকৃত ভূগোল* (১৮৫৪), দ্বারকানাথের *গ্রীস দেশের ইতিহাস* (১৮৫৭), *রোম রাজ্যের ইতিহাস* (১৮৫৭), পুস্তকের কথা আপনাদের মনে রাখিতে বলি। মদনমোহনের 'পাখি সব করে রব' কবিতাটির কথা আপনারা হয়তো কেহই ভুলিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র-স্থাপিত এবং সরকারি অর্থে পোষিত আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে এখানে আরও কিছু বলা দরকার। কারণ কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে বাংলার বিবিধবিদ্যাবিষয়ক সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার ঘটিবার সুযোগ হয় ইহার দরুন। বাংলা শিক্ষা তথা বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারি নীতি মাঝে মাঝে

বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু সর্বত্র সত্তর শিক্ষা যে অতটা প্রসার লাভ করে তাহার ভিত্তি রচনা হয় ঐ আদর্শ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে। মিডল ভার্নাকুলার স্কুল বা মাইনর ছাত্রবৃত্তি স্কুলগুলি দিকে দিকে স্থাপিত হইল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি চালু হইতে দেখি। বিবিধ বিষয়, যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত বাংলার মাধ্যমে শেখানো হইত এবং পরীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে চিকিৎসা, আইন প্রভৃতি শিখিবার উপযুক্ত বিবেচিত হইত। যখন ইংরেজি আসিয়া ওই স্থান দখল করে তখনও দেখি মাইনর ছাত্রবৃত্তি স্কুলগুলির প্রাচুর্য অব্যাহত রহিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার প্রাবল্য ঘটিলে এই বিদ্যালয়গুলি একে একে বিলুপ্ত হয়। বাংলা চর্চার ক্রমিক ধারা যাহা একদিন উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে পর্যন্ত প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও আর রহিল না। শুধু বাংলা শিক্ষায় নহে, বাংলার মননসাহিত্যের বিকাশের পক্ষে ইহার নিমিত্ত বিষম বাধা উপস্থিত হয়। অনুবাদসাহিত্য আমার বক্তব্য হইলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চায় ভাঁটা পড়িল কেন সেদিকেও সুধীবৃন্দের দৃষ্টি পড়িবার সময় আসিয়াছে। অনুবাদসাহিত্যের প্রেরণাও এই সময় হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল।

এখন আবার পূর্ব কথায় আসি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা ইতিপূর্বে সামান্যত উল্লেখ করিয়াছি। মদনমোহনের কবিপ্রতিভা বিংশতি বৎসর বয়সেই প্রকটিত হয় বাংলা *বাসবদত্তা*-র মধ্যে। এই নামে সংস্কৃত বইখানি হইতে তিনি আখ্যানভাগ গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের *শকুন্তলা* (১৮৫৫) এবং *সীতার বনবাস* (১৮৬০) অনুবাদধর্মী হইয়াও রচনার পারিপাট্যে মৌলিক পুস্তকের গুণান্বিত। রামগতি ন্যায়রত্ন ক্যাপটেন রিচার্ডসনের ইংরেজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন *কালকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস* (১৮৫৮) নামে। কিশোরপাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গে বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না এগুলি ওই শ্রেণীর বই। প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতাস্থ কৃষি-সমাজের আনুকূল্যে *ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ* খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন ১৮৫৩ সন হইতে। ১৮৫৫ সনে ইহার পঞ্চম খণ্ড বাহির হইয়া বন্ধ হয়। এই পুস্তক উক্ত সমাজের জার্নাল এবং ট্রানস্যাক্‌শান্স-এ প্রকাশিত কৃষিবিষয়ক বিবিধ রচনার অনুবাদ। পূর্বেও কৃষি-সমাজের পক্ষে জন ক্লার্ক মার্সম্যান এইরূপ দুই খণ্ড পুস্তক অনুবাদ করেন। উদ্দেশ্য দেশবাসীর মধ্যে কৃষিবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা।

১৬

পঞ্চাশের দশকে ব্যক্তিগত প্রযত্ন এবং সরকারি আনুকূল্যে আরব্ধ কোনও কোনও প্রচেষ্টার কথা এই মাত্র বলিলাম। এই দশকের শুরুতেই আর একটি বেসরকারি উদ্যোগ দেখি। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' বা সংক্ষেপে 'অনুবাদক সমাজ'ই এই বেসরকারি উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠাকাল—ডিসেম্বর ১৮৫০। প্রকৃত প্রস্তাবে পরবর্তী সনে ইহার কার্যারম্ভ হয়। নাম হইতেই বুঝা যায় অনুবাদসাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারকল্পেই মুখ্যত ইহার উদ্ভব। ইংরেজিতে এই সমাজের নাম নানাভাবে প্রকটিত হয়। একটি দেখি, নাম দেওয়া হইয়াছে Vernacular Translation Society বা Committee। আমি বহুবৎসর পূর্বে পত্রিকান্তরে অনুবাদক সমাজ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ও চৈত্র ১৩৬১ এবং বৈশাখ ১৩৬২)। এখানে স্থূল স্থূল কয়েকটি বিষয়ের কথা মাত্র বলিতে পারিব।

অনুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে ইউরোপীয় ও বাঙালি মনীষার যুগ্ম পরিকল্পনা লক্ষ করি। উত্তরপাড়ার জমিদার বদান্যবর জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং হাওড়া জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হজসন প্রাট এই উদ্দেশ্যে হাতে হাত মেলান। তখন কলিকাতা তথা বঙ্গদেশে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিল যাহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যা বিষয়ে অনুবাদ-পুস্তক প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু সাধারণ বা সামান্যশিক্ষিত সাবালক নারীপুরুষের পক্ষে ইহা অধিগম্য করা কঠিন হইত। অনুবাদক সমাজ প্রথমেই বলেন যে, এখানকার অনুবাদ-পুস্তকগুলি হইবে সহজ সরল ভাষায় সুখপাঠ্য করিয়া লেখা। চিত্তোৎকর্ষ সাধন এবং চিত্তবিনোদন দুইই ইহার দ্বারা সম্ভব করার চেষ্টা শুরু হইতেই চলে। ভালো ভালো ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ আরম্ভ হইল। প্রথমেই দেখি

জন রবিনসন *রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত*, ডা. রোয়ার *সেকসপীয়র-কৃত গল্প* এবং হরচন্দ্র দত্ত *লার্ড ক্লাইব চরিত্র* ইংরেজি হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদকার্যে আরও অনেকে সমাজের নির্দেশে লিপ্ত হইলেন। দেখি ভূদেব মুখোপাধ্যায় , রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীপ্রধানদের নাম অনুবাদকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

১৮৫১ সনের অক্টোবর নাগাদ বিলাতের পেনী ম্যাগাজিনের আদর্শে *বিবিধার্থ সংগ্রহ* নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র অনুবাদকসমাজের মুখপত্র স্বরপ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হইলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পূর্বেও কোনও কোনও পত্রিকায় চিত্র মাঝে মাঝে বাহির হইত। কিন্তু *বিবিধার্থ সংগ্রহ*-এ বহু চিত্র নিয়মিতভাবে লেখার সঙ্গে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অচিরেই কাগজখানি নানা কারণে, বিশেষত অঙ্গসৌষ্ঠবে সুধিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রশস্তি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এখানির অযাচিত প্রশংসায় মুখর ছিলেন। অর্থাভাবহেতু এই দশকের মধ্যভাগে কিছুকাল বন্ধ থাকিলেও পরে ১৮৫৯ নাগাদ রাজেন্দ্রলালেরই সম্পাদনায় এখানি পুনঃপ্রচারিত হয়।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সে যুগের খ্যাতনামা ইংরেজ ও বাঙালি এই সমাজের কর্মকর্তৃসভায় স্থান পাইয়াছিলেন। তখন পর্যন্ত ও দুয়ের একত্রে কা করিতে কোনও বাধার সৃষ্টি হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উৎসাহদাতা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রথমাবধি এই সমাজকে প্রচুর অর্থ দান করেন। পাদ্রি লঙ্ অনুবাদকসমাজের আর একজন প্রধান কর্মকর্তা। বাঙালিদের মধ্যে দেখি সে যুগের প্রধান সাহিত্যিক মনীষী রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখকে। প্রাট ও জয়কৃষ্ণ প্রথমে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। প্রাট অন্যত্র চলিয়া গেলে আর. বি. চ্যাপম্যান নামে একজন মাঝামাঝি সময়ে সমাজের সম্পাদক হন। পরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল এই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরেজি হইতে বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করাই ছিল এই সমাজের প্রধান কাজ। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েরও বই কিছু কিছু ইহার আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে সারগর্ভ প্রস্তাবসমূহ সঙ্কলন করিয়া পাদ্রি লং 'সংবাদ সার' নামে একখানি সুন্দর পুস্তক ইহার আনুকূল্যে প্রকাশিত করেন। তৎসংকলিত ও সম্পাদিত ১২৬২ ও ৬৩ সালের নূতন পঞ্জিকা দুইখানি এই সময়কার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পঞ্জিকায় সাধারণত যেসব বিষয় থাকে তদুপরি ওই সময়ের সরকারি আইনকানুন বিধিব্যবস্থা বিভিন্ন প্রদেশে চালু মুদ্রা এবং বাংলার দূর দূর অঞ্চলের মেলা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। সমাজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে ইহা একযোগে কিছু কিছু বই বাহির করিতে থাকে। প্রামাণিক ইংরেজি গ্রন্থের কতকগুলি চরিত্র, যেমন, আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লঙ্গ, নূরজাহান, পীটার দি গ্রেট প্রভৃতি জীবনীগুলি এক একটি ছোট আকারের বইয়ে অনুবাদান্তে প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তকের প্রধান অনুবাদক ছিলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

দেখিতেছি ১৮৫৬ সনে সমাজ লেখকদের নিকট বইয়ের পাণ্ডুলিপি যাচ্ঞা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য— প্রতিটি উৎকৃষ্ট বইয়ের জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার প্রাদন। দশখানি পাণ্ডুলিপি আসে। কিন্তু তাহার মধ্যে দুইখানি উৎকৃষ্টতম বিবেচিত হয়। প্রথমখানি সমাজের সরকারি সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান* নামক উপন্যাস; দ্বিতীয়খানি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত *পদ্মিনী উপাখ্যান*। রঙ্গ লাল এখানি নিজ ব্যয়ে পরে ছাপান। *সুশীলার উপাখ্যান* অনুবাদকসমাজেরই সম্পত্তি। পরপর আরও দুইখণ্ড অর্থাৎ একুনে তিনখণ্ড প্রকাশিত হয়। এখানি যে সামান্য-শিক্ষিতদের মধ্যে খুব সমাদৃত হয় তাহার প্রমাণ পাই পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই ইহার সাত-আটটি সংস্করণে। সমাজ প্রকাশিত পুস্তকাবলির নাম দেওয়া হইয়াছিল *গার্হস্থ্য সাহিত্য*। বাস্তবিকই এই নাম সার্থক বিবেচনা করি। গদ্যের বিদ্যাসাগরীয় রীতি এবং আলালি রীতির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দুয়ের অন্তরালে আর একটি রীতিও বাঙালিচিত্তে গ্রাহ্য হইতে থাকে। *সুশীলার উপাখ্যান* এবং সমাজপ্রকাশিত বিবিধ কাহিনি, গল্প,

জীবনী প্রভৃতির মধ্যে এই রীতি বিধৃত। বঙ্কিমচন্দ্র এই বইগুলির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তখন যে বাংলা গদ্যের সহজ সরল ও সুরুচিপূর্ণ সুখপাঠ্য রূপও পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে তাহা ভুলিলে চলিবে না। সহজ সরল বাংলার সঙ্গে আমরা বাস্তবিকই পরিচিত হই ওই সময় হইতে।

ইংরেজিই শুধু নয়। সংস্কৃত হইতেও সমাজের আনুকূল্যে কোনও কোনও বই অনূদিত হয়। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের *বৃহৎ কথা* দুই খণ্ড এইরূপ বই। পরবর্তী দশকের প্রারম্ভে *জীববিদ্যা* শীর্ষক একখানি অনুবাদ বই এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *শিল্পিক দর্শন* (১৮৬০) ও *শিবজির চরিত্র* (১৮৬২) সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র পর সমাজ 'রহস্য সন্দর্ভ' মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহারও সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। ১৮৬২ সন নাগাদ অনুবাদকসমাজ স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হয়। তথাপি কয়েক বৎসর যাবৎ ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দেখি। অনুবাদকসমাজ এক যুগ ধরিয়া বাংলা সাহিত্যেকে প্রধানত অনুবাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। আজকাল প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য কত রকম উদ্যোগ দেখি, ভাষার সারল্য রক্ষা করিতে কতই না চেষ্টা। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সামান্য শিক্ষিত মানুষের চিত্তোৎকর্ষ ও চিত্তবিনোদনের যে উপায় অবলম্বিত হইতেছিল তাহার দিকে আমরা একবার দৃষ্টি ফিরাইতে পারি না কি? আমি এখানে অনুবাদকসমাজেরএবং ইহা কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুবাদিত পুস্তকাদির কথা সামান্যই বলিতে পারিলাম। এ বিষয়ের অনুসন্ধানে নবীন গবেষক আগ্রহী হইলে ভাষাসাহিত্যের ইতিহাস সুষ্ঠুরূপে প্রণয়ন সুসাধ্য হইবে।

আমার কথা এখানেই শেষ হইল। অনুবাদের মাধ্যমে ভাষাসাহিত্য সে যুগে, সেই সাহিত্য গড়নের যুগে কতখানি সহায় হইয়াছিল এখন হয়তো আপনারা ইহা কতকটা আঁচ করিতে পারিতেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে গদ্য মূলে ও অনুবাদে লালিত হইতেছিল এই পঞ্চাশের দশকে তাহার একটি সুন্দর ও সহজবোধ্য রূপ প্রত্যক্ষ করি। কথা ও লেখ্য ভাষার মধ্যে দূরত্ব দূর করার সার্থক চেষ্টা আমাদের চোখে না পড়িয়া যায় না। অনুবাদসাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সবশেষে একটি কথা বলিয়া আমি বিদায় লই। আপনারা যে এই দুরূহ বিষয়টি ধৈর্যসহকারে অনুধাবন করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।*

*আমি দৃষ্টিশক্তিহীন। এ কারণ, বলা বাহুল্য প্রতিটি কাজে আমাকে অপরের সাহায্য লইতে হয়। বর্তমান বক্তৃতা প্রস্তুতকালে শ্রীমান কানাইলাল দত্ত, নারায়ণচন্দ্র ব্রহ্ম এবং প্রশান্তকুমার বাগল আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। —লেখক।

'বাংলা অনুবাদ সাহিত্য' (১৮০১-১৮৬০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা' (১৯৬৮)-রূপে এ বছর ১২, ১৩ ও ১৪ মার্চ
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রদত্ত বক্তৃতা। — স. এ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
(ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৫)

অশ্রুকুমার সিকদার

বোর্হেসের গোলকধাঁধা

কোনও লেখক নোবেল পুরস্কার পেলে তখনই তাঁকে নিয়ে আমাদের কাগজে হইচই করা হয়। ইয়োর্গে লুইস বোর্হেস (Jorge Luis Borges) এখনও নোবেল পুরস্কার পাননি, তাছাড়া তিনি এমন এক দেশের মানুষ যার কথা খবরের কাগজের চূড়ায় সচরাচর জায়গা পায় না, তাই তাঁর সম্বন্ধে পত্রপত্রিকার এমন নীরবতা। আমাদের দেশেরই বা দোষ কী, বস্তুত ১৯৬১ সালে স্যামুয়েল বেকেটের সঙ্গে যৌথভাবে ফেরমেন্টর পুরস্কার পাবার আগে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জেন্টিনার এই লেখক সম্বন্ধে ইয়োরোপও সাধারণভাবে অজ্ঞ ছিল। অথচ এই বহুপাঠী চিন্তাশীল লেখক যে অন্ধকারময় গোলকধাঁধার জগৎ রচনা করেছেন তা বিশেষভাবে আধুনিক মানুষের উপযোগী। ১৮৯৯ সালের ২৪ অগস্ট বুয়েনোস এয়ার্সে বোর্হেসের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন বুদ্ধিজীবী লেখক মানুষ। তাঁরই বিশাল গ্রন্থাগারে শৈশব থেকে বোর্হেসের ইচ্ছামতো মানসিক ভ্রমণ আরম্ভ হয়। তাঁর মা এখনও জীবিত, এই অকৃতদার লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই কেন্দ্রস্বরূপ। বোর্হেসের ধমনীতে হিস্পানি, ইংরেজ, পর্তুগিজ ও ইহুদি পূর্বপুরুষের রক্ত প্রবহমান। তাঁর একজন পূর্বপুরুষ এসেছিলেন ইংল্যান্ডের অন্তঃপাতী নর্থাম্বারল্যান্ড থেকে। আর একজন ছিলেন পর্তুগিজ জাহাজের ক্যাপ্টেন। অন্য একজন পূর্বপুরুষ আর্জেন্টিনার গৃহযুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছিলেন। শিক্ষাসংস্কৃতির দিক থেকেও তিনি মিশ্র ঐতিহ্যের মানুষ। কিছুদিন সুইট্জারল্যান্ডের জেনিভায়, কিছুদিন স্পেনে তিনি অধ্যয়ন করেন। স্পেনে তিন বছর অধ্যয়নকালে তিনি Ultraista কবিগোষ্ঠীর সংস্রবে আসেন এবং ১৯২১ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি আর্জেন্টিনার Ultraismo কবিতার প্রবর্তক ও নেতা হন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মূলত কবিতা-লেখক। তাঁর মুক্তছন্দে লেখা কবিতায় বুয়েনোস এয়ার্সের দৃশ্য ও পরিমণ্ডল মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সময়ের কবিতায় তাঁর পরবর্তী গদ্যের নৈর্ব্যক্তিকতা নেই, তাঁর প্রথম যুগের কবিতা অনেক বেশি হার্দ্যগুণে মণ্ডিত। সময়স্রোত ও মৃত্যুচেতনা সেই কবিতাবলিতে প্রমূর্ত ও প্রতিধ্বনিত, এক চরম তাড়নায় যেন তারা পরস্পর একাকার হয়ে গেছে। কবিতা ছাড়া তিনি এই সময় লিখতেন সাহিত্যবিষয়ে প্রবন্ধ।

১৯৩০-এর পর তাঁর রচনায় এক মৌলিক পরিবর্তন এল। তাঁর গদ্যে গল্প লেখার বাইরের ইতিহাস বড় বিচিত্র। একবার পড়ে গিয়ে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান এবং অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। কয়েক মাস একটি অক্ষরও লেখেননি, কবিতা লেখায় হাত দিতে সাহসই পাননি। তাঁর ভয় হয়েছিল হয়তো লেখার শক্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। অবশেষে তিনি এই ভেবে গল্প লেখায় সন্তর্পণে হাত দেন যে তাঁর গল্প একটা নতুন ব্যাপার হবে এবং পাঠকেরা পুরোনো লেখার সঙ্গে নতুন লেখাকে তুলনা করে খারাপ বলার সুযোগ পাবে না, যেহেতু দুই ধরনের লেখার ধর্ম একেবারে আলাদা। এইভাবে গল্পের উৎস খুলে গেল। তাঁর গদ্যরচনায় হাত দেওয়ার ব্যাপারে এই ঘটনা থেকে যতটা আকস্মিক মনে হয় ততটা আকস্মিক নয়, তার পিছনে আন্তরিক প্রবর্তনাও ছিল। এই মাধ্যম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তাঁর কবিতার ইন্দ্রিয়জ জগৎ হয়ে উঠেছিল অবাস্তব, হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। ইন্দ্রিয়জ জগৎ অবাস্তব হয়ে উঠেছিল, কারণ তাঁর বাবা, তাঁর শিল্পী বোন নোরা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের মতো তিনিও দ্রুত দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছিলেন। ইন্দ্রিয়জ জগৎ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল আর্জেন্টিনায় পেরোনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায়। যে আর্জেন্টিনাকে তিনি 'this dismantled republic' বলেছিলেন তার রাজনীতিতে যোগ দেবার উৎসাহ

তাঁর ছিল না। রাজনীতিতে নিরুৎসাহ হলেও কিন্তু পেরোনের একনায়কত্বে তাঁকে কম বিব্রত হতে হয় না। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে সামান্য চাকরি নিয়ে তিনি প্রচুর এলোমেলো অধ্যয়নের যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। পেরোন তাঁকে বরখাস্ত করে নিযুক্ত করে হাঁসমুরগির খামারের ইন্সপেক্টর পদে। এই গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে বন্ধুদের উদ্যোগে তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় তিনি ইংরেজিমার্কিন সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, যে বিষয়ে তাঁর সন্দেহাতীত যোগ্যতা ছিল। এঁইসব অভিজ্ঞতার বশেই হয়তো একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের চিন্তা তাঁকে কম ভারাক্রান্ত করেনি। Deutsches Requiem গল্পে তাই সহজেই তিনি বক্তার মুখ দিয়ে নাজি-মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন। The Secret Miracle গল্পের চেক নায়ক একদিন ভোরে শোনে:

> A rhythmic, unanimous noise, punctuated by shouts of command, arose from the Zeltnergasse. It was dawn, and the armoured vanguard of the Third Reich was entering Prague.

এমনিভাবে, যিনি একদিন লিটল ম্যাগাজিনসমূহের সম্পাদনায় ব্যস্ত থাকতেন, তিনি এইসব আন্তরিক ও বহির্ঘটনার প্রবর্তনায় হয়ে উঠলেন স্থবির গৃহবাসী বহুপাঠী পণ্ডিত এবং লেখক। নির্জন ঘণ্টাগুলি বিচিত্র সাহিত্য ও দর্শন পাঠে এবং নিজের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনার কাজে এখন তিনি ব্যয় করতে লাগলেন। প্রায়-দৃষ্টিহীন এবং হীনস্বাস্থ্য এই লেখকের অক্ষম অকর্মণ্য শরীরে এক অসামান্য মণীষা দীপ্যমান হয়ে উঠল এবং সেই মনীষার দ্যুতি প্রকাশ পেল তাঁর আকারে-ছোট ঠাসবুনানি দার্শনিক উপাখ্যানগুলিতে। সমস্ত আলোড়ন উত্তেজনার মধ্যে ধ্যানস্থ লেখক রচনা ক'রে চললেন গল্পগুলিতে এক সুশৃঙ্খল নৈর্ব্যক্তিক মনীষার জগৎ। আগে তাঁর প্রবন্ধে থাকত বিশ্লেষণ, কবিতায় থাকত কল্পনা, সেই কল্পনা আর বিশ্লেষণ একাকার হয়ে গেল এই উপাখ্যানগুলিতে—যার মধ্যে বোর্হেসের পরিণত মননের সমস্ত জটিলতা ও আর্তি বর্তমান। তাৎক্ষণিক বাস্তব জগতের পরিবর্তনশীলতা ও উন্মার্গ বিশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে তাঁর এই রচনাগুলি যেন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। ভালেরির লেখায় যে মনীষার স্বচ্ছ আনন্দ ও শৃঙ্খলার জন্য গূঢ় অভিযান আছে, তা বোর্হেসেরও অভিপ্রেত। পশ্চিমি সভ্যতার প্রত্যন্ত প্রদেশে জন্মে, সেই সভ্যতার সংকট প্রত্যক্ষ ক'রে, তাঁর অনূদিত *Labyrinths* গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক জেমস ইরবির ভাষায়, বোর্হেস ইয়েটসের মতো 'monuments of unageing intellect' গড়ে তুলেছেন।

১৯৫৩ সালের পর যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ পেতে বসে তখন তিনি গল্প লেখা ছেড়ে আরও ছোট আকারের প্যারাব্‌ল লেখায় হাত দেন। এই প্যারাব্‌গুলো তাঁর *El hacedor* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, ইংরেজিতে বইটির নাম *Dreamtigers*। এতদিন গদ্যচর্চার পর শেষপর্যায়ে আবার তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু এই শেষপর্যায়ের কবিতা আগের আমলের কবিতার মতো আঙ্গিকে বা বিষয়ে বিদ্রোহী নয়। এই নতুন কবিতা আইন অমান্য করে না, শান্ত তাদের চিত্রকল্প, স্মৃতিতে বিধৃত এই কবিতার স্বর ধীর। এই নিয়মিত সুষম কবিতাগুলি সবদিক থেকেই ঐতিহ্যপরায়ণ, এমন কি প্রথানুগত। আসলে তিনটি গ্রন্থে সংকলিত যে পঁচিশ-ত্রিশটি গল্পের উপর তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির প্রতিষ্ঠা, সেইসব দার্শনিক উপাখ্যানে বিদ্রোহী বোর্হেসের সত্যস্বরূপ রয়ে গেছে; তাই বোধহয় কবিতায় তাঁর বিদ্রোহের প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে।

নিজের উদ্দেশে যে এলিজি বোর্হেস লিখেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস আছে। কবিতার শেষে বলেছেন বোর্হেসের নিয়তি অন্য সব মানুষের নিয়তি থেকে অভিন্ন। তেমনভাবে বলা যায়, বোর্হেসের উপখ্যানসমূহও সব মানুষের নিয়তির কাহিনি। কবিতাটি তর্জমা ক'রে দিলাম।

এলিজি

হায় বোর্হেসের নিয়তি

এই ভুবনের অনেক সমুদ্রে ভেসে বেড়াল

অথবা সেই একমাত্র একলা সাগরে, নানান যার নাম,
ছিল এডিনবরায়, জুরিখে, দুই করডোবায়,
কলাম্বিয়া এবং টেকসাসে,
পরিবর্তমান প্রজনীর অন্তিমে পৌঁছাল
পূর্বপুরুষের প্রাচীন ভূমিতে,
আন্‌দালুসিয়ায়, পোর্তুগালে, সেইসব দেশে
যেখানে স্যাক্‌সনেরা ডেনদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ঘটিয়েছে
রক্তে-রক্তে সংমিশ্রণ।
ঘুরে বেড়াল লন্ডনের প্রশান্ত লাল গোলকধাঁধায়,
কত আয়নায় বুড়িয়ে গেল,
মূর্তির চোখে বৃথাই খুঁজল মর্মর চাহনি,
জিজ্ঞাসাবাদ করল প্রস্তরলিপিকে, কোষগ্রন্থকে, মানচিত্রকে,
দেখল অন্য মানুষেরাও যা-যা দ্যাখে,
মৃত্যু, মন্থর উষা, সমতলভূমি,
কমনীয় নক্ষত্রনিচয়,
আসলে দেখলে না কিছুই, কিছুই না,
বুয়েনোস এয়ার্সের এক কন্যার মুখশ্রী ছাড়া,
যে মুখ চায় না তুমি তাকে মনে রাখো।
হায় বোর্হেসের নিয়তি
হয়তো তোমার নিয়তি থেকে কিছু আলাদা নয়।।

স্বদেশি লক্ষণ সাহিত্যে থাকতেই হবে, বা স্বদেশি বিষয় নিয়ে লিখতেই হবে—তা না হলে রচনা জাতীয় ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হবে বোর্হেস একথা মনে করেন না। ঐতিহ্যের নামে তিনি সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের বিরোধী। তিনি আর্জেন্টিনার লেখকের ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, নাট্যকার রাসিনকে যদি বলা যেত তিনি গ্রিকপুরাণ অবলম্বনে লিখছেন সেই জন্যে তাঁকে যথার্থ ফরাসি লেখক বলা যায় না তাহলে তিনি হতবাক হতেন। একমাত্র ইংরেজ বিষয় নিয়ে লিখতে হবে বললে শেক্‌সপিয়রও কম আশ্চর্য হতেন না। তাঁর মতের সমর্থন পেয়েছেন বোর্হেস গীবনের রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন বিষয়ক ইতিহাসে। সেই বইয়ে গীবন বলেছেন, কোরানে উটের উল্লেখ নেই। বোর্হেসের মতে কোরানের অকৃত্রিমতার চরম প্রমাণ এই উটের অনুল্লেখ। আরবদেশীয় মোহম্মদ জানতেন না উট বিশেষ করে আরবদেশীয় প্রাণী, উট তাঁর কাছে ছিল বাস্তবের অকিঞ্চিৎকর অঙ্গ। তাই উটের উল্লেখের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু মেকি লেখক, ট্যুরিস্ট বা আরব জাতীয়তাবাদী হলে কী করত? - প্রত্যেক পৃষ্ঠা উটের মিছিলে সে সাজিয়ে দিত। 'Mohammed, as an Arab, was unconcerned : he knew he could be an Arab without camels' বোর্হেস মোহম্মদের এই আচরণ অনুকরণীয় মনে করেন। যে দেশে তাঁর জন্ম, যে ভাষার তিনি লেখক সেই দেশও ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য শুধু নয়; তাঁর আনুগত্য সমগ্র পশ্চিম সভ্যতার উত্তরাধিকারের প্রতি। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহ্যে বদ্ধমূল।

প্লেটো, স্পিনোজা, পাসকাল, বার্কলে ও হিউমের মতো দার্শনিকের চিন্তা ও তত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত

করেছে। জার্মান দার্শনিক নীৎশে ও শোপেনহাউয়ারের ভাবনাও তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। বিশেষ ক'রে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অধ্যয়ন গভীর। সেই অধ্যয়ন তাঁর রচনাকে পুষ্ট করেছে। তিনি শেক্‌সপিয়রের রচনাবলি, মোরের গ্রন্থ, সুইফ্‌টের গ্যালিভারের ভ্রমণকথা, পোপের ইলিয়াডের অনুবাদ, মার্ক টোয়েন, শ', কিপ্‌লিঙের রচনা ও ইয়েটসের কবিতার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। হিস্পানি সাহিত্যের প্রধান পুরুষ সের্ভেন্টিসের সঙ্গে তাঁর রচনার সম্পর্ক নিবিড়। এ ছাড়া দান্তের দিব্যমিলন, ক্রোচের কাব্যতত্ত্ব, সুইডেনবোর্গের প্রতীকী রচনা ও কাফ্‌কার অন্ধকার থেকেও তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। তবে সাহিত্যে প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর একটি মত স্মরণীয়, তিনি মনে করেন প্রত্যেক সৎ লেখকই তাঁর পূর্বসূরী তৈরি করে নেন। বোর্হেসের লেখা পড়ার পরও মনে হবে পূর্ববর্তী অনেক লেখকের মধ্যে যেন এই ধরনটি আছে। বিশেষ ক'রে মনে হবে কাফ্‌কার মধ্যে আছে বোর্হেসের গোলকধাঁধার পূর্বাভাস্। বাস্তবিক তিনি কাফ্‌কার অনুরাগী, হিস্পানি ভাষায় যাঁরা কাফ্‌কার প্রথম অনুবাদ করেন বোর্হেস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পার্থক্য ভুললে চলে না—কাফ্‌কা উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু দশ পৃষ্ঠার বড়ো রচনা বোর্হেসের বিরল। বোর্হেস কোনওদিন উপন্যাস লিখবেন একথা বিশ্বাসই হয় না।

এক জাতের লোক আছেন যাঁরা পরিচিত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আস্থাশীল করে তোলেন। অন্য এক দল আছেন, যাঁদের কাজ পরিচিত পৃথিবী সম্বন্ধে পাঠককে সন্দিহান করে তোলা চেনা জগতের ভিত্ তাঁরা নাড়িয়ে দেন, চেনা জগৎকে হঠাৎ বড় বেশি অচেনা মনে হয়। কাফ্‌কার মতো বোর্হেসও এই শ্রেণীর একজন। তাঁর আকারে-ছোট উপাখ্যানগুলিতে যে আর্ন্তজাতিক বাতাবরণ পাই তা লেখকের মিশ্ররসের ও মিশ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ফল। আধুনিক মানুষের দেশকালজনিত, অনন্ত সম্বন্ধীয় যন্ত্রণা এইসব উপাখ্যানে বিগ্রহ পেয়েছে। এই গল্পগুলি যদিও অদ্ভুত-কল্পনা ও অতিশয়তায় ভরপুর, তবু তা নিতান্ত ইচ্ছাপুরণের ব্যাপার নয়। এখানে অপ্রত্যাশিত এসে নিয়মিত-কে বিভ্রান্ত করে, অন্তর্লীন বাস্তবতা আপাত-বাস্তবতাকে হার মানায়। বোর্হেস একটি রচনায় এক কল্পজগতের কথা বলেছেন। সেই কল্পবিশ্বের সাহিত্য উদ্ভট-কল্পনাময়, তার মহাকাব্য ও উপকথায় কোথাও বস্তুজগতের কথা আদৌ নেই। তাকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় নিতান্ত নৈরাজ্যময়, কল্পনার এক দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচার; পরে অবশ্য তার অন্তর্গূঢ় সুষমা ও সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হয়, তার উদ্ভাবনা নির্দিষ্ট নিয়মের শাসন মান্য করে। বোর্হেসের কল্পবিশ্বের সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব কথা তাঁর নিজের সাহিত্য সম্বন্ধেও খাটে।

বোর্হেস একবার বলেছিলেন উদ্ভট-কল্পনাময় সাহিত্যের মৌলিক কৌশল চারটি—গল্পের মধ্যে গল্প (যেমন আরব্যরজনীতে বা মহাকাব্যে মেলে), স্বপ্ন ও বাস্তবের একাকার (যেমন কাফ্‌কায়), অতীত বা ভবিষ্যতে প্রয়াণ (পরশুরামের উলটপুরাণ, অরওয়েলের ১৯৮৪) এবং দ্বৈতসত্তা (ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের গল্প)। উদ্ভট-কল্পনায় ভরা তাঁর রচনায়ও বোর্হেস এইসব কৌশল ব্যবহার করেছেন। গল্পের মধ্যে গল্পের উদাহরণ তিনি এইভাবে দিয়েছেন। ধরা যাক, ইংল্যান্ডের মাঝখানে এক সমতলে সর্বাংশে নিখুঁত এক বিরাট ম্যাপ আঁকা হল। তাহলে সেই ম্যাপের মধ্যে আবার তুলনীয় আকারের ম্যাপ থাকতে বাধ্য, আবার সেই ম্যাপেও ম্যাপ থাকবে, এমনি করে অনন্ত পর্যন্ত। Tlon, Uqbar, Orbis Tertius গল্পে পাই কাল্পনিক কোষগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া কল্পনা-নির্মিত এক নতুন জগতের কথা। The Lottery in Babylon-এ বাস্তব স্বপ্নের দ্বারা আক্রান্ত কাফ্‌কার 'দুর্গ' বা 'আদালতে'র মতো—এখানে বস্তুজগৎ দাঁড়িয়ে আছে লটারির ভিত্তির উপর। গণতান্ত্রিক নির্বাচনই কি এই লটারি? কোম্পানি কে বা কারা? পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা, না স্বয়ং ঈশ্বর? Theme of the Traitor and Hero গল্পে দ্বৈতসত্তার কৌশল ব্যবহার করেছেন বোর্হেস—এখানে বীর ও বিশ্বাসঘাতক একই লোক। The House of Asterion গল্পের নায়ক আস্টেরিয়ন আর একজন আস্টেরিয়নকে নিজের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখায়।

বোর্হেসের গল্পগুলোয় আছে খেলার ধরন। খেলার যেমন সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে, এই খেলারও তেমনি আরেক নিয়ম আছে, সেও তার নিজেস্ব। নবোকফ ধাঁধা তৈরি করে মজা পান, এই দিক থেকে নবোকফের

সঙ্গে বোর্হেসের মিল। *Real Life of Sebastian Knight*-এ, *Pale Fire*-এ দ্বৈতসত্তার কৌশল ব্যবহার করেছেন নবোকফ্। *Pale Fire*- এ দীর্ঘ কবিতা ও তার টিকাটিপ্পনী উপন্যাসের অঙ্গ, বোর্হেসের গল্পের সব পাদটিকা এমনকি যেগুলো সম্পাদকের টীকা বলে চিহ্নিত সে সমস্তই লেখকের টীকা এবং সে সবই মূল রচনার অংশ। দু'জনেই গম্ভীর পণ্ডিতি ধরন এই মজার বাক্যের খেলায় ব্যবহার করেন। অবশ্য নবোকফ ও বোর্হেস তুল্য লেখক নন, বোর্হেসের মহিমা নবোকফে নেই। নবোকফের খেলা খেলাতেই শেষ, তাঁর রচনায় একটি নান্দনিক ব্যসন আছে; বোর্হেস সেই খেলাকে মেটাফিজিকাল স্তরে উন্নীত করেন। কোথায়ও খেলা, কোথায়ও ধাঁধা, কোথায়ও ভাষায় চাতুরি, কোথায়ও বা রচনাশৈলীর—তার মধ্য দিয়ে তাঁর হাতে গড়ে ওঠে স্বপ্নের জগৎ, দুঃস্বপ্নের জগৎ। সাকার হয়ে ওঠে আতঙ্ক, সেই আতঙ্ক—বোর্হেসের, আমাদেরও।

Labyrinths গ্রন্থের ভূমিকায় মরোয়া বোর্হেসের রচনাশৈলীকে বলেছেন, 'mathematical style'। অঙ্কের নিয়মও খেলার নিয়মের মতো, শুধু আরো অনেক কঠিন, আরও অনেক জটিল। কতকগুলো পস্টুলেট স্বীকার করে নিলে তার পরিণাম কী হয়?—এই যেন তাঁর জিজ্ঞাসা। কোনো অদ্ভুত পস্টুলেটকে তার চূড়ান্ত লজিকাল পরিণামে নিলে কী দাঁড়ায়? —তারই সন্ধানে গল্পগুলি তৎপর। তর্কের নিয়ম মেনে নিয়ে কুতর্ক করেন বোর্হেস। তিনি বলেছেন : 'There is a concept which corrupts and upsets all others'.। সেই ধারণা হল ইন্‌ফিনিট বা অন্তরের ধারণা জ্ঞাত সান্ত পরিধির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা সন্ধান করে, অসীম সম্ভাবনার চূড়ান্ত খুঁজতে গিয়ে সব উল্টোপাল্টা এবং উদ্ভট ও অপরিচিত হয়ে যায়। এবং এমনভাবে এক স্বয়ংবর নিটোল অন্য-নিরপেক্ষ জগৎ গড়ে ওঠে অঙ্কেরই মতো। The Wall and the Books প্রবন্ধে তিনি চীন সম্রাট শি হুয়াং তি-র কথা বলেছেন, যিনি বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং সমস্ত বই আগুনে পোড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। বোর্হেস তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, সম্রাট হয়তো বিশ্বাস করতেন 'decay cannot enter a closed orb'। বোর্হেসও তেমনি বাক্যের এব নিশ্ছিদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ নির্মাণ করেছেন, যা কতকগুলো অপরিবর্তনীয়, পচনহীন উপলব্ধির ধারক হয়ে উঠেছে। বিচিত্র পদ্ধতিতে ও নানা পরিমাণে শিল্প ও দর্শনের যোগসাজস ঘটিয়ে তিনি যে জগৎ রচনা করেছেন তার নাম দিয়েছেন 'hieroglyphic world'। তিনি মনে করেন দৃশ্যমান অবাস্তবতা ছাড়া শিল্প হয় না—অবাস্তব হবে দৃশ্যমান, দৃশ্যমান হয়ে উঠবে অবাস্তব। তিনি তাই নোভালিসের এই উক্তিটি সানন্দে উদ্ধৃত করেন :

> The greatest magician would be the one who would cast over himself a spell so complete that he would take his own phantasmagorias as autonomous apparitions'.

বোর্হেস তেমনি একজন জাদুকর, প্রতিভার মন্ত্র বলে তিনি তাঁর রচনাগত কল্পনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এক প্রবন্ধে পাস্‌কালের ব্যবহৃত একটি উপমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাস এক মুঠো উপমার ইতিহাস। এই প্রত্যয়ের বশবর্তী হয়েই কি বোর্হেস রূপকের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যকে ধরতে চেয়েছিলেন? অন্তত গ্রিকপুরাণের ল্যাবেরিন্থ বা গোলকঁধাধার উপমা তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন। কাল্পনিক কোষগ্রন্থে তিনি Tlon নামে এক অপরিচিত গ্রহের ইতিহাস পেলেন, পরে জানা গেল কোষগ্রন্থ এবং ওই গ্রহ এক গুহ্যসম্প্রদায়ের রচনা। সেই কল্পলোক সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য, Tlon বস্তুত এক গোলকধাঁধা, কিন্তু মানুষের হাতে তৈরি গোলকধাঁধা বলে মানুষই তার মর্মোদ্ধার করতে পারে। The Garden of Forking Paths-এর বক্তা বলে গোলকধাঁধা সম্বন্ধে অনেক কিছুই সে জানে, কারণ সে সেই ৎসুই পেন-এর বংশধর যিনি তেরো বছর ধরে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন এবং এক গোলকধাঁধা নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে। সেই আকারহীন উপন্যাসের

'diaphanous mystery' যখন উদ্‌ঘাটিত হল তখন দেখা গেল সময় বিষয়ে লেখা ওই উপন্যাস এবং ওই গোলকধাঁধা বাস্তবিক সমার্থক, অভিন্ন বস্তু। অন্য সব উপন্যাসে অনেকগুলো বিকল্পের সম্মুখীন হলে অন্যগুলো বাদ দিয়ে একটি বেছে নেওয়া হয়, কিন্তু ৎসুই পেন-এর উপন্যাস সব কয়টি বিকল্পকে লেখক একই সঙ্গে গ্রহণ করে দেখেন কোন কোন বিকল্প পথ কোথায় নিয়ে যায়। এমনিভাবে সময়ের গোলকধাঁধাকে উপন্যাসে সাকার করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক বোর্হেস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লাইব্রেরির সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেই অসীম বৃত্তাকার লাইব্রেরি আবার বস্তুত গোলকধাঁধার তুল্য হয়ে উঠেছে। চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউন গল্পগুলির অনুরাগী বোর্হেস ডিটেকটিভ গল্পের ধরনে যে Death and the Compass গল্পটি লিখেছেন তার মধ্যেও আততায়ী অনুভব করেছিল এই জগৎ সংসার এক গোলকধাঁধা যার থেকে পলায়ন সাধ্যাতীত। The House of Asterion গল্পে সেই ক্রেটান গোলকধাঁধার ইশারা পাই, যার মধ্যে ঢুকে থিসিউস মিনোটরকে বধ করেছিল। আস্টেরিয়নের বাড়ি আর বিশ্বের মাপ সমান, বোঝাই যায় বাড়িটা বিশ্বের উপমান। এই বাড়ির এক অংশের পুনরাবৃত্তি অন্য অংশে, এবং তালা নেই, তালা-দেওয়া দরজা নেই, তবুও সে বন্দী। এই বাড়ি বা বিশ্ব তাই গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু নয়। এই গোলকধাঁধা দুঃস্বপ্নময় পরাবাস্তব জগতের, সময়ের, নিয়তির। দেশকাল-বিজড়িত এই নিয়তিবাদী গোলকধাঁধার কথা বোর্হেস লিখেছেন Conjectural Poem নামে একটি কবিতায়, তার ইংরেজি অনুবাদের অংশ উদ্ধৃতি করছি। শত্রুর মর্মান্তিক আঘাতে আহত ডক্টর ফ্রান্সিসকো লাপ্রিদা মৃত্যুর পূর্বাহ্নে চিন্তা করছেন।

> I see at last that I am face to face
> with my South American destiny,
> I was carried to this ruinous hour
> by the intricate labyrinth of steps
> woven by my days from a day that goes
> back to my birth. At last I've discovered
> the mysterious key to all my years,
> the fate of Francisco de Laprida,
> the missing letter, the perfect pattern,
> that was known to God from the beginning.
> In this night's mirror I can comprehend
> my unsuspected true face. The circle's
> about to close. I wait to let it come.

তাঁর গল্পগুলোকে মনে হতে পারে আঙ্গিকের খেলা, তার মধ্যে কোনও মানবিক দায়িত্ব বা অনুভূতি নেই, মনে হতে পারে লেখকের জীবনের সঙ্গে এই রচনাবলির কোনও যোগ নেই। কিন্তু উলটোটাই সত্যি। মানবিক দায়িত্ব তাঁর লেখায় অস্বীকৃত নয়, কিন্তু তার প্রকাশ পরোক্ষ এবং তির্যক। তা ছাড়া তাঁর গল্পের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল আছে, তাদের ভিত আত্মজৈবনিক। তাঁরই মতো তাঁর চরিত্রগুলো উদ্ভটবিষয়, গুহ্যবিষয়ে জ্ঞান-আহরণে প্রায়-ইন্দ্রিয়জ আনন্দ পায়। ধাঁধার রহস্যে তিনি সত্য খোঁজেন, তাই— একিলিস ও কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার বিখ্যাত জেনোর প্যারাডক্স বা জার্মান কার্ডিনাল নিকোলাসের কথা — বৃত্ত অনন্ত বাহুবিশিষ্ট একটি ক্ষেত্র বা পলিগন তাঁকে আকৃষ্ট করে। পুরোনো বই, ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি, পুরোনো মানচিত্র, কোষগ্রন্থ বা অভিধান তাঁকে আকর্ষণ করে; এই জাতীয় বাক্য শোনামাত্র তাঁর কৌতূহল চরমে ওঠে — 'আয়না এবং যৌনসঙ্গম খারাপ ব্যাপার, কেননা তাতে জনসংখ্যা বাড়ে।' জাদু সংখ্যা, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিপরীত মত, যেমন বোর্হেসের তেমনি চরিত্রগুলোর কৌতূহল জাগায়। গ্রন্থাগারিক লেখকের রচনায় অনেক ঘটনা ঘটে গ্রন্থগারে এবং তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি বুয়েনোস এয়ার্স শহর, যদিও গল্প থেকে চট করে তাকে চিনে নেওয়া যায় না। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি

দেখেছেন যখন তিনি স্থানচিত্র খোঁজেন না, যখন বুয়েনোস এয়ার্সের নগরচিত্র দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তখনই সেই শহরের স্বভাব তাঁর রচনায় ধরা পড়ে।

তাই তাঁর লেখায় যে বার বার সের্ভেন্টিসের কথা আসে তা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধু হিস্পানি ভাষার মহত্তম লেখকের প্রতি বোর্হেসের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য নয়, সের্ভেন্টিসের ডন কুইকসোট যেমন জীবন ও সাহিত্যের মিশ্র রসায়ণে রচিত, বোর্হেসের রচনাবলিও তাই। সাহিত্য ও জীবনের এই সংযোগ আসলে সত্য ও অধ্যাসের সমস্যাকেই প্রতিবিম্বিত করে। আমরা প্রত্যেকেই এক চিরন্তন আখ্যানের লেখক পাঠক ও চরিত্র, আমরাই অধ্যাসের নির্মাতা, তার প্রতীকের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা আমরাই করি, পরিণামে দেখি সেই চেষ্টা কোনো এক সর্বোত্তম লেখকের সৃষ্টির কাছে পরাজিত হয়। বার্কলের তত্ত্ব থেকে এক পা এগিয়ে বোর্হেস শুধু দেশকে নয়, কালকেও অস্বীকারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর গোলকধাঁধাগুলিকে দেশাতীত কালাতীত করতে চাইলেও তারা হয়ে গেছে দেশে কালে বিজড়িত, —কারণ বোর্হেস জানতেন, 'The world, unfortunately, is real : I unfortunately, am Borges'। তাঁর রচনাবলির সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগের কথা চমৎকারভাবে নিজেই বলেছেন তিনি Borges and I নামের প্যারাব্‌লটিতে। সেটির সম্পূর্ণ বাংলা তর্জমা উদ্ধৃত করছি।

বোর্হেস ও আমি

যার নাম বোর্হেস, সেই অন্য জনের জীবনেই সব ঘটে। আমি বুয়েনোস এয়ার্সের পথ দিয়ে চলতে এক লহমার জন্য দাঁড়াই, যান্ত্রিকভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি প্রবেশপথের খিলান ও দরজার জাফরির কাজ; আমি বোর্হেসকে জানি ডাকে আসা চিঠিপত্রে, অধ্যাপকদের নামের তালিকায় ও জীবনী-অভিধানে তার নাম দেখে। আমি ভালোবাসি সময়-মাপা গেলাস, মানচিত্র, আঠারো শতকের ছাপাখানার অক্ষর, কফির স্বাদ, স্টিভেনসনের গদ্য; সেও এসব পছন্দ করে, কিন্তু গরিমার বশবর্তী হয়ে সে এই সমস্তকে পর্যবসিত করে যেন অভিনেতার গুণে। আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিদ্বেষের এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে; আমি বেঁচে আছি, আমি জীবন-যাপন করে চলেছি, যাতে বোর্হেস সাহিত্য রচনা করতে পারে, এবং সেই সাহিত্যেই আমার সার্থকতা। বাড়িয়ে না বলেও এ কথা বলা যায়, কয়েক পৃষ্ঠা অকৃত্রিম রচনা সে লিখেছে। কিন্তু সেই কয় পৃষ্ঠাও আমাকে অমরত্ব দিতে পারবে না। কারণ যা ভাল তার মালিক কেউ নয়, এমনকি সেও নয়, ভাষা এবং ঐতিহ্যই তার যথার্থ স্বত্বাধিকারী। তাছাড়া বিনাশই আমার নিশ্চিত নিয়তি, শুধু আমার কয়েকটি মুহূর্ত তার মধ্যে বেঁচে থাকবে। অল্প অল্প ক'রে আমি সব কিছুই তার হাতে তুলে দিচ্ছি, যদিও আমি জানি অস্বাভাবিক অভ্যাসে সে অতিশয়োক্তির দিকে ঝোঁকে এবং সব কিছুকেই কৃত্রিম করে তোলে। স্পিনোজা জানতেন সব জিনিসই আপন সত্তা রক্ষায় উৎসুক, পাথর চিরন্তনভাবে পাথর হতে চায়, বাঘ হতে চায় বাঘ। আমি বেঁচে থাকব বোর্হেসেরই মধ্যে, নিজের মধ্যে নয় (অবশ্য আমি একজন কেউ, একথা যদি সত্যি হয়), কিন্তু তার বইতে আমি নিজেকে খুঁজে পাইনে বললেও চলে; বেশি খুঁজে পাই বরং অন্য বইতে, গিটারের শ্রমসাধ্য ঝংকারে। অনেক বছর আগে আমি তার থেকে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলাম এবং শহরতলীর পুরাণ রচনা ছেড়ে শুরু করেছিলাম কাল ও অনন্তকে নিয়ে খেলা করতে, কিন্তু সেই সব খেলারও মালিক এখন বোর্হেস এবং আমাকে এখন তাই অন্য কিছু কল্পনা করতে হবে। আমার জীবন শুধু উড়ে যাওয়া, আমার সব কিছুই আমি হারিয়ে ফেলি এবং আমার সব কিছুর অধিকারী হয়—হয় বিস্মরণ অথবা সে।

আমি জানি না আমাদের দুজনের মধ্যে কে এই পৃষ্ঠার লেখক।

বোর্হেসের উপাখ্যানগুলি যতই বিচিত্র বা উদ্ভট হোক তার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ মেলে। তিনি এমনভাবে লেখেন যেন পুঞ্জীভূত ইতিহাসস্তূপের কোনও অস্তিত্ব নেই, অথবা যদি তার অস্তিত্ব

থেকেও থাকে তাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করা উচিত। প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে তাই চ্যালেঞ্জ করে উলটো মত প্রতিষ্ঠায় তিনি আনন্দ পান—জুডাস যে ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ধরিয়ে দেয়নি, তার উদ্দেশ্য যে মহত্তর ছিল তা প্রমাণে বোর্হেস প্রয়াস পেয়েছেন। ইতিহাসের সব কিছুই তাঁর কাছে হয় আনকোরা নতুন, নইলে বহু পুরোনো। অনেক উপাখ্যানে পাঠককে নিয়ে যায় আদিম সময়ে বা একেবারে ইতিহাসের বাইরে। কালস্রোতে এখানে একাকার —অতীত ও বর্তমান অনুষঙ্গের যোগে হয়ে ওঠে সমসাময়িক। হাতের মুঠোয় একটি মুদ্রার কথা মনে পড়িয়ে দেয় কারোনের পারানির কড়ির কথা, জুডাসের ত্রিশ মুদ্রা, বেশ্যা লাইসের দ্রামা, এক হাজার এক রাত্রির জাদুকরের উজ্জ্বল মুদ্রার কথা, শাহনামার ষাট হাজার চরণের জন্য সেই ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রার কথা যা সম্রাটকে ফিরদৌসি সুবর্ণমুদ্রা নয় বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আহাবের মাস্তুলে-লাগানো বা লিওপোল্ড ব্লুমের ফ্লোরিনের কথা।

এই রচনাবলির মুখ্য আবেগ ভয় এবং ভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসাবেই এই উপাখ্যানগুলি রচিত। বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যের শক্তির এইসব রচনায় বোর্হেস বুদ্ধির শৃঙ্খলাকে আবাহন করেছেন। এক ক্লাসিকাল শাসনে অস্তিত্বের খিল খুলে দেওয়া ভয় এখানে যৎপরোনাস্তি শাসিত। তাঁর কল্পনাজগতের মূর্ত ভয়কে প্রথমে মনে হতে পারে অস্বাভাবিক অবাস্তব, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে যায় সেই ভয় সম্ভাবনারূপে বাস্তবজগতের পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে। সেই জন্যেই তাঁর রচনা আমাদের এতটা ভাবিয়ে তোলে। এই ভয়কে সাকার করতে এবং তাকে শাসন করতে বোর্হেস মৃত্যু বা হত্যার ঘটনা বেছে নিয়েছেন, কারণ জনসন যখন বলেছিলেন কয়েক দণ্ড পরে ফাঁসি হবে জানলে মাথা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন তিনি খুব একটা খাঁটি কথা বলেছিলেন। The Garden of Forking Paths-এ খুনের ঘটনা আছে, Death and the Compass-এ অনেকগুলো খুনের কথা আছে। The Secret Miracle-এর নায়ক তখনই অসমাপ্ত নাটক শেষ করতে পারল যখন বধ্যভূমিতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। যেখানে খুনের গল্প নেই, সেখানেও এক অপ্রতিরোধ্য আতঙ্কের গুরুতর ভার যেন সত্তার উপর চেপে বসে।

কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তাঁর রচনা কারুণ্য বা ভাবাবেগ, কোনও মানবীয় উপাদানই নেই। তাঁরা বলেন, এই উপাখ্যানগুলো সাহিত্যের বিশেষজ্ঞের, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীর জন্য লেখা। যাঁরা বোর্হেসের নিঃসঙ্গ জীবনকে জানেন, যাঁরা জানেন অ্যালকেমির কোন অলৌকিক রসায়নে তিনি আত্মজৈবনিক উপলব্ধিকে বাক্‌বিভূতিতে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁরা এই অভিযোগ মেনে নেবেন না। সে যাই হোক, এই আকারে-ছোট রচনাগুলো অসহ্য তীব্রতা ধারণা ক'রে থাকলেও সেগুলো পড়া কঠিন নয়। তাঁর গদ্যে কোনও শব্দই অতিরিক্ত নয়, গদ্য ঠাসবুনানি কিন্তু স্বচ্ছ। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গদ্যের মতো এই গদ্যে অর্থই মুখ্য। বক্তব্যপ্রধান, সংজ্ঞার্থপ্রধান এই গদ্যর সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, ঘন—প্রায় আইনের ভাষার মতো। সুস্পষ্টতার দায়ে কঠিন দার্শনিক শব্দের পাশে তিনি চলিত লৌকিক শব্দ বসাতে দ্বিধা করেন না। ভাষা সুস্পষ্ট, কিন্তু ভাবে বা বক্তব্যে দ্ব্যর্থতার অভাব নেই, তিনি মনে করেন ambiguity is richness ।

কখনও পরিহাস করার জন্য, কখনও উদ্ভট-কল্পনাকে সাকার করার জন্য তিনি গবেষক পণ্ডিতের গম্ভীর মন্থর ভাষাবিন্যাস অনুসরণ করেন। তাঁর Tlon, Uqbar, Orbis Tertius এমন রচনাভঙ্গির চমৎকার উদাহরণ। Pierre Menard, Author of the Quixote গল্পে, যেখানে নায়ক সের্ভেন্টিসের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়ায় অক্ষরে-অক্ষরে এক আর-একখানি 'ডন কুইকসোট' লিখে ফেলেছিল, সেখানেও এই গবেষকের ভঙ্গি মেলে। সেই কাল্পনিক লেখকের রচনাবলির তালিকা ও তাদের প্রকাশকাল দিয়ে এই গল্পের সূত্রপাত হয়েছে। সাহিত্যিক মনীষীদের সম্বন্ধে স্মরণগ্রন্থে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির রচনার আলোচনা বা স্মৃতিকথা থাকে; ঠিক সেই ভঙ্গি অনুকরণ করে Funes the Memorious গল্পে লেখক স্মারকসংকলনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যেন Funes - এর স্মৃতিকথা লিখেছেন। এলিয়টের মতো তিনি অন্যের রচনার অংশ নিজের সামিল করে নেন—উদ্ধৃতি হয়ে যায় মূল রচনার অংশ। The Immortal গল্পে তিনি হোমারের

ইলিয়াডের উদ্ধৃতি গেঁথে-গেঁথে এক অলৌকিক জগতকে বাস্তব করে তুলেছেন। কখনও-কখনও মজা করার জন্য নিজের রচনার উদ্ধৃতিও নিজের অন্য রচনায় জুড়ে দেন তিনি। এই রচনাবলিতে মজা ও সিরিয়াস-ভাব এমন আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাদের আলাদা করা যায় না।

এমনি করে মনীষার ব্যবহারে, ভাষার নিজস্ব শৈলীর সাহায্যে, বিচিত্র অপ্রচলিত বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়নের উপকরণ ব্যবহার করে, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে অব্যবস্থিত বিপরীতকে আবিষ্কার করার বিদ্রোহী কৌতুকের সাহায্যে, অন্ধত্বের ফলে ইন্দ্রিয়জ জগৎ থেকে সরে এসে অন্তরস্থ অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে বিশ্বের গোলকধাঁধাকে প্রতিবিম্বিত করে, বোর্হেস তাঁর সেই মুষ্টিমেয় রচনাবলি লিখেছেন — যে রচনাবলিতে সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে ঝঞ্ঝার উন্মত্ত তীব্রতা। নিজের রচনার সেই চরিত্র বোর্হেস নিজেই কবিতায় লিখেছেন, বাংলা তর্জমায় কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—

কী দিয়ে তোমাকে ধরে রাখব?
আমি তোমাকে দিই সংকীর্ণ গলিপথ
আমি তোমাকে দিই একলা চাঁদের দিকে যে মানুষ
বড় দীর্ঘ দিন তাকিয়ে থেকেছে তার তিক্ততা।
আমি তোমাকে দিই আমার পূর্বপুরুষদের।
আমি দিতে পারি আমার একাকিত্ব, আমার অন্ধকার,
হৃদয়ের ক্ষুধা; আমি তোমাকে ঘুষ দিতে চাইছি
সংশয়ের, বিপদের,
হেরে যাওয়ার।।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
(ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৫)

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ছাত্রদের বিপ্লবী ভূমিকা

১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রবিক্ষোভ যখন ক্রমশ ছাত্রবিপ্লবে আকার নেয় এবং ছাত্রবিপ্লব শ্রমিকবিপ্লবে পরিণত হতে যাচ্ছে তখন ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক জোর্জ মার্শেই লিখলেন : 'এইসব আপাত-বিপ্লবীরা শুধু যে ছাত্রদের খেপিয়ে তুলছে তাই না, এরা শ্রমিকদের বিপ্লব শেখানোর ধৃষ্টতাও দেখাচ্ছে।' ছাত্ররা যে শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লব করতে পারে, এটা মার্শেই কিংবা ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে ভাবা কঠিন ছিল, তাই এই ব্যঙ্গ। ড্যানিয়েল কোন-বেন্ডিট তাঁর পাঁচ সপ্তাহে লেখা মে-জুন মাসের বিপ্লব সম্পর্কে বইতে*, মার্শেই-এর ব্যঙ্গের উত্তর লিখেছেন, ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির চিন্তার ধারা মার্শেই-র লেখা থেকেই বোঝা যায়। এঁরা শুধু 'শেখানোতেই' বিশ্বাস করেন, এঁদের দৌড় লেকচার দেওয়াতেই, বিপ্লব করানোতে নয়, বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হল কি না তা বুঝবার ধৈর্য বা বুদ্ধি বা ইচ্ছা এঁদের নেই।

ছাত্রদের প্রতি ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টির অবিশ্বাসের কারণ কী? একজন বাইরের ছোকরা, একটা জার্মান ইহুদি, নাম ড্যানিয়াল কোন-বেন্ডিট, এদের চালনা করেছে বলে? এই বিপ্লবী ছাত্ররা কম্যুনিস্ট ছাত্র ইউনিয়ন ইউ ই সি-র কর্তৃত্ব মানেনি বলে? এই বিপ্লবীরা পার্টিতে বিশ্বাস করে না বলে? অথবা ছাত্রদের স্বরূপই বিপ্লব-বিরোধী বলে? যে কারণেই হোক মার্শেই লিখলেন :

> এইসব 'বিপ্লবীদের' চিন্তা এবং কার্যকলাপ দেখলে হাসি পায়। এরা সকলে এসেছে কারখানা মালিকদের বাড়ি থেকে। এরা শ্রমিকের ছেলেদের, যাদের দুয়েকজনের সঙ্গে পড়াশুনা করতে বাধ্য হয়, তাদের অনুকম্পা করে। বিপ্লব-টিপ্লব সেরে এরা সবাই বাবার ব্যবসায়ে কারখানায় নেমে পড়বে এবং শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত শোষণে তৎপর হয়ে ধনতন্ত্রের ধ্বজা ওড়াবে।

ফরাসি কম্যুনিস্টরা যাই ভাবুন না কেন, মে-জুন মাসের ছাত্রবিপ্লব প্রমাণ করেছে ছাত্রদের পক্ষে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব। ড্যানিয়েল কোন-বেন্ডিট তাঁর বইয়ের প্রথমার্ধে বর্তমান জগতে ছাত্রদের বিপ্লবী ভূমিকা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন, এবং মে-জুন মাসে তার বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করেছেন বলে দাবি করছেন।

ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন-বেন্ডিটের ধারণায়, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও প্রকট হয়ে উঠেছে। আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজব্যবস্থা চালু রাখতে হলে দরকার : ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, প্রশাসক, মনস্তত্ত্ববিদ। না হলে উৎপাদন অব্যাহত রাখা, শিল্পোদ্যোগের গতিপ্রকৃতি আপন স্বার্থের অনুকূলে রাখা, রাষ্ট্রযন্ত্র চালু রাখা, এমনকি অবসর সময় কীভাবে কাটালে ধনতন্ত্র নিরাপদে থাকবে সেদিকে খেয়াল রাখা, ইত্যাদি ঠিক থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী শিক্ষাযন্ত্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধনতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই ধরনের কর্মী তৈরি করা। এক সময় বুর্জোয়া শ্রেণীর আপন লোকজনই যথেষ্ট ছিল, তারাই এইসব শিক্ষাযন্ত্রে তৈরি হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করত। কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দীক্ষায় দীক্ষিত কর্মীদের চাহিদা বাড়তে লাগল, তার ফলে ক্রমশই স্কুলকলেজের দরজা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খুলতে লাগল। বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী থেকে উত্তরোত্তর

*Obsolete Communism : The Left-Wing Alternative - Daniel Cohn-Bendit and Gabriel Cohn-Bendit : Tr. Arnold
Pomerans. Pp 256 ; Andre Deutsch ; 25 sh.

বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী আসছে। কিন্তু এইটুকুই। শ্রমিকশ্রেণী থেকে ছাত্ররা আসছে বলেই ধনতন্ত্রের শিক্ষাযন্ত্র হঠাৎ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে না। বর্তমান শিক্ষাযন্ত্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই—নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ধনতন্ত্রের ছাঁচে গড়ে তোলা। এবং কার্যত ঘটছেও তাই। এই নতুন শ্রেণীর ছাত্ররাও বড় হয়ে ম্যানেজার হয়ে উঠছে, ধনতন্ত্রের ছাঁচে সুন্দর নিজেদের মিলিয়ে রাখছে।

কিন্তু কতদিন? বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা যতই কমবে, দক্ষ কর্মীর চাহিদা যতই বাড়বে, স্কুলকলেজের দরজা ততই কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর কাছে উন্মুক্ত হবে। তারপর এমন অবস্থা হবে, যখন সব ছাত্রদের চাকরি দেওয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। তখনই শ্রমিক ছাত্রদের চোখ ফুটবে। তাদের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হবে। তারা বিপ্লবী হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর চাইতেও বড় কথা, যার জন্য স্কুলকলেজে ধনতান্ত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে, তা হল, শিক্ষাজগতের অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে যেমন স্কুলকলেজগুলো দক্ষ কর্মী তৈরি করতে ব্যস্ত, অন্যদিকে তেমনি এগুলো সৎ চিন্তাবিদদের উৎসাহ না দিয়েও পারে না। কৃষ্টি, বিজ্ঞান, মানবতাবোধ ইত্যাদির আধার বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানব-চরিত্র, সমাজ-উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, তর্ক হয়েই পড়ে। একজন ছাত্র যখন শিক্ষা নিয়ে ভাবে, তর্ক করে, তখন তার চোখের সামনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। পদার্থবিদ্যার ছাত্র দেখে, বিজ্ঞানী মানুষের উন্নতির জন্য গবেষণা চালাচ্ছেন এবং হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করেছেন। একজন মনস্তত্ত্ববিদ কেবলই চিন্তা করছেন, মানুষকে কী করে কাজের উপযোগী করে তোলা যায়, কিন্তু কাজকে কী করে মানুষের উপযোগী করা যায়, সে বিষয়ে কোনও চিন্তাই তাঁর নেই। উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কোনও মানবিক যুক্তিতেই কোনও ছাত্র ব্যাখ্যা করতে পারে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র মানবতাগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে সে আধুনিক জগৎকে বিশ্লেষণ করতে পারে না, তার সামনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শোষণব্যবস্থার মূল চরিত্র উন্মুক্ত হয়ে পড়েই। যে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নিয়েছিল নিছক আপন প্রয়োজনে, দক্ষ কারিগর হিসেবে তৈরি করে নিতে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই তার চোখের পর্দা সরিয়ে শোষণযন্ত্রের স্বরূপ চিনিয়ে দেয়।

তাই বর্তমান জগতের সর্বত্র, বার্কলেতে, টোকিওতে, মাদ্রিদে, রোমে, ওয়ারশতে, কলাম্বিয়াতে, নিউইয়র্কে, ছাত্ররা বিপ্লবী হয়ে উঠছে। তাদের বিক্ষোভের ধরন আগেকার তরুণসমাজের বিক্ষোভের চেহারা থেকে স্বতন্ত্র। পুরোনো যুবসমাজ অশান্ত হয়ে উঠত, তার কারণ বড়দের আসন কত তাড়াতাড়ি তারা অধিকার করে নিতে পারবে, তার জন্য। আজকের যুবসমাজ অশান্ত হয়ে উঠছে, তার কারণ বড়দের আসন অধিকার করার লোভ নয়, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শোষণস্বরূপের উপলব্ধি। ফ্রান্সের ছাত্রসমাজ অর্থনৈতিক দারিদ্র্যে পীড়িত নয়, তারা শাসনযন্ত্রের অর্থহীনতায়, ধনতন্ত্রের শোষণস্বরূপের নগ্নতায় পীড়িত। তাই তাদের বিক্ষোভ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের বিরুদ্ধেই নয়, পূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই তারা হাত মেলায় শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে, যাতে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত করে নতুন সমাজ তৈরি করতে পারে।

তাই বলে সব ছাত্রই বিপ্লবী নয়। অনেক ছাত্রই বিনা দ্বিধায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা মেনে নেয়, বড় হয়ে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে যায়। অনেক ছাত্র এই শোষণব্যবস্থার স্বরূপ চেনে, কিন্তু সংঘর্ষের ভয়ে আপত্তি করে না। অনেক ছাত্রই কিন্তু বিবেকের তাড়নায়, মানবতাবোধের তাগিদে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবী হয়ে ওঠে।

ড্যানিয়েল কোন-বেন্ডিট এই কথার উপর বারবার জোর দিয়েছেন, ফ্রান্সের ছাত্রদের বিক্ষোভ, চাকরির জন্য নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক জগতের ব্যবচ্ছেদের জন্য নয়, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। সংস্কার নয়, বিপ্লব। সাময়িক শান্তি নয়, সাময়িক স্বাধীনতা নয়, আমূল পরিবর্তন, যাতে সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক কোনও বিশেষ শ্রেণীর অনুগত প্রজা হয়ে না থেকে আপন জীবনের ভার নিজ হাতে নিতে পারে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে ছাত্রসমাজ সুসংহত সমাজ নয়। কেউ চিরকালই স্কুলকলেজের ছাত্র থাকে না। নানা শ্রেণীর মানুষ ছাত্রসমাজে সমবেত হয়। কৃষক-শ্রমিকের দারিদ্র্যের চাপ এদের উপর নেই। তাদের স্বাধীনতা আছে, ভোরে উঠেই কারখানায় যেতে হয় না, মাঠে যেতে হয় না, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে হয় না। কারখানায় যেমন ফোরম্যান সব সময় ঘাড়ের উপর চেপে থাকে, জমিদারের চেলাচামুণ্ডারা যেমন পিছন পিছন লেগে থাকে, তেমন কোনও রুদ্ধশ্বাস অশান্তি এদের নেই। অর্থাৎ ছাত্রসমাজের অর্থনৈতিক কারণে বিপ্লবী হয়ে ওঠার আশু সম্ভাবনা এখনই নেই, যদিও পাশ করে বেরিয়ে চাকরি পাবে না, এই ভয় তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, বুদ্ধিগতভাবে বিপ্লবের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন তারা অনুভব করছে। কীভাবে এই অনুভূতি বিপ্লবের কাজে লাগাতে পারে? শিক্ষাজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষককে উদ্বুদ্ধ করে।

ড্যানি কোন-বেন্ডিট এই কথা বারবার বলছেন। বার্কলের ছাত্রদের আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ, তাঁর মতে, তারা ছাত্র-আন্দোলনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবেছিল। সেই আন্দোলনকে কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। ফ্রান্সের ছাত্ররা পেরেছে। তাদের ২২ মার্চ আন্দোলন থেকে নাঁত্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়কট আন্দোলন, তা থেকে নাঁতের্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন, তা থেকে সোরবোন, তা থেকে ১৩ মে-র শ্রমিক ধর্মঘট — ছাত্রবিপ্লব থেকে শ্রমিকবিপ্লবে উত্তরণ।

শ্রমিকযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষাযন্ত্রকে দখল করে ছাত্ররা যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের পথ দেখানোতে সাহায্য করবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুরু দায়িত্বও তাকে বহন করতে হবে। শ্রমিককে শেখানো হয়েছে যে কারখানা চালানোর যোগ্যতা তাদের নেই, সেজন্য দরকার ম্যানেজারের, সমাজ চালানোর যোগ্যতা তাদের নেই, সেজন্য দরকার প্রশাসকের। এই ভাঁওতা দিয়ে তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। ছাত্রদের তৈরি করা হচ্ছে ওই ম্যানেজারের, প্রশাসকদের পদে উপযুক্ত করে। ছাত্রদের দায়িত্ব শ্রমিকদের কাছে এই বুর্জোয়া বুজরুকি ভেঙে দেওয়া। শ্রমিকরাও যে কারখানা চালাতে পারে, সমাজ চালাতে পারে, সেদিকে চোখ খুলে দেবে শিক্ষিত ছাত্ররা। এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় ধরে, তার সংগঠন দখল করে (যাকে বলা যায় 'ক্রিটিক্যাল ইউনিভার্সিটি'), ক্রমে তাকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে।

নাঁতের্-এ ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল। ১৯৬৭-৬৯ সালের ধর্মঘট সেখানে শুধু চিরাচরিত রাজনৈতিক ধর্মঘট ছিল না। দশ থেকে বার হাজার ছাত্র লেকচার বয়কট করেছিল, আপাত-উপলক্ষ ছিল ছোট লেকচার হলে গাদাগাদি ছাত্রের ভিড়। এই ধর্মঘটে তথাকথিত বামপন্থী ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস কোনও নেতৃত্বই দেয়নি। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাব লেকচার বয়কট করেছিল। তারপর একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় দ্রুত দৃশ্যপরিবর্তন ঘটে। ড্যানিয়েল কোনো-বেন্ডিট তখনকার মিনিস্টার অফ ইয়ুথ মিসোফ্-কে হিটলারের অনুচর বলে আখ্যা দেওয়ায় পুলিশ ড্যানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে তৎপর হল, ফলে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ল, ছবি আঁকা হল, দেখানো হল পুলিশ সাদা পোশাকে কীভাবে অধ্যাপকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ড্যানি-বিতাড়নের বিরুদ্ধে ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হল, ডীন রায়ট-পুলিশ ডাকলেন। পুলিশ-ছাত্রের লড়াইতে পুলিশ পিছু হটল।

এখানে বলা প্রয়োজন নাঁতের্-এর ডিন সত্যিসত্যিই ফ্যাসিস্ট ছিলেন না, বরং বামপন্থী বলেই পরিচিত ছিলেন। অথচ ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ছাত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে তিনি রায়ট-পুলিশ ডাকলেন। অর্থাৎ, মানবতাবোধের আধার বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তির মাধ্যমে ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের পথে না গিয়ে তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের কাণ্ডারি পুলিশকে ডাকলেন। সুতরাং ছাত্ররা স্লোগান দিল : 'অধ্যাপকেরা, তোমাদের হয়ে এসেছে, তোমাদের সংস্কৃতিরও।' ছাত্রদের উদ্দেশ্যে স্লোগান পড়ল : 'পরীক্ষাঘরে উত্তর দিতে বসে কেবল প্রশ্ন করে যাও।'

ফ্রান্সের সর্বত্র, যেখানেই গোলযোগ দেখা গেছে, সেখানেই পুলিশ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে।

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা চালান, তাঁদের মূল অস্ত্র তথাকথিত মানবতাবোধ, যুক্তি, তর্ক সেসব কিছু না, সেই একই অস্ত্র পুলিশ। অর্থাৎ যে পুলিশ শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখে মালিকের স্বার্থের জন্য, সেই পুলিশই ছাত্রকে দাবিয়ে রাখে ডিনের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য। বিপ্লবী ছাত্র তাই বিপ্লবী শ্রমিকেরই শরিক।

ন্যাশনাল ভিয়েতনাম কমিটির ছয়জন জঙ্গি সদস্য গ্রেপ্তার হবার পর, নাঁত্রে-এ ছাত্ররা সমবেত হয় প্রতিবাদসভায় ২২ মার্চ। সভাশেষে ঠিক হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং দখল করা হোক। সাদা পোশাকে পুলিশের নাঁত্ এবং নাঁত্রের বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে ঢোকার প্রতিবাদে তারা বলল, পুলিশ এখন আর প্রতিবাদসভায় গ্রেপ্তার করে খুশি থাকছে না, সভাশেষে বিশ্ববিদ্যালয়েও ঢুকে পড়ছে ছাত্রদের সন্ধানে, সমস্ত সমাজকেই মনে করছে যেন পুলিশের ব্যারাক, সুতরাং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটা শুধু পুলিশের অত্যাচার নয়, এটা আসলে ধনতন্ত্রের অত্যাচার, মেকি গণতন্ত্রের অত্যাচার।

সেদিন দেড়শো ছাত্র, যার মধ্যে অর্ধেকেরই কোনও দলগত আনুগত্য ছিল না, ঠিক করল ২৯ মার্চ আলোচনাসভা ডাকা হোক, যাতে বিষয় হবে : ১৯৬৮ সালে ধনতন্ত্র এবং শ্রমিকদের সংগ্রাম, ইউনিভার্সিটি এবং অ্যান্টি-ইউনিভার্সিটি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম দেশে শ্রমিকদেরও ছাত্রদের সংগ্রাম। সেই সঙ্গে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লক দখলের সিদ্ধান্তও নিল।

২৮ মার্চ ডিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলেন। তিনশো ছাত্র জমায়েত হল। দরজাবন্ধ ঘরের সামনে তারা আলোচনা চালিয়ে গেলে পুলিশ তাদের ঘিরে থাকল। ১লা এপ্রিল সমাজবিদ্যার ছাত্ররা পরীক্ষাবর্জনের সিদ্ধান্ত নিল, সমাজবিদ্যাকে ধনতান্ত্রিক বুজরুকি আখ্যা দিল। অধ্যাপকেরা কেউ কেউ ক্লাস বন্ধ করে দেওয়ায় আপত্তি করে বললেন, ছাত্রদের আলোচনা করতে দেওয়া হোক। ২রা এপ্রিল ১২০০ ছাত্র লেকচার হল দখল করল, যদিও ডিন ভয় পেয়ে তাদের জন্য একটা ছোট হল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এর পর ইস্টারের ছুটি। ছুটির পর একটা সভা ডাকা হল, আধা-ফ্যাসিস্ট প্রকাশক স্প্রিঙ্গার ট্রাস্টের উপর জার্মান ছাত্রদের আক্রমণকে সমর্থন করে, রুডি ডুচকের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে। নাঁত্রে-এর ছাত্ররা ক্রমশ তাদের আত্মকলহ ভুলে গিয়ে, ভিয়েতনামের সমর্থনে, জার্মান এস ডি এস-এর সমর্থনে, রেড রুডির সমর্থনে এক প্ল্যাটফর্মে জমা হল। প্রত্যেকদিন সভা, পোস্টার, পরীক্ষাবর্জন। ২রা ও ৩রা মে নির্ধারিত হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনার দিন হিসেবে। আধা-ফ্যাসিস্ট দল 'অক্সিদাঁ' হুমকি দিল, ফলে নাঁত্রে-এর ছাত্ররাও পাথর নিয়ে তৈরি হল। ডিন ভয় পেয়ে আবার ক্লাস বন্ধ করে দিলেন। ২২ মার্চের আন্দোলনের সাতজন কর্মীকে আদেশ হল সোরবোনের এক বোর্ডের সামনে হাজির হতে। ছাত্ররা দলে দলে সেই বোর্ডের কাছে গিয়ে হাজির হল।

এইসব ছাত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ড্যানিয়েল কোন-বেন্ডিট বলছেন, এরা সকলেই বামপন্থী ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় বামপন্থী ছাত্র ছাত্র-অসন্তোষের মূল কারণ বেছে নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন একটা অবস্থা তৈরি করে যখন কর্তৃপক্ষের মূল চরিত্র উদঘাটিত হয়ে পড়ল। যুক্তিতে না পেরে, পুলিশ দিয়ে তাদের ঠান্ডা করতে চেষ্টা করা হল। যার ফল, পুলিশি অত্যাচার, যার ফলে যে সব ছাত্র ছিল না, তারাও বামপন্থীদের দলে চলে এল।

৩ তারিখ থেকে ঘটনাবলি বহুশ্রুত। প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ, সোরবোনের ভেতরে পুলিশ, ক্লাসের ভেতর ঢুকে চারশো ছাত্রকে গ্রেপ্তার, ল্যাটিন কোয়ার্টারে রায়ট-পুলিশের মুখোমুখি ছাত্র, রাত্রিবেলা ছাত্রদের বা ছাত্র মনে হওয়া লোককে ঠেঙানি। ছাত্ররা সংগ্রাম লিপ্ত হল। ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে এল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং নাঁত্রে-এর চারজন অধ্যাপক।

এই সময় কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী ছাত্ররা ফতোয়া দিল, 'কিছু সংখ্যক অতি-বাম ছাত্র সরকারি গাফিলতি এবং ছাত্র অশান্তির সুযোগ নিয়ে ক্লাসের পড়া নষ্ট করছে, পরীক্ষা নষ্ট করছে। এরা দ্যগলের অনুচর, শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যারা পড়াশুনা করতে চাইছে তাদের শত্রু।'

৭ মার্চ লং মার্চে, আল্ ও ভ্যাঁ-এ বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে ছাত্রবিক্ষোভের সময় অবশ্য সমস্ত বামপন্থী ছাত্রদলই কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছাত্ররা কোনও দলেরই আনুগত্য মানেনি। শাঁজেলিজ্-এ যে ৩৫০০০ ছাত্র জমা হয়েছিল তাদের কোনও নেতার দরকার হয়নি। সোরবান দখল করতে পারলে কী হতে পারত বলা যায় না, কিন্তু ইউ এন এফ-এর আমলাতান্ত্রিক নেতারা বক্তৃতার তোড়ে ছাত্রদের ফিরিয়ে দিলেন। ৮ মে প্লাস্ দ্যু ল্যুক্সাঁবুর্গ-এ কম্যুনিস্ট নেতারা ছাত্রদের ভুজুং ভাজুং দিয়ে ঘরে যেতে বাধ্য করলেন। কিন্তু ছাত্ররা দমেনি। তার পরের দিন সোরবোন খুললে ছাত্ররা টিচ-আউট অনুষ্ঠিত করে কম্যুনিস্ট নেতাদের কাছে জানতে চাইল, আগের দু'দিন ছাত্রদের বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার অর্থ কী? লুই আরাগঁ কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য পেশ করতে এসে তাড়া খেলেন। সাধারণ লোক ছাত্রদের সমর্থন জানাল। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সদস্যরা ছাত্রদের আন্দোলনের সপক্ষে দু'দল হয়ে গেলেন, দ্যগলের অবস্থা টলমল করে উঠল, পুলিশের অত্যাচার ছাত্রদের প্রতি সমর্থন জোরদার করে তুলল। ছাত্রদের আন্দোলনে এসময় কোনও নেতা ছিল না, ছাত্ররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুলিশের হাত থেকে রক্ষার ভার নিজেরাই তুলে নিয়েছিল। ব্যারিকেড তৈরি হতে লাগল, আলোচনা চলতে লাগল, একদল থেকে দূত গেল অপর দলের কাছে খবরাখবর দেওয়ার জন্য। একই সঙ্গে হঠাৎ দেখা গেল সাধারণ শ্রমিক আর ছাত্ররা বসে মতবিনিময় করছে।

ড্যানি এইভাবে ১০ জুন পর্যন্ত ছাত্র-শ্রমিক বিপ্লবের প্রতিদিনের ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন আর কম্যুনিস্ট পার্টি বারবার স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনকে বিপথে চালানোর চেষ্টা করছে এবং সংকটময় মুহূর্তে সফল হয়ে ছাত্র আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। তথাকথিত নেতা ছাড়াই ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ঘটেছে, যার পরিণতি ১৩ মে-র শ্রমিক ধর্মঘট। নেতা ছাড়া, সংগঠন ছাড়া, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া কী করে এটা সফল হল? ড্যানি দেখিয়েছেন কর্তামি ছিল না, কিন্তু দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছাত্রসমাজ ছিল, যারা একই সঙ্গে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে অন্দোলন চালিয়ে গেছে—ল্যাবরেটরি কমিটি, সাধারণ ছাত্র কমিটি, স্টাফ কমিটি, স্ট্রাইক কমিটি।

ছাত্র-আন্দোলন থেকে ড্যানি ক্রমশ শ্রমিক-আন্দোলনে চলে গেছেন। সেখানকার ঘটনাবলি বিবৃত করে তিনি দেখিয়েছেন কম্যুনিস্ট পার্টি, সি জি টি কীভাবে প্রাণপণে শ্রমিকবিপ্লবকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে। শ্রমিকরা যখন কারখানা দখল করছে, তখন ২১ মে সেগ্যুই সি জি টি-র পক্ষ থেকে বললেন; 'আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা ফাঁকা বুলি, শ্রমিকরা যা চায় তা হল কিছু দাবিপূরণ।' কিন্তু শ্রমিকদের অনমনীয় মনোভাব বুঝতে পেরে সি জি টি পথে নামতে বাধ্য হল, ২৪ মে দুটো বিশাল মিছিল বার করল। দু'লক্ষ শ্রমিক-ছাত্রের দল সেই মিছিলে যোগ দিল। আর একলক্ষ শোভাযাত্রী জমা হল গার্ দ্য লিয়ঁ-তে। প্যারিসের অন্যান্য রাস্তায় হাজার নরনারী। স্টক এক্সচেঞ্জ দখল করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। প্যারিস জনতার হাতে, বিপ্লব আরম্ভ। পুলিশের সাধ্য ছিল না সমস্ত সরকারি বাড়ি পাহারা দেওয়া - এলিজে, ওতেল্ দ্য ভিল্, রেডিও অফিস-সব অরক্ষিত। এমন সময় কম্যুনিস্ট ছাত্রেরা আবার এগিয়ে এল। জে সি আর-এর একজন নেতা ছাত্রদের চালনা করল আবার সোরবোনের দিকে। ইউ এন এফ আর পি এস ইউ-র নেতারা অর্থমন্ত্রক আর ন্যায়মন্ত্রকের বাড়ি দখল করতে দিল না, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাত্র-শ্রমিককে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। বিপ্লবের শেষ।

ড্যানির বক্তব্য সরল। ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তারা বিপ্লব চাননি, তাই বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও, শ্রমিকসমাজ তৈরি থাকলেও, অসৎ নেতৃত্বের জন্য বিপ্লব হল না। পার্টি বিপ্লব চায়নি, তার কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করার পর তাকে চালনা করার মতো সংগঠন বা মনোবল তার নেই। তার নেতারা সব স্বার্থান্বেষী এবং মূলত মালিকেরই ধামাধরা। ড্যানির দৃঢ় বিশ্বাস, কারখানার মালিকেরা এখন ট্রেড ইউনিয়নের কর্তাদের আপন স্বার্থের অনুকূলেই ভাবেন। অসংখ্য শ্রমিককে

নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসংখ্য শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো সেগুলো হাত করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। এবং ফ্রান্সে তাই ঘটেছে। এখানকার ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের প্রতিনিধি নয়, মালিকের প্রতিনিধি।

ড্যানি এখানেই থামেননি। তাঁর ধারণা, পার্টি মাত্রেই ব্যুরোক্রাসি। ব্যুরোক্রাসির যাবতীয় দোষ তাতে বর্তাবেই, ফলে পার্টি নামে জনগণের হলেও আসলে মুষ্টিমেয় নেতার অস্ত্র। সুতরাং পার্টিতে বিশ্বাস করা মানে আত্মহত্যা। শুধু ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টি নয়, পৃথিবীর যাবতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এই একই স্বার্থান্বেষী লোকেতে ভর্তি। সে জন্য নাঁত্রে-এ স্লোগান পড়েছিল: 'দয়া ক'রে, কম্যুনিস্ট পার্টি ঢোকার সময় যতটা পরিষ্কার দেখেছিলেন, বেরুবার সময় ততটাই পরিষ্কার রেখে যাবেন।' কিন্তু এই আবেদন নিস্ফল। পার্টি আর ডিমোক্রাসি খাপ খায় না। মায় বলশেভিক পার্টিতেও খাপ খায়নি।

মে-জুন মাসে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সি জি টি-র কাণ্ডকারখানা দেখে ড্যানির এই বদ্ধমূল ধারণা। মে মাসের ঘটনা ঘটার আগে কম্যুনিস্ট ব্যুরোক্র্যাটরা প্রাণপণে ধর্মঘট ডাকায় বাধা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে ছাত্ররা যখনই কোনও বৈপ্লবিক কাজ করতে গেছে, তখনই পার্টি ব্যঙ্গ করেছে। পার্টি কেবলই শ্রমিক-শ্রেণীর ছেলেদের ভর্তি করার আন্দোলন করেছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতিয়ার সেদিকে তার কোনও হুঁশই নেই। তার কারণ কী? কারণ, পার্টির নেতারাও ওই একই বুর্জোয়া রোগে ভোগেন, কী ক'রে সমাজের উপরের ধাপে ওঠা যায়, নিজেদের ছেলেদের তোলা যায়। এটা তাদের খেয়াল নেই, শ্রমিকশ্রেণীর সব ছেলে একসঙ্গে উঁচু ধাপে উঠতে পারে না, উঠতে পারবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন, সুতরাং আসল ওষুধ হল ধাপগুলোই ভেঙে দেওয়া। অথচ যতবার ছাত্ররা ৩রা মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত বিক্ষোভ জানিয়েছে, ততবারই পার্টির পক্ষ থেকে তা দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন শ্রমিক ধর্মঘট ঘটলই, তখন সি জি টি চেষ্টা করেছে বিপ্লব না ঘটিয়ে গুটিকয়েক দাবি পূরণের। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মঘট বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা।

তাহলে বিপ্লব ঘটবে কী করে কে ঘটাবে? ছোট ছোট অ্যাকশন কমিটি। এদের সঙ্গে পার্টির পার্থক্য কোথায়?

১. বিপ্লবের স্রোতের প্রত্যেকটি তরঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে, মূল্য দিতে হবে। প্রত্যেককেই আপন আপন পথে চলতে দিতে হবে। আদেশের শৃঙ্খল থাকবে না।

২. কমিটির প্রত্যেকটি প্রতিনিধি প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে দায়ী থাকবেন, প্রয়োজন হলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া চলবে। বিশেষজ্ঞর কোনও স্থান নেই, কেউ যদি বিশেষজ্ঞ হতে চান, তাঁকে বাধা দেওয়া হবে। জ্ঞানের দরজা সবার কাছে সমান খোলা থাকবে।

৩ তত্ত্ব বা তথ্যের নিরন্তর আদানপ্রদান চলবে। কেউ জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করবে না, করলে বাধা দেওয়া হবে। তথ্য বা তত্ত্বের খবরদারি সহ্য করা হবে না।

৪. কমিটিতে উঁচুতলা নিচুতলা বরদাস্ত করা হবে না।

৫. শ্রমিকসমাজে সর্বপ্রকার পার্থক্য ঘোচাতে হবে, কায়িক বা মানসিক কোনওপ্রকার তারতম্য চলবে না।

৬. কারখানা ব্যবসা চালাবে তারা যারা সেখানে কাজ করবে।

৭. বিপ্লবের জন্য কোনওপ্রকার স্বার্থত্যাগ আত্মদান ইত্যাদি বুলি বরদাস্ত করা হবে না। বিপ্লব কেউ দয়া করে করে না, করিয়ে দেয় না, বিপ্লব করে কারণ বিপ্লবই বাঁচার শ্রেষ্ঠ পথ, একমাত্র পথ।

ফ্রান্সের ছাত্রসমাজ এই বিপ্লবের পথে বিশ্বাস করে তাই সফল হয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্র আয়ত্ত করা যায়নি, তার কারণ মহামহিমান্বিত কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সি জি টি, যার তুলনায় দ্যগল আর দ্যগলের পুলিশ নস্যি।

নাঁত্রে-এর অধ্যাপক তুরেন বলেছেন:

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকেছে, কখনও আর বেরুবে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় যতই আধুনিক আর বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠবে, ততই এর রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত পাকা হবে। যতই তরুণদের বলা হবে, নিজেদের হয়ে ভাব, ততই তারা প্রতিবাদ জানাবে, সমালোচনা করবে, প্রতিরোধ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করবে। এই বিক্ষোভ বাড়তেই থাকবে...যদি রাজনীতিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুড়ে ফেলতে হয়, তাহলে আমাদের সবাইকেই তার সঙ্গে ছুড়ে ফেলতে হবে।

ড্যানির ভাষায়: প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি হয়ে উঠবে অ্যান্টি-ইউনিভার্সিটি এবং তারপর পপুলার ইউনিভার্সিটি। এখন ছাত্রদের দায়িত্ব:

১. নিজেদের পাঠক্রম নিজেদের হাতে নেওয়া অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ।

২. ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা দলগত স্বাতন্ত্র্যকে দাবিয়ে রাখে যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীভাগ তা দূর করা।

৩. যাঁরা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত তাঁদের ছাত্রদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

৪. জ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা, জ্ঞানবিভাগ, যা ছাত্রদের একের কাছ থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করে তা মুছে ফেলা।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সকলের কাছে খুলে দেওয়া।

তার আগে ছাত্ররা কী করবে? বৈপ্লবিক চিন্তা করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে, তাদের সংগঠনে ব্যুরোক্রাসি থাকবে না, শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করবে, পার্টির আদেশ-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে। পদে পদে কর্তৃপক্ষকে বাধা দিয়ে তাকে বাধ্য করাবে পুলিশ ডাকতে অথবা ক্লাস বন্ধ করে দিতে যাতে জনসাধারণের চোখে খুলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল চেহারাটা। আর সবসময় মনে রাখতে হবে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব শ্রমিক-কৃষককে নেতৃত্ব দেওয়া নয়, তাদের সঙ্গে কাজ করা।

৭ম বর্ষ ১-৩ সংখ্যা
(বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬)

রাধারমণ মিত্র

'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে

বঙ্গাব্দ ১৩৫৫-র প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় " 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পরে *দেশ* পত্রিকার ২৫ ফাল্গুন ১৩৭৪ (ইং ৯ মার্চ ১৯৬৮) সংখ্যায় ওই প্রবন্ধটি লেখকের সম্মতি-ক্রমে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়।

ইং ১৯৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি আমি বহুকাল পূর্বে পড়ি, এবং তখন আমার মনে কতকগুলি বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। আমি ওই বিষয়ে পড়াশোনা ও চিন্তা করতে থাকি। শেষে আমার মনে হয় 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সুনীতিবাবুর সিদ্ধান্ত ভুল; শুধু মূল বিষয়েই নয়, ইতিহাসাদি আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়েই ভুল। এই ধারণা আমার কেন হল তার কারণগুলি এখন সুধীবৃন্দের সামনে উপস্থিত করলাম। আমার লেখায় ভুল থাকলে যদি কোনও সহৃদয় পাঠক তা দেখিয়ে দেন বিশেষ উপকৃত হব।

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি দীর্ঘ, *দেশ* পত্রিকার প্রায় সাড়ে-তিন পৃষ্ঠাব্যাপী। তার মধ্যে যেগুলি প্রধান বিষয় সেগুলি লেখকের ভাষায় (*দেশ পত্রিকার পাঠ* অনুসরণে) প্রথমে তুলে দিয়ে তার নীচে আমার বক্তব্য জানিয়েছি।

মূল প্রবন্ধের ক্রম যতদূর সম্ভব এই আলোচনায় অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আপত্তিজনক উক্তিগুলি ভেঙে সাজানো ও সেগুলিকে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক

সুনীতিবাবু লিখেছেন : "আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা শহর খুব প্রাচীন স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতার গৌরবের পত্তন।

১. ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই।

২. তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটি বড়ো বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল,

৩. এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল।

৪. সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া দাঁড়ায়।"

মন্তব্য :

১. ১ ও ২ সংখ্যক উক্তি পরস্পরবিরোধী। দুই উক্তিই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না।

২. ২ সংখ্যক উক্তি লেখক আরম্ভই করেছেন 'অনুমান হয়' এই বাক্যাংশ দিয়ে। কলকাতার সমৃদ্ধি ইতিহাসের ব্যাপার। এত গুরুতর একটি উক্তির সমর্থনে লেখক ইতিহাস থেকে একটি তথ্যও সঙ্কলন করে দেখাতে পারেননি। ইতিহাস বিষয়ে অনুমান ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হলে গ্রাহ্য হতে পারে না। অনুমান নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি পরে দেখাবো লেখক অন্যত্র এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৩. ষোড়শ শতকে কলকাতার নাম বাংলার বাইরে কোথায় পৌঁছেছিল স্পষ্ট করে লেখক তা বলেন নি।

৪. এই উক্তিটি অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা একটা বিখ্যাত স্থান হয়ে দাঁড়ায়নি। অখ্যাত নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল।

প্রথমত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগস্ট তারিখে জোব চার্নক এখানে পদার্পণ করে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন করেন। কলকাতার সমৃদ্ধি তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। তখন কলকাতা তিনটি নগণ্য গ্রামের একটি মাত্র। আট বছর পরেও অর্থাৎ ১৬৯৮ সালেও যখন ইংরাজ কোম্পানি ওই তিনটি গ্রামের খাজনা আদায়ের অধিকার খরিদ করে তখনও কলকাতা নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল।

দ্বিতীয়ত, জোব চার্নক মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কলকাতায় নামেননি, নেমেছিলেন সুতানুটি গ্রামে, আর ওই গ্রামেই তিনি বসবাস করেন। পরবর্তী 'টাউন' কলকাতায় অর্থাৎ বর্তমান ডালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলে তিনি থাকতেন ও ওইখানেই তিনি মারা যান –এর আদৌ কোনও প্রমাণ নেই। বরং উল্টো প্রমাণ আছে। সেন্ট জন গির্জার সংলগ্ন কবরখানায় তাঁর সমাধি-সৌধটি তাঁর মৃত্যুর দু-তিন বছর পরে তাঁর জামাতা চার্লস আয়ার নির্মাণ করেন। চার্নকের মৃত্যুর পর থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা ডালহাউসি অঞ্চলে বাস করতে আরম্ভ করে এবং ওই স্থানই তাদের কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। চার্নকের আগমনের পূর্বেই যদি কলকাতা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে থাকত, তাহলে চার্নক কলকাতাতেই নামতেন, সুতানুটিতে নয়। সুতানুটিতে নেমেছিলেন এইজন্য যে সুতানুটি বরং তখন একটা বিখ্যাত না হোক, বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়ত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কলকাতা যে কত নগণ্য স্থানে ছিল তার আরও কতকগুলি প্রমাণ এখানে দিচ্ছি :

ক. Col. Henry Yule, যিনি A. C. Burnell -এর সঙ্গে *Hobson-Jobson* গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস ও অন্যান্য জায়গার দপ্তর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ১৬৭৫ সালের *English Pilot* গ্রন্থে ও একটি পুরাতন *Marine Chart*-এ *'Chuttanuttee'* ও 'গোবিন্দপুর' নাম পেয়েছেন, কিন্তু 'কলিকাতা' নাম পাননি। কোম্পানির পুরোনো কাগজপত্রে 'কলিকাতা' নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ যা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন তার তারিখ ১৬ অগস্ট ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

খ. শুধু তাই নয়। বিলাতের ইন্ডিয়া অফিসে কলকাতার Factory Council-এর লেখা যে সব চিঠিপত্র আছে, সে সব চিঠির মাথায় ১৭০০ সালের ২৭ মার্চ পর্যন্ত কলকাতার নাম নেই, আছে *Chuttanuttee*-র নাম। ওই বছরের ৮ জুন থেকে যে সব চিঠি লেখা হয় তাদের মাথায় আছে *Calcutta* নাম এবং ওই বছরের ২০ অগস্ট থেকে যে সব চিঠিপত্র লেখা হয়েছে তাতে স্থানের নাম আছে 'Fort William in Calcutta'।

গ. ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাত্র একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা ক'রে আসছিল। তার নাম ছিল London Company। ওই সালে ইংল্যান্ডের রাজা আর একটি ইংরেজ কোম্পানিকে ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা করার লাইসেন্স দেন। এই কোম্পানির নাম English Company। ফলে চার বছর ধরে এই দুই কোম্পানির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তাতে দুই কোম্পানিরই প্রচুর লোকসান হয়। শেষে কোম্পানি দুটি বুঝল যে মারামারি না করে দুই কোম্পানি মিলে এক হয়ে যাওয়াই ভালো। ১৭০২ সালে মিলিত হবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল কলকাতায়। কিন্তু সে চুক্তিপত্রে স্থানের নামের উল্লেখ আছে কলিকাতা বলে নয়, *Chuttanuttee* বলে।

ঘ. ১৭০৩ সালের John Thornhill-এর Chart-U Kitherpore (খিদিরপুর)- এর উল্লেখ আছে, কলকাতার কোনও উল্লেখ নেই।

উপরের তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কেন, অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেও, কলকাতা বিখ্যাত স্থান হয়ে ওঠেনি।

দুই

এরপর সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের প্রচলিত ছ'টি ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করেছেন এবং সব ক'টিকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে খারিজ করে দিয়েছেন।

করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে আর একটি ব্যুৎপত্তি আছে যেটি অন্য কোনও কারণ না হলেও নিছক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক এবং সুনীতিবাবুর মতো ভাষাতাত্ত্বিকের সেটি খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

সুনীতিবাবু বলেছেন : "সাধু বা পুরাতন বাঙ্গালার রূপ 'কলিকাতা', কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার) রূপ 'ক'ল্‌কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোল্‌কাতা, কোল্‌কেতা)'।"

'কলিকাতা'কে আমরা যেমন উচ্চারণ করি 'কোলিকাতা', 'কলকাতা'কেও আমরা সেই রকম উচ্চারণ করি 'কোলকাতা'। এখন, যে ব্যুৎপত্তির কথা বলছি সে অনুসারে 'কোলিকাতা'=কোলি কা হাতা এবং 'কোলকাতা'=কোল কা হাতা। এর অর্থ 'কোলি' বা 'কোল' নামক জাতির গণ্ডি বা দেশ।

তিন

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : " 'কলিকাতা' নামটির ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক।

(১) কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্রীস্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শকে) রচিত হয় (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৭৩)।...চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া, ...চাঁদ সদাগর কালীঘাটে গিয়া কালিকার পূজা করেন।

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে, কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটি পৃথক স্থান। কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—আধুনিক বাঙ্গালার এইরূপ ধ্বনি-পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান—ইহা অসম্ভব।"

মন্তব্য :

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল নিয়ে দু'জন নামকরা সাহিত্যিক বিশেষ আলোচনা করেছেন। একজনের নাম সুনীতিবাবু নিজেই উল্লেখ করেছেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'-এ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের রচনাকাল ও ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে শেষে মন্তব্য করেছেন ওই কাব্যে কলকাতাসমেত গঙ্গাতীরবর্তী যতগুলি গ্রামের নামের উল্লেখ আছে সবগুলিই প্রক্ষিপ্ত, কারণ তাঁর মতে ওই নামগুলি আধুনিক।

সুনীতিবাবু বাংলা ১৩৪৩ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র তারই উপর নির্ভর করেছেন। তাতে শ্রীযুক্ত সেন কী মত প্রকাশ করেছেন জানি না, কেননা সে প্রবন্ধ আমি পড়িনি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। সময় দাঁড়িয়ে নেই। সুকুমারবাবুর কলমও থেমে থাকেনি। বাংলা ১৩৪৩ সালের পরে তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা করেছেন। সেই প্রামাণ্য ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধের ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণে (পৃ ১৮৪-২১৪) শ্রীযুক্ত সেন সপ্তগ্রাম থেকে আরম্ভ করে কালীঘাট পর্যন্ত কাব্যে উল্লিখিত গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম আছে : কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, বোরো, কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর,

চাঁপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, জমিন, দিগঙ্গ, নিমাইতীর্থ, চাণক্য, বুড়নিয়ার দেশ, আকনা মাহেশ, খড়দহ, রিষিড়া, সুখচর, কোননগর, কোতরং, কামারহাটী, আড়িয়াদহ, ঘুসুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, ধনগু, কালীঘাট। খড়দহের পাদটীকায় শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : "এ বর্ণনা অনেকাংশেই প্রক্ষিপ্ত। খড়দহের প্রসঙ্গে আছে, 'খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবৎ।' নিত্যানন্দ এখানে আনুমানিক ১৫৩৫ সালের দিকে বাস করিয়াছিলেন। তাহার আগে নয়। সুতরাং অন্যথা অ-খ্যাত এই স্থানটি ১৪৯৫ সালে 'শ্রীপাট' অর্থাৎ বৈষ্ণব মহান্তের বাস হেতু তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

শুধু তাই নয়। অন্তত আরও একটি জায়গা শ্রীযুক্ত সেন-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে — সেটি নিমাইতীর্থ। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিমাই-এর বয়স ছিল ১০ বছর। সুতরাং সেই সময় তিনি বৈদ্যবাটীতে আসতেই পারেন না, এসেছিলেন ঢের পরে, পুরী যাবার পথে। তখনই এই স্থান তাঁর নামে তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। অতএব ১৪৯৫ সালে নিমাইতীর্থ ছিল না। শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : "বিপ্রদাসের কাব্যের সবচেয়ে পুরাণো পুঁথি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগেকার নয়।" তা নয় হল, —কিন্তু 'কলিকাতা' নাম? শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখেছেন : "কলিকাতা নামও প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করি।"

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : "(২) কবিকঙ্গণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে (খ্রিস্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫?) কলিকাতা ও কালীঘাটের পৃথক-পৃথক উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত।"

মন্তব্য :

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য দুজনেরই মত —সুনীতিবাবুর উল্লিখিত কালে ওই কাব্য রচিত হয়নি, তার পরে হয়েছে। সুনীতিবাবু নিজেও নিজের দেওয়া সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। অন্যদিকে বাংলা ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'কবিকঙ্কন ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য' এই শিরোনামায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেছেন —"আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিতি করি....প্রায় ৫০/৬০ খানি পুঁথি (চণ্ডীর —রা. মি.) আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোনখানিতে ঐ (অর্থাৎ রচনার কাল-নির্দেশক —রা. মি.) শ্লোক দেখি নাই।" (দ্র 'মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস')। এই উক্তির পর আমার মনে হয় চণ্ডীকাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়।

এখন দেখা দরকার ওই কাব্যে সত্যসত্যই কলকাতার নাম আছে কি না। সাহিত্য-রথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর স্বগৃহে সযত্নে রক্ষিত একখানি পুঁথি থেকে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত বলেছেন : 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে।' (দ্র 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস')। সরকার মশাইয়ের এই সংস্করণে 'কলিকাতা' ও 'কালীঘাট' কারওরই উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ১২৯৯ সনে (ইং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে) মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ "বিশ্বকোষ"-এ লেখা 'কলিকাতা' প্রবন্ধের লেখক বলেছেন : "মুদ্রিত পুস্তকে থাকিলেও, কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিলাম, তন্মধ্যেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নাই।"

তৃতীয়ত, দ্বিজমাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্র-যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট ইত্যাদি কাছাকাছি জায়গার উল্লেখ থাকলেও, 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নেই। অবশ্য কবি মাধবের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন ১৫৭৯, কেউ বলেন ১৬৪৫, কেউ বলেন ১৬৪৭, আবার কারও মতে ১৬৬৪ সাল। প্রথম তারিখের কথা ছেড়ে দিয়ে একেবারে শেষের তারিখকে রচনাকাল ধরলেও দেখা যাচ্ছে ১৬৬৪ সালেও দ্বিজমাধবের চণ্ডীকাব্যে 'কলিকাতা'র নাম নেই।

সুতরাং মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল না।

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : "(৩) ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে —আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। *Hobson-Jobson*-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে।

১. Blochmann ব্লখ্ মান্ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসি ('দেশ' পত্রিকায় ভুল করে 'ফরাসী' ছাপা হয়েছে —রা. মি.) আইন-ই-আকবরীতে Klkt (Kalkata বা Kalikata) রূপে নামটি পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে —Kln='কল্না', Klt= 'কল্তা', Tlp = 'তল্পা'। 'কলকাতা' ও 'কল্পা' এই দুই পাঠভেদ সর্বপ্রাচীন দুইখানি পুঁথিতে পাওয়া যায়।

২. 'কল্কাতা, Bkw' বকোয়া ও Brbkpur বারবকপুর' এই তিনটি মহাল সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল। ....

৩. তবে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময় কলিকাতা যে একটি লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে —

৪. ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরথীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসাকেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

মন্তব্য :

১. ক. আমার মতো আনাড়ি ঐতিহাসিকের পক্ষে এ ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে, তাই নিজের মত ব্যক্ত না করে এ বিষয়ে বাংলাদেশের তথা ভারতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করব। কিন্তু তার আগে আমার পক্ষ থেকে সুনীতিবাবুর কাছে এইটুকু সবিনয় নিবেদন করতে চাই যে যেখানে এতরকম পাঠভেদ দেখা যাচ্ছে সেখানে অন্য পাঠ বাদ দিয়ে শুধু 'কলিকাতা' বা 'কলকাতা' পাঠ গ্রহণ করবার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? যদি বলেন সর্বপ্রাচীন পুথিতে এই পাঠটি আছে, তাহলে 'তল্পা' পাঠ গ্রহণ করতে আপত্তি কি, যখন, তিনি নিজেই বলেছেন, এ পাঠটিও সর্বপ্রাচীন পুথিতে আছে?

খ. এখন স্যার যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন : 'Calcutta is unlikely. I prefer the variant in text Kalna'।

মূল ফারসি আইন-ই-আকবরি গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড Blochmann সাহেব ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সটীক অনুবাদ করেন Col. H.S. Jarrett যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৪-৯৬ খ্রিস্টাব্দে। Jarrett-কৃত এই দুই খণ্ড অনুবাদ 'corrected and further annotated' হয়ে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। Jarrett-কৃত দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদের পাদটীকায় স্যার যদুনাথ ওই মন্তব্য করেছেন।

২. যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে আইন-ই-আকবরীতে কলকাতার নাম আছে, সে কলকাতা কি একটি গ্রাম না মহল? আইন-ই-আকবরি বলছে 'মহল', সুনীতিবাবু ধরে নিয়েছেন 'গ্রাম'। (৩ ও ৪ অংশে তাঁর উক্তি দ্রষ্টব্য।) গণ্ডগোলের মূল এইখানেই।

বলা বাহুল্য মহল (এক বচনে 'মহল', বহু বচনে 'মহাল') ও গ্রাম এক জিনিস নয়। মহল গ্রামের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। কত বড় তার খানিক ধারণা হবে এই হিসাব থেকে : বাংলা 'সুবা'র মধ্যে মোট ২৪টি 'সরকার' ও ৬৮৭টি 'মহাল' ছিল। সরকার সাতগাঁর অধীনে তথাকথিত কলকাতা নিয়ে মোট ৫৩টি মহাল ছিল। সরকার সাতগাঁর মোট রাজস্ব ছিল ১৬,৭২৪,৭২৪ দাম; সরকার সাতগাঁর অধীনে কলকাতা (অথবা কলনা), বকোয়া ও বারবাকপুর এই তিনটি মহালের মিলিত রাজস্ব ছিল ৯৩৬,২১৫ দাম।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটি 'মহাল' একটি 'গ্রাম'-এর থেকে বহু, বহু গুণ বড় ছিল—পরবর্তী কালের প্রায় একটি 'পরগণা'র সমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে বহু পরবর্তী কালে 'মহাল' কলকাতার বদলে একটি 'পরগণা' কলকাতার সাক্ষাৎ পাই। তথাকথিত কলকাতা মহলের মধ্যে কতগুলি গ্রাম ছিল ও তাদের কি কি নাম ছিল তা আইন-ই-আকবরীতে দেওয়া নেই।

৩. এই উক্তিটি এক/৩-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। সমস্তটাই 'অনুমান'। আইন-ই আকবরির মতো অত বড় এক ইতিহাসগ্রন্থ থেকে লেখক একটা প্রমাণও বার করতে পারেননি।

৪. এই উক্তিটিও এক/২-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং এক/২-এর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেই মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য। অধিক বলা অনাবশ্যক।

এর পর সুনীতিবাবু লিখেছেন :

৫. "কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে দলিল। বহুকাল হইতে, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J. Seth মেসরোভ সেথ্ মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধি-ফলকগুলির মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধি-ফলক হইতেছে, দানশীল বণিক Sukias সুকিয়াস-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বী-র'। ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩০ (ভুল ক'রে ছাপা হয়েছে ১৬৩২—রা. মি.) অব্দ হয়।...

৬. এই লেখা হইতে জানা যায় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় আরমানী বণিক্দের একটি কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। ইংরেজ Job Charnock যোব চারনক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে—দুই পুরুষ আগে—আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।"

মন্তব্য :

৫. ক. কলকাতা শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিলখানি নিজেরই প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে, কলকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না। যদি পাথুরে দলিলের গায়ে কলকাতার নাম লেখা থাকত, তাহলেই প্রমাণ হত যে ১৬৩০ সালেও কলকাতা নামে এক গ্রাম বা শহর বাংলাদেশে ছিল। শোনা যায় আমাদের কালীঘাটে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এককালে কতকগুলি রোমান বা গুপ্ত যুগের (?) মুদ্রা পাওয়া যায়। তা থেকে প্রমাণ হয় না যে রোমানদের বা গুপ্তদের সময়ে কালীঘাট গ্রাম বিদ্যমান ছিল বা ওইসব রোমানদের বা গুপ্তদের মুদ্রা কালীঘাটে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল!

খ. যে মেসরোভ সেথ ওই দলিলখানি আবিষ্কার করেন তাঁরই ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৬৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনও গ্রামে বা শহরের আরমানি বণিকদের বসবাস আরম্ভ হয়নি। পরবর্তী কালে সৈদাবাদ (মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে), চুঁচড়া, চন্দননগর, ঢাকা ও কলকাতা-বাংলাদেশের মাত্র এই পাঁচটি গ্রামে বা শহরে তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

মেসরোভ সেথ লিখেছেন : 'Armenians formed their first settlement in Bengal in the year 1665 by virtue of a farman issued by Moghul Empeor Aurangzeb granting them a piece of land at Saidabad, wih full permission to form a settlement there'। সে যুগে মোগল সম্রাটগণ জমি ও অনুমতি না দিলে কোনও বিদেশিই ভারতের কোথাও বসবাস করতে পারত না।

চুঁচড়া সম্বন্ধে সেথ মশাই লিখেছেন : 'The Armenians had attached themselves to their confreres in trade, the Dutch, at Chinsurah, in the year 1645 under the leadership of the famous Margar family'। এখানে সেথ্ সাহেবের ভাষা লক্ষণীয়। তিনি বলছেন না যে আরমানিরা ১৬৪৫ সালে চুঁচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে। তা বললে তো তাঁরই আগেকার উক্তিকে খণ্ডন করা হয়। বলছেন তারা ওই সালে ওলন্দাজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। তাহলে নিশ্চয় তারা এই ব্যবসা বাংলার বাইরে থেকে চালাত। বাংলাদেশে আরমানিদের সর্বপ্রথম গির্জা ১৬৯৫ সালে চুঁচড়ায় নির্মিত হয়। সুতরাং ১৬৬৫ ও ১৬৯৫-এর মধ্যে কোনও সময়ে তারা

চুঁচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে।

আরমানিরা চন্দননগরে প্রথম কখন আসে সে কথা সেথ সাহেব বলতে পারেননি। মাত্র এইটুকু বলেছেন যে চন্দননগরের ফরাসি কবরখানায় সব থেকে পুরোনো আরমানি কবর আছে একজন বণিকের, যিনি মারা যান ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

সেথ সাহেবের মতে ঢাকায় আরমানিরা বসবাস আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৬৩০ সালে বা তার পূর্বে আরমানিদের কলকাতায় বসবাস করার কথা অলীক কল্পনা মাত্র।

৬. ১৬৩০ সালের কলকাতায় আরমানি বণিকদের একটি কেন্দ্র ছিল এবং এই কেন্দ্রে তারা স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করত—এ কথা প্রথমে বলেন মেসরোভ সেথ সাহেব, তাঁকে অনুসরণ করে সুনীতিবাবু এই প্রবন্ধে সেই কথা বলেছেন।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় Catchick Arakiel নামে এক ধনী আরমানি বণিক বাস করতেন। তিনি স্থানীয় আরমানি গির্জার জন্য অনেক কিছু করেন। গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলঙ্কৃত করেন, গির্জার ঘড়ি-ঘরে যে ঘড়িটা আছে গির্জা-সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকে যে উঁচু পাঁচিল আছে সেই পাঁচিল নির্মাণ করিয়ে দেন। এঁরই পুত্র Agah Moses Catchick Arakiel কলকাতায় জন্মান অষ্টাদশ শতকে। তিনি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে Hawksworth নামে এক সাহেবকে একখানি চিঠি লেখেন। Hawksworth সাহেব সেই চিঠিখানি *East Indian Chronologist* নামে এক পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। সেই চিঠিতে Arakiel সাহেব বলেছেন :

> Shortly after the establishment of Calcutta by the English, the Armenians settled among them,...The site of the present Armenian church was at that time their burying ground in which there are tombstones dated 80 years back and consequently older than the present church।

বর্তমান আরমানি গির্জাটি তৈরি হয় ১৭২৪ সালে এবং তার সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে ওই চিঠি লেখার সময় থেকে ৮০ বছর আগেকার অর্থাৎ ১৭২০/২১ সালের সমাধি আছে। ১৬৩০ সালের রেজা বিবির কবর ছাড়া এই গোরস্তানে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় একটি কবর নেই। অন্য যেসব কবর আছে সবগুলিই অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী কালের। কেননা ১৭২০ সালে Kenanentch Phanoos নামে এক আরমানি নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কবরস্থান করবার উদ্দেশে ওই জমি খরিদ করেন। ১৭২৪ সালে ওই কবরস্থানের এক পাশে Agsh Nazar নামে অন্য একজন আরমানি গির্জাঘর তৈরি করে দেন।

সপ্তদশ শতকের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কবর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে ওই সময়ে কলকাতায় আরমানিদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। একটিমাত্র লোক দিয়ে তা আর উপনিবেশ হয় না! আরমানিরা কলকাতায় ১৬৩০ থেকে ১৭২০ সাল পর্যন্ত ৯০ বছর স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করল অথচ তাদের মধ্যে আর একটি লোকও মরল না—এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? যদি মরত তবে নিশ্চয় কবর থাকত এবং যদি বাস করত নিশ্চয়ই মরত। সুতরাং ইংরেজ আসার দুই পুরুষ আগে কলকাতায় আরমানিদের উপনিবেশ ছিল—এটা একেবারে আষাঢ়ে গল্প। কোন মোগল সম্রাট ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে বা তার পূর্বে আরমানিদের কলকাতায় বসবাসের অনুমতি দিলেন? সে অনুমতিপত্র কোথায়?

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নকের কলকাতায় আসার পর যে আরমানিরা এখানে আসে তার আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে Khojah Phanoos Kalanthar (বা Kalandar) নামে একজন বিখ্যাত আরমানি বণিক সুরাতে বাস করতেন। তাঁর এক ভাগ্নে ছিলেন। তিনি কলকাতার ইতিহাসে আরও বিখ্যাত। তাঁর নাম Khojah Israel Sarhad। মামা-ভাগ্নে দুজনে মিলে ইংল্যান্ডে যান ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে তখন Sir Josiah Child ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। সে সময়ে এই

পদাধিকারীকে চেয়ারম্যান না বলে, গভর্নর বলা হত। বিলাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের আরমানি সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে দুটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। কোম্পানির তরফে স্যার জোশিয়া চাইল্ড ও আরমানিদের তরফে খোজা ফানুস ও খোজা সরহদ স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় চুক্তিটির বয়ান ছিল এই রকম :

> The Honourable East India Company stipulated "that wherever forty or more of the Armenian nation shall become inhabitants of any of the garrisons, cities or towns belonging to the Company in the East Indies, the said Armenian shall not only have and enjoy the free use and exercise of their religion but there shall also be attached to them a parrel of ground to erect a church thereon for the worship and service of God in their own way. And that we will also at our own charge, cause a convenient church ro be made of timber which afterwards the said Armenians may alter and build with stone and solid material to their own good liking. And the said Governor and Company will also allow £ 50 per annum, during the space of seven years, for the maintenance of such priest or minister as they shall choose to officiate therein.

এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দু-বছর পরে জোব চার্নক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো কলকাতায় আসেন। তাঁর আসার ১৭ বছর পরে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে উপরে উদ্ধৃত চুক্তি অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি বর্তমান আরমানি গির্জার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরমানিদের জন্য একটি কাঠের ছোট গির্জাঘর (chapel) তৈরি ক'রে দেন। আর পুরোহিতের মাইনে বাবদ ৭ বছর পর্যন্ত ৫০ পাউন্ড করে বছরে দিয়ে যান। ১৭১৪ সালে এই সাহায্য বন্ধ হয়। এবং তার দশ বছর পরে আরমানিরা ওই কাঠের গির্জা পরিত্যাগ করে ১৭২০ সালে কেনা কবরখানার হাতার মধ্যে পাকা গির্জঘর তৈরি করে।

১৬৯০ সালে জোব চার্নকের আসার পর থেকে একটি দুটি করে আরমানি বণিক কলকাতায় আসতে থাকে। ১৭০৭ সালের আগে তাদের সংখ্যা চল্লিশেও পৌঁছায়নি। সুতরাং ১৬৩০ সালে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে সত্যিই ওই সময়ে কলকাতায় তাদের একটি উপনিবেশ ছিল, তাহলে এটা কি আশ্চর্যের কথা নয় যে তাদের মতো ধনী ও ধর্মপ্রাণ জাত ৯৪ বছরের মধ্যেও নিজেদের জন্য একটা গির্জাঘর ও ৯০ বছরের মধ্যেও একটা গোরস্থান তৈরি করল না? প্রায় একশো বছর ধরে তারা রবিবারের উপাসনা করত কোথায়? মৃতের সৎকার করত কোথায়?

এতকিছু বলার পরেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ১৬৩০ সালের ওই রেজা বিবির কবর সম্বন্ধে। ও কবরের ব্যাখ্যা কী? মেসরোভ সেথ সাহেব যাঁকে 'That renowned scholar' এবং 'Author of Early Annals of the English in Bengal' বলেছেন সেই 'Late Professor C. R. Wilson' কবরটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> Regarding the earliest grave of an Armenian in the Armenian churchyard in Calcutta, the tombstone is dated 11th July, 1630 A. D. This has been taken as showing that the Armenians were established in Calcutta as early as 1630. The inference does not seem valid. The instance is isolated. No other tombstones in the churchyard are dated earlier than the 18th century. There is nothing to show that the stone is in situ. It may well have been brought to Calcutta from elsewhere. An inscribed stone has recently been found in St. John's churchyard which must somehow have come from China. Even if the stone is in situ it does not prove the existence of an Armenian colony. In India a person must be buried where he dies. If an Armenian voyager died in a ship near Calcutta, it would be necessary to bury the body there.

কলকাতার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' এখানেই সাঙ্গ হয়নি। *দেশ* পত্রিকার আরও আধ পৃষ্ঠা ধরে বিস্তৃত হয়েছে। তাতে আরমানিদের পরে পোর্তুগিজদের ও তাদের পরে ইংরাজদের কলকাতায় আগমন, ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে ওই তিন জাতির কলকাতায় পাশাপাশি বাস ও বাণিজ্যসম্পদের সমান অংশীদারি, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি থেকে ইংরাজদের বাংলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধালাভ, ১৬৯৮ (ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে ১৭৯৮—রা. মি.) সালে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের কাছ থেকে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম খরিদ, ১৬৯৯ সালে কলকাতা ইংরেজদের পুরো অধিকারে আসবার ফলে আরমানি ও পোর্তুগিজদের বাংলার বাণিজ্যে ও কলকাতায় প্রতিপত্তি হ্রাস, সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থিতি ইত্যাদি মামুলি ও সুপরিচিত বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এই বর্ণনায়ও কতকগুলি ভুল আছে। প্রথম, পোর্তুগিজদের পরে ইংরেজরা আসেনি, ইংরেজদের পরেই পোর্তুগিজরা এসেছে। দ্বিতীয়, আরমানি, পোর্তুগিজ, ও ইংরাজ এই তিন জাতির বাণিজ্যসম্পদে সমান অংশীদারি কোনওদিনই ছিল না। পোর্তুগিজরা কলকাতায় ব্যবসা করল কবে? তারা তো ইংরেজদের সৈনিক হত, কেরানি হত, চাকর-বাকর হত এমনকি ক্রীতদাসও হত। তাদের মধ্যে তো একমাত্র ব্যবসাদার Baretto ও De Suja পরিবার। এঁরা কলকাতার লোক নন। এসেছিলেন বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তৃতীয়, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলাদেশের আন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে দিল্লি থেকে কোনও বিশেষ সুবিধালাভ করেনি। পরে করেছে। চতুর্থ, সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা তিনটি গ্রাম খরিদ করেনি, তিনটি গ্রামের খাজনা আদায়ের স্বত্ব খরিদ করে।

এইসব মামুলি ইতিহাস শুধু শোনাবার জন্যই শোনানো হয়েছে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কলকাতার পাথুরে দলিলের কথাও শুধু আরমানিদের ইতিহাস শোনাবার জন্য পাড়া হয়েছে। বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের কাব্যের উল্লেখের তবু অর্থ বোঝা যায়। অর্থ হচ্ছে দেখানো যে 'কালীঘাট' নাম থেকে 'কলিকাতা' নাম হয় নি। নেতিবাচক প্রমাণ হলেও 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি'র সঙ্গে তার কিছুটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আইন-ই আকবরির আলোচনা কী জন্য? তাতে তো কালীঘাটের নাম নেই। ওই দুটি কাব্য ও একটি ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যদি লেখক প্রমাণ করতে পারতেন কলকাতায় সেই যুগে শামুকপোড়া কলিচুনের উৎপাদন ও ব্যাবসা এবং তজ্জনিত তার সমৃদ্ধি ও খ্যাতি ছিল, শুধু তাহলেই ওই গ্রন্থগুলির আলোচনা সার্থক এবং প্রবন্ধের যা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল তা সিদ্ধ হত। তা না করে লেখক আমাদের কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ দেখিয়েছেন মাত্র। তিনি যেন ধরে নিয়েছেন শুধু এর দ্বারাই কলকাতার প্রাচীন সমৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রমাণ করা যায়। এ ধারণা (যদি তাঁর সত্যই থেকে থাকে) একান্তই ভুল। কোনও গ্রন্থে কোনও স্থানের উল্লেখ থাকলেই প্রমাণিত হয় না যে সে স্থান বিখ্যাত। মনসামঙ্গল কাব্যে 'জমিন', 'বুড়নিয়ার দেশ'-এর উল্লেখ আছে। কেউ তাদের নাম কখনও শুনেছে? আইন-ই-আকবরিতে তথাকথিত কলকাতার সঙ্গে 'বকোয়া' ও 'বারাকপুর-এর উল্লেখ আছে। এদের পরিচয় কেউ জানে? সুতরাং এইসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা একেবারে অবান্তর ও নিরর্থক। এ দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লেখক একবারও একথা বলেননি যে ১৪৯৫ সাল বা তার আগে থেকেই কলকাতায় কলিচুন তৈরি হত, নতুবা গ্রামের নাম কলকাতা হতে পারত না। একথাটি তিনি অনেক পরে এবং অন্য প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেছেন—'এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে' (পাঁচ/৮.দ্রষ্টব্য)। প্রবন্ধের প্রায় শেষে আর একটি বাক্যে এই কথারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—'সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পোড়া (কাতা) চুন বা কলিচুন প্রস্তুতই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।'

এই সুদীর্ঘ আলোচনা লেখকের আসল প্রস্তাবের ভূমিকা মাত্র। এইবার তিনি "কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি"র কথা আরম্ভ করছেন।

চার

সুনীতিবাবু লিখেছেন :

১. " 'সুতানুটী' নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত— সুতার নুটী, অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম।

২. হয়তো ঐ অঞ্চলের আদি নাম ছিল 'চিৎপুর', পরে চিৎপুরের অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে 'সুতার নুটীর হাট' বসিত, তাহাই 'সুতানুটীর হাট' বা 'সুতানুটী হাট' রূপে পরিচিত হয় ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশ্লিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় 'সুতানুটী'।

৩. এই 'সুতীনুটী' নামেরই অনুরূপ 'কলিকাতা' নাম।

৪. 'কলিকাতা'—একটি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

৫. ইহার অর্থ, 'কলি' বা কলিচুনের জন্য 'কাতা' শামুক পোড়া।

৬. সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সুতানুটী' নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে 'কলি-কাতা' নাম।

৭. পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়।

৮. এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা 'কলি ফিরাইবার' জন্যই প্রস্তুত সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে।

৯. শামুক-পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা ঐ চুন দিয়া পান খাইতেন না।

১০. পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, ঐ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

১১. 'কলি'-শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। 'কাতা' শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি।...উত্তরবঙ্গে রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চূনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে 'কাতা' বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গাড়াকে বাঙ্গালাদেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে 'বাখারী'ও বলে।...

১২. 'কলি' শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী') দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুকপোড়া চূন অর্থে উত্তর-ভারতে সুপ্রচলিত। শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।...

১৩. বাঙ্গালায় ও উড়িয়াতে 'কাতা' শব্দ 'নারিকেল-দড়ি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও 'কাতা' শব্দের ব্যুৎপতি অজ্ঞাত। 'কলি' ও 'কাতা' অর্থাৎ কলিচুন ও নারিকেল-দড়ি, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 'কলিকাতা' নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই,...

১৪. কিছুকাল পূর্বে আমি 'কাতা' শব্দকে চলিত বাঙ্গলা 'কাতা' অর্থাৎ 'পার্শ্বদেশ' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ('কলির কাতা'—'কলিচূনের স্থান বা আড়ত')। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।"

মন্তব্য :

১. ১-এ আছে 'সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত'। আবার ৬-এ আছে 'শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা'। আবার পাঁচ/৮-এ আছে 'কাতা-চূনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত'।

তিনটি জায়গায় চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—হাট বা বাজার, আড়ত এবং কারখানা। 'আড়ত' শব্দটি দুবার, অন্য তিনটি শব্দ একবার করে ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ থেকে ৪০০/৫০০ বছর আগেকার কথা বলা হয়েছে। অতদিন আগে বাংলাদেশের কোথাও কি

বাজার, আড়ত কিংবা কারখানা ছিল? অন্তত সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিন গ্রামে ছিল না।

'হাট' বা 'বাজার'—এখানে বাজার কি হাটের সমার্থক শব্দ? অর্থাৎ হাট মানে যা, বাজার মানেও তা? তা কখনওই নয়। হাট একদিন মাত্র বসে, সেইদিনই ভাঙে। বাজার ভাঙে না, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। হাটে আড়ত থাকে না, বাজারে থাকে, কেননা আড়তও স্থায়ী। হাট প্রাচীনতর, বাজার, আড়ত, কারখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সমাজ ও শিল্পবিবর্তনের আদিতে হাট, পরবর্তীকালে গঞ্জ, বাজার, আড়ত, কারখানা দেখা দেয়। ৪০০/৫০০ বছর আগে বাজার, আড়ত, কারখানা থাকা সম্ভব ছিল না। শুধু হাট থাকাই সম্ভব ছিল। সুতরাং সময়ের দিকে লক্ষ না রেখে ওই শব্দগুলি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লেখা উচিত ছিল—শামুকের, চুনের, কাতা চুনের, শামুক পোড়া কাতার হাট ছিল। সুতানুটি 'বাজার' কেউ কখনও শোনেনি, সকলেই শুনে এসেছে সুতানুটির 'হাট'।

২. 'হয়তো' সুতানুটি হাট অঞ্চলের 'আদি নাম ছিল চিৎপুর'। 'হয়তো' কেন? ওই অঞ্চলের আদি নাম কোনওদিনই চিৎপুর ছিল না। চিৎপুর বাগবাজারের খালের পরপারে উত্তর দিকে আগেও ছিল, আজও আছে। যখন খাল ছিল না তখনও চিত্তেশ্বরীর মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলকে চিত্তেশ্বরীপুর বা চিৎপুর বলা হত। বর্তমান 'চিৎপুর রোড'-এর পার্শ্ববর্তী স্থান চিৎপুর নয়। চিৎপুর রোডের পুরো নাম Road to Chitpur, অর্থাৎ চিৎপুরে যাবার রাস্তা। এ রাস্তারও নাম আগে চিৎপুর রোড ছিল না, ছিল Pilgrim Path বা Road to Collegot (তীর্থযাত্রীদের রাস্তা বা কালীঘাটে যাবার রাস্তা)। সুতানুটি হাট চিৎপুরের অন্তর্গত তো ছিলই না, সন্নিকটেও ছিল না। চিৎপুর থেকে অনেক দূরে গঙ্গার ধারে ছিল। সুতানুটির হাট বসত হাটখোলায়। ওই হাটের জন্যই হাটের স্থানের নাম হয়েছে 'হাটখোলা'।

৩. 'সুতানুটি নামেরই অনুরূপ কলিকাতা নাম' হয়েছে—বলেছেন সুনীতিবাবু এবং আরও দুই জায়গায়—৬ ও পাঁচ/৮.-এ ওই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

একটু আগেই দেখালাম 'বাজার', 'আড়ত', 'কারখানা'—এসব শব্দ ব্যবহার করা ভুল হয়েছে। ব্যবহার করা উচিত ছিল 'হাট' শব্দ। কিন্তু সুনীতিবাবু একবারও কলিচুন সম্পর্কে 'হাট' শব্দটি ব্যবহার করেননি। না করবার কারণ আছে। কেউ কখনও যেমন 'সুতানুটি বাজার'-এর কথা শোনেনি, তেমন 'কলিচুন বা কাতাচুনের হাট'-এর কথাও শোনেনি। কলিচুনের হাট ছিল না, তাই শোনেনি। থাকলে শুনত। সুতানুটি হাটের মতো যদি কলিচুনের হাট একটা থাকত তাহলে সুতানুটির অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ওই হাটের নাম থেকে 'কলিকাতা' নাম হতে পারত। সুতরাং যত বারই, যত রকম ভাষাতেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যপারটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়ে থাক না কেন, সে চেষ্টা সফল হয়নি। অতএব 'সুতানুটি' নামের অনুরূপ 'কলিকাতা' নাম হয়েছে এ কথা আদৌ বলা চলে না।

৪. লেখক এখানে বলেছেন 'কলিকাতা' একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। আবার ১২-তে বলেছেন 'কলি শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী')...ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।' পরস্পরবিরোধী উক্তি এবং 'কলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখক জানেন না একথা অবিশ্বাস্য শোনায়।

আসলে শব্দটি 'কলি' নয়—'কলী'। এটি হিন্দুস্থানি শব্দ নয়, আরবি শব্দ—আরবি থেকে হিন্দুস্থানিতে এসেছে। পুরো শব্দটি Al-Qualiy। Al=the, Qualiy=ash বা calcined ash। ইংরেজিতে শব্দটির রূপ Alkali। Potash, Soda ও Lime (চুন)—এই তিনটি Alkali। তুলনীয় ইংরেজি শব্দ Alchemy, Algebra, Alcohol।

'কলী' বা 'কলি' শব্দ *Hobson-Jobson*-এ নেই।

৫. 'কাতা' শব্দ নিয়ে সুনীতিবাবু বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। নানা জায়গায় নানা মানে করেছেন,—যথা, ১. শামুকের আড়ত [দ্র ৬], ২. চুনের কারখানা [দ্র ৬], ৩. শামুক পোড়া [দ্র ৫], ৪. (শুধু) চুন [দ্র ১১], ৫. পোড়ানো শামুক [দ্র ১১], ৬. নারিকেল দড়ি [দ্র ১৩], ৭. আনত [দ্র ১৪]।

সর্বশেষ, অর্থটি এখন তিনি ত্যাগ করেছেন। সেটি ছেড়ে দিলেও একই 'কাতা' শব্দ ছয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোনও একটা সুস্পষ্ট মানে পাওয়া যায় না। 'কলি' শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করলে একটা কিম্ভূতকিমাকার বা জবরজঙ্গ মানে দাঁড়ায়। সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' শব্দের তিন জায়গায় তিন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা তিনটি উত্তরোত্তর বেশি ঘোরালো-প্যাঁচালো, লম্বা ও জটিল হয়ে উঠেছে। সেই তিনটি ব্যাখ্যা পরপর নীচে তুলে দিচ্ছি :

(১) 'কলি বা করিচুলের জন্য কাতা বা শামুক পোড়া'। [দ্র ৫]

(২) 'কলির বা চূনের ও কলিচূনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চূনের কারখানা'। [দ্র ৬],

(৩) 'জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচূনের ও অন্য চূনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচূন এবং কাতা-চূনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত।' [দ্র পাঁচ/৮.]

লক্ষণীয় যে ২-এর অর্থ ১-এর অর্থের চেয়ে জটিল, আবার ৩-এর অর্থটি ২-এর অর্থের চেয়ে আরও জটিল ও ঘোলাটে, ভাষা সেখানে এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে জট ছাড়িয়ে এক্‌টা সুস্পষ্ট মানে করাই দায়।

২-সংখ্যক ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে—'কলির বা চুনের ও কলিচুনের'। 'বা' এবং 'ও' শব্দের মানে কি? 'বা'-এর পর শুধু 'চূন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেন? 'কলি' মানে কি শুধু 'চুন'? তাহলে পাথুরে চুনও কি কলি? 'ও কলিচুনের'ই বা কি অর্থ? কোনও অর্থই তো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

৩-সংখ্যক ব্যাখ্যায় বাবহৃত 'ও অন্যচুন' কি? পাথুরে চুন?

যখন 'কাতা' শব্দেরই অর্থ পরিষ্কার করা দরকার তখন ব্যাখ্যার মধ্যে 'কাতাচুন' ও 'কাতার আড়ত' শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে অর্থ পরিবর্তন না করে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে 'কাতা' শব্দটিকে ব্যবহার করা উটিত ছিল।

৭. 'পাথরিয়া চূন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চূন প্রস্তুত হয়।'—লিখেছেন সুনীতিবাবু ১৯৩৮ সালে। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালেও দক্ষিণবঙ্গে শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি হত। 'রসপুর-কলিকাতা' ছাড়া আর কোথায় কোথায় হত? এখন কি হয় না? যদি না হয় কলি ফেরানো হয় কোন্ চুনে? যদি দক্ষিণবঙ্গে পাথুরে চুন হত তাহলেও কি শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করবার দরকার হত? যেখানে পাথুরে চুন, হয় সেখানেও কি কলি ফেরাবার জন্য শামুকপোড়া চুন দরকার হয়?

৮. 'কলিচুন' মানেই কি শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন? পাথুরে চুন কি 'কলিচুন' নয়? সে চুন দিয়ে কি কলি ফেরানো যায় না?

শামুক ও ঝিনুক পোড়ানো চুন দেওয়ালে কলি ফেরানো ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগে না? যদি লাগে কী কী কাজে লাগে?

৯. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা শামুক পোড়ানো চুন না খেতে পারেন, আর সকলে খেতেন? না, খেতেন না?

১০. 'পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে...পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ' ছিল। কিন্তু সুলভ হওয়ার পরে কি হল? আর সদাচারবিরুদ্ধ রইল না, এমনকী নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের পক্ষেও?

শামুক পোড়ান চুন জৈব পদার্থের বিকার বলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা এই চুন দিয়ে পান খেতেন না তা নয়। তাঁরা মোটেই পান খেতেন না, পাথুরে চুন দিয়েও না। অল্পবয়স্ক বালক ও ছাত্ররাও পান খেত না। এদের ও বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। পান খাওয়া বিলাস বলে গণ্য হত। বিলাস ব্রহ্মচর্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হওয়ায় বর্জনীয় ছিল।

৭ থেকে ৯ উপবিভাগে পাথুরে চুন ও শামুক চুনের উৎপাদন ও ব্যবহার, পাথুরে চুনের দক্ষিণবঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতা, শামুক চুনের কলি ফেরাবার কাজে প্রশস্ততা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সেইজন্য 'চুন' সম্বন্ধে এখানে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা দরকার। তাহলে বোঝা যাবে সুনীতিবাবু যে মতামত ব্যক্ত করেছেন

তা কতখানি সত্য ও গ্রহণযোগ্য। বলা বাহুল্য এই আলোচনা আমি সাধ্যমতো সংক্ষিপ্ত করব।

চুন

চুনের আকর দু'রকম—১. শামুক, ঝিনুক, জোংড়া (বড় শামুক) ও প্রবাল (coral) এবং ২. চুনের পাথর। প্রথমগুলি পুড়িয়ে বাখারি চুন ও দ্বিতীয় জিনিসটি পুড়িয়ে পাথুরে চুন পাওয়া যায়।

বাখারি চুন (Shell-lime)

বাখারি মানে শক্ত খোলা। সংস্কৃত বল্কল, বাকল বা গাছের ছাল, তা থেকে মানে—কঠিন আচ্ছাদন বা বর্ম। বাংলাদেশে প্রবাল পাওয়া যায় না। এখানে শামুক, ঝিনুক, জোংড়ার শক্ত খোলা পুড়িয়ে এই চুন তৈরি হত। শামুক ও ঝিনুক জলচর প্রাণী। মাদ্রাজে ডাঙার শামুকও পাওয়া যায়। তারা জঙ্গলে থাকে। ঝিনুক তিনরকম—একরকম ঝিনুক লোকে খায়, একরকম থেকে মুক্তো হয়, আর একরকম থেকে চুন হয়। শামুক ও চুনের ঝিনুক মিষ্টি জলের বিল, ঝিল, পুকুরেও হয়। আবার নোনা জলেও হয়। মিষ্টি জলের শামুক ধানক্ষেতেও পাওয়া যায়। মিষ্টি জলের শামুক-ঝিনুকের চেয়ে নোনা জলের শামুক-ঝিনুক আকারে অনেক বড় হয়। কলকাতার পাশে ধাপা বা লবণহ্রদে ও সুন্দরবনে বড় বড় শামুক ও ঝিনুক প্রচুর হয়। শুনেছি একসময়ে এই দুই জায়গার শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন কলকাতায় আমদানি হত। পূর্ব দিক থেকে আসত বলে এই চুনের প্রবেশদ্বার ছিল বেলেঘাটা। তাই বেলেঘাটা বহুকাল থেকেই চুনের আড়তের জন্য বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য যে ধাপা বা সুন্দরবন অঞ্চলে একসময়ে বাখারি চুন তৈরি হলেও সেখানে একটা গ্রামও নেই যার নাম 'কলিকাতা'।

আবার ধাপা বা সুন্দরবনের চেয়ে ঢের বড় শামুক ও ঝিনুক হয় সমুদ্রের নোনা জলে। তাই মাদ্রাজের করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাখারি চুন বহুদিন যাবৎ কলকাতার বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করেছিল। মাদ্রাজে উৎকৃষ্ট পাথুরে চুন তৈরি হলেও, কলকাতার সাহেবেরা '*Chunam*' বলতে মাদ্রাজের বাখারি চুনকেই বুঝত।

বাখারি চুন বিশুদ্ধ চুন। একে ইংরেজিতে rich বা fat lime বলে। এই চুনের ব্যবহার তিনরকম—ক. পানের সঙ্গে খাবার জন্য, খ. ইমারতে পঙ্খের কাজ (stucco)-এর জন্য, গ. দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য। বাখারি চুনের দাম পাথুরে চুনের দামের চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশি। সেই জন্য এই চুন দেওয়ালে কলি ফেরাবার কাজে বিশুদ্ধ পাথুরে চুনের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না।

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজদের ভাগ্য ফিরে গেল। তারা চৌরঙ্গি অঞ্চলে ও এসপ্ল্যানেড রো-তে নতুন নতুন বাড়ি তুলতে লাগল। একজন ইংরেজ লেখক সেই অবস্থা বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

> Palace rose upon palace with classic portico, column and balustrade, each simulating the glories of ancient Rome. Everywhere there was elegance and refinement. The insides of the house similarly took on a new beauty with the introduction of 'chunam', a type of plaster made from powdered oyster shells brought from the Coromondol coast, which, when applied to the walls and staircases, gave a fine glossy finish nearly as beautiful as marble.

Eastern Interlude :

A Social History of the European Community in Calcutta by R. Pearson.

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে 'চুনাম' অর্থে মাদ্রাজের উপকূল থেকে আনা ঝিনুক-চুনকেই বোঝাত ও তা দিয়ে বাড়ির দেওয়াল প্রভৃতিতে পঙ্খের কাজ করা হত। মাদ্রাজের বাখারি চুন যে পঙ্খের কাজের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ছিল এবং একমাত্র বাখারি চুন ছাড়া অন্য কোনও চুন দিয়ে এই কাজ হত না সেকথা আর একটি প্রামাণিক পুস্তক থেকে পাচ্ছি। তাতে লেখা আছে :

> Madras Chunam is a very fine stucco. It is laid on in three coats, the first a mixture of shell-lime and sand, tempered with jaghery water, about half an inch thick;

the second made of sifted shell-lime and fine sifted white sand without jaghery, as it would colour the plaster. The third coating which receives the polish is prepared with great care; the finest and whitest shells being selected for the lime, and mixed with from ¼ to ⅙ th of the volume of the finest white sand.–*Thomason Civil Engineering College* Manual (new series) No 1 a–Limes, Mortars and Cements, compiled by Capt. C. C. Moncrieff R. E., Fourth Edition, Edited by Major A. M. Lang R. E, Roorkee.

Hobson-Jobson-এ আছে :

1750-60–The flooring is generally composed of a kind of loam or stucco, called chunam, being a lime made of burnt shella.–Grose।

1809–The row of chunam pillars which supported each side...were of shining white.–Lord Valentia।

এই পঙ্খের কাজই হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তীকালে বাখারি চুনের প্রধান ব্যবহার। কিন্তু প্রাচীনকালে এর প্রধান ব্যবহার ছিল পানের চুন হিসাবে। *Hobson-Jobson*-এ এর প্রমাণ আছে :

1510–And they also eat with the said leaves (betel) a certain lime made from oyster shells which they call cionama.–Vaptheme।

1673–The natives chew it (betel) with china (lime of calcined oyster shells).–Freyer।

1689–Chinam is lime made of cockel-shells or lime stone. and Pawn is the leaf of a tree.–Ovington।

দ্রষ্টব্য : *Hobson-Jobson*-এ চুন সম্বন্ধে যতগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে তাদের মধ্যে একটিতেও দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুনের ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

পাথুরে চুন

আগেই বলা হয়েছে চুনের পাথর পুড়িয়ে পাথুরে চুন হয়। চুনের পাথরের ইংরেজি রাসায়নিক নাম Carbonate of Calcium ($CaCO_3$)আর পাথুরে চুনের নাম Oxide of Calcium (CaO)। কোনও কোনও চুনের পাথরে চুনের সঙ্গে Sulphuric Acid মেশানো থাকে। এরকম পাথরকে Sulphate of Lime বা Gypsum বলে। Gypsum পুড়িয়ে যে চুন হয় তাকে Plaster of Paris বলে। Plaster of Paris বড় বড় অট্টালিকার স্তম্ভ ও ভেতর দেওয়ালের প্লাস্টার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এরকম পাথর সচরাচর পাওয়া যায় না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুনের পাথরে চুনের সঙ্গে Carbonic Acid মেশানো থাকে। যে পাথরে এক হাজার ভাগের মধ্যে ৪৩৬ ভাগ Carbonic Acid ও ৫৬৪ ভাগ চুন থাকে তাকে বিশুদ্ধ পাথর ও সেই পাথর থেকে যে চুন হয় তাকে বিশুদ্ধ চুন বলে। সাদা চা খড়ি ও রাজস্থানের মাকরানা মার্বল পাথর বিশুদ্ধ চুনের পাথর।

আবার কোনও কোনও পাথুরে চুনের সঙ্গে Alumina, Silica, Magnesia, Manganese, Oxide of Iron ইত্যাদি মেশানো থাকে। এইরকম পাথর অবিশুদ্ধ পাথর। কঙ্কর বা খোয়া যা পুড়িয়ে ঘুটিং চুন হয় তা অবিশুদ্ধ পাথর। তার চুনও অবিশুদ্ধ চুন। অবিশুদ্ধ চুনে জল ঢাললে তা ক্রমশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য এই চুনকে Hydraulic চুনও বলা হয়। এই চুন ইমারতের গাঁথনিতে ব্যবহার করা হয়। বিশুদ্ধ চুনে জল ঢাললে তা শক্ত হয় না, গলে যায়। এই চুনকেই rich বা fat চুন বলে। এই চুন পানে খাবার জন্য ও দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাখারি চুন ও বিশুদ্ধ পাথুরে চুন—দুইই rich বা fat চুন। সুতরাং বিশুদ্ধ পাথুরে চুন কলি ফেরাবার কাজে অনায়াসেই বাখারি চুনের বিকল্পে বা পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এই চুনের দামও বাখারি চুনের দামের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ কম। সুতরাং খাঁটি পাথুরে চুন পেলে লোক অত দাম দিয়ে বাখারি চুন ব্যবহার করতে যাবে কেন?

পাথুরে চুন নানাপ্রকার। তার মধ্যে সিলেট চুন, কাটনি চুন, মাইহার চুন, বিসরা চুন ও সাতনা চুন প্রধান। এদের মধ্যে আবার ছাতক বা সিলেট চুন সর্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চুন। অসামের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এই চুনের পাথর অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সিলেট চুনের বিশুদ্ধতা ও প্রাচুর্য সম্বন্ধে Robert Lindssy সাহেব (যিনি ১৭৭৮ সালে সিলেট জেলার কালেক্টার ছিলেন) লিখেছেন :

> The mountain was composed of the purest alabaster lime and appeared in quantity equal to the supply of the whole world...The only great staple and steady article of commerce (in the Sylhet District–R. M.) is chunam or lime. In no part of Bengal or even Hindustan, is the rock found so perfectly pure or so free of alloy, as in this province. Therefore Calcutta is chiefly supplied from hence.

বাখারি চুন বাংলাদেশে এতই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কলিচুন হিসাবে ক্বচিৎ এ চুন ব্যবহৃত হত। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ও প্রচুর সস্তা সিলেট চুন বরাবর ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। Archdeacon Firminger সাহেব লিখেছেন:

> ...the lime referred to was Sylhet lime, and came from Khasi and Jaintia Hills which contain inexhaustible beds of lime-stone. Sir William Hunter states that 'from time immemorial a large part of the supply of Bengal has been derived from this source'.–Imperial Gazetteer of India, Vol. I, p. 348।

বাকি রইল একটি প্রশ্ন। সত্যসত্যই কলি ফেরাবার কাজে বাখারি চুনের পরিবর্তে বিশুদ্ধ পাথুরে চুন ব্যবহার করা চলে কি না ও বাংলাদেশে ব্যববার করা হত কি না। পূর্বোক্ত রুরকির *Thomason Civil Engineering College Manual*-এর মতো প্রমাণিক গ্রন্থে লেখা আছে :

> White-wash. The interior walls of Indian houses, as also in some cases the exterior, are generally white-washesd in lieu of being painted or papered. 'White-wash' is merely a thin solution of slaked lime, with some ingredicnt, as gum, glue or rice-water, to render it adhesive to the walls...For 1000 superficial feet of ordinary white-wash are required 1½ seers of stone-lime and .05 chitacks of gum.

এই পুস্তক প্রকাশিত হয় প্রায় একশো বছর আগে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এতে white-wash-এর জন্য বাখারি চুনের উল্লেখমাত্র নেই। শুধু এই বইয়ের নয়, আমি সরকারি-বেসরকারি পুস্তক, পুস্তিকা, বিবরণ, রিপোর্ট, কাগজ-পত্র যথাসাধ্য খুঁজেও কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুনের ব্যবহারের কথার, অথবা কলকাতায় যে এই চুন কস্মিনকালে তৈরি হত তার, উল্লেখ পাইনি।

পাঁচ

তাব পর সুনীতিবাবু লিখেছেন :

১. "কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে।

২. এখনকার বহুবাজার স্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা 'বৈঠকখানা স্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম বা নগরের একটি প্রধান রাস্তা—পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩. বহুবাজার স্ট্রীটের উত্তরে 'চুনাগলি' পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

৪. এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা 'চিত্তরঞ্জন আভেনিউ' গিয়াছে, বহুবাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ চিৎপুর ও ছাতাওয়ালা গলির পূর্বে এবং আধুনিক কলেজ স্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটি স্থানে 'চূনারীতলা' (Chunarytollah) নামে একটি পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন নক্‌শা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়।

৫. এই 'চূনারীতলা'-তে 'চূনারী' বা চূনের কাজ করিত, এমন লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন 'শাঁখারীটোলা'-তে এক ঘরও শাঁখারী নাই, তেমনি 'চূনারীতলা' হইতে চূনারীদের অস্তিত্ব অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল এবং 'চূনাগলি'র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

৬. চূনারীতলার আরও একটু পূর্বে, এখনকার কলেজ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মধ্যে লেডি ডফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছে 'চুনাপাথুরে লেন'। এই অঞ্চলও চূনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৭. সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটী ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ডস্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখানকার বেন্টিক স্ট্রীটের) পূর্বে কলিকাতা গ্রামের পূর্ব সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়া—'চূনাগলি, চূনারীতলা ও চূনারীপুখুর' অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া—চূনের কাজ হইত।

৮. সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য (কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া চূন, শামুকপোড়া কলিচূনের ও অন্য চূনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচূন এবং কাতা-চূনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।"

মন্তব্য :

১. প্রথমত, এত সময় থাকতে সুনীতিবাবু 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ' বেছে নিতে গেলেন কেন? ১৬০০ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ তো কলকাতার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এ যুগের তো বিশেষ কোনও লিখিত বিবরণ বা কাগজ-পত্র নেই। সুতরাং কাগজপত্রের সাহায্যে তো প্রমাণ করবার উপায় নেই যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা গ্রামে চুন তৈরি হত।

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আগে সুনীতিবাবু আমাদের বলেছেন যে দক্ষিণ বঙ্গে ইং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বাখারি চুন তৈরি হত (চার/২. দ্র)। কলিকাতা ও দক্ষিণ বঙ্গে। তা সত্ত্বেও, এখন জানলাম যে অন্তত কলকাতা গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ওই চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইশো বছরের কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন? কোনও গুরুতর কারণ না থাকলে এ রকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারত না। কিন্তু সেই গুরুতর কারণটি বা কারণগুলি যে কি সুনীতিবাবু ঘুণাক্ষরেও আমাদের জানাননি।

তৃতীয়ত, 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ' পর্যন্ত বলতে তিনি ঠিক কোন সাল পর্যন্ত ধরেছেন—তারও কোনও ইঙ্গিত দেননি। সুতরাং যে যার খুশিমতো একটা সময় ধরে নিতে পারে। আমি তাঁর কথার আক্ষরিক মানে করে ১৭৫০-৫১ সাল ধরলাম।

২. "অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা (বহুবাজার স্ট্রীট) 'বৈঠকখানা স্ট্রিট' নামেও পরিচিত ছিল"—এই উক্তিটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। একটা শতক দীর্ঘ সময়। সুতরাং ওই শতকের কোন ভাগে—অদিতে, মধ্যে, না শেষভাগে—বৌবাজার স্ট্রিটের বৈঠকখানা স্ট্রিট নাম ছিল? যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এসে সুনীতিবাবু কলকাতায় বাখারি চুন তৈরির ইতিহাসে দাঁড়ি টেনেছেন সেই ১৭৫০-৫১ সালেও এই মেরুদণ্ডস্বরূপ রাস্তাটির 'বহুবাজার স্ট্রিট' বা 'বৈঠকখানা স্ট্রিট' এ দুটো নামের কোনওটাই হয়নি।

ওই বছরের মাত্র ৮/৯ বছর আগে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সর্বপ্রথম নকশা তৈরি হয়। তাতে শুধু ইংরেজ, পর্তুগিজ, ও আরমানি অধ্যুষিত কলকাতাটুকু দেখানো হয়েছে। উত্তরে বর্তমানের আরমানি স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে বর্তমানের হেষ্টিংস স্ট্রিট পর্যন্ত, পূর্বে বর্তমানের চিৎপুর রোড থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ধার পর্যন্ত, কলকাতার মাত্র এইটুকু অংশ চতুর্দিকে একটা কাঠের বেড়া বা বেষ্টনী (Pallisades)-র মধ্যে দেখানো হয়েছে। একটি রাস্তারও নাম তাতে নেই। কিন্তু এই নকশাটি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল তারিখে A. Upjohn সাহেব আর একটি বৃহত্তর নকশার অংশরূপে এই নকশাটি প্রকাশ করেন। ওই তারিখে Upjohn সাহেব নিজের আঁকা বৃহত্তর কলকাতার আরও একটি নকশা প্রকাশ করেন। তার কথা আমি পরে বলব। Upjohn প্রকাশিত প্রথম যে নকশাটির কথা বললাম তার পুরোনাম —Plan of the territory of Calcutta as marked out in the year 1742, exhibiting likewise the Military operations at Calcutta when attacked and taken by Seraj ud Dowlah on the 18th of June 1756. Printed and Pulbished according to the Act of Parliament by A.Upjohn. 2nd April 1794।

অর্থাৎ এই নকশাটিতে দুটি নকশা আছে—১৭৪২ সালের আদি কলকাতার ও ১৭৫৬ সালের বৃহত্তর কলকাতার — উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণে Governapore (গোবিন্দপুর) পর্যন্ত মারাঠা খাতের অন্তবর্তী কলকাতা। এই ১৭৫৬ সালের নকশায় মাত্র একটি রাস্তারই নাম দেওয়া আছে — Avenue leading to the Eastward। এই রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান চিৎপুর রোড থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে মারাঠা খাত পর্যন্ত চলে গেছে —অর্থাৎ বর্তমান 'বৌবাজার স্ট্রিট'। সুতরাং এই নকশা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৭৫০-৫১ সালে কেন, ১৭৫৬ সালেও বর্তমান বৌবাজার স্ট্রিটের নাম বৈঠকখানা স্ট্রিট ছিল না, বৌবাজার স্ট্রিটও ছিল না —ছিল Avenue leading to the Eastward ।

১৭৪২ ও ১৭৫৬ সালের নকশা দুটির মধ্যে ১৭৫৩ সালে Lieutenant Wells নামে একজন সৈনিক কলকাতার আর একটি নকশা আঁকেন। সেই নকশার নাম হচ্ছে —Plan of Fort William and Fort of the City of Calcutta. Surveyed by W. Wells, Lieutenant of the Artillery company in Bengal, 1753। নামেই নকশার পরিচয় —পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম ও ড্যালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকু মাত্র এতে দেখানো হয়েছে। এই নকশাতেও কোনও রাস্তার নাম নেই। মনে রাখতে হবে যে ১৭৫৩ ও ১৭৫৬ সাল আমাদের নির্ধারিত ১৭৫০-৫১ সালের সীমার বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

Lieutenant Wells-এর নকশার ৩১/৩২ বছর পরে Lieutenant-Colonel Mark Wood (ইনি Surveyor-General of India ছিলেন এবং এঁরই নামে কলকাতার Surveyor-General-এর অফিসের সামনের রাস্তার নাম Wood Street হয়েছে)। কলকাতার পুলিশ কমিশনারদের জন্য ১৭৮৪-৮৫ সালে একটি বড় প্রমাণের কলকাতার নকশা তৈরি করেন। তাতে দেশি ও সাহেবি দুই পাড়াই দেখানো হয়েছিল। মূল নকশাটি পুলিশ কমিশনারদের অপিসেই ছিল। সাধারণে এই নকশার কথা জানত না। তাই ওই নকশা তৈরি হবার ৭/৮ বছর পরে ১৭৯২ সালে William Baillie নামে এক ভদ্রলোক ওটিকে একটু ছোট করে কমিশনারদের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন। এই নকশার নাম —Plan of Calcutta reduced by permission of the Commissionars of Police from the original one executed by Lieutenant-Colonel Mark Wood in the year 1784 and 1785. Published in October 1792 by William Baillie.

Mark Wood -এর নকশাতেই সর্বপ্রথম কলকাতার রাস্তার নাম পাওয়া যায় এবং এই নকশাতেই প্রথম 'বহুবাজার স্ট্রিট বা বৈঠকখানা স্ট্রিট'—এই নাম পাই। এই নকশায় চিৎপুর রোডের পূর্বে ও বৌবাজার স্ট্রিটের উত্তরে মাত্র দুটি রাস্তা ও দুটি পাড়ার নাম দেওয়া আছে। রাস্তা দুটি হল Old Hurrenbury (হরিণবাড়ি) Lane ও Chhatawallah (ছাতাওয়ালা) Lane ও পাড়া দুটি হল Colootollah ও Chunarytollah। এই নকশায় 'চুনাগলি' ও 'চুনাপুখুর লেন' —কোনওটারই নাম কিংবা অস্তিত্ব নেই।

সুনীতিবাবুর ধারণা এগুলি অনেক পুরনো গলি —কয়েকশো বছরের পুরনো। আমরা নকশায় দেখছি যে ১৭৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত চুনাগলি ও চুনাপুকুর গলির জন্মই হয়নি।

৩. বাকি রইল Chunarytollah। নকশায় Colootollah ও Shakerytollah আছে। Colootollah-র উচ্চারণ সুনীতিবাবু 'কলুতলা' করেন, না 'কলুটোলা' করেন? Shakerytollah-কে তিনি এই প্রবন্ধে শাঁখারিটোলা, Cossitollah কে কসাইটোলা লিখেছেন। তবে Chunarytollah-কে 'চুনারীটোলা' না লিখে 'চুনারীতলা' লিখেছেন কেন? বোধহয় তাঁর মনে তখন Dhurrumtollah-র নজির ছিল। কিন্তু এরও উচ্চারণ হওয়া উচিত 'ধর্মটোলা'। আমরা ভুল করে উচ্চারণ করি 'ধর্মতলা'। ঠিক সেইরকম ভুল কবি কালীতলা, মদমোহনতলা, ষষ্ঠীতলা, শীতলাতলা ইত্যাদি সম্বন্ধে। এগুলো কোনও ঠাকুরের মন্দির মাত্র বোঝায় না, মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে পাড়া গড়ে উঠেছে সেই পাড়াগুলিকে বোঝায়। 'টোলা মানে 'পাড়া', 'টুলি' মানে 'ছোট পাড়া' (যথা, কুমারটুলি)। এ শব্দ দুটি বাংলা 'টোল' শব্দের স্বগোত্র। যেখানে বহুলোক (বিশেষত একই পেশার) একত্রে বাস করে তার নাম 'টোলা'। যেখানে বহু ছাত্র একসঙ্গে বাস করে এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করে – সেই জায়গাকে বলি 'টোল'। কলকাতায় অনেকপাড়া আছে যাদের নাম কোনও বিশিষ্ট গাছ বা গাছের শ্রেণীর নামের সঙ্গে 'তলা' শব্দ যোগ ক'রে করা হয়েছে; যেমন নেবুতলা, বটতলা, ঝাউতলা, বেলতলা,আমড়াতলা ইত্যাদি। যদিও গাছে 'তলা' থাকে, তবুও নেবুতলা ইত্যাদি নাম গাছের তলাকে বোঝায় না। ওই গাছ বা গাছের সারিকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে যে লোকের পাড়া বা টোলা গড়ে উঠেছে সেই টোলাকে বোঝায়। গাছের যদিও বা 'তলা' থাকে, দেবদেবী যথা ধর্ম বা মনসা ইত্যাদির 'তলা' কল্পনা করা.হাস্যকর। আবার হিন্দি 'তালাও' (পুকুর) শব্দ অনুরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। 'তালাও'কে আমরা 'তলা' করে নিয়েছি প্রায় সব ক্ষেত্রে। যেমন 'বির্জী তলাও' অর্থাৎ বির্জী পুকুরকে আমরা বলি 'বির্জীতলা'। যদিও পুকুর মাত্রেরই একটা 'তল' বা 'তলা' থাকে, তাহলেও বির্জীতলার 'তলা' সে 'তলা' নয়। হিন্দি 'গোলতালাও' (গোলদীঘি)-কে আমরা 'গোলতলা' ক'রে নিয়েছি। ইংরেজিতেও সমান ভুল করা হয়েছে—বির্জীতালাওকে লেখা হয়েছে Birjeetollah, অর্থাৎ 'বির্জীটোলা' বা পাড়া। তবুও এ নামের একটা অর্থ হয়, কিন্তু বির্জীতলার কোনও অর্থ হয় না, যদি না 'তলা' মানে 'টোলা' বা 'পাড়া' ধরা হয়।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। Baillie-র নকশা প্রকাশিত হবার দেড়বছর পরে Upjohn-এর নকশা প্রকাশিত হয়। এটা অষ্টাদশ শতকের কলকাতার শেষ নকশা। শুধু কলকাতা নয় মারাঠা খাতের বাইরের ও গঙ্গার ওপারে হাওড়াও অনেকখানি অঞ্চল এতে দেখান হয়েছে। এই নকশার নাম —Calcutta and its environs from an accurate survey taken in the year 1792 and 1793 by A. Upjohn, 2nd April 1794 । Mark Wood- এর নকশার চেয়ে এই নকশায় রাস্তার সংখ্যা স্বভাবতই বেশি। তবু এতেও 'চুনাগলি' ও 'চুনাপুকুর গলি'র নাম নেই। (সুনীতিবাবু ভুল ক'রে চুনাপুকুরের জায়গায় 'চুনারী পুকুর' লিখেছেন) তখন এই দুটো গলি তৈরি হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। কেন না সংখ্যা বাড়ার দরুন রাস্তা ও গলিগুলো ঘিজি ঘিজি দেখানো হয়েছে। যদি হয়ে থাকে ১৭৮৫ ও ১৭৯৩ —এই দুই সালের মধ্যে কোনও সময়ে হয়ে থাকবে। তবে না হওয়াই সম্ভব। হলে নিশ্চয়ই নাম থাকত। সুনীতিবাবুও বলেননি যে এই দুটি গলির নাম নকশায় আছে, যেমন বলেছেন চুনারিটোলার বেলায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত 'চুনাগলি' ও 'চুনাপুকুর গলি'র জন্মই হয়নি। অত বড় যে 'সার্কুলার রোড' তার জন্ম মাত্র ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে। অন্যে পরে কা কথা? কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট ও স্ট্র্যান্ড রোড তৈরি হয় ১৮১৭ সালের পর Lottery Committee-র দ্বারা। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে কলকাতার অধিকাংশ রাস্তা তৈরি হয়। সর্বপ্রথম Surveyor of Roads কলকাতায় নিযুক্ত হন ১৭৬৬ সালে। অন্ধকূপে যে সব ইংরেজকে হত্যা করা হয়েছিল বলে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন তাঁদের দেহগুলো পুরনো দুর্গের ফটকের সামনে যে খানায় ফেলে

দেওয়া হয়েছিল সে খানা বুজানো হয় ওই ১৭৬৬ সালেই। কিন্তু এসব ব্যাপার ১৭৫০-৫১ সালের অর্থাৎ আমাদের আলোচনা-সীমার অনেক পরের কথা, কোনওটিই আগের নয়।

সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা —এই তিন গ্রামের জমি, বাড়িঘর ও রাস্তার কোম্পানির তরফ থেকে প্রথম জরিপ হয় ১৭০৬ সালে, দ্বিতীয় ১৭২৬ সালে, তৃতীয় ১৭৪২ সালে ও চতুর্থ ১৭৫৬ সালে। ওই চার সালে যথাক্রমে কলকাতার ছোট-বড় রাস্তার মোট সংখ্যা কত ছিল তার সরকারি হিসাব নীচে উদ্ধৃত করছি ১৯০১ সালের আদম-শুমারির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্সাস অফিসার এ. কে. রায়-এর A Short History of Calcutta, 1902 থেকে :

সাল		বড় রাস্তা (স্ট্রিট)	গলি (লেন)	ছোট গলি (বাই লেন)
১৭০৬	২	২	০	
১৭২৬	৪	৮	০	
১৭৪২	১৬	৪৬	৭৪	
১৭৫৬	২৭	৫২	৭৪	

১৭৫৬ সাল আমাদের আলোচ্য সীমার বাইরে পড়ে।

এখন দেখা যাক 'চুনারিটোলা' নাম কবে হল। ১৬৯০ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত এই ৬০/৬১ বছরের মধ্যে কলকাতার দেশি লোকেরা যার যেখানে খুশি বাস করেছে। বসবাসের কোনও বিধিনিষেধ বা আইনের কড়াকড়ি ছিল না। কারণ তখন বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে কলাকতায় বসবাস করানই ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৭৫১ সাল পর্যন্ত কলকাতার লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেল। তখন কড়াকড়ির দরকার হল। ১৭৫২ সালে অর্থাৎ সুনীতিবাবুর নির্দিষ্ট আলোচনা-সীমার পরের বছর Holwell সাহেব কলকাতার জমিদার হয়েই হুকুম জারি করলেন যে এরপর থেকে বেশি লোকেরা যার যেখানে খুশি বাস করতে পারবে না। এক পেশাবলম্বী লোকেদের নির্দিষ্ট স্থানে একসঙ্গে বাস করতে হবে। এই আইন জারি হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১৭৫২ সাল থেকে কলকাতায় 'পাড়া', 'টোলা' ও 'টুলি' ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। সুতরাং ১৭৫২ ও ১৭৮৪ এই দুই সালের মধ্যে কোনও সময়ে 'চুনারিটোলা'র জন্ম হয়ে থাকবে। সুনীতিবাবুর ধারণা যে 'চুনারিটোলা' অনেক পুরনো পাড়া, সে ধারণা ভুল।

অতএব ১৪৯৫ সাল কিংবা তার পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ১৭৫০-৫১ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর ধরে কলকাতায় বাখারি চুন তৈরি হয়ে এসেছে —সুনীতিবাবুর এ বিশ্বাস একেবারেই ভিত্তিহীন। যে তিনটি জায়গার নাম থেকে তাঁর এ বিশ্বাস জন্মেছে তার কোনওটিরই উৎপত্তি ১৭৫০-৫১ সালের মধ্যে হয়নি, পরে হয়েছে। ওই তিনটি নামের জোরে যদি বলতেই হয় যে এককালে কলকাতায় 'চুন' তৈরি হত (দ্র. লেখক শুধু বাখারি চুনের কথাই বলেননি 'অন্য চুন'-এর কথাও বলেছেন) তা হলে এও বলা উচিত যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের অনেক পরে ইংরেজ আমলে ওই ব্যবসার সূত্রপাত হয়। কিন্তু যেমন বাখারি চুন ছাড়া অন্য চুন হত স্বীকার করলে তাঁর 'থিয়োরি' টেকে না, একথা স্বীকার করলেও তেমনি টেকে না।

কিন্তু সত্যিই কি 'চুনাগলি', 'চুনাপুকুর' ও 'চুনারিটোলা' এই তিনটি নাম থেকে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে যে চুন, বিশেষ করে বাখারি চুন তৈরি হত তার প্রমাণ মেলে? আমার মতে মেলে না। নাম তিনটির আদিতে 'চুন' শব্দ থাকায় লেখক নামগুলি 'চুন' এই অর্থে নিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বোঝবার ভুল হয়েছে। এক-একটি নাম নিয়ে বিচার করা যাক।

৩.ক. 'চুনাগলি'তে কি হত? চুন তৈরি হত, না বিক্রি হত? তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। মাত্র চুনের 'কাজ' হত বলেছেন। এটা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

খ. শুধু 'চুন' শব্দ মাত্র বাখারি চুনকেই বোঝাবে কেন? পাথুরে চুনকেও বোঝাবে না কেন? তিনি

নিজেও তো 'অন্য চুন' কথা ব্যবহার করেছেন। তাহলে 'চুনাগলি' নাম তো সে গলিরও হতে পারে যে গলিতে চুনের পাথর পুড়িয়ে চুন তৈরি হত বা যেখানে পাথুরে চুন বিক্রি হত? আর যদি 'চুনা'র ইংরেজি হয় Chunam তাহলে চুনাগলিতে পাথুরে চুন কিংবা মাদ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত বাখারি চুনের আড়ত ছিল--এ মানে হতেও বাধা নেই।

গ. এর কোনওটাই কিন্তু আমার মতে আসল মানে নয়। সুনীতিবাবু আসল মানের কাছ ঘেঁসে গেছেন কিন্তু ধরতে পারেননি। তিনি নিজেই লিখেছেন : 'চুনাগলি পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।' তিনি যাদের 'মেটে' বা 'কালো' ফিরিঙ্গি বলেছেন তাদেরই বলা হয় 'চুনো ফিরিঙ্গি'। 'চুনো' মানে ছোট, খুদে, যেমন 'চুনোপুঁটি'। চুনো ফিরিঙ্গি মানে অত্যন্ত ওঁচা ফিরিঙ্গি। তাহলে চুনোগলি মানে হয় যে গলিতে চুনো ফিরিঙ্গিরা বাস করত। এই ফিরিঙ্গিরা যে ওই গলিতে বা করতো তা সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য।

৫. 'চূনারীটোলা'—সুনীতিবাবু 'চূনারী'র মানে করেছেন যারা 'চুনের কাজ করিত'। আবার সেই অস্পষ্টতা! স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল যারা চুন তৈরি করত। কিন্তু যারা চুন তৈরি করে বাংলায় তাদের বলে 'চুনিয়া', যেমন যারা নুন তৈরি করে তাদের বল 'নুনিয়া'। যারা চুন তৈরি করে তাদের আমরা ভুল করে 'চুনারি' বা 'চুনুরি' বলি। শব্দটি আসলে বাংলা 'চুনারি' নয়, হিন্দি 'চুন্‌রি'। 'চুন্‌রি' শব্দ হিন্দিতে বহুল প্রচলিত শব্দ, বহু হিন্দিগানে এই শব্দটি পাওয়া যায়। 'চুনরি'র দুই অর্থ : ক. রং-এ ছোপানো কাপড়, শাড়ি, ওড়না ইত্যাদি, খ. যারা এই রকম কাপড় রং-এ ছোপায়। এই কাজ যারা করে তাদের হিন্দিতে 'রংরেজ'ও বলে (ইং dyer)। 'চুনারিটোলা'র মানে, যে-পাড়ায় রংরেজরা বাস করে।

৬. 'চূনাপুকুর গলি'— সুনীতিবাবু লিখেছেন : 'এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।' কী থেকে তাঁর অনুমান হল? চুনাপুকুর নাম থেকে। কিন্তু চুনা মানে যদি চুন হয় তাহলে 'চূনাপুকুর' মানে কী হয়? হয়, যে পুকুরে 'চুন' জন্মায়। কোনো পুকুরেই চুন জন্মায় না বা তৈরি হয় না। যে পুকুরে যে প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মে সেই প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম থেকেই পুকুরের নাম হয়। যেমন গোলপুকুর (গোলপাতা থেকে), কাশপুকুর, নলপুকুর, কৈপুকুর, শামুক পুকুর, ঝিনুক পুকুর ইত্যাদি। এমনকী পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ জন্মালে সেই গাছের নাম থেকেও পুকুরের নাম হয় — যেমন, তালপুকুর। কিন্তু সুনীতিবাবু এইরকম সোজা মানে না করে ঘুরিয়ে চুনাপুকুরের মানে করেছেন, যে পুকুরে চুনের উপাদানস্বরূপ শামুক বা ঝিনুক জন্মায়। অর্থাৎ 'চুন' শব্দের বাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্যার্থ ধরে মানে করেছেন। এ রকমভাবে পুকুরের নাম হয় না। অথচ চুনাপুকুরের একটা সরল ও সুবিদিত মানে আছে। সে মানে তিনি নেন নি। কথাটা 'চূনা'পুকুর নয়, 'চুনো'পুকুর। 'চুনো' খাঁটি বাংলা শব্দ। চুনোগলির সম্পর্কে এর মানে আমরা আগেই পেয়েছি —'খুদে', 'ছোট'। 'চুনোপুকুর' মানে যে পুকুরে 'চুনোমাছ' বা 'চুনোপুঁটি' জন্মে।

৭. সুতরাং 'চুনাগলি', 'চূনা পুকুর' ও 'চুনারিটোলা' কোনও নামেরই চুনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবু যদি কেউ 'চুনা' শব্দের চুন অর্থই ঠিক মনে করেন তাঁকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রথম, সমস্ত কলকাতায় তো একটি-মাত্র চুনাপুকুরের সন্ধান পাচ্ছি; সুতানুটীতে পাচ্ছি না. গোবিন্দপুরে পাচ্ছি না, মারাঠা খাতের মধ্যে অন্য কোনও গ্রামেও পাচ্ছি না, তাহলে কি বুঝতে হবে এই মাত্র একটা পুকুরের শামুক ঝিনুক পুড়িয়েই সমস্ত কলকাতা, সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের চুনের প্রয়োজন মিটত? সেটা কি সম্ভব?

দ্বিতীয়, চুনুরিটোলায় অনেক চুনুরি থাকত। মাত্র একটা পুকুরের শামুক, ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করতে এতগুলো লোক লাগত? আশ্চর্য!

তৃতীয়, কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও আশেপাশের গ্রামগুলোতে সত্যসত্যই কি এমন আর অন্য

পুকুর ছিল না যেখানে শামুক বা ঝিনুক পাওয়া যেত? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের একটিরও নাম 'চুনাপুকুর' হল না কেন?

চতুর্থ, সারা বাংলাদেশ কি এমন একটি গ্রামও আছে যার মধ্যে দু'চারটে চুনাপুকুর নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে কি সেইসব গ্রামে চুন তৈরি হত না? যদি হত, সেইসব গ্রামের নাম 'কলিকাতা' হল না কেন?

পঞ্চম, ১৪৯৫ সাল থেকে (তার আগের কথা ছেড়েই দিলাম) ১৬৯০ সাল পর্যন্ত এই দুশো বছরের মধ্যে কলকাতায় যে পরিমাণ কলিচুন তৈরি হয়েছে তা কী কাজে লেগেছে? ক-টা পাকাবাড়ির দেওয়াল চুনকাম করা হয়েছে? ওই সময়ে কলকাতা ও আশপাশের গ্রামে ক'টা পাকাবাড়ি ছিল? সকলেই শুনে এসেছি ১৬৯০ সালে যখন জোব চার্নক সুতানুটিতে আসেন, তখন সেখানে একটা পাকাবাড়িও ছিল না। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মাটির চালাঘরে থাকতে হয়। গোবিন্দপুরেও কোনও পাকাবাড়ি ছিল না। মাত্র কলকাতায় ড্যালহাউসি অঞ্চলে সাবর্ণ জমিদারদের একটিমাত্র পাকাবাড়ি ছিল। সেইটি ভাড়া নিয়ে চার্নক সরকারি কাগজপত্র সেই বাড়িতে রাখেন। C. R. Wilson এ গল্প মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। তবু আমি সত্য বলেই ধরে নিলাম।

ইংরেজ আসার পর থেকে প্রধানত কলকাতায়, অল্পস্বল্প সুতানুটী ও গোবিন্দপুরে পাকাবাড়ি তৈরি হতে থাকে। কোন সালে কত পাকা ও কত কাঁচাবাড়ি ওই তিন গ্রামে ছিল তার সরকারি সংখ্যা পূর্বোক্ত এ. কে. রায়-এর 'A Short History of Calcutta থেকে তুলে দিলাম :

সাল	পাকা বাড়ির সংখ্যা	কাঁচাবাড়ির সংখ্যা
১৭০৬	৮	৮,০০০
১৭২৬	৪০	১৩,৩০০
১৭৪২	১২১	১৪,৭৪৭
১৭৫৬	৪৯৮	১৪,৪৫০

১৭৫৬ সাল আমাদের আলোচনা-সীমার বাইরে।

সুতরাং কলকাতায় ইংরেজ আগমনের সময় যখন মাত্র একটি পাকাবাড়ি ছিল তখন তার পূর্বে দুশো বছর ধরে এখানে দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য কলিচুন তৈরি হয়েছে একথা বলা বাতুলতা। আসল কথা ইংরেজদের আসবার পর থেকে এখানে পাকাবাড়ি তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে, আর তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। এইসব বাড়ি তৈরি করার জন্য চুনের প্রয়োজন হয়েছে ও ক্রমশ চাহিদা বেড়েছে। চুন সিলেট, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আমদানি হয়েছে। কলকাতায় চুনের গোলা ও আড়ত বসেছে।

এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা। যে দুটি গলি ও একটি পাড়ার নাম সুনীতিবাবু নির্দশন হিসাবে উল্লেখ করেছেন —তাদের কোনওটিরই আদিতে'কলি' শব্দ নেই, আছে 'চুনা' শব্দ। অন্যদিকে "কলিকাতা" নামের আদিতে 'চুনা' বা 'চুন' শব্দ নেই। আছে 'কলি' শব্দ। শুধু চুন শব্দ ব্যবহার করলে একমাত্র পাথুরে চুনকেই বোঝায়। অন্য চুন বোঝাতে হলে জোংড়া, শামুক, ঝিনুক, বাখারি ইত্যাদি শব্দ 'চুন' বা 'চুনা' শব্দের আদিতে বসাতে হয়। সুতরাং কলিকাতা নামের আদিতে 'কলি' শব্দ না থেকে 'চুনা' শব্দ থাকা উচিত ছিল —নামটি হওয়া উচিত ছিল চুনাটোলা, চুনাপাড়া, চুনাহাট বা চুনাগ্রাম —এর যে কোনও একটা। এমনকি 'চুনাকাতা'ও চলতে পারত। কিন্তু তা না করে 'চুনা' শব্দের ব্যাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষার্থ ধরে অর্থ 'কলিচুন করে চুনাপুকুর, চুনাগলি ও চুনারিটোলা থেকে 'কলিকাতা' শব্দ নিষ্পন্ন করা কতখানি ভাষাতত্ত্বের নিয়মসম্মত সুধীজনেরাই তা বিচার করবেন। এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমার দ্বিতীয়টি জানা নেই।

ছয়

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : " 'কলিকাতা' নামটি মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে— বাঙ্গালাদেশের দুই কোণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, 'কলিকাতা' নামে দুইটি গ্রাম আছে। ....ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ

থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত ১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি ঐ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটির সম্বন্ধে খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় তিন মাইল উত্তরে 'কলিকাতা-ভোগদিয়া' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহার অধিবাসী-সংখ্যা মাত্র ৩/৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী; ঐ গ্রামে চূনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্‌স্পেকটর শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার বায়ুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে 'রসপুর-কলিকাতা' গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে 'ছোট-কলিকাতা' বলিতেও শোনা যায়)। সব্-ইনস্পেকটর মহাশয়ের বিবরণ তুলিয়া দিতেছি :
The village is situated on the northern bank of the river Damodar. Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufactured in this village from snail-shells (শামুক চুন) on an extensive scale so as to meet the local demands.
ঐ স্থানে তিনজন চুনারী মহাজন আছেন, তাঁহাদের নামও দিয়াছেন।"

মন্তব্য :

ক. আর দুটো 'কলিকাতা' গ্রামের নাম শুনে সেখানে কলিচুন হয় কিনা সুনীতিবাবু দারোগাদের লিখে যাচাই করতে গেলেন, অথচ যে কলকাতা তাঁর এই আলোচনার প্রধান বিষয় সেই কলকাতায় সত্যসত্যই চুন তৈরি হত কি না তা কাগজপত্র থেকে স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলেন না, শুধু ভাষাগত ব্যুৎপত্তির উপর ও তিনটি নামের উপর নির্ভর করেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলেন। ব্যুৎপত্তি যাই বলুক, 'কলিকাতা' নামের গ্রাম থাকলেই যে সেখানে কলিচুন তৈরি হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। কলিচুন না তৈরি হলেও গ্রামের নাম 'কলিকাতা' হতে পারে, প্রমাণ 'কলিকাতা-ভোগদিয়া'। যদি একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাও কোনও তত্ত্ব (theory) বা প্রকল্প (hypothesis) অপ্রমাণিত হয় তাহলে সেই তত্ত্ব বা প্রকল্প দাঁড়াতেই পারে না। সুনীতিবাবু মোট তিনটি 'কলিকাতা' নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে এ পর্যন্ত দুটির বেলায় তাঁর 'তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাকি আছে একটি —'রসপুর-কলিকাতা'। তার ব্যাপারটা আমরা পরে দেখব। আপাতত যদি ধরেও নিই যে এই শেষের 'কলিকাতা' সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সত্যমিথ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২। সুতরাং তাঁর তত্ত্ব গ্রাহ্য হতে পারে না।

যদি মাত্র 'কলিকাতা' নামের একটা যেমন-তেমন ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে 'কোল কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা'তো চমৎকার ব্যুৎপত্তি। কিন্তু সুনীতিবাবু কি এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করবেন? করবেন না, বলবেন কোলরা বা কোলিরা যে কলকাতায় বাস করত তার প্রমাণ কি? আমিও সুনীতিবাবুকে তাঁর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সেই কথাই বলি। কলিচুন যে কলকাতায় হত তার প্রমাণ কি? 'রসপুর-কলিকাতা' কোনও প্রমাণ নয়। সেখানে যা হত তাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে 'কলিকাতা-ভোগদিয়া'তেও হত।

খ. 'রসপুর-কলিকাতা'—এখন এই গ্রামের ব্যাপারটা দেখা যাক।

'কলিকাতা-ভোগদিয়া'কে লোহজঙ্গ থানার দারোগা একটি গ্রাম বলেছেন। আমতা থানার দারোগাও বলেছেন 'রসপুর-কলিকাতা' একটি গ্রাম। গোড়ায় গলদ! এ দুটি কখনওই এক গ্রাম হতে পারে না, তারা আলাদা অথচ পাশাপাশি গ্রাম। বাংলাদেশে এরকম যুগ্ম গ্রামের নাম বহু আছে। কোনও জেলায়, মহকুমায় বা থানায় একই নামের একাধিক গ্রাম থাকলে, একটি গ্রামকে অন্য গ্রাম থেকে পৃথক করবার জন্য যুগ্ম গ্রামের নাম ব্যবহার করা হয়। ভোগদিয়া গ্রাম ওই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একের বেশি আছে। সেই জন্য আলোচ্য ভোগদিয়াকে শনাক্ত করবার উদ্দেশ্যে তার পূর্বে তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম 'কলিকাতা' জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কলিকাতা গ্রাম দিয়ে ভোগদিয়া গ্রামকে সনাক্ত করা হয়েছে। সেইরকম রসপুর ও কলিকাতা দুটি আলাদা গ্রাম। এখানে কলিকাতা গ্রামকে শনাক্ত করবার জন্য তার নামের আগে 'রসপুর' নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যে গ্রামকে দিয়ে নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামকে শনাক্ত করা হয়, যে গ্রামের নাম প্রথমে

বসে, সেটি সাধারণত অন্যটির চেয়ে বেশি বিখ্যাত। প্রথমটিতে ভোগদিয়ার চেয়ে কলিকাতা বেশি বিখ্যাত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রসপুর কলিকাতার চেয়েও বেশি বিখ্যাত। এই আলোচনা থেকে জানা গেল যে রসপুর ও কলিকাতা এক গ্রাম নয়, দুটি পাশাপাশি গ্রাম এবং কলিকাতার চেয়ে রসপুর অনেক বেশি বিখ্যাত। প্রকৃত পক্ষেও তাই-ই। আমতা থানার দারোগা সাহেব যখন রসপুর-কলিকাতাকে 'this village' বলেছেন তখন কলিকাতা না রসপুর কোন গ্রামে শামুক চুন হত এবং প্রায় ১০০০ চাষি কোন গ্রামে বাস করত বোঝা যাচ্ছে না। তিনি কি দুটি গ্রাম একসঙ্গে ধরেছেন? তাহলে তো বুঝতে হবে রসপুর ও কলিকাতা দুই গ্রাম মিলিয়েই ১০০০ বাসিন্দা এবং দুই গ্রামেই শামুক চুন হত। শামুক চুনকে যদি কলিচুন বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে জিজ্ঞাস্য রসপুরের নামও কলিকাতা হল না কেন?

আর একটি কারণে যুগ্ম গ্রামের নাম ব্যবহার করা হয়। যদি গ্রাম দুটি স্বতন্ত্র মৌজা না হয়ে দুটি গ্রাম মিলিয়ে এক মৌজা হয়। কলিকাতা-ভোগদিয়ার কথা জানি না। রসপুর-কলিকাতা বিভিন্ন মৌজা, এক মৌজা নয়।

শুধু দারোগাবাবুই রসপুর ও কলিকাতাকে একটি গ্রাম বলে ধরেছেন তা নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ধরে থাকে। রসপুর চাষিপ্রধান গ্রাম নয়, কলিকাতা চাষি-প্রধান। রসপুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বহু ভদ্র গৃহস্থের বাস। গ্রামে স্কুল আছে, বড় বড় পাকাবাড়ি আছে, দেবালয় আছে। এই গ্রামের খ্যাতি এত বেশি যে কলিকাতা গ্রামের নাম এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই জানে না। তারা কলিকাতাকে রসপুর গ্রামের অহিন্দু এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুপাড়া হিসাবেই জানে। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আগে তাই ছিল, পরে স্বতন্ত্র মৌজা হয়।

গ. ১৯৩৭ সালে থানার দারোগাবাবু সুনীতিবাবুকে লেখেন, রসপুর-কলিকাতা গ্রামে স্থানীয় প্রয়োজন (local needs) মেটাবার জন্য শামুক চুন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় ('manufactured ...on an extensive scale')। অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হত। 'স্থানীয় প্রয়োজন'-এর মানে স্পষ্ট নয়। শুধু রসপুর-কলিকাতার প্রয়োজন, না সমগ্র আমতা থানার প্রয়োজন? কোন কাজে এই চুন ব্যবহার হত দারোগাবাবু তাও লেখেন নি। শুদ্ধ গোটাকতক গ্রামের পাকাবাড়ির দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য লাগত? সে তো অল্প চুনেই হয়। তার জন্য extensive scale-এ manufacture করবার প্রয়োজন করে না। শুধু বাইরে চালান গেলেই extensive scale-এ চুন তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু বাইরে চালানের কথা তিনি বলেননি। তাঁর উক্তি স্ববিরোধী ও উদ্ভট মনে হয়।

এ বিষয়ে L. S. S. O' Malley I. C. S ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্তী বি. সি. এস প্রণীত ও ১৯০৯ সালে প্রকাশিত Howrah District Gazetteer-এর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

Amta—It has long been an important centre of trade. Formerly it contained many salt and coal depots, being an entrepot for salt brought from Midnapore and coal brought from the Ranigunj coalfield. TheDamodar then formed a broad highway of commerce bearing hundreds of cargo boats. ...The railways have killed the river-borne trade in salt and coal; but on the other hand the trade in paddy and straw, carried partly by boats and partly by rail, has flourished; and there are also large exports to Howrah of jute, vegetables and fish. Brown country paper used to be manufactured here but that industry had been crushed by the pressure of competition.

There are several important villages in the jurisdiction of Amta Thana, such as Raspur (রসপুর নয় রাসপুর), Joypur, Jhinkra and Narit. Other places which may be mentioned are Pandua.....the home of the well-known poet Chandra Rai; Amrajuri with a charitable disensary, Rautra, the home of Babu Jiban Krishna Rai, said to be the richest kaibarta in the Sub-Division; and Bhatora on the Rupnarain river with a police beat-house.

উপরের উদ্ধৃতিতে আমতা শহর ও আমতা থানার প্রধান প্রধান গ্রামের ও বাণিজ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে। রসপুর বা রাসপুর গ্রামের উল্লেখ আছে কিন্তু 'কলিকাতা' গ্রামের ও সেই গ্রামে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন শামুক চুনের কোনও উল্লেখ নেই। এই গেজেটিয়ার দারোগাবাবুর চিঠি লেখার ২৮ বছর আগে প্রকাশিত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, হয় গেজেটিয়ার প্রকাশের সময় পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ও তার চুনের উৎপাদন এত নগণ্য ছিল যে গেজেটিয়ার-প্রণেতাদের কর্ণগোচর হয়নি, নয় গেজেটিয়ার প্রকাশিত হবার পরে কলিকাতা গ্রামে শামুক চুন তৈরি আরম্ভ হয়। শেষেরটি হয়ে থাকলে শামুক চুন তৈরির সঙ্গে ওই গ্রামের নামের কোনও সম্বন্ধ নেই। কারণ গ্রামটি তো আর ১৯০৯-এর পরে হয়নি!

ঘ. দুই দারোগাবাবুর চিঠিতেই একটি অত্যন্ত জরুরি কথা, যা গ্রামের নাম নির্ধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই কথাটিই নেই। লোহজঙ্গের দারোগা জানিয়েছেন : 'ঐ (কলিকাতা-ভোগদিয়া) গ্রামে চুনের কাজ হয় না।' অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে হত না, কিন্তু জানা দরকার ছিল আগে কখনও হত কি না। তবেই কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তির সাহায্য হত। ঠিক সেইরকম আমতার দারোগা জানিয়েছেন শামুক চুন হয়। তার চেয়ে যা জানা দরকারি ছিল সে হচ্ছে, কতদিন থেকে হয়ে আসছে। যদি জানা যেত শহর কলকাতার আগে না হোক, একই সময় থেকে হয়ে আসছে, তা হলে বোঝা যেত আমাদের কলকাতার পরে নয়, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, স্বতন্ত্রভাবে ওই গ্রামের নাম কলিকাতা হয়েছে কলিচুন থেকে। কিন্তু তা যে হয়নি তা প্রমাণিত হচ্ছে ওই গ্রামের 'ছোট-কলিকাতা' নাম থেকে। অর্থাৎ 'বড়' কলিকাতা নাম থেকেই 'ছোট' কলিকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ঙ. সুনীতিবাবু নিজে কখনও 'রসপুর-কলিকাতা' গ্রামে গেছেন কি না জানি না। আমি ৩/৪ বার গেছি। প্রথম যাই বহুবছর আগে, তাঁর প্রবন্ধ পড়বার পরই। তারপরেও কয়েকবার গেছি। আমি অনুসন্ধান ক'রে কলিকাতা গ্রাম সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তা এই।

আজ থেকে অনেক বছর আগে—অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে জনা-কয়েক ইংরেজ কলকাতা শহর থেকে এসে এই গ্রামে দামোদর তীরে কুঠি তৈরি করে। তখন এই গ্রাম রসপুর গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। মুসলমান ও তপশিলি হিন্দুরা এই পাড়ায় বাস করত। কলকাতার খ্রিস্টান সাহেবরা তো হিন্দু-প্রধান রসপুর গ্রামে বাস করতে পারত না। সেইজন্য তারা এই পাড়ায় এসেছিল। কিসের কুঠি তারা বানিয়েছিল তা স্থানীয় অধিবাসীরা নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। তবে তাঁরা প্রাচীনদের কাছ থেকে শুনেছেন যে নীলকুঠি। যে কুঠিই বানাক, সেই কুঠি নির্মাণের সূত্রেই তারা রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকঘর চুনিয়াকেও এই পাড়ায় আনে। যখন তাদের ব্যবসা জেঁকে ওঠে ও এই পাড়া সমৃদ্ধিশালী হয় তখন তারা এর নাম রাখে 'ছোট-কলিকাতা'। তখনই এই সাহেবপাড়া রাসপুর গ্রাম থেকে আলাদা হয়ে এক স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়। সুতরাং চুন তৈরির সঙ্গে ছোট-কলিকাতা নামের কোনও সম্বন্ধ নেই। আমি প্রথমবার যখন সে গ্রামে যাই তখন সেই বিরাট কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। শেষবার দিয়ে দেখি যে ভগ্ন-স্তূপ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। চুনিয়াদের বংশধর আর কেউ নেই। চুন তৈরি বন্ধ।

চ. ইংরেজরা ঘর ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যেখানেই বসবাস করেছে সেই জায়গার নাম রেখেছে তারা যে গ্রাম, শহর, জেলা বা দেশ থেকে এসেছে সেই-সেই গ্রাম শহর ইত্যাদির নামে। শুধু সেইসব নামের আগে একটা New (নতুন) শব্দ বসিয়ে দিয়েছে, যেমন NewBritain, New Caledonia, New Cumberland, New England, New Glasgow, New Hampshire, New Ireland, New York ইত্যাদি। বর্তমানে ইংরেজদের অনুকরণেই আমরা 'নব-ব্যারাকপুর', 'নব-বৃন্দাবন' তৈরি করেছি। এদেশে কলকাতা থেকে ইংরেজরা গিয়ে বাংলার পল্লীতে বাস করলে সে পল্লীর 'নতুন কলিকাতা' নাম রাখত না, রাখত 'ছোট কলিকাতা'। সুনীতিবাবু যদি নিজে গিয়ে ভোগদিয়া-কলিকাতার তথ্যানুসন্ধান করতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রসপুর-কলিকাতার মতোনই একটা ইতিহাস সে কলিকাতাতেও পেতেন। রসপুর-কলিকাতা তো

অত্যন্ত অখ্যাত কলিকাতা। স্থানীয় লোকেরাও জানে না, হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারও জানে না। কিন্তু যে 'ছোট কলিকাতা' প্রায় শতবর্ষ ধরে বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে ছিল, তা ছিল নদীয়া জেলার 'সুখসাগর' গ্রাম —ওয়ারেন হেস্টিংস ও পোর্তুগিজ ধনকুবের জোসেফ ব্যারেটোর লীলানিকেতন। ১৮৫৯-৬০ সাল নাগাদ সে 'ছোট কলিকাতা' গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। শুধু তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জেগে আছে 'সাহেব ডাঙা' এই নামের আড়ালে।

মোট কথা, নাম একটি মনগড়া (arbitary) চিহ্ন, যা বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অন্য বস্তু ব্যক্তি বা স্থান থেকে পৃথক করে শনাক্ত করবার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না। হিন্দুদের নাম আগে প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামে রাখা হত। যার নাম নারায়ণ বা শঙ্কর বা পার্থসারথি সে সত্যিই নারায়ণও নয় শঙ্করও নয় পার্থসারথিও নয়। আজকাল ছেলেমেয়েদের অন্য নাম দেওয়া হয়। সেখানেও নামের অর্থের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। কানাছেলের নাম পদ্মলোচন-এর মতো কালোমেয়ের নাম শুক্লা হয়, আবার ফর্সা মেয়ের নামও কৃষ্ণা হয়। যার নাম অসীম বা অনন্ত সে সত্যিকার অসীম বা অনন্ত নয়।

স্থানের নামের ক্ষেত্রে এ অসংগতি আরও বেশি প্রকট ও ব্যাপক। বস্তুত ব্যক্তির নামের মানে তবু বোঝা যায়। স্থানের নামের মানে বহু ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না। টালা, বড়িষা, বন্ডেল, গর্চা, ধাপা, ধাপধাড়া, শালিমার ইত্যাদি নামের কী মানে? যেখানে স্থানের নাম যুগ্ম শব্দের দ্বারা গঠিত সেখানে হয় প্রথম শব্দটি বোঝা যায়, দ্বিতীয়টি বোঝা যায় না, যেমন বাজারসহ; নয় দ্বিতীয়টি বোঝা যায়, প্রথমটি বোঝা যায় না, যেমন গোঁদলপাড়া। আবার যেখানে দুটো শব্দেরই মানে বোঝা যায় সেখানে গোটা নামটার অর্থ বাস্তবের সঙ্গে মেলে না, যেমন নারায়ণপুর বা বৈকুণ্ঠপুর (যদি ব্যক্তির নাম থেকে না হয়ে থাকে) সত্যিই বিষ্ণুর গোলোকধাম নয়। কলিকাতাও সেইরকম একটি নাম। 'কলি' ও 'কাতা'—এই দুই শব্দের টেনেবুনে একটা অর্থ দাঁড় করালেও এটা সত্য নয় যে গোটা নামটা 'কলিকাতা' নামক স্থানের বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করছে।

তাঁর প্রবন্ধের গোড়ায় সুনীতিবাবু লিখেছেন : 'দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে বৃটিশরাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও (অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত – রা. মি.) নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।' এই নির্ধারণ কার্যটি এ যাবৎ কেউ করতে পারেননি বলে সুনীতিবাবু অনেক ভেবেচিন্তে কলিচুন থেকে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে —এই তত্ত্ব 'আবিষ্কার' করেছেন। কিন্তু সুনীতিবাবু বোধ হয় জানেন না যে আজ থেকে ৭৭ বছর আগে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ *বিশ্বকোষ*-এ 'কলিকাতা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। প্রবন্ধ-লেখকের নামের উল্লেখ না থাকলেও বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি আর কেউ নন, মাইকেলের পরম বন্ধু পুরাতত্ত্ববিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সচিব গৌরদাস বসাক। তিনি এই প্রবন্ধে পূর্ব থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত প্রচলিত কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চারটি মতবাদের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে কলিচুন থেকে কলিকাতা। এই মতবাদ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'কলিচুন হইতে কলিকাতা নাম হওয়া নিতান্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।'

*** 'বিশ্বকোষ'-এ কলিকাতা নামের এই উৎপত্তির কথা আমাকে জানান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার সিংহ, ডি. ফিল। এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। –রা. মি.**

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
(কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৬)

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঐতিহ্য, শিল্প ও আধুনিকতা

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য দুটি : এক, পদসমূহের বিচার ও তাদের স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিরূপণ; দুই, পদত্রয়ের সম্বন্ধে বিচার। হয়তো লেখার সময় এই অভিপ্রেত আনন্তর্য সর্বদা রক্ষিত হয়নি, কোথাও কোথাও উদ্দেশ্যমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু আশা করি তার জন্য বক্তব্য বিচারের হানি হয়নি।

মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার বা বিশ্লেষণে দুটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধারণা হল, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা। বস্তুত, মানববিবর্তন মানবপ্রকাশেরই বিবর্তন; আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য, সার্থকতা ও স্বরূপ নির্ণয় ও অনুধাবন, ওই দুই ভাবধারা ব্যতীত নিতান্তই অসার। মানবসভ্যতার ইতিহাস এক ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস। কেবল মুঠো মুঠো বালি জমিয়ে সেতুবন্ধনের জন্য ইতর প্রাণী হলেই চলে, কিন্তু মানুষ তার প্রগতির পথে ক্রমাগত পরিচয় দিয়েছে তার চাতুর্যের, স্বপ্নের, সাহসের ও ধ্রুব অন্বেষণের। কালাবচ্ছিন্ন দেশদেশান্তরে প্রক্ষিপ্ত অস্থিখণ্ড ও নানা জীবাশ্মের সঞ্চয়ে নৃতত্ত্ববিদের কাছে মানুষের যে পরিচয়, প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ তদপেক্ষা পূর্ণতর, মহত্তর। মানবসত্যের কিয়দংশ অবশ্যই অভিব্যক্ত ভূপৃষ্ঠে প্রাণধারণের সংগ্রাম, কিন্তু অনেকাংশ নিহিত তার পুরাণে, কাব্যে, শিল্পে, গুহাচিত্রে। পরিবেশ যেমন তাকে নিয়মিত প্রভাবিত করেছে, সেও তেমনই ক্রমাগত তার সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করেছে নব নব পরিবেশ। মূলত মানুষই একাধারে সৃষ্টি ও স্রষ্টা। বিষয়চৈতন্যে মগ্ন থেকেও মানুষ অনন্তকাল ধরে সচেতন ও জিজ্ঞাসু। এই কারণেই বোধ হয় মানুষ অজ্ঞাত, অপরিচিত, এমনকি ভয়াবহ অযুত তথ্যাবলির মধ্যে থেকেও বিপর্যস্ত হয়নি, পরন্তু উদ্বৃত্তের অনুপ্রেরণায় নব নব মূল্য উদ্ভাবনের দ্বারা পরিপার্শ্বের অসংখ্য ঘটনারাজ্যে এনেছে সংগঠন, সার্থকতা ও সংহতি।

পরবর্তী মানুষ যে কেবল পূর্বপুরুষের কল্পনাশক্তির এই সৃজনশীল প্রয়োগ ও তার সাফল্য সংরক্ষণ করে ঐতিহ্য অর্জন করেছে তা নয়, বিচিত্র মূল্যাদর্শ সৃষ্টি করে ও যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছে। মানবসমাজের ঐতিহ্যের ইতিহাস তাই উন্মেষশালিনী প্রতিভা ও বিবর্তমান মূল্যাদর্শের ইতিহাস। এই মূল্যাদর্শ বজায় রাখা বা কর্মক্ষেত্রে মূল্যমান প্রয়োগ করার মাধ্যমেই পরিবর্তন প্রগতির মর্যাদা পায়। কিন্তু মূল্যবোধ স্বতঃই নির্বাচন প্রবৃত্ত করে। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সবটুকুই আমরা সংরক্ষণ করি না — কিছু গ্রহণ করি, কিছু বর্জন করি। ঐতিহ্যের অন্যতম একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য, কৃত নির্বাচনের সংগতি ও সার্থকতা প্রদান। ঐতিহ্যের মাধ্যমেই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে মানব-সম্ভাবনার পূর্ণ রূপায়ণ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ মানবসত্তার বিকাশ ও বিবর্তন অংশত অন্তর্নিহিত হলেও, অনেকাংশে পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব নির্ভর। 'আমি কী', এ প্রশ্ন হয়তো নিঃসন্দেহে 'ব্যক্তিগত', কিন্তু আমার 'ব্যক্তিস্বরূপ', অপরাপর ব্যক্তি সম্বন্ধের ফলস্বরূপ। জনৈক পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিক মনে করেন : 'মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনও কিছু জানতে হলে, তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে তার সমাজ, সংস্থা ও ঐতিহ্যের লীলা সম্পর্কে জানা আবশ্যক।' বস্তুত, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের সার্থকতা সমাজনিরপেক্ষ তো নয়ই, পরন্তু ঐতিহ্যনির্ধারিত। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা প্রকৃতপক্ষে একক, স্বয়ম্ভু ও ইতিহাস-বহির্ভূত কোনও ঘটনা নয়, নিতান্তই অপরাপর ব্যক্তি ও বিষয় সমৃদ্ধ। আমাদের কর্মের বা ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান যে সম্ভব হচ্ছে তার অন্যতম কারণ ব্যক্তিবহির্ভূত এক সাধারণ (common) ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি। অবশ্য এ থেকে যেন কেউ সিদ্ধান্ত না করেন যে একই যুক্তিবলে আমরা একটি বৃহত্তম সাধারণ ঐতিহ্য স্বীকার

করব, যাকে বলা যায় 'মানব ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য সদাই গোষ্ঠীবিশেষ অপেক্ষিত যথা, সংস্কৃতি — তা কখনওই সর্ববৈশিষ্ট্য অতিক্রান্ত হতে পারে না। ঐতিহ্যের ল. সা. গু.-করণ অনৈতিহাসিক ও সেই কারণে অর্থহীন। তেমনই এ প্রবন্ধে মানুষের সাধারণ ধর্মে সংশয়ক্ষেপ অভিপ্রেত নয়। যেটুকু বিবক্ষিত তা হল : ঐতিহ্য ভাষা, পরিবেশ, ধর্ম, পুরাণ ইত্যাদির সঞ্চিত সার, অতএব কোনও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীবিশেষের বৈশিষ্ট্য থেকে তা ন্যায়ত মুক্ত হতে পারে না এবং সেটি আকাঙ্ক্ষিতও নয়। মানবহিতকামী কিছু উদারচরিত সমাজসেবী মহামানবতীর্থের স্বপ্নে বিভোর হয়ে এক ও অদ্বিতীয় সমবায়ী ঐতিহ্যে আস্থা স্থাপন করতে চান অহেতুক। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমাজনায়করা 'প্রভেদমাত্রই বিরোধ' এই প্রমাদবশত এক নিরবলম্ব, বিমূর্ত সামান্য ধারণাকে ঐতিহ্যস্বরূপ ভেবে সাম্প্রতিক মানবসভ্যতার সংকট ও সমস্যা অবসানের কল্পনা করেন। অথচ ঐতিহ্যের সম্পদশালিতা তার বৈচিত্র্যে, কার্যকর প্রভাব তার বৈশিষ্ট্যে। বহুকে গুণহীন ঐক্যে পর্যবসিত করে দ্বন্দ্বের অবসান করার অর্থ ঐতিহ্যকে নিষ্ফল ও উৎকর্ষহীন করে তোলা। যদিও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী বা বুদ্ধদেবের মর্মবাণী সর্বমানবের, তথাপি তাঁদের বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য কেবলমাত্র তাঁদের স্ব স্ব সংস্কৃতির পটভূমিতেই গৃহীত হতে পারে। এর মূল কারণ অবশ্য এই যে, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি কোনওটিই তৎ তৎ ভাষা নিরপেক্ষ নয়। বর্তমান স্বদেশে ভয়াবহ সাংস্কৃতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই কটি কথা অবশ্য স্মরণীয়। নচেৎ, সংস্কৃতিনাশের সমূহ সম্ভাবনা। কতিপয় বিদ্যালোকপ্রাপ্ত তথাকথিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল ক্রমাগত এক সর্বনাশা ধারণা প্রচার করছেন যে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য এবং উভয়ের মূল ভিত্তি যে ভাষা তা চয়ন ক্রয়ের বিষয়। আন্তর্জাতিক মনোভাব বা অবাস্তব এক সর্বজনগ্রাহ্য মানব ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে তাঁরা প্রচণ্ড পাশ্চাত্যধাবনের লালসা মেটাতে চান। শিক্ষার ক্ষেত্রে এঁরা দেশি ভাষা ত্যাগ করে ইংরাজি ভাষা, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্যারিস-নিউইয়র্কের ঘরানা, সমগ্র দেশের উপর চাপাতে চান। এঁদের ধারণা ঐতিহ্যের বাজার থেকে খুঁটে খুঁটে ভালো ভালো পণ্য এনে ঘর সাজানোর দায়িত্ব তাঁদের উপরই ন্যস্ত। বস্তুত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা ভাষা কুলে জন্মের মতো দৈবায়ত্ত (given), গুটিকয়েক বাবুদের রুচি ও পৌরুষ চয়িত নয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ ঐতিহ্য বদল করতে উৎসুক হলেও হতে পারেন, সেটা সম্ভব কী অসম্ভব তা নিতান্তই ব্যক্তিগত শ্রম ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, কিন্তু সারা দেশের ঐতিহ্য পোশাকের মতো বদল করার প্রচেষ্টা অবৈজ্ঞানিক ও উন্মাদকল্পনা। জনৈক ভারতীয় শিল্পী কোথা থেকে শুরু করবেন এটা অনির্দিষ্ট হতে পারে (এমনকি এটাও গুরুতর বিতর্কের বিষয়), কিন্তু ভারতীয় শিল্প কোন খাতে প্রবাহিত হবে, কোন ধাপ থেকে, কোন ধারা স্বীকার করে, অগ্রসর হবে তা একান্তই সুনির্দিষ্ট (অর্থাৎ দেশজ ঐতিহ্যই একমাত্র ধারা-নির্দেশক), কয়েকজন বিশেষ প্রতিভার দাবিদারদের শলা-পরামর্শের উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা কমিটি, নানা সভাসমিতি ও আলোচনার উত্তেজনা ও উল্লাসের তাড়নায় এই সরল ও সুস্পষ্ট সত্য প্রায়শই বিস্মৃত হই। ফলে কী শিল্পে, কী শিক্ষায়, কী সমাজপরিকল্পনায় আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য সাম্প্রতিকতার ব্যাপক অনুকরণের জিগির তুলছি। এই আত্মঘাতী সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হতে হলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বৈজ্ঞানিক অর্থ ও ভাবপ্রসার জানা একান্ত প্রয়োজন। মূল কথা হল, প্রয়োগলভ্য ঐতিহ্য সর্বদাই বিশিষ্ট, কেননা বিশেষ সমাজ-নির্ভর।

ব্যাপক অর্থে, অতীতের তাবৎ উত্তরাধিকারই ঐতিহ্য বলে গণ্য হতে পারে। এ অর্থে, কতিপয় অভিনব আচার-ব্যবহার ব্যতীত সকল সামাজিক প্রথাই ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুত তা হয় না। আমাদের পুরাকাল থেকে যা কিছু হয়ে আসছে তাকেই ঐতিহ্য বলে মানতে গেলে এক বিপুল ভার বহন করতে হয়। ফলে আমরা অতীতের কিছু গ্রহণ করি এবং অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয়বোধে বর্জন করি। অর্থাৎ অতীতের সব কিছুই ঐতিহ্য বলে মানা সম্ভব ও স্বাভাবিক নয়। সামাজিক জীব আমরা ; ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হলেও পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদান, ব্যবহারিক সামঞ্জস্য ইত্যাদি ব্যতিরেকে অভিব্যক্তি বা আত্মপ্রকাশ অসম্ভব। এই পারস্পরিক, সামাজিক সমঝাওতার

জন্য চাই এক সর্বজনগ্রাহ্য (তৎ তৎ সমাজে) নিয়মতন্ত্র। ব্যক্তিবুদ্ধির নিয়ামক এ সকল সামাজিক বিধি না থাকলে স্বৈরাচারের দুর্বিপাক থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহ্যের কাজ এই জাতীয় সামাজিক সামঞ্জস্য সংরক্ষণ। এই কারণেই অতীত থেকে যা পাই সব কিছুকে না মেনে, সেটুকুই রক্ষা করি যা ব্যক্তি হিসাবে আমাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষায় সাহায্য করে। আর যে মুহূর্তে আমরা এই নির্বাচন ও বিচারে প্রবৃত্ত হই, সেই মুহূর্তে মূল্যমান প্রয়োগ ও তদ্দ্বারা মূল্যায়নে বাধ্য হয়। অর্থাৎ অতীতের কোনও কিছুই যখন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে করি, তখনই আমরা পক্ষপাত প্রদর্শন করি। ফলে অতীতের সব কিছুই নয়, কেবল যে উত্তরাধিকারের প্রতি এই মূল্য-পক্ষপাত প্রদর্শন করি, তাই ঐতিহ্যরূপে সমাজে স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ ঐতিহ্য ও শ্রেয়োবোধ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই কারণেই শিল্প ও ঐতিহ্যের যোগ নিবিড়। অতীতের যে প্রথাগুলির প্রতি আমরা (প্রচলিত জীবনযাপনে) সপ্রশংস স্বীকৃতি জানাই, কেবল সেগুলিকেই ঐতিহ্যের মর্যাদা দিই। অতএব ঐতিহ্য ও ইতিহাস ভিন্ন। বিদেশি কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মতে : 'ঐতিহ্য কেবল অতীতের ঐতিহাসিক চেতনাই নয়, অতীতকে বর্তমানে সঞ্জীবিত রাখা[২]।'

সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্স রাডিনের (Max Radin) বক্তব্যে এ ধারণা খুবই পরিস্ফুট। তিনি বলেন : ঐতিহ্য যেহেতু এই মূল্যবোধে আশ্রিত, অতএব মানুষের সৃজনশীল সত্তাংশেই ঐতিহ্য সর্বাধিক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। ফলে সমাজে একজন বৈজ্ঞানিকের তুলনায় একজন শিল্পী অধিকতর পরিমাণে ঐতিহ্যনির্ভর। এ প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান বক্তব্যও তাই শিল্প ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন ও তদুদ্দেশ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধহীনতা প্রমাণ।

২

শিল্পের ধর্ম প্রকাশ। প্রকাশের মর্ম সঞ্চার। এক্ষেত্রে শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে জটিল প্রশ্নের অবতারণা করা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল সমস্যা সেক্ষেত্রে বৃদ্ধিই পাবে। এ প্রবন্ধে লক্ষ্য যারপরনাই সীমিত। মূল অভিপ্রায় শিল্পে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক নিরূপণ ; এই সূত্রে শিল্পের স্বরূপ চিন্তায় কিছু মনোক্ষেপ অনিবার্য, কিন্তু তা নিতান্তই মূল উদ্দেশ্যের পরিপূরক হিসাবে। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি যে অপ্রকাশিত শিল্প (art) নিতান্তই ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিনির্ভর, সমাজ ও সমষ্টিগতভাবে তার বিচার একেবারেই সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা দুটিই সমাজসাপেক্ষ ধর্ম। অতএব রসিকবর্গের কাছে পরিবেশিত শিল্পই আমাদের আলোচ্য হতে বাধ্য। এই পরিবেশন প্রকাশ ব্যতিরেকে অকল্পনীয়। 'প্রকাশ' শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্যবিপুল, সেহেতু প্রকৃত অর্থ নির্ধারিত না হলে, দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দার্শনিক আলোচনায় 'স্বপ্রকাশ' শব্দটি অতি আদরণীয়। কিন্তু ইতরজনের ব্যবহৃত অর্থে প্রকাশ মাত্রই 'কিছুর মাধ্যমে অপর কিছু প্রকাশিত'। যেমন বস্তুর রূপ 'আলোক-মাধ্যমে প্রকাশিত'। শিল্পকে যখন প্রকাশ বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তখন এই অর্থেই করা হচ্ছে। এই সূত্রে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ শিল্প-আলোচনায় 'প্রকাশ' শব্দটির একটি বিশেষ দার্শনিক তাৎপর্য মেনেছেন[৩], তাই প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রসাহিত্যে 'প্রকাশ' শব্দটি গ্রহণ করার নানা অসুবিধা। বরং পাশ্চাত্য দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে তাঁর 'এসথেটিকস' বইয়ে 'art is expression' বলতে প্রকাশের সাধারণ অর্থই মেনেছেন। অর্থাৎ যে অর্থ-ভূমিকায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বৈধ ও তাৎপর্যময় : ১. কী প্রকাশিত, ২. কীভাবে প্রকাশিত, ও ৩. প্রকাশের উদ্দেশ্য, সিদ্ধি বা লক্ষ্য কী? প্রচলিত পদ প্রয়োগ করলে বলতে হয়, প্রথম প্রশ্নটি শিল্পের বিষয়বস্তু-সূচক, দ্বিতীয়টি মাধ্যম-সূচক (আঙ্গিক ও পদ্ধতি এর অন্তর্ভুক্ত) ও তৃতীয়টি শিল্পের সার্থকতা-সূচক। দুর্ভাগ্যবশত, শিল্প আলোচনায় 'প্রকাশ' শব্দটির ব্যবহার কখনও কোনও একটিকে, আবার কখনও সম্মিলিতভাবে ওই তিনটিকেই বোঝানো হয়। এই কারণে অপ্রকৃত ও অপ্রাসঙ্গিক বিরোধ এবং বৈষম্য বর্জন করতে হলে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক 'প্রকাশ' শব্দটির প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা

নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। সহজ করে বলা যায়—শিল্পের রূপ বা / এবং অবয়ব প্রকাশ, আবার অন্তরাত্মাও প্রকাশ। অতএব সমস্যা হল, প্রত্যক্ষ-লভ্য রূপটি প্রকাশ, না রূপটি প্রকাশের বহিরাবরণ মাত্র? নানা দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ এ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। এইজন্য বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু আমরা এই প্রবন্ধে শিল্পানুভব নিয়ে আদপেই লিপ্ত নই, আমাদের বিচার্য হল : শিল্পের অর্থ কী, এবং বিধি-নিষেধের সঙ্গে শিল্পী ও শিল্পের সম্পর্ক কী? ঐতিহ্য আলোচনায় পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে ঐতিহ্য কার্যত, পরস্পরের আদানপ্রদানের বিধি-মঞ্চ; অতএব যদি এই মত প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে বিধি (rules) ব্যতীত শিল্প অসম্ভব, তাহলে ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ-প্রকার ও সম্বন্ধ-নিগূঢ়তা যথাযথ নিরূপিত হবে।

প্রকাশ কথাটির অর্থ বিশদ বুঝতে হলে, বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে শব্দটির অভীপ্সা ও তাৎপর্য বিচার আবশ্যক। কাব্যশিল্পে প্রকাশ অর্থ কী? কবিতার শ্রুত বা দৃষ্ট শব্দ-চিহ্নসমূহ, না তদন্তর্নিহিত কোনও ভাবসত্য? কাব্যবিষয় কি লিখিত বা উদ্ধৃত শব্দ না শিল্পীমনের কল্পনায় উদ্ভাসিত কোনও তত্ত্ব বা সত্য বা ভাব? উপরে শেষোক্ত তিনটি পদকে এক অর্থে ব্যবহার করছি, কেননা তাদের অর্থভিন্নতা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে নিষ্প্রয়োজন। ভাববাদী বা অর্থবাদীরা বলবেন, কাব্যের অর্থ বা ভাবচেতনায় অন্তর্নিহিত এবং প্রকৃত প্রকাশ এটিই ; ভাবের বহিরানয়ন কেবলমাত্র টেকনিক বা ব্যবহারিক ক্রিয়া, সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি ও প্রকাশ অভিন্ন এবং উভয়ই শিল্পীর ব্যক্তিমানস। সংক্ষেপে, সৃজনশীল কল্পনা। অপর পক্ষে, অবয়ববাদীরা বলবেন, শিল্পে আবরণ ও আবৃতের (form & content) পার্থক্য অযৌক্তিক ও অযাচিত—ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষে যা লভ্য তাই সৃষ্টি বা প্রকাশ। এতৎপ্রকার বিভেদজন্য শিল্পতত্ত্ব বিচারে বিভিন্ন মতাদর্শ প্রচলিত। যে জড়বস্তু-মাধ্যমে শিল্পের প্রকাশ, সেই জড়-পিণ্ড যে শিল্পবস্তু নয় এ কথা বোধহয় সকলেই মানবেন। অর্থাৎ কাব্য-পুথি, পট-বস্ত্র বা ভাস্কর্যপ্রস্তর নিতান্তই প্রাকৃতিক সামগ্রী, তারা কদাপি শিল্পবস্তু নয়। কিন্তু পূর্বে যে আমি অবয়ববাদীদের কথা বলেছি, তাঁরা কি তবে এই অসম্ভব মত পোষণ করেন যে জড়পদার্থগুলিই শিল্প-বস্তু? অবশ্যই নয়। তাঁরা বলেন : 'উপস্থাপিত বিষয়জন্য যে অবয়বসমূহ, তৎসকাশে যে ইন্দ্রিয়জ অনুভব তাই এবং কেবল তাই শিল্পপ্রকাশ।' বস্তুত, এই দুই বিসম্বাদী দলের প্রকৃত পার্থক্যের স্বরূপ নির্ণয় জনৈক পাশ্চাত্য দার্শনিক অতি সুন্দরভাবে করেছেন। উক্ত দার্শনিকের মতে, 'ভাববাদীরা স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের উপর জোর দেন, অপর পক্ষে অবয়বাদীরা জোর দেন শিল্পসৃষ্টির সঞ্চারধর্মিতার উপর।[৫]' অর্থাৎ প্রথম পক্ষ একদেশদর্শী কেননা তাঁরা শিল্পসৃষ্টি বিচারে কেবল প্রকাশধারার বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ একই প্রকার দোষ করেন প্রকাশিতের প্রাধান্য স্বীকারে। অথচ, শিল্প এই দুই নিয়ে—এক সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ। এবার আমাদের মূল বক্তব্যে আসা যাক।

শিল্প প্রকাশ, প্রকাশমাধ্যম-নির্ভর। অতএব এই মাধ্যম জ্ঞানায়ত্ত না হলে, বা তার ব্যবহারবিধি রপ্ত না থাকলে শিল্পী প্রকাশকৃপণ ও ফলত অনুর্বর হয়ে পড়বেন। শিল্পমাত্রই অবয়ব-সমন্বিত প্রকাশ। অবয়ব মাত্রই মাধ্যম-নির্ভর। অর্থাৎ চিত্রকরের প্রকাশানুভব বর্ণে, আলোকে; কবির শব্দে, ধ্বনিতে; সংগীতকারের সুরে, স্বরে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যদি কেউ পরাদার্শনিক হয়ে বলেন, যে শিল্প এতাদৃশ মাধ্যম-নিরপেক্ষ, নিরবয়ব এক অরূপ ভাবপাথার, এবং পরবর্তী মাধ্যমচয়নের দ্বারা শিল্পে ওই আদি নিরবলম্ব ভাবই প্রকাশিত হয়, তাহলে বলতে বাধ্য হব যে, এ মত এতই অবাস্তব ও অযৌক্তিক যে এই মত স্বীকৃতি তো দূরস্থান, এ মতবাদ বোঝাই দুঃসাধ্য। এ মত মানলে বলতে হয়, শিল্পসৃষ্টি গুটিকয় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির অকৈতব সাধনার বিষয়— প্রকাশে তার বিকার ও ব্যর্থতা। বস্তুত, এই মত নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। প্রথমত, এ মত বিচারবিরোধী। অথচ শিল্পে বিচার থেকে নিরস্ত হলে, স্বভাবতই উৎকর্ষজ্ঞাপন আবেদন প্রকাশও বন্ধ করতে হয়। এবং তা করার অর্থ, শিল্পরস আস্বাদন একান্তই ব্যক্তিগত রুচি-নির্ভর করা ও তুলনামূলক আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত, এ মত

ঘটনাবিরোধী, কেননা শিল্প-ইতিহাসে দেখি, শিল্পীরা এর বিপরীত ব্যবহারই দেখিয়েছেন। তৃতীয়ত, এ জাতীয় 'মাধ্যম-নিরপেক্ষ' ভাব কল্পনাসাধ্য নয় এবং এই ভাবের স্বরূপনির্ধারণ সাধ্যাতীত। ফলে প্রকাশ ও প্রকাশ্যের যথার্থ সম্বন্ধ নিরূপণ অসম্ভব। অতএব এই অযাচিত কষ্টকল্পনার মধ্যে না গিয়ে আমরা শিল্পকে মূলত সাবয়ব, মাধ্যম-সাপেক্ষ প্রকাশ বলে মানাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। ন্যায়ত, এটাও মানতে হবে যে শিল্পী তাঁর চেতনায় শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন প্রকার বিষয় বা বস্তু বা ভাবের স্বধর্ম-নিরূপণ (identifying) করতে অসমর্থ হলে প্রকাশে অক্ষম হবেন। কোনও কিছুর স্বধর্ম-নিরূপণ কিন্তু কর্তার অহেতুক ইচ্ছা বা অভীপ্সার উপর নির্ভর করে না। যেমন, একটি ফুলকে 'ফুল' বলে জানতে হলে ফুলের স্বধর্ম-নিরূপণ অবশ্যকর্তব্য। অথচ এ জাতীয় ধর্ম-নিরূপণ অন্তে নির্ভর করে প্রচলিত বা / এবং পরিকল্পিত বিধির উপর। চেয়ার-কে 'ফুল' বলে যদি অভিহিতও করি, তথাপি তার ধর্ম-নিরূপণ পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ বস্তু-অভিধা কোনও-না-কোনও নিরূপিতব্য ধর্ম-সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কতিপয় বিধি অনুসরণ না করলে, এবং স্ব-ইচ্ছায় বিভিন্নকালে একই বস্তুতে ভিন্ন ধর্ম আরোপ করলে, ধর্ম-ধ্রুবত্বের অভাবে কোনও পরিগ্রহ বা ভাব-সঞ্চার অসম্ভব। অতএব, শিল্পী সামাজিক জীব হিসাবে ও কিয়দংশে স্বীয় সুবিধার্থেও বটে, এইরূপ বিধি স্বীকার ও প্রয়োগে বাধ্য।

শিল্প প্রকাশ : প্রকাশ বিভিন্ন সামগ্রী ও মাধ্যম-নির্ভর। শিল্পী এই সামগ্রী রাশি ও মাধ্যমগুলি সঠিক নিরূপণের জন্য বিধিনির্ভর। স্ব স্ব কল্পনায় বিধি লাভ হয় না। বিধিমাত্রই সমাজে প্রচলিত ও স্বীকৃত। অতএব বিধি ঐতিহ্যনির্ভর। ফলত শিল্পও অন্তে ঐতিহ্যনির্ভর। ধরা যাক, সাহিত্য। সাহিত্যমাধ্যম শব্দ ও ভাষা; শব্দ ও ভাষার যথাযথ প্রয়োগ, বিধিনিয়ন্ত্রিত। মূলকথা, শিল্পকে প্রকাশ মানলে, প্রকাশের নিমিত্ত ঐতিহ্য-পরিপুষ্ট প্রচলিত বিধি ও নিয়মাবলি মানতে বাধ্য। একথা অবশ্যই আমার বক্তব্য নয় যে, ঐতিহ্যের আগম কেবলমাত্র বিধি-আশ্রয়ী; ভার বৈশিষ্ট্য, বর্ণনা-তাৎপর্য ইত্যাদি নানা কারণেই শিল্পীকে ঐতিহ্যের শরণ নিতে হয়। আমি মাত্র এটুকুই বলতে চাই যে শিল্পীর পক্ষে ন্যূনতম অথচ অবশ্যস্বীকার্য যে চেতনা তা বিধি-ভিত্তিক। অন্তত এই কারণে শিল্পী, তা তিনি যতই প্রতিভাধর বা ব্যষ্টিশাসিত হন না কেন, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না।

এখানে অবশ্য নিম্নরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে। সাহিত্য উপন্যাস, নাটক এগুলিকে ভাষার নিয়মাবলি বা বিশেষ করে অর্থ ও প্রয়োগবিধি যতটা প্রযোজ্য, কবিতায় ততখানি নয়। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতারও মাধ্যম ভাষা; ফলে ভাষাগত বিধি-সূত্র সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তো চলে না। শব্দার্থ হয়তো রূপক, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত। কিন্তু শব্দের রূপকার্থ কদাপি স্বয়ম্ভর নয়, লক্ষণার্থের উপর নির্ভরশীল। রূপক, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির আশ্রয়ে অর্থবিস্তার হয়, কিন্তু মূলে তো সেই লক্ষণার্থ।

অর্থাৎ মাধ্যম-নিরূপণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধি শিল্পী মানতে ও জানতে বাধ্য এবং যেহেতু বিধি, সেই হেতু ঐতিহ্যনির্ভর। অতএব অন্তত এই কারণে শিল্প ঐতিহ্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

শিল্প ও প্রকাশ অভিন্ন, আমরা পূর্বেই স্বীকার করে নিয়েছি; প্রকাশ সম্পর্কিত যে তিনটি সম্ভাব্য প্রশ্ন উল্লিখিত হয়েছিল, তার তৃতীয় বা শেষ প্রশ্নটি, অর্থাৎ 'প্রকাশের (শিল্পের) উদ্দেশ্য কী', অনন্তর এটির সঙ্গে বিধিবৃত্তির অনিবার্যতা বিচার করব। শিল্প যেহেতু প্রকাশ, সেই হেতু শিল্পের মূল উদ্দেশ্য— 'ভাব-অনুভূতি সঞ্চার'। অর্থাৎ শিল্পীকে একটি বিশেষ কালের, বিশেষ দেশের রসিকবৃন্দের কথা ভাবতেই হবে। এবং সেক্ষেত্রে রসিক ও রসস্রষ্টার মধ্যে যদি সমপর্যায়ের কোনওপ্রকার বিধিসাদৃশ্য না থাকে, তাহলে প্রকৃতই বিপর্যয়। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবী যদি ধরেও নিই, তাহলেও 'সমানধর্মী'র প্রয়োজন। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক ও সাহিত্যিকের মতে — 'The poet and the critic must be composed of the same peers.'। এই সমধর্মিতা তো কেবল কতকগুলি ব্যক্তিধর্ম নয় — সমান প্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য। শিল্পীর প্রত্যাশার যাথার্থ্য কেবলমাত্র নিয়মানুগ ও বিধি-অনুগত ব্যবহার-নির্ণীত।

প্রজ্ঞাবান ইতালীয় দার্শনিক ও শিল্পতত্ত্ববিদ্ ক্রোচে তাঁর *এস্‌থেটিক্‌স* গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন। তথাকথিত কোনও অসভ্য সম্প্রদায় একটি চিত্রিত ক্যানভ্যাসকে পারাপার-তরণী ভেবে জলে ব্যবহার করতে যায়। এ দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট হয়, যে শিল্প ও সঞ্চার সমধর্মী সংস্কৃতি ও পরিবেশের অপেক্ষা রাখে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে অসভ্য সম্প্রদায়টির স্বীয় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও চিত্রশিল্পীর ঐতিহ্য থেকে তা এতই ভিন্নতর যে পারস্পরিক সমধর্মিতার অভাবে শিল্পানুভবের এই নিদারুণ ব্যর্থতা সম্ভব হল। এই সমধির্মিতার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত হতে পারে, তা অবশ্যই অনেকাংশে নির্ভর করে, রসিক ও রসস্রষ্টার মধ্যে বিধিপালনের সাদৃশ্যের উপর। আজ জগৎ অনেক সংকীর্ণ, সেহেতু এক দেশের শিল্পী অন্য দেশে বা অন্যতর ঐতিহ্য-পরিপুষ্ট সংস্কৃতিতেও কদর পান, কিন্তু তা নেহাৎই সমধর্মিতা ভিত্তি করেই। অদ্যাবধি ভাবা কঠিন যে কোনও চিনা গায়ক, তা তিনি যতবড় কুশলী শিল্পীই হন না কেন, ভারতের কোনও অজগ্রামে আদৃত হবেন। সমধর্মিতার অর্থ বস্তুত কতকগুলি সদৃশ বিধির সচেতন ও অবচেতন প্রতিপালন। কল্পনা, ভাবাবেগ এগুলি বিশেষ করে এমনই সমাজপুষ্ট যে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া প্রায়শই বিধিভিত্তিক। এস্থলে 'বিধি' শব্দটির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। 'বিধি' পদটি এই প্রবন্ধে খুবই প্রসারিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, বিধি বলতে, আজ্ঞা, নিষেধ ও প্রচলিত ব্যবহারবৃত্তি বোঝানো হচ্ছে। প্রথা, নিয়ম ও গোষ্ঠীনির্ভর চারিত্রিক প্রতিক্রিয়া—এই তিন ধরনের চেতনাকেই 'বিধি'র অর্থের অন্তর্ভুক্ত করছি। আসলে তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াসমূহকে যতটা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়, বস্তুত তারা তা নয়, অনেকখানিই সমাজে বহুদিনের অভ্যাস-নির্ধারিত। শিল্পী স্বয়ং কিয়ৎপরিমাণে এই বিধি ভাবিত না হলে সৃষ্টিকার্যে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। স্রষ্টাকে যদি সর্বদা স্মরণ করতে হয় যে তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেক ক্রিয়া ও উপকরণের জন্য টীকা-ভাষ্য তাঁকেই উপস্থাপিত করতে হবে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ সকল অনুপ্রেরণা হারিয়ে সৃষ্টি থেকে নিরস্ত হবেন। তদুপরি, টীকা-ভাষ্যও সাধারণভাবে কতকগুলি বিধি স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে। মোটকথা, জ্ঞানত ও অজ্ঞাতে কতকগুলি ব্যবহারিক সাদৃশ্য—জন্যই শিল্প-প্রকাশ ও ভাবসঞ্চার আদপে সম্ভব, নচেৎ নয়। ঐতিহ্য এই ব্যবহারিক সাদৃশ্যের কারণ-মঞ্চ। এই কারণে শিল্প ও ঐতিহ্য অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত।

এ তো গেল শিল্প ও ঐতিহ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এতদ্ব্যতীত ঐতিহ্য-সংরক্ষণ ও শিল্পীর সৃজনশীল চেতনার এক জাতীয় প্রকারগত সাযুজ্য বর্তমান। পূর্বেই বলা হয়েছে ঐতিহ্য, জীবনযাপনে ব্যাপক অর্থে একটি সংহত মূল্যাদর্শ দেয়, যা ব্যক্তির বিভিন্ন কার্যে মূল্যায়নে সহায়তা করে, অথচ যে মূল্যায়ন সামাজিক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধায়ক। সৃজনশীল চেতনা তথ্য সৃষ্টি করে না, নতুন বিষয় সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে এক অভিনব মূল্যাদর্শ অথচ যা সঞ্চিত মূল্যাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত - কী সংঘাতে, কী সহযোগিতায়। অর্থাৎ শিল্পীর সৃজনক্রিয়া মূল্যায়নহেতু শিল্পীকে ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হয়। মূল্যবোধ তো স্বতন্ত্র তথ্য আবিষ্কার নয়, তথ্যজগতে ও ভাবজগতে নির্বাচন প্রয়োগ। ফলে সহানুভূতির আবেদন সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ সাধারণ বা বিশেষ সংবেদন উত্থাপন দ্বারা সদৃশ গণগোষ্ঠীতে ভাবসামঞ্জস্য ও বিচারসমতার নিশ্চয়তা, মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে : 'আমি যাকে ভালো বলি, তুমিও তাকেই বল'—এ আবেদন মূল্যায়নের প্রধান অনুপ্রেরণা। আমরা পরে দেখব যে, এই কাররেই শিল্পবস্তু (art object) কোনও বিশিষ্ট সত্তা বা ভাবসৃষ্টি নয়, এক সমগ্র চৈতন্যদর্শ (model) সৃষ্টি। এই মর্মে তাই শিল্পে ঐতিহ্যের প্রভাব গভীর।

স্বভাবতই সমালোচকবৃন্দ শিল্পে ঐতিহ্যের প্রভাব পরিস্ফুট বলেই মনে করেছেন। তথাপি এই প্রবন্ধে সর্বজনস্বীকৃত মতেরই দীর্ঘ পুনরালোচনা আপাতদৃষ্টিতে বর্জনীয় পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহুভাষিত হয়েও ঐতিহ্যের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ না করার জন্য ও শিল্প এবং ঐতিহ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক বিচারের অভাবে, শিল্প কোন ক্ষেত্রে এবং কিভাবে ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারে, তার সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। ফলে প্রায়ই ঐতিহ্যের নামে শিল্পে প্রাচীন ইতিহাসকেই বরণ

করি। এ জাতীয় প্রমাদের দৃষ্টান্ত প্রচুর। চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, সংগীতে কসরৎ-পারদর্শী, সাহিত্যে সনাতনপন্থী সমালোচকদের হাতে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনা—এ সবই একই ভুলের উদাহরণ। অর্থাৎ ঐতিহ্যের একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, কালনিরপেক্ষ অবশ্যস্বীকার্য কাঠামো আছে যার বাইরে ভাবপ্রকাশ অসার্থক, বস্তুত অসম্ভব। প্রাচীন কতকগুলি ধারণা ও বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করা কোনোক্রমেই ঐতিহ্যবরণ নয়।

৩

সনাতনপন্থীরা যদি ইতিহাসকে ঐতিহ্য বলে ভুল করেন, তাহলে অতিশয় আধুনিকতার বাসনায় বিরোধী গোষ্ঠী পরিবর্তনমাত্রই প্রগতি এই ভুল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান। ঐতিহ্যের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করেছি তা যথার্থ হলে, আধুনিকতা কেবল সমকালীনতা নয়, এক প্রগতিশীল মূল্যমান নির্ণয়; ধারাবাহিকতা অস্বীকার জন্য যে অনুর্বর অভিনবত্ব, সেই অর্থহীন, উদ্দেশ্যশূন্য পরিবর্তন নয়, আধুনিকতা তাই, যা ঐতিহ্যগত আদর্শকে নব কলেবর দান ও ফলত সমকালীন সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক প্রকাশলিপ্সাকে সংহত ও সংগঠিত করে। সংক্ষেপে, আধুনিকতা মাত্র বৈচিত্র্যই নয়, সার্থক বৈশিষ্ট্য; সামান্যকে বাদ দিয়ে বৈশিষ্ট্য অর্থহীন। ঐতিহ্য উক্ত সামান্যের পটভূমি। অর্থাৎ ঐতিহ্য ও আধুনিকতা পরস্পরবিরোধী নয়, পরস্পর সম্পূরক। আধুনিকতার প্রকৃত দ্বন্দ্ব আনুষ্ঠানিকতার (Institutions) সঙ্গে। বস্তুত আধুনিকতা তো কোনও ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশির চাল নয়, সমাজে স্বীকৃত প্রগতিশীলতা। ফলে আধুনিকতাই সমাজস্বীকৃতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের ঐতিহ্য। একটি কথা অবশ্যবিবেচ্য এইজন্য যে, শিল্পে প্রায়শই আধুনিকতার অভিমানে ঐতিহ্যের প্রতি অযাচিতভাবে বিরূপ মনোভাব পোষিত হয়। এই মনোভাবের সবটাই অবশ্য কৃত্রিম বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। ঐতিহ্য বিধি-মণ্ডিত। শিল্প মুক্তিচেতনাজন্য ও মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী। বিধি অনুসরণ তাই মুক্তিপথের বাধা মনে হতে পারে। ফলে অনেক সময় শিল্পী ও সমালোচকগণ ঐতিহ্যকে বন্ধন ভাবেন; এ ভাবনা কিয়দংশে খুবই স্বাভাবিক, যদিও ভ্রান্ত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিল্পে আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ না করে ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করছি, ততক্ষণ পূর্বপক্ষের ধারণা ভ্রান্ত হলেও উপেক্ষণীয় নয়।

'আধুনিক' শব্দের একটি প্রধান অর্থ 'সাম্প্রতিক'। অর্থাৎ আধুনিক পদটি কালনিরপেক্ষ নয়। এক অর্থে সম্প্রতিকালে যে শিল্প সৃষ্ট, তাই 'আধুনিক শিল্প'। এই অর্থে 'আধুনিক' পদটি পরিগৃহীত হলে প্রচলিত ব্যবহার-রীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। যদিও আধুনিক পদটির কালাবচ্ছেদকতা সাধারণভাবে অনস্বীকার্য, তথাপি মাত্র সেই অর্থেই পদটি আমরা ব্যবহার করি না। আধুনিক শব্দটি ব্যবহৃত রীতি অনুসারে, একটি গুণগত বৈশিষ্ট্যও আরোপিত হয়। এযুগে বাস করেও কোনও শিল্পী সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করলেও, তাঁর সৃষ্ট শিল্পবস্তুকে আমরা কদাপি আধুনিক বলব না। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র 'অভিনবত্ব' থাকলেই 'আধুনিক' শব্দটির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না; যদিও এটি একটি অবশ্যগণ্য অর্থ। অর্থাৎ 'আধুনিক শিল্প' নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব অবগাহী, কিন্তু 'অভিনব শিল্প' হলেই তাকে 'আধুনিক শিল্প' নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব-অবগাহী, কিন্তু 'অভিনবত্ব যদি রসিক মহলে স্বীকৃত ও প্রগতিশীল ধারণার জনক হিসাবে পরিগণিত হয়, তবেই সেই অভিনবত্ব শিল্পে আধুনিকতার মর্যাদা পায়। তদুপরি এই অভিনবত্ব ভাব ও রূপ উভয়ক্ষেত্রেই রসসঞ্চারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ আধুনিকতা ও আঙ্গিক-মগ্নতা একার্থক হয়ে পড়ে ও শিল্পমুক্তির ছদ্মনামে শিল্পের সত্যনাশে সহায়ক হয়। একথাও অবশ্য স্মরণীয় যে, তৎকালীন রসিকসমাজে স্বীকৃতি-সাপেক্ষতা সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। পরবর্তী যুগের রসিকসমাজ প্রাচীন কোনও শিল্পীর কার্যে সার্থক আধুনিকতা আবিষ্কার করতে পারেন। যথা, ফরাসি দেশে আঁরি রুশোর চিত্রাঙ্কন তৎকালীন প্যারিসে বহুনিন্দিত ও পরিহসিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরবর্তীকালে বিশেষ সমাদৃত হয়। কিন্তু এ সম্ভাবনা থাকলেও সমকালীন রসিকসমাজে সঞ্চারিত হওয়ার আবশ্যকতা একেবারে

অস্বীকৃত হলে, স্বৈরাচারপন্থী অভিনবত্বে শিল্পজগতে দুর্যোগ ও দুর্বোধ্যতার অবধি থাকবে না।

মোট কথা 'সাম্প্রতিকতা' ও 'অভিনবত্ব' আধুনিকতার (শিল্পবিচারে) আংশিক ব্যাখ্যাই দেয় মাত্র। এ ছাড়াও 'আধুনিক শিল্প' বলতে আমরা জীবন, সমাজ ও সত্তা সম্পর্কে এক সামগ্রিক ধর্মসাপেক্ষতা বুঝি যেটির প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে হলে, অন্তত কিছুটা শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এই বিশিষ্ট অর্থোদ্গমের অপেক্ষা না করেও ব্যাপক অর্থে বলতে পারি যে আধুনিক শিল্প পরিবেশনে এযাবৎকালের শিল্পধারা প্রকাশের এক নতুনও বিস্তৃত ধারায় প্রবাহিত হয়। আর এই কারণেই প্রাক্-বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিত বর্জন করে শিল্পকে আধুনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা অর্থহীন ও অবাস্তব। এই প্রাক্-পরিপ্রেক্ষিত আত্মগত করেই প্রগতি। অর্থাৎ ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে, তাকে বর্জন করে নয়, শিল্প আধুনিকতার মহত্ত্বলাভ করতে পারে। এর অর্থ, আধুনিকতার স্তরে, শিল্প ও শিল্পীকে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐতিহ্য সদাই বিধি-ভিত্তিক। অথচ, সাম্প্রতিকতা ও অভিনবত্ব ব্যতীত আধুনিকতার তৃতীয় এক অর্থ আছে। এই অর্থে আধুনিক শিল্প নিয়তই শুদ্ধতাসন্ধী ও তদর্থেই মুক্তিপ্রার্থী। শিল্পে প্রগতির পথ ক্রমবর্ধমান মুক্তি অর্জনের পথ। কিন্তু কি থেকে মুক্তি? অবশ্যই বন্ধ থেকে মুক্তি; বিধিনিয়মের জটিলতা ও বাহুল্য থেকে মুক্তি। অথচ ঐতিহ্য মানতে হলে, এ মুক্তি পরাহত নয় কি? এ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা চেষ্টা করব যে এ সমস্যা কেবল আপাত-বিরোধের সমস্যা। আর তাই জন্য প্রয়োজন, সংক্ষেপে শিল্পস্বরূপ বিশ্লেষণ।

৪

আমরা পূর্বেই দেখেছি শিল্প প্রকাশ। কিন্তু কী প্রকাশ করে? অর্থাৎ প্রকাশকে প্রতীকধর্মী (Symbolic) ভাবা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রাচীন দার্শনিকদের রীতি অনুযায়ী শিল্পকে সৌন্দর্যের, সুষমার বা আনন্দের প্রকাশ বলা একেবারেই অচল, কেননা এ জাতীয় অর্থহীন বাক্‌বিস্তারে শিল্পসমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয় না। তাছাড়াও আনন্দ, সৌন্দর্য বা তাদৃশ ভাবপদার্থ, প্রকাশের ফলস্বরূপ, প্রকাশের আধেয় নয়। শিল্পী কোনও একটি বিষয়, একটি আবেগ বা একটি ভাব প্রকাশ করেন না; তিনি নানা বিচিত্র বিষয় প্রকাশ করেন। বস্তুত শিল্প-বিষয়ক এ জাতীয় প্রাচীনপন্থী সংজ্ঞা কেবলই পুনরুক্তি... তার তাৎপর্য বিচার দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের সংজ্ঞা কখনও সম্ভব নয়; এবং প্রয়োজনীয়ও নয়। শিল্প বা আর্ট এমন বিচিত্র কার্য-কারণের সমাহার যে তাদের সম্মিলিত কোনও সাধারণধর্ম অন্বেষণ মূঢ়তা ও অযথা কালক্ষেপণ। বিভিন্ন শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা কোনও একটি সামান্যধর্ম-জন্য নয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও স্তরের সামান্যধর্ম-সমাহার। একেই জনৈক পাশ্চাত্য দার্শনিক[৬] 'family resemblance' বলেছেন। আর্টের একটি বিখ্যাত সংজ্ঞা দিয়েছেন শিল্প-সমালোচক ক্লাইভ বেল। তাঁর মতে: 'art is distortions'। এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করলেই আর্টের সংজ্ঞা কখন কীভাবে পুনরুক্তির প্রশ্রয় দেয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। সমালোচকের মতে শিল্প= বিকার। কিন্তু যে কোনও বিকার বা distortion তো নয়। একতাল মৃত্তিকা বা একখণ্ড প্রস্তরকে যে কোনোভাবে বিকৃত করলেই তা আর্ট হয় না। অগত্যা মানতে হয় কেবলমাত্র শিল্পোচিত বিকার (artistic distortion)-ই শিল্প। অর্থাৎ অন্তে সংজ্ঞার্থ দিতে হয় সংজ্ঞেয় (definicndum) পদের সাহায্য নিয়ে ও ফলে অহেতুক চক্রন্যায়ে আবর্তিত হতে হয়। আর্টকে 'হার্মনি' বলারও এক অসুবিধা প্রকৃতপক্ষে 'শিল্প' ভিন্ন ভিন্ন কার্য - চিত্রণ, সংগীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি। এর সবগুলি প্রকাশ করতে যদিও 'শিল্প' বা 'আর্ট' এই সামান্য, পদ ব্যবহার করি, তৎসত্ত্বেও এই পদের পরিপূরক কোনও একটি অর্থসামান্য বা সংজ্ঞা অন্বেষণ অযথা নৈয়ায়িক লিপ্সা চারিতার্থতার অপচেষ্টা। অবশ্য সংজ্ঞাকথন অসম্ভব বলে হতাশ হবার কোনও কারণ দেখি না। বস্তুত একক ধর্মসাদৃশ্য না থাকলেও, সব কটি ক্রিয়ারই এক উদ্দেশ্য বা সার্থকতা-সাদৃশ্য আছে বা থাকতে পারে। এই সাদৃশ্য শিল্পে কী প্রকার? কেউ কেউ বলেন শুদ্ধ 'অনুভবসিদ্ধি'; কেউ বলবেন-'ভাবসিদ্ধি' (যেমন, কলিংউড়);কারও

মতে বিশ্বে নিহিত 'তত্ত্বসিদ্ধি' (Reality)। এই তত্ত্ব কেউ 'জড়ে' আরোপ করেন, আর কেউ বা 'চিৎ'-এ। আবার তথাকথিত বাস্তববাদীরা (Realists) এই দুইয়ের সমন্বয়ে যে বাস্তবজীবন, পরিপার্শ্ব ও পরিবর্তনশীল সমাজচেতনা, তাতে আরোপ ক'রে থাকেন। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক হাবার্ট রিড্ এই শেষোক্ত মতের প্রবক্তা। মার্কসবাদীরা তো বটেই। প্রথমটিকে সাবজেকটিভ (subjective) ও তৎপরবর্তী মতগুলিকে সচ্ছন্দে অবজেকটিভ (objective) বলা যেতে পারে। শিল্পের সার্থকতাবিষয়ক আলোচনাগুলি মোটামুটি উক্ত মতগুলির যে কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অতএব উক্ত মত ক'টি বিচার করলে আমরা নূন্যাধিক শিল্পের সার্থকতা ও উদ্দেশ্যের সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে এক যথার্থ দৃষ্টি লাভ করতে পারি। প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এই মতগুলির ব্যাপ্তি দোষ।

প্রথমে উল্লিখিত মতটি, অর্থাৎ 'শিল্পের অনুভবসিদ্ধি'-শিল্পকে অতিমাত্রায় ব্যক্তিতান্ত্রিক করে তোলে। শিল্প যদি শিল্পীর কোনও বিশেষ অনুভবের প্রকাশ মাত্র হয় তাহলে শিল্পের অন্যতম প্রয়োজনীয় যে ধর্ম, অর্থাৎ নিখি হৃদয়সংবেদ্যতা, তার হানি হয়। ব্যক্তির ক্ষণ-নিরূপিত কালে যে অনুভব তা এতই ব্যক্তিগত যে তার সঞ্চার বড়ই কঠিন, এমনকি অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়ত, কোনও বিশেষ অনুভবের প্রকাশ এতই তথ্যনির্ভর যে শিল্প স্বতঃই আবেদনাত্মক (prescriptive) না হয়ে, অন্যায় রকম বর্ণনাত্মক (descriptive) হয়ে ওঠে ও শিল্পধর্ম হারায়। এবং সেক্ষেত্রে শিল্প ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঘটনাচিত্র ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই ক্ষীয়মাণ সীমারেখার গোলযোগ প্রকট হয়ে পড়ে। কোনও চিত্রশিল্পী যখন একটি গাছ আঁকেন, তখন কোনও এক মুহূর্তে, কোনও এক স্থানে লব্ধ ওই বিশেষ গাছটির বিশিষ্ট অনুভব প্রকাশ শিল্পীর উদ্দেশ্য কদাপি নয়; কেননা শিল্পচেতনার প্রয়োজনীয় বিস্তার এতে নেই। শেষত, এই ক্ষণনির্দিষ্ট এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পীর সম্পূর্ণ একাত্মতাবোধ আসতেই পারে না। প্রতিনিয়তই তাঁর অনুভব-বৈচিত্র্য তাঁকে ওই মুহূর্তের নির্দিষ্ট অনুভব থেকে স্বতঃই বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অতএব, শিল্পের উদ্দেশ্য অনুভবসিদ্ধি, এ মত স্বীকার করার বহু অসুবিধা।

দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ, শিল্প ভাবসিদ্ধি ভাববাদী দার্শনিকদের অতি প্রিয়। এই মত মানলে শিল্পে দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রচুর সুযোগ বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর সত্তারাশির ভাববাদী ব্যাখ্যাকারবৃন্দ প্রায়ই অনুভব-সত্য ও চিন্তা-সত্যের মধ্যেকার স্তরে শিল্প-সত্যের স্থান নির্ণয় করেছেন। অনেকে আবার মনে করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ বা বহুলাংশে বের্গসঁ, যে মূল যে ঐক্যবদ্ধ সমাগ্রিক সত্য তা একমাত্র শিল্পেই উদ্ভাসিত। কিন্তু এই মতের মস্ত অসুবিধা শিল্পী ও রসিকের মধ্যে যথাক্রমে জাগ্রত ও সঞ্চারিত ভাবের অভিন্নতা নিরূপণ। শিল্পীর ভাব ও রসিকের ভাব ভিন্ন হলে শিল্পীর অভিপ্রেত ভাবসিদ্ধি হবে না। দ্বিতীয়ত এই মতানুসারে ভাব ও রূপের চিরন্তন দ্বন্দ্ব অপ্রতিহত থাকে। কেননা, যে রূপে যে ভাব শিল্পে প্রকাশিত, সেই ভাব ও সেই রূপের মধ্যে কোনও আবশ্যিক (necessary) সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্থাৎ একই ভাব অন্যরূপে বা অন্যজাতীয় রূপে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। এবং তা না পারলে ভাব ও রূপের সমাগ্রিক সম্মিলনে শিল্পে যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য বর্তমান তার ব্যত্যয় হয়। ভাব ও রূপ পরস্পর-নিরপেক্ষ থাকে; ন্যায্যত, এই মতাবলম্বীদের মতে সংগীত বা চিত্রকলায় ভাবগত পার্থক্য নাও থাকতে পারে, কেবল রূপগত পার্থক্যের ভিত্তিতেই তারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প। এ কথা মেনে নেওয়া নিতান্তই কঠিন। রূপ-নিরপেক্ষ ভাব অকল্পনীয়। অতএব এ মতও গ্রাহ্য মনে হয় না।

'শিল্পের উদ্দেশ্য তত্ত্বসিদ্ধি' এই তৃতীয় মতটির যৌক্তিক অসারতা সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, তত্ত্বপ্রকাশের বাহন শিল্প নয়, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি। ফলে সার্থকতা বিচারে, 'তত্ত্বসিদ্ধি' সাদৃশ্যজন্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প তুলনীয় প্রকাশ হিসাবে গণ্য হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে উৎকর্ষের মান নির্ণয় কঠিন, কেননা এই মতানুসারে যে মান শিল্পে প্রাযোজ্য, ন্যূনাধিক সেই মানই বিজ্ঞানে প্রয়োগ করতে হবে। এ কথা অবশ্যই অবাস্তব। কেননা, তত্ত্ববিষয়ে যে জাতীয় প্রশ্ন করা যায়, শিল্পে সে প্রশ্ন নিতান্তই অর্থহীন।

যথা - কোনও তত্ত্ব ভুল কী নির্ভুল এ প্রশ্ন বৈধ, কিন্তু শিল্পে এ প্রশ্ন অচল। তত্ত্বে প্রামাণ্য বিষয়ক প্রশ্ন সমীচীন ও অনুমোদিত, কিন্তু শিল্পে নিতান্তই হাস্যকর, সে তত্ত্ব শুদ্ধ চিৎ-ই হোক, বা শুদ্ধ জড়-ই হোক। যাঁরা শুদ্ধ তত্ত্বকে 'জীবন, সমাজ, পরিপার্শ্ব' ইত্যাদি অস্পষ্ট ও সংশয়াত্মক পদে পর্যবসিত করে শিল্পের উদ্দেশ্যসাধনে বিশ্বাসী, তাঁরা প্রায়শই বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করে, সংস্কারবুদ্ধির প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। হয় তাঁরা বলবেন যে, আমাদের নিত্য ও নৈমিত্তিকভাবে যাপিত জীবনের ইতিহাসই শিল্পপ্রকাশ ; সেক্ষেত্রে শিল্পে বিবরণের প্রাধান্য দেওয়া হবে ও ফলত সৃজনশীলতার হানি হবে। পরিপুষ্ট ও বহু উৎকৃষ্ট প্রচলিত শিল্পধারাকে এঁরা নিরন্তর উপেক্ষা ও অন্তে শিল্প হিসাবে অস্বীকার করবেন। নচেৎ, চেষ্টাকল্পিত তত্ত্বসার আরোপ করে শিল্প ও জীবনের মধ্যে সামান্যতম ও ক্ষীণ সম্পর্ক উপস্থিত না করা পর্যন্ত সমালোচকবৃন্দ তৃপ্তি পাবে না। তথাকথিত মার্কসীয় ভঙ্গির শিল্পসমালোচনা অনেকাংশে এই পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়াও, উক্ত মতে, শিল্পীর সামাজিক জীবন ও শিল্পীর মনের গভীর যে ব্যক্তিগত জীবনবোধ (personal reserve, যদি না এই দুইয়ের পার্থক্য শুরুতেই অস্বীকৃত হয়)—এই দুইয়ের বিরোধের মীমাংসা সাধন অসম্ভব। অতএব, শিল্পীর ও শিল্পের যে একাত্মতার দাবি তা কেবলই অস্বীকৃত হবে ও শিল্পী দ্বৈত ব্যক্তিত্বের শিকার হবেন। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রিক মনীষী প্লেটো তাই তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্র থেকে শিল্পীদের নির্বাসিত করে বিরোধের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন।

বস্তুত, শিল্প যে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত একথা এতই স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ যে, একথা প্রচারে কোনও অভিনব জ্ঞানসঞ্চার হয় না। শিল্পসৃষ্টি, নিঃসন্দেহে জীবনেরই একটি ক্রিয়া, অতএব জীবনের সঙ্গে যুক্ত, এটুকুই মাত্র বক্তব্য হলে বলা অনাবশ্যক। অবশ্যই জীবনতত্ত্ব পারদর্শীরা এটুকু মাত্র বলেন না, তাঁরা বলতে চান (যদিও অনেকসময় পরিস্ফুট হয় না) শিল্প উৎসারিত সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য থেকে এই হেতু শিল্পের আদিম বশ্যতা এই ব্যবহারিক জীবনের নিকট। এটা যদি সত্যও হয় যে, শিল্প সর্বদাই শিল্পনিরপেক্ষ জীবব্যবহারের জন্য, তাহলেও এটা অস্বীকার করা যায় না, ক্রমশ এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকারভিন্নতা এতই অধিক হয়ে ওঠে যে একটিব দ্বারা অপরটি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে না — এবং ব্যাখ্যার চেষ্টাও অর্থহীন। মূল কথা, শিল্পচর্চার জন্ম-ইতিহাস যাই হোক, তার কর্ম-ইতিহাস তাকে এক স্বতন্ত্র সত্তায় রূপান্তরিত করে। এই সুস্পষ্ট সত্যটি স্বীকারে কিছু পণ্ডিত বর্গের কেন অস্বাভাবিক সংকোচ, বোঝা দায়। আলোচিত মতের অর্থ কেউ যদি করেন যে শিল্পে শিল্পীর জীবন নয়, জীবন-বোধ প্রকাশিত, তাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু 'জীবন' ও 'জীবন-বোধ' স্বতন্ত্র।

পরিসর স্বল্প, তাই বিভিন্ন মতগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হয়তো যথার্থ ন্যায়-বিচার সম্ভব হয়নি, কিন্তু যথাসাধ্য মূল অসুবিধাগুলি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমরা দেখার চেষ্টা করব, এই মতগুলির সাধারণ কোনও ধর্ম আছে কিনা এবং থাকলে সেই ধর্ম সমন্বয়ে, শিল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নতুন ধারণায় উপস্থিত হওয়া যায় কিনা।

এই প্রবন্ধের সর্বত্র 'শিল্পী ও শিল্পের একাত্মতা' কথা ক'টি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারণাটিই প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মতগুলির মধ্যে একটি সামান্য ধর্ম সূচিত করে। শিল্প প্রকাশ এবং প্রকাশে যেহেতু শিল্পী স্বকীয় ভঙ্গি প্রয়োগ করেন, অতএব শিল্পে শিল্পীর প্রকাশ থাকবেই। উপরে উল্লিখিত সকল মতাবলম্বী ব্যক্তিবৃন্দ একথা মানতে দ্বিধা করবেন না যে, শিল্পে শিল্পীর প্রকাশ অনিবার্য, তা সে তিনি যে ধারণাই প্রকাশিতব্য মনে করুন না কেন। এই কারণে এই ধারণাটি আমরা শিল্পজগতে সর্বজনগ্রাহ্য বলে ধরে নিতে পারি। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমালোচকদের পরিভাষার বলা যায়—'আর্ট-এ কিছু পরিমাণ সাবজেকটিভিটি থাকতে বাধ্য'। চিত্রশিল্পী সেজান (Cesanne) তাঁর এক পত্রে লিখেছেন : 'সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব শিল্পে দ্রষ্টার প্রকৃত অনুভবের প্রতিরূপ প্রকাশ[৭]।' শিল্পীর মতে 'এটাই শিল্পে, শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা'। অর্থাৎ, সেজান শিল্পে অনুভবসিদ্ধির মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

সর্বোৎকৃষ্ট হয় বলে মনে করতেন। মোট কথা, শিল্পের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্পর্কে শিল্পী বা সমালোচক যে ধারণাই পোষণ করুন, শিল্পে আত্মপ্রকাশ হয় ও বিশ্বাস আধুনিকতার একটি বিশিষ্ট অবদান। এই আত্মপ্রকাশ অবশ্যই শিল্পীর আত্মজীবনীর প্রকাশ নয়, শিল্পীর জীবনাদর্শের প্রকাশ। এই আত্মপ্রকাশ আবার একে অর্থে সমগ্র মানবপ্রকাশ[৮]। এই অর্থেই জীবনী না বলে জীবনাদর্শ বলছি। ফলে শিল্পী তাঁর শিল্পপ্রকাশের সঙ্গে এক রহস্যগভীর একাত্মতা বোধ করেন। 'রহস্যগভীর' বলছি এই জন্য যে, খুব প্রচল অর্থে এই জাতীয় একাত্মতা নির্বাচ্য নয়।

দ্বিতীয় এক সামান্য ধর্ম এবার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। শিল্প বা আর্ট মূলত অনুভব বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। ভাব, ধারণা বা তত্ত্বভিত্তিক নয়। অন্তে সিদ্ধি যাই হোক না কেন, শিল্পের মূল অনুপ্রেরণা প্রাথমিকভাবে অনুভবের তীব্রতা। এ অনুভব ইন্দ্রিয়জ কী ইন্দ্রিয়াতীত এ বিচার স্বতন্ত্র দার্শনিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু অনুভব (রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'উপলব্ধি' অর্থেও গ্রাহ্য) যে শিল্পের মূল অবলম্বন বা সামগ্রী এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকা অনুচিত। অনন্তর এই দুটি সামান্য ধর্মকে একত্র করলে শিল্পসিদ্ধি বিষয়ক উল্লিখিত মতগুলি ছাড়া আর একটি মৌলিক ধারণায় উপনীত হই। অর্থাৎ, 'শিল্প শিল্পীর অনুভবের জগৎ (sense-model) প্রকাশ করে'। শিল্পে শিল্পীর অনুভবের জগৎ প্রকাশিত, এটা ঠিক অভিপ্রেত অর্থ বহন করে না। বস্তুত আমাদের বক্তব্য হল, শিল্পে শিল্পী তাঁর অভিনব জীবনাদর্শ অনুভব-মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ইংরাজি ভাষায় 'model' শব্দটির যা দ্যোতনা, আমাদের নিছক তাই বক্তব্য। অর্থাৎ, শিল্পী তাঁর প্রত্যেক শিল্পকার্যে sense বা experience-model রচনা করেন। অতঃপর জগৎ শব্দটি ব্যবহার না করে আমি 'মডেল' শব্দটিই ব্যবহার করব। মডেলের ব্যবহার প্রায় সব শাস্ত্রেই অধুনা করা হচ্ছে। মডেল এমন একটি বিধিনিয়ন্ত্রিত কাঠামো যার মধ্যে সদৃশ বিষয়গুলি নির্বিশেষে স্থান পায় ও আপন নির্দিষ্ট অবস্থান জন্য এক সামগ্রিক সার্থকতা অর্জন করে। গাণিতিক বিজ্ঞানে মডেল ব্যবহার সর্বাধিক। মূল কথা, মডেল এমন একটি নির্দেশ-মণ্ডল যার মধ্যে অধিকারী বিশেষগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করে এক ঐক্যবদ্ধ নীতি-পরিচালিত হয় ও এক সর্বজনীন সার্থকতা লাভ করে। শিল্পে 'মডেল' শব্দটি আমরা এই অর্থেই ব্যবহার করছি। একটি সফল মডেলের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এক বিশেষ বিষয়, সামান্যের বিস্তার লাভ করে। একটু বিশদ করা যাক। একটি বিশেষ বিষয় তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অবশ্য সার্থকতাপ্রদ। ধরা যাক, একটি টেবিল, তার স্বধর্ম নিরূপণের দ্বারা নিশ্চিতই তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বুদ্ধিগত হয়। কিন্তু সব কটি গুণই টেবিলকে অপরাপর বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। অথচ, এই টেবিলকে যখন আধুনিক জীবন ও সভ্যতার মধ্যে বিশেষ পর্যায়ে রেখে দেখি, তখন ওই বিশিষ্ট বিষয়টি এক বিস্তৃততর সার্থকতা ও অপরাপর বহু বিষয়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতা লাভ করে। এতে টেবিলটির ধর্ম বৃদ্ধি হয়তো হল না, কিন্তু নিঃসন্দেহে সার্থকতা প্রসার হল। এই অর্থে শিল্পীও তাঁর শিল্পে একটি বিশেষ অনুভবকে কেন্দ্র করে এমন এক মডেল উপস্থিত বা সৃষ্টি করেন যাতে মাত্র ওই অনুভবটিরই নয়, সমগ্র অনুভব জগতের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সার্থকতা প্রসার হয়।

শিল্পপ্রবাহ লক্ষ করলে দেখা যায়, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, শিল্পী বস্তুসার বা বিশেষ তত্ত্বপ্রচারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শিল্পীর উৎসাহ অভিনব অভিজ্ঞতা বা অনুভবে। তাঁর তীব্র ও প্রগাঢ় অনুভবে তিনি তন্ময় হয়ে যান। সেটা সত্য বা তথ্য এটি বিচার করা শিল্পীর ধর্ম নয়। তিনি অভিজ্ঞতার এই তীব্রতাকে এক বিশেষ বা তজ্জাতীয় অনুভবের মডেলে রূপান্তরিত করতে চান। সাধারণ অবস্থায় বা সাধারণ চেতনায় অভিজ্ঞতা বা অনুভবগুলি প্রায়শই হয় সামাজিক রীতি বা তত্ত্ব অনুগ। তাই অভিজ্ঞতা নূতন হলেও সর্বদা অভিভূত করে না। কিন্তু শিল্পী-চেতনায় অকস্মাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ানুগ অনুভব (এ অনুভব শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, সাক্ষাৎকার, আকৃতি, বর্ণ যাই হোক না কেন) বা অভিজ্ঞতা আনে এমন এক তীব্রতা (intensity) যার প্রাবল্যে শিল্পী বিহ্বল বা অবশ হয়ে পড়েন। তাঁর এযাবৎ লব্ধ অভিজ্ঞতা

রাশিকে এই একটি ক্ষণের অভিজ্ঞতা যেন প্লাবিত করে দেয়। এই ব্যাকুল অসহায়তা থেকে শিল্পী উত্তীর্ণ হতে চান। হয় তাঁকে এই নব অভিজ্ঞতা অস্বীকার করতে হয়, দমন করতে হয়, না হয় এযাবৎ সঞ্চিত সকল অভিজ্ঞতা ও ভাবাদর্শকে এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কাঠামোয় নতুন করে সাজাতে হয়। এই অভিনব সজ্জাই মডেল সৃষ্টি। শিল্পী তৎকালীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করেন এবং তাঁর সমগ্র জীবনাদর্শ ওই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিল্পে ফুটিয়ে তোলেন। সংগীত, চিত্রণ, সাহিত্য, ভাস্কর্য তাই একটি বা কয়েকটি অনুভব-জাত হলেও, প্রকাশ করে এক সর্বব্যাপী জীবনাদর্শ। মহৎ শিল্প তাই কালোত্তীর্ণ ও দেশোত্তীর্ণ (সীমিত অর্থে) হতে পারে। অনুভব যত প্রগাঢ়, শিল্পে প্রকাশিত জীবনাদর্শ বা মডেল ততই ব্যাপক। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাটি শিল্পীর কাছে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকে না, এক বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ জগতের সন্ধান দেয়। প্রকাশিত মডেলে শিল্পী নিজের ও তৎ মাধ্যমে সকল মানুষের জীবনাদর্শ পরিবেশন করতে চান। এরই নাম সঞ্চার (communication)। এই অর্থে তাই শিল্পী মাত্র বিবরণ বা বর্ণনায় উৎসাহী নন, তাঁর শিল্পে প্রকাশিত মডেলের প্রতি স্বীকৃতির আবেদনও (prescription) থাকে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকও হয়তো মডেল সৃষ্টি করেন কিন্তু সেগুলি বিবরণমূলক (descriptive) ও তত্ত্বভিত্তিক; শিল্পীর মতো অনুভব-ভিত্তিক মডেল রচনায় তাঁরা অসমর্থ।

এইবার শিল্পের এই বিশ্লেষণ অনুসারে পূর্বস্থাপিত শিল্প সমস্যা অর্থাৎ ঐতিহ্য শরণ ও মুক্তিচেতনার আপাতবিরোধ বিচার করা যাক। কোনও মডেলে যেমন অন্তর্নিহিত সংহতি ও ঐক্য থাকা আবশ্যক, তেমনই আবশ্যক মডেলটির অপরাপর মডেলের সঙ্গে ধারাবাহিকতার সম্পর্ক। নচেৎ মডেলটি আয়ত্ত হবে না। মডেল যতই ব্যাপক, যতই অভিনব হোক না কেন, অপরাপর সৃষ্ট মডেলের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে, যাঁদের কাছে আবেদন করা হবে তাঁরা মডেলটির বৈশিষ্ট্য ধরতে অসমর্থ হবেন এবং 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন। তাতে অভিপ্রেত সঞ্চার ব্যাহত হয়। শিল্পসৃষ্টি তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়। শিল্পে এমনই এক অপরোক্ষতা আছে যে এক্ষেত্রে বিচার-সংশয়ের অবকাশ নেই। একটি সৃষ্ট মডেল হয় আমি গ্রহণ করি, নয় বর্জন করি। শিল্পে সংশয়বাদীরা অরসিকের দলে পড়বেন। এই জন্য নতুন মডেল সৃজনকালে শিল্পী সর্বদাই ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেন, নতুবা ভাব আদান-প্রদানের রাস্তা বন্ধ। শিল্পী যদি এমন মডেল সৃষ্টি করেন যা পূর্বাপর সব মডেল থেকে বিচ্ছিন্ন, তাহলে সে মডেলে রসিকবৃন্দ বিমূঢ় বোধ করতে পারেন, কিন্তু সার্থক সঞ্চারের অভাবে শিল্পীকৃত মডেলের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। দর্শক বা শ্রোতার অধিকৃত মডেল থেকে শিল্পীর মডেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলে পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগাযোগ থাকবে না। এই কারণেই শিল্প ঐতিহ্যনির্ভর; এবং একমাত্র এই অর্থেই শিল্পের সঙ্গে সামাজিক জীবনবোধের সম্পর্ক। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে প্রচলিত মডেলের অতিসদৃশ মডেল অনুকরণের নামান্তর, তাতে আধুনিকতা আনয়ন তো দূরস্থান শিল্পকর্মই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিল্প যেমন মডেল হিসাবে ঐতিহ্য মারফত বিধি মানতে বাধ্য, তেমনই অপরপক্ষে কেবল বিধিনিয়ন্ত্রিত হলে শিল্পসৃষ্টি অসাধ্য। অতএব মধ্যম পন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। আমরা পূর্বেই বলেছি, বিধির দুটি অবশ্য দিক হল— 'আজ্ঞা' ও 'নিষেধ'। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে নিষেধের দিকটা বহুলাংশে অস্বীকার করেন। নিষেধ দিয়ে যে গণ্ডি টানা হয়েছে, নতুন মডেলে শিল্পী সেই গণ্ডি ছাড়িয়ে বিস্তৃততর মডেল পরিবেশন করেন। নিষেধ অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাগুলিকেও ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। এখানেই শিল্পে মুক্তিচেতনার স্থান। এখানে বলা কর্তব্য যে, মডেলের যে বিধি-নিয়ম তা কিন্তু সবই ঐতিহ্যবাহিত নয়, বেশ কিছু সংখ্যক বিধি মডেলের নিজস্ব সংগঠন জন্য। এই জন্য মডেল যত জটিল, শিল্প ততই বদ্ধ। অতএব মডেল সরল হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিল্পধারায় আধুনিকতার এক মহৎ প্রচেষ্টা শিল্পের মডেল সহজ ও সরল করা। অর্থাৎ বর্জনীয় বাহুল্য বর্জন করার অর্থ, বহু অপ্রয়োজনীয় বিধির শাসন থেকে মুক্তি। এই অর্থেই শিল্পে 'শুদ্ধিকরণ' শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। অর্থাৎ চিত্রশিল্পে 'শুদ্ধ দৃষ্টি', সংগীতশিল্পে 'শুদ্ধ ধ্বনি', নাটকে 'শুদ্ধ সংলাপ'—ক্রমাগত শুদ্ধিকরণের এই প্রচেষ্টা আধুনিক শিল্পের এক সার্থক

অবদান। শিল্পীকে ঐতিহ্য মানতে হয় বলে তিনি বিধি-নিয়ম হয়তো অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু ঐতিহ্য-আদিষ্ট নিষেধ অমান্য করে আজ্ঞাগুলির অর্থ বিস্তার দ্বারা ওই rule গুলিকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগসাধ্য করেন। এই কৃতিসাফল্যেই শিল্পীর প্রতিভার প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পী যুক্তি অর্জন করেন প্রচলিত মডেলগুলির অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে। শিল্পে যত সামগ্রী ও ভাবনার ভিন্নতা, ততই মডেল জটিলতর। ভাব ও রূপ, বর্ণ ও রেখা, শব্দ ও অভিধা, সুর ও স্বর ইত্যাদি নানা সামগ্রী-পার্থক্য শিল্পীকে সৃজনকার্যে বাধা দেয়। আধুনিক শিল্পে তাই আমরা দেখি শিল্প এই পার্থক্যের লোপ সাধন করে মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা করছে। এই হেতু শিল্পে ক্রমবর্ধমান আধুনিকতা ও সামগ্রী-বিভিন্নতার লোপসাধন প্রায় একার্থক। এইভাবে শিল্পী অযথা বিধিবাহুল্য হ্রাস করে ঐতিহ্যকে অনেক সরল করতে সক্ষম হন। মুক্তি ও ঐতিহ্যচেতনার বিরোধ হ্রাস পায়। সামগ্রী-বিভিন্নতা যত কম, অনুভব বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ততই স্বল্প এবং অনুভব সঞ্চার ততই তীব্র, শুদ্ধ ও অপচয়হীন। এই অর্থে আধুনিক শিল্প অনেক প্রত্যক্ষ ও প্রখর (direct ও intense)। শিল্পে ক্রমশ তাই প্রতীকধর্মিতা হ্রাস পাচ্ছে ও প্রত্যক্ষধর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে পরিষ্কার বোধ হবে। অ্যারিস্টটলের আমলে নাটকের সামগ্রী হিসাবে ষড়ঙ্গ মানতে হত— কাহিনি, চরিত্র, সুর, উচ্চারণ, মোক্ষণ, মঞ্চ ইত্যাদি। আধুনিক নাটকে এই সামগ্রী-ভিন্নতা লোপ করে ঐক্যময় এক 'মানব পরিবেশ' (human situation) উপস্থাপিত হচ্ছে। এই সূত্রে এ্যাবসার্ড নাট্যকারগণ স্মরণীয়, বিশেষ করে বেকেট। সংগীত চিত্রশিল্প ভাস্কর্যে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি।

উল্লিখিত শিল্পসমস্যার বিরোধ তাই প্রথমে আপাতবিরোধ বলে অভিহিত করেছিলাম। অর্থাৎ ঐতিহ্য মেনেও আধুনিক শিল্পের মুক্তি-অভিযান সফল হতে পারে ও হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই আমরা আধুনিকতা ও শিল্পস্বরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

মূল কথা ক'টি পুনরায় উপসংহারে উল্লেখ করছি। শিল্প যেহেতু প্রকাশ এবং প্রকাশ যেহেতু সঞ্চারধর্মী এবং সঞ্চার-সম্ভাবনা যেহেতু ঐতিহ্যসাপেক্ষ, অতএব শিল্পীমাত্রই ঐতিহ্য স্বীকারে ন্যায়ত বাধ্য। বিধি-আড়ম্বর বা বাহুল্য বর্জন করে আধুনিক শিল্প মুক্তিপ্রার্থী, কিন্তু সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ বিধিনিরপেক্ষ হতে চাওয়া আত্মধ্বংসী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হবে। শিল্পী অনুভব-মডেল সৃষ্টি করেন তাঁর ঐতিহ্যমণ্ডলের মধ্যেই। কিন্তু মডেলের সংহতি, সরলতা ও অভিনবত্ব শিল্পমুক্তির পথ খুলে দেয়।

সূত্র নির্দেশ:

১। Erik H. Erikson, *Young Man Luther,* 1958, p.18

২। T.S.Eliot, 'Tradition and the Individual Talent" *Selected Essays,* London 1932, p. 14

৩। *Encyclopoedia of Social Sciences,* vol, p. 62 (1944 Edn)

৪। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-দর্শন*, বিশ্বভারতী দর্শন ভবন, শান্তিনিকেতন, ১৯৬৯।

৫। R. Wollheim, Art and Its Objects & Row, U.S.A., 1968, p. 32

৬। L. Wittgenstein, Philosophical Investigations.

৭। H.Read, The Philosophy of Modern Art. Meridian Books New York, 1957, p 191

৮। রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্য*।

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
(পৌষ-মাঘ ১৩৭৬)

ভবতোষ দত্ত

সখারাম গণেশ দেউস্কর

স্রষ্টা বা শিল্পী বলতে যা বোঝায় সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯-২৩ নভেম্বর ১৯১২) তা ছিলেন না। উপন্যাস কবিতা নাটক বা গল্প তিনি লেখেননি। তবু বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয়। রসের ক্ষেত্রে তাঁর দান নয়, মননের ক্ষেত্রেও নয়। মননের সঙ্গে যেখানে জীবনের যোগ সখারামের স্মরণীয়তা সেখানেই। বাংলা গদ্যসাহিত্য এই যোগসাধনের কাজটি করে এসেছে। যে চিন্তাধারা রামমোহনের সময় থেকেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছল যখন থেকে আধুনিক জীবনাদর্শের বাহক রাজা এবং নব উদ্বুদ্ধ প্রজার মধ্যে সম্পর্ক একটি স্পষ্ট আকৃতি পেল। সখারামের প্রধানতম রচনা 'দেশের কথা'য় তার চরম রূপটি ফুটে উঠেছিল। সখারামকে ইতিহাসে স্থাপন করতে গেলে বাঙালি চিন্তাধারার এই গতিরেখাটিকেই অনুসরণ করে আসতে হবে।

ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথাই বলি। এখানে ইংরেজের আধিপত্যের আরম্ভ, এখানেই ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। বাঙালি মনীষীরাই এর সুফল এবং কুফল চিন্তা করেছিলেন। সখারাম বাঙালি ছিলেন না, যদিও বাংলাই ছিল তাঁর কর্মভূমি, জন্মভূমি ছিল দেওঘর, পিতৃভূমি মহারাষ্ট্র। সখারামের জীবনকথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো।

বৈদ্যনাথের কাছে করো গ্রামটি সম্ভবত বর্গীর হাঙ্গামার সময় মরাঠাদের হস্তগত হয়। সদাশিব বিবাহসূত্রে এই গ্রামটি পান। সদাশিব ছিলেন সখারামের পিতামহ, সদাশিবের পুত্র ছিলেন গণেশ। গণেশ সদাশিব কাশিধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। সখারাম বৈদ্যনাথে জন্মগ্রহণ করেন ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯। বাল্যকালেই সখারাম মাতৃহীন হন। তাঁর পিসিমাই, তাঁকে লালন করেছিলেন। পিসিমা ছিলেন বুদ্ধিমতী, বিদ্যানুরাগিণী। মরাঠা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সখারামের জীবনের আদর্শ গড়ে ওঠে এই পিসিমারই প্রভাবে। মরাঠা জাতির ইতিহাস, শিবাজীর কীর্তিকলাপ সখারামের কিশোরমনে ছায়া ফেলেছিল। পরবর্তী জীবনে নূতনতর ইতিহাসের পরিবর্তিত পটভূমিতে দেশাত্মবোধক কার্যকলাপে সেটাই হয়েছিল ফলবান।

পিতা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বেদ-অধ্যয়নে। দেওঘর ইস্কুলে তিনি পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলেন। বাংলাও স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিখতে থাকেন। তখন দেওঘর ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত জীবনীকার। সখারামের বাংলা ভাষায় অনুরাগের মূলে প্রভাব ছিল যোগীন্দ্রনাথের। দেওঘরে তখন থাকতেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের গৃহে সখারাম প্রায়ই যেতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে সখারামের পরিচয় হয় সেখানেই। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সখারামের মৃত্যুর পর একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন।

দারিদ্র্যের জন্য সখারাম পড়াশোনা বেশিদিন চালাতে পারলেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেওঘরেই তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। তখন থেকেই তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির *সাহিত্য*-র লেখক। *ভারতী প্রদীপ বঙ্গদর্শন আর্যাবর্ত*-এ তাঁর ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে । তাঁর প্রথম পুস্তিকা *এটা কোন যুগ* শিক্ষকপদে নিযুক্ত হাবার আগেই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানে'-এ এবং স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়ে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে লেখা নয়,

যুগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার। পিতার প্রভাবে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসচর্চা করেছিলেন, এটা তারই ফল। তারপরেই বেরোতে থাকে *মহামতি রানাডে* (১৯০১), *ঝাঁশীর রাজকুমার* (১৯০১), *বাজীরাও* (১৯০২), *আনন্দবাঈ* (১৯০৩)। কিন্তু এই বইগুলি ছাড়াও তাঁর বহু রচনা পুস্তকাকারে অনিবদ্ধ। এই রচনাধারা অনুসরণ করে গেলে সখারামের ইতিহাস-সন্ধান এবং দেশানুরাগের ক্রমগভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। মরাঠাজাতির গৌরবপূর্ণ ইতিহাস, শিবাজীর দেশ ও জাতি গঠন, দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে তাঁর দুঃসাহসিক সংগ্রামে তার চূড়ান্ত পরিণতি—এই ইতিহাস সখারাম ভালো করেই পড়েছিলেন। তাঁর পড়া শুধু পুথিগত ছিল না, তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেশানুরাগের শিখা জ্বলে উঠল। দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট মি. হার্ডের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে হিতবাদীতে যে সব লেখা বেরিয়েছিল, সখারামই তার লেখক অনুমান করে স্কুল কমিটির সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেট মি. হার্ডি সখারামকে কর্মচ্যুত করলেন। শুধু তাই নয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সখারাম দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন।

'হিতবাদী'র সম্পাদক তখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। কাব্যবিশারদই সখারামকে *হিতবাদী*-তে চাকরি দিলেন। কাজ আরম্ভ করলেন ত্রিশ টাকায়, কর্মদক্ষতাগুণে সে বেতন বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে সখারাম নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়লেন। শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন, বঙ্গভঙ্গ-অন্দোলন ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর যোগ স্থাপিত হল। তাঁর বিখ্যাত বই *দেশের কথা* লেখা হল ১৯০৪-এ ১৯০৭ সালে কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপান যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাব্যবিশারদের অনুপস্থিতি কালে সখারাম ছিলেন *হিতবাদী*-র সম্পাদক, পরে তিনিই হলেন স্থায়ী সম্পাদক। কিন্তু সেই কাজেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। সুরাট কংগ্রেসের (২৯০৭) ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে সখারাম *হিতবাদী*-র কাজ ছেড়ে দিলেন। দ্রুতপন্থী এবং ধীরপন্থীদের বিরোধে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে গেল। দ্রুতপন্থীদের নেতা তিলককে দোষারোপ করতে চাইলেন *হিতবাদী*-কর্তৃপক্ষ। সখারাম তাতে অসম্মত হলেন। রাজনৈতিক আদর্শের গুরুকে তিনি কিছুতেই সমালোচনা করতে চাইলেন না। তেজস্বী মরাঠা সামান্য আয়ের উপায়টিও ছেড়ে দিলেন।

হিতবাদী-র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এদিকে *দেশের কথা* এবং *তিলকের মোকদ্দমা* বই দু'খানাই সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন। *দেশের কথা* সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদ একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়েছেন:

> ১৩১১ থেকে ১৩১৪ সাল এই চারি বৎসরে দেশের কথা চারি সংস্করণে ১০০০০ খণ্ড বিক্রীত হয়। তাহার পর সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পুস্তকের প্রচার যত বাড়িতে লাগিলে শিক্ষাব্রতী সখারাম তাহার মূল্য তত কমাইতে লাগিলেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ সখারামের ব্যক্তিত্বদ্যোতক আর-একটি ঘটনার কথা বলেছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য :

> বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না। সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন।

সরকারের রোষভাজন সখারামকে জাতীয় পরিষদও কাজে রাখতে ভরসা পেলেন না। সখারাম নিজেই অধ্যাপকপদ ত্যাগ করলেন। ১৯১২-র ২৩ নভেম্বর দেওঘরে করো গ্রামে দারিদ্র্য ও ব্যাধির আক্রমণের মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্কর মৃত্যুবরণ করলেন। ইতিপূর্বে পুত্র ও পত্নীকে তিনি হারিয়েছিলেন। সখারাম দেশসেবার পুরস্কার পেলেন অর্থ বিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারা নয়, স্বরাজ-আন্দোলনে রাজরোষকে উপহার করে *দেশের কথা* এবং *তিলকের মোকদ্দমা*-র লেখকরূপে জনচিত্তে স্থায়ী আসন-লাভের দ্বারা। 'স্বরাজ' শব্দটি সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বাংলায় লেখা *দেশের কথা* (১৯০৪) গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন[২]।

কলকাতায় চলে আসার পর থেকেই সখারাম দেশাত্মবোধক কর্মে অধিকতর নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তখন বাংলাদেশে সর্বজনপরিচিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সখারাম যে উদ্দীপনা এবং দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, সে-কথা সখারাম স্বামীজির দেহত্যাগের পর নিজেই বলেছিলেন।

পাঞ্জাব প্রদেশাগত এক বন্ধুকে নিয়ে সখারাম একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান। বিবেকানন্দ আরম্ভ করলেন পাঞ্জাবের অন্নকষ্ট ইত্যাদির আলোচনা। জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে বিশেষ কর্তব্য রয়েছে স্বামীজি তার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে থাকলেন। শিক্ষা অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে পতিত অগণ্য ভারতবাসীর উন্নয়নের নানা আলোচনায় সময় কেটে গেল। বিদায় গ্রহণের সময় পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি আশা করেছিলেন স্বামীজির কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত আলোচনার গতিই ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হল। একথা শুনে স্বামীজি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন :

> Sir, so long as even a dog of my country remains without food, to feed and take care of him is my religion and anything else is either non-religion or false religion.

স্বামীজির দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পর সখারাম এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেন স্বামীজির কথাগুলি তাঁর অন্তরকে দগ্ধ করেছিল, সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন দেশাত্মবোধ কাকে বলে। *দেশের কথা* রচনামূলে যে প্রজ্বলন্ত দেশচেতনা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তেজোগর্ভ অনুপ্রেরণাও যে তার অন্যতম ইন্ধন ছিল, এই অনুমান খুবই যুক্তিসংগত।

অবশ্য সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা ছিল তিলকের। মহারাষ্ট্র আন্দোলন ক্রমেই বলশালী হয়ে উঠেছিল। লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে গণপতি-পূজার নূতনতর ব্যাখ্যা দিয়ে সার্বজনিক পূজারূপে তার প্রবর্তন করলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তিলকের জ্ঞান ও গবেষণা তাঁর দেশচেতনাকে গঠিত করেছিল। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তব্যকে যুক্ত করে একটি নূতন মূল্যমানকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিলক। একই প্রেরণাতে প্রবর্তিত হল শিবাজী-উৎসব। প্রতাপগড়ে তিলকের চেষ্টায় মহারাজ শিবাজীর উপাস্য ভাবানীদেবীর মন্দিরের সংস্কার হয়। শিবাজী ধর্মবলে ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিলকেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের নতুন জাতীয়তাবাদ ধর্মের বলেই বলীয়ান হয়ে উঠুক। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী-উৎসবের অনুষ্ঠান হল মহারাষ্ট্রে। এই উপলক্ষে কেশরী প্রবন্ধ-কবিতায় এবং উৎসব-বিবরণে মুখর হয়েছিল। তারপরে দু'জন ইংরেজ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, তখন শাসন কর্তৃপক্ষ মনে করলেন তিলকের রচনাই এই হত্যাকাণ্ডকে প্রণোদিত করেছিল। তিলক কারারুদ্ধ হলেন।

সখারামের চিন্তাপথ তিলকের পথকেই অনুসরণ করেছিল। তিলকের মতোই তিনি ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে করতে বর্তমান ভারতে তার উপযোগিতা চিন্তা করেছিলেন। ধর্মের বন্ধনেই ভারতচিত্তকে বাঁধতে হবে। নতুন জাতীয়তা ধর্মকে আশ্রয় করেই গঠিত হবে। ধর্মবিচ্ছিন্ন দেশাত্মবোধের চিন্তা তখনও দেখা যায়নি। বাংলাদেশে এই দেশাত্মবোধের পটভূমি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র যে ত্যাগব্রতী দেশসাধকদের কল্পনা করেছিলেন, তারা সন্ন্যাসী, দেশ এবং ঈশ্বর তাদের কাছে প্রায় সমার্থক।

সখারামের দেশকল্পনার পরিচয় পাই 'শিবাজীর দীক্ষা'য় :

> ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এদেশে ধর্ম্ম ভিন্ন কখন কোন জাতির বা কোন সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয় নাই। শিখজাতির উন্নতির সহিত গুরু নানকের প্রচারিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাণনাথ নামক জনৈক মহাপুরুষ বুন্দেলখণ্ডে যে নবধর্ম্মভাবের প্রবর্ত্তন করেন তাহারই ফলে বুন্দেলা জাতি মোগল শাসনের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয়। মুসলমান আমলে রাজপুতনায়, পঞ্জাব ও বুন্দেলখণ্ডের ন্যায় নবধর্ম্মের উদ্দীপনা ও

মূর্ত্তি পরিপ্লাবন সংঘটিত হয় নাই বলিয়া সেখানে আমরা হিন্দু শক্তির বিজয়িনী মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই। ...

যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন মহারাষ্ট্র দেশে ধর্ম্মসংস্কার ও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাহাদিগের দেশের ধর্ম্মশিক্ষক ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। মহারাজ শিবাজীর জীবনীর সেহিত ঐ সকল সাধু পুরুষের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ। ... রামদাস স্বামীর নিকট মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার অনুগামী মহারাষ্ট্র সমাজ যে অপূর্ব্ব দীক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে মুসলমান-প্লাবিত ভারতে হিন্দুশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুশক্তির এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিধর্ম্মীর চক্ষে অরাজকতার ইতিহাস রূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এই ইতিহাস তাঁহাদিগের গৌরবকাহিনীতে পরিপূর্ণ।' [৪]

ধর্মের সাহায্যে জাতিগঠন-কল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। সম্ভবত তিলকের শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দীপনাতেই তিনি 'প্রতিনিধি' (১৮৯৭) কবিতাটি রচনা করেছিলেন। যে-রাজ্য শিবাজী গুরুকে দান করেছিলেন, গুরু শিষ্যকে সেই রাজ্যই শাসন করতে আদেশ দিলেন অন্ধ কর্তৃত্বে নয়, ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মাত্র। শিবাজী ঈশ্বরের রাজ্যকে অপ্রমত্ত চিত্তে শাসন করবেন ধর্মেরই সেবকরূপে :

গুরু কহে তবে শোন — করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার
এই আমি দিন কয়ে — মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি — ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে সে রাজধর্ম — জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

শিবাজীর এই রাজ-আদর্শ আকৃষ্ট করেছিল সখারামকে, মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই সমধর্মিতাতে সখারাম এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের নিকটে এলেন। ১৯০২ সালে বাংলাদেশেও মহারাষ্ট্রের এই উৎসব পালিত হল। সখারামই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। কয়েকবারের শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে সখারাম *শিবাজীর মহত্ত্ব* (১৯০৩), *শিবাজীর দীক্ষা* (১৯০৪) এবং *শিবাজী* (১৯০৬) নামে তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনটিই বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী-উৎসব' এবং প্রেমতোষ বসুর একটি কবিতা যুক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যেও সেই বিশ্বাসই ধ্বনিত :

এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন
করিব সম্বল।

ধর্মের নির্দেশেই রাজ্য গড়তে হবে। জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে ধর্মের চেয়ে মহত্তর অনুপ্রেরণা ও শক্তি আর কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনাতেও বলেছেন :

আমাদের দেশে মোগল শাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল, তখন সে-চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর গুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন।[৫]

শরৎকুমার রায়ের *শিবাজী ও মরাঠা জাতি* গ্রন্থের (১৯০৮) ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথ একই কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে সখারাম ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একমত।

ধর্ম ও জাতীয়তার মিশ্রণকে অনেকেই অনুকূলচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। এই মিশ্রণের বিপদ এই যে ভিন্ন ধর্ম যারা আচরণ করে, এই জাতীয়তার আদর্শ তাদের চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে না। ফলে হিন্দুধর্মাশ্রিত জাতীয় চেতনা ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশকেই অবহেলা করতে চায়। অবশ্য এর উদার ব্যাখ্যাও আছে। তবু অনুভূতি যুক্তিতে নিরস্ত হবার নয়। ১৯০৬-এর শিবাজী-উৎসবে অনুষ্ঠিত ভবানী পূজায় তিলক কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেননি। কিন্তু তাই বলে শিবাজী-উৎসব পালন করতে তিনি কোনো বাধা অনুভব করেননি। কারণ যে-ধর্ম জাতীয় সংহতি গড়ে তোলে সে-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিছু বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সেকালীন গদ্যরচনা যিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন তিনি সহজেই উপলব্ধি করবেন, আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাতেই তিনি ধর্ম রক্ষা করে চলতে উপদেশ দিয়েছেন, সে-ধর্ম কোনও সাম্প্রায়িক, পৌরাণিক বা ঔপনিষদিক ধর্ম নয়; সে-ধর্ম মানবনীতির ধর্ম। আমরা যখনই কোনও সংকট সমাধানের চেষ্টা করব তখন আমরা যেন শুধু আশু প্রয়োজনকেই বড়ো করে না দেখি। সকল সমস্যার মূল চরিত্রশুদ্ধি। আমাদের বুদ্ধি যদি হয় দুর্বুদ্ধি, চরিত্র যদি হয় সংকীর্ণ তবে কোনও সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে তারই নাম ধর্ম। মারাঠা রাজ্য স্থায়ী কেন হল না, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন:

> একদিন সেই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া গেল। তখন সমস্ত দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পারিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা বিশ্বাসঘাতকতা বটগাছের শিকড়জালের মত মারাঠা প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়াছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে— ইহাই মারাঠা অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সামাজিক সংস্কার, এমনকি ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের সময়ও রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মাচরণের অনুকূলে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সখারাম যে-সময়ে লেখকরূপে দেখা দিয়েছেন, সে সময়টায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রখর হয়ে উঠেছে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কও এক শতাব্দী পর নতুন দিকে মোড় ফিরেছে। ইংরেজ জাতি আমাদের কাছে তো শুধু রাজার জাতি ছিল না, সে ছিল জঙ্গম শক্তির প্রতীক, জাতীয় জড়তা ঘোচাবার মন্ত্রদাতা। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপেই আমরা ইংরেজকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই বিশ্বাসের ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে এল সেই শতাব্দীর শেষে। অবিশ্বাস রূপ নিল তীব্র রাজনৈতিক উদ্যোগ আয়োজনে। জাতীয় মহাসভার ধীরগতি কর্মসূচি মনঃপূত হয়নি অনেকেরই। মহারাষ্ট্রে তিলক এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী যুবসংগঠন এক অধীরতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুললেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের *দেশের কথা* (১৯০৪) রচিত হয়েছিল এই উত্তাল জনচেতনার মুহূর্তে। এই বইতে সখারাম ইংরেজ শাসনের দু'দিক নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সার্থকতা এবং নৈতিক সার্থকতা। প্রথম যুগে ইংরেজ জাতির প্রভুত্বের নৈতিক প্রভাবের চিন্তাই হয়েছিল বড়ো, কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজ প্রভাবের প্রত্যক্ষ কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল। নৈতিক প্রভাবের সার্থকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের ক্রমপরিবর্তিত রূপান্তরের সাক্ষ্য আছে মনীষীদের চিন্তায়। আধুনিক বাংলার মননধারার এদিকের আলোচনার গুরুত্ব কম নয়, কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির কাহিনি অন্ধ বিদেশি অনুকরণের স্থলে স্বাধীন চেতনার প্রতিষ্ঠা। প্রায় প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এই সম্পর্কে মন্তব্য আছে। অতএব এই ইতিহাস সংক্ষেপে অনুসরণ করা অসংগত হবে না, কারণ সখারামের বই এই ইতিহাসেরই ফসল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের ছলনায় এদেশে যখন রাজদণ্ড বিস্তার করে বসল তখন বিদেশি বণিকের শাসন আমাদের কাছে অবমাননাজনক মনে হয়নি। তার ছিল দুটো কারণ। একটা কারণ, এটা যে অপমান এ-বোধ দেখা দেয়নি অন্তত হিন্দুদের কাছে। অর্থাৎ দেশাত্মবোধের তখনই জন্মই হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ, ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই জন্যই উন্নততর জাতির সান্নিধ্য এবং প্রভাব সুফলদায়ক বলেই মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনায় দেখা দিলেন রামমোহন। অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ তিনি, অসামান্য ধীশক্তি এবং অপরিমেয় কর্মপ্রেরণা তাঁর। তবু তিনি ইংরেজের অধীনতাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> ...for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and religious subjects among those nations to which that influence extends.

এই বহুবিধ সুফল উনিশ শতকের বাঙালিদের চিন্তাকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করেছিল। শিক্ষার নবতর পদ্ধতিতে, উন্নততর নীতিবোধে সর্বভারতীয় সংহতি-সাধনে, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের সহায়তায় ইংরেজ শাসন আমাদের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রবুদ্ধ করেছে। ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের দ্বারা একদিন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে—রামমোহনের এই বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত ছিল সুদূর ভবিষ্যতের একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানবিকতা, যার ধারক সেদিন ছিল ইংরেজ শাসন, ভারতীয় জাতিগঠনে প্রেরণা স্বরূপ কাজ করেছিল।

নব্যবঙ্গের ইংরেজিপ্রীতি এই বিশ্বাসেরই আতিশয্যপূর্ণ প্রকাশ। তাঁরা নির্বোধ অনুকারক ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজের সহযোগিতায়, তাদের দেওয়া মানববিদ্যা দিয়েই দেশের অচল জড়তার স্তূপকে নিরাকৃত করতে হবে। ইংরেজই এ বিষয়ে সহায়ক হবে। তাদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় তখনও সন্দেহের কীট প্রবেশ করেনি। শিক্ষালয় স্থাপনে ইংরেজ সহায়তা করেছে, সতীদাহের মতো সামাজিক অন্যায় দূরীকরণে দেশবাসীর ইচ্ছাকে তারা দিয়েছে স্বীকৃতি, নিরপেক্ষ শাসন-বিধান প্রয়োগে দেশীয় জাতি এবং সম্প্রদায় ভেদকে মান্য না করে মানবিক মূল্যকে তারা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নব্যবঙ্গের কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জর্জ টমসন বলেছিলেন ইংরেজ শাসনে আস্থা রেখেই তাদের চলতে হবে [৮]। আস্থা তাঁরা রেখেছিলেন। ১৮৫৭-র সিপাহি যুদ্ধের সময়ে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সৌধ যে দেশের মাটিতে গড়ে উঠছে, সে-মাটির থেকে প্রাণরসধারা ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে চলেছে, সেদিকে তখনও মনোযোগ পড়েনি। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময়ে আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা এক সময়ে অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।[৯]

ইংরেজ জাতির যে মহত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকলেও একটি বিপরীত চিন্তার আভাস ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছিল। এই নতুন মনোভাবের কারণ ছিল ক্রমজাগ্রত দেশাত্মবোধ। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেই দেশাত্মবোধ প্রথম দিকে গড়ে উঠেছিল। রঙ্গলালের কাব্যে স্বাধীনতাহীনতার জন্য দুঃখবোধের ইংরেজের কৃপাপ্রার্থনা ছিল, তেমনি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। ইংরেজই আমাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করবে—ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্বে এই বিশ্বাসটুকু ভাঙতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। উইলসন হেয়ার বেথুন বেন্টিঙ্ক

মেটকাফ হারডিন্‌জ প্রভৃতি কয়েকজন শাসক যাঁরা এদেশীয় ভাবুক সমাজের সঙ্গে মিশেছিলেন, তাঁদের সান্নিধ্যই ইংরেজ চরিত্রের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে আস্থা জন্মিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ-প্রবর্তিত ন্যায়নীতিও আমাদের মধ্যে মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বলেছিলেন:

> ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অসুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য; কে বলিবে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?[১০]

ইংরেজ-প্রবর্তিত বিধিবিধানের সততাই শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইংরেজ মহত্ত্বকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছিল। কিন্তু সংশয়ের সরীসৃপ একটু একটু করে মাথা তুলতে লাগল। ইংরেজের ন্যায়বিধি চমৎকার কিন্তু তার প্রয়োগ বড়ো সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রই 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বাঙ্গালা শাসনের কল' (১৮৭৪) প্রবন্ধ দুটিতে সে-অসুবিধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যদি ন্যায়বিধি প্রয়োগ করাই না যায় অথবা কঠিন হয়, তবে সে-বিধির সার্থকতা কী? সরকারি শাসনকার্যে অংশভাক্ হবার সুযোগেও বাঙালির বাধা হচ্ছিল। দেশীয় ব্যক্তিদের জীবনধারার সঙ্গে অপরিচয় যেমন একদিকে শাসকশ্রেণীকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, তেমনি এ বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিদের সাহায্যকে কাজে লাগাবার অনিচ্ছাও শাসকদের প্রতি নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে তুলছিল।[১১] এ-সন্দেহেরও নানা প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ তাঁর রচনায় সহজপ্রাপ্য। তিনিই ১৮৭৩ সালে ইংরেজ ও দেশীয় এই দুই সম্প্রদায়ের অসহযোগের উল্লেখ করেছিলেন; কিন্তু অসহযোগের দ্বারাই সুফল অর্জন করতেও বলেছিলেন:

> ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না — কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নয়। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক — উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্য ক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।[১২]

এই জাতিবৈর থেকেই দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হল। যে-সময়ে বঙ্কিম এই কথাগুলি লিখেছেন সেই সময়েই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আত্মচেতনামূলক বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা লিখছেন। *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ দেশের মাতৃমূর্তি দেখা দিয়েছে, লোকরহস্যে দেখা দিয়েছে ইংরেজের বৈরীমূর্তি। অবশেষে ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম বুঝিয়েই বললেন ইংরেজের থেকে কতটুকু নিতে হবে, কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর দেশের ভাণ্ডারেই বা লুকিয়ে আছে কোন ঐশ্বর্য। কমলাকান্তের থেকে আনন্দমঠে দেশাত্মবোধ হল তীব্রতর। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব বঙ্কিমের চোখে যেন নিষ্প্রভ হয়ে এল, মুখ্য হয়ে উঠল দেশ ও জাতীয় চরিত্রের পরিণাম-ভাবনা। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থ পরিহাসের উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত রামা কৈবর্ত, হাসিম শেখ, পরাণ মণ্ডল, রামধন পোদদের ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রকে অধিকার করল। এই বিভেদের জন্য দায়ী ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি আর উদ্দেশ্য ছিল 'বাবু'-শ্রেণী তৈরি করা এবং জনসমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা।

ইংরেজ কী কৌশলে ভারতবাসীর জীবনধারা শোষণ করছিল রমেশচন্দ্র দত্ত তার জ্বলন্ত বর্ণনা দেবার আগে আর-একজন ঋষিকল্প ব্যক্তি ধীর গম্ভীরভাবে এই সর্বনাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। কঠিন নিরপেক্ষতার সঙ্গেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় নতুন সভ্যতার সুফল-কুফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দশটি সূত্রে তিনি তাঁর এই আলোচনাকে সংহত করে দেখিয়েছিলেন। তার ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্র যথাক্রমে এই :

শুল্ক বা বাণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে যাহাতে ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত।[১৩]

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর বহু তথ্য প্রমাণ সহযোগে যে কথা বলেছিলেন, ভূদেবও সংক্ষেপে সেই কথাই বলেছিলেন। পূর্ববর্তীর রচনাতে তখনও কোনও তিক্ততা ফুটে ওঠেনি, রমেশচন্দ্র হয়তো তখনও ভেবেছিলেন রাজকার্যে ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দিলে এইসব দোষ এড়ানো যাবে। ইংরেজের শাসনযন্ত্রে ভারতীয়রা অধিক সংখ্যায় স্থান গ্রহণ করতে পারলে সেও একরকমের স্বায়ত্তশাসনই হবে। তাতে পীড়ন যেমন কম হবে তেমনি দেশীয় লোকসমাজে আত্মনিয়ন্ত্রণের আত্মপ্রসাদ আসবে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত *England and India* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তাতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের বর্ধমান বিচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি বলেন :

> A feeling of unrest is perceptible in India, not of unrest under the British rule, but of unrest under a form of government framed forty years ago and which no longer suits the circumestances of the present day. Indian opinion seeks to be heard, and is not heard ; Indian feeling seeks to be represented and is not represented.[১৪]

ইংরেজ শাসনের প্রতি যে প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ওই শতাব্দীর শেষে সে-প্রত্যাশা ফুরিয়ে এল। ইংরেজের প্রতি আমাদের সন্দিগ্ধতার উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র, ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেবার পরামর্শও দিয়েছিলেন, কিন্তু যে সর্বনাশ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন রমেশচন্দ্র তার পরের বই *The Economic History of India* (1901)-তে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইংরেজের প্রতি আমাদের অবিশ্বাসের পাত্র পূর্ণ হয়েছে। যে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করছে তার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার আর কিছু নেই। বাহুবলে যে কোটি কোটি লোককে পদানত করে রেখেছে, বাহুবল দিয়ে তার প্রতিকার হবে না। প্রতিকারের একমাত্র উপায় আত্মগঠন, চরিত্রবল—আমাদের স্বভাবকে ক্ষুদ্রতামুক্ত করা। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে একথাই বলা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যে সুফল লাভের জন্য ইংরেজ শাসনকে সহ্য করতে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার কোনও কথা নেই, এমন কী রমেশচন্দ্র শাসনকার্যের দায়িত্ব দিয়ে ভারতবাসীর অবিশ্বাস দূর করার প্রস্তাব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-চিন্তাও করেননি। তিনি বললেন :

> সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজা প্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।... আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত, সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।[১৫]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে পন্থা নির্দেশ করেছেন, বস্তুত সেটা সমাধানই নয়। তিনি সমস্যার কোনও নির্দিষ্ট সমাধান না দিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন নিজেদের চারিত্রিক দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করতে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করে, ভর্ৎসনা করে, সমালোচনা করে বাঙালিকে বলেছিলেন তার চরিত্রধর্মকে গঠন করতে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মূল বক্তব্য ছিল ত্যাগ বীর্য

সেবার দ্বারা চরিত্রগঠন। এজন্য সেকালের সাহিত্যে নীতির প্ররোচনা যেন বেশি বলেই মনে হয় আজ আমাদের কাছে।

ইংরেজ সম্বন্ধে বাঙালির মনোভাব আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল থেকে ধীরে ধীরে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রধানত সাহিত্য থেকে তার পরম্পরাগুলি বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্যমান মনোভাবের যে কারণ নিহত ছিল, তার জ্বলন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস দিয়েছেন রমেশচন্দ্র, ডিগবি, দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতি। সখারাম *দেশের কথা*-র উপকরণ এঁদের বই থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এ ছাড়া নানা রিপোর্ট ও গ্রন্থের প্রভৃত সাহায্য নিয়ে সখারাম ইংরেজশাসনের কুফল বর্ণনা করেছিলেন। শুধুমাত্র দেশীয় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতের অভিমত দিয়ে তিনি বই রচনা করেননি। সরকারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হয়েছিল বিদেশিদেরই স্বীকৃতি। সখারাম গর্ভনর এবং ভাইসরয়দের অর্থপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন, যার ভিতর দিয়ে ইংরেজের রাজনৈতিক অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে। মেকলে লিটন নর্থব্রুক মনরো টাউনসেন্ড কটন প্রভৃতির উক্তিগুলি সখারাম-বর্ণিত দেশের শোচনীয়তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিদেশি রাজপুরুষেরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য স্বজাতির উদ্দেশ্য যে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন ইংরেজ সে-কথার কর্ণপাত করেনি। সখারাম যখন লিখছেন তখন অবস্থা চরমে পৌঁছে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে 'ছোটো ইংরেজ' এবং 'বড়ো ইংরেজ'-এর শ্রেণীনির্দেশ পাওয় যায়[১৬], উনিশ শতকের বাঙালি বড়ো ইংরেজেরই ভরসা করেছিল, কিন্তু দেখা গেল ছোটো ইংরেজ সে-ভরসাকে চূর্ণ করেছে। সখারাম বড়ো ইংরেজের মন্তব্য দিয়ে ছোটো ইংরেজের কুকীর্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন।

দেশের কথা রচিত হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কাজে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে — এ কথা সখারাম বইয়ের ভূমিকাতেই বলেছেন। ডিগবির *The Prosperous British India–A velation from Official Records*, (*London, 1901*), দাদাভাই নৌরোজির '*Poverty and un-British Rule in India*' (*London 1876-1901*), রমেশচন্দ্র দত্তের '*The Economic History of India*' (*1901*) প্রভৃতি বই সাধারণ পাঠকেরা হয়তো পড়েনি ইংরেজি ভালো করে না জানার জন্যই। *দেশের কথা*-য় সখারাম তাদের সংগৃহীত তথ্যগুলিই সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন।[১৭] ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন রাজশক্তির যথেচ্ছাচারের বাধা প্রজার তরফ থেকে আসা উচিত। 'আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন মাত্র। আমাদিগকে দাতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়'—সখারামের এই কথাগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি মডারেটপন্থী ছিলেন না, ছিলেন তিলকপন্থী। বঙ্কিম-কথিত বৃষজাতীয় পলিটিক্‌সের তিনি ছিলেন ভক্ত। সখারাম প্রত্যক্ষ ভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করেছিলেন, বিপ্লবীদের ক্লাস নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে *দেশের কথা* রচিত বলে শোনা যায়। বইটি নিস্পৃহ ইতিহাস নয়, এর পিছনে সচেতন উদ্দেশ্য ছিল। যুগসঞ্চিত কারণে এই বইয়ের জন্ম। এতে ইংরেজশাসনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কুফলের সঙ্গে নৈতিক অধোগতির বিবরণও ছিল।

বইয়ের শেষ অধ্যায়টি ('সম্মোহন-চিত্ত-বিজয়') বিশেবভাবেই প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, ধ্যানধারণা ভালোমন্দ বিচারবোধের ক্ষেত্রে ইংরেজশাসন যে গুরুতর পরিবর্তন এনেছিল, এই অধ্যায়টিতে তার বিস্তৃত আবেগপূর্ণ আলোচনা আছে। এককালে ইংরেজি শিক্ষার মহত্ত্বে মুগ্ধ বাঙালির আজ প্রয়োজন ষাট বছর পরে সেই শিক্ষার ফল বিচার করে দেখা। পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি প্রধান ফল 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মোহাভিভূত' করেও 'আত্মাভিমান এবং আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস' নষ্ট করা।[১৮] বিজয়ী জাতির প্রতি সম্ভ্রমে বিজিত জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাকে হারিয়েছে; শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদ বেড়েছে। পরাধীনতার ফলে চিত্তবৃত্তির অবনতি ঘটেছে, পরস্পরে সংশয় ও ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়েছি। ইংরেজশাসনে ভারতবাসী সভ্য হয়েছে, এই মিথ্যা কিংবদন্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে সখারাম বলেছেন : 'এই তত্ত্ব ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে

উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা স্বভাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি।'

ইংরেজি শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। সখারাম বলছেন, শাসক কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান প্রচারে নানা প্রতিকূলতাই করেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লক্ষ্যই বা কী? বিশ্বের ঐক্যকে বিশ্লেষণ করে অনৈক্যকে উদ্ঘাটিত করা। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ভারতবাসীর লক্ষ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। বিরোধকে গ্রাস করে ঐক্যাভিমুখী করে তোলাই ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্য।[১৯] সখারাম বিস্তৃতভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন আমাদের দেশেরই দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সেভাবে কখনওই ছিল না। ইংরেজের ভেদনীতিই বিরোধ সৃষ্টি করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে সখারামের মৈত্রীসূচক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য এবং তাৎপর্য অনেকখানি। তিলকপন্থী সখারামের জাতীয়তাবোধ উদারতাচিহ্নিত। তিনি বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের এই বিরোধগ্রাসিতা বা সামঞ্জস্যসাধনী শক্তির জন্য ইসলামভক্ত মুসলমানও হিন্দুর চিরবিদ্বেষের পাত্র হন নাই।' এই প্রসঙ্গে তিনি হিতবাদী পত্রিকার একটি মন্তব্য তুলেছেন :

> মুসলমান শাসনপ্রণালী কষ্টকর ছিল, একথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, দেশের লোকে জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজ সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড়ো ছোরা রাখিতে হইলে 'পাশ' লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখনকার অবস্থা যে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল একথা কেমন করিয়া বলিব? হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এসকল কথা আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভুলিতে পারি না।[২০]

মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে এই পরিবর্তিত মনোভাব নিশ্চয়ই লক্ষ করবার যোগ্য। অবশ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো আচারনিষ্ঠ পূর্বেই এই নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে গিয়েছিলেন। এক্সট্রিমিস্টদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে সখারাম এবং হিতবাদীর এই চিন্তাধারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিবেচ্য। মুসলমানরা নয়, খ্রিস্টানরাই ছিল নিপীড়ন-পারদর্শী, এমন কথা সখারাম বলেছিলেন, সেটা কতটা ইতিহাসসম্মত কতটা দেশাত্মবোধক প্রয়োজনসম্মত বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত কথা'। সখারাম রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন বিদেশি প্রয়োজনেই ইতিহাস হয়েছে মিথ্যাময়। আমরা যে দেশের সত্যকার ইতিহাস জানতেও পারি না ইংরেজি শিক্ষার বহু কুফলের মধ্যে এটি একটি। নিজেদের সম্বন্ধে এমন অজ্ঞতা সৃষ্টির আয়োজন আর নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করতে গিয়ে সখারাম যা বলেছিলেন সেটিই 'দেশের কথা'র মর্ম :

> রাজনীতিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের পক্ষে স্বদেশপ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ। পাশ্চাত্য সংস্রবে আমাদিগের সমাজশরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা দূর করিবার পক্ষে স্বজাতি-প্রেমই একমাত্র উপায়।

দেশের কথা স্বদেশপ্রীতির শিখাকে নভোস্পর্শী করেছিল। সেকালের দেশব্রতী যুবকেরা এই বইখানিকে প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বইটি বাজেয়াপ্ত হল; কিন্তু গান্ধীজির আন্দোলনকাল পর্যন্ত বইটির প্রেরণা ছিল অক্ষুণ্ণ। এতে দেশের যে শোচনীয় সর্বনাশের দিকটি উদ্ঘাটিত, তাতে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রবলতা লাভ করেছিল। সখারাম এই আগুন মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাস এবং সমকালীন রাজনীতি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলাদেশেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালি মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গকে ঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন যেন বলা যায় না। এ অনেকটা একান্নবর্তী পরিবার ভাঙার সামাজিক ঘটনার মতো। অন্তত রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একে বাঙালি সৌভ্রাত্রের উপর আঘাত বলেই ভেবেছিলেন। তাঁরা যেসব পরিকল্পনা করলেন এই সন্ধিক্ষণে যে সবই হল

গঠনমূলক—ইংরেজের মুখাপেক্ষী না থেকে চিন্তায় ও কর্মে নিজেদের সংগঠিত করা। সখারাম বঙ্গভঙ্গের অসন্তোষের মধ্যে দেশপ্রেমের অভিপ্রকাশ দেখলেন, তাতে তিনিও যোগ দিলেন। বাংলাদেশের এই আন্দোলনকে মহারাষ্ট্রের সমাজসংস্কারক দলের মুখপাত্রেরা বিদ্রুপ করেছিল। বয়কট-পন্থাকেও তারা নিন্দা করেছে। তখন সখারামের গুরু তিলক বাঙালির পক্ষসমর্থনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রবন্ধ লিখেছেন। একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে বিলাতি পণ্য বর্জন ও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। *বন্দেমাতরম*-কে মরাঠা যুবকরাও গ্রহণ করে নিয়েছে[২১]। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই সখারামের বই বেরিয়েছে। এই উত্তেজনায় *দেশের কথা* ঘৃতাহুতি দিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ জননেতারা আন্দোলনকে যে গঠনমূলক কর্মাপন্থায় চালিত করতে চেয়েছিলেন *দেশের কথা*-য় তার নির্দেশ ছিল না। এই বইতে আঁকা হয়েছিল একটা প্রচণ্ড শূন্যতার দিক, শতাব্দীব্যাপী ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের ভগ্ন দলিত ধ্বংসদশা। দীনেশচন্দ্র সেন এই বই পড়ে লিখেছিলেন :

> কোন সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয় বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে অথচ দেউসকর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিসটিক হইতে সমৃদ্ধত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘটান করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় — প্রভেদ এই যে ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে।[২২]

এ দৃশ্য পাঠকের গভীর অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে তপ্ত করে। সখারাম আমাদের দেশাত্মবোধে আগুন ধরাতে চেয়েছেন। এই উত্তেজনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ দাবানলের শিখা থেকে গৃহকোণের দীপটি জ্বালতে পরামর্শ দিলেন :

> এ কথা যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-যুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে।[২৩]

রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'-প্রবন্ধে প্রকাশিত আদর্শ থেকে আলাদা ছিল না। কিন্তু তখন দেশে বিপ্লব-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অরবিন্দের মামলা, তিলকের মামলা নিয়ে দেশ উত্তেজিত। সখারামের পরবর্তী বই *তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত* (১৩১৫) এই উত্তেজনাকে বাড়াল ছাড়া কমাল না। এতে মোকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হল। কেশরীর প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত হলে, তার স্বকৃত অনুবাদ দিলেন সখারাম। সংবাদপত্রের সংবাদ, প্রতিদিনের মামলার বিবরণ, তিলকের নিজের বক্তৃতা কিছুই বাদ পড়েনি। তাছাড়া তিলকের দণ্ডের সংবাদে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্যও সংযোজিত হয়েছে। তিলককে নিয়ে *হিতবাদী*-র সঙ্গে সখারামের মতভেদ হয়েছিল, *হিতবাদী*ও তিলকের দণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সখারাম এর পূর্বেই *হিতবাদী*-র কর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তিলকের মোকদ্দমা উপলক্ষে সখারাম আর-একবার তীব্র জাতীয়তাবাদের ঢেউ তুলে দিলেন। এই বইটি সেই মুহূর্তে রচিত। ফলে *দেশের কথা*-র সেই অনিবার্য পরিণতি এল 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে'র ক্ষেত্রেও। বইটি বাজেয়াপ্ত হল। কিন্তু সখারাম গণেশ দেউস্কর দেশের চিত্তে লাভ করলেন স্থায়ী আসন[২৪]।

সূ ত্র নি র্দে শ :

১ *আর্যাবর্ত*, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

২ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৬৮) পৃ ২০৪।

৩ *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples (1960), p. 644 । এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২-তে সখারামের মৃত্যুর বছর।

৪ শিবাজীর দীক্ষা (১৩১১)।

৫ ভারতবর্ষ, ধর্ম্মপদং' (১৯০৪)।

৬. 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি', ভূমিকা।

৭ The English Works of Raja Rammohun Roy, Part III. p 105 (Final Appeal to the Christian Public)। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*-য় উদ্‌ধৃত পৃ ৪২। কিশোরীচাঁদ মিত্র ও রামমোহন সম্পর্কে বলেছেন '... he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country and was strogly of opinion that the English were better fitted to govern it than the native themselves.' — Calcutta Review, 1845।

৮ ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র* (১৯৬১), পৃ ৯২-৯৩।

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সভ্যতার সঙ্কট*।

১০ বঙ্কিমচন্দ্র, *ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা* (১৮৭৩)।

১১ দ্রষ্টব্য : *British Paramountcy and Indian Renaissance*, vol. IX, Part I (1963), p. 410।

১২ *বঙ্কিম-রচনাবলী*, বিবিধ, 'জাতিবৈর' (১২৮০)।

১৩ সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), ইংরাজাধিকার - ইংরাজের বৈদেশিক ভাব।

১৪ জে এন গুপ্ত-প্রণীত Life and Works of Romesh Chunder Dutt (1911) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত। p. 380 ।

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজাপ্রজা, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩)।

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, ছোটো ও বড়ো (১৯১৭)।

১৭ *দেশের কথা*-র সূচিটি (১৯০৪ সং) উদ্‌ধৃত করছি : আমাদের দেশ ; ইংরাজ শাসনের দোষ-গুণ; দেশের অবস্থা; মানসিক অবনতি ; কৃষকের সর্ব্বনাশ; রেল ও খাল; বঙ্গীয় শিল্পিকুলের সর্বনাস ; দেশীয় শিল্পের ধ্বংস; দেশের আয়-ব্যয় সম্মোহন-চিত্ত-বিজয়। পরিশিষ্টে : বিনিময় ক্ষতি; আদমসুমারির তালিকা; শিক্ষকের তালিকা; ভারতীয় কৃষকের অবস্থা ; দেশীয় রাজ্যের উত্তমর্ণ ; বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী ; কৃষকের অবস্থা; মিশনারিদিগের কুসংস্কার ; সামরিক ব্যয় ; দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ; স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপাল ; লবণে রাজস্ব ; দেশের আয়-ব্যায়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪২।

১৮ বস্তুত ঐতিহাসিকদের মত এই যে, ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে বশংবদ কেরানিকুল সৃষ্ট হবে, শাসক-কর্তৃপক্ষের মনে এই অভিসন্ধি থাকলেও আসলে ফল হয়েছিল বিপরীত। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মুক্ত বুদ্ধির সাধনাকে ইংরেজি শিক্ষাই প্রশস্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথও 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করাকেই বলেছিলেন অন্ধতা।

১৯ রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯০২) প্রবন্ধে এই তত্ত্বের কথা বলেছিলেন।

২০ *দেশের কথা*, ১৯০৪, পৃ ৩০৩।

২১ সখারাম গণেশ দেউস্কর, 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' (১৩১৫), পৃ ৫১।

২২ *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়), শ্রাবণ, ১৩১১, পৃ ২১০।

২৩ *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়), শ্রাবণ, ১৩১১, পৃ ২১০। প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যসহ রবীন্দ্ররচনাবলি ১০ (বিশ্বভারতী সং) পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

২৪ এই প্রবন্ধের কোনও কোনও তথ্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত (১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯) 'সখরাম গণেশ দেউস্কর' প্রবন্ধ থেকে পেয়েছি। সখারামের পূর্ণাঙ্গ গন্থতালিকার জন্য *সাহিত্য সাধক চরিত* দ্রষ্টব্য।

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬)

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

অশোক মুস্তাফি : ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। নেতাজি ও টম পেনের উপর গবেষণামূলক কাজের জন্য সুপরিচিত। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্মদেশ, সুভাষচন্দ্র ও আয়ারল্যান্ড, টমাস পেন অ্যান্ড ইন্ডিয়া, টমাস পেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড* ইত্যাদি।

শান্তি বসু : রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা। কিছুদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। *সাহিত্যপত্র* ও *এক্ষণ* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে তাঁর লেখা বইটি উল্লেখযোগ্য।

কানাই সামন্ত : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪—৩ অক্টোবর ১৯৯৫। বর্ধমান। রবীন্দ্রগবেষক কবি ও শিল্পী। বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ ও রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *ইন্দ্রধনু, রূপমঞ্জরী, সন্ধ্যাতারা, শুকতারার টিপ* (কাব্যগ্রন্থ), *ঝরাপাতা ঝরাপালক* (স্মৃতিকথা) ইত্যাদি।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৪০। প্রাবন্ধিক সমালোচক ও সম্পাদক। সাহিত্য চলচ্চিত্র নাটক শিল্পের সব শাখাতেই অবাধ বিচরণ। প্রকাশিত কয়েকটি বই : *থিয়েটারের জল হাওয়া, উৎপল দত্তের গদ্যসংগ্রহ* (সম্পা), *বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ* (সম্পা) ইত্যাদি।

অমিয় বাগচী : ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৬। যদুপুর, মুর্শিদাবাদ। অর্থনীতিবিদ। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *ভারতে আধুনিক শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন, সংস্কৃতি সমাজ ও অর্থনীতি, বিশ্বায়ন : ভাবনা ও দুর্ভাবনা* (সম্পা) ইত্যাদি।

শিশিরকুমার দাশ : ৭ নভেম্বর—৭ মে ২০০৩। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *অবলুপ্ত চতুর্থচরণ, আর্গোস, গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব, ফুলের ফসল : সংকলনের রাজনীতি, ভাষাজিজ্ঞাসা* ইত্যাদি।

শম্ভু মিত্র : ২২ অগস্ট ১৯১৫—১৯ মে ১৯৯৭। আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। নাট্য সৃজনের পাশাপাশি নিয়মিত লিখেছেন নাটক গল্প ও প্রবন্ধ। প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ : *অভিনয় নাটক মঞ্চ, প্রসঙ্গ নাট্য, সম্মার্গ সপর্যা, কাকে বলে নাট্যকলা, নাটক রক্তকরবী* ইত্যাদি।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় : ১৯১৫—২৩ জুন ২০০৪। গ্রিক-ল্যাটিন-ফরাসি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত। যুক্ত ছিলেন *সাহিত্যপত্র* সম্পাদনার সঙ্গে। গ্রন্থ সমালোচনা করেছেন *পরিচয়* পত্রিকায়। প্রকাশিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ : *বর্ষশেষ ও অন্যান্য কবিতা, বসুন্ধরা, কয়েকটি প্রেমের কবিতা* ইত্যাদি।

সুনীলচন্দ্র সরকার : ১৯০৭-১৯৭৬। বিশ্বভারতীতে ইংরাজি ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটেছিল। সৃজনশীলতা ছিল বহুমুখী—সু-গায়ক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও কবি হিসেবেও সুপরিচিত।

শঙ্খ ঘোষ : ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২। চাঁদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ : *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, নিঃশব্দের তর্জনী, এ আমির আবরণ, কল্পনার হিস্টিরিয়া দামিনীর গান* ইত্যাদি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : ৬ অক্টোবর ১৯৩৩। কলকাতা। কবি ও প্রাবন্ধিক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক যাদবপুর ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *অতন্দ্র গোলাপ, অস্তসূর্য এঁকে দিলো টেম্পেরা, তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন, শরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা, ভ্রমণে নয় ভুবনে* ইত্যাদি।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : ১১ জুলাই ১৯১৫—৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য, ইংলিশ পোয়েটস অ্যান্ড আদার এসেস, রিভোল্ট ইন ইস্ট বেঙ্গল, ইস্ট ওয়েস্ট লিটারারি রিলেশানস্* ইত্যাদি।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত : ২২ এপ্রিল ১৯৩৪। কাশীপুর। সাহিত্যিক ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *একই সমুদ্র, বিদ্ধ করো, পরিচয়, আর কোনও চিহ্ন নেই* (কাব্য), *দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ, বিশ শতকের পাশ্চাত্য মন ও সৃষ্টি, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ইন কোয়েস্ট অফ ওয়ার্ল্ড কালচার* (প্রবন্ধ) ইত্যাদি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। বর্ধমান। কবিতা ও উপন্যাস দিয়ে সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হলেও সাহিত্য সমালোচক ও প্রাসঙ্গিক হিসেবেই সুপরিচিত। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, বাংলা কবিতার কালান্তর, আগুন ও অন্ধকারের নাট্য : রবীন্দ্রনাথ, উনিশ বিশের কড়চা, আলো আঁধারের সেতু : রবীন্দ্রনাথ* ইত্যাদি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য : ৯ অক্টোবর ১৯২৭—২৩ মার্চ ২০০৩। ভাটপাড়া। নৃতাত্ত্বিক, ফরাসি ভাষাও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *অশ্বমেধ, এক দিগন্ত দিনান্তের, গঙ্গাবতরণ, গান্ধী রোম্যা রোঁলার দৃষ্টিতে* ইত্যাদি।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত : ১৯২১। শিলং। চলচ্চিত্র পরিচালক ও সমালোচক। *ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি*-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। *ইন্ডিয়ান ফিল্ম রিভিউ, ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার* ও *স্প্যান*-এ সাংবাদিকতা করেছেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *দ্য সিনেমা অফ সত্যজিৎ রায়, ফিল্ম ইন্ডিয়া : সত্যজিৎ রে (অ্যান্থোলজি), দ্য পেইন্টেড ফেস* ইত্যাদি।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬। লেখালেখি *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায়। সম্মানিক অধ্যাপনা ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডি— সিমলা। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *উনিশ শতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, দ্য পার্লার অ্যান্ড দ্য স্ট্রিট, ডেঞ্জারাস আউটকাস্ট, ইন দ্য ওয়েক অফ নকশালবাড়ি* ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য : ১৯৩২। ভাগলপুর। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। *ভারতকোষ*-এর সঙ্গে সম্পাদনা সূত্রে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *টীকা টিপ্পনি, তেরছা নজরে, মোল্লা নাসিরুদ্দিন, রোদ্যাঁ নটরাজ* ইত্যাদি।

অরুণ সেন : ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬। ইংরেজবাজার, মালদহ। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সম্পাদিত পত্রিকা *সাহিত্যপত্র কলকাতা*। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *এই মৈত্রী এই মনান্তর, বিষ্ণু দে : এ ব্রত যাত্রায়, যমিনী রায় বিষ্ণু দে : বিনিময়, বইপড়া বইপাড়া, যোগেন চৌধুরীর ছবি* ইত্যাদি।

পরেশ চট্টোপাধ্যায় : বামপন্থী অর্থনীতিবিদ। অধ্যাপনার সূত্রে প্রথমে সিটি কলেজ পরে ইন্ডিয়ান ইনস্‌টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, জোকায় যুক্ত হন। বর্তমানে কানাডার কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *মার্কস মিথস্ অ্যান্ড লেজেন্ডস, মার্কসিস্ট কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড দ্য সোভিয়েত এক্সপিরিয়েন্স* ইত্যাদি।

অশোক সেন : ১৯২৭। ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। *বারোমাস* পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ ইলিউসিভ মাইলস্টোনস্, কথায় উপকথায় বিদ্যাসাগর, ইতিহাসের ঠিক ঠিকানা* ইত্যাদি।

অশোক মিত্র : ১০ এপ্রিল ১৯২৮। ঢাকা, বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদ ও বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *প্রবন্ধ সংগ্রহ, অকথা-কুকথা, কবিতা থেকে মিছিলে, পুরনো আখরগুলি, আপিলা-চাপিলা, নাস্তিকতার বাইরে, সংকটের স্বরূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* ইত্যাদি।

বিনয় ঘোষ : ১৪ জুন ১৮৯৭—২৫ জুলাই ১৯৮০। কলকাতা। সমাজবিজ্ঞানী। সাহিত্যসমালোচক, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি—বিশেষত লোকসংস্কৃতির গবেষক। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র* ইত্যাদি।

নীরদ মজুমদার : মে ১৯১৬—২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। টাকি, চব্বিশ পরগণা। চিত্রশিল্পী। তন্ত্র আর্টের পুনর্জন্ম দিয়েছেন তাঁর আঁকায়। বিখ্যাত সিরিজ—*ইমাজ এক্লোজ,* উইং *অর নো এন্ড, ষোড়শী কলা, বৈতরণী ইত্যাদি*। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *পুনশ্চ পারি*।

সত্যজিৎ রায় : ২ মে ১৯২১—২৩ এপ্রিল ১৯৯২। কলকাতা। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হলেও কিশোর সাহিত্যিক ও অলংকরণ শিল্পী হিসেবেও প্রথম সারিতে। প্রকাশিত বই অজস্র। তার মধ্যে প্রবন্ধের গ্রন্থ : *বিষয় চলচ্চিত্র, আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস*।

কমলকুমার মজুমদার : ১৯১৫—৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। টাকি, চব্বিশ পরগণা। সাহিত্যিক ও শিল্পী। ফরাসি সাহিত্য-মিনিয়েচর চিত্রণ অলংকরণ থেকে লোকশিল্প নাটক নানা বিষয়ে ছিল তাঁর অনায়াস দক্ষতা। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *অন্তর্জলি যাত্রা, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, নিম-অন্নপূর্ণা, গোলাপ সুন্দরী, সুহাসিনীর পমেটম* ইত্যাদি।

মুরারি ঘোষ : ১৯৩১-২০০৭। অর্থনীতির ছাত্র। হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের রিসার্চ অফিসার ছিলেন। মার্কসের জীবনী গ্রন্থ তিনি লেখেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি নিযুক্ত ছিলেন রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা বিষয়ক কাজে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ২৩ নভেম্বর ১৯০৭—৩০ জুলাই ২০০৪। কলকাতা। ঐতিহাসিক ও প্রাক্তন সাংসদ। *প্রগতি* পত্রিকায় যৌথ সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ : *তরী হতে তীর, যুগের যন্ত্রণা প্রত্যয়ের সংকট, চরৈবেতি চরৈবেতি, স্বদেশ জিজ্ঞাসা, চক্ষুসা কাণঃ* ইত্যাদি।

অন্যরকম ব্যাখ্যা তাঁকে বিশেষ পরিচিতি দেয়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক হিল ছদ্মনামেও প্রচুর প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখেন। প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ: *দ্য ইংলিশ রেভেলিউশন ১৬৪০*, *ইকোনমিক প্রবলেম অফ দ্য চার্চ*, *ইনটেলেক্টচুয়াল ওরিজিন অফ দ্য ইংলিশ রেভেলিউশন* ইত্যাদি।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :১৯১৬—৬জুন ২০০৩। কলকাতা। সিটি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। *নাউ* পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক। ১৯৪৯ থেকে নানা পত্রপত্রিকায় দর্শন সাহিত্য ও মার্কসবাদ বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন।